7561.3
.005
অধ্যা-১-১২
CALCUTTA UNIVERSITY
Acc. No.....
Book No.....
LIBRARY.

৪৯শ বর্ষ | ১৩৩২ | বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়

অকালে বাসন্তী পূজা

রামচন্দ্রের ন্যায় আজ আমার শরতে বাসন্তী পূজা, বর্ষমধ্যে বর্ষারম্ভের ভারতী-উদ্বোধন।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিস্মৃতিশক্তিরূপেণ সংস্থিতা

যিনি রামচন্দ্রকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তিনি আমায় সিদ্ধার্থ করুন।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

যেতে যদি হয়

ভৈরবী

যাব, যাব, যাব তবে,
যেতে যদি হয় হ'বে ॥
লেগেছিল কত ভালো
এই যে আঁধার আলো,
খেলা করে শাদা কালো
উদার নভে।
গেল দিন ধরামাঝে
কত ভাবে কত কাজে,
সুখে, দুখে, কভু লাজে,
কভু গরবে।
যেতে যদি হয় হ'বে ॥
প্রাণপণে কত দিন
শুধেছি কঠিন ঋণ,
কখনো বা উদাসীন
ভুলেছি সবে।
কভু ক'রে গেনু খেলা,
স্রোতে ভাসাইনু ভেলা,
অনমনে কত বেলা
কাটানু ভবে।
যেতে যদি হয় হ'বে ॥
জীবন হয়নি ফাঁকি,
ফলে ফুলে ছিল ঢাকি,
কিছু যদি রহে বাকি
কে তাহা ল'বে ?
দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে,
বোঝা-ব'সে-যাওয়া বুকে
যাব চ'লে হাসিমুখে,
যা'ব নীরবে।
যেতে যদি হয় হ'বে ॥

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

শূদ্রধর্ম্ম

মানুষ জীবিকার জন্যে নিজের সুযোগমত নানা কাজ ক'রে থাকে, সাধারণতঃ সেই কাজের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ নেই—অর্থাৎ তার কর্ত্তব্যকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মূল্য দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষে একদিন জীবিকাকে ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করা হ'য়েছিল। তা'তে মানুষকে শান্ত করে, আপনার জীবিকার ক্ষেত্রকে তার সমস্ত সঙ্কীর্ণতাসমেত মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

জীবিকা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যাদের ইচ্ছায় কোনো বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে ভাগ্যে তা'দের বাধা দেয়। যে-মানুষ রাজমন্ত্রী হ'বার স্বপ্ন দেখে কাজের বেলায় তা'কে রাজার ফরাসের কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় কাজের ভিতরে ভিতরে তার বিদ্রোহ থামতে চায় না।

মুস্কিল এই যে, রাজসংসারে ফরাসের কাজের প্রয়োজন আছে কিন্তু রাজমন্ত্রীপদেরই সম্মান, এমন কি, যে স্থলে তার পদই আছে কর্ম্ম নেই সেখানেও। ফরাস ব'সে ব'সে ভাবে—তার প্রতি দৈবের অবিচার। পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে কিন্তু ক্ষোভ মেটে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতার পক্ষে ভাগ্যও যদি যোগ দিত, সব ফরাসই যদি রাজমন্ত্রী হ'য়ে উঠ্‌ত, তা হ'লে মন্ত্রণার কাজ যে ভালো চল্‌ত তা' নয়, ফরাসের কাজ একেবারেই বন্ধ হ'য়ে যেত।

দেখা যাচ্ছে ফরাসের কাজ অত্যাবশ্যক, অথচ ফরাসের পক্ষে তা অসন্তোষজনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে কাজ করা অপমানকর।

ভারতবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা ক'রেছিল বৃত্তিভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা ক'রে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হ'ত তাহ'লেও তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকৃত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনই থাম্‌ত না। পাকা হ'ল ধর্ম্মের শাসনে।—বলা হ'ল এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তার ধর্ম্মেরই অঙ্গ।

ধর্ম্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবী করে। সেই ত্যাগে আমাদের দৈন্য নয়, আমাদের গৌরব। ধর্ম্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগ বিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ কর্‌বার উপদেশ দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ করতেই পার্‌ত না। শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ-স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায়নি। তবুও, সে কিছু পা'ক্ আর না পাক্, ধর্ম্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করারও মধ্যে তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে।

বস্তুতঃ জীবিকা নির্ব্বাহকে ধর্ম্মের শ্রেণীতে ভুক্ত করা তখনি চলে যখন নিজের প্রয়োজনের উপরেও সমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য থাকে। ব্রাহ্মণ ভাতেভাত খেয়ে বাহ্য দৈন্য স্বীকার ক'রে নিয়ে সমাজের আধ্যাত্মিক আদর্শকে সমাজের মধ্যে বিশুদ্ধ যদি রাখে তবে তার দ্বারা জীবিকা

নির্ব্বাহ হ'লেও সেটা জীবিকা নির্ব্বাহের চেয়ে বড়ো, সেটা ধর্ম্ম। চাষী যদি চাষ না করে তবে এক দিনও সমাজ টেঁকে না—অতএব চাষী আপন জীবিকাকে যদি ধর্ম্ম ব'লে স্বীকার করে তবে কথাটাকে মিথ্যা বলা যায় না। অথচ এমন মিথ্যা সান্ত্বনা তাকে কেউ দেয়নি যে, চাষ করা কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যে সব কাজে মানুষের উচ্চতর বৃত্তি খাটে মানবসমাজে স্বভাবতই তার সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশী—একথা সুস্পষ্ট।

যে দেশে জীবিকা অর্জ্জনকে ধর্ম্মকর্ম্মের সামিল ক'রে দেখে না, সে দেশেও নিম্নশ্রেণীর কাজ বন্ধ হ'লে সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটে। অতএব, সেখানেও অধিকাংশ লোককেই সেই কাজ কর্‌তেই হ'বে। সুযোগের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ সে রকম কাজ করবার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ টিঁকে আছে। আজকাল মাঝে-মাঝে যখন সেখানকার শ্রমজীবিরা সেই কথাটা সমাজের নিষ্কর্ম্মা, বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবিদের জানান্ দেয় তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন কোথাও বা কড়া রাজশাসন কোথাও বা তাদের আরজি মঞ্জুরি দ্বারা সমাজ-রক্ষার চেষ্টা হয়।

আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্ম্ম-শাসনের অন্তর্গত ক'রে দেওয়াতে এ রকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে' দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু এতে ক'রে জাতিগত কর্ম্মধারাগুলির উৎকর্ষ হ'য়েছে কিনা ভেবে দেখ্‌বার বিষয়।

যে সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হ'তে পারে তা ব্যক্তিগত না হ'য়ে বংশগত হ'তেই পারে না। যদি তা'কে বংশে আবদ্ধ করা হয় তা হ'লে ক্রমেই তার প্রাণ ম'রে গিয়ে বাইরের ঠাট্‌টাই বড় হ'য়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তার জন্যে ব্যক্তিগত শক্তির দরকার; যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চল্‌তে চল্‌তে তার অভ্যাসটা পাকা ও দস্তুর প্রবল হ'তে পারে কিন্তু তার আসল জিনিষটি ম'রে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হ'য়ে উঠে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়। উপনয়ন প্রথা এক সময়ে আর্য্য দ্বিজদের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল—তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহ বাস সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যে সকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্যে নিয়ত জাগরূক চিৎশক্তির দরকার সে তো মৃত পদার্থের মত কঠিন আচারের পৈতৃক সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখবার নয়। সেই জন্যেই স্বভাবতই উপনয়ন-প্রথা এখন প্রহসন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ উপনয়ন যে-আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে মরে। ক্ষত্রিয়েরও সেই দশা, কোথায় যে সে, তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা ক্ষত্রিয় বর্ণ ব'লে পরিচিত, জাতকর্ম্ম বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়েই তারা ক্ষত্রিয়ের কতকগুলি পুরাতন আচার পালন করে মাত্র।

এদিকে শাস্ত্র বল্‌চেন, 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। একথাটার অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে-জাতির শাস্ত্রবিহিত যে-ধর্ম্ম তাকে তাই পালন করতে হবে। একথা বল্‌লেই তার তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম্ম অনুশাসনের যে-অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা চলে তাই প্রাণপণে

পালন করতে হবে, তার কোনো প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনতার খর্ব্বতা ঘ'টে তার ক্ষতি হোক্। অন্ধ আচারের ঔদ্ধত্য অত্যন্ত বেশী; তার কাছে ভালো মন্দর আন্তরিক মূল্যবোধ নেই। তাই যে-শুচিবাইগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান করতে ছোটে, সে নিজের চেয়ে অনেক ভালো লোককে বাহ্যশুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে করতে দ্বিধা করে না। বস্তুতঃ তার পক্ষে আন্তরিক সাধনার কঠিনতর প্রয়াস অনাবশ্যক। এই কারণে আধুনিক কালে যারা বুদ্ধি বিচার জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রাহ্মণ-সভার মতে স্বধর্ম্ম পালন করে তাদের অহঙ্কার এতই দুঃসহ অথচ এত নিরর্থক।

অথচ জাতিগত স্বধর্ম্ম পালন করা খুবই সহজ, সেখানে সেই স্বধর্ম্মের মধ্যে চিত্তবৃত্তির স্থান নেই। বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরী করা, ঘানি থেকে তেল বের করা বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়—বরং তা'তে মন যতই মরে যায় কাজ ততই সহজ হ'য়ে আসে। এই সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে তদুপযুক্ত চিত্তও বাকী থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হ'য়ে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক্, আজ ভারতে বিশুদ্ধ ভাবে স্বধর্ম্মে টিঁকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই। এই জন্যেই ভারতবর্ষের নিমক-হারাম দেশ-সেবা ইংরেজ-গৃহিণীর মুখে অনেক বার শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তারা বড় বেশী অনুভব করে। ধর্ম্মশাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে? লাথি-ঝাঁটাবর্ষণের মধ্যেও তারা স্বধর্ম্ম রক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা তো কোনোকালে সম্মানের দাবীও করেনি, পায়ওনি, তারা কেবল শূদ্রধর্ম্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা ক'রেই নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রেছে। আজ তারা যদি বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্ম-বিস্মৃত হয় তবে ব্রাহ্মণ-সভা তাদের স্পর্দ্ধা সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে।

স্বধর্ম্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সব চেয়ে বেশি। তাই একদিক্ থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্র-ধর্ম্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্ম্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায় অবনত। বুদ্ধিসাধ্য, জ্ঞানসাধ্য চারিত্রশক্তিসাধ্য যে-কোনো মহাসম্পদ লাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা' এই প্রবল ভার ঠেলে তবে করতে হবে,—তার পরে সেই সম্পদ্‌কে রক্ষা করবার ভার এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই, এই কথাই আমাদের ভাববার কথা।

এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় দুর্গতির যে ছবি দেখতে পাই, সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বলতে বসেছি।

প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙে জাহাজ লাগ্‌ল, দেখ্‌লুম সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবী পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধ'রে তা'কে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। নিজের দেশে রাজ-ভৃত্যের লাঞ্ছনধারী কর্ত্তৃক স্বদেশীর এরকম অন্যায় দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশ-বিদেশে এরা শূদ্রধর্ম্ম

পালন করচে। নিমকের সহজ দাবী গভ ঘুরে পৌঁছয় এরা সহজেই তাকে বহু দূরে লঙ্ঘন ক'রে যায়, তাতে আনন্দ পায়, গর্ব্ব বোধ করে।

চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে—সেই চীন, যে-চীন জদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ ক'রেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েন্‌সাঙের চীন।

মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে। এদিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচঞ্চু খরনখরদারুণ স্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্চে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে এসিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চল্‌চে, য়ুরোপের মর্ম্মের প্রতি তার লক্ষ্য। রক্তমোক্ষণ-ক্লান্ত পীড়িত এসিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। পূর্ব্বমহাদেশের পূর্ব্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেয়ালের চারদিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগ্‌বার উপক্রম করচে। হয় ত একদিন এই বিকটকায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, হয়ত একদিন তার আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনাকে উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের পলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ ব'লেই গণ্য করবে। তখন এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কী কাজ? তখন য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে ক'রে তার প্রাচীন বন্ধুকে সে বাঁধতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে। কেন মারবে কেন মরবে এ কথা প্রশ্ন করতে তার ধর্ম্মে নিষেধ। সে বলবে, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। ইংরেজ সাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না পায়ও না—ইংরেজের হ'য়ে সে কুলিগিরির বোঝা ব'য়ে মরে যে-বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই পরমার্থ নেই, ইংরেজের হ'য়ে সে পরকে তেড়ে মারতে যায় যে-পর তার শত্রু নয়,—কাজ সিদ্ধ হ'বামাত্র তাড়া খেয়ে আবার তোষাখানার মধ্যে ঢোকে শূদ্রের এইতো বহু যুগের দীক্ষা। তার কাজে স্বার্থও নেই, পরমার্থও নেই, সম্মানও নেই,—আছে কেবল 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই বাণী। নিধনের অভাব নেই—কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড় দুর্গতি আছে, যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হ'য়ে পরের সর্ব্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে। অতএব এতে আশ্চর্য্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনো দিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায়, তাহ'লে নিঃশ্বাস ফেলে বলবে,—"I miss my best servant."

সাংহাই নগরে যে ধর্ম্মঘট হইয়াছে সে সম্বন্ধে Paul Blanshard নামক একজন আমেরিকান রিপোর্টার আমেরিকার The Nation পত্রে যে প্রতিবেদন পাঠাইয়াছেন তাহাতে একজন চৈন ভদ্রলোকের সাক্ষ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(A Chinese graduate of Glasgow. His English is faultless. His labour library is the best I have seen in the East. His pictures are hung in international Exhibitions.)

I am a pacifist, but I shall tell you a story that will show you how I feel about this strike. It will show you how hard it is to be pacifist in China today.

There is a park here in Shanghai which is paid for chiefly by Chinese taxpayers, but no Chinese person is allowed to enter it. One day I was walking by this park when I saw a Sikh Policeman chase away a group of ricksha men from the gate, curse them, and deliberately tip over one of the rickshas. He had lost his temper, because one of the men had come too close to the forbidden territory. He took the license of the ricksha man away from him while the poor fellow stood here in the road with the tears streaming down his face. I walked over to the Sikh Policeman and said :—

"If I were hired by the British to police India for them, I would never treat your countrymen as you are treating these ricksha men."

He cooled down very quickly and was about to give the license back to the ricksha man when two English men came up. They said to me :

"What are you doing here interfering with this policeman ? Don't argue with us. You have no business here. You're nothing but a damned Chinaman. 'Get out of here."

They said that to me in China.

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

———

ভারতীয় আর্থিক জীবনের গড়ন ও শাসন *

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমাজ-সম্বন্ধের আর্থিক লেন-দেনের ঠাঁই বিশেষ বিস্তৃত ও গভীর। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের উপর মস্ত প্রভাব বিস্তার করে। আবার রাষ্ট্রের প্রত্যেক কাজেই কিছু না কিছু ধনদৌলতের অঙ্গ স্পর্শ করিতে হয়। হিন্দু নরনারীর আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক কথা এই কারণে শাসন-দক্ষতার বৃত্তান্ত যথাপর নাই আবশ্যক।

পাশ্চাত্য সমাজে আর্থিক দলিল।

ইয়োরোপের মধ্যযুগে কিষাণ, মজুর শিল্পী, বণিক, সুদখোর, মহাজন ইত্যাদি শ্রেণীর কিরূপ আর্থিক জীবন যাপন করিত তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত পাওয়া কঠিন নয়। জার্মাণ অধ্যাপক কেরাকে প্রণীত "হ্বিটশাফট্‌স্‌-গেশিষ্টে অর্থাৎ 'আর্থিক ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (লাইপৎসিস্‌, ১৯২২) এই বিষয়ে বহুসংখ্যক পুরাণো দলিলে উল্লিখিত আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চুক্তিপত্র দোকানদারির হিসাব, পল্লীবাসী বা নাগরিকদের তালিকা, কোতোয়ালের হুকুমনামা, শাসন কর্ত্তাদের আদেশ বা আইন সবই পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধেও এই ধরণের তথ্য অনেক।

অষ্ট্রীয়ার ইন্‌স্‌ব্রুক নগরের আর্কিভ বা পুঁথিখানায় হাজার হাজার হাতের লেখা কাগজ পত্র দেখিতে পাই। এইগুলি অতি প্রাচীনকালের সমসাময়িক সাক্ষী। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশেও পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে সেকালের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলাকে সমসাময়িক দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে পাকড়াও করিতে পারি। এই সকল প্রমাণের জোরেই লম্প্রেখট লিখিয়া গিয়াছিলেন, "মধ্যযুগের জার্মাণ আর্থিক জীবন" (লাইপৎসিস্‌ ১৮৮৬)। আর কার্ল বিশের প্রণীত "ডি, এন্টষ্টেহুঙ্গ ড্যার ফোল্‌কস্‌ হ্বিটসাফ্‌ট" (লাইপৎসিস্‌ ১৯২২) নামক জার্মাণ গ্রন্থেও এই ধরণের সাক্ষীই অতীত সম্বন্ধে কথা কহিতেছে।

"শ্রেণী" গৌরবে ইয়োরোপ ও ভারত

এই ধরণের সাক্ষ্য ভারতের অতীত সম্বন্ধে পাওয়া যায় কি? একদম যায় না বলিলেই ঠিক বলা হইত। তবে সাবেক কালের তাম্রলিপি এবং প্রস্তর শাসনগুলার ভিতর প্রায় এই ধরণেরই আর্থিক জীবন বিষয়ক প্রমাণ কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল প্রমাণ ছাড়া অন্য কোন সাক্ষীর জমানবন্দি এই গ্রন্থে লওয়া হইবে না। তাহার জোরেই হিন্দু-জাতির আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক চিত্র প্রদান করা সম্ভব।

---

* "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" গ্রন্থের এক অধ্যায়।

জার্মাণ সমাজে যাহাকে "ইন্‌নুঙ্‌" বা "জেনুক্‌ট্‌" বলে, ইতালিতে ফ্রান্সে এবং ইংল্যাণ্ডে যাহাকে "গিল্ড্‌" বলে সেই ধরণের আর্থিক দল, সমিতি বা সঙ্ঘ হিন্দু জীবনে দেখা দিয়াছিল। সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠান "শ্রেণী" নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য সমাজে "শ্রেণী"র উদ্ভব হয় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় 'শ্রেণী'র চরম বিকাশ সাধিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান গ্রন্থে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরের কথা আলোচিত হইতেছে না। তবে পরবর্ত্তী-কালে ইয়োরোপের আর্থিক দলগুলা যে সকল কাজ কর্ম্ম করিত প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজ কর্ম্ম সেইরূপই ছিল বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন গ্রীসে "গিল্ড্‌" প্রথা সবিশেষ পুষ্ট হয় নাই। কিন্তু রোমাণ সাম্রাজ্যের এখানে ওখানে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কাল হিসাবে রোমাণ সাম্রাজ্যের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান গ্রন্থের সামিল। কিন্তু "শ্রেণী" গৌরবে ইয়োরোপের মধ্য যুগ "রোমাণ কাল" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাজেই হিন্দু জাতির আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলা বুঝিবার সময় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও জার্ম্মাণির ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর আর্থিক ইতিহাস আলোচনা করাই সঙ্গত।

কিষাণ শ্রেণী।

ইয়োরোপের কিষাণ সমাজে "গিল্ড্‌" বা "ইন্‌নুঙ্‌" গড়িয়া উঠে নাই। ভারতে কৃষকদেরও "শ্রেণীর" কথা শুনিতে পাই। কোনো তাম্র শাসন বা প্রস্তরলিপি এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় না। কোনো সমসাময়িক স্বদেশী গ্রন্থকার বা বিদেশী পর্য্যটকের রচনায়ও তাহার প্রমাণ নাই।

কিন্তু গৌতম (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী), মনু (খৃঃ অঃ দ্বিতীয় শতাব্দী, এবং বৃহস্পতি (খৃঃ অব্দ সপ্তম শতাব্দী) ইত্যাদির সঙ্কলিত "ধর্ম্ম" বা "স্মৃতি" শাস্ত্রে কৃষক "শ্রেণীর" উল্লেখ আছে। শুক্র সঙ্কলিত অথবা শুক্রের নামে প্রচারিত "নীতি-শাস্ত্রে"ও কৃষক দিগকে শ্রেণীবদ্ধরূপে আন্দাজ করিতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে "ধর্ম্ম", "স্মৃতি" ও "নীতি" বিষয়ক গ্রন্থগুলাকে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় ইতিহাসের ইজ্জৎ দেওয়া হইতেছে না। প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠান বিষয়ক মতামত, তত্ত্ব, বা "থিয়োরি" হিসাবে এইগুলার দাম নির্দ্ধা-রিত করা হইতেছে। কোনো প্রকার "থিয়োরি" এই বইএর আলোচ্য বিষয় নয়।

রাখাল-শ্রেণী।

দল বাঁধিয়া জানোয়ার চরানো সম্বন্ধে মাদ্রাজ হইতে সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। বাদশা রাজেন্দ্র চোলের আমলে—একাদশ শতাব্দীতে—দক্ষিণ ভারতের এক পল্লীতে মেষ-পালকেরা শ্রেণীবদ্ধভাবে ব্যবসা চালাইত। এরাণ সওন নামক তাহাদের একজন এক পল্লী-মন্দিরের

রাখাল নিযুক্ত হন ; চৌপর দিন রাত ঘিরে একটা বাতি জ্বালাইয়া রাখা ছিল তাহার মন্দির-সেবার প্রধান অঙ্গ। এই জন্য মন্দিরের সম্পত্তি হইতে তাহাকে দেওয়া হয় ৯০ টা মেষ।

ভেড়ার পরিবর্ত্তে ঘি "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ",—এই গেল চুক্তির গোড়ার কথা। কিন্তু চুক্তিটা রক্ষা করার ভার পড়িয়াছিল গোটা রাখাল-দলের উপর—একটা সওন যদি পলাইয়া যায় অথবা জেলে যায় তাহা হইলে বাতিটা জ্বালাইবে কে? তাহার "শ্রেণী", এইরূপই ছিল চুক্তিপত্রের ঘোষাবিদা। গোটা "শ্রেণী" দলবদ্ধভাবে একজন সভ্যের দায়িত্ব লইল,—এইটুকু তথ্য ছাড়া তাম্রশাসনে আর কিছু বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপযোগী বস্তু নাই।

বণিক-শ্রেণী।

ইংরেজ পণ্ডিত গ্রোস প্রণীত "গিল্ড মার্চ্যাণ্ট" বা "শ্রেণীবদ্ধ বণিক" নামক দুইখণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থে (অক্সফোর্ড ১৮৯০) বিলাতী বণিক সম্প্রদায়ের "সেকেলে" প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আছে। তাহার তুলনায় হিন্দু ব্যবসায়ীদের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিযোগ বিষয়ে অতি সামান্য ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে (খ্রীঃ অঃ ৩২০—৫৫০) পাটলিপুত্র ছিল ভারতের রোম বিশেষ। এই নগরে বণিকদিগের "সমূহ", "সঙ্ঘ" বা "শ্রেণী" ছিল একাধিক। সকলগুলা মিলিয়া একটা কেন্দ্র-"সমূহ", বা কেন্দ্র-"শ্রেণী" গড়িয়া তুলিয়াছিল। সাম্রাজ্যের মফঃস্বলে ও নানা ছোট সহরে এবং পল্লীতে,—বোধহয় এই কেন্দ্রশ্রেণীর শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

"শ্রেণী" নামে বোধ হয় সে যুগে টাকার তোড়াওয়ালা মহাজন বা ব্যাঙ্কারগণ পরিচিত ছিল। "স্বার্থবাহ" এবং "কুলিক" বলিলে হাটুয়া, দোকানদার, ইত্যাদি বণিক বুঝা যাইত। ১৯০৩—০৪ সালের "আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের" বার্ষিক বিবরণীতে দেখিতে পাই যে গুপ্ত আমলের বণিকেরা মাটির মুদ্রা দিয়া চিঠি পত্রের "সীল মোহর" লাগাইত।

এই গেল উত্তর ভারতের কথা। দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে দ্বাদশ শতাব্দীর বিক্রম চোলের (১১১৮) যুগ একটা সাক্ষ্য দেয়। পাঁচশজন বণিক কোনো "শ্রেণীর" সভ্য ছিল। সমগ্র চোল সাম্রাজ্যে এই শ্রেণীর কারবার এবং লেনদেন চলিত।

কারিগর-শ্রেণী।

শিল্পী বা কারিগরদের শ্রেণী সম্বন্ধে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর "দলিল" আছে। গুজরাত প্রদেশের তথ্যই বেশী পাওয়া যায়। নাসিক অঞ্চলে প্রাপ্ত তাম্রশাসন বা প্রস্তর লিপি এই যুগের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একমাত্র সাক্ষী।

তাঁতী, গান্ধিক এবং কলু ইত্যাদি শিল্পীদের "শ্রেণী"র কথা জানিতে পারি। "শ্রেণী"রা জনগণের টাকা কড়ি জমা রাখিত। অনেক সময়ে শতকরা নয় টাকা হইতে বার টাকা পর্য্যন্ত সুদ পাইয়া গৃহস্থরা "শ্রেণী"র ব্যাঙ্কে টাকা মজুত রাখিত।

সেনাপতি উষবদাতের দানের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। গোবর্দ্ধন নগরের তাঁতী "শ্রেণী" উষবদাতের ২০০০ কার্ষাপণ জমা রাখিয়াছিল। আর এক তাঁতী শ্রেণীর হাতে ১,৫০০ কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়া সেনাপতি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ১২০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

তৃতীয় শতাব্দীতে গোবর্দ্ধন নগরের কয়েকটা শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা গিয়াছে। কুমোর, "ওদ-যান্ত্রিক" (জলের কলওয়ালা), এবং কলু এই তিন জাতীয় শিল্পীর "শ্রেণী"রা কতকগুলা দান পাইয়াছিল। এই সকল দানের সুদ হইতে তাহারা কোনো বৌদ্ধ সঙ্ঘের সাধুসন্তদিগকে ঔষধপত্র যোগাইত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শিল্পীর শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে ব্যবসা চালাইত। কুমার গুপ্ত যে সময়ে সম্রাট (খৃঃ অঃ ৪১৩—৪৫৫) সেই সময় দশ-পুর নগরে রেশম তাঁতীদের একটা "শ্রেণী" গড়িয়া উঠে। তাঁতীরা গুজরাত হইতে আসিয়া এইখানে বাস্তভিটা গাড়িয়াছিল।

দশপুরে যে সকল গুজরাতী তাঁতী উঠিয়া আসে তাহাদের সকলেই তাঁতের শিল্পে লাগে নাই। পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ লড়াইয়ের ব্যবসায় মন দিয়াছিল কেহ বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চায় লাগিয়া যায়। আবার সন্ন্যাসধর্ম্মেও কাহারও কাহারও মতি ঝুঁকিয়াছিল। বাপদাদাদের "জাতি"গত ব্যবসা ছাড়িয়া দেওয়া সেকালে অসম্ভব ছিল না।

৪৭৫ খৃঃ অঃ সম্রাট স্কন্দগুপ্তের আমলে ইন্দ্রপুর নগরে কলুদের এক "শ্রেণী" একটা এককালীন দান পাইয়াছিল। দানের সুদ হইতে কোনো মন্দিরের বাতি জ্বালানো ছিল "শ্রেণী"র দায়িত্ব। ইন্দ্রপুর নগর ত্যাগ করিয়া গেলেও "শ্রেণীর" এক্তিয়ার ও জিম্মা পচিয়া যাইবে না; তবে "শ্রেণী"টা যদি উঠিয়া যায় এক মাত্র তাহা হইলেই সম্পত্তির উপর অধিকার এবং বাতি দেওয়ার দায়িত্ব লুপ্ত হইবে। এইরূপ ছিল দানপত্রের চুক্তি কথা।

ভারতের "শ্রেণী" সাহিত্য।

কি বণিক "শ্রেণী", কি কারিগর "শ্রেণী" উভয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে অল্পবিস্তর খবর পাওয়া যায়। পালি "জাতকে"র কাহিনীতে পাঁচশ, 'সাতশ' সওদাগরের দল উল্লিখিত আছে। তাহা ছাড়া স্বর্ণকার, চর্ম্মকার ইত্যাদি "আঠারো" শিল্পের "শ্রেণীর" কথাও শুনিতে পাই। সে খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর সমাজ।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" যে সমাজ চিত্রিত আছে তাহাতেও কারিগর এবং বণিক উভয় সম্প্রদায়েরই "শ্রেণী" দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম, স্মৃতি এবং নীতি বিষয়ক আইন গ্রন্থেও শ্রেণী বিষয়ক বিধি নিষেধ আলোচিত আছে।

কিন্তু "জাতকের" গল্প অথবা "শাস্ত্রের" বিধানগুলার সাহায্যে সন তারিখ সমন্বিত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। বড় জোর এইগুলা ব্যবহার করিয়া ঠারে ঠোরে হিন্দু নরনারীর সমাজ ব্যবস্থার চিত্র প্রদান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এইরূপ চিত্রেরও মূল্য আছে। কিন্তু তাহার জন্য এই কেতাব প্রণীত হইতেছে না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নিজ নিজ দেশ সম্বন্ধে আর্থিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা প্রণালী ভারত সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে আমাদের দেশের মূর্ত্তি কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখাই বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "লোকাল গবর্ণমেণ্ট" বিষয়ক গ্রন্থে "লিপি" এবং "সাহিত্য" উভয় তরফ হইতেই "শ্রেণী" বিষয়ক তথ্য একত্র করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের "সঙ্ঘ জীবন" বিষয়ক গ্রন্থেও এই দুই তরফের উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে। ভবিষ্যতের লেখকগণকে এই সব উপকরণ অনেক ঝাড়িয়া বাছিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রেণী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম গণ্ডী।

"শ্রেণী" সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া গেল তাহাতে এই মাত্র বুঝা যায় যে, পল্লী বা নগরের লোকেরা এই সকল প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক স্বরূপ ব্যবহার করিত। তাহা ছাড়া দাতারা "শ্রেণীকে" 'ট্রাষ্টী" করিয়া দেবোত্তর ইত্যাদি সম্পত্তি দান করিতে অভ্যস্ত ছিল। এই দুই তথ্যে সমাজে শ্রেণীর প্রভাব বুঝিতে পারি। শ্রেণীগুলা যে নরনারীর বিশ্বাসভাজন ছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

জাতকের কথা, মহাভারতের কথা, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের কথা এই সঙ্গে জুড়িয়া দিলে শ্রেণী প্রতিষ্ঠানের "আর্থিক" এবং "রাষ্ট্রীয়" কর্ম্মগণ্ডীও ধরিতে অন্ততঃ পক্ষে আন্দাজ করিতে পারা যাইত। প্রত্যেক "শ্রেণী" নিজ নিজ আইন সৃষ্টি করিতে অধিকারী ছিল। আবার বিচারের কাজেও প্রত্যেক "শ্রেণীর" স্বরাজ্য এই সকল সাহিত্যে বিবৃত আছে। কিন্তু কোন্ রাজরাজড়ার আমলে এবং কোন্ মুলুকে শ্রেণীগুলা বাস্তবিকপক্ষে আইনস্রষ্টা এবং বিচারক রূপে কার্য্য করিয়াছে তাহা এখন প্রমাণিত করা সম্ভব নয়। কাজেই সম্প্রতি সেই সকল কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইরাক্লি পণ্ডিত হপ্‌কিন্‌স এবং জার্ম্মাণ হিলেব্রাণ্ট্‌ ইত্যাদির রচনায় এই বিষয়ে "শাস্ত্রের" নজির উদ্ধৃত হইয়াছে।

বৃহস্পতির "শ্রেণী" বিধান।

তবে "থিয়োরী" বা দার্শনিক মতবাদের তরফ হইতে এই সঙ্গে একটা আলোচনার ইসারা করিতেছি। জার্ম্মাণ পণ্ডিত গিয়ের্কে প্রণীত "মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় মতবাদ" নামক গ্রন্থে

"দল," "সমূহ," "সঙ্ঘ" "শ্রেণী" ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের "কর্পোরেশন" লইয়া দার্শনিক তর্কবিতর্ক আছে। মেইটল্যাণ্ডের ইংরেজি তর্জ্জমায় সেই গ্রন্থ (কেম্ব্রিজ ১৯০০) সকলের বোধগম্য।

প্রশ্নটা এই—"সঙ্ঘ" কাহাকে বলে? কতকগুলা লোক কোন ঘরে বা মাঠে বসিয়া কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছে দেখিলেই কি বলিব যে উহারা দলবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ। বর্ত্তমান ভারতে যাঁহারা আইনের ব্যবসা করেন তাঁহারা বলিবেন "না"। এক সঙ্গে "একাধিক" লোকের কাজ চলিতেছে অথচ কাজটাকে কোনো "এক ব্যক্তির"ই কাজ বলিয়া যখন ধরিয়া লওয়া হয় তখনই বলা চলে যে, এ একটা "কর্পোরেশন" বা "সঙ্ঘ" বটে।

সেকালের হিন্দু সমাজে মাথাওয়ালা লোকেরা "সঙ্ঘ", "শ্রেণী" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে এইরূপ "আধুনিক" চোখে দেখিতেই অভ্যস্ত ছিল। সেকালের পশ্চিমারাও এইরূপ "আধুনিকই" ছিল।

হিন্দু নরনারীর সাক্ষী বৃহস্পতির "ধর্ম্ম শাস্ত্র"। গ্রন্থটা সপ্তম শতাব্দীর সঙ্কলন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এই গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে "সমূহ" বিষয়ক যে সকল বিধান আছে সেই সব যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খাটে এইরূপ ধরিয়া লইতেছি। তবে সেই বিধান অনুসারে হর্ষ বর্দ্ধন-অথবা পুলকেশীর আদালতে মামলা মোকদ্দমা চলিত সে কথা বলিতেছি না। সমূহ, সঙ্ঘ, শ্রেণী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কাহাকে বলে এই সম্বন্ধে সেকালের একটা মত বুঝিয়া দেখিবার জন্য বৃহস্পতির এই অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে।

"সঙ্ঘ-ব্যক্তি" বা ঐক্য বিশিষ্ট লোকসমষ্টি।

(১)

এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রথম "লক্ষণই" এই যে বিনা "সভায়" কোনো কাজ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সভায় দুইজন, তিনজন বা পাঁচজন লোক থাকা দরকার। এই কয়জন লোক লইয়া সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হয় বুঝিতে হইবে।

একটা দল বা শ্রেণী অপরাপর দল বা শ্রেণীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইতে অধিকারী কোনো ব্যক্তি বিশেষ ও দলের বা শ্রেণীর সঙ্গে সন্বিদ বা চুক্তি কায়েম করিতে পারে। এই সকল "সন্বিদ" দেশের ভিতরকার অন্যান্য সন্বিদের মতনই আইনের চোখে স্বীকার্য্য। এই হইতেছে "সমূহ" সম্বন্ধে বৃহস্পতির দ্বিতীয় কথা।

"সমূহের" তৃতীয় লক্ষণ এই যে, যে-কোনো ব্যক্তি ইহার প্রতিনিধি স্বরূপ সরকারী বা সার্ব্বজনিক কর্ম্মকেন্দ্রে হাজির হইতে পারে। এই প্রতিনিধির যে কোনো কাজ "সমূহেরই" কাজ স্বরূপ গৃহীত হইবে। কাজেই প্রতিনিধির হাতে যে সকল টাকা কড়ি বা অন্য কোনো

দায়িত্ব আসিয়া জুটে সেই বিষয় "সমূহের" একতিয়ার সম্পূর্ণ। আবার প্রতিনিধি যে সকল দেনা করিবে তাহার জন্য "সমূহই" ষোল আনা দায়ী।

এই গেল বৃহস্পতির বিধান। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতে ও (পৃঃ অঃ ৩৫০) এই ধরণের "সমূহ" নীতির কিছু কিছু পরিচয় আছে।

কিষাণ, শিল্পী বা বণিক যখন এইরূপ লক্ষণওয়ালা দলের সভ্য হয় তখন তাহাদিগকে "কতকগুলা লোকের ভিড়" মাত্র বলা চলে কি? গোটা "সঙ্ঘ" বা "শ্রেণী" তখন "একটা ব্যক্তির" মতন কাজ করিতেছে। এই ধরণের দলকে পাশ্চাত্য পারিভাষিকে "গ্রুপ্ পার্সন" বা "সঙ্ঘ ব্যক্তি" বলে কিছু সহজে তাহাকে "ঐক্যবিশিষ্ট লোক সমষ্টি" বলিতে পারি।

এই বিষয়টা আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি কাত্যায়নের কথায়। কাত্যায়ন বৃহস্পতির পরবর্ত্তী স্মৃতিকার। মিত্রমিশ্রের "বীরমিত্রোদয়', এবং চণ্ডেশ্বরের "বিবাদ রত্নাকর" নামক যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির দুইভাষ্যে কাত্যায়নের মতামত আলোচিত আছে।

কাত্যায়ন বলেন যে, "শ্রেণী" ইত্যাদি "সমূহ" গঠিত হইয়া যাইবার পরেও নতুন নতুন লোককে শ্রেণীর সভ্য করা সম্ভব। এই নতুন সভ্যেরা "শ্রেণীর" সকল সম্পত্তি এবং অধিকার ভোগের দাবী করিতে পারে। আবার "শ্রেণীর" পুরাণো দেনা শুধিবার দায়িত্ব ও ইহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য। তবে একমাত্র "সর্ব্বসম্মতি" ছাড়া নয়া মেম্বর "শ্রেণীতে" প্রবেশ করিতে অনধিকারী। অর্থাৎ "শ্রেণীতে" সভ্য সংখ্যা বাড়িলে কমিলে ইহার স্বরূপ বদলাইয়া যায় না। শ্রেণীর "ব্যক্তিত্ব" যে-কে সেই থাকে। কাত্যায়ণ "শ্রেণীকে" "সঙ্ঘ-ব্যক্তি" বুঝিতেন বেশ পরিষ্কার রূপেই।

মিত্রমিশ্র "গ্রুপ্-পার্সন" তত্ত্বের চরম মত দিয়াছেন। নতুন সভ্যেরা "শ্রেণীর" আর্থিক লাভালাভ ভোগ করিতে অধিকারী ত বটেই। তাহারা "শ্রেণীর" পুরাণো "আধ্যাত্মিক পুণ্য" ভোগেরও দাবী রাখে। অর্থাৎ দান খৈরাত, লোকসেবা ইত্যাদি সৎকর্ম্মের জন্য "শ্রেণীর" প্রতিষ্ঠাতারা "পরলোকে" যে পদ পাইবে সেই পদে ইহার ভবিষ্য সভ্যদের অধিকার। "শ্রেণীর" অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ একই ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তর বা বয়স মাত্র।

পাশ্চাত্য পারিভাষিকে এই অবস্থাকে বলে, "কর্পোরেশ্যন অমর" কাত্যায়ণ এবং মিত্র মিশ্র "শ্রেণীর বা সঙ্ঘের মরণ নাই" তত্ত্বই স্বতন্ত্র ও ঐক্য প্রচার করিয়াছেন। যতই নতুন লোক ভর্ত্তি হউক না কেন, "শ্রেণী" তাহার ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র ও ঐক্য রক্ষা করিয়া যুগে যুগে অগ্রসর হইতেছে।

"শ্রেণী" ও নগর শাসন

নগর শাসনের সঙ্গে শ্রেণী প্রতিষ্ঠানের কিরূপ যোগাযোগ ছিল? ব্রিসো-প্রণীত "ফরাসি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান" বিষয়ক গ্রন্থে জানিতে পারা যায় যে "শ্রেণী"গুলা নগরে খুব প্রভাব শালী ছিল বটে। কিন্তু "শ্রেণীর" মুখোরাই একমাত্র নগরশাসক ছিল না। নগরের "স্বরাজ"

হইতে শ্রেণীর "স্বরাজ" স্বতন্ত্ররূপে রক্ষিত হইত। শ্রেণীগুলা আর্থিককেন্দ্র, কিন্তু নগর একমাত্র আর্থিক কেন্দ্র নয়।

এই ধরণের আলোচনায় যোগ দেওয়া ভারতীয় ঐতিহাসিকদের পক্ষে সম্প্রতি অসম্ভব। কেন না মালমশলার বাকৃতি যৎপরোনাস্তি।

আর এক প্রশ্ন। "শাস্ত্র" গ্রন্থে "শ্রেণী"গুলাকে "স্বরাট্"—প্রায় ষোলকলায় পূর্ণ স্বরাট্রূপে বিবৃত করা হইয়াছে। কিন্তু "সার্ব্বভৌম", "চক্রবর্ত্তী" ইত্যাদি স্থানীয় মৌর্য্য গুপ্ত, পাল, চোল ইত্যাদি বাদশাদের আমলে রাজধানীর "বড়কর্ত্তারা" "মফঃস্বলের" স্বরাজ কেন্দ্র গুলার কতখানি মুণ্ডপাত করিয়া ছাড়িয়াদিলেন? রাজধানীর "শ্রেণী"গুলা ও "সরকারী" আদালতের ছায়ায় নিজ নিজ স্বরাজ্য কতখানি সামলাইয়া চলিতে পারিত?

এই সকল প্রশ্নের জবাব দিবার সময় গৌতম কৌটিল্য, মনু বা শুক্রের "বিধিলিঙ্" ওয়ালা ক্রিয়াপদ বিশিষ্ট কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধান আওড়াইলে চলিবে না। চাই খাটি ঐতিহাসিক তথ্য, যাহা ঘটিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত, এই ধরণের বৃত্তান্তই পাই ইংরেজ অধ্যাপক আষ্টুইন প্রণীত "লণ্ডনের গিল্ড" নামক গ্রন্থে (১৯০৮)।

পরিশিষ্ট ।

"বিনয় সাহিত্য এবং "ধর্ম্ম", "স্মৃতি" ও "নীতি" শাস্ত্র।

"বিনয়"-সাহিত্য ও শাসন-সাহিত্য আবার "ধর্ম্ম"-"স্মৃতি" এবং "নীতি" শাস্ত্র ও শাসন সাহিত্য আর এই দুই প্রকার "আইন" গ্রন্থেরই সন তারিখ জানা নাই। তথাপি বর্ত্তমান গ্রন্থে শাসন প্রণালীর তরফ হইতে "বিনয়কে" যে পদ দেওয়া হইল "শাস্ত্র"গুলাকে সেই পদ দেওয়া হইল না, এই পক্ষপাতের কারণ কি?

গৃহত্যাগী সাধু সন্তদের জীবন শাসন করা "বিনয়ের" উদ্দেশ্য। সঙ্ঘের বাহিরের নর নারীর সঙ্গে সঙ্ঘওয়ালাদের লেন দেন "বিনয়ের" "আইনে" শাসন করা সম্ভব নয়। কিন্তু "শাস্ত্র"গুলার ফকীর ভিখারীর জন্য আইনই একমাত্র ভিক্ষুসঙ্ঘোহন্তদের আইন নয়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, মজুর, ধনী, দরিদ্র, ছোঁড়া, বুড়া, সুদখোর, কেরাণী, স্ত্রী, পুরুষ, রাজা, প্রজা, কিষাণ, কারিগর ইত্যাদি সকল প্রকার মানুষের জন্য এবং মানুষের "দলের" জন্য যত রকমের আইন সম্ভব প্রায় সবই "শাস্ত্র"-সাহিত্যের অন্তর্গত।

"বিনয়" মানিয়া চলিত দুশ', পাঁচশ, দুহাজার, পাঁচ হাজার ব্যক্তি।
জন্য রচিত তাহাদের সংখ্যা লাখে লাখ, কোটি কোটি।

কাজেই "বিনয়ের" আইনগুলাকে রাষ্ট্র মানিয়া চলুক বা না চলুক তাহাতে কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্র চলিতে পারে আপন মনে, আর সঙ্ঘও চলিতে পারে আপন মনে, কিন্তু "শাস্ত্রের আইন যদি রাষ্ট্র না মানিয়া চলে তাহা হইলে" শাস্ত্রগুলা শাস্ত্রই নয়,—অথচ তাহাতে

রাষ্ট্রের ইজ্জৎ কোনো মতেই খাটো হয় না। কেন না রাষ্ট্র নিজের মতলব মাফিক নিজ নিজ আইন কায়েম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে।

এই জন্যই প্রতিপদে জিজ্ঞাসা করিতে হয়,—শাস্ত্রগুলার কোন্ কোন্‌টা, আবার কোন্ কোন্‌টার কোন্ কোন্ ধারা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল? কোন্ যুগের কোন্ রাষ্ট্র কর্তৃক?

আর এক কথা। "বিনয়ের" স্রষ্টা কে বা কাহারা জানা আছে। শাক্য গৌতম নামক ব্যক্তিবিশেষের উপদেশের উপর ভর করিয়া তাঁহার চেলারা নিজেদের আখড়া সামলাইবার জন্য ওকালতী বুদ্ধি খাটাইয়া কতকগুলা বিধিনিষেধ কায়েম করিয়া ছিল। "সঙ্ঘের" ইতিহাসে জানাও যায় যে এই সকল বিধিনিষেধ প্রতিপালিত হইত ও। তবে "আদর্শ" হইতে চ্যুত হইয়াছিল কত জন ভিক্ষু কবে কবে তাহার "স্টাটিস্টিক্স" হয়ত পুরা মাত্রায় পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু মৌর্য্য, পাল বা চোল রাজারা যে সকল আইন কায়েম করিয়াছিলেন সেগুলা চুঁড়িতে হইবে কোথায়? "শাস্ত্র"-সাহিত্যে, না আর কোথাও? অথবা কিছু কিছু "শাস্ত্র" সাহিত্যে এবং কিছু কিছু আর কোথাও?

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

কালীপূজায় বলিদান ও বর্ত্তমানে তাহার উপযোগিতা।

আমি ছিলাম আপন মনে হৃষীকেশের অরণ্যে পরম শান্তিতে, আত্মশোধনময়, আত্মজ্ঞানসুধার অন্বেষী। অক্ষয় আনন্দের একটুখানি স্বাদ মুখে লাগিতে না লাগিতে হুকুম হইল—"উঠো, নিয়ত কর্ম্ম তোমার অপেক্ষা করিতেছে।"

আজ তোমাদের যে বার্ত্তা শুনাইতে আসিয়াছি সে আমার নিজের মন হইতে উদ্ভূত নয়। আমার মনের ভিতর আর এক কোন্ মন এক দিন নিদ্রা ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে আমার তন্দ্রাবিজড়িত কর্ণকুহরে কহিল—"কালীপূজা আসিতেছে—বলির রাত্রি—বলি চাই। পাঁঠাবলি নয়, আত্ম বলি। সকলকে সচেতন করো" আমি আশ্চর্য্য হইয়া গাত্রোত্থান করিলাম। এ কথা কে বলিল? এত আমার মনের কথা নয়। পাঁঠাবলি বন্ধ করাইবার আদেশ কি এ? এ বিষয়ে ত কোনদিন ভাবি নাই! এ ত সোশাল রিফর্ম্মারের কাজ, আমার মন ত এদিকে কোন দিন যায় নাই, এ ত আমার জানা রাস্তা নয়।

একটা নূতন অজ্ঞাত পথে যাত্রার অপেক্ষাতে আক্রান্ত হইলাম। একটা অনমসাহসিক কল্পনার চাপে ভয়ভীত হইলাম। পথ খুঁজিয়া পাই না। চিন্তা ঘনীভূত হইতে থাকিল।

যে মন হইতে প্রেরণা আসিয়াছিল সেই মনই পথ সরল করিতে লাগিল, সেই 'সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক' আমার ভীরুতা অপনোদন করিলেন। সেই সকল চেতনের মহাচৈতন্য আমার বুদ্ধিকে অজ্ঞাত অসন্ত্রাসিত পথে চালনা করিয়া তাঁর বার্ত্তা বহনের উপযোগী করিয়া লইলেন। অস্পষ্ট সুস্পষ্ট হইল, কঠিন সহজ হইল।

• • •

যে তরুণের পংক্তি আজ আমার সামনে বসিয়া আছে, সে বিশবৎসর আগেকার তরুণের দল নয়। আমার হাতে উদ্বোধনীর শানাই দিয়া তখন যে নবীন প্রাণগুলিকে ভগবতী মহাশক্তি জাগাইয়াছিলেন সে তোমরা নও। অথচ তাহারা তোমরাই বটে, এবং তোমরা তাহারাই। ভারতের নানা জাতি দেখিয়াছি, কিন্তু বাঙালী যুবকের যে বিশেষত্ব তা আর কোথাও পাই নাই। অথচ সে বিশেষত্ব বাঙলায় যুগের পর যুগে বাঙালী যুবকের মধ্যে সমানই ভাবে রহিয়াছে। বাঙালী তরুণ দাহ্যগুণময়; সে দাহিকাশক্তির সংস্পর্শ মাত্রের অপেক্ষা রাখে। তোমাদের মত দলে দলে ভাবাগ্নিদীপ্ত, ত্যাগকুশল, আত্মবলিদানোন্মুখ ব্রতী যুবকসম্প্রদায় আর কোথাও দেখি নাই। আগুন চায় দাহ্য পদার্থ, প্রাণ চায় প্রাণকে জাগাইতে। তাই তোমাদেরকে আমার আবশ্যক আছে। হয়ত বা আমাকেও তোমাদের আবশ্যক আছে। তাইআমার আত্মার অগ্নি দিয়া তোমাদের আত্মার আগুন ধরাইতে, আমার প্রাণবত্তা দিয়া তোমাদের প্রাণ বাড়াইয়া দিতে আবার নিয়োজিত হইয়াছি।

বাঙলায় অফুরান প্রাণপ্রবাহ চলিয়াছে, শুধু তাই নয়। পঁচিশ বৎসর আগে দেখিতেছি সে প্রবাহের বেগ ক্ষীণ নয়, অতি পুষ্ট। তখন দুজোড়া খঞ্জার অতি কষ্টে তৈয়ার করিতে হইয়াছিল—আজ দেখিতেছি সেদিনকার বীজ শুধু অঙ্কুরিত হয় নাই, শাখা পল্লবিত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। আজ ঘরে ঘরে, মেসে মেসে, হষ্টেলে হষ্টেলে, ক্লাবে ক্লাবে, বক্সিংয়ের প্রতিযোগিতা। সেদিনকার "ভারতা"তে মৃত্যুচর্চ্চার জন্য পর্ব্বতশিখরে, সমুদ্রের বক্ষে, বনের গহনে, যুদ্ধের আহতাঙ্গনে—ক্রীড়াচ্ছলে, শিকারচ্ছলে, পর্য্যটনচ্ছলে, সেবাচ্ছলে সকলকে ঝাঁপ দিতে আহ্বান করিয়াছিলাম। আজ দেখিতেছি বেশী আহ্বানের আবশ্যক হয় না, বাঙ্গালী যুবকের এখন "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য।" কাল অগ্রসর হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার যুবকেরাও অগ্রসর হইয়াছে।

হে আমার তরুণ ভায়েরা, পুত্রেরা—আজ আমি তোমাদের ক্ষণিকের রাজনীতির কথা শুনাইতে আসি নাই। আজ আমি এমন পলিসির মন্ত্র শিখাইতে আসিয়াছি যাহাতে তোমাদের সন্তান অমর হইবে।

আজ আমি তোমাদের দেখাইব পাশুপত-অস্ত্রলাভের পথ, শ্রদ্ধার পথ। শুনাইব তোমাদেরই জাতীয় ধর্ম্মের কথা, বলিব কেমন করিয়া ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই স্বরাজ আনিতে পারিবে, দেশকে স্বাধীন করিতে পারিবে—এই পাকা রাস্তা, আর সব কাঁচা, এই একমাত্র পন্থা—নান্যঃ পন্থা। আমার কথাটা আজ তোমাদের ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতেই হইবে, এবং শুনিয়া তদনুযায়ী কাজ করিতে হইবে

• • •

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের চিত্তে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। দেব দেবীর প্রতি বিশ্বাস লুপ্ত হইয়াছে। এম্, এ, বি, এল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী পর্য্যন্ত যে অন্ততঃ অর্দ্ধলক্ষ যুবক কেবল কলিকাতার ইউনিভার্সিটি হল হইতেই প্রতিবৎসর নির্গত হয়, তাহারা যুক্তিবাদ অথবা নাস্তিক্যে অবগাহন স্নান করিয়া আসে। অদৃষ্ট দেবতা-গণের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ শক্তিতে তাহারা বিশ্বাস শূন্য, সন্ধ্যা আহ্নিক পূজাপাট তাহাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের অংশভূত নহে। গৃহ দেবতা, গ্রামদেবতা বা জনপদ দেবতার প্রতি তাদের আর পূর্ব্ব সুলভ নিশ্চিন্ত নির্ভরতা নাই। ধর্ম্মহীন বা ধর্ম্মবিরোধী শিক্ষার দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হইয়াছে। তথাপি যে দিন জীবন সংগ্রামে মুমূর্ষু হয়; বিপদ সাগরের উত্তালতরঙ্গে হাবুডুবু খায়, সেদিন চিরন্তন স্বাভাবিক মানুষটি তার অস্বাভাবিক শিক্ষা সত্ত্বেও এক অতিস্নিগ্ধ অলক্ষ্য শক্তিমান সুহৃদের শরণাপন্ন হয়, তাঁকে ডাকে, তাঁর দয়া ও বল ভিক্ষা চায়।

ধর্ম্মভাব একবারে মরে না। কালের প্রভাবে তাহাতে পরিবর্ত্তন আসে মাত্র। স্থূল অনুভূতি সূক্ষ্ম অনুভূতিতে পরিণত হয় এবং পূজা পদ্ধতিও তদনুযায়ী রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা রাখে। ঈশ্বরকে একটি বিশেষ নামে ডাকা বা ভাবা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত সংস্কার। সেই নামেই ঈশ্বর তার মনে সহজে প্রকট হন। 'কালী' এই নাম অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সাধারণ বাঙ্গালীর মনে ঐশ্বরী শক্তির অনুভূতি প্রবাহক একটি বলবান শব্দ। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হেতুবাদী যুবকের মনেও সে ভাব আনে কিনা তাহা কালী শব্দের প্রকৃত অর্থ ও উহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়।

শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কালী দেবতা তিনি, তিনি ন যোষিৎ, ন পুমান্, ন চ ক্লীবঃ; তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন। তাঁহার স্ত্রীরূপ কল্পনা সাধকের সুবিধার্থে মাত্র। অনন্তকাল ধরিয়া জগতের মধ্যে যে চৈতন্যময়ী সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার শক্তির কার্য্য চলিতেছে তাহাই 'কালী' বা 'মহাকাল'। সেই শক্তি জগৎ-প্রসবিত্রী, জগন্মাতা; তাঁহাকেই বেদে গায়ত্রীমন্ত্রে পুংলিঙ্গ 'সবিতা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। তিনিই পালনকারিণী এবং তিনিই মুক্তিবিধাত্রী। তিনি সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্র প্রভৃতি পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃতিক পদার্থের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যময় জড়-দেবতা নহেন। তিনি আদ্যাশক্তি। সকল চেতনের চৈতন্য; সকল প্রাণের প্রাণ ও সকল শক্তির শক্তি। তিনি প্রত্যেকের অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন।

অব্যবহিত পূর্ব্বের অমাবস্যা নিশি বা মহালয়া মহাপ্রলয় রাত্রি ছিল। উহার পরবর্ত্তী অমাবস্যায় কালী পূজার রাত্রে প্রলয়াবসানে নূতন কল্পের আরম্ভ হইল, নূতন সৃষ্টির উন্মেষ হইল। ইহা ঋষি কল্পনা। এই মহারাত্রে কালী পূজার অর্থ সৃষ্টির প্রারম্ভিক মুহূর্ত্তে স্রষ্টার আরাধনা।

আরও বেশী কিছু জানিতে ইচ্ছা হইলে গুরুর নিকট যাইতে হয় আপাততঃ আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে ইহাই জানা যথেষ্ট যে কালী বা মহাকাল অনন্ত ঈশ্বরের নামান্তর। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে তাঁহারই স্তব ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্ব লোকাশ্রয়ায়
নমোঽ দ্বৈতবায় মুক্তি প্রদায়
নমো ব্রহ্মণে বাপিনে শাশ্বতায়।

অতএব কালীপূজার প্রকৃত তত্ত্বের ভিতর বীভৎস বা গর্হিত এমন কিছু নাই যাহার জন্য আমরা লজ্জিত হইব। কালীপূজা উঠাইয়া না দিয়া উহার যথার্থ অর্থ জনসাধারণে প্রকট করিয়া, উহার পূজাবিধি কালোপযোগী করিয়া উহাকে জাতীয় আধ্যাত্মিক শক্তির পুষ্টিকল্পে প্রয়োগ করাই বুদ্ধির কাজ হইবে।

যে প্রাচ্য মণীষীরা খ্রীষ্ট জন্মে আনন্দ প্রকাশ করিতে তাঁর আস্তাবলের সূতিকা গৃহে দর্শন দিয়াছিলেন—নিঃসন্দেহ পরে তাঁহাদেরই নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া যীশু আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তিতে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। যতদিন সাধনা চলিতে ছিল ততদিন যীশু স্বজাতির নিকট অজ্ঞাত ছিলেন। হঠাৎ যেদিন আপ্তপুরুষের ন্যায় তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেদিন বলিলেন—'আমি আমার দেশ ও জাতির পূর্ব্বগুরুগণের উপদেশ ও বিধান বিপর্য্যস্ত করিতে আসি নাই, আমি তাহা ফলিত করিতে আসিয়াছি।' এবং করিয়াছিলেনও তাহাই।

খ্রীষ্টানী যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর পক্ষে খ্রীষ্টানগুরু যীশুর এই উক্তি ও আচরণ অনুকরণীয়। যদিবা আমাদের পূর্ব্বতন চিন্তাপদ্ধতি একটা মস্ত ধাক্কা খাইয়াছে তথাপি আমাদের মধ্যে এতটা সম্বরণ শক্তি ও বিচার থাকা চাই যাহাতে পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রচলিত পূজা পদ্ধতির মধ্যে যাহা কিছু রক্ষণযোগ্য তাহার রক্ষা করিয়া বাকি অংশের কালোপযোগী পরিবর্ত্তনের দ্বারা আধ্যাত্মিক মৃত্যু হইতে নিজেদের বাঁচাইতে পারি।

বলিদান সম্বলিত কালীপূজা অধুনা কিভাবে বজায় রাখিতে পারা যায় সেই মুখ্য বিষয়ের অবতারণার পূর্ব্বে বলিদান সম্বন্ধে সাধারণতঃ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বলিদানের অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ। বলিই ধর্ম্মের প্রাণ। বলিদানই সকল দেশে, সকল কালে, সকল মানবসমাজে পূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়াই গণ্য হয়। ইহারই দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মানুষের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

বলি প্রধানতঃ দুই প্রকারের, এক নজর, ভেট বা উপঢৌকন, আর এক দণ্ড। যেমন মানুষ নিজের চেয়ে পদে, মানে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বড় লোকের সম্মুখীন হইতে হইলে—রাজা, জমীদার, সাধু বা গুরুর দর্শনে যাইলে খালি হাতে যাওয়াটা লজ্জাকর বা অশোভন মনে করে, কিছু না কিছু নজর বা প্রণামী সঙ্গে লইয়া না গেলে নিজের কাছেই নিজে লঘু হইয়া পড়ে, তেমনি বিনা দর্শনীতে দেবদর্শনে যাওয়া, খালি হাতে মন্দিরে যাওয়া—অন্ততঃ পত্রটি, পুষ্পটি, ফলটি, পয়সাটিও দেবতার পায়ের তলায় না রাখায় যেন নিতান্ত হীনতা উপলব্ধি হয়। বলির এক সময়ে অর্থ ছিল দেব ভোগ। মৃণ্ময় বা প্রস্তরমূর্ত্তির সাম্‌নে যাহা কিছু স্থূল খাদ্য পানীয় নিবেদন করা যাইত তাহা দেবতা বস্তুতঃ ভোজন করিতেন এইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং এখনও সম্ভবতঃ কোথাও কোথাও সে বিশ্বাস আছে। চিন্তারাজ্যে ক্রমোবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়া আর এক ধারণার উৎপত্তি হইল—যজ্ঞাগ্নিতে আহুত স্থূল পদার্থের সূক্ষ্ম বায়বীয় অংশের দ্বারাই দেবতাগণের পুষ্টি হয়। চিন্তার আরও উন্নত স্তরে সিদ্ধান্ত হইল, যিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের স্রষ্টা ও পাতা তাঁর স্বশরীর পালনের জন্য কোন খাদ্যদ্রব্যের আবশ্যক নাই; কোনরূপ বস্তু তাঁহাকে উৎসর্গ করাই নিষ্প্রয়োজন শুদ্ধ হৃদয় ও শুদ্ধ আচরণের উৎসর্গই শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ; একমাত্র তাহারই দ্বারা উঁহার প্রীতি সাধন হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"দ্রব্যময় যজ্ঞের অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।" এবং রামপ্রসাদ গহিয়াছেন—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।
জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা,
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়
আলো চাল আর বুট ভিজানা।
জগতকে পালিছেন যে মা সাদরে তাও কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা।

কিন্তু অনুগ্রহভাজনের কৃতজ্ঞ হৃদয় স্বতঃউচ্ছসিত হইয়া ভক্ত বস্তুর বিচিত্র উপঢৌকন প্রথমে তাঁহার পদপ্রান্তে না রাখিয়া তৃপ্তি পায় না। তাঁহার নেওয়ার প্রয়োজন নাই জানিলেও তাঁহাকে দেওয়ার সাধ না দিয়া নিবৃত্তি হয় না। মানুষ নিজে যা কিছু পায় বা উপভোগ করে তাই প্রথমে তাঁহাকে নিবেদন করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। শস্য, তরীতরকারী, ফলমূল, মাংস ও সুরা সবই। তাঁহাকে না চাখাইয়া, তাঁহার প্রসাদ না করাইয়া আগে-ভাগেই নিজে গ্রহণ করিতে রুচি হয় না। তাই পূজার ভোগ বা যজ্ঞ উৎসবে পরিণত হয়, উপাস্য ও উপাসকে মিলিয়া আহার ভোজের আনন্দময়তা লাভ করে।

পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দণ্ডরূপে উৎসর্গীকৃত বলির ভোগ কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যাপার। উহার

P30492

ভিতর উৎসবের আনন্দ নাই, দক্ষিণের পীড়া আছে ; উপাসক উহা স্বতঃস্ফূরিত কৃতজ্ঞতা-বশে দেয় না, পাপ মোচনের জন্য ভয়চকিত চিত্তে সমর্পণ করে। উহার ভোজ হইতে পারে না ; কারণ উহা প্রায়শঃ নরবলি বা স্বজাতীয় নরের প্রতীক্ বলি। যে অসভ্য বর্ব্বরেরা নরমাংস সেবন করে তাহারাও স্বজাতীয়ের মাংস স্পর্শ করে না। প্রত্যেক সমাজের মানব-ধর্ম্মে এমন কোন কোন পাতক আছে যাহা মহাপাতক বলিয়া গণ্য হয়, যাহার কোনই প্রায়শ্চিত্ত নাই, একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত দেবপদে পাতকীর প্রাণ বলি। যখন কোন বংশ, কুল বা জাতি দীর্ঘকালব্যাপী দৈবী বিপদপরম্পরার দ্বারা অভিহত হইতে থাকে তখন অনুমান করা যায়, সেই বংশ, কুল বা জাতিস্থ কোন এক ব্যক্তি এমন কিছু মহাপাতক করিয়াছে, যার দরুণ দেবতার কোপভাজন হইয়াছে। নিত্যকৃত পূজা অর্চ্চনায় দেবতার সে কোপের শান্তি হয় না। তাহার জন্য নৈমিত্তিক পূজা ও বিশেষ বলির আবশ্যক। সে বলি আর কিছুই নহে, অপরাধী স্বয়ং বা তাহার হইয়া তাহারই রক্তের কোন স্বেচ্ছা-প্রতিনিধি।

চিতোরের রাজলক্ষ্মী যেদিন গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিলেন, "ময়া ভূখী হুঁ"—সেদিন চিতোরদ্রোহী কোন পাতকীর বা তাহার বংশের কোন প্রতিনিধির আত্মবলি কামনা করিয়াছিলেন। গ্রীক্ জাতির কল্যাণবিধায় রুষ্ট আর্টেমিস দেবতার ক্রোধতর্পণের জন্য পবিত্র গ্রীকরাজকুমারী ইফিজিনিয়ার বলিদানে এই নীতিই পাওয়া যায়। কাপালিকদের কালী-পদে কুমার বা কুমারীর বলিদানেও এই তথ্যই নিহিত আছে কিন্তু কাপালিকগণের নরবলির প্রতি শাক্তদেরও যে জুগুপ্সা চিরপ্রচলিত দেখা যায় তাহাই প্রকট করে যে নরবলি যদি স্বেচ্ছায় না হইয়া পরেচ্ছায় হয় তবে তাহা দেবগ্রাহ্য বলি নহে, তাহা নরহত্যা মাত্র। অ্যানার্কিষ্টদের দেশদ্রোহীর হত্যাও অঘোরপন্থীর নরবলিদানের সমান গর্হিত ও জঘন্য। তাহাতে দেশের দেবতা তুষ্ট হইতে পারেন না। যদি দ্রোহী স্বয়ং বা তাহার পরিবারস্থ কেহ লজ্জা ও অনুতাপের তীব্রতায় দগ্ধ হইয়া স্বকৃত বা স্বাত্মীয়কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হয় তবেই দেবতা প্রসন্ন হন। যে জাতির মধ্যে এইরূপ স্বেচ্ছায় আত্ম-বলিদানেচ্ছুর অভ্যুদয় হয়, সেই জাতির পাপমোচন হইয়া তাহার প্রতি দৈবানুগ্রহ অতি সত্বর বর্ষিত হইতে থাকে।

প্রত্যেক জীববলিদানেই—বলি যেখানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আত্মোৎসর্গ না করে, সে স্বয়ং অপরাধী হউক বা প্রতীক হউক, মানুষ হউক আর পশু হউক, বলপ্রয়োগজনিত এমন একটী নৃশংসতা ও আসুরিক ভাব থাকে, যাহা সাত্ত্বিক উপাসনারূপে কখনই দেবতার গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাহা তামসিক বর্ব্বর প্রকৃতিরই উপযোগী। শিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি 'ভদ্রলোকে'র তাহা নিতান্তই অনুপযুক্ত। চণ্ডীতে উক্ত আছে—

"বলিদানাদিপূজেয়ং বিপ্রবর্জ্যাময়েরিতা।
তেষাং কিল সুরামাংসৈর্নোক্তা পূজানৃপ"॥

ব্রাহ্মণগণ এই বলি-মাংসাদি সম্বলিত পূজা বর্জ্জন করিবেন। হে নৃপতে! ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সুরামাংসাদি দ্বারা অর্চ্চনা কুত্রাপি বিহিত হয় নাই।"

ব্রাহ্মণ শব্দ এখানে সাঙ্কেতিক মাত্র। যাহা ব্রাহ্মণগণের বর্জ্জনীয় তাহা দ্বিজমাত্রের, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও বর্জ্জনীয়। তাই চণ্ডীতেই দেখিতে পাই চণ্ডীপূজা প্রবর্ত্তক সুরথ রাজা ও সমাধিবৈশ্য ফলমূলাহারী হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক মন একমাত্র তাঁহাতে নিবিষ্ট করিয়া নিজের গাত্ররক্ত বলিদান করিলেন।

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥

জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের উভয়কে অভিলষিত বরদান করিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে নিত্য বা নৈমিত্তিক কোন পূজাতেই দেবতাকে জীব বলিদান প্রশস্ত নহে।

নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য আর একটা প্রাণীকে ঘাড় ধরিয়া আনিয়া বলি দেওয়ার ভিতর একটা অতি নীচ ক্ষুদ্রতাও আছে। বলি মানে ত্যাগ। যেখানে মানসিক করিয়া বলি দেওয়া হয়, অর্থাৎ "মা আমার ঘরে ঐশ্বর্য্য বর্ষণ করিও, আমি তোমায় জোড়া পাঁঠা আর একটা মহিষ বলি দেব"—বলিয়া যেখানে পশু বলি দেওয়া হয়, সেখানে ছাগল বা মহিষ কিনিয়া বলি দিতে আমার খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় সত্য, অর্থাৎ পশুর মূল্য যে কতিপয় রজত মুদ্রা তাহা খরচ করিতে হয়—ততটুকু পরিমাণে আমার ত্যাগ হইল। কিন্তু তার চেয়ে অতুলন পরিমাণ ত্যাগ যে প্রাণত্যাগ সেটা আমার নয়, সেটা অন্য জীবের। কালীর নিকট বলি দেওয়ার ধনসম্পদ রাজ্যপাট পুত্র পৌত্র ষড়ৈশ্বর্য্য বা অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি যা কিছু লাভ সেটি হবে আমার, আর তার জন্য প্রাণটি দেওয়াইব অপরের, যে প্রাণ একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিবার নয়, যে প্রাণ ছাগশরীরেই থাকুক, মেষশরীরেই থাকুক, মহিষশরীরেই থাকুক বা মানুষশরীরেই থাকুক কোন প্রাণীই স্বেচ্ছায় দিতে প্রস্তুত হয় না। ধড়ফড়ান ব্যাকুল প্রাণীর সেই প্রাণটুকু চিরকালের মত বের'করাইব, আমার ক্ষণকালের স্বার্থের জন্য। উহার লোকসান ও আমার লাভের মাত্রার কি অপার ব্যবধান। দেবতার সঙ্গে দরদস্তুরে আমার স্বার্থের বদলে অন্যের প্রাণের এই বিকিকিনির ভিতর কি ঘৃণা নীচতা আছে তাহা যদি একবার কেহ তলাইয়া উপলব্ধি করে তবে আর এরূপ কাজে কোন ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি হয় না। ইহা ভদ্র লোকের জন্য শাস্ত্রে বিহিতও নহে তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

আর এক প্রকারের নরবলি আছে, যাহাকে অধ্যাত্ম বলি বলা যায়। বেদে উল্লিখিত সব প্রথম বলি এই জাতীয়। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিরাটপুরুষকে যজ্ঞ পশুরূপে বলিদান করিলেন। "যজ্ঞং যজ্ঞেন অযোজয়ৎ।"

ইহার দ্বারা বেদ আমাদের বুঝাইলেন যে স্বয়ং ঈশ্বর সৃষ্টিতে আত্ম বলিদান করেন।

অনন্ত সান্ত হন, অসীম সীমাবদ্ধ হন ; যিনি সূক্ষ্ম দুর্জ্ঞেয় ও দুরনুমেয় ছিলেন, তিনি স্থূল, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগোচর হইলেন

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ
সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্
স তপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। ছিলেন কেবল এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম।

তিনি তপস্যা অর্থাৎ চিন্তা ঘনীভূত করিলেন, তাঁহার তপস্যা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইল সৃষ্টি পূর্ব্বে শুধু ছিল তমোময়ী প্রকৃতি, জড় বস্তুর নিদান।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে।
আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

সেই অন্ধকারের উপাদান হইতে জড় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া পরমাত্মা তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন, তাহাকে চৈতন্যময় করেন, তাঁর স্পন্দময়ী ক্রিয়া শক্তির দ্বারা তাহাকে পরিচালনা করিয়া এক আশ্চর্য্য লক্ষ্য পথে লইয়া যান। আধুনিক ভাষায় বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় বিরাট পুরুষ অথবা সৃষ্টিমান্ ঈশ্বর পূর্ব্বকল্পের প্রাণীগণের হিতার্থ জড়রূপ ক্রুসে বিদ্ধ ক্রাইষ্ট। মহাপ্রলয়ে যে সকল জীবাত্মা সুপ্তাবস্থার অপেক্ষা করিতেছে নূতন সৃষ্টি না হইলে তাহারা বিবর্ত্তনের বা আত্মবিকাশের চরমে পৌঁছিতে পারেনা, পূর্ণতার দ্বারা তাঁহাতে লয় হইতে পারে না ; পরমশিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাহাদেরই প্রতি অনুকম্পায় তাহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধনার জন্য কল্পে কল্পে নূতন সৃষ্টি, ভগবানের বীরত্বের আপনাকে বাধা। এই আদি অধ্যাত্ম পুরুষবলির রূপক হইতেই সম্ভবতঃ বৈদিক যজ্ঞে প্রতীকরূপে পশুবলির প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। প্রাচীন হীব্রুদিগের বৃত্তান্তে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে। উহাতে দেখিতে পাই অধ্যাত্ম বলিপশুর মাংস ও রক্ত সেবনের দ্বারা, উৎসর্গীকৃত বলির পবিত্রতা উপাসকদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হইত। ক্রীষ্টানদের Holy Communion বা 'পবিত্র ভোজ' এর উৎপত্তি এই প্রাচীন হীব্রু প্রথা হইতে ; উৎসর্গীকৃত রুটি ও মদ ক্রাইষ্টের শরীর ও রক্ত কল্পনায় শ্রদ্ধাভরে সেবন করিলে ক্রাইষ্টের গুণাবলী, তাঁর ঈশ্বর তন্ময়তা ও ত্যাগ সেবকদের শরীরে বর্ত্তায় এই বিশ্বাস।

এখন দেখিলাম বলি বা উৎসর্গ তিন একারের, আনন্দ বা কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক, প্রায়শ্চিত্ত জনক ও অধ্যাত্ম। একই পূজায় ত্রিবিধ বলিরই সমাবেশ হইতে পারে।

পূজা মানুষের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্থাপনের পন্থা—বলি তাহার প্রধান অঙ্গ। সে সম্বন্ধ কেবল একাএকা ব্যক্তিগত ভাবে স্থাপিত হইতে পারে, বা বহুজনের সহিত মিলিত হইয়া সমষ্টিভাবেও হইতে পারে। মিলিত পূজায় বা উপাসনায় সমবেত উপাসকবৃন্দ ঈশ্বরের সূত্রে পরস্পরের সহিতও মিলনবন্ধনে বাঁধা পড়েন। দেবতাবিশেষের সার্ব্বজনীন পূজায় জনগণের

পরস্পর ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি হয়, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি পুষ্টিলাভ করে এবং সম্পদে মৈত্রী, বিপদে সাহায্য ও পরস্পরের নিকট হইতে আঘাতে ধৈর্য্যের একটা বাধ্যবাধকতার ভাব আনিয়া দেয়। যিনি সকলের পিতা ও সকলের প্রতি বৎসল তাঁর প্রসন্নতাপ্রার্থী হইয়া তাঁর সমীপে উপস্থিত হইবার সময় পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ মিটাইয়া না আসিলে তাঁর চরণে আসা ব্যর্থ হয়। যীশু তাঁহার শৈল-উপদেশে বলিয়াছেন—"মন্দিরে ঢোকার পূর্ব্বে ভা'য়ের সঙ্গে যদি মনোমালিন্য থাকে, তাহা সাফ করিয়া আসিও, নচেৎ ভগবানকে ডাকা বৃথা।" এ ব্যক্তিগত উপাসনার বিধেয় পূর্ব্বাচরণের উপদেশ। কিন্তু যীশুর বহু পূর্ব্বে সমষ্টি-উপাসনা সম্বন্ধেও বাইবেলে ঐ কথাই বলা হইয়াছে—"যদি তোমাদের মধ্যে কাহারো পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ থাকে তাহারা যেন বিবাদ না মিটাইয়া তোমাদের সঙ্গে বলি দিতে না আসে, তা'তে যজ্ঞের হানি হইবে।"

যজ্ঞে ও বলিদানের ভোজে একই ধর্ম্ম, জাতি কুল বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত যাহারা তাহারাই যোগদান করিয়া থাকে। আচার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতি বা ধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি বিধি-নিষেধ আছে, বলি দেওয়ার সময় সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যাহা নিজেদের পক্ষে নিষিদ্ধ আহার তাহা দেবতাকেও ভোগ দেওয়া যাইতে পারে না। যাঁহারা স্বয়ং নিরামিষাশী তাঁরা দেবীকে জীববলি দিতে পারেন না। অথচ সংস্কার দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে যে, পশুবলি না হইলে দেবতার প্রসন্নতা সাধন হয় না—তাই পশুর স্থলে তার প্রতীকরূপে কুষ্মাণ্ড সসা প্রভৃতি কাটা হয়। ভাবটা এই, কিছু কাটা চাই, শুধু শুধু নৈবেদ্যের মত রাখিয়া দিলে রুধির দানের হঠক্রিয়ার ভাব আসে না। তাই সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য আত্মসৃক্ দানের দ্বারা হঠতার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিয়াছিলেন। যেখানে জনপদবাসী সকলের কল্যাণের জন্য সার্ব্বজনীন ভাবে রক্ত বলিদানের প্রয়োজন অনুভূত হয় সেখানে যে কোন একজন নির্ম্মলাত্মা সকলের হইয়া নিজেকে উৎসর্গ করিয়া উক্ত রাজা ও বৈশ্যের ন্যায় দেবীকে আপনার শরীর হইতে নিঃসৃত রক্ত দান করেন। একটী পাত্রে ধৃত সেই রক্ত সমবেত সকলের উপর ছিটান হয় বা কপালে তাহার ফোঁটা পরান হয়। এইরূপে একই বলিদানের রক্তে সিক্ত হইয়া বা একই বলিদানের রক্তের ফোঁটা পরিয়া জনপদবাসী সকলে একই রক্ত-চুক্তিতে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য রক্ষা করিতে আবদ্ধ হন। যদি কেহ সে চুক্তিভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করে বা অধর্ম্মাচরণ করে তবে দেবতার কোপ তাহার উপর এবং সেই জনপদের উপর পতিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যতক্ষণ বিশ্বাসহন্তা স্বয়ং বা তাহার হইয়া আর কেহ প্রায়শ্চিত্ত না করে ততক্ষণ দেবতার কোপ জাগ্রত থাকে। জাপানীদের 'হারিকিরি' অর্থাৎ জাতীয় পাপ বা কলঙ্ক মোচনের জন্য আত্মবলি দান একটি মহামূল্যবান্ প্রথা। যদি প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক বা স্বজাতিদ্রোহী আকৃষ্ট যে তারই কোন নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয় তার বিশ্বাসঘাতকতা বা স্বজাতিদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মহত্যা করিবে, তবে পাপ করিবার পূর্ব্বে তার মন কাঁপিত এবং এইরূপে বিশ্বাসহন্তার সংখ্যা কমিয়া আসিত; অধঃপতিত, পাপ-পঙ্কিল জাতিবিশেষ এইরূপে পাপধৌত হইয়া আবার উঠিত।

কালী বা জগৎস্রষ্টা ও পাতার পূজা এবং তাঁহার বলিদান দেওয়ার অর্থ এতক্ষণ বুঝাইলাম। এইবার প্রকৃত প্রস্তাবে আসিব।

তোমরা স্বরাজ চাও। যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা এক বিশ্ব-পিতার পদতলে প্রণত হইয়া তাঁহাকে একত্রে ডাকিবার অধিকারী নয়, সে দেশে স্বরাজের অর্থ কি? যদি এক ছত্র-তলে সবাইকে আনিবে তবে প্রথমে বিশ্বরাজের ছত্রতলে তাহাদের মিলাও। তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া সকলে রক্ত-চুক্তিবদ্ধ হও। দেবতা ও মানুষে মিলিয়া দেশকে গড়। পৌরুষকে বাদ দিয়া শুধু দেবতার উপর নির্ভর করা যেমন নিরর্থক, তেমনি দৈবশক্তির সাহায্য ব্যতীত কেবল পুরুষার্থও ব্যর্থ হয়। দেবতাকে কেহ চোখে দেখে না, বিশ্বকার্য্যে ও বিশ্ব ঘটনায় তাঁর শক্তির পরিচয় পায় ও তাঁহাকে হৃদয়ে অনুভব করে; বুঝিতে পারে অনেক সময় দেখার চেয়ে অদেখার শক্তি অধিক, জানার চেয়ে অজানার জোর বেশী। সেই অদেখাকে বশে আনিতে হইবে, সেই অজানাকে অনুকূল করিতে হইবে। য়ুরোপীয়েরা বিজ্ঞানের স্থূল যন্ত্রের দ্বারা শক্তিরহস্য উদ্ভেদ করিতে চান। জড়শক্তিকে বশীভূত করিবার জন্য উহার আবশ্যকতা আছে, তোমরাও তাহা কর। কিন্তু আমাদের দেশের গুণীরা যে সূক্ষ্ম সংশয়রহিত চিত্তযন্ত্রের দ্বারা জগৎব্যাপী চৈতন্যশক্তিকে বশীভূত করিয়া আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার সাধনা ছাড়িও না। য়ুরোপও এই শ্রদ্ধামার্গের সন্ধান পাইয়াছে—এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদের মধ্যে একদল প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিতেছে—যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জনিত শক্তি মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে পাহাড় লঙ্ঘাইয়া, মৃতকে সঞ্জীবিত করে। তোমাদের মধ্যে সেই শক্তির সাধনা চাই। সে শক্তির উদ্ভবস্থান দেবমন্দির, সে শক্তির সঞ্চার হয় সর্ব্বশক্তিমান দেবতার ধ্যানে। বাঙলার যুবকেরা যদি বাঙলার গ্রামে গ্রামে গ্রাম-দেবতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পার, সেই দেবমূর্ত্তির ভিতর এক-একটী তারকেশ্বরকে জাগ্রত করিতে পার, তবে লোকহিতকারী দেশহিতকারী এক একটি শক্তিকেন্দ্র স্থাপনা করিলে জানিও। পুঞ্জীভূত সমবায় শক্তি বিকাশের জন্য সমবেত পূজার আয়োজন কর—সার্ব্বজনীন দেবমন্দিরে সার্ব্বজনীন পূজার বিধি প্রবর্ত্তন কর। উচ্চ নীচকে ধনী নির্ধনীকে একই বিশ্ব পিতা বা বিশ্ব মাতার পদপ্রান্তে মিলাও। প্রতি গ্রামে গ্রামে যে গ্রামদেবতার সার্ব্বজনীন মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে তাতে মুচি মেথর, হাঁড়ি ডোম, ধোপা নাপিত, তেলী তাঁতী, চাষা মজুর, জল আচরণীয় বা জল অনাচরণীয় শূদ্র, এবং ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থ ও বৈশ্য সকলে সপ্তাহে একদিন মিলিত হইয়া সমবেত পূজা করো। তাহাতে অমিতবল লাভ হইবে। মুসলমানদের দৃষ্টান্ত দেখ, মুক্তিফৌজদের দৃষ্টান্ত দেখ। একখানি কাঠ শীঘ্র জ্বলে না, অনেক গুলি কাঠ একত্র হইলে একখানা কাঠও জ্বলে সকলখানাও জ্বলে। তাঁরা জল আর তার আলাদা আলাদা পড়িয়া থাকিলে ধাক্কা দেয় না—তাদের একত্র করিলে মিশ্রণগুণে প্রত্যেকেই বৈদ্যুতীতে ভরিয়া উঠে, তখন তাদের স্পর্শ করিলেই মহা বিপদ। হিন্দু জনসাধারণ মুক্তির

অবলম্বন বিনা ঈশ্বরে চিত্তনিবিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু হিন্দু জ্ঞানী পুরুষ মূর্ত্তির ভিতর দিয়াও ঈশ্বরের ধ্যান করিতে পারেন, কারণ তিনি জানেন :—

ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং

সেই ঈশ্বরের দ্বারা সব কিছু ব্যাপ্ত হইয়া আছে। জ্ঞানী পুরুষ তাই রূপ ও রূপকের আবরণ ভেদ করিয়া অরূপ আত্মায় পৌঁছিতে পারেন। অতএব উভয়বিধ অধিকারীই একই স্থানে বসিয়া একই সময়ে একই দেবতার উপাসনা করিতে পারেন। উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ প্রগাঢ় ও প্রত্যক্ষবৎ করিবার সহায়তাকল্পে, উচ্চ অধিকারী হইলেও নিম্ন অধিকারীর অনুভূতি ও উৎসাহ অভঙ্গ রাখার উদ্দেশ্যে, গীতার ভাষা—লোক সংগ্রহার্থে, কিছু না কিছু উৎসর্গের বস্তু প্রত্যেকেই হাতে লইয়া আসিবেন—একটি পত্র বা পুষ্প, ফল বা মূল, কি ধন বা ধান্য যাহা কিছু হয়। উৎসর্গান্তে প্রসাদরূপে তাহাই সকলের মধ্যে বণ্টিত হইবে। টাকা পয়সা যাহা কিছু আসিবে তাহা গ্রামের দরিদ্রগণের সেবায় ব্যয়িত হইবে। এই সার্ব্বজনীন মন্দিরে পুরোহিত কোন কিছুরই বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবেন না, তিনিই সর্ব্বসাধারণ উপাসকের মতই প্রসাদের অংশমাত্রই ভোগী হইবেন, দেবতাকে নিবেদিত টাকা পয়সা একেবারেই স্পর্শ করিবেন না। এইরূপে পুরোহিতকে নির্লোভ রাখিয়া তাঁকে আধ্যাত্মিক অধঃপতন হইতে বাঁচাইতে হইবে। আবশ্যকস্থলে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ও মন্দির সম্পর্কিত ব্যয়ের জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি পঞ্চায়তী করদানের ব্যবস্থা থাকিবে। সাপ্তাহিক নিত্যপূজায় কোন বলির বিধি থাকিবে না ; কিন্তু বিশেষ বিশেষ তিথিপূজায়,—প্রধানতঃ কালীপূজায় বলিই পূজার প্রধান অঙ্গ হইবে। আমরা দেখিয়াছি, কালীপূজার রাত্রি বলিদান-প্রধান রাত্রি! সেদিন ত্রিবিধ প্রকারের বলিরই অনুষ্ঠান থাকিবে। ভগবান স্বয়ং আত্মবলিদানের দ্বারা সেদিন সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন; জীবাত্মার পূর্ণতা সংসিদ্ধির জন্য পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ড রচনা ব্যাপারে আপনাকে আবার ক্রিয়াশীল ও আবদ্ধ করিলেন। অতএব এই মহান্ স্মৃতি জাগরূক রাখার জন্য, ভগবানের এই আত্মবলিদান নিজের ভিতর সঞ্চার করার জন্য ক্ষীরপুত্তলিকায় বিরাট পুরুষের প্রতীক কল্পনা করিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞ দেওয়া বা বলিদান করা এবং তদনন্তর সেই যজ্ঞমাংস সেবন করিয়া তাহার গুণ ও শক্তি নিজের ভিতর সঞ্চার করার প্রক্রিয়া এই পূজার একটি প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ একজন পুরুষ সকলের হইয়া আত্মরূপিণ দেবতাকে নিবেদন করিলে সেই রুধিরের ফোঁটা সকলের কপালে পরাইয়া দেবতার আশীষযুক্ত রক্তের শপথে সকলকে বাঁধা আবশ্যক। সেদিনকার পূজার সম্পূর্ণ পদ্ধতি নিম্নলিখিতরূপ হইতে পারে।

১। বেদীর উপর সজ্জিত ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে উপাসকগণের ভিন্ন ভিন্ন প্রীতি-উপঢৌকন বা মানসিক স্থাপন

২। আসন গ্রহণ।

৩। পুরোহিতের উদ্বোধন।

৯। পুরোহিতের দ্বারা দ্রব্য উৎসর্গ করা।—(মানসিকস্থলে যার দেওয়া এবং যার নামে দেওয়া—কর্দ্দ অনুসারে তাহাদের নাম উচ্চারণ করতঃ)।

সকলের মিলিত স্তোত্র পাঠ।

নৈবেদ্য ও মানসিক স্বীকার করণের জন্য পুরোহিতের প্রার্থনা।

সঙ্কীর্ত্তন।

পুরুষ বিশেষের আত্মরুধিরপাতের সঙ্কল্প জ্ঞাপন।

পুরোহিতের দেব-সম্মতি প্রার্থনা।

রুধির দান।

১১। সমবেত প্রার্থনা।

১২। সংকীর্ত্তন।

১৩। পুরোহিতের দ্বারা সকলের মাথায় রক্ত-টীকা পরান।

১৪। উচ্চ নীচের পরস্পর আলিঙ্গন বা করপুটে করপুট মিলান।

১৫। পুনঃপ্রবেশন।

১৬। পুরোহিত কর্ত্তৃক প্রতীকে বিরাটপুরুষ বলি।

১৭ প্রতীক ক্ষীরপুত্তলির অংশ বণ্টন ও সেবন।

১৮। পুরোহিতের প্রার্থনা।

১৯। সঙ্কীর্ত্তন।

২০। প্রসাদ গ্রহণ।

আমার বক্তব্য শেষ হইল। তোমাদের কাজের পালা আরম্ভ হইল। আমি চাই বঙ্গকে নবীন কালীপূজায় অর্থাৎ নবরূপে নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভে স্রষ্টার আত্মবলিদানের দীক্ষা গ্রহণ করিতে, তাঁহার কর্ম্মশীলতার অনুসরণ করিতে। আজকালকার যুবকেরা—তোমরা গণতান্ত্রিক, নূতন কল্পারম্ভে গণধর্ম্মের বীজ বপন কর—মন্দির যতদিন না হয় মাঠে, মণ্ডপে না হয় অঙ্গনে। স্পৃশ্য অস্পৃশ্যতার সমাধান ইহাতেই হইবে, জনগণহৃদয় একসূত্রে বাঁধা ইহাতে হইবে, স্বদেশদ্রোহিতা নিবারণ ইহাতে হইবে, যে স্বরাজসিদ্ধি—একদিন ইহাতে হইবে।

আমি চাই তোমাদের স্রষ্টার সৃজন কার্য্যের বিপুল আনন্দের অংশভাগী করিতে এবং যে আনন্দের দ্বারা কিছু-না হইতে তিনি এক একটী সৌরলোকের সৃষ্টি করেন। তাঁহার সেই আনন্দের আস্বাদ তোমাদের গ্রহণ করাইতে চাই—যাহা কিছু না হইতে একটি সমগ্র জাতিকে গড়িয়া তোলার আনন্দ, যাহা পূর্ণতার আনন্দ, খণ্ডতার নহে; যাহা সমষ্টির আনন্দ ব্যষ্টির নহে, যাহা বিশ্ব-আনন্দ—ব্যক্তির নহে।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

স্বরাজের 'স্ব'

কিছুদিন থেকে আমাদের মধ্যে 'স্বরাজ' শব্দের খুব প্রচলন হ'য়েছে—এমন কি আমাদের সমস্ত জাতীয় উদ্যম এই ভারতবর্ষে 'স্বরাজ'-প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হ'য়েছে। এমন সময় আমাদের স্বরাজের 'স্ব'টা কি, একটু ভেবে দেখ্‌লে মন্দ হয় না। কারণ, 'স্ব'র উপরই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হ'বে—'স্ব' না হ'লে স্বরাজ ত হ'বে না, বরং অরাজ হ'বে।

স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে, এদেশে 'স্বরাজ' শব্দটা খুব প্রাচীন—আর্য্য জাতির যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ, তা'তে 'স্বরাজ শব্দের প্রয়োগ আছে।

যুধস্ত তে বৃষভস্ত স্বরাজ
উগ্রস্ত যূনঃ স্থবিরস্ত ঘৃষ্বেঃ।
অজূর্যা তো বজ্রিণো বীর্য্যাণি
ইন্দ্র! শ্রুতস্ত মহতো মহানি॥—৩.৪৬.১

"হে ইন্দ্র! উগ্র, বীরর্ষভ, স্বরাজ, নবীন-প্রবীণ জরাহীন, বজ্রধারী, বর্ধণকারী, বিশ্রুত তোমার বীর্য্যসমূহ অতিশয় মহীয়ান্।" 'স্বরাজ' ইন্দ্রের এই বিশেষণগুলি প্রণিধানযোগ্য।

এ দেশ নাকি দার্শনিকের দেশ—আমরা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে দর্শন উদরস্থ করি। অতএব স্বরাজের 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টা একটু দার্শনিক ভাবে আলোচনা করি। হিন্দু দর্শনের চরম লক্ষ্য জীবকে স্বীয় 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত করা। পতঞ্জলি যোগসূত্রে যোগের লক্ষণ নির্দ্দেশ ক'রে বল্‌ছেন—"যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"। মানুষের চিত্তে নানাভাবের তরঙ্গ উঠ্‌ছে, সেই তরঙ্গে মানুষ আন্দোলিত হ'য়ে নানা দিগ্‌দেশে ভেসে যাচ্ছে। যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ কর্‌লে কি হ'বে? না, মানুষ 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। তদা দ্রষ্টুঃ স্ব-রূপে অবস্থানম্। এককথায় স্বরাজ হবে।

যোগসূত্রের চেয়ে অনেক প্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই স্ব-রূপে অবস্থানের কথা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের অপ্রাচীনতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করেন না। ঐ উপনিষদে মানুষকে লক্ষ্য ক'রে বলা হ'য়েছে—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে। অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে মানুষ নিজের স্ব-রূপ ভুলে গেছে। এমন একদিন আস্‌বে, যখন সে পরম জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হ'য়ে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'বে অর্থাৎ স্ব-রাজ হ'বে। ইহাই মানুষের চরম সার্থকতা, পরম পুরুষার্থ।

আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে যে, প্রত্যেক মানুষের একটা 'স্ব' আছে—একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা স্বালক্ষণ্য আছে। আমার 'স্ব' তোমার 'স্ব' নহে; রামের 'স্ব' শ্যামের 'স্ব' হ'তে বিভিন্ন। সেই জন্য আমার যা স্ব-ধর্ম্ম, তোমার তা' স্ব-ধর্ম্ম নহে; আমার যাহা ব্যক্তিগত শ্রেয়ঃ; তোমার তাহা ব্যক্তিগত শ্রেয়ঃ নহে। আমি যদি আমার স্বধর্ম্মের

অনুসরণ না ক'রে তোমার স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি (যেটা আমার পক্ষে পরধর্ম্ম), তা' হ'লে আমি শ্রেয়ের পথ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে প্রেয়ের বিপথে গিয়ে পড়ব—তা'তে আমার কল্যাণ হবে না, অকল্যাণ হবে। কারণ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—দূরম্ এতে বিপরীতে বিষূচী। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বল্‌ছেন—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

এর তাৎপর্য্য এই যে, স্বধর্ম্মের অনুসরণ কর্‌লে মানুষ শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হ'য়ে 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত হয়—এক কথায় স্বরাজ হয়।

ব্যক্তির যেমন স্ব-ধর্ম্ম আছে, জাতিরও তেমনি স্ব-ধর্ম্ম আছে। আমরা যেন না ভাবি যে, এক একটা জাতি (Nation) কতকগুলো ব্যক্তির রাশি মাত্র—যেমন এক রাশ বালি বা এক পাঁজা ইট। বালু কণায় বালু কণায় মিলিত হয় না, মিশ্রিত হয় মাত্র—মিশ্রিত হ'য়ে একটা রাশি সৃষ্টি করে। জাতি সে রকম রাশি নয়। যখন অনেকগুলি স্বতন্ত্র ব্যক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হ'য়ে একটা সংহতি (Organic Unity) রচনা করে, সেই সংহতির নাম হয় জাতি। অতএব জাতি একটা সংঘাত বা Organism—যেমন আমার শরীর। জৈববিজ্ঞান (Biology) থেকে আমরা জেনেছি যে, প্রত্যেক প্রাণি শরীর—তা' সে শরীর উদ্ভিদেরই হ'ক আর জীবজন্তুরই হ'ক—অনেক হাজার কোষাণু বা Cell দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কোষাণুর স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র জীবনশক্তি আছে কিন্তু তথাপি তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত হ'য়ে শরীর রূপ সংঘাত (Organism) রচনা ক'রেছে। ব্যষ্টিকোষাণুর সমষ্টিজাত এই সংঘাত কোষাণু হ'তে স্বতন্ত্র। এই শরীররূপ সংঘাতের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র জীবন-শক্তি আছে। সেই জন্য ব্যষ্টি কোষাণু ক্ষত, আহত, আর্ত্ত বা পীড়িত হ'য়ে শরীরচ্যুত হ'লেও, সমষ্টি-সংহত শরীর রূপ সংঘাতের ব্যক্তিত্ব ও সত্তা অব্যাহত থাকে।

এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ ক'রে সমাজতত্ত্ববিদেরা বল্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন যে, জাতি বা সমাজও ঐরূপ একটা সংঘাত—এটা ব্যক্তি-মানুষের সমবায়ে গঠিত—অথচ ব্যক্তি ছাড়া এর একটা স্বতন্ত্র সত্তা, একটা স্বাধীন জীবনশক্তি আছে। সেই জন্য ব্যক্তিবিশেষের অপচয়ে বা উপচয়ে এর বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না—এর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে।

ইয়োরোপে বোধ হয় নব্য ইটালির জনক ম্যাটসিনিই এই কথা প্রথম প্রচার ক'রেছিলেন—এখন অনেকেই এ কথা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে যে ব্যষ্টি সমষ্টির তত্ত্ব প্রচলিত আছে, সেটা এই ধরণেরই কথা। বৈদান্তিকেরা বলেন, যেমন ব্যষ্টি বৃক্ষের সমষ্টি বন, যেমন ব্যষ্টি জলবিন্দুর সমষ্টি জলাশয়, সেইরূপ ব্যষ্টি-পুরুষের সমষ্টি বৈশ্বানর বা বিরাট পুরুষ। যেমন প্রত্যেক বৃক্ষ ও জলকণা স্বতন্ত্র কিন্তু তাদের সংযোগে বন ও জলাশয় রচিত হ'য়েছে, সেইরূপ এ জগতে যত ব্যক্তি আছে, যত ব্যষ্টি-জীব আছে, তা'দের সমষ্টিতে ঐ বৈশ্বানর বা বিরাট পুরুষ রচিত হ'য়েছেন; অর্থাৎ তিনি ব্যক্তি-জীব-পুঞ্জের অঙ্গাঙ্গি-যোগ-সিদ্ধ, সমবায়-গঠিত স্বতন্ত্র সংঘাত। এই কথার সঙ্গে ম্যাটসিনির জাতি-ঘটনার কথার বেশ সঙ্গতি নাই কি?

ম্যাট্‌সিনি এ কথাও বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন একটা বৈশিষ্ট্য একটা স্বাতন্ত্র্য একটা স্বালক্ষণ্য আছে, তেমনি প্রত্যেক জাতিরও এক একটা বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বালক্ষণ্য আছে। সেই জন্য দেখা যায়, প্রত্যেক জাতির জীবনতন্ত্রীতে এক একটা স্বতন্ত্র সুর ধ্বনিত হচ্চে—সে সুর অন্য সব জাতির সুর থেকে পৃথক্। জগতে যত জাতি আছে, যদি সকল জাতির হৃদয় বীণায় একই সুর বাজ্‌তে থাকত, তা হ'লে তাতে সঙ্গীত হত না—এক তারার একঘেয়ে আওয়াজ মাত্র হ'ত। কিন্তু বিশ্ব শিল্পীর বিচিত্র বিধান এই যে বিশ্ব যন্ত্রে বিশ্বসঙ্গীত ধ্বনিত হ'তে হবে—সমস্ত জাতির বিভিন্ন হৃদয় তন্ত্রীতে যে বিবিধ সুর উত্থিত হচ্চে, এক দিন তাদেরই সমবায়ে ঐ বিশ্ব সঙ্গীতের ঐকতান বাদিত হবে। সেই জন্যই প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র, কি প্রবীণ কি নবীন সমস্ত জাতিরই একটা স্বালক্ষণ্য আছে। হিন্দু, পারশিক, চৈনিক, গ্রীক্, রোমক, মিসরীয়, এসিরীয় বেবিলোনীয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতি এবং ইংরেজ, ফরাসি, জার্ম্মাণ, ইতালীয়, মার্কিন প্রভৃতি আধুনিক জাতি প্রত্যেকেরই এক এক বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন স্বধর্ম্ম আছে—প্রত্যেক জাতিরও তেমনি স্বধর্ম্ম আছে। এই স্বধর্ম্ম পালনেই তার সুখ শান্তি, শ্রেয় সার্থকতা এবং পরিণামে তার স্বরাজ সিদ্ধি। এর ব্যতিক্রমে অর্থাৎ 'ভয়াবহ' পরধর্ম্মের অনুসরণে তার বিলোপ ও বিনাশ।

হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য কি? তার স্বালক্ষণ্য কি? তার স্বধর্ম্ম কি? যার অনুসরণ কর্‌লে তার স্বরাজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ হবে, সে 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত হবে? কিন্তু এ কথা আলোচনা করবার পূর্ব্বে একটা বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। সেটা এই যে এই হিন্দু জাতি যুগযুগান্ত ধ'রে নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও অন্ততঃ ছয় সাত হাজার বৎসর জীবিত রয়েছে! সব প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু হিন্দু জাতি আজও খাড়া রয়েছে! কেন? কিসে? অন্ততঃ ৬।৭০০০ বল্‌লাম—আমার কিন্তু ধারণা দশ বার হাজার বৎসর। যখন আমাদের পূর্ব্ব পিতৃগণ তাঁদের 'প্রস্তোতকঃ' থেকে উদাত্ত স্বরে সামগান কর্‌তে কর্‌তে এই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন, সে আজ খুব সম্ভব দশ বার হাজার বৎসরের কথা। এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত কর্‌বার স্থান এ প্রবন্ধ নয়—তবে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বেদবিদ্যাবিশারদ বালগঙ্গাধর তিলক অয়ন চলনকে (যাকে Precénion of the Equinox বলে) মান দণ্ড ক'রে বৈদিক যুগের যে কালনির্ণয় করেছেন, পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তার প্রতিবাদ কর্‌তে পারেন নি। তিনি দেখিয়েছেন যে, বেদের ও ব্রাহ্মণের কোন কোন অংশ যখন রচিত হয় তখন মৃগশিরাঃ নক্ষত্রে—এমন কি পুনর্ব্বসুতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হ'ত। সে আজ ৯।১০ হাজার বৎসরের কথা। এ কথা বল্‌লে অত্যুক্তি করা হবে না যে, যখন ভারতীয় আর্য্যজাতির সভ্যতা উন্নতির মধ্যগগনে আলোক বিকীর্ণ কর্‌ছিল, তখন গ্রীক রোমের পত্তন হয়েছিল মাত্র—তখনও গ্রীক ও রোমক সভ্যতা নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। এখন প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিসর মেক্‌সিকো, এসিরিয়া, বেবিলন—কেহই জীবিত নাই; অথচ যখন ভারতবর্ষে

সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ, তখনও এদের মধ্যে কেহ কেহ ভূমিষ্ঠ হয় নাই। হিন্দুস্থানের বক্ষের উপর দিয়ে যে প্রলয়ের প্লাবন ব'য়ে গেছে—যবন, ইরাণি, হুণ, চীন, পাঠান, মোগল, তুর্কি, পর্ত্তুগিজ, ওলোন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ—কত জাতির, কত জেতার বিজয় তুফান ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় ভারতের আকাশকে যে ভাবে আলোড়িত করেছে ভারতবাসীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ধিক্কার, অত্যাচার, অবিচার ও দুরাচারের অভিঘাত সহ্য করতে হয়েছে —তার একটা ছোট ঢেউ স্পর্শ করলে অন্য যে কোন জাতি চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত! স্বরাজ ইন্দ্রের ন্যায় এই 'যুনঃ স্থবিরস্য' এই নবীন-প্রবীন ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য কি? প্রায় সকল প্রাচীন জাতিই বিলুপ্ত হ'ল, ভারতের এই প্রাচীন হিন্দু জাতি আজও রয়েছে কেন? এটা কি একটা accident? এই নিয়মের জগতে accident বলে কোন কিছু নেই। এই জগতের যিনি স্বামী, সেই বিধাতার বিধানেই এই অঘটন ঘটন সংঘটিত হয়েছে—এই হিন্দু জাতি জীবিত রয়েছে। বহু যুগ আগে হিন্দু জাতির বিলোপ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি। বরং দেখতে পাই যারা যারা জেতার বেশে এই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল, হিন্দু জাতি ক্রমে ক্রমে তাদেরই গ্রাস ক'রে আত্মসাৎ করেছে। কত কত বিজেতা জাতির সভ্যতা এদেশে এসেছে কিন্তু তারা হিন্দু সভ্যতাকে নষ্ট করতে পারে নি—বরং তাদের 'কালচারের' সংস্পর্শে ভারতের জাতীয় জীবন আরও সম্পন্ন, আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। গ্রীকের পর ইরাণি সভ্যতা এল—তারপর হুন—তারপর মুসলমান—পাঠান মোগল তুর্কি। যে মুসলমান ইরাণি সভ্যতাকে চূর্ণ করেছিল, তুর্ক তাতারকে উদরস্থ করেছিল, ভারতে এসে তারা স্তম্ভিত স্তম্ভিত হয়ে গেল। মোগল এসে পাঠানকে উৎখাত করলে বটে। কিন্তু হিন্দুকে লুপ্ত করতে পারলে না। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষের ইতিহাসে কি দেখতে পাই? ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু জাতি আত্মলাভ করছে—পূর্ব্বেই গ্রীক ইরাণি হুনকে আত্মসাৎ করেছিল—এখন মুসলমানকে পরাভূত ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে—পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হয়েছে —মোগলের দুর্ব্বল হস্ত থেকে রাজদণ্ড খ'সে পড়ছে। পাঞ্জাবে শিখ, রাজস্থানে রাজপুত, দক্ষিণাপথে মারাঠা জাতি সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আট শত বৎসরের পর হিন্দু আবার নিজেকে মহীয়ান্ করেছে, আবার গরীয়ান্ হয়েছে। হিন্দুস্থানে হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে, তার সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে—সব উদ্‌যোগ আয়োজন ঠিক হয়েছে। এমন সময়, হিন্দুর জাতীয় জীবনের এই সন্ধিস্থানে সুদূর পশ্চিম থেকে সাত সমুদ্র পার হ'য়ে এক নূতন জাতি এক অভিনব সভ্যতা নিয়ে ভারতবাসীর সম্মুখীন হ'ল। তার ফলাফলের কথা এবং হিন্দুজাতি কি বৈশিষ্ট্যের বলে ঐ রকমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল, সে কথা আমরা আগামী বারে আলোচনা করব।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

মতের বদল।

বন্ধুরা সকলে আমার স্ত্রীজাতি-বিদ্বেষী বলে ঠাট্টা করতেন। আমার কাব্য-প্রিয়তার সঙ্গেই কি করে এই অপবাদটা তাঁরা মিলিয়ে নিতেন আমার জানা ছিল না—হয়ত আমি হতাশ-প্রেমিকদের কোটায় পড়েছিলেম্। এক ডজন রসনার কাছে আমার একটি কোন কাজে লাগবে না জেনেই চুপ করে থাকতেম, নইলে ভাষার অকুলান আমার হত না।

একদিন আমাদের বেড়াবার জায়গাটিতে যেয়ে দেখি বন্ধু হাঁ-ব্যতীত বাকী সকলেই গরহাজির। বন্ধু বললেন, আর দাঁড়ানো নয়, এগোনো যাক্। দু'জনে নদীর ধারের পথ ধরলেম।

ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছে একটা বেঞ্চের উপর বসা গেল। সুমুখে বিস্তৃত নদী, বাতাসে ছোট ছোট ঢেউগুলো জড়াজড়ি করে বেড়াচ্ছে, গড়িয়ে এসে বাঁধা ঘাটের সিঁড়ির উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে। দু'জনেই সুমুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেম।

হঠাৎ বন্ধু আমার দিকে চেয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে বলে উঠলেন—"দেখ, আমি যা বলছি সেটা নিছক অনাবশ্যক কৌতূহলের কথা নয়। সংসারে লোকে যাকে দুঃখ কষ্ট বলে সেগুলো এমনতর কিছু প্রচুর পরিমাণে তোমার কাঁধে চাপেনি যাতে করে তোমার এই বিচিত্র ব্যবহারের সমর্থন করা যায়। এর গোড়ায় কিছু সত্য যদি থাকে সেইটেই আমি জানতে চাই, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে শুধু খেয়ালের উপর ভর করে কারো জীবন কাটে না।"

বন্ধুর কথা শুনে আমি চুপ করে রইলেম। দেখি আমার চিরদিনের স্বচ্ছ চিন্তার ধারা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। কবেকার ভুলে যাওয়া একটা ব্যথা আবার মাথা তুলে জেগেছে, অব্যক্ত বেদনায় সকল মন বিকল করে দিয়েছে।

বন্ধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। একটু থেমে আমি বলতে সুরু করলেম—

"সে অনেকদিনের কথা। ধাড়ী বয়েস পর্য্যন্ত গাঁয়ের পাঠশালাতেই আমি পড়তেম, নানা রকমে পণ্ডিত ও পড়ুয়াদের ত্যক্ত করে মার খেতেম। দুষ্ট ছেলের যতগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন সবই আমার ছিল, আর বেশীর ভাগ ছিল, স্পষ্টবাদিতা। বোধ হয় সেইটেই আমার বেশী শাস্তি ভোগের কারণ হয়েছিল।

একদিন সকাল বেলা দেখি আমাদের পাশের বাড়ীতে নূতন লোকের আমদানী হয়েছে। তাদের মধ্যে ছিল একটি মেয়ে, বোধ হয় সাত আট বছর বয়েস হবে। ইতিহাসে লেখে দুষ্ট ছেলেরা শীঘ্র প্রেমে পড়ে না। আমি হয়ত প্রেমে পড়েছিলুম না, কিন্তু বেছে বেছে ঐ মেয়েটাকে ত্যক্ত করাই আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল।

ছোট, পাতলা, ফরসা সেই মেয়েটি—মুখখানি অতিভাবুক লোকের মত পরম গম্ভীর করে বেড়াত, যেন তার ভাবনার আর অন্ত নেই। সুবিধেমত পেলেই আমি ঠাস করে একচড় তার গালের ওপর কসিয়ে দিতেম। তার প্রতিশোধ নিত সে আমার মায়ের কাছে বসে অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মুখ ভেঙ্গাইয়ে।

ছুটির দিন দুপুরে যখন আমি লাটাই তৈয়ার করতে ব্যস্ত থাকতেম, দেখতেম সে ছাদে উঠে হাত তুলে নাচছে! খুবজোরে আমি হেসে উঠতেই আমার দিকে ফিরে মুখ ভেঙচানো সুরু করত। কখন কখন ছাদের উপর শুকুতে দে'য়া একরাশ সুপারী থেকে একটা তুলে নিয়ে ফট্ করে আমার দিকে ছুঁড়ত। রেগে গিয়ে আমি আমার অস্ত্র তীর ধনুক আন্‌তেম একদিন [redacted]র অব্যর্থ লক্ষ্যে তার শিক্ষে হয়েছিল—সেই থেকে ঐ মহাস্ত্র দেখলেই নাচ ছেড়ে সে দুপদাপ করে নেমে যেত।

এর পর কিছু দিন বাদে আমার দুষ্টামী অসহ্য হওয়াতে সহরের স্কুলে আমার চালান হল। যাবার দিনটিতে মেয়েটির সাথে ভাব করতে গেলাম। "শোন লক্ষ্মীটি" বলে কথা সুরু করতেই সে হেসে অস্থির হয়ে সকলের সুমুখেই নাচ জুড়ে দিল। অপ্রস্তুত হয়ে রাগকরে, তার পিঠে এক কিল বসিয়ে দিয়ে আমি ফিরে এলেম। শুনলেম সে চীৎকার করে "বাঁদর" "লক্ষীছাড়া" ইত্যাদি বিশেষণে অনুপস্থিত আমাকে আপ্যায়িত করবার চেষ্টা করছে।

তারপর বছর চার কেটে গিয়েছে। বাংলায় তখন স্বদেশীর মরসুম। সমস্ত দেশে একটা নূতন হাওয়া সজোরে বইছে। বিশেষ কিছু না বুঝলেও "ভাই ভাই একঠাঁই" ও "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" ইত্যাদি বুলি অনুক্ষণ আমাদের মুখে ছিল। বিশেষ করে ছিল শাদা মুখকে উচ্চ কণ্ঠে গালি দেওয়া, কারণ অন্তরে অনেকেই তাকে ভয় করে চলত এবং হয়ত এখনও চলে। রাতারাতি আমরা তখন যোদ্ধা হ'তে ব্যস্ত—খেলার আড্ডায় লাঠিখেলে ও বাড়ী বাড়ী মুষ্টি ভিক্ষে করে ইংরেজকে জব্দ করবার ফন্দী আঁটতেম। সারাদিন স্বদেশ উদ্ধারে ব্যস্ত থেকেও আমার ভাবোচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়ত না। রাত্রে ঘরের দোর এঁটে কালিকলমের সাহায্যে যথেচ্ছমনে ইংরেজ নিপাত করতেম। কি করে সপ্ত কোটির জায়গায় তেত্রিশ কোটি কণ্ঠের কলস্বরে ইংরেজ রাজলাঞ্ছন গুটিয়ে দেশে পালাবে, ইংলিস চ্যানেল অদ্ভুদ উপায়ে লাল হয়ে যাবে, এ সব যেন প্রত্যক্ষে দেখে লিখে যেতেম।

আমার দাদা ছিলেন সরকারী চাকর, দাস মনোভাবের জীবন্ত মূর্ত্তি। তাঁর মাইনে ছিল কিছু মোটা, আর সেই অনুপাতে সোয়াস্তি ছিল খুব কম। কাঁগজের গালি, ছেলেদের টিট্‌কারী, ও উপরওয়ালার ধমক সব তিনি অম্লানবদনে সহ্য করতেন; কারণ তিনি বুঝতেন যে আমাদের সাংসারিক কাজে মুখের কথার চেয়ে রূপো অনেক সারবান্ ও টেঁকসই পদার্থ। দেশের পেট্রিয়টিজমের উচ্ছ্বাস তিনি কাজে লাগাতে জান্‌তেন, কিন্তু স্পষ্টই টের পেতেম আমার স্বদেশপ্রেমের আতিশয্য তাঁকে ত্রস্ত ক'রে তুল্‌ত। একদিন বেরিয়ে এসে দেখি আমার সেল্‌ফের কোণ থেকে টেনে বের করা ইংরেজ রক্তে লাল সেই খাতাখানা আগুনে

পুড়ে কালো হচ্ছে এবং সর্ব্বসাধারণজানিত কিন্তু অপ্রত্যাশিত উপায়ে আমার দু'টি কাণই লাল হ'য়ে গেল।

ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে স্বদেশী চর্চ্চা ছেড়ে দিলেম। গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ অবলম্বনের সময় তখন নয়। ছেলে না গেলেও মনে বৈরাগ্যের উদয় হ'ল। কিন্তু অত্যন্ত দুরদৃষ্টবশতঃই হবে, ধর্ম্মচর্চ্চায় মন না গিয়ে সাহিত্যচর্চ্চার দিকে ছুটল। কাব্যরসের আস্বাদ আমার কাছে মনে হ'ল খুব পান্সে। মেয়েরা যেমন ক, খ, ছেড়েই উপন্যাস পাঠিকা হ'য়ে বঙ্গসরস্বতীর পশার অক্ষুণ্ণ রাখেন আমি তেমনি ডবল প্রমোশন নিলেম। বাড়ীর সব চেয়ে ছোট মেয়েটিকে রোহিণী সাজিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বল্‌তেম,—"রোহিণী, তুমি আমার কে?" রোহিণী হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌ত বটে, আমি তার হ'য়ে তখনই সুর নাবিয়ে করুণ কণ্ঠে জবাব দিতেম, "যতদিন পায়ে রাখ ইত্যাদি"। সব চেয়ে আমার মনে লাগত রাধারাণীর চমৎকার কোর্টশিপ মনে মনে ভাবতেম দেবেন্দ্রনাথের মত তাকমত হীরের হার পরে যাওয়া আমার অদৃষ্টে নেই, কিন্তু রাধারাণীর সাক্ষাৎ পেলে হয়ত ফুলের মালাতেও কার্য্যসিদ্ধি হ'তে পারে।

পূজোর ছুটিতে বাড়ী এলেম। সদ্য স্বদেশ-উদ্ধার রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে পোষাকের বাহার আমার খুবই বেড়ে গিছিল। বাড়ীর মেয়েরা আমার চুলের পারিপাট্য সাধনে অধ্যবসায় দেখে চমৎকৃত হ'য়ে যেতেন। বাবা বোধ হয় ভাবতেন, তাঁর টাকাগুলো সার্থক খরচ হচ্ছে, কারণ মুখে কিছুই তিনি বল্‌তেন না।

পূজার ক'দিন কাজকর্ম্মেই সকাল বিকেল কেটে যেত। আরতির বেলায় মেয়েরা ভিড় ক'রে বস্‌তেন, একদিন নজরে পড়ল এ দলের মধ্যে একটি নূতন মূর্ত্তি।

অতি সুন্দর, তরুণ, আনন্দ-উজ্জ্বল কান্তি সে মেয়েটি উৎসুক নয়নে দেবীপ্রতিমা দেখছে। কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ চেয়ে থেকে চিন্‌লেম এটি আমার সেই সাবেককালের ভালবাসার পাত্রী।

সরল হাসিমাখা মুখখানি, আগ্রহ-চঞ্চল দু'টি চোখ, স্বাস্থ্যদীপ্ত লাল দু'টী গাল, উজ্জ্বল বর্ণ, বাল্যের চাঞ্চল্য ও কৈশোরের নূতন সলজ্জ ভাব, এ সবগুলো মিলে এমন অপূর্ব্ব রূপ সৃষ্টি ক'রেছে যা বিদ্যুতের মত আমার মনের আকাশে চম্‌কে গেল। ভাবলেম, তাইত কল্পনার চেয়ে বাস্তব কত বেশী সুন্দর।

আরতির বাদ্য কোলাহল তখন থেমে গিয়েছে। ধূপধূনোর জমাট মেঘ কেটে গিয়ে দেবী-প্রতিমার উজ্জ্বল সজ্জা চিক্ চিক্ ক'রে ফুটে উঠছে। সমাগত দর্শনার্থীর দল প্রণাম ক'রে বিদায় হচ্ছে। আমার চোখ দু'টী পলকবিহীন হ'য়ে সেই সুন্দরী তরুণী মূর্ত্তির উপর আবদ্ধ। ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেম। হঠাৎ টের পেলেম একজোড়া চোখের উজ্জ্বল সকৌতুক দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে। চোখ ফিরুতেই দেখি তার পাতলা ঠোঁট দু'খানিতে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে, ছোট্ট কপালটুকু সে হাসির ছাট লেগে দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। তারপর তার নীল শাড়ীর আঁচল দুলিয়ে বাড়ীর আর সকলের সাথে সে বেরিয়ে গেল।

শরতের স্বচ্ছ আকাশে চাঁদের আলো সে রাতে আরও উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিল,—স্বপ্ন-রাজ্যের পরীরা সকলেই নীল আঁচল দুলিয়ে হেসে হেসে ছুটে বেড়াল।

আমার সকল বিষয়ে মতী ছিলেন মা। বিজয়ার দিন বিসর্জনের বাস্ত থেমে যাবার পর বাড়ীতে বাড়ীতে নমস্কার কোলাকুলির পালা যখন শেষ হয়ে এল, মায়ের কাছে ছোট ছেলেটির মত বসে আমার আব্দার জানাচ্ছি। আমার অশ্রুতপূর্ব্ব বায়না শুনে মা হেসে বললেন,—"তাকি হয় বাবা, ওরা যে বড় গরীব"। রেগে আমি বললেম, "তা হোক গিয়ে"। এমন সময় কলহাস্যের সাথে নীল আঁচল দুলিয়ে সে মেয়েটি এসে ধুপ্ করে মার সুমুখে মাথা ঠুকল। মা হেসে উঠে বললেন, "এই যে কনে আপনি এসে হাজির"। লজ্জায় তার মুখ রাঙ্গিয়ে উঠল।

চট্‌করে ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেম নমস্কার শেষ করে সে বাড়ী ফিরছে। আমাদের দোর পার হতেই একবার ফিরে চাইল—মুখে তার উচ্ছ্বসিত হাসি। বোধ হয় আমার দিকে নজর পড়েছিল, কারণ মনে হ'ল পামকা সে এক পাক নেচে নিল: তারপর দোর পার হয়ে ছুটে পালাল।

মনে অনেকখানি বৈরাগ্য নিয়ে কলকাতা পড়তে গেলেম। কিন্তু মাস চারেক কলকাতার মেসের ভাত খেতেই "চোখ মুখ ফুটল"। পোষাকের যা ত্রুটি ছিল, অর্থাৎ চোখে চশমা, হাতে রিষ্ট ওয়াচ ও পকেটে সিগারেট কেস—সব সেরে গেল। মেসের বিজ্ঞ বন্ধুরা বলতেন আমার ওড়ার অল্পই বিলম্ব আছে—যদিচ সকাল বেলা চায়ের সময়টিতে তাঁরা আমার ঘরে পদধূলি দিয়ে আমার চা বিস্কুট ও সিগারেট ওড়াবার যথাশক্তি সাহায্যই করতেন।

সকালে আটটায় ঘুম ভেঙ্গে যখন দেখতেম ঘরের অপর লোকটি অত্যন্ত অধ্যয়নশীলের মতই পাঠে রত, তখন উচ্চ চীৎকারে সঙ্গীত ও চায়ের জলের হাঁকডাকে তার পাঠ ভঙ্গ করা; কাগজওয়ালার আবির্ভাব মাত্রই ছটকা করে পলিটিকস আলোচনা; স্নানের বেলায় কুক্কার বন্ধুগণের সাবান চর্চ্চায় অনুরক্তি ও জলের চৌবাচ্চা নিঃশেষ করবার মত স্বার্থপরতার উপর কটাক্ষ ও বিদ্রুপ; আহার কালে বামুনঠাকুরের উপর তর্জন গর্জন, মেস জীবনের উপর বৈরাগ্যজ্ঞাপন ও বন্ধুকে চপ কাটলেটের লোভ দেখিয়ে 'পারমোস' দানে রাজি করানো; তারপর কলেজের হৈ চৈ ও বিশ্বের যাবতীয় খবরের আলোচনা; বিকেলে রং বেরংয়ের জলযোগ পর্ব্ব, গোলদীঘিতে লেকচার শোনা ও ঠেলাঠেলি করে বেড়ানো; সন্ধ্যায় চা পান ও আনুসঙ্গিক কাব্য ও মধুর রসের চর্চ্চা, বায়স্কোপ বা থিয়েটর পালানো—এই রকম ব্যাপারের ভেতর দিয়ে নিত্যকার জীবন কেটে যেত।

কিন্তু বা'র থেকে এই জীবনটাকে দেখে যে যা ভাবুক এর ভেতর থেকে যে রস আমরা পেতেম সেটা দিয়ে অনেকেরই মুখরোচক একটা চমৎকার সাহিত্য লেখা যায়। অতগুলো তরুণ নব প্রাণের একত্র সমাবেশে যে রসের সৃষ্টি হ'ত সেটা নিছক করুণ, বীভৎস বা রৌদ্র রস যে নয় তা হলপ করে বলা যায়।

মেসে আমার ঘরে সন্ধ্যার পর যে আড্ডা বসত আমরা ঠাট্টা করে তার নাম রেখেছিলেম,

Dumb Men's Society অর্থাৎ বোবার সভা। ঘরের অপর সহপাঠিটি রাগ করে বলতেন Pillars of the Society, আর মেসের রসিক সুপারিটেণ্ডেণ্ট বলতেন চীৎকার-কারিণী সভা। রাত বারটার পরও যখন সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সকল রকম সমস্যার মীমাংসা আমরা শুধু গলার জোরেই করবার চেষ্টা করতেম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশায় যখন নোটিশ দিয়ে, অনুযোগ করে, মিনতি করেও Dumb Menদের অতখানি গলার জোরের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারতেন না, তখন অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে একদিন তিনি দোতালায় নেমে গেলেন,—আর আমাদের সভার নামের সঙ্গে একটি বিশেষণ জুড়ে দিয়ে গেলেন। সেই থেকে আমাদের চীৎকার কারিণী সভা হ'ল ভীষণ চীৎকার-কারিণীসভা।

ষোল বছর না পেরুতেই রাজনীতি ও সাহিত্য চর্চ্চার মত দুইটি গুরুতর বিষয়ে আমি হাত দিয়েছিলেম। রাজনৈতিক চর্চ্চার ফল হয়েছিল যা আমাদের যুগে হ'য়ে থাকে,—আর সাহিত্য চর্চ্চার ফল হয়েছিল বোধ হয় মানসিক উৎকর্ষ বা বাক্যবৈদগ্ধ। মেসের বন্ধুরা আমার মানসিক উৎকর্ষের সত্যতা সম্বন্ধে বোধ করি কোন সন্দেহ পোষণ করতেন না; তবে রাজনীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার চূড়ান্ত মন্তব্য গুলোর ঝাঁঝ অনেকের গায়ে বাজত। বোধ হয় ঠিক এই জন্য বোবার সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমি হলেম সামাজিক সমস্যার মীমাংসক।

দুপুর রাতে গাড়ী ঘোড়ার শব্দ থেমে যাবার পরেও অপর্য্যাপ্ত সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে আমরা সমাজের কোন্ কোন্ সমস্যার মীমাংসা করতেম এখন তা বলা নিষ্প্রয়োজন। মনে পড়ে রাজনীতিতে আমার মতগুলো খুব ডিমোক্রাটি, এমন কি রিপাব্লিকান ছিল এবং যে ভাষায় সে মতগুলো ব্যক্ত করা হ'ত তার প্রতিবাদ আমার বন্ধুরা শুধু যুক্তি দ্বারা করতে পারতেন না। কিন্তু সমাজ বিষয়ে আমার রক্ষণশীলতা দেখে তাঁরা অবাক্ হয়ে যেতেন। বৈদ্যুতিক আলোকের সাথে পবিত্র হোমাগ্নি আলোকের তুলনাটা আমার বাঁধা ছিল। প্রাচীন আর্য্য গৌরব রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেম এবং কেহ আক্রমণ করলে শুধু একাল ও সেকালের তুলনার সংখ্যাধিক্যেই তাকে নির্ব্বাক করে দিতেম।

অন্যান্য সমস্যার মধ্যে বিধবাবিবাহটা আমার বিশেষ আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি বলতেম, সংসারে দুঃখের অন্ত নেই, তার মধ্যে যে গুলো আমরা নিজেরা সৃষ্টি করি তার জন্য কোন অজুহাত ত দেওয়া চলে না। মানুষ মরবার জন্যই হয়েছে; এ অবস্থায় একজন গেলে আর একজনের চলবে না এ কি রকম কথা? সুখ হ'ল না,—কি করা যাবে? যতটুকু পার নিশ্চিন্ত হয়ে কাটিয়ে দাও—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—ইত্যাদি।

কতদিন কলেজ ছেড়েছি। ছাত্র জীবন এখন অতীতের কথা, তার নিত্যকার ইতিহাস একখানা উজ্জ্বল, সুন্দর চিত্রের মত মনের মাঝে আঁকা রয়েছে। কি উৎসাহময়, উদ্দাম, অস্থির সে প্রাণের গতি! কোন্ যাদু মন্ত্রে আজ সে এত স্থির, ধীর হয়ে উঠেছে?

কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা কিছু করবার জন্য তাড়া না থাকায় প্রবল উৎসাহে কিছুদিন ছুটে বেড়ান গেল। লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের এ দেশটায় প্রাণের বৈচিত্র্যের অভাব যতই থাক প্রকৃতি তার বৈচিত্র্যশালী অনন্ত ঐশ্বর্য্যের দোর খুলে দিতে কিছুমাত্র কৃপণতা করেনি। মানুষের সাথে কথা কয়ে যখন হাঁপিয়ে উঠতেম, তার একঘেয়ে প্রাণের গতি ও সুর যখন মনকে ক্লিষ্ট করে ফেলত, তখন অচেতন বলে যে সব বস্তুকে আমরা উপেক্ষা করে থাকি তাদের দিকে চোখ ফেরাতেম,—এমন সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল, বিচিত্র রূপ বুঝি আর কোথাও নেই! নিজের মনের চোখ দিয়ে যারা প্রকৃতিকে দেখে আমি তাদের দলে ছিলেম না। আপনাকে সরিয়ে রেখে আমি তার সুমুখে দাঁড়াতেম, যাতে কার বিনা বাধায় তার চেহারা আমার মনের উপর ছায়াপাত করতে পারে।

এমনি করে দিন যায়। বন্ধনমুক্ত হরিণের মত ছুটে ছুটে মনের কোনে কি জিনিষ যে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল তার খোঁজ আর রাখতে সময় পাইনি।

ফাল্গুনের এক নীরব সন্ধ্যায় বসে বসে যখন সমুদ্রের গম্ভীর তরঙ্গ-আক্ষেপ শুনছি, কিসের অভাব যেন হঠাৎ মনকে আকুল করে তুলল। আশ্চর্য্য হয়ে গেলেম নিজের কাণ্ড দেখে! কিসের ব্যথা এ? অনেক বসে ভাবলেম কি চাইছে এ। হায়, ভাবের স্বর্ণপাত্র পূরে নিয়েও মানুষ সুখী হয় না, তাকে বুঝি সুদ শুদ্ধ ফের সেটা লোকের কাছে উজাড় করে ঢেলে দিতে হয়! নদী যখন কানায় কানায় পূরে ওঠে তখন তাকে বেরোবার পথ দিতেই হবে, নইলে সে দু'কূল ছাপিয়ে উঠে আপনাকে পাগলের মত ছেড়ে দেয়।

মনের এ পাগলামী দিন দিন বেড়েই চলল। অন্তরে আমি চিরদিন শান্তি প্রিয়—এ অসোয়াস্তি ও ব্যাকুলতা আমাকে ত্রস্ত করে তুলল। একদিন অভ্যাসমত সকালে বেড়াতে বের হয়ে টের পেলেম মন যেন হালকা হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে পড়ল সে দিনকার ভোরের কথা।

আকাশে সূর্য্য তখন ওঠেনি, পূর্ব্ব আকাশ কেবল লাল হয়ে উঠেছে। শাদা বালির বিস্তৃত মাঠ তারি ওপর সমুদ্রের নীল জল ঢেলে এসে পড়ছে। সুমুখের অনন্ত-প্রসারিত নীল জলের দিকে চেয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি, হাওয়ায় গায়ের চাদর ও মাথার চুল বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠছে। জানতেম আমার মত দুই একটি বেকার লোক ছাড়া এসময় কেউ এদিকে আসে না, পিছনে গলার আওয়াজ শুনে ফিরে চাইলেম।

আমার বয়সেরই একটি সাহেবী পোষাকপরা যুবক একটি মেয়ের সাথে কথা কইতে কইতে আসছে, পশ্চাতে গুটিকয় ছেলে মেয়ে সোল্লাসে চীৎকার করে ছুটছে।

আমাকে ঐ অবস্থায় একা দাঁড়িয়ে দেখে যুবক ও তার সাথীটি একবার চেয়ে দেখে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। ছেলেদের দল কিছুক্ষণ চাঁ করে চেয়ে থেকে আবার কলকণ্ঠে ছুটল।

এটুকু সময়ের মধ্যে ভাল করে লক্ষ্য করবার কিছু অবসর ছিল না, শুধু নজরে পড়েছিল মেয়েটির স্থির উজ্জ্বল চোখের গভীর পূর্ণ দৃষ্টি, তার মুখে কিসের প্রশান্ত তৃপ্তির আভাস, আর যুবকটির চঞ্চল আগ্রহ ও বিজয় গর্ব্ব। কোন্ আনন্দের সন্ধান পেয়ে তার মুখে ঐ দীপ্তি ফুটে উঠেছে আমি তাই ভাবছিলেম। এতক্ষণ পরে আমার অন্তরের অজানা অভাব যেন মূর্ত্তিমান হয়ে উঠল, মনে ভাবলেম ঠিক কথা মানুষের অভাব বোধ করি মানুষ ছাড়া দেবতাও মিটাতে পারে না। এতদিন ধরে তবে এই অভাবই কেবল সঞ্চয় করে আসছিলেম?

এমনি ধারা এলোমেলো ভাবনায় যখন ব্যস্ত, হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই মেয়েটির কথা, যাকে ছেলেবেলায় আমি বে করতে চেয়েছিলেম। ভাবলেম, এখন সে কত বড় হয়েছে? দেখতে কেমন হয়েছে? কেমন লোকের সাথে বে হয়েছে? তারপর মনে হ'ল তার সেই নাচবার অভ্যাসের কথা। হেসে আপন মনে বললেম অমন দুষ্ট, চঞ্চল মেয়েটি সে এবারে বোধ হয় ছেলের মা হয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে। অত সুন্দর, সরল, সানন্দিতা সে বোধ করি বেশ সুখেই আছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু জানবার কৌতূহল হল—আমার তখন সে কি ভাবত। মোটের উপর তার সম্বন্ধে মনের বাস্তবতা দেখে জানলেম, পাঁচ বছর আগেকার সেই নীল শাড়ীপরা লাস্যময়ী চঞ্চল মেয়েটি কোন অদৃশ্য কোণে একটু চিহ্ন রেখে গিয়েছিল।

আপনার মন নিয়েই নাড়াচাড়া করতে ব্যস্ত তখন আমি ভাবিনি যে সংসারে আর কেউ আমার কথা ভাবে। দেখলেম তা নয়, দু'একজন ভাবে এবং অনেকটা অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক রকমও ভাবে—প্রমাণ নীচের চিঠি,—

প্রিয় ——

আজ বছর খানেক তুমি বাড়ী ছেড়েছ, এখনও ফেরবার নাম করনা। তোমার বাড়ীর সবাই ও আমরা বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছি,—তোমার এই অদ্ভুত, সৃষ্টি ছাড়া ব্যবহার দেখে। কিসের অভাব তোমাকে এমন গৃহছাড়া ক'রে এখানে সেখানে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে আমরা বহু গবেষণা ক'রে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। আরও সুখের খবর এই যে শুধু আবিষ্কার করেই আমরা ক্ষান্ত হইনি, সেটা যথাসাধ্য কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

যে মেয়েটি তোমার জন্য আমরা পছন্দ করে রেখেছি তাকে দেখে তোমার বৈরাগ্য-নেশা যে ছুটে যাবে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহই নেই। আমাদের অনুরোধ শীঘ্র তুমি চলে আসবে। ইতি—

তোমার বন্ধু—

বন্ধুর অনুরোধ মেনে নিয়ে, মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করে বাড়ী মুখে রওনা হলেম।

অনেক কাল পরে বাড়ী এসেছি, নিজের গৃহ হলেও আদর যত্নটা অতিরিক্ত পরিমাণে ভোগ করা হচ্ছে। আশ্চর্য্য হলেম যে কোন অবসরে সমস্ত মনজোড়া চিন্তার মেঘ কেটে গিয়ে কোথায় যেন ঈষৎ অরুণ বরণ ফুটে উঠেছে। এতক্ষণ নজরে পড়েনি, চেয়ে দেখলাম,

এরও মনের নয় প্রকৃতির দেহের। ভাবলেম মানুষ হয়েছি তাই, গাছ হলে যে এ রং দেহেও লেগে যেত।

মা বললেন, "বাবা এবারে একটী বিয়ে কর, আমি দেখে মরি।"

আমি বললেম, "মরবার কিছু প্রয়োজন নেই, তবে বিয়ে যদি বল করি।"

"বেঁচে থাক্ আমায় নিশ্চিন্তি করলি বাবা।"

বাবা বললেন; "আমি নিজে মেয়ে দেখেছি, বেশ সুন্দর; লেখা পড়া জানে; দেখে শোনে ভাল; তুমি কাল গিয়ে দেখে এস।"

বন্ধু বললেন, "চলতে পাঁচার পাপীটিকে দেখে আসা যাক্। আমার দেখা একবার হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রে আছে সুন্দর জিনিষ পুনর্দর্শনে ন দোষায়"—

বন্ধুর শাস্ত্রজ্ঞান ও তার ব্যবহার ঠিক আমাদের পাঁচজনের মতই, কাজেই—তাঁর প্রস্তাবে চট্ করে রাজি হলেম।

কন্যাকর্ত্তার অত্যধিক বিনয় ও অভ্যর্থনার আড়ম্বর, বাড়ীর সকলের সকৌতুক দৃষ্টিপাত, মেয়েদের লুকোচুরি, বাইরে পাড়ার বুড়োদের অসহ্য ভদ্রতা—সব সহ্য করে কনে দেখা হ'ল, —অর্থাৎ বন্ধু দেখলেন।

সাক্ষীগোপালের মত—বসে থেকে, আপাদমস্তকসজ্জিতা, নতনয়না সুন্দরী মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে বন্ধুর ইঙ্গিত মত উঠে পড়তেই, হঠাৎ কিসের আকর্ষণে চকল চোখ পাশের কক্ষের দিকে চেয়ে অপ্রত্যাশিত কঠোর আঘাত পেয়ে ফিরে এল।

এই কি সেই আমার ছেলে বেলার ভালবাসার পাত্রী? সারা পৃথিবীর গায়ে চোখের পলকে উদাস গোধূলি রং তুলিয়ে দিল কে? সে কি তার দুটি চোখের ঐ দৃষ্টি?

মাথায় সে অনেক খানি চ্যাঙ্গা হয়েছে; কুণ্ঠিত যৌবনভার পরিপূর্ণ দেহখানি কিসের আক্ষেপে যেন আপনার গতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছে। দেহের উজ্জ্বল বর্ণ কাপড়ের প্রাণ-হীন শাদা রঙের সাথে যেন সঙ্কোচে মিশিয়ে যেতে চাইছে।

কিছুক্ষণ নিঃসাড়, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম; ঝড়ের বেগে কি একটা ভাব মনে ঢুকে পড়ে, ভেতরটা একেবারে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যেখানে যা সাজানো গোছানো ছিল ওলট পালট করে দিয়ে, আগাগোড়া হালকা, ফাঁকা করে দিয়ে গেল।

কি মর্ম্মস্পর্শী, করুণ সে দৃষ্টি! মানুষের হাজার প্রতিকারহীন অব্যক্ত বেদনার নালিশ শুধু সেই দু'টী আনত চোখের দৃষ্টিতেই যেন ফুটে উঠেছে!

মনে হাসি পেল আমি এককালে—বিধবা বিবাহ নিয়ে বিস্তর তর্কজাল রচনা করতেম; সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে টেবিল চাপড়িয়ে আমার মতই সুধাদ্বেষী বন্ধুদের মুখবন্ধ করতে। বিচারকের উচ্চ আসন নিতে চক্ষুলজ্জা আমাদের কোন কালেই হয় না, কিন্তু ফিরে একবার দেখবার অবসর কারো থাকে না যে দুঃখের ভার বোঝাটা কোন্ দুর্ভাগ্যের ঘাড়ে চেপে যাওয়ার মাঝে তাকে একেবারে গুইয়ে দিয়েছে।

তারপর সেখান থেকে চলে এলেম। আমার প্রথম ভালবাসার পাত্রীকে সেই শেষ দেখা দেখি। বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে মত বদ্‌লেছে, কিন্তু মুখে বলতে সাহস নেই।"

বন্ধু আমার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে চাইলেন—

হঠাৎ সঙ্গীত ধ্বনি কানে এল। সুমুখে চেয়ে দেখি চাঁদের আলোতে নদীবক্ষ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; সৌখীন আমোদকারীর দল নৌকার ছাদে বসে, গান গেয়ে চীৎকার করে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে।

তারপর এগিয়ে যেতেই নগরের তখনও সচল জনসঙ্ঘের মাঝে আপনাদের হারিয়ে ফেললাম।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

ব্যাঘ্র কুম্ভীর সংবাদ।

দাঁতগুলো ইস দৈত্যের মত
ভয় লাগে বাবা হাঁ দেখে,
কোঁস করে ওই রোষ ভরে চায়
ওটা কে আবার বাঁ দিকে!

(২)

মেছো কুম্ভীর গেছো বাঘ নয়
পলাবার আর শক্তি কি
আস্ত মহিষ শেষ গিলে খায়
যা হবার আজ হ'ক দেখি।

(৩)

দুই দিকে দুই আগ্নেয় গিরি
ধোঁয়াইছে যেন গুমরিয়ে
বক্ষ সরোজ বরজের মাঝে
পাপ হয়ে যায় ঘুমরিয়ে।

(৪)

অভয় দ্র দুটো উদর পূরণ
করিতে পারি কি এই বেশে
ভবল ডাগর সাগরের মাঝে
পানামা যোজক হই শেষে

)

কহি কুলিশ পথ ছেড়ে দিস্
কেনরে ভীতির ঢেউ তুলিস
করাল কাইলা কারিব ডিমের
মধ্যে যে মনো ইউলিসিস্

(৬)

ধরা না হলেও ত্রোণ হওয়া যাবে
ছাড়ে নাক এই পাপ বুঝি
কেষ্ট পাইয়ে করে দেয় মোরে
জোরে কৃষ্ণের বাপ বুঝি।

)

হেলা শ্রদ্ধায় কৃষ্ণ নামের
ফল কোথা যাবে বুঝছো হে
ভীম বিভীষিকা কোথায় লুকানো
জোড়া জানোয়ার উহু হে।

(৮)

রঙ করা দুটা মাটীর পুতুল
ছি ছি এতক্ষণ পাইনি টের,
ভ্রান্তি ঘটালে 'কান্তির' ছবি
বারোয়ারি এটা দাঁই হাটের।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সম্পাদকের দরবার।

পরম মাননীয়া —

শ্রীযুক্তা ভারতী সম্পাদিকা মহাশয়া

বরাবরেষু—

আপনার দরবারে আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সমাধানের জন্য উপস্থিত করিতেছি, সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া উপকৃত করিবেন।

রাজনীতি বা পলীটিক্স কাহাকে বলে?

রাজনীতি ও স্বদেশ প্রেমের প্রভেদ কি?

স্বদেশ প্রেমের কার্য্য কূটনীতিবাতীতও হইতে পারে কিনা?

৪। রাজনীতি বা পলিটিক্সে কূটনীতি অপরিহার্য্য কিনা?

৫। ইংরেজী-জন প্রবাদে যে বলে politics is a dirty game অর্থাৎ 'পলিটিক্স একটি নোংরা খেলা' সেই স্বভাব-মলিন পলিটিক্সকে শোধন করা বা পলিটিক্সের খেলা খেলিতে গিয়া নিজে শুদ্ধ সাত্বিক থাকা সম্ভব কিনা?

৬। যথার্থ সাত্বিক ব্যক্তির পলিটিক্সে লিপ্ত থাকার রুচি হইতে পারে কিনা?

৭। পলিটিক্স খেলার নেশায় মত্ত হইলে লীডারদিগের জন্য অন্ততঃ অহমহমিকা, আত্মম্ভরিতা স্বতঃ পরতঃ আত্মঘোষণা ও রিসেপশন এড্রেসাদির দ্বারা আত্মবন্দনা গ্রহণেচ্ছার ঘোর রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি সকল নানা ছদ্মবেশে বৃদ্ধি হয় ও প্রশ্রয় পায় কিনা? স্বমতবাদীর সংকার ও স্তুতি ঘোষণা এবং স্বমতবিরোধীর লাঞ্ছনা বা অনাদর রূপ বৈষম্য, পদস্থ থাকার জন্য কথনো বা আত্মমতের ঘাত প্রভৃতি নানা অসাত্বিকতার গভীর কর্দ্দমে পতিত হইতে হয় কিনা?

৮। তথা কথিত "সাত্বিক রাজনীতির" ধুয়ায় সাত্বিকতা শুদ্ধতা বা ধার্ম্মিকতার খাঁটি আদর্শকে বিকৃত করা হয় কিনা? ইতি—

ভবদীয়, বিনীত দরবারী

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতীর দরবারে উপস্থিত উল্লিখিত প্রশ্ন গুলির উত্তরের জন্য পাঠক সাধারণকে আমন্ত্রিত করা যাইতেছে। বাছা বাছা উত্তর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

পাঠকগণ প্রতিমাসে নূতন নূতন প্রশ্ন দরবারে উপস্থিত করিতে পারেন।

ভাঃ সং।

বাঙ্গলার চাষী

(১)

বাঙ্গলার জাতীয় সাহিত্যের স্রষ্টা, বঙ্গবাণীর অমর-সেবক, সার্থক জীবন, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বাঙ্গলার অপূর্ব্ব শোভায় বিমুগ্ধ চিত্তে গাহিয়াছিলেন,—"সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ শীতলাং, সস্যশ্যামলাং মাতরং বন্দেমাতরম্!" সে আজ অনেক দিনের কথা। তখনও দেশে টাকায় এক মণ চাউল বিকাইত। দেশের তাঁত দেশের বস্ত্র যোগাইত। তখনও দেশের লোককে জীবন ধারণের ও লজ্জা নিবারণের জন্য বিদেশের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দাঁড়াইতে হয় নাই।

তারপরে বাঙ্গলার সাহিত্য-জীবনের কৈশোরে, বাঙ্গলার স্বজাতি-প্রেমী প্রাণবন্ত কবি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালও সেদিন উদাত্ত গম্ভীর স্বরে বাঙ্গলার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া গাহিয়াছিলেন,—"ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা; সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী ওগো, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি; সে যে আমার জন্মভূমি!"

হায়, আজ আর সেই বাঙ্গলাদেশ তেমনি আছে কি? কোথায় আজ বাঙ্গলার সে ধন ধান্য, কোথায় সে পুষ্পের হাসি? আজ কি এই বাঙ্গলাদেশকে সকল দেশের সেরা বলিয়া কাহারও মনে গর্ব্ব অনুভূত হয়? আজ কি বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে সুপেয় সুজলপূর্ণ তড়াগসমূহ, সুন্দর শ্যামল ক্ষেত্রসমূহ ও বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, বাঙ্গালীর মনকে তেমনি বিমল আনন্দে ভরপুর করিয়া তোলে? তাও নয়?

আজ বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাব। উপযুক্ত চিকিৎসার ও খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্যের অভাব। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সম্পাদনের জ্ঞানের অভাবে এবং বৎসরের পর বৎসর ভীষণ প্লাবনে আজ বাঙ্গলার মাঠ শ্যামলতা বিবর্জ্জিত। কৃষকের নয়ন বাষ্প-পূরিত এবং কৃষি-সম্বল মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙ্গালী সম্প্রদায় আজ অর্থশূন্য, সেরুদণ্ডহীন, চাকুরীর একান্ত শরণাপন্ন।

আজ উপযুক্ত উপায়নির্দ্দেশ-বিরহিত স্বাবলম্বনের উপদেশ, গোলামী পরিত্যাগের সুযুক্তিপূর্ণ অনুরোধ বুভুক্ষু অথচ আধুনিক বিলাসপরায়ণ বাঙ্গালীর মনে স্বপ্নবাণীর ন্যায় অতি ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই বোধ হয়। নহিলে এই বাঙ্গালী জাতি একবার যদি তার এই অর্থকৃচ্ছ্রতার সমাধানে সমর্থ হয়, তবে বোধ হয় পরমুহূর্ত্তেই সে এক পদাঘাতে এই জড়তার, এই অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া, একটা হ্যামডেনের মত,—একটা কামালের মত—একটা লেনিনের মত—কি একটা আবদুল করিমের মত জ্বলিয়া উঠিয়া সদর্পে বলিতে

পারে,—আমি স্বাধীন !—বিশ্বের স্বাধীনতা আমার স্রষ্টা !—স্বাধীনতার তিলমাত্র বিচ্যুতিতে আমার মৃত্যু !

মনে এখনো ভরসা জাগে,—যদি আবার বাঙ্গলার কৃষি,—বাঙ্গলার কৃষক উন্নত হয়, আবার যদি বাঙ্গলার পণ্যে, বাঙ্গলার ব্যবসায়ে চঞ্চলার কৃপাদৃষ্টি অচল হয়ে উঠে, তবে, হয়ত —আবার এ জাতি জাগ্রত হইবে। আবার হয়ত রাখালের মুখে বেলার শেষে মাঠে মাঠে সেই মধুর বাঁশী বাজিয়া উঠিবে,—মরা নদীর বুকে বুকে নূতন জোয়ার-জলে সুমধুর ভাটিয়াল সুদূরের শ্রোতাকে আনন্দ দান করিবে। বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা বাঙ্গলার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শ্যামল হইয়া ফুটিয়া উঠিবে ! জানি না, সে সুখের দিন আর কত দূরে !

(২)

বঙ্গমাতার শ্যামল পল্লী-অঞ্চলে কৃষক-প্রধান শান্ত গ্রামের কোলে আমার জন্ম। আজন্ম কৃষকদের মমতাপূর্ণ সাহচর্য্যে, সহায়তায় এবং পরিচর্য্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছি। আমার গার্হস্থ্য-জীবনের সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে যাহাদের মুখে বিমল আনন্দের হাসি ও সমবেদনার অকৃত্রিম অশ্রুবিন্দু নয়নের কোণে নিয়তই ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছি ; এবং যাহাদের বিপৎপাতে আমাদিগকেই পরমাত্মীয়ের ন্যায় অভয় দানের জন্য চিরদিন অগ্রসর হইতে হইয়াছে, সেই একান্ত পরিচিত নিকটতম প্রতিবেশী কৃষকদের সম্বন্ধে সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ দুই চারিটী কথা আজ প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করিব।

(৩)

"United we stand, divided we fall." একথা প্রায় সকল দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরাই অল্পবিস্তর জানেন যে, যেখানে পরস্পরের মিলন, সৌহৃদ্য এবং ঐকান্তিক সহানুভূতি—সেইখানেই সমৃদ্ধি, সুখ এবং সন্তোষ। আর যেখানে—পরস্পরের বিদ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও বিচ্ছেদ—সেইখানেই অশান্তি, পরাজয় ও দারিদ্র্য।

অথচ এই বিভিন্ন ভাবের বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও সকল দেশের সকল প্রকার মানুষের জীবনের ইতিহাসে এমন এক একটা অমঙ্গলময় সময় আসিয়া উপস্থিত হয়—যখন মানুষ সমস্ত হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া পরস্পরের অহিত চিন্তায় এবং একের ধ্বংসে অপরের উন্নতিলাভের অমূলক আশায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। কোন সুযুক্তি, কোন সুপরামর্শই তখন আর মানুষের মনে অনুসরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

আশৈশব পল্লীর এই সনাতন প্রথাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, সাধারণতঃ যে কৃষক-পরিবারে সম্প্রীতি, স্নেহ, মমতা ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ পরিলক্ষিত হয়, তাহারাই পরিজনবর্গের ঐকান্তিক পরিশ্রমে ও যত্নে পরিবারের আবশ্যক ক্ষেত্রসমূহের উৎকর্ষ সাধনে এবং উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনে সমর্থ হয়। একমাত্র তাহারাই মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দে পরিজনবর্গের মুখে সুখের অন্ন দান করিয়া, বৎসরের জন্য আবশ্যক বস্ত্রাদি

সরবরাহ করিয়া, মনিবের নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করিয়া শীতাতপ ও বর্ষার হাত হইতে আত্মরক্ষার তথাকথিত উপযুক্ত গৃহতলে কথঞ্চিত শান্তিতে বাস করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে অতি বিরল।

অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায়—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই অবস্থা। পরিবারস্থ কাহারও প্রতি কাহারও প্রাণের ভালবাসা নাই। কাহারও হিতার্থে কাহারও মন অগ্রসর হয় না। কাহারও দুঃখে বা অসামর্থ্যে কাহারও মন গলে না। সকলেই নিজ নিজ বিচ্ছিন্ন জীর্ণ কুটীরে চারি পাঁচটী শিশু পুত্র-কন্যার, স্ত্রীর এবং নিজের মাথা কয়টি কোন রকমে বাঁচাইয়া আসিতেছে। উহারই এক পার্শ্বে হয়ত সামান্য আচ্ছাদনতলে অথবা উন্মুক্ত আকাশতলে জীর্ণ বেড়ার আড়ালে নিত্য সকাল সন্ধ্যায় তাহাদের আরাধ্য স্থূলতম তণ্ডুল এবং তৈল ও মশলা বিহীন শাক অথবা অতিকষ্টে স্বহস্তে সংগৃহীত মৎস্য পক্ক হইয়া শয্যাগৃহের একপার্শ্বে মাচার উপরে মাটির বাসনে রক্ষিত হইতেছে। প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়াহ্নে অতিরিক্ত নুন ও গৃহকোণে বর্দ্ধিত দু একটী গাছ হইতে সংগৃহীত কাঁচা লঙ্কা ও ঘাটের ঈষৎ কর্দ্দমাক্ত দুর্গন্ধপূর্ণ জল সহযোগে সকলে মিলিয়া উদরকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। তাহারই অনতিদূরে একটী অতি জীর্ণ চালের তলদেশে অতি দুর্গন্ধপূর্ণ ক্লেদাক্ত অবস্থায় কয়েকটী কৃষ বলদ ও ততোধিক কৃশাঙ্গী গাভী জলে পচান তৃণদলপূর্ণ সুবৃহৎ মৃৎভাণ্ডে মুখ রাখিয়া জাবর কাটিয়া ও অনবরত পুচ্ছতাড়নাদ্বারা মশক ও মক্ষিকার উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। আর কোন কোন শয়নগৃহের একপার্শ্বে লম্বিত অপর একখানা চালের তলায় হয়ত একটী ঢেঁকী কর্ম্মহীন অবস্থায় অতি নীরবে মাথা নীচু করিয়া শায়িত রহিয়াছে।

বাটীর প্রাঙ্গনটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াই বিচ্ছিন্ন কৃষক ভ্রাতাদের গৃহ সকল নির্ম্মিত। ঐ সকল গৃহের অল্পমাত্র ব্যবধানেই চারিদিক ঘেরিয়া প্রকৃতি তাঁর শ্যামল শোভা অবাধে বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন। ঐ বনরাজিকে ভেদ করিয়া যে সূক্ষ্ম পথটী বাটীর নিম্নস্থ ক্ষেত্রে যাইয়া মিশিয়াছে—তাহারই পার্শ্বে হয়ত একটী ক্ষুদ্র পঙ্কিল জলাশয় রহিয়াছে। কৃষক-পত্নী এবং সন্তানগণ প্রভাতের আহারান্তে সেই জলাশয়ের পার্শ্বে বসিয়াই পচান পাটের, কি মেস্তার গাছ হইতে নরম আঁশগুলি টানিয়া টানিয়া পৃথক করিয়া রাখিতেছে। আর তাহারই দুর্গন্ধে উহাদের ক্ষুদ্র গৃহ-প্রাঙ্গন, পথ, ঘাট ও জলাশয় প্রভৃতি পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহাতে কাহারও কোন অসুবিধা বোধ হইতেছে না।

আর ইত্যবসরে কৃষক কর্ত্তা হয়ত অতি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া, মস্তকে গামছার পাক বাঁধিয়া এবং আকণ্ঠ জলমগ্ন করিয়া পাট কাচিতেছে। অথবা কাজের অভাবে সাংসারিক অভাব মোচনার্থ, কিম্বা আদালতের খরচ নির্ব্বাহের নিমিত্ত মহাজনের দুয়ারে জমি বন্ধক রাখিয়া ধারের আশায় মহাজনের নিকট স্তোকবাক্য বলিতেছে, আর মাঝে মাঝে তাম্রকুটের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছে।

এই ত' গেল কৃষক ভ্রাতাদের সাধারণ জীবনের মোটামুটি চিত্র। এখন একবার

খোঁজ করিয়া দেখা যাক্ যে, ইহাদের এই চির দুর্দ্দশার, এই ঋণ গ্রহণে চিরবাধ্যতার কারণ কি ? সকলেরই হস্তে প্রচুর ক্ষেত্র-সম্পদ রহিয়াছে এবং প্রতি বৎসর অন্ততঃ এক একটী ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সামান্য মাত্র ব্যয়ের উপযুক্ত পরিমাণ মূল্যেরও অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইতেছে। তবুও যে কৃষকের এবং তাহাদেরই উপরে নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত ভদ্রদের জীবনযাত্রা সুখে অতিবাহিত হইতেছে না ইহার কারণ কি ?

আমার ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যতটা উপলব্ধ হইয়া আসিয়াছে—আজ সেই কথা কয়েকটী বলিয়াই এ প্রবন্ধের শেষ করিব। তারপরে যাঁহাদের উপরে ভগবান এই পতিত জাতির কল্যাণময় পন্থা নির্দ্দেশের ভার যুগে যুগে ন্যস্ত করিয়া আসিতেছেন,—আশা করি, তাঁহারাই উহাদের ভবিষ্যৎ উন্নত জীবনের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন ও উহাদের শ্রদ্ধা ও আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইবেন।

(৪)

কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি যে, বাঙ্গলার কৃষির এই চরম দুর্দ্দশার দিনেও কৃষকদের হস্তে যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে। আর এই সকল ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় এবং অপচয় হইয়াও যাহা কৃষকের গৃহে সঞ্চিত হয়, তাহাই কৃষকের এবং তাহার কৃষি-সম্বল মনিবের দুঃখ মোচনের পক্ষে মোটামুটী হিসাবে যথেষ্ট বলা চলিত। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা যে, কেন সত্য সত্য তাহাদের কাহারই দুঃখ দারিদ্র্য দূরীকরণে সমর্থ হয় না এখন আমি সেই কথাই বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রতি বৎসর সাধের শরৎকাল তাহার নতুন শেফালি ও শিশিরের শোভা, সবুজ ধান্যশীর্ষ, পরম সুন্দর নীল আকাশ, শুভ্র, লঘু, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিন্ন মেঘের অন্তরালে ক্রীড়াপরায়ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণবর্ষী সুধাকরের পরম সুন্দর হাসি, জলে স্থলে বিকশিত পদ্মের বর্ণ, গন্ধ ও সুষমার সম্ভার সহ সমাগত হয়। এই পরম শোভাময় শরতেই বাঙলার সাতকোটী সন্তানের মাতা তাঁহার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে তাঁহার সন্তানগণকে পরম স্নেহে একবার দর্শন দান করেন। তিনটি দিনের মাতৃদর্শনের আনন্দে বাংলার বাঙ্গালী সমস্ত দুঃখ, দারিদ্র্য, শোক, তাপ, বিষাদ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। দশমীর পুণ্যতিথিতে সাশ্রুনেত্রে মাতার জড় মূর্ত্তি বিসর্জ্জনের পরে বাংলার ঘরে ঘরে, প্রতি বাঙ্গালীর বুকে বুকে আবার এক আত্মহারা করুণ সুর অতি ধীরে ধীরে রণিয়া রণিয়া উঠিতে থাকে। তখন বাংলার শত্রু মিত্র, ছোট বড়, হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ থাকে না। তখন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধ সকলেই সকলকে পরম আদরে আপন বক্ষে ধারণ করে। পরস্পরে অতি মধুর সম্ভাষণ ও মধুর আহার্য্য বিনিময় করে। ঘটিপূর্ণ দুগ্ধ ও ঝুড়ি পূর্ণ মৎস্যসহ কৃষক তাহার প্রতিবেশী মনিবের গৃহে হাসি মুখে উপস্থিত হয়। এবং মুড়ী, মুড়কী ও মিষ্টিসহ শিশু-সন্তানের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আনন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করে। অতি অল্পকালের জন্য বাংলার মর্ত্ত্যলোকে দেবতার স্বর্গ নামিয়া আসে। বাংলা স্বর্গের পবিত্র আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

এই শুভ বিজয়া দশমীতেই বাংলার হিন্দু মুসলমান যাবতীয় কৃষক সম্প্রদায়েরই হালসন্ আরম্ভ। এই হালসনেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল কৃষকই প্রতিদেশী ব্রাহ্মণের সাহায্যে বিশুদ্ধ সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রথম চাষ আরম্ভ করে। এই সময়ে সকলের ক্ষেত্রেই ধান্য সুপক্ক হইয়া উঠিয়াছে। হেমন্তের সমাগমে গ্রামের এবং মাঠের সমস্ত জল শুকাইয়া উঠিলেই ধান কাটা আরম্ভ হইবে।

ধান কাটা শেষ হইলেই সমস্ত মাঠগুলি রৌদ্রতপ্ত কাটা ঝুকে স্বর্ণাভ শুষ্ক খড়ের রাশি লইয়া পড়িয়া থাকিবে যতদিনে না আবার সুবৃষ্টির পতন হয়। এতদিন কেবল কৃষকের গৃহের অতি নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রাংশে মাঝে মাঝে তিল, তামাক, লঙ্কা ও বেগুণ প্রভৃতি উৎপন্ন হইবে। ইহাতে তাহাদের বিশেষ কোনই উপকার হয় না। ইহা কেবল অনুপায়ের উপায় মাত্র। নিতান্ত ঠেকার সময় কৃষক ইহারই কিছু কিছু নিকটবর্ত্তী বাজারে বিক্রয় করিয়া নিজেদের সামান্য আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করে মাত্র।

শারদোৎসবের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী মনিবদের সংক্ষিপ্ত তহবিল একেবারেই নিঃশেষ হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের পর্ব্বাঙ্গেই উৎসাহের প্রাচুর্য্য হেতু যেসকল সামগ্রী ধারে সংগৃহীত হইয়া থাকে সেই দেনা পরিশোধের বিভীষিকাও সকল মধ্যবিত্তদের অন্তরে ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। সুতরাং তখনই সকলের মনেই একটা কথা জাগিয়া উঠে,—এখন, টাকা চাই ;—কিন্তু টাকা কোথায় ? তখনই প্রজার বাকী খাজানা, এবং প্রজাকে ধারে দেওয়া টাকাও সুদের প্রতি সকলের নজর পড়ে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি যে, এ সময়ে প্রজাদের অবস্থাও প্রায় মনিবদেরই অনুরূপ। তাহারাও প্রায় সকলেই শূন্য হস্ত। কারণ কয়েকদিন পূর্ব্বে আসন্ন শারদোৎসবের এবং মনিব ও মহাজনদের অভাবের সংসারের ব্যায় নির্ব্বাহের জন্য সকল প্রজাকেই যথাসাধ্য দেনা ও খাজানার টাকা পরিশোধ করিয়া বাকী টাকার জন্য যে কোন রকমের একটা রফা করিয়া লইতে হইয়াছে। এখন এই নূতন চাপে পড়িয়া প্রজাদের বৎসরে প্রথমবার মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হইল। এবং যে যাহা ধারে সংগ্রহ করিল তাহা দ্বারা মনিব ও মহাজনের ধার কতকটা শোধ করিয়া কিছু দিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করিল। এ বিষয়ে মনিব, মহাজন ও প্রজা সকলেই প্রায় সমান দোষ গুণের ভাগী। কেন না মনিব ও মহাজনের প্রায় অধিকাংশেরই সম্বল একমাত্র প্রজার খাজানা ও ঋণদানের সুদের টাকা। এদিকে প্রজারও এমনি বরাৎ যে, সে কখনই বৎসরের সকল খাজানা ও দেনার টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না।

কথায় বলে, "অভাবে স্বভাব নষ্ট"। প্রজার দল বৎসরের পর বৎসর অনবরত টাকার অভাবে এইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে ক্রমেই অসৎ পথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে এবং অধিকাংশ প্রজা বা দায়গ্রস্ত ব্যক্তিই কোনভাবে চলিলে মনিবকে এবং মহাজনকে ফাঁকি দেওয়া চলিতে পারে অনবরত এই চিন্তা এবং চেষ্টা করিতে থাকে। এ বিষয়ে বর্ত্তমানের

মক্কেল শূন্য বুভুক্ষু অসংখ্য উকীল ও মোক্তারগণ আবার বিশেষ উৎসাহ দাতা। তাঁহাদেরই বহুবিধ সৎ পরামর্শের ফলে এক সময়ের সেই সরল গ্রাম্য চাষীর দল আজ দলে দলে ঠক সাজিতেছে। বছরের পর বছর তাহারা যাহা কিছু সম্পত্তি বেনামা করিয়া নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করিয়া মহাজনের ঋণ অসঙ্কোচে হজম করিতেছে। আর 'যেন তেন প্রকারেণ, সেই নির্দ্দিষ্ট খাজানা দুই তিন বৎসর বাকী রাখিতে পারিলেই পর বৎসর কোন নতুন উকীলের সহায়তায় বাকী খাজানা বাতিলের জন্য জওয়াব দিয়া আদালত হইতে হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে। সুতরাং মনিবেরাও বাধ্য হইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিতই চলিয়া থাকেন; এবং যেখানে প্রয়োজন বোধ করেন সেস্থলে প্রজাদের বিরুদ্ধে অল্প বিস্তর অসৎ পন্থার এবং কথঞ্চিৎ অত্যাচারের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। আর ধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রকারেরাও তা বলিয়া গিয়াছেন, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।" নহিলে গ্রাম্য গরীব মনিব মহাজনদের বাচিবারই বা উপায় কি?

কেন না, এক দিকে প্রজাদের ও দায়গ্রস্তদের ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি যেমন দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, তেমনি গবর্ণমেণ্টও প্রতিবৎসর প্রজাদের মনিব মহাজনদের হাত হইতে মুক্তির পর মুক্তিই দিয়া চলিয়াছেন। কেবল আইনের বলে প্রজার দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টাই করিতেছেন। অথচ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থার কোনই প্রতিকারের চেষ্টা চলিতেছেনা। এদিকে সকল সন্তানেরাই এক আকাশ কুসুমের আশায় উচ্চশিক্ষার শেষ সোপান পর্য্যন্ত কোনরূপে পৌছিয়া, অবশেষে ব্যর্থতার পাষাণ বুকে চাপিয়া আবার সেই গ্রামের নিঃস্বতার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। আর দরিদ্র প্রজাদের দেওয়া সামান্য অর্থে কোনরূপে ভদ্রতাবজায় রাখিয়া জীবন্মৃতের মতই দিন অতিবাহিত করিতেছেন। এখন হয় অতিশীঘ্রই সকলকে কৃষক, বা কুলী মজুরের কাজে লাগিতে হইবে। না হয় ঐ দক্ষিণ আফ্রিকার মত নতুন নতুন বনে, জঙ্গলে অথবা সুদূর দ্বীপে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের আশানন্ত, বৈদেশিক লাঞ্ছিত একদল দুর্ভাগা পরগাছার দল সৃষ্ট হইয়া উঠিবে। ভারতের হতভাগ্য কাঙ্গাল সন্তানদের করুণ ক্রন্দনে হয়ত পৃথিবীর শান্তিপূর্ণ আর এক অংশ মুখরিত হইয়া উঠিবে।

যাক্ এ বিষয়ে আমি আর বিশেষ কিছুই বলিব না। হয়ত ইতি মধ্যেই ইহা কোন কোন প্রজাতন্ত্রীর বা সাম্যবাদীর নিকট বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইতেছে। হয়ত আমাকে তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীই মনে করিতেছেন। কিন্তু আমি কেবল প্রজা ভুস্বামী উভয় পক্ষেরই কতটা দোষ গুণ, এবং বর্ত্তমানে উভয় পক্ষই সমাজের ঐকান্তিক সহানুভূতির কতটা মুখাপেক্ষী তাহাই দেখাইবার জন্য উপরোক্ত কথা কয়েকটা বলিয়াছি।

(৫)

বল্‌সেভিকবাদের বা পূর্ণ অর্থসাম্যবাদের দম্‌কা হাওয়ায় বর্ত্তমান সভ্য-জগতের প্রায় সকল চিন্তাকেন্দ্রই অল্পবিস্তর আন্দোলিত হইতেছে। ভারতের রাজনৈতিক অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের গায়েও যে সে বাতাসের ঢেউ আসিয়া না লাগিতেছে এমন নহে। ইহা ছাড়া, ভারতীয় স্বদেশ-হিতৈষীদের মুখেও দরিদ্র নিরক্ষর প্রজাদের সর্ব্বকল্যাণময় জাগরণের দ্বারা ভারতের অচিরে

বাজগণের আশ্বাস বাক্য প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ রাজকীয় আইন মজলিসেও প্রজাস্বত্ব বিধায়ক উন্নতিকর আইনের ঘোষণাও প্রতি বৎসরই দুই একবার শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ পূর্ব্বেও যেমন প্রজাকুল অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে, অশিক্ষায়, চিকিৎসাবিহীন বিবিধ ব্যাধিতে এবং নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় মনুষ্যবাসের অযোগ্য বাসস্থানে কোনরূপে বাঁচিয়া আসিতেছিল, আজিও তাহারা তেমনি ভাবেই দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে।

দেশহিতৈষীরা বক্তৃতার উচ্চ মঞ্চ হইতে বহুবার বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন, কিন্তু কখনও কৃষকদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের বাস্তব হিতের চেষ্টা করেন না, বা করিতে সাহসী হন না। তাহার যে কোন বিশেষ কারণ নাই, তাহাও নহে। সহরের বক্তৃতায় সাহিত্যের আনন্দ আছে, একটা শৃঙ্খলা আছে, নিয়ম আছে, সময়ের পরিমাণ আছে, নামের আশা আছে, আর আছে কল্পনাময় স্বদেশহিতৈষণার একটা গোপন আত্মতৃপ্তি।

অন্য দিকে, গ্রামে থাকিয়া কৃষকদের সঙ্গে প্রকৃত ভাবে মেলামেশা করিয়া, তাহাদের অনিয়ন্ত্রিত মনগুলিকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে তাহাদেরই উন্নতিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে আছে শুধু—অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, বক্তৃতাবিহীন ও উৎসাহশূন্য অদম্য চেষ্টা, সামন্ত্রিক অপমান ও বহুবিধ লাঞ্ছনা। সুতরাং এই দ্বিবিধ কর্ম্মধারার মধ্যে আমরা এ পর্য্যন্ত প্রথম ধারাকেই আশ্রয় করিয়া আসিতেছি, এবং কর্ম্মের অনুরূপ ফলও ফলিয়া আসিতেছে। ইঞ্জিনবিহীন গাড়ী যেমন রেল লাইনের উপরে শুধু হাতের ধাক্কায় দশ বিশ হাত মাত্র চলিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আমাদের প্রকৃত আভ্যন্তরিক উন্নতিশীল কর্ম্মবিহীন বক্তৃতার জোরে সব স্বদেশী আন্দোলনও তেমনি প্রতি বারে মাত্র দুই চারি হাত মাত্র অগ্রসর হইয়াই আবার নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তার বাংলা পর্য্যটনে এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই গ্রাম সংগঠনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতের দুর্ভাগ্য দেবতার চক্ষে বুঝি তাহা সহ্য হইল না। তাই চিত্তরঞ্জনকে অসময়েই তিনি সরাইয়া লইলেন!

এদিকে গবর্ণমেণ্ট আইনতঃ প্রজার ঋণের সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রজাকে আর ঋণ গ্রহণ করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন কোথায়? প্রজা ত অভাবের তাড়নায় নিজের গরজে অতি উচ্চ সুদেও কত রেজিষ্ট্রী-বিহীন দলিলে আঙ্গুলের ছাপ দিয়াই কত ঋণ গ্রহণ করিতেছে।

আইনের বলে জমির উপরে প্রজার স্বত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দেনার দায়ে এবং বাকী খাজনার তাগাদায় প্রজা তাহার জমাজমি সকলই বন্ধক রাখিতেছে এবং নিজে নিঃস্ব হইয়া পরের মজুরী করিয়া দিন চালাইতেছে। ইহা হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবার উপায় কি?

কেহ হয়ত বলিবেন যে, বর্ত্তমান দেশকে ঢালিয়া গড়িতে হইবে। সমস্ত ভূ-সম্পত্তি হইতে মধ্যবিত্তকে বঞ্চিত করিয়া, উহা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া সমগ্র বাংলার প্রজাদের মধ্যে সমপরিমাণে বিলাইয়া না দিলে ইহার প্রতিকার অসম্ভব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে হতভাগ্য মধ্য-

বিত্ত ভূস্বামীদিগের জন্য অপরাপর স্বাধীন দেশ সমূহের ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার চেষ্টা করাও কি উচিত নহে? দেশের বা সমাজের কোন অংশকেই বাদ দিয়া বা শক্তিহীন করিয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইবে না। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে তাহা অর্জ্জন ও রক্ষা করিবার উপযুক্ত শক্তি দেশের ও সমাজের সকলকেই সমভাবে সঞ্চয় করিতেই হইবে। নহিলে অরাজকতা, রক্তপাত ও অযথা আত্মকলহে শক্তিক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

(৬)

এইবার প্রজাদের অর্থাভাবের ও দায়গ্রস্ত অবস্থার কয়েকটা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য কারণের উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধের শেষ করিব।

প্রথমতঃ কৃষকদিগের পরিবারস্থ আত্মীয়বর্গের সহিত হিংসাপূর্ণ কলহ, এবং তাহার ফলে পরস্পর হইতে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে জীবন যাপনের প্রথাই তাহাদের দুর্দ্দশার এক বিশেষ কারণ। ইহার ফলে তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ আয়ত্তাধীন জমিসমূহের চাষ আবাদ একার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে ধারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এবং সেই অর্থসাহায্যে নিকর্ম্মা প্রতিবেশী মজুরদের দ্বারা জমির কার্য্যাদি সম্পন্ন করাইয়া লইতে হয়। ইহা দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। একবার চাষ আবাদের সময়, আবার ফসল কাটিবার সময়। এবং এইরূপেই অধিকাংশ প্রজার আয়ের অর্দ্ধেক ফসলের মূল্য নিঃশেষ হইয়া যায়। মাত্র বাকী অংশদ্বারা জীবিকা, খাজানা এবং দেনা প্রভৃতি চালাইয়া লইতে হয়। ইহার সঙ্গে বাৎসরিক ছোট খাট উৎসব, আত্মীয়তা ও দুই একটা মোকদ্দমার ব্যয় ত লাগিয়াই আছে।

দ্বিতীয়তঃ অভাবের সংসারে দুঃখ সহজে ঘুচিতে চাহে না। যখনই যাহা নিম্ব সংসারে আসে বিবিধ প্রকারের অনটনের টানে তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। চাষ, নিড়েন; ও ফসল কাটা প্রভৃতির মজুরী এবং বীজের মূল্য প্রভৃতি বাদ দিয়া যাহা কিছু শস্য চাষীর ঘরে আসিতে পায়, তাহা তখনই ঘরের অভাবের টানে ও পাওনাদারদের তাগাদায় আবার ঘরের বাহিরেই চলিয়া যাইতে থাকে। বাংলার চাষীর প্রধান সম্বল ধান এবং পাট। এই দ্বিবিধ ফসল যখনই তাহার ঘরে উপরোক্তরূপে কিছু কিছু সঞ্চিত হইতে থাকে—তখনি সর্ব্বপ্রকারের অভাব মোচনের ও পাওনাদারদের তাগিদ ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ হয়। তখন চাষীকে নিরুপায়ে দেশী ও বিদেশী বড় বড় মহাজন ব্যবসায়ীদের দ্বারে নিজের যাহা কিছু সম্বল তাহা লইয়াই উপস্থিত হইতে হয়।

দেশীয় কিম্বা বিদেশের বণিক সম্প্রদায় সকলেই এক পথের পথিক। সকলেই নিজ নিজ উচ্চতম লাভের প্রতিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু গরীব গৃহস্থ—যাহারা ফসলের মালিক—তাহাদের দুঃখের বা ন্যায্য অধিকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তাহারা কৃষকের অভাবের গরজ বুঝিয়া একেবারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষকের দুই দিন অপেক্ষারও অবসর নাই। সে তখন নিজের দায়ে নিজেই নিজের একান্ত পরিশ্রমলব্ধ

শস্যের ভার জলের দামে ব্যবসায়ীর দুয়ারে বিক্রয় করিয়া সন্তপ্ত চিত্তে এবং নিজ দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে। আর ধনী ব্যবসায়ী হয়ত ঐ শস্য ক্রীত দামের দশ গুণ বর্দ্ধিত মূল্যে বৈদেশিক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া চালান দেয়। ফলে, দেশের চাষীকুলের বা ভূস্বামীদিগের বা অন্য কাহারই কোন উপকার হয় না। যাহা কিছু হয় তাহা মাত্র ঐ কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ীর। অথচ এই ব্যবসায়ীরাই আবার দেশের চরম দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দশার সময়ে দেশের লোকের নিকট হইতে কি নিষ্ঠুরতার সহিতই না অন্ন বস্ত্রের বিনিময়ে কত অসম্ভব উচ্চ মূল্য নির্ব্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকে।

দেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের এই একান্ত অসহায় অবস্থার কথা জানিতে পারিয়াই বোধ হয় চিত্তরঞ্জন পূর্ব্ববঙ্গের ধান-পাট কংগ্রেসের ও উদারহৃদয় ধনী সম্প্রদায়ের সাহায্যে নিষ্ঠুর ব্যবসায়ীদের হাত হইতে রক্ষা করিতে এবং শস্যের প্রকৃত মালিক চাষীদের ন্যায্য উচ্চতম মূল্য দান করিয়া তাহাদের অভাব মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার কল্পনা কল্পনাই রহিয়া গেল। নিষ্ঠুর মরণ তাঁহার প্রাণের বাসনাকে আর সফল হইতে দিল না। তাই বোধ হয় আজ দেশের ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলেই চিত্তরঞ্জনের ন্যায় প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকের ও সেবকের অভাবে এমন রোদনপরায়ণ, এত ম্রিয়মান।

চাষীদের উন্নতি লাভের চরম উপায় বোধ হয়—বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি অল্পলোকের সাহায্যে, অল্প খরচে, অল্প সময়ে এবং পরিমিত ক্ষেত্রে অধিকতম ও উৎকৃষ্টতম শস্যের উৎপাদন এবং চাষীর হাত দিয়াই ঐ শস্য উচ্চতম মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পাদন। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা হইতেছে কি? সেই সনাতন দুই বলদ ও এক লাঙ্গলের ব্যবস্থা আজও মন্থরগতিতে বিস্তৃত মাঠের বুকে যেন ছেলেখেলা খেলিয়া চলিয়াছে। আজ আবার বাংলা জোড়া কচুরী পানার উপদ্রবে বুঝি সে ধূলাখেলাও সাঙ্গ হইতে বসিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বৈজ্ঞানিক উপায়ে পানাধ্বংসের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এখন ঐ পানা ধ্বংসের ভার পড়িয়াছে একা চাষার উপরে। কিন্তু তাহার দুইখানা দুর্ব্বল হস্ত কি সম্বৎসর ঐ রক্তবীজের বংশধররূপী পানা-ধ্বংসেই নিযুক্ত থাকিবে,—না তাহার চাষ, আবাদ ও গৃহধর্ম্মাদি বজায় রাখিবে?

শুনিতে পাই, এবং মাঝে মাঝে কাগজেও দেখিতে পাই যে, গবর্ণমেণ্ট নাকি কোথায় বহু অর্থব্যয়ে আদর্শ বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সে বিদ্যা শিক্ষা এবং অর্থব্যয় যে দেশের কৃষির উন্নতি সাধনে কোথায় কতটুকু সুফলপ্রসূ হইয়াছে দেশের জনসাধারণ আজও সে বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ এবং সংশয়াপন্ন।

দেশের এত সব অভাব অভিযোগ, এত দুর্দ্দশা, এবং দেশের শক্তিমান ভাগ্যনিয়ন্তাদের হাতে দেশের সর্ব্বপ্রকার শক্তির এত অপব্যবহার এবং জনসাধারণের এমন অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া শুধু এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়,—হে ভারতের ভগবান আজও কি ভারতের গ্লানি চরম সীমায় উপস্থিত হয় নাই?

শ্রীঅমূল্যচরণ রায় চৌধুরী।

খেয়াল খাতা।

কবি ও গীতি-কবি।

গীতি-কবিতা নানা ভাবের (mood) মধ্য দিয়া কবির অভিব্যক্তি মাত্র।

কবি সৃষ্টি করেন, গীতি-কবি প্রকাশ করেন।

কবি যেখানে স্বভাবের শোভাকে ফুটাইয়া তুলিতে চান, গীতি-কবি সেখানে সেই শোভা দর্শনে তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাই বর্ণন করেন।

কবি আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া শুধু তাঁহার সৃষ্টিকেই সম্মুখে উপস্থাপিত করেন; গীতি-কবি নিজের উপরই সমস্ত আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করেন।

জগতের সমগ্র নরনারী চরিত্র লইয়াই কবির খেলা; গীতি-কবি তাঁহার নানা কবিতার ভিতর দিয়া নানাভাবে শুধু একটীমাত্র চরিত্র লইয়াই নাড়াচাড়া করেন—সেটি তাঁহার নিজের।

যে ভাব সার্ব্বজনীন নহে, যাহা তোমার নিজের প্রকৃতির রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে আমি ঠিক তোমার মত সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া গ্রহণ নাও করিতে পারি, তাই গীতি-কবিতায় ছন্দের ও ভাষার এত বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য্য।

আমিত্ব (ego) প্রবল না হইলে, আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইতে না পারিলে, শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা লেখা অসম্ভব।

কবিতা—প্রকৃতির নূতনরূপ প্রকাশ; গীতি-কবিতা প্রকৃতিরই ব্যাখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

ব্রিটীশ মিউজিয়ামের বিখ্যাত মনস্বী আর্থারওয়েলি একখানি জাপানী উপন্যাসের অনুবাদ করছেন। তাঁর মতে এইটি জগতের শ্রেষ্ঠতম ও প্রাচীনতম উপন্যাসের অন্যতম। অনুবাদ ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হবে, প্রতিখণ্ডে ৩০০ পৃষ্ঠা থাকবে। ইহা মুরাসাকি নামে একজন মহিলার লেখা। ১০০৪ খৃষ্টাব্দে এই উপন্যাস লেখা হয়েছিল—তখন জাপানের রাজধানী কিওটো। এই উপন্যাসে সর্ব্বসমেত ৯০০টি চরিত্র আছে। পুরানো জাপানী ভাষায় বইটি লেখা—আধুনিক জাপানিরাও বইটি বুঝতে পারেনা।

সম্রাটের প্রণয়িনীর ছেলে জেঞ্জির প্রেমের কাহিনীর উপন্যাস এইটি। ওয়েলী সাহেব বলেন জেঞ্জির প্রেমপাত্রী উৎসুমেমির সখীর চরিত্র রচয়িত্রী চমৎকারভাবে এঁকেছেন। জেঞ্জিও উৎসুমেমির মধ্যে যে কাব্যময়ী পত্রিকা-গুলির বিনিময় হয়েছিল তার উপমা সবও অতি সুন্দর।

শ্রীগিরিজা কুমার বসু।

জোয়ার-ভাঁটা

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আট বৎসরে যখন 'ভবেৎ গৌরী', তখন তার অর্দ্ধেকে কন্যা দানের পুণ্যটা যদি দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে ভোলানাথ বৈদিকের ভাগ্যে মুরলার বেলা এইটাই ঘটিয়াছিল। মুরলার নাম রূপাত্মক অস্তিত্বটা ক্রূণত্ব ছাড়িয়া লোকচক্ষুর গোচরে আসার পূর্ব্বেই, সম্ভাবনার রকমে তাহার ভাবী স্বামী নির্ণীত হইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে কন্যার মুখ হইতে স্তন্যের ছাপটা ভাল করিয়া না উঠিতেই ভোলানাথ তাহার ললাটে প্রজাপতির মার্কা দাগিয়া দিলেন। কিন্তু হায়, জ্বলজ্বলে লাল রং কোন নিদারুণ অদৃশ্য লিপির পোঁচে শীঘ্রই কালো ভূষোর মত হইয়া গেল।

সাতটা বৎসর অতিক্রম না করিয়াই মুরলাকে অধবা, সধবা ও বিধবা নারী জীবনের এই তিন রকমের সাজই ধরিতে হইল। সমাজে ও সমাসের ব্যবস্থায় এতগুলি ধবসম্পর্কিত অবস্থায় সে পড়িল বটে, কিন্তু ঐ ধব জিনিষটার সঙ্গে তাহার তেমন কিছু যে জ্ঞানের যোগ ঘটিয়াছিল, এমন একটু সন্দেহেরও বোধ হয় কোনই অবসর নাই। তবুও সন্দেহ বুঝি একটু করা চাই, নহিলে শাস্ত্রবিধির অমর্য্যাদা হয় নাকি?

সেদিন মাঘের সায়াহ্নে শীতের বাতাস বেশ কন্‌কনে রকমই বহিতেছিল। মুরলা গায়ে একটা মোটা চাদর জড়াইয়া ঘরের রোয়াকে বসিয়া এক মনে তার কাচের সংসার সাজাইতেছিল। পিসিমা হঠাৎ সেখানে আসিয়া তাহাকে টানিয়া উঠাইলেন—তাঁর অসতর্ক চরণের তাড়নায় মুরলার অমন সোনা ও সাটিনে মোড়া ছেলেটি ঠিকরাইয়া অদূরে যে একটা বাঘ থাবা গাড়িয়া বসিয়াছিল, একেবারে তাহার মুখের উপর গিয়া পড়িল। বিনোদিনীর মেয়ের সঙ্গে সম্প্রতি এটির পরিণয় কত সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে,—তাই না এর বেশের এতটা পারিপাট্য! মুরলা বড়ই ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পিসিমার দিকে চাহিল, বোধ হয় একটা কড়া তিরস্কার তার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল, কিন্তু পিসিমার চোখে অজস্র জলধারা দেখিয়া সে যেন কিছু ঘাবড়াইয়া গেল।

একজন প্রতিবেশিনী সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বলিলেন,—"মেয়েটার আক্কেল দেখ, এখন আবার পুতুল খেলা!"

মুরলা বড়ই যেন ফাঁপরে পড়িল, সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমন করিয়া সে ত অনেক সময়ই পুতুল খেলে, কৈ পিসিমা সে জন্য ত কখনও কাঁদেন নাই! পাড়ার ঐ প্রৌঢ়াটি তেমন নম্রস্বভাবা না হোন্, তিনি ত কখন এমন করিয়া তার পুতুল খেলার অশোভনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে আসেন নাই!

পিসিমা কাঁদিতে কাঁদিতে মুরলার হাত ধরিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিলেন। ওমা, এই শীতে সন্ধ্যা বেলা আবার নাইতে হবে নাকি! মুরলা আতঙ্কে বলিয়া উঠিল—"পিসিমা, আমি ত কিছু মাড়াই নি।"

পিসিমার ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কয়েকটি লোক ঘাটে আসিয়া জমিয়াছিলেন। সেই প্রৌঢ়াটি এবার যেন কিছু তীব্র কণ্ঠে কহিলেন,—"আবাগী, তুই যে দু'পা দিয়ে মাড়িয়ে তোর সব ভেঙ্গেছিস্।"

মুরলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। আজ সে ত ভাঙা ছেড়ে কোন বাসন কোসনে হাতই দেয় নাই। দৈবাৎ দুই একটা তার হাত থেকে পড়ে বটে, কিন্তু পা দিয়ে মাড়িয়ে ভাঙা, এও কি কখন কেউ করে, না করতে পারে।

পিসিমা সহাইয়ে তাহাকে এই শীতের সন্ধ্যায় জলে টানিয়া নামাইতে লাগিলেন। ঠাণ্ডায় তাহার সর্ব্ব শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। সে হাঁচড়—পাঁচড় করিয়া ডাঙায় উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পিসিমা অবশ্য তাহাকে একটা চুবনী না দিয়া আর ছাড়িয়া দিলেন না। মুরলা সিক্ত দেহে ঘাটের ধাপে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ও কাঁদিতে লাগিল। যূপ কাষ্ঠের ছাগের মত তখন তার অবস্থা। যাঁর বেদীর মূলে এই শিশুটি বলি পড়িল, তিনি দেবীই হোন্ আর দানবীই হোন্ কিন্তু এতটুকু মাংসে তাঁর তৃপ্তি ঘটে কি?

মুরলার সেই কান্না দেখিয়া চারিদিকে হইতে এবার একটা আলোচনার উৎস যেন প্রবল বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিল। যে প্রৌঢ়াটি কিছু পূর্ব্বে মুরলার আচরণের কড়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁর সবটি এখন যথাসম্ভব কোমল হইয়া আসিল। তিনি এবার একটু যেন বিনাইয়া বলিলেন—"দেখ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এমন অজ্ঞানের মনও ওর সর্ব্বনাশের কথাটা এখন বুঝে ফেলেছে।"

অপর দিক হইতে অমনই একটা যেন প্রতিধ্বনি আসিল "তা হবে না? এ যে বিধাতার ব্যবস্থা!"

মুরলার এখনও নিষ্কৃতি হয় নাই। পিসিমা—তাহার সিঁথার লাল দাগটুক ঘষিয়া ঘষিয়া উঠাইতেছিলেন। ঘষার চোটে তাহার চুলে একটু জোরে টান পড়িতেছিল। মুরলা বেদনায় তাহার মাথাটা একটু সরাইয়া লইতেছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া নীরজা বলিল, "আহা,—ঐ দাগটার উপর ওর কত দরদ, ওটা মুছ্‌তে যেন ওর প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।"

নীরজা ইহার টীকা কাটিল, "যেদিন ঐ দাগ পড়েছে, সেই দিনেই যে তার দাম ও বুঝে নেছে।"

কমলা একটু বোকা রকমের মেয়ে। নীরজার এই কথায় সে একটু বিস্মিত হইয়া পড়িল। সে যেন একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ দিদি, চার বছরে পা দিয়েই ওর বিয়ে হয়েছিল, তখন কি আর এ সব কিছু বোঝা যায়।"

নীরজা তাহাকে মুখ নাড়া দিয়া জবাব করিল, "বোঝা যায় কিনা যায়, তা তোর মতন ন্যাকায় জানবে কি ? ও জ্ঞান কি আর বয়েসে আটকায়, ও কোথা থেকে সে সময় আপনা হতে এসে জোটে।"

কমলা এখন তরুণী, তারও বিবাহ অতি শৈশবেই ঘটিয়াছিল। সে নীরজার এই কথায় চিন্তার মন্থন দণ্ডে তার অতীতের তলদেশটা একবার বেশ করিয়া আলোড়ন করিল। কিন্তু নীরজার বাক্যের সমর্থনকারী কোন স্মৃতিই তাহার মনের সামনে ভাসিয়া উঠিল না। তাই সে যাহা তার বোঝার অতীত এমন জিনিষটাকে বুঝিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু কমলা না বুঝিলেও, সেখানে বোঝার বড় অভাব ছিল না। গ্রামের শ্যামাকান্ত ভাদুড়ী সেখানে শোকক্লিষ্ট ভোলানাথের পাশে দাড়াইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল: মেয়েদের এই কথায় একটা কিছু না বলিয়া সে থাকিতে পারিল না। গ্রামের এমেচার থিয়েটারে সে একজন নাকি প্রসিদ্ধ অভিনেতা। বকিয়া বকিয়া তাহার বেশ একটু বকার অভ্যাস জমিয়া গিয়াছিল। এমন সুযোগটা হাতে পাইয়া শ্যামাকান্ত করুণ রসে কণ্ঠ ভিজাইয়া বক্তৃতার সুরে বলিয়া উঠিল, "কে জানে লীলাময়ের একি লীলা! কেনই বা ঐটুকু প্রাণে তিনি এত খানি সুখের আলো ঢেলে দিলেন, আবার কেনই বা পরক্ষণে তা এমন দুঃখের জমাট আঁধারে ভরিয়ে ফেল্‌লেন। যা হক্ হিন্দু প্রথার মধ্যে কি আধ্যাত্মিক রহস্য! কোন্ দেশের এতটুকু বিধবা তার বৈধব্য এমন তীব্র ভাবে অনুভব করতে সমর্থ। ওর ঐ হৃদয় ফাটা রোদনটা কি ? ওযে শব্দব্রহ্মরূপী মহীয়ান্ পাতিব্রত্য। পতি শোকের দাহনে পুড়িয়া ছয় বৎসরের হিন্দু নারীও যে কি অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে সেই দৃশ্য কি আজ তোমাদের চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান ন'য় ? দেখ, ভাব, কাঁদ, আবার সেই সঙ্গে এমন দৈবভূমি ভারতে জন্মেছ বলে গৌরবে উচ্ছ্বসিত হও।"

পল্লীবাসিনী নিরক্ষরার দল অভিনেতা মহাশয়ের সাধুভাষার আবরণ ঠেলিয়া তাহার বক্তৃতার মর্ম্মটুকু নিঃশেষে সংগ্রহ করিতে না পারুক, কিন্তু তাঁর কাঁপান কণ্ঠের কোমল রেশটুকু সকলের কানে গিয়া অবশ্য বেশই বাজিল। থিয়েটারে শ্যামাকান্তের বক্তৃতায় অনেকেরই অক্ষির স্নায়ুমণ্ডল বিশেষ উত্তেজিত না হইয়া পারিত না, এখানেও শ্রোতাদের উপর তাহার ক্রিয়া অবশ্য বেশ পরিস্ফুট আকারেই দেখা দিল। একে ত এই শোকের দৃশ্যে উপস্থিত মহিলামণ্ডলীর চক্ষু একটু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন অভিনেতার এই করুণ সুরের শীতল হাওয়ার সেই বাষ্প যে অতি সহজেই নীল আকাশ হইতে বৃষ্টিবিন্দুর মত ঝর্‌ঝর্ পড়িতে থাকিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! কিন্তু এই বর্ষণটার সঙ্গে অনেকেরই নিজ হৃদয়ের একটা দুঃখ প্রবণতার যতটা যোগ ছিল, দুঃখীর উপর যথার্থ সহানুভূতির যোগ ততটা ছিল কি না সন্দেহ।

কেন না উপস্থিত অনেকেরই বৈধব্যের ব্যাখ্যায় ও বক্তৃতায় এত বেশী বিভোর

হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, হতভাগী বিধবাটার দিকে তাঁহাদের নজর থাকিলেও, মন দিবার যেন ততটা অবসরই ছিল না। মুরলা এখনও সেই শীতের বাতাসে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ও কাঁদিতেছিল। বাড়ীর সাম্‌নেই এই পুকুর, ভোলানাথ হাতের ভিতর মুখ গুঁজিয়া চাতালে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার এ সব দিকে বড় হুঁস্ ছিল না। ভোলানাথের জেঠতুত ভগিনী ক্ষেমঙ্করীর মনটাও যেন চারি পাশের আলোচনায় একটু বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু এই দলের মধ্যে একটি বার তের বছরের ছেলের কানে ঐ ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা গুলো যেন কেমন বেসুরো ঠেকিল। মুরলার অবস্থা দেখিয়া সে ক্ষেমা পিসির একটু কাছে গিয়া কহিল,—

"হ্যাগা আগে বিধবা হলে, পড়েছি অনেকে আগুনে পুড়ে মরত। এটা কি শীতেই আড়ষ্ট হয়ে মরবে?"

খুবই স্পষ্ট কথা। ভাবের নেশা কাটাইয়া বালক সরোজ কুমারের মত সহজ চক্ষে দেখিলে, মুরলার ক্রন্দনের মধ্যে পতিশোক অপেক্ষা শীতের প্রকোপটাই সকলের নজরে পড়িত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুরলা বেদান্তবাগীশের তৃতীয় পক্ষের একমাত্র ফল। এই ফলটি দিয়াই পতিপ্রাণা সাধ্বী পঞ্চষষ্টিবর্ষীয় ভোলানাথের পাকা বুকে কাঁচা মাথা রাখিয়া পূর্ণ যৌবনেই ভবের খেলা শেষ করিয়াছিল। আদর্শ ও কবিত্বের ক্ষেত্রে যাহাই মানুন, ভোলানাথ নিজের ব্যবহারে পত্নীর ঐ বিশেষণ দুটীর মর্য্যাদা বড় যেন রাখেন নাই। তরুণী ভার্য্যার প্রাপ্য হিসাবে হরসুন্দরী ভোলানাথের নিকটে সোহাগ যে কিছু আদায় করিতে পারে নাই, তাহা নয়। কিন্তু সোহাগ অপেক্ষা স্বামীর সংশয়ের বেগটাই যেন তাহাকে বড় বেশী কড়া রকমে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

উভয়ের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর ফারাক সত্ত্বেও পতিপ্রাণতা যতটুকু গজাইবার সম্ভাবনা পত্নীর সাধ্বীত্বের প্রতি অসঙ্গত সতর্কতায় সেটুকু ও যেন আরও মুষড়াইয়া গিয়াছিল। হরসুন্দরীর এই অকাল মৃত্যুটা ভোলানাথের পক্ষে যাহাই হোক, তাহার নিজের কাছে খুব একটা আপশোষ ও ক্ষতির আকারে বড় যেন দেখা দেয় নাই। তাই কৃতান্ত যে দিন তাহাকে স্বামীর বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া লইল, সে দিন তার হাত দু'টা সেই বক্ষ আঁকড়াইয়া ধরিতে তেমন আগ্রহ দেখাইল না। ফল কথা, বৈদান্তিক মহাশয় তাঁহার স্ত্রীটিকে কেবল ব্যবহারিক সত্য রূপে গ্রহণ করায়, তাহার প্রতি তাঁর নিজের ব্যবহার কতকটা সত্য হইলেও, তেমন যেন শিব ও সুন্দর রকমের বড় হয় নাই।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা বর্ত্তমানের একটা অতীত ভূমিকা মাত্র। এখন মুরলার বৈধব্যের পর বহু বর্ষ চলিয়া গিয়াছে। ভোলানাথের সংসারের উপর কালের চাকা ইহার

মধ্যে অনেক নূতন দাগ কাটিয়াছে। তাঁর পূর্ব্ব পক্ষের দুইটি পুত্র এখন লায়েক হইয়া কাজের উপলক্ষে প্রবাসেই থাকে, তাহাদের সঙ্গে এই আখ্যানের যেমন কোনই সংস্রব নাই। পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে ভোলানাথের জ্যেষ্ঠতুত ভগিনীই গৃহস্থালির হাল ধরিয়া ছিলেন। কৃতান্তের ডাকে তাঁহাকেও লোকান্তরে যাইতে হইয়াছে। তবে এই হালটা দিদিমা যখন ছাড়িতে বাধ্য হইলেন, তখন ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুষ্টিতে সেটা ধরিবার মত শক্তি কতক জন্মিয়াছিল। কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় মুরলা এ বিষয়ে অনেক পাকিয়া উঠিয়াছে—তরুণীর হাতে গৃহস্থালির তরণী বড় মন্দ চলিতেছে না।

তবে অবশ্য কেবল হাল ধরিলেই নৌকা চলে না, নীচের যথেষ্ট জল থাকা চাই। ভোলানাথের সংসার নদী কূলে কূলে ভরা না থাক, তাহাতে কখন চড়া পড়িত না। বেদান্ত-বাগীশের শিখা ও পাণ্ডিত্য দুইটারই বেশ পসার ছিল। সর্ব্বত্রই নিভৃত সাধনা অনেক সময় লোকের চক্ষু এড়াইয়া যায়। কিন্তু শিখা যেখানে উদ্ধত ও উন্নত ভাবে পাণ্ডিত্যকে উঁচু করিয়া ধরিতে পারে, সেখানে তার অবর দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বিদায় আদায়ের প্রণালী দিয়া ভোলানাথের সংসারে যে রস প্রবাহ আসিয়া পড়িত, তাহার উপর গৃহস্থালির পাড়ি জমানর কোনদিনই ভোলানাথের বড় ব্যাঘাত ঘটে নাই।

এখন বর্ত্তিকে এই রসসংগ্রহের কিছু ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার সংসারের বিভূতি কমিয়াছে বৈ বাড়ে নাই। ইহা ছাড়া পুত্রেরা এখন ইংরাজী লিখিয়া অন্য ব্যবসায় ধরিয়াছে—সে দিকটায় এখন ভোলানাথের রসদের অপেক্ষা বরং রসসংগ্রহই কিছু হয়। তবে সেটার পরিমাণ অবশ্য এখনও বড় বেশী দাঁড়ায় নাই কারণ পুত্রেরা একে কাজে কতকটা নূতন ব্রতী, তার উপর তাহাদের নূতন পাতা সংসার সৃষ্টিতত্ত্বের সনাতন নিয়মে যথাক্রমে নূতন নূতন মুখ ব্যাদান করিতেছিল। ইংরাজি শিক্ষার এই অর্জ্জন ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে ইহার দোষও যে পুত্রদের ভিতর কিছু সংক্রামিত হইয়াছে, এটাও সূক্ষ্ম বুদ্ধি ভোলানাথের বুঝিতে বড় বাকি ছিল না। কারণ তাহারা প্রকাশ্যে তত্টা কিছু না বলিলেও, বৃদ্ধ পিতার উদ্বাহ প্রবণতায় যেন বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিল।

কিন্তু ভোলানাথের এই কাজটা তাঁহার ইংরাজীনবিশ পুত্রদের ভাল না লাগুক, অশেষশাস্ত্রবেত্তা বেদান্তবাগীশ ত ইহাতে কোন সংহিতার বিধি লঙ্ঘন করেন নাই। আজ কাল তাহার পুত্রদের মত যুবকদল যে এরূপ পরিণয়ের প্রতি বিরুদ্ধতা দেখায়—সেটা যে তাহাদের বিদেশী শিক্ষার বিকৃত ফল। ভোলানাথ ছেলেদের টোল ছাড়াইয়া যখন ইংরাজী ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে এরূপ শিক্ষায় এমন সব মতি বিপর্য্যয় ঘটিবে এটা জানিতেন না, তাহা নয়। কিন্তু মতির বিপর্য্যয় অপেক্ষা চাকুরির বিপর্য্যয়ের উপরেই তাঁহার নজরের ঝোঁকটা বোধ হয় বেশী পড়িয়াছিল। প্রাচ্য ভারতী অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভারতীর সঙ্গে আজ কাল কমলার কিছু বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখিয়াই তিনি এই অহিন্দু বাগ্দেবীর সেবাতেই তাঁর হিন্দু সন্তান দুটিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তাই তাঁহার পুত্রদের এই শিক্ষা বিভ্রাটে ভোলানাথ অবশ্য দৈবে পড়ান নাই, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য অনেকটা সফলই হইয়াছিল বলিতে হইবে। পুত্রেরা অসন্তুষ্ট হইলেও, অকৃতজ্ঞ ছিল না। পুত্রদের অসন্তোষটা তিনি বড় গায় মাখেন নাই, এটাকে তিনি কলির একটা অনিবার্য্য অধর্ম বলিয়াই মনে করিতেন। কাজেই তাহাদের অর্থ-সাহায্যের চেষ্টার ভিতর তাহাদের কৃতজ্ঞতাকে এরূপ মূর্ত্তিলাভ করিতে দেখিয়া শুধু সেইটাকে ভোলানাথ এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মের বাকি নিদর্শন বলিয়াই বোধ হয় মানিতেন।

ভোলানাথ শাস্ত্র মতেই হরসুন্দরীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন, এখনও এই বয়েসেও শাস্ত্র মতেই কত শত হরসুন্দরীর পিতাকে তিনি কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। বাটের পরেও যে ভোলানাথ ষোড়শী পত্নীর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আরাধনা নিজের অটুট স্বামিত্ব ও দেবত্বের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাও অবশ্য অশাস্ত্রীয় নয়। তাই বুঝি হরসুন্দরীর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের শক্তিটাকে তাঁহার পদপঙ্কজ ছাড়া বিষয়ান্তরে একটুমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিলেই, ভোলানাথের হৃদয়ে অমনই সন্দেহের আগুন জ্বলিয়া উঠিত, তাহাতে তিনি নিজে পুড়িতেন, পত্নীকেও কম পোড়াইতেন না।

এ বিষয়ে ভোলানাথের অনুভূতি এতটা সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছিল যে, পত্নীর শরীরে সামান্য একটু এসেন্সের আমেজ, একটু অলঙ্কারের পারিপাট্য বা একটু বেশের বিশেষত্বেই তাঁহার মানস চক্ষুতে একেবারে গীতগোবিন্দের একাদশ সর্গটা যেন ফুটিয়া উঠিত। আসল কথা শাস্ত্রবেত্তা ভোলানাথের শাস্ত্রজ্ঞানে যাহাই বলুক, ষোড়শীর উপর তাঁহার প্রাপ্য দাবীটায় মরাগ্রস্ত ভোলানাথের তেমন বিশ্বাস ছিল না। তাহা থাকিলে পত্নীর এই সব প্রসাধনের মধ্যে একটা যৌবনসুলভ সাজসজ্জার প্রতি অনুরাগমাত্রই তাঁহার নজরে পড়িত, বাস্তবিক তাহাতে কোন রকম পূর্ব্বরাগের ব্যাপার তেমন কিছু ঘটে নাই বুঝিতেন।

যাই হোক্ ষষ্ঠি বর্ষীয় বিপত্নীকের যত ইচ্ছা তত পরিণয়ে শাস্ত্র কোন অন্তরায় না ঘটাইলেও, দৃষ্ট বর্ষীয় বিধবার স্বাভাবিক আবদারটুকুও সারেস্তা করিতে অবশ্য আচার ও বিধির অন্ত নাই। সধবার উপর যে দৃষ্টিটা এত তীক্ষ্ণ ছিল, বিধবার উপর সে দৃষ্টিটা যে কিছু কোমল হইবে, এমন আশা বা আশঙ্কা করিবার অবশ্য কোন কারণ ছিল না। অতি বাল্য হইতেই মুরলার ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতায় কেহ কিছু খুঁত ধরিতে পারে নাই। ভোলানাথের পাকা হাতের কষুনিতে মুরলার অতি কচি দেহ ও মনের উপরই বৈরাগ্যের বাঁধনগুলো খুব শক্ত রকমই ছিল। ভোলানাথ নিজের সুখ-সুবিধার দিকে চিরদিনই কিছু যত্নপর, বালিকাও এই যত্নপরতায় কোন উদাসীন্য জন্মায় নাই। তাহা বলিয়া বিধবার কোন বিলাসিতা না হোক্ একটু আমোদেরই প্রশ্রয় দিয়া তিনি শাস্ত্র ও কন্যার মাথা এক সঙ্গে কেমন করিয়া খাইবেন।

ঠিক কথা বলিতে গেলে, ভোলানাথ কন্যার শাসন সম্বন্ধে কঠোর শাস্ত্র অপেক্ষাও যেন কঠোর ছিলেন। পিতাকে মাছের মুড়ো চুষিতে দেখিয়া সাত বৎসরের বিধবা যখন কচি

হাতখানি বাড়াইত, তখন যে ভোলানাথ চোখ রাঙাইয়া গর্জ্জন করিতেন, এটা অবশ্যই শাস্ত্রীয় শাসন। কিন্তু পূজার সময়ে বিনোদিনীর রঙিণ কাপড় দেখিয়া মুরলা তার জন্য আবদার ধরিলে, ভোলানাথ যে কন্যার পৃষ্ঠে চপেটা বসাইতেন, এটা বোধ হয় শাস্ত্র অপেক্ষাও কঠোর। হিন্দু ঘরের এরূপ বিধবারা এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ যতটুকু প্রশ্রয় পায় ভোলানাথ তাহার অর্দ্ধেকও কন্যাকে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দার্শনিক ভোলানাথ বুঝি মনস্তত্ত্বের গভীর আলোচনায় ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে এই সব প্রবৃত্তিগুলোকে ছোট বেলায় এমন করিয়া না দাবিলে পরে তাহারা বিপ্লব ঘটাইতে পারে। রঙিণ কাপড়ের প্রতি এই বালিকার আকাঙ্ক্ষাটা যদি একটু প্রশ্রয় পায়, তবে সেটা কি পরে প্রলয়ঙ্করী বাসনার আকার ধরিবে না?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন জিনিষটা এত জটিল যে তাহার সম্বন্ধে একটা কাঁটাছাঁটা তত্ত্বের উপর একেবারে নির্ভর করা চলে না। বিশেষতঃ এই তত্ত্বটা যদি নিজের মর্ম্মের ভিতর না গাড়িয়া বসে, শুধু বাহিরে একটা খোটার মত জীবনের গায়ে একটু ঠেক্‌নো দেয় মাত্র, তবে তার স্থায়িত্বের আশা অবশ্য আরও অনেক কম। জীবনটা যদি একঘেয়ে শান্ত শীত ঋতুই হইত, তবে এরূপ ঠেকনোয় তার ঝোঁকটা অনেক কাটিতে পারিত কিন্তু চৈত্র-বায়ুর উদ্দাম দোলু—তাহাকে রোধ করা ত আর ঐ ঠেকনোর জোরে কুলায় না।

প্রতি কুড়িবার বসন্ত মুরলার জীবনের উপর দিয়া বেশ ধীর পদেই চলিয়া গিয়াছে। তাহার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ব্রহ্মচর্য্যের বেড়া ঠেলিয়া একটুও যে তার হৃদয়কুঞ্জে লাগে নাই, অবশ্যই তাহা নয়। কিন্তু তাহার নিশ্বাসের সঙ্গে তার সখীটীর পুষ্পধনুর গন্ধ মিশিয়া সেখানকার হাওয়ায় কোন রকম মাদকতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তবু এই খামখেয়ালী দেবতাটীকে কি বিশ্বাস আছে? ইনি কোথায় কোন ছলে কি বিপ্লব ঘটাইবেন, তাহার ঠিকানা পাওয়া, শোনা যায়, মুনিঋষিরও সাধ্যাতীত।

ভোলানাথ নিজে অবশ্য একজন মস্ত তত্ত্বজ্ঞানী। দুহিতার বৈরাগ্য সাধনার সঙ্গে তাঁহার একটু তত্ত্বজ্ঞান মিশাইবার ঝোঁকটা নিতান্তই স্বাভাবিক। তিনি প্রথমে মুরলাকে একটা ছোটখাট মৈত্রেয়ী-গার্গী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সংসারের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিলেও, সেই সঙ্গে যে একটা কেমন ভাব জাগাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া ভোলানাথ নিজে এই জ্ঞানের এতটা অধিকারী হইয়াও সংসারকে ত বড় বেশী অসার ঠাওরাইতে পারেন নাই। তত্ত্বজ্ঞানের কাছে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ভোগ ও ত্যাগের কি কোন পৃথক মানদণ্ড আছে? ভোলানাথ জ্ঞানী হইয়াও কম ভোগী ছিলেন না। মুরলা যে তাঁহার কাছে জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া ত্যাগের পথ ধরিবেই এমন আশা কৈ?

তাই তাঁহার এই ছোট গার্গীটি যখন তত্ত্বজ্ঞানের একটু আস্বাদ পাইয়া প্রশ্ন করিতে

শিখিল, ভোলানাথ তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। যে শিক্ষায় বিচারের চোখ খুলিয়া দেয়, বিধিব্যবস্থার কার্য্যকারণ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন জাগাইয়া তোলে, সে শিক্ষা জগতের অসারতা প্রচার করিলেও তাহাকে এক্ষেত্রে বড় বিশ্বাস নাই। সেই জন্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা এ সম্বন্ধে একটা অধিকার ভেদ করিয়া নারী জাতিকে এ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। ভোলানাথ বেদান্তবাগীশ এই তত্ত্বজ্ঞানের এমন জবর অধিকার পাইয়াও এখনও সপত্নীবর্ষে কেন স্বেচ্ছামত পত্নীর সংখ্যা বাড়াইতে পারেন, আর শিশু বিধবাটি কেন একটু রঙিন কাপড়ও পরিতে পারে না, এই কূট প্রশ্ন যে জ্ঞানে বাড়িবার সম্ভাবনা মুরলার মনে তাহার আঁচ লাগান কখনই নিরাপদ নয়।

শেষ সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল, চোখ খুলিয়া নয়, চোখ বাঁধিয়াই মুরলাকে ত্যাগের পথে চলিতে হইবে! চোখ খুলিলে পথের সঙ্গে চারিদিকের বৈষম্যও যে তাহার নজরে পড়িবে। চোখ বাঁধা থাকিলে, পথের সহিত পদের একটা অন্ধ অনুভূতি ছাড়া আর কোন বালাই নাই। কলিকাল মৈত্রেয়ী গার্গী গড়িবার পক্ষে একেবারেই প্রশস্ত নয়! তবে? তাজ্জব ব্যাপার, ভারতের ভাবো, পুরাণে একটিও তেমন আদর্শ বিধবা-চিত্র নাই। সতী-শিরোমণি সীতা, তিনি ত পুরোপুরিই সধবা। সাবিত্রী বিধবা হইয়াও সধবা—সত্যবান্ মরিয়াও মরিল না। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চ কন্যাদের মধ্যে দুই একটি বিধবা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্ত যে একেবারেই সুবিধাজনক নয়। আধুনিক আদর্শবাদীর কলমেও ফুটিয়া উঠিত কি না রোহিণী আর কুন্দনন্দিনী!

তবুও ভোলানাথ আদর্শবাদের এই অভাবাত্মক রহস্যটার মধ্যে কি তত্ত্ব খুঁজিয়া পাইলেন, জানি না, তবে তিনি এখন অবশ্য জ্ঞানের পথটা মুরলার সম্মুখে একেবারে রুদ্ধ রাখিয়া নিতান্ত ভক্তির পথেই তাহাকে টানিতে চাহিলেন। যে পথেই টানুন ভোলানাথের টানটা একটুও হাত ধরিয়া চলার মত নয়, কেবল জোর করিয়া ঠেলিবার মতই দেখাইয়াছিল। ভোলানাথের শিক্ষার উপনিষদের ব্যাখ্যান দিয়াই হৌক, আর পুরাণের আখ্যান দিয়াই হৌক, তাহাতে উপদেশ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উদাহরণ একটুও ছিল না। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ বড়, এটা নাকি আধুনিক প্রথা; উপদেষ্টার দিকে চোখ না দিয়া উপদেশকে কাণের ভিতর লওয়াই নাকি প্রাচীন বিধি। তবে ইচ্ছা করিয়া কাণা সাজিয়া শুধু কাণ খাড়া করিয়া থাকার মত আত্মবঞ্চনা, না হয় আত্মবিলোপের প্রণালীটা মানুষ সুস্থ জ্ঞানে তেমন অনুসরণ করিতে পারে কি না সন্দেহ।

তবে ভোলানাথের কন্যা ও শিষ্যা কি আত্মলোপটাকে আত্মবঞ্চনা বলিয়া বুঝিয়া আত্মভোগের দাবীটাই প্রতিষ্ঠিত করিতে বসিবে? সে কি সাম্যের দাঁড়িপাল্লার অধিকারের তৌল করিয়া নিজের প্রাপ্য আদায় করিতে কোমর বাঁধিবে? সে কি পিতার জীবনের খাতা দেখিয়া নিজের ভোগ ও ত্যাগের জমা খরচ কাটিবে? এ সব হিসাব গরহিসাবের ব্যাপার অবশ্যই তাহার চিত্তকে বিচলিত করে নাই। পিতা ও উপদেষ্টার প্রতি ভক্তি

নিয়তই প্রায় তাহার অসুখ ছিল, কোনরূপ সতর্ক সমালোচনার সন্তাপে কখনই তাহার বড় একটা অসুচর ঘটে নাই। সবই সত্য, তবু একটু কথা আছে।

জীবনই জীবন গড়িয়া তোলে, উপদেশ তাহা বড় পারে না। উপদেষ্টা ভোগী হইলে শিষ্যও ত্যাগী হইতে চাহে না, এতটা ঠিক না হৌক, কিন্তু কাহারও উপদেশ নিজের জীবনগত না হইলে, অপর জীবনের উপর যে তাহার প্রভাব ততটা পড়া কখনই সম্ভব নয়, এটা অবশ্য মানিবার মত কথা। ভোলানাথ আত্মসুখী বলিয়া তাঁহার অনুসরণে তাঁহার সন্তানও আত্ম-সুখ খুঁজিবেই, এটা একটা ধ্রুব সিদ্ধান্ত নয়,—আত্মসুখী পিতার কি আত্মত্যাগী সন্তান পৃথিবীতে একেবারে দুর্লভ? কিন্তু বৈরাগ্যের আদর্শটা শুধু বাক্যে নয়, কাজে যদি ভোলানাথ নিজের জীবনে ফুটাইয়া দেখাইতেন, তবে সেটার প্রভাব আরও কতগুণ বাড়িত! অবশ্য এই সম্ভাবিত প্রভাবের পরিণাম এখন আর কে ঠিক করিবে। আর সেই বর্দ্ধিত পরিমাণের বোঁকটাই নিশ্চয়ই মুরলার চিত্ত চিরদিন সংযত করিয়া রাখিত, এতটাই বা কে বুক ঠুকিয়া বলিতে পারে?

কারণ শুধু নারী-চরিত্র বা পুরুষের ভাগ্য নয়, মানুষের মন জিনিষটাই দেবা ন জানন্তি কুতোঃ মনুষ্যাঃ। তত্ত্বজ্ঞেরা এই মনের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা প্রণালী ঠিক করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু মনটা যে কলের মত সেই প্রণালীর বশে চলিবেই, এমন কেহ বলিতে পারে না। এমন ব্রহ্মচর্য্যের কড়া পাহারার মধ্যে থাকিয়াও মুরলার মনে অন্ত ভাব কেন জুটিল, ইহার ঠিক খবর কে দিবে? বাল্মীকির আবহাওয়ায় পুষ্ট হইয়া তাহা কালিদাসের দিকে এমন ভাবে কেন ঝুঁকিল, ইহার কোন কাটাছাঁটা উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই বার-তের বছরের এম্ ই ইস্কুলের ছাত্র সরোজকুমার এখন একজন সুশিক্ষিত যুবক। শ্যামাকান্তের সেই বক্তৃতা ইহারই কাণে বেসুরো লাগিয়াছিল, বৈধব্যের চেয়ে শিশু মুরলার শৈশবের সেই ক্লেশটাই ইহার চোখে বেশী পড়িয়াছিল। সরোজ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট মার্কামারা বিদ্বান। তবে সরোজের এই বিদ্যার মার্কাটা শুধু তাহার বাহিরে একটা ছাপের মত লাগে নাই, তাহার ভিতরেও একটু ছোপ ধরিয়াছিল।

যাহাদের এই মার্কা শুধু একটা বাহিরের ছাপ মাত্র, তাহারা মার্কা ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই ছাপটাই জাহির করে, বিদ্যাটার সঙ্গে আর বেশী কিছু সম্বন্ধ রাখা তত দরকার মনে করে না। কিন্তু সরোজের মনের ভিতর ইহার ছোপ ধরিয়াছিল বলিয়া বিদ্যার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক এত সহজে মুছিয়া গেল না। কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের যে একটু আস্বাদ পাইয়াছিল, এখন তাহারই রসপানে সে সমুৎসুক। ভোলানাথের কেবল দর্শনে নয়, কাব্যেও বেশ একটু পারদর্শিতা ছিল। সরোজ এখন তাঁহারই কাছে এই সাহিত্য চর্চ্চা সুরু করিয়াছে।

সরোজকুমার ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে মানুষ হয় নাই। এখন আবার এই ধরায় শুধু ঐশ্বর্য্যের কেন, কোন ক্রোড়ই তাহার আর ছিল না। সরোজের অতি বাল্যেই তাহার মাতার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, কয়েক বৎসর হইল, তাহার পিতাও সেই অজানা লোকে চলিয়া গিয়াছেন। সরোজ এই কয় বছরে এই জানা লোকের অনেক অভাব-অনটন জানিয়াছে।

এই অভাব অনটন অনেক সময় খুব গুরু হইয়া উঠিলেও, সেগুলো তার বিদ্যা চর্চ্চার একাগ্রতাকে চাপিয়া মারিতে পারে নাই। নিজের এই একাগ্রতার বলে সকল রকম অন্তরায়কে নানা উপায়ে কাটাইয়া এখন সে সাফল্য লাভ করিয়াছে। তবে বিদ্যার অর্থগত সাফল্য এখনও তাহার কিছুই ঘটে নাই। সরোজের সে জন্য তেমন যেন একটা বিশেষ আকুলতাও ছিল না। দুই চার মাস সে এখন নিজের সামান্য পল্লী গৃহটীতে আস্তানা গাড়িয়াছে। একটু আধটু গৃহশিক্ষকতায় যাহা পায়, তাহাতেই তার এখন এক রকম চলে। সে নিজের হাতেই ঘরের কাজ সবই চালায়, এমন্তক রসুইবাস পর্য্যন্ত।

মুরলা সীতা-সাবিত্রীর দ্বারা আগাগোড়া ঢাকা থাকিলেও, কেমন করিয়া শকুন্তলা-উর্ব্বশী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহা ঠিক জানি না। কিন্তু তাহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন নায়িকাটীকে সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্ত করিয়াছিল ঐ কাব্যামোদী সরোজেরই নায়কত্ব। সরোজ যে দিন 'কালিদাস' বগলে পুরিয়া ভোলানাথের আশ্রমে আসিয়া দেখা দিল, সে দিন বুঝি মুরলার চারিদিকের শান্ত আকাশে একটু কান্ত'নের হিল্লোল খেলিয়া গেল। ভোলানাথের গৃহ যে কখন পূর্ব্বে কাব্যের রসাত্মক বাক্যে ধ্বনিত হয় নাই, তাহা ত নয়। কিন্তু সে বাক্যের সঙ্গে মুরলা তাহার মনের কোন ঐক্য কখন অনুভব করে নাই। তখন সেটা তাহার কাণেই পৌঁছিয়াছিল মাত্র, কিন্তু কাব্যের সেই বাঙ্ময় ভাবটী সরোজের কণ্ঠে যেন প্রাণময় হইয়া এখন মুরলার মরমে গিয়া প্রবেশ করিল।

পিতার মুখে বৈরাগ্যের কত রকম ব্যাখ্যাই না মুরলা তন্ময় হইয়া শুনিয়াছে। কত পতিব্রতার উজ্জ্বল চরিতাখ্যান সে একাগ্রমনে অধ্যয়ন করিয়াছে। তাহার এই শ্রবণ ও পঠনজাত জ্ঞানটা যে তাহার কাছে তোলা সাজের মতই ছিল, তাহার নিত্যকার আটপৌরে জীবনে সেটা যে একটুও আমল পায় নাই, ইহাও নয়। তবু তাহার সেই আচার ও অনুষ্ঠানরত হৃদয়ের তপোবনে আকাঙ্ক্ষার বীজ আধমরা থাকিলেও একেবারে মরে নাই। তাই এখন সেটা বুঝি কোন অনুকূল রসের সিঞ্চনে একটু একটু অঙ্কুর ছাড়িতে সুরু করিল।

মুরলা বৈরাগ্যের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলো এখনও তন্ন তন্ন করিয়া পালন করে, কিন্তু তাহার মানসিক বৈরাগ্যের মূর্ত্তিটা যেন দিন দিন একটু রাগরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। ভোলানাথের মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের পর সরোজ প্রায় প্রত্যহ তাঁহার নিকট সাহিত্যচর্চ্চা করিতে আসে। যৌবনে ভোলানাথের কাব্যরসের প্রতি বিশেষ একটু টান ছিল, বার্দ্ধক্যেও রসটুক তাঁহার কাছে তিক্ত লাগিত না। ইংরাজিনবিশ সুশীলের সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়া ভোলানাথ

বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন, ছাত্রের একাগ্রতার অনুপাতে তিনিও বিশেষ উৎসাহেই অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন।

কিন্তু তাঁহাদের এই সাহিত্যচর্চ্চার সঙ্গে আর একটী হৃদয়ে যে অপর রকম চর্চ্চা সুরু হইয়াছিল, এ খবর অবশ্য তাঁহারা দুজনেই প্রথমে কিছু রাখেন নাই। এই হৃদয়ের অধিকারিণীর কাছেই যেন তার ভিতরকার এই পরিবর্ত্তনটার আসল রূপ প্রথমে একটু পরিস্ফুট ছিল না। সরোজের ঐ একাগ্র অধ্যয়ন ও আলাপটার দিকে মুরলা যে বিশেষ একাগ্র হইয়া পড়িতেছে, এটা সে অবশ্য বুঝিত, কিন্তু তার এই একাগ্রতার মূল কারণটা প্রথমে তাহার কাছে একটু যেন ধরা পড়ে নাই। ভাল লাগিত বলিয়া মুরলা নিত্যই এই অধ্যয়নের সময়টিতে ভিতরের রোয়াকে আসিয়া বসিত। ক্রমে সে কাব্যালাপে এতটা মজিয়া গিয়াছিল যে, ছাত্রের অনুপস্থিতিতে ইহা কোন দিন বন্ধ থাকিলে মুরলার মন বড় যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িত।

যাই হোক, নিজের মনের ভাব আর নিজের কাছে কত দিন লুকান থাকে মুরলা ক্রমে বুঝিল, তাহার এই আগ্রহটা শুধু একটা কাব্যপ্রিয়তা ছাড়া আরো কিছু—আর সেইটাই আসল ও মূল কিছু। সরোজ ছাড়া আরও অনেকে ত ভোলানাথের কাছে এরূপ আলাপের অবতারণা এখনও করে, কিন্তু তখন মুরলার চিত্ত কি এমন উন্মুখ হইয়া ওঠে? মুরলা অবশ্য শেষে বেশ স্পষ্টই অনুভব করিল যে, তাহার মনের ঝোঁকটা কাব্যের দিকে কিছুই নয়, ঐ নবীন কাব্যামোদীর দিকেই সবটাই। কালিদাস তাহার কেহই নয়, সরোজকুমারই তাহার সর্ব্বস্ব।

সত্যই যে সে শকুন্তলার ব্যাখ্যান বা উর্ব্বশীর বিশ্লেষণ শুনিতে বড় আসে নাই, সে যে নিজেই শকুন্তলা বা উর্ব্বশী হইয়া কাব্য চর্চ্চার মধ্যে দেখা দিয়াছিল এখন উপায়? এখন ত আর মনকে আঁখিঠারা চলে না, সে যে নিজের কাছে এখন নিজে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে। জানিয়া শুনিয়া সে এখনও কি এই নূতন স্রোতে গা ভাসান দিবে? এতদিনের বৈরাগ্যের খোঁটাগুলির কি কোনই জোর নাই? মুরলা স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজেকে এই নূতন স্রোতের মুখে ছাড়িল না, সে যথাশক্তি সেই খোঁটাগুলিকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিল।

মুরলা কাব্যালাপ একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। এখন হইতে বাহিরে যখন গুরু ও ছাত্রের আলাপ চলিত, তখন মুরলা দরজা জানালা বুঁড়িয়া নিজের ঘরে সাবিত্রীর ব্রতকথা পড়িতে রত থাকিত। সরোজ গ্রামের ছেলে, দরকার পড়িলে তাহার সহিত দু'একটা কথা কহায় মুরলার বাধা ছিল না। আর এমন দরকারও মাঝে মাঝে পড়িত, বৃদ্ধ ভোলানাথের অসুস্থতা ঘটিলে, ঔষধ-পথ্য আনা ও সকল সময়েই একটু আধটু বাজারহাট করার মত দুই একটা সাংসারিক কাজ সরোজের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। তাহা হইলেও মুরলা যতটা সম্ভব সরোজের সংস্রব হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে প্রয়াস পাইত।

ভোলানাথ ও সরোজ অবশ্য মুরলার ভাব-নদীর এই জোয়ার ভাঁটার কোনই আভাস পাইল না। মুরলার বাহ্য আচরণে এমন কিছুই দেখা যায় নাই, যাহাতে ভোলানাথের সন্দিগ্ধ মনেও কোনরকম সন্দেহ আসিতে পারে। আর সরোজ ত বাহিরের লোক, তাহার চোখে মুরলার আকৃতিটাই যখন বড় পড়িত না, তখন সে মুরলার প্রকৃতির খবর কেমন করিয়া জানিবে। মুরলা তাহার অনুভবের নিকটেই বড় আসে নাই, তাই এখন তাহার এই দূরে থাকার ভাবটাও সরোজের নজরে বড় পড়িল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভাজপুরের সকল রকম আড্ডা ও আশ্রমেই শ্যামাকান্ত ভাদুড়ীর গতিবিধি। আর এই সকল রকম আড্ডা ও আশ্রমের সকলরকম আলোচনার ব্যাপারেই শ্যামাকান্তের বাক্-শক্তি নিয়তই অব্যাহত। ইহারই একটু নিদর্শন মুরলার সেই বৈধব্যের দিনে একটু পাওয়া গিয়াছে।

শ্যামাকান্তের এই বাক্যের কারবারে একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। ইহাতে তাহার নিজের মূলধন বড় কিছু ফেলিতে হইত না। গ্রামের থিয়েটারে বহুদিন অভিনেতৃত্ব করিয়া শ্যামাকান্তের পরের কথাকে আপনার করিয়া লইবার একটা শক্তি জন্মিয়াছিল। অভিনয়ের বাহিরে অন্য ব্যাপারেও তাহার এই শক্তিটার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যাইত। অভিনীত গ্রন্থের ভাব সম্বন্ধে তাহার ততটা অধিকার না থাক, ইহার বাক্‌সম্পদ ত শ্যামাকান্ত অবশ্যই আয়ত্ত করিয়া ফেলিত। তাই শ্যামাকান্তের আলোচনায় যুক্তির অভাব ঘটিলেও উক্তির অভাব ঘটিত না। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির কোন মূলধন খাটাইতে হইত না বলিয়া শ্যামাকান্ত তাহার কথার ব্যবসাটা খুব বেপরোয়া চালাইত।

শুধু বাক্‌সম্পদ নয়, শ্যামাকান্তের অর্থসম্পদও ছিল। কিন্তু তাহার এই বাক্ ও অর্থের প্রতিপত্তি অবশ্য রঘুবংশ প্রণেতার সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নয়। শ্যামাকান্তের বাক্যে রস ততটা নয়, যতটা ছিল পরের চোষা ছিব্‌ড়ে। আর তার কথাটা অনেক সময় নিরর্থক ঠেকিত, তবে তার লোহার সিন্দুকটা সকল সময়েই যথেষ্ট অর্থে ঠাসা ছিল। যাই হোক, এই সিন্দুকের অর্থটারও তাহার কথার কারবারে কম সুযোগ ঘটে নাই।

যাহাদের ভাবিয়া সংসার চালাইতে হয়, তাহাদের এক ত কথার অবসর কম পড়ে, তা ছাড়া তাহাদের একটা ভাবনার অভ্যাসও জন্মায়। অবসর মিলিলেও এই অভ্যাসক্রমে কথার পূর্বে তাহাদের একটু চিন্তা করারই সম্ভাবনা। তাই তাহাদের কথার বেগ এই চিন্তায় আট্‌কাইয়া একটু মন্দ গতি হইতে পারে। কিন্তু শ্যামাকান্তের এ দুইটা বাধা বা বালাই ছিল না। শ্যামাকান্ত ভাবিয়া সংসার চালাইত না, ভাবিয়া কথাও বলিত না।

শ্যামাকান্তের পিতা তাঁহার এই একমাত্র পুত্রের হাতে প্রায় লাখ দুই টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া ভবসংসারের খতিয়ান গুটাইয়া ছিলেন। শ্যামাকান্তের আমলে এই

পৈতৃক সম্পত্তির বর্দ্ধন ছাড়া কখনই হ্রাস ঘটে নাই। কথা খরচের বেলা শ্যামাকান্ত আপন পর ভেদ করিত না, কিন্তু টাকা খরচের বেলা তাহার এই ভেদজ্ঞান টনটনেই ছিল। নিজের ভোগ-বিলাসের আয়োজনে শ্যামাকান্ত ব্যয়কুণ্ঠ ছিল না, কিন্তু দেশের ও দশের সকল ব্যাপারে তাহার কণ্ঠটা যত মুক্ত থাকিত, হস্তটা তত মুক্ত হইত না। শ্যামাকান্তের সংসারও তেমন বিস্তৃত নয়। তাহার প্রথম পক্ষের ছেলেটী মাতামহের কাছেই থাকে, সে তার অবস্থাপন্ন মাতামহের একমাত্র ওয়ারিশান্। শ্যামাকান্ত আবার দারপরিগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু গতিক দেখিয়া মনে হয় এটি নিরেট রকমই নিষ্ফলা।

যাহার উপর সংসার ও সমাজের ভার এতটা লঘু তাহার পক্ষে হরিসভার কীর্ত্তন হইতে নর্ত্তন পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারেই কথার ফাগ খেলিয়া বেড়ান, কিছুই শক্ত নয়। শ্যামাকান্ত আজ বিকালটায় বেদান্তবাগীশের সারস্বত আশ্রমে আসিয়া দেখা দিয়াছে। শ্যামাকান্ত বেহুঁস হইয়া কথার ফাঁকি ছড়াইত বটে, কিন্তু কোথায় কি রকম কথা ছড়ান চাই, এ বিষয়ে অবশ্য তার হুঁস ছিল। ইয়ারমহলে শ্যামাকান্ত কম ইয়ার ছিল না, তাহা হইলেও পণ্ডিতের কাছে সে পণ্ডিতী ধরণের কথা কহিতেই চেষ্টা করিত। যেমন থিয়েটারের অভিনয়ে তেমনই সামাজিক আলাপেও নানারকম ভোল ফিরাইতে পারিত।

শ্যামাকান্ত একটী বেতের মোড়ায় বসিয়া তার কুর কুরে গুম্ফ আস্তিনের উপর তার ছিপ ছিপে ছড়ির সোণাবাঁধান বাঁটটা হেলাইয়া রাখিয়া বলিল,—"গুড়োমশায়, বক্তৃতা যা কর্‌লে, তা আর কি বল্‌ব।"

বেদান্তবাগীশ একটু মুচকি হাসির সঙ্গে কহিলেন,—"কে, সংস্কারকদলের কোন পাণ্ডা নাকি ?"

শ্যামাকান্ত নাক সিট্‌কাইয়া উত্তর দিল, "ও পাণ্ডাদের সে পাণ্ডা কোথায়, তারা ত ভণ্ডামি কর্‌তেই জানে।"

ভোলানাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তা' বটে, ওরা আত্মজ্ঞানের সংস্কার করে না, পরের সংস্কারেই ব্যাকুল।"

শ্যামাকান্ত এবার ভারী উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল,—"ওদের জ্ঞান থাক্‌লে ত জ্ঞানের সংস্কার কর্‌বে। মায়ামুগ্ধ বদ্ধ জীব তার আবার চৈতন্য কোথা ? সেত ঘুমের ঘোরে সদাই খেয়াল দেখ্‌ছে। অহমিকার তিমিরে চারিদিক পরিব্যাপ্ত—মহেশ্বরের তৃতীয় চক্ষু কেবল তার ভিতর পথ দেখতে পায়। মোহিনী তাঁকেও ভুলিয়ে বিশ্বময় ঘোরাতে পারে। এদের দৃষ্টিতে পড়ে কেবল চারিদিকে বৈষম্য। তা' ত' পড়বেই। সাম্যের সম্যক রূপ দর্শন করা কি সহজ কথা ? সত্ত্ব, রজঃ, তম তিনটে গুণ যার বশীভূত হয়েছে তারই নয়নে বিশ্বের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। নহিলে—"

এই বলিয়া শ্যামাকান্ত একটা ঢোক গিলিল। ভোলানাথ তাহার কথার ছিড়্‌টা কাটিবার আশায় এই সুযোগে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক-ঠিক, যা বল্‌লে তাতে একটুও সন্দেহ নাই। তবে সেই বক্তৃতার কথাটা কি তুল্‌ছিলে ?" (ক্রমশঃ)

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

রবি-রশ্মি

চরকা

চরকা চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করিনি অপবাদ দিয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালীতে লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু দণ্ড দেবার বেলাতেও আমার পরে সম্পূর্ণ নির্ম্মম হতে পারেন না বলেই আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও আমার সঙ্গে এক কলঙ্কের রসায়নে মিল করিয়েছেন।

এ'তে আমার ব্যথা দূর হ'ল, তাছাড়া একটা অত্যন্ত পুরোনো কথার নতুন প্রমাণ জুটল এই যে, কারো সঙ্গে কারো বা মতের মিল হয়, কারো সঙ্গে বা হয় না। অর্থাৎ সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাধ্‌বে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ বিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই কাঠি বের করে আনেন। বস্তু দ্রব্যকে এরকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চুপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মৌমাছির বুদ্ধি করে তুল্‌লে নারায়ণের দরবারে হিসাব নিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে। ছোটো বয়সে জগন্নাথের ঘাটে স্নানযাত্রার প্রয়োজনে যখন যেতেম, নানা পাল্কীর মাঝি হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু কোনো একটার পরে যখন অভিরুচির পক্ষপাত প্রকাশ করা যেত, তখন সে জন্যে কারো কাছ থেকে শাসনভয় ছিল না। কেননা পাল্কী ছিল অনেক, যাত্রী ছিল অনেক, তাদের গন্তব্যস্থানও ছিল অনেক। কিন্তু যদি দেশের উপর তারকেশ্বরের এমন একটা স্বত্ব থাকৃত যে, তারণের জন্যে শুধু একটিমাত্র পাল্কীই পবিত্র, তবে তাঁর প্রবল পাণ্ডাদের জবরদস্তি ঠেকাত কে?—এদিকে মানবচরিত্র ঘাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে মরত, "ওরে পালোয়ান, কূল যদি বা একই হয়, ঘাট যে নানা,—কোনোটা উত্তরে কোনটা দক্ষিণে।"

শাস্ত্রে বলেন, ঈশ্বরের শক্তি বহুধা। তাই সৃষ্টিব্যাপারে পাঁচ ভূতে মিলে কাজ করে। মৃত্যুতেই বিচিত্র ভূত দৌড় মারে; প্রলয়ে সব একাকার। মানুষকে ঈশ্বর সেই বহুধা শক্তি দিয়েছেন, তাই মানবসভ্যতার এত ঐশ্বর্য্য। বিধাতা চান মানবসমাজে সেই বহুকে গেঁথে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের; বিশেষ ফললুব্ধ শাসনকর্ত্তারা চান, সেই বহুকে দ'লে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের। তাই সংসারে এত অসংখ্য এক-কলের মজুর, এক উর্দ্দিপরা সেপাই, এক দলের দড়িতে বাঁধা কলের পুতুল। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব জুড়িয়ে হিম হয়ে যায়নি, সেখানেই এই হ্যামানদিস্তায়-কোটা সমীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চল্‌ছেই। কোথাও যদি সেই

বিদ্রোহের লক্ষণ না থাকে, যদি দেখি সেখানে হয় প্রভুর চাবুকে নয়, গুরুর অনুশাসনে মানুষকে অনায়াসেই একই ধূলিশয়নে অতি ভালোমানুষের মতো নিশ্চল শান্তিতে রাখতে পারে, তাহলে সেই "দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম-কলেবর" দেশের জন্যে শোকের দিন এসেছে বলেই জানব।

আমাদের দেশে অনেক দিন থেকেই সমীকরণের অলক্ষণ বলবান। এই মরণের ধর্ম্মই আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতের প্রত্যেক মানুষের পরেই এক একটি বিশেষ কাজের বরাৎ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এই মন্ত্র যে, সৃষ্টির প্রথম দরবারে তাদের আদিপুরুষ একটিমাত্র বিশেষ মজুরীর বায়না নিয়ে তাদের চিরকালকে বাঁধা দিয়ে বসে আছে। সুতরাং কাজে ইস্তফা দিতে গেলেই সেটা হবে অধর্ম্ম। এইরকমে পিঁপ্‌ড়ে-সমাজের নকলে পুচরো কাজ চালাবার খুব সুবিধে, কিন্তু মানুষ হবার বিশেষ বাধা। যে মানুষ কর্ত্তা, যে সৃষ্টি করে, এ'তে তার মন যায় মারা, যে মানুষ দাস, যে মজুরী করে, তারই দেহের নৈপুণ্য পাকা হয়। তাই বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এবং সেই পুনরাবৃত্তির জাঁতা চালিয়ে চালিয়েই অস্তিত্বের প্রতি ভারতের এত বিতৃষ্ণা। তাই সে জন্মজন্মান্তরের পুনরাবর্ত্তন-কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মের মূল মেরে দেবার জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার কথা ভাবছে। এই পুনরাবৃত্তির বিভীষিকা সে আপন প্রতিদিনের অভ্যাস-জড় কর্ম্মচক্রের ঘুর-পাকের মধ্যেই দেখেছে। লোকসান্ শুধু এইটুকু নয়, এম্‌নি করে যারা কল ব'নে গেল তারা বীর্য্য হারালো; কোন আপদকে ঠেকাবার শক্তিই তাদের রইল না। যুগ যুগ ধ'রে চতুর তাদের ঠকাচ্ছে, গুরু তাদের ভোলাচ্ছে, প্রবল তাদের কানমলা দিচ্ছে। তারা এর কোনো অন্যথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, কারণ তারা জানে মেরে রেখেছেন বিধাতা; সৃষ্টির আদিকালে চতুর্ম্মুখ তাদের চাকায় দম দিয়ে বসে' আছেন, সে দম সৃষ্টির শেষকাল পর্য্যন্ত ফুরোবে না। একঘেয়ে কাজের জীবন্মৃত্যুর বেলার মধ্যে কালস্রোতে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র যাই বলুন না, সৃষ্টির গোড়ায় ব্রহ্মা মানুষকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন, এর সঙ্গে তার সম্পূর্ণই তফাৎ। মানুষের খোলের মধ্যে ঘূর্ণিচাকার মোটর-কল না বসিয়ে মন বলে' অত্যন্ত ছটফটে একটা পদার্থ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বালাইটাকে বিদায় করতে না পারলে মানুষকে কল ক'রে তোলা দুঃসাধ্য। ঐহিক বা পারত্রিক ভয়ে বা লোভে বা মোহমন্ত্রে এই মনটাকে আধমরা ক'রে তবে কর্ত্তারা একদলের কাছে কেবলি আদায় করছেন তাঁতের কাপড়, আরেক দলের কাছে কেবলি ঘানির তেল, এক দল কেবলি জোগাচ্ছে তাঁদের ফরমাসের হাঁড়ি, আর এক দল বানাচ্ছে লাঙলের ফাল। তারপরে যদি দরকার হয় মনুষ্যোচিত কোনো বড় কাজে তাদের মন পেতে, তারা বলে বসে, "মন? সেটা আবার কোন্ আপদ? হুকুম করো না কেন? মন্ত্র আওড়াও।"

গাছ বসিয়ে বেড়া তৈরী করতে গেলে, সব গাছকেই সমান খাটো করে ছাঁটতে হয়। তেমনি ক'রে আমাদের এই ছাঁটা মনের মূল্লুকে মানুষের চিত্তধর্ম্মকে যুগে যুগে দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকেকার অবাধ্যতার যুগে এদিকে ওদিকে তার গোটাকতক ডালপালা

বিদ্রোহী হয়ে সামাজিক ঔদাসীন্যকে অতিক্রম ক'রে যদি বেরিয়ে পড়বার দুষ্টলক্ষণ দেখায়, যদি সকলেরই মন আজ আঁধার রাতের ঝিল্লিধ্বনির মত মৃদু গুঞ্জনে একটিমাত্র উপদেশমন্ত্রের সমতান অনুকরণ না করে, তাহলে কেউ যেন উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত না হন ; কেননা স্বরাজের জন্যে আশা করা তখনই হবে খাঁটি।

এই জন্যেই কবুল করতে লজ্জা হচ্চে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্য্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায়নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্দ্ধা বলে মনে করবেন, বিশেষ রাগ করবেন, কেননা বেড়জালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে-মাছটা ফস্‌কে যায়, তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না। তথাপি আশা করি আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাঁদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত, কেননা চরকা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।

যে-কোনো সমাজেই কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেইখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।

বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতের মধ্যযুগের সাধু সাধক যাঁদেরই দেখি, যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোনো মহাবার্ত্তা বহন ক'রে, তাঁরা সকলেই অমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী। তাঁরা সব বাধা ভেদ ক'রে কথা কয়েছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। তাঁরা কৃপণের মতো, হিসাবী বিজ্ঞলোকের মতো এমন কথা বলেননি যে, আগে বাহ্যিক তারপরে আন্তরিক, আগে অন্নবস্ত্র তারপরে আত্মশক্তির পূর্ণতা। তাঁরা মানুষের কাছে বড় দাবী ক'রে তাকে বড় সম্মান দিয়েছিলেন, আর সেই বড় সম্মানের বলেই তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হ'য়ে সাহিত্যে, গানে, নানা কারুকলায় সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। তাঁরা মানুষকে দিয়েছিলেন আলো, দিয়েছিলেন জাগরণ, অর্থাৎ তাকে দিয়েছিলেন তার আপন আত্মারই উপলব্ধি—তাতেই সব দেওয়া পূর্ণ হয়।

আজ সমস্ত দেশজুড়ে আমাদের যদি দৈন্য এসে থাকে, তাহলে জানা চাই, তার মূল আছে আমাদের ভিতরের দিকে। সেই মূল দুর্গতির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ বেছে নিয়ে দেশশুদ্ধ সকলে মিলে তার উপরে একটিমাত্র বাহ্যিক প্রক্রিয়া নিয়ে পড়লে শনিগ্রহ ভয় পান না। মানুষ পাথরের মতো জড় পদার্থ হ'লে বাইরে হাতুড়ি ঠুকে তার মূর্ত্তি বদল করা যেত,—কিন্তু মানুষের মূর্ত্তিতে বাহির থেকে দৈন্য দেখা দিলে ভিতরে প্রাণশক্তির দিকে মন দেওয়া চাই—হাতুড়ি চালাতে গেলে সেই প্রাণটার উপরেই ঘা পড়বে।

একদিন মোগল পাঠানের ধাক্কা যেই লাগ্‌ল, হিন্দু-রাজত্বের ছোট ছোট আল্‌গা পাট্‌কেলের কাঁচা ইঁমারৎ চারিদিক থেকে খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। দেশে তখন সুতোর অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সুতো দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ভাঙন বন্ধ করা যায়নি। রাজার সঙ্গে তখন আর্থিক বিরোধ ছিল না, কেননা তাঁর সিংহাসন ছিল দেশেরই মাটিতে। যেখানে ছিল গাছ, তার

পাকা ফল পড়ত সেইখানেই গাছতলায়। আজ আমাদের দেশে রাজা এক-আধজন নয়, একেবারে রাজার বন্যা ভারতের মাটি ধুয়ে তার ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলছে সমুদ্রপারে। জমি তাতে ফলও হারায়, উর্ব্বরতাও হারায়। এবারকার এ আঘাতও যে ঠেকাতে পারিনি তার কারণ এ নয় যে আমাদের যথেষ্ট সুতো নেই,—কারণ এই যে, আমাদের মিল নেই, প্রাণ নেই।

কেউ কেউ বলেন মোগল পাঠানের আমলে আমাদের নিঃশক্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্নবস্ত্রও ত ছিল। নদীতে জলধারা যখন কম, তখন বাঁধ দিয়ে ছোটো ছোটো কুণ্ডে হাতের কাছে দিনের কাজ চালাবার মত জল ধরে রাখা যায়। এদিকে বাঁধ ভেঙেছে যে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দেনা পাওনা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকি, এমন দিন আর নেই, কখনো আসবেও না। তা ছাড়া সেরকম অবরোধই সব চেয়ে বড় দৈন্য। এমন অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের যোগ্য মনের শক্তি যদি না জাগাতে পারি, তাহলে ফসল খেয়ে যাবে অন্যে, ভুঁষ পড়ে থাকবে আমাদের ভাগে। ছেলে ভোলানো ছড়ায় বাংলা দেশে শিশুদেরই লোভ দেখানো হয় যে, হাত ঘুরোলে লাড়ু পাবার আশা আছে—কিন্তু কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্য দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না। বাইরের দারিদ্র্য যদি তাড়াতে চাই, তাহলে অন্তরেরই শক্তি জাগাতে হবে বুদ্ধির মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সহযোগিতা-প্রবর্ত্তক হৃদয়তার মধ্যে।

তর্ক উঠবে, কাজ বাইরের থেকেও মনকে তো নাড়া দেয়। দেয় বটে, কাজের মধ্যেই যদি মনের অভিমুখে কোনো একটা চিন্তার ব্যঞ্জনা থাকে। কেরাণীর কাজে এটা থাকে না, এ কথা আমাদের কেরাণীগিরির দেশে সকলেই জানে। সঙ্কীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহু নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মত অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই জন্যেই, যে সব কাজ মুখ্যতঃ কোনো একটা বিশেষ শারিরীক প্রক্রিয়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of labour প্রচার করেছেন, কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশী চড়া গলায় indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। যারা মজুরী করে, তারা নিতান্ত দায়ে পড়েই সমাজের বা প্রভুর, প্রবলের বা বুদ্ধিমানের লোভে বা শাসনে নিজেদের যন্ত্র বানিয়ে তোলে। তাদেরই মন্ত্র, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—অর্থাৎ না খেয়ে যখন মরতেই বসেছে, তখন মনটাকে বাদ দিয়েই হাত চালিয়ে পেট চালানো। তাই ব'লে মানুষের প্রধানতর অর্দ্ধেকটা বাদ দেওয়াতেই তার dignity, এমন কথা ব'লে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাকে বিদ্রূপ করা। বস্তুত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই এই যন্ত্রীভবনের পঙ্গুতা থেকে বাঁচাবে কিসে, এইটেই হয়েছে মস্ত সমস্যা। আমার বিশ্বাস সব বড় সভ্যতাই, হয় মরেছে, নয় জীবন্মৃত হয়েছে, অল্প লোকের চাপে বহু লোককে মন-মরা করে দেওয়াতেই। কেননা মনই মানুষের সম্পদ। মনোবিহীন মজুরীর আন্তরিক অগৌরব থেকে মানুষকে কোনো বাহ্য

সমাদরে বাঁচাতে পারা যায় না। যারা নিজের কাছেই নিজে ভিতর থেকে পাটো হয়ে গেছে, অন্যেরা তাদেরই খাটো করতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চ্চার সামনে যদি কোনো বড় নৈতিক সাধনা থাকে, সে হচ্ছে বাহ্য প্রকৃতির হাতের সব রকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এত বড় কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নাই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল, সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই, মানুষের আছে.—তাই মানুষ মাত্রই দ্বিজ। তার বাহিরের প্রাণ অন্তরের প্রাণ উভয়কেই রক্ষা করতে হবে। তাই জড়ের উপর তার বাহ্য কর্ম্মভার যতটাই সে না চাপাতে পারবে, ততটাই চাপাতে হবে মানুষের উপর। সুতরাং ততটা পরিমাণেই মানুষকে জড় করে শূদ্র করে তুলতেই হবে, নইলে সমাজ চলবে না। এই সব মানুষকে মুখে dignity দিয়ে কেউ কখনই dignity দিতে পারবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ীর তলায় স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভার লাঘবতার মত ঐশ্বর্য্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহুযুগ পূর্ব্বে প্রথম বুঝতে পারলে, যেদিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন উৎপাদনের কাজে লাগল, ধন তখন থেকে চক্রবর্ত্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোন তত্ত্ব নেই? বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম, তেমনি আর একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে, অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈব শক্তিই অসীম, এই জন্য চলনশীল চক্রের এখনো আমরা সীমানায় এসে ঠেকি নি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতোকাটার পক্ষে আদিমকালের চরকাই শেষ, তাহলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্ত্ত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তাহলে পৃথিবীতে অন্য যে সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে, তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাচক্রের যে বিরাট শক্তিরূপ দেখা যায়, সেটাকে যখন ভুলি, যখন কোনো এক বিশেষ কালের বিশেষ চরকাকেই সুতো কাটবার চরম উপাদান রূপে দেখি ও

অভ্যস্তভাবে ব্যবহার করি, তবে চরকা ভিতরের দিক থেকে আমাদের কাছে বোবা হয়ে থাকে। তখন যে চরকা মানুষকে একদিন শক্তির পথে ধনের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে, সে আর এগোবার কথা বলে না। কানের কাছে আওয়াজ করে না তা নয়, কিন্তু মনের সঙ্গে কথা কয় না।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, চরকা ছাড়া আর কোন কাজ করো না' এমন কথা তো আমরা বলি নে। তা হতে পারে, কিন্তু আর কোনো কাজ করো, এ কথাও তো বলা হয় না। সেই না বলাটাই কি প্রবল একটা বলা নয়? স্বরাজ সাধনার একটি মাত্র কাজের হুকুম অতি নির্দ্দিষ্ট, আর তার চারিদিকেই নিঃশব্দতা। এই নিঃশব্দতার পটভূমিকার উপরে চরকা কি অত্যন্ত মস্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে না? বস্তুত সে কি এতই মস্ত? ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক স্বভাবস্বাতন্ত্র্য নির্ব্বিচারে এই ঘূর্ণ্যমান চরকার কাছে যে যতটা পারে আপন সময় ও শক্তির নৈবেদ্য সমর্পণ করবে,—চরকার কি প্রকৃতই সেই মহিমা আছে? একই পূজাবিধিতে একই দেবতার কাছে সকল মানুষকে মেলবার জন্যে আজ পর্য্যন্ত নানা দেশে বারে বারে ডাক পড়ল। কিন্তু তাও কি সম্ভব হয়েছে? পূজাবিধিই কি এক হল, না দেবতাই হল একটি? দেবতাকে আর দেবার্চ্চনাকে সব মানুষের পক্ষে এক করবার জন্য কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুর অত্যাচার পৃথিবীতে চলে আসচে। কিছুতেই কিছু হল না, শুধু কি স্বরাজ-তীর্থের সাধন-মন্দিরে একমাত্র চরকা দেবীর কাছেই সকলের অর্ঘ্য এসে মিলবে? মানব-ধর্ম্মের প্রতি এত অবিশ্বাস? দেশের লোকের পরে এত অশ্রদ্ধা?

ওপী ব'লে আমাদের এক পশ্চিমদেশীয় বেহারা ছিল। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, যখন সে পুরী তীর্থে গিয়েছিল, জগন্নাথের কাছে কোন্ খাদ্য ফল উৎসর্গ ক'রে দেবে এই নিয়ে তার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হ'ল। সে বার বার মনে মনে সকল রকম খাবার যোগ্য ফলের ফর্দ্দ আউড়িয়ে যেতে লাগলো। কোনটাতেই তার মন সায় দিল না। অবশেষে হঠাৎ মনে পড়ে গেল—বিলিতি বেগুন। তখনি তার দ্বিধা গেল ঘুচে, জগন্নাথকে দিয়ে এল বিলিতি বেগুন, শেষ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে তার পরিতাপ রইল না।

সব চেয়ে সহজ দেবতার কাছে সব চেয়ে কম দেওয়ার দাবী মানুষের প্রতি সবচেয়ে অন্যায় দাবী। স্বরাজ সাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটী লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া। আশা করি ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটী ওপী নেই। বড় যখন ডাক দেন তখন বড় দাবী করেন, তখন মানুষ ধন্য হয়। কেননা মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চম্‌কে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে সে বড়।

আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পূজোর পরে আমাদের ভরসা বেশী। বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবী থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতর বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি তা হ'লেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্মকর্তৃত্বের

উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নেই। এমন দেশে দেশ উদ্ধারের নাম ক'রে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্চি, আর মনে মনে বল্‌ছি—স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চল্‌ছে।

ঘোর পুরাতন কথাটাকে আজ নূতন করে বল্‌তে হচ্ছে যে, স্বরাজের ভিত বাহ্য সাম্যের উপর নয়, অন্তরে ঐক্যের উপর। জীবিকার ক্ষেত্রে এই আন্তরিক ঐক্যের মস্ত একটা জায়গা আছে। বস্তুত ঐক্যটা বড় হতে গেলে জায়গাটা মস্ত হওয়াই চাই। কিন্তু মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সুতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে, কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষ্যের বাইরে পড়ে থাক্‌বে।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয়; আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলেই মিল্‌বে এমন চর্চ্চা এখানে কোনদিন ছিল না, সবে এর আরম্ভ হয়েছে, সাধারণের মনকে সত্য ভাবে অধিকার করতে অনেক দেরী হবে। এই জন্যেই জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড় মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সব চেয়ে প্রশস্ত, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে—মরণেরই ডাকের মত এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়, যদি প্রমাণ করতে পারি এখানেও প্রতিযোগীতাই মানব-শক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য—তাহলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে গ্রাম-সমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চ্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের স্বভাবটা অনেকটা তৈরী হয়ে আছে।

ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকের বা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়-বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়বুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এ পর্য্যন্ত এমনিই চল্‌ছে। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্ত ভাবে স্বকীয় স্বার্থ সাধনের আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে, এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যেদিন মানুষ স্পষ্ট ক'রে বুঝবে যে, সর্ব্বজাতীয় রাষ্ট্রীক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পরনির্ভরতাই মানুষের ধর্ম্ম; সেই দিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্য সাধনার ক্ষেত্র হবে। সেইদিনই সামাজিক মানুষ যে সকল ধর্ম্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে রাষ্ট্রীক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ পরকে ঠকানো পরের ধন চুরি আত্মসাৎ করার নিরবচ্ছিন্ন চর্চ্চা এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয় ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জান্‌বে। League of Nationsএর প্রতিষ্ঠা হয়ত রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ।

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ।

এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা? কিন্তু মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয় এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয় আপন সত্য পাবে এই ত চাই। কয়েক বছর পূর্ব্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁট যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে ধন তার সম্মিলনে। সকলদিকেই মানব সত্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য—মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করিনে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোন একটা বাহ্য কর্ম্মের প্রতিক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায় তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয়, এই জন্য বহু কর্ম্মধারা এর থেকে সৃষ্টি হতে পারে। মূলের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজি ভাষায় যাকে অাঁধা গলি বলে, জীবিকা সাধনার পক্ষে এ সে রকম পথ নয়। বুঝেছিলুম এই পথ দিয়ে কোন একটা বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যার মধ্যে অন্নের সকলপ্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোন কোন আত্মীয় তখন সমবায় তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়ার্লণ্ডের কবি ও কর্ম্মবীর A. E. রচিত National Being বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায় জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড় সিদ্ধি পায়, অর্থাৎ কর্ম্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি, এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এসব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বই কি। কোনো বড় সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না, দুর্লভ জিনিষের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায়, এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশ্বাসও করছেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন, এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যাঁরা তর্কে নামেন, তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা পরিমাণ খদ্দর হতে পারে। অর্থাৎ

তাঁদের হিসাব মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তাহলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু দৈন্য জিনিষটা জটিল মিশ্র জিনিষ। আর এ জিনিষটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্ব্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধ'রে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা কৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে, তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না? দেশশুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে, তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারী থুৎকার-প্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয় তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সেঁচে ফেলবার উদ্দেশে চরকা চালনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

আয়র্লণ্ডে সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়-জীবিকা প্রবর্ত্তনে প্রথম লেগেছিলেন, তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম সুরু হয়েছে, National Being বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে, তখন ছাড়তে যেতে বিলম্ব হয় না। তবু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে-দেশের যে-কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লণ্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন, তখন তিনি একই কালে ভারতবর্ষের জন্যেও সিদ্ধিকে আবাহন ক'রে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তাহলে তিনি তেত্রিশ কোটি ভারত-বাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ ক'রে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে, তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের সামিল ক'রে দেখে, তারা জানে না যে অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

এইমাত্র আমার একজন বন্ধু বললেন যে, দেশের সাধারণ দৈন্য দূর বা স্বরাজ লাভ বললে যতখানি বোঝায়, তোমার মতে চরকায় সুতোকাটার লক্ষ্য ততদূর পর্য্যন্ত নাও যদি পৌঁছয়, তাতেই বা দোষ কি? চাষের কাজ যখন বন্ধ থাকে, তখন চাষীর, এবং গৃহকাজ প্রভৃতি সেরেও গৃহস্থের হাতে যে উপরি সময় বাকী থাকে, তাকে সকলে মিলে কোনো সর্ব্ব-

জনসাধা লাভবান কাজে লাগালে সাধারণের অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে, দেশে চরকা চলিত করার এই শুভ ফলটুকুই ধরে নাওনা কেন। মনে আছে এই জাতীয় আর একটা কথা পূর্ব্বে শুনেছিলুম। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে থাকে। তার দ্বারা সমস্ত ভারত জুড়ে যে পুষ্টিকর খাদ্য নষ্ট হয়, তা সকলে মিলেই যদি রক্ষা করি, তাহলে মোটের উপরে অনেকটা অন্নকষ্ট দূর হতে পারে! কথাটার মধ্যে সত্য আছে। ফেন সমেত ভাত খেতে গেলে অভ্যস্ত রুচির কিছু বদল করা চাই, কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ্য ক'রে দেখলে সেটা দুঃসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এই রকম এমন আরো অনেক জিনিষ আছে, যাকে আমাদের দৈন্যলাঘব-উপায়ের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে যাঁরা যেটা ভালো বোঝেন চালাতে চেষ্টা করুন না; তার কোনোটাতে ধন বাড়বে, কোনটাতে তার সঙ্গে পুষ্টিও বাড়বে, কোনটাতে কিছু পরিমাণে আলস্য দোষ কেটে যাবে। কিন্তু দেশে স্বরাজ লাভের যে একটা বিশেষ উদ্যোগ চলছে, দেশশুদ্ধ সকলে মিলে ভাতের ফেন না ফেলাকে তার একটা সর্ব্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ করার কথা কারো তো মনেও হয় না। তার কি কোন কারণ নেই? এ সম্বন্ধে আমার কথাটা পরিষ্কার করবার জন্যে ধর্ম্মসাধনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষ্যেই যদি বিশেষ জোর দিয়ে হাজারবার ক'রে বলা হয় যে, যার-তার কুয়ো থেকে জল খেলে ধর্ম্মভ্রষ্টতা ঘটে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এমন উপদেশে ধর্ম্মসাধনার নৈতিক পন্থার মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। যার তার কুয়োতে মলিনতা থাকার আশঙ্কা আছে, সেই মলিনতার স্বাস্থ্য ক্লিষ্ট হয়, স্বাস্থ্যের বিকারে চিত্তের বিকার ঘটে, সেই বিকারে ধর্ম্মহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে, এ সব কথাই সত্য ব'লে মানলেও তবু বলতেই হবে, অপ্রধানকে পরিমাণ-অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাতে প্রধানের মূল্য কমে যায়। সেই জন্যই আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না। ছোটকে বড়োর সমান আসন দিলে সে সমান থাকে না, সে বড়োকে ছাড়িয়ে যায়। এই জন্যেই জলের শুচিতা রক্ষার ধর্ম্মবিধি মানুষের প্রাণ-হিংসা না করার ধর্ম্ম বিধিকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে নিত্যধর্ম্মের সঙ্গে আচার ধর্ম্মকে মিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা এরকম দুর্গতি যে কত ঘটছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই মজ্জাগত সনাতন অভ্যাসেরই জোরে আজ চরকা খদ্দর সর্ব্বপ্রধান স্বারাজিক ধর্ম্ম কর্ম্মের বেশে গদাহাতে বেড়াতে পারল, কেউ তাতে বিশেষ বিস্মিত হল না! এই প্রাধান্যের দ্বারাতেই সে অনিষ্ট করছে, আমাদের দেশের বহু-যুগসঞ্চারী দুর্ব্বলতার আর একটা নতুন খাদ্য জুগিয়ে দিচ্ছে। এর পরে আর এক দিন আর কোন বলশালী ব্যক্তি হয়ত স্বারাজ্য সিংহাসন থেকে প্রচার করবেন যে, ভাতের ফেন যে ফেলে দেয়, সেই অন্নঘাতীকে মন্ত্রণা-সভায় ঢুকতে দেব না। তাঁর যদি যথেষ্ট জোর থাকে এবং তাঁর শাসন যদি বেশী দিন চলে, তবে আমাদের দুর্ভাগা দেশে একদিন সাধুলোকে

নিজেদের শুচিতারক্ষার জন্যে ভাতের থেনপাত উপলক্ষে মানুষের রক্তপাত করতে থাকবে। বিদেশী কাপড় পরায় অশুচিতা ঘটে, এই নিষেধ যদি দেশের অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করে, এবং অন্ন জল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অশুচিতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কার-গত হয়ে উঠে, তাহলে সেদিন ইদের দিনে কলকাতায় যেরকম মাথা কাটাকাটি হয়েছে, এ নিয়েও একদিন ম্লেচ্ছ ও অম্লেচ্ছদের মধ্যে তেমনি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যে আচার পরায়ণ সংস্কারের অন্ধতা থেকে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতারীতির উৎপত্তি, সেই অন্ধতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকা-খাদ্দরিক অস্পৃশ্যতা-তত্ত্ব জাগিয়ে তুলছে।

কেউ কেউ বলবেন তুমি যে সমবায় জীবিকার কথা বলছ, সকলে মিলে চরকা কাটাই ত তাই। আমি তা মানি না। সমস্ত হিন্দু সমাজে মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাণুতত্ত্বমূলক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না। ওটা একটা কর্ম, ওটা একটা সত্য নয়। এই জন্যেই কুয়োর জল যখন শুচি থাকছে, পুকুরের জল তখন মলিন হচ্ছে, ঘরের কানাচের কাছে গর্ত্তর ডোবায় তখন রোগের বীজাণু অপ্রতিহতপ্রভাবে যমরাজের শাসন প্রচার করছে। আমাদের দেশে কাসুন্দি তৈরি করবার সময় আমরা অত্যন্ত সাবধান হই—এই সাবধানতার মূলে প্যাষ্টার-আবিষ্কৃত তত্ত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু তত্ত্বটা রোগের বীজাণুর মতই অদৃশ্য আর বাহ্য কর্মটা পরিষ্কীত পিলেটারই মত প্রকাণ্ড; সেই জন্যেই এই কর্মপ্রণালীতে কেবলমাত্র কাসুন্দিই বাঁচছে, মানুষ বাঁচছে না। একমাত্র কাসুন্দি তৈরি করবার বেলাতেই বিশুদ্ধ লোকে মিলে নিয়ম মানার মতই, একমাত্র সুতো তৈরির বেলা-তেই তেত্রিশ কোটি লোকে মিলে বিশেষ আচার রক্ষা। তাতে সুতো অনেক জমবে, কিন্তু যুগে যুগে যে-অন্ধতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গড়বন্দী করে রেখেছে, তার গায়ে চাড় পড়বে না।

মহাত্মাজির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্য্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড় ক'রে দেখলে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা, যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কি হতে পারে? তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্য-বিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জ্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক্, বলশালী করুক্, তাকে নিজের মন দিয়ে চিন্তা করতে, সঙ্কল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক্—এই আমার কামনা। যে কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন রায়ের মত অত বড় মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি, অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি,—সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণই মহাত্মাজির কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে, যাকে আমার স্বধর্ম আপন ব'লে গ্রহণ করতে পারছে না। সে জন্যে

আমার খেদ রয়ে গেল। কিন্তু সাধনার বিচিত্র পথই বিধাতার অভিপ্রেত, নইলে প্রকৃতি-ভেদ জগতে কেন থাকবে? ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকার দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু আমার বুদ্ধি বিচারে চরকার যতটুকু মর্য্যাদা, তার চেয়ে পাছে বেশী স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক বিদা ক'রে নিরস্ত হয়েছি। মহাত্মাজি আমাকে ঠিক বুঝবেন জানি, এবং পূর্ব্বেও বারবার আমার প্রতি যেমন ধৈর্য্য রক্ষা করেছেন, আজও করবেন; আচার্য্য রায় মশায়ও জনাদর-নিরপেক্ষ মতস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, অতএব মাঝে মাঝে বক্তৃতা সভায় যদিচ মুখে তিনি আমাকে অকস্মাৎ তাড়না ক'রে উঠবেন, তবু অন্তরে আমার প্রতি নিরুরুণ হবেন না। আর যাঁরা আমার দেশের লোক, যাদের চিত্তস্রোত বেয়ে উপকার আর অপকার উভয়েরই কত স্মৃতি অতলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তাঁরা আজ আমাকে যদি ক্ষমা না করেন, কাল সমস্তই ভুলে যাবেন; আর যদিবা না ভোলেন, আমার কপালে তাঁদের হাতের লাঞ্ছনা যদি কোনো-দিন নাও ঘোচে, তবে আজ যেমন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথকে লাঞ্ছনার সঙ্গী পেয়েছি, কালও তেমনি হয়ত এমন কোনো কোনো স্বদেশের অনাদৃত লোককে পাব, যাঁদের দীপ্তি দ্বারা লোকনিন্দা নিন্দিত হয়।　　(সবুজ পত্র)

স্বরাজ সাধন

আমাদের দেশে বিজ্ঞ লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন যে, যত খুসি কথায় বল, লেখায় লিখো না। আমি এ উপদেশ মানি নি, তার ভূরি প্রমাণ আছে। কিছু পরিমাণে মেনেওছি; সে কেবল উত্তর লেখা সম্বন্ধে। আমার যা বলবার তা বলতে কসুর করিনে; কিন্তু বাদ যখন প্রতিবাদে পৌঁছয়, তখন কলম বন্ধ করি। যতরকম লেখার বায়ু আছে ছন্দে এবং অছন্দে, সকলেরই প্রভাব আমার উপর আছে—কেবল উত্তর বায়ুটাকে এড়িয়ে চলি।

মত বলে যে একটা জিনিষ আমাদের পেয়ে বসে, সেটা অধিকাংশ স্থলেই বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে গড়া নয়, তার মধ্যে অনেকটা অংশ আছে যেটাকে বলা যায় আমাদের মেজাজ। যুক্তি পেয়েছি বলে' বিশ্বাস করি—সেটা অল্প ক্ষেত্রেই; বিশ্বাস করি বলে'ই যুক্তি জুটিয়ে আনি—সেইটেই অনেক ক্ষেত্রে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতই খাঁটি প্রমাণের পথ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; অন্য জাতের মতগুলো বারো আনাই রাগ বিরাগের আকর্ষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এ কথাটা খুবই খাটে যখন মতটা কোনো ফললোভের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই লোভ যখন বহুসংখ্যক লোকের মনকে অধিকার করে। সেই বহু লোকের লোভকে উত্তে-জিত করে' তাদের তাড়া লাগিয়ে কোনো একটা পথে প্রবৃত্ত করতে যুক্তির প্রয়োজন হয় না, কেবল পথটা খুব সহজ হওয়া চাই, আর চাই দ্রুত ফললাভের আশা। খুব সহজে

এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। গণ মনের এইরকম ঝোড়ো অবস্থায় এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বাদ প্রতিবাদ উত্তর প্রত্যুত্তর কেবলমাত্র বাগবিতণ্ডার সাইক্লোন আকার ধরে, সেই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে কোনো মতকে কোনো বন্দরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময়ে যেই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুবই সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয়, তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে' দিতে পারে, এ কথায় যারা মেতে ওঠে, তারা বুদ্ধি নেই বলে'ই যে মাতে তা' নয়, লোভে পড়ে' বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলে'ই তাদের এত উত্তেজনা।

অল্প কিছুদিন হ'ল স্বরাজ হাতের কাছে এসে পৌঁচেছে বলে' দেশের লোক বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তারপরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কথা উঠল সর্ত্ত পালন করা হয়নি বলে'ই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এ কথা খুব অল্প লোকেই ভেবে দেখলেন যে, আমাদের সমস্যাই হচ্ছে সর্ত্ত প্রতিপালন নিয়ে। স্বরাজ পাবার সর্ত্ত আমরা পালন করিনে বলে'ই স্বরাজ পাইনে, এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ হিন্দু মুসলমানে যদি আত্মীয়ভাবে মিলতে পারে, তাহলে স্বরাজ পাবার একটা বড় ধাপ তৈরী হয়, কথাটা বলাই বাহুল্য। ঠেকচে ঐখানেই যে, হিন্দু মুসলমানের মিলন হল না যদি মিলত তবে পাঁজিতে প্রতিবৎসরে যে ৩৬৫টা দিন আছে, সব ক'টা দিনই হ'ত শুভদিন। এ কথা সত্য যে, পাঁজিতে দিন স্থির ক'রে দিলে নেশা লাগে, তাই ব'লে নেশা লাগলেই যে পথ সহজ হয়, তা বলতে পারিনে।

পাঁজির নির্দ্দিষ্ট দিন অনেক কাল হ'ল ভেসে চলে গেছে, কিন্তু নেশা ছোটে নি। সেই নেশার বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন। একটী বা দুটী সঙ্কীর্ণ পথই তার পথ। সেই পথের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে চরকা।

তাহলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়—স্বরাজ জিনিষটা কি? আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটি নে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখতে পারে না। হয় ত পারে, যদি ভারতের বহু কোটী লোক আপন বিনা মূল্যের অবসরকাল সুতো কাটায় নিযুক্ত ক'রে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা যে সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশে যাঁরা চরকার পক্ষে লেখনী চালাচ্ছেন, তাঁরা অনেকেই চরকা চালাচ্ছেন না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে। কিন্তু সেও স্বরাজ নয়। না হোক, সেটা অর্থ বটে ত। দারিদ্র্যের পক্ষে সেই বা কম কি? দেশের চাষীরা তাদের অবসরকাল বিনা উপার্জ্জনে নষ্ট করে; তারা যদি সবাই সুতো কাটে, তাহলে তাদের দৈন্য অনেকটা দূর হয়।

স্বীকার করে' নেওয়া যাক্ এও একটা বিশেষ সমস্যা বটে। চাষীদের উদ্বৃত্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। কথাটা শুনতে যত সহজ, তত সহজ নয়। এই সমস্যার সমাধান তার যদি নিতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে বুদ্ধির দুরূহ সাধনা দরকার। সংক্ষেপে বলে' দিলেই হ'ল না—ওরা চরকা কাটুক।

চাষী চাষকরা-কাজের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েছে। চাষের পথই তাহার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখনই সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন সে কাজ করে না। কুঁড়ে বলে' কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায়। যদি সম্বৎসর তার চাষ চলতে পারত, তাহলে বছর ভরেই সে কাজ করত।

চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এই যে, তা'তে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আরেকটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা চাই। কিন্তু চাষ প্রভৃতি মজুরীর কাজ লাইন-বাঁধা কাজ। তা' চলে ট্রাম গাড়ীর মত। চালার প্রয়োজন হ'লেও লাইনের বাইরে নতুন পথ তার পক্ষে সহজ নয়। চাষীকে চাষের বাইরে যে কাজ করতে বলা যায়, তা'তে তার মন ডিরেল্‌ড্ হয়ে যায়। তবু ঠেলে ঠুলে তাকে হয়ত নাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তা'তে শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে।

বাংলাদেশের অন্তত দুই জেলার চাষীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন, তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এক জেলা এক-ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপাদন করতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তারপর তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসরকালে সব্‌জি উৎপন্ন করতে পারত উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাই নি। যারা ধান চাষের জন্য প্রাণপণ করতে পারে, তারা সব্‌জি চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সব্‌জির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।

আরেক জেলার চাষী ধান, পাট, আখ, সর্ষে প্রভৃতি সকলরকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু যে জমিতে এ সব শস্য সহজে হয় না, সে জমি তাদের বৃথা পড়ে' থাকে, তার খাজনা বহন করে' চলে। অথচ বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষী এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে' নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষী এই অনভ্যস্ত ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে চাষী পাটের ফসল করে, তা'কে স্বভাবতঃ অলস বলে' বদনাম দেওয়া চলে না। শুনেছি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কোথাও পাট উৎপন্ন করা কঠিন নয়, কিন্তু সেখানকার লোকেরা পাট প্রস্তুত করার দুঃসাধ্য দুঃখ বহন করতে নারাজ। বাংলাদেশে যে পাট এক্‌চেটে, তার একমাত্র কারণ এখানকার জমিতে নয়, এখানকার চাষীতে। অথচ আমি দেখেছি

এই চাষীই তার বালু জমিতে তরমুজ ফলিয়ে লাভ করবার দৃষ্টান্ত বৎসর বৎসর স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও এই অনভ্যস্ত পথে যেতে চায় না।

যখন কোনো একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয়, তখন মানুষের মনকে কি করে' এক পথ থেকে আর এক পথে চালানো যায়, সেই শক্ত কথাটা ভাবতে হয়; কোনো একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাৎলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয়, তা বিশ্বাস করিনে,—মানুষের মনের সঙ্গে বফা নিষ্পত্তি করাই হল গোড়ার কাজ। "হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক্", বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জারি করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষ্যে হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কেননা সেরকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন কি নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে; সেটা দুরূহ সন্দেহ নেই—তবু "এও বাহ্য।" কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানেই ঠেকেচে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজ প্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয়পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজিনবীশের কথা জানতেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর সমস্তই রুচিপূর্ব্বক আহার করতেন, কেবল গ্রেট্ ইষ্টার্ণের ভাতটা বাদ দিতেন —বলতেন মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না। যে-সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে, সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিলতে তাঁর বাধবে। ধর্ম্মনিষেধের আদেশ নিয়ে মনের যেসকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত, সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দু মুসলমান-বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে, খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগস্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছায় না।

আমাদের দেশের এই সকল সমস্যা আন্তরিক বলে'ই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বল্‌লে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুন্‌লেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঠিক পথে অর্থ উপার্জ্জনের বাধা যার অন্তরের মধ্যে আছে, সেই ব্যক্তিই জুয়ো খেলে রাতারাতি বড়মানুষ হবার দুরাশায় নিজের সর্ব্বনাশ করতেও প্রস্তুত হয়।

চরকা কাটা স্বরাজ সাধনার প্রধান অঙ্গ, এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে, তবে মান্‌তেই হয় সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ। এই জন্যই, দেশের মঙ্গল-সাধনে আত্মপ্রভাবের যেসকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে, সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিস্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায়। এমন অবস্থায় ধ'রেই নেওয়া যাক যে, চাষীরা তাদের অবসরকাল যদি লাভবান কাজে লাগায়, তা'হলে আমাদের স্বরাজলাভের

একটা প্রধান অন্তরায় দূর হতে পারে ; ধ'রেই নেওয়া যাক্ এই বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সব চেয়ে আজ পরম চিন্তনীয়।

তা'হলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে চাষীদের অবকাশকালকে সম্যকরূপে কি উপায়ে খাটানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য চাষের কাজে খাটাতে পারলেই ঠিক রাস্তাটা পাওয়া যায়। আমার যদি কঠিন দৈন্যসঙ্কট ঘটে, তবে আমার পরামর্শদাতা হিতৈষীকে এই কথাই সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে যে, আমি দীর্ঘকাল ধরে' সাহিত্য রচনাতেই অভ্যস্ত। বাগব্যবসায়ের প্রতি তাঁর যতই অশ্রদ্ধা থাক্, আমার উপকার করতে চাইলে এ কথা তিনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। তিনি হয়ত হিসাব খতিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারেন যে, ছাত্রদের জন্যে কলেজ-পাড়ায় যদি চায়ের দোকান খুলি, তাহলে শতকরা ৭৫ টাকা হারে মুনফা হতে পারে। হিসাব থেকে মানুষের মনটাকে বাদ দিলে লাভের অঙ্কটাকে খুব বড় করে দেখানো সহজ। চায়ের দোকান করতে গিয়ে আমি যে নিজেকে সর্ব্বস্বান্ত করতে পারি তার কারণ এ নয় যে, সুযোগ্য চা-ওয়ালার মত আমার বুদ্ধি নেই, তার কারণ চা-ওয়ালার মত আমার মন নেই। অতএব হিতৈষী বন্ধু যদি আমাকে ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখ্‌তে বা স্কুল-কলেজপাঠ্য বিষয়ের নোট্ লিখ্‌তে বলেন, তবে নিতান্ত দায়ে ঠেক্‌লে হয় ত সেটা চেষ্টা দেখতে পারি। আমার বিশ্বাস চায়ের দোকান খোলার চেয়ে তা'তে আমার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা কম হবে। লাভের কথায় যদিবা সন্দেহ থাকে, অন্তত এ কথাটা নিশ্চিত যে, সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেক্‌টিভ গল্পের লাইনে সুইচ্ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।

চিরজীবন ধরে' চাষীর দেহ মনের যে-শিক্ষা ও অভ্যাস হয়েছে, তার থেকে তা'কে অকস্মাৎ ঠেলে ফেলে দিয়ে তা'কে সুখী বা ধনী করা সহজ নয়। পূর্ব্বেই বলেছি, মনের চর্চ্চা যাদের কম, গোঁড়ামি তাদের বেশি—সামান্য পরিমান নূতনত্বেও তাদের বাধে। নিজের প্লানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অনুরাগ বশত মনস্তত্ত্বের এই নিয়মটা গায়ের জোরে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করলে, তা'তে মনস্তত্ত্ব অবিচলিত থাক্‌বে, প্লানটা অক্ষম হবে।

চাষীকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোন কোন কৃষিক্ষেত্রবহুল দেশে চলেছে। সে সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জমি থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশী ফসল আদায় করছে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই পথ আবিষ্কারে মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। চাষের উৎকর্ষ উদ্ভাবনের দ্বারা চাষীর উদ্যমকে ষোলো আনা খাটাবার চেষ্টা না করে' তা'কে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়। আমরা চাষীকে অলস বলে' দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তা'কে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই, তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।

এতক্ষণ এই যা আলোচনা করা গেল, এটা এই মনে করেই করেচি যে, সুতো ও খদ্দর বহুল পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হ'লে, তাতে একদল শ্রমিকের অর্থকষ্ট দূর হবে। কিন্তু সেও মেনে নেওয়া কথা। এ সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করে'ও থাকেন। আমার মতো আনাড়ির সে তর্কে প্রবেশ করে' কাজ নেই। আমার নালিশ এই যে, চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত ক'রে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্চে।

দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোঝায়, তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোট করে' দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবী কমিয়ে দিলে অলস মন নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণ সাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে' তোলবার উপায়। দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে' রাখলে দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটীকে যদি ছোট করি, আমাদের সাধনাকে ছোট করা হবে। পৃথিবীতে যারা দেশের জন্যে মানুষের জন্যে দুঃসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাট রূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই, তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার। বহুল পরিমাণ সুতো ও খদ্দরের ছবি দেশের কল্যাণের বড় ছবি নয়। এ হ'ল হিসাবী লোকের ছবি, এ'তে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবী শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না, যা' বৃহত্তের উপলব্ধিজনিত আনন্দে কেবল যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।

শিশু আনন্দের সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে। কেননা সে আপন বাপের মুখে মায়ের মুখে সর্ব্বদাই ভাষার সমগ্র রূপটা দেখতে পায়। যখন সে স্পষ্ট করে বুঝতেও পারে না, তখনো এইটেই তা'কে কেবলি আকর্ষণ করে। তাই এই প্রকাশের পূর্ণতা লাভের জন্য নিয়তই তার একটী আনন্দময় চেষ্টা জেগে থাকে। শিশুর মনকে বেষ্টন করে' যদি এই পরিপূর্ণ ভাষা সর্ব্বদা বিরাজ না করত, যদি তার চারিদিকে কেবলি ঘুরতে থাকত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র, তাহলে বেতের চোটে কাঁদিয়ে তাকে মাতৃভাষা শেখাতে হ'ত, এবং তাও শিখতে লাগত বহু দীর্ঘকাল।

এই কারণে আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজ সাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই, তাহলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্ত্তি প্রত্যক্ষগোচর করে' তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্ত্তির আয়তন যে খুব বড় হবে, এ কথা বলিনে; কিন্তু তা' সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবী করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিষের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে' চলে। তা' যদি না হ'ত, তাহলে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল

হয়ে জন্মাত—তারপরে সেটা ধীরে ধীরে হ'ত হাঁটু পর্য্যন্ত পা; তারপরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে—তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই। সেই আনন্দে তাকে মানুষ করে' তোলবার কঠিন দুঃখও মা বাপ স্বীকার করতে পারে। নইলে যদি একখানা আস্ত পা নিয়েই তাদের চার পাঁচ বছর কাটাতে হ'ত, তাহলে সেই আংশিকের দায়ত্ব তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠত।

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতোর আকারেই দেখতে পাকি, তাহলে আমাদের সেই দশাই হবে এই রকম অঙ্গ সাধনায় মহাত্মার মত লোক হয়ত কিছুদিনের মত আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এই জন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে' গণ্য করে। আমি মনে করি, এরকম মতি স্বরাজ লাভের পক্ষে অনুকূল নয়।

স্বদেশের দায়িত্বকে, কেবল সুতো কাটার নয়, সম্যক্ ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোট ছোট আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিষটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে' নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তা'তে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো না কোনো আকারে গ্রহণ ক'রে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কা'কে বলে, সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর পরে', কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিষটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই, ভারতবর্ষের কোনো একটা ক্ষুদ্র অংশে তা'কে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তাহলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। তাহলে আত্মপ্রভাবের যে কি মূল্য তা' বুঝতে পারব—ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্ম-শক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে, তাহলেই স্বদেশকে স্বদেশ রূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে—কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালবাসতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্চে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে' তুলচে না, এই জন্যে তাদের পরস্পর মিলনের

কোনো গভীর উপলব্ধি নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্ম্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন। নানা পথে এক লক্ষ্য অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশ-সৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ করে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। যদি এইরকম উদ্যোগকে আমরা আয়তনে ছোট বলে' অবজ্ঞা করি, তবে গীতার সেই কথাটা যেন মনে আনি,—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সত্যের জোর আয়তনে নয়, তার আপনাতেই।

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চ্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হ'লে, তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব, আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জন-সঙ্ঘের এই চিত্তচৈতন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে,—তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে' আনে। বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে, সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ—অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি ক'রে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষ সাধন হয়। বেঁচে থাকবার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, আমার প্রাণ আছে। কেউ কেউ হয়ত বল্‌তেও পারেন যে, সুতো কাটাও সৃষ্টি। তা নয়। তার কারণ, চরকায় মানুষ চরকারই অঙ্গ হয়; অর্থাৎ যেটা কল দিয়ে করা যেত, সে সেইটেই করে। সে ঘোরায়। কল জিনিষটা মনোহীন বলেই সে একা, নিজের বাইরে তার কিছুই নেই। তেমনি যে মানুষ সুতো কাটচে সেও একলা, তার চরকার সূত্র অন্য কারো সঙ্গে তার অবস্তুযোগের সূত্র নয়। তার প্রতিবেশী কেউ যে আছে, এ কথা তার জানবার কোনো দরকারই নেই। রেশমের পোকা যেমন একান্ত ভাবে নিজের চারদিকে রেশমের সুতো বোনে, তারও কাজ সেইরকম। সে যন্ত্র, সে নিঃসঙ্গ, সে বিচ্ছিন্ন। কন্‌গ্রেসের কোনো মেম্বর যখন সুতো কাটেন, তখন সেই সঙ্গে দেশের ইকনমিক্‌স্-স্বর্গের ধ্যান করতেও পারেন, কিন্তু এই ধ্যানমন্ত্রের দীক্ষা তিনি অন্য উপায়ে পেয়েছেন—চরকার মধ্যেই এই মন্ত্রের বীজ নেই। কিন্তু যে মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্যোগ করচে, তাকে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারি কাজে স্বরাজ সাধনার সত্যকার আরম্ভ বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত

গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয়, তাহলেই বুঝব গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্চে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজ লাভ। পরিমাণ হিসেবে কম হলেও, সত্য হিসাবে কম নয়। অর্থাৎ শতকরা একশো'র দ্বারে লাভ না হলেও হয়ত শতকরা একের দ্বারে লাভ;—এই লাভই শতকরা একশো'র সগোত্র, এমন কি, সহোদর ভাই। যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্ন উপার্জ্জনে, আনন্দ বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে, সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তারপরে একটা দীপের থেকে আরেকটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবেনা, স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রসৃত সমগ্রবুদ্ধির পথে।

নানা কথা

ঢাল। *

বাঙ্গালী ছেলের শারীরিক বলবীর্য্য বৃদ্ধিকারী খেলা-ধূলার প্রতি আমার চিরানুরাগ তোমরা জান। দুর্ব্বলের শারীরিক বলবৃদ্ধি তার মনের বলবৃদ্ধির সহায়তা করে আমি বিশ্বাস করি, অহিংসা মন্ত্র নিয়ে ঘরে বসে থাকলে সকলেরই যে মন্ত্রসিদ্ধি হবে তা আমি বিশ্বাস করিনে। উল্টা ছলনায়, রাশি রাশি কৃত্রিম মহাত্মায় দেশ ভরে যাবে—অহিংসাবাদীদের বুকের ভিতর সাতপুরু ঢাকনায় ঢাকা হিংসা নানা ছুতোয় বেরিয়ে আসবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়-চরিত্র নিস্তেজ, নিরুদ্যম ও স্ফূর্ত্তিহীনতায় আচ্ছন্ন হবে মনে করি। চরকা চালাবার স্ফূর্ত্তি সকলকে প্রাণবান করতে পারে না। সুতরাং শারীরিক বলবীর্য্য চর্চ্চার দ্বারা দেশকে স্ফূর্ত্তিমান দেখায় আমি আনন্দ পাই, একথা আমি স্বীকার করব। দেশকে নিষ্ক্রিয় আমি দেখতে চাইনে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা বলতে চাই, আমার কাছে ক্ষত্রিয়তা একটি আদর্শ ধর্ম্ম, অনেক বেড়া দিয়ে তার আটঘাট বাঁধা। ক্ষাত্রধর্ম্মের অর্থ নয় নৃশংসতা, ক্ষাত্রধর্ম্মের অর্থ নয় গুপ্তহত্যা, সংযম ও আত্মদমন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রাণ।

আজকের খেলায় বিজয়ীকে দেশবন্ধুর নামে একখানি ঢাল প্রদানের দ্বারা সম্মানিত করতে প্রস্তুত হয়েছ। এই ঢাল প্রদানের অর্থটা একটু চিন্তা করে দেখো। আমাদের

* রাজবাটি ফুটবল এসোসিয়েশনে সভানেত্রী শ্রীমতী সরলা দেবীর অভিভাষণ।

দেশে প্রাচীনকালে দেব বা মানব উভয় জাতির যোদ্ধাদের চিহ্ন তাঁদের রথধ্বজায় চিত্রিত থাকত—তাই কারোর নাম ছিল গরুড়ধ্বজ, কেউ কপিধ্বজ, কেউ মীনধ্বজ, কেউ বৃষধ্বজ। প্রাচীন য়ুরোপের বর্ম্মাবৃত যোদ্ধাদের পরিচয় তাঁদের ঢালের উপর অঙ্কিত বা খোদিত থাকত। কেননা তাঁদের মুখ দেখে চেনার যো ছিল না, মুখও বর্ম্মে ঢাকা। তাই ঢাল-বিশেষের রঙ ও চিত্র সেই ঢালধারী যোদ্ধার বীরত্ব ও তার বংশমর্য্যাদার সঙ্গে লোকের মনে একাকার হয়ে বসে যেত। যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে Herald বা ঘোষক প্রত্যেক যোদ্ধার ঢালের চিত্রবর্ণনার দ্বারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করত। পরস্পরে ঢালের রঙ বা চিত্র অনুকরণ করে জগৎকে ঠকাতে চেষ্টা করলে যুদ্ধ বেধে যেত—যেন পরস্পরের মহিমা চুরির চেষ্টা।

কোন রাজা পররাজ্যের অধিকার দাবী করলে সেই রাজ্যের রাজঢালের চিত্রাবলী নিজের ঢালচিত্রে সংযুক্ত করে দাবী সাব্যস্ত করতেন, জমিদারেরাও তাই করতেন—তারপর মারামারি কাটাকাটি সুরু হত।

ক্রমে ব্যক্তিগত বীরত্বের স্থলে যখন কলাকৌশলের দ্বারা যুদ্ধে জয়পরাজয় নির্ণীত হতে লাগল তখন যুদ্ধস্থলে ঢালের চিহ্ন ধারণ অনাবশ্যক হলেও বংশমর্য্যাদার চিহ্নস্বরূপ বজায় রইল।

ব্যক্তিগত বীরত্বের দিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঢালটা ক্রীড়াক্ষেত্রে—tournamentএ-ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়েছিল। সেখানে রমণীদের উপস্থিতি প্রযুক্ত ঢালের চিত্রবৈচিত্র্য ও আড়ম্বর অনেক বেড়ে গেল। সকল পুরুষেরই ইচ্ছা হত দর্শক নারীদের সাম্‌নে তাঁর ঢাল বেশী সুন্দর দেখতে হোক, তাঁরই মহিমা বেশী ঘোষিত হোক, এবং তিনিই বিজয়ী হোন।

ক্রমে ঢালের চিত্র শিরমোহরে চড়ল, এবং রাজঢাল, দপ্তরঢাল, সাম্প্রদায়িক ঢাল, পারিবারিক ঢাল ও পারিতোষিক ঢাল—এই কয়রকম শাখায় ঢালের প্রয়োগ বিস্তৃত হল। তোমরা যে ঢাল আজ প্রদান করবে তা এই শেষ শ্রেণীর ঢাল—কোন বিশেষ বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ পুরস্কাররূপে প্রদেয় ঢাল।

তোমরা এই ঢালের সঙ্গে দেশবন্ধুর নাম জড়িত করেছ। যারা দিচ্ছ এবং যারা গ্রহণ করছ দুই দলেই স্মরণ রেখো দেশবন্ধুর নামে চিহ্নিত ঢালে কি কি চিত্র অঙ্কিত থাকা উচিত, কোন্ কোন্ গুণের মর্য্যাদা রাখার দায়িত্ব আজ স্বীকার করলে। যদি এ ঢাল গ্রহণ করলে তবে এর যোগ্য হতে হবে জেনো। দেশভক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের পায়ে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করা, নিঃস্বার্থ হওয়া, নির্ভীক হওয়া—এই সব এ ঢাল তোমাদের নিকট দাবী করে। এ ঢাল গ্রহণের জন্য হাত বাড়াবার আগে নিজের মনকে একবার যাচিয়ে দেখো—পারবে? এ ঢালের মর্য্যাদা রাখতে পারবে? এর অবমাননা না করবে?

এ ঢাল আমার হাত দিয়ে, মাতৃজাতির হাত দিয়ে দেওয়াচ্ছ। বিজয়ীদের হাতে

এ ঢাল অর্পণ করার আগে তোমাদের আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেব। য়ুরোপ থেকে আমদানী এ ঢালের সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের নারী-মর্য্যাদার স্মৃতি জড়িত আছে। যারা এ ঢাল গ্রহণ করবে তারা নারীর সম্মান, নারীকে আপৎ হতে উদ্ধার করা, নির্য্যাতন হতে রক্ষার কর্ত্তব্য থেকে কখন বিচ্যুত হবে না, এই মনে ভেবে ঢাল নিও।

বাংলাদেশের চতুর্দ্দিকে নারীনির্য্যাতনের কথা ক্রমাগত শুনা যাচ্ছে। যদি এ ঢালের উপযুক্ত হতে চাও অবলাবলদলরূপে নিজেদের সংগঠন কর। জেলা ভাগ করে নাও, এক এক জেলায় এক একজন গিয়ে একটী করে দল বাঁধ। যদি দল কোথাও বেঁধে থাকে তাদের বল বাড়াও। নারীদের আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত কর। অত্যাচারিত নিরুপায় নিঃসহায় নারীদের সমাজে গ্রহণের জন্য সমাজের লোককে বোঝাও, পূজোর সময় গ্রামে গ্রামে জগদম্বার পূজায় যখন বহু জনসমাগম হবে—তখন পল্লী-সমাজে এই ভাবের প্রচার বইয়ে দাও, গ্রাম তোলপাড় করে দাও—যেন অত্যাচারিত একটিও হিন্দুনারী হিন্দু-সমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বাধ্য হয়ে আর মুসলমান সমাজভুক্ত না হয়। একে ত নিরপরাধিনীর প্রতি অন্যায়বিধান, তার উপর সমাজের লোকবল হানি।

ঢাল তোমাদের পৌরুষ ও কোমল হৃদয়তা দু'য়েরই জন্য প্রেরণা দেয়। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শুধু আত্মরক্ষা নয়, বিপন্নের রক্ষা। যদি ঢাল গ্রহণ করলে তবে যথার্থ ক্ষত্রিয় হতে শিক্ষা কর।

খাদি-প্রতিষ্ঠান *

আমি খদ্দর ব্যবহার করি—আমি খদ্দর ভক্ত। খদ্দর সম্বন্ধে বলার কথা আছে অশেষ, কিন্তু শ্রোতাদের ধৈর্য্যের শেষ থাকতে পারে, সেইজন্য সংক্ষেপে দুটী কথা মাত্র বলব। খদ্দর কাপড়খানি কি? একে কেন ভালবাসি, কেন পরি—কেন সবাইকে পরতে বলি? এটী পরতন্ত্র ভারতবর্ষের আত্মশক্তির একটী নিবিড় পরিচয়। ভারতের ছাইচাপা আগুন থেকে থেকে দপ্ দপ্ করে কোন না কোন দিক দিয়ে জ্বলে উঠতে চায়। যতই দাবাতে চাও, যতই আইন কানুনের চাপে ঢাকতে চাও, যতই বিদেশী সৌখীন কাপড়ের ঠাণ্ডাজল ঢেলে তাকে নিবাতে চাও সে কিছুতেই নেবে না,—কিছুতেই দাবে না। এই খদ্দরের টানাপোরনের ভিতর দিয়ে আমাদের ছিন্নভিন্ন আত্মশক্তি বুনে উঠবার—বিকাশের একটী পথ খুঁজছে। নানাদিকে নানাভাবে জাতির দলিত মথিত ক্ষুব্ধ আত্মা নিজের মাথা তুলতে চায়—গর্ব্বিত প্রভীচ্যের কাছে প্রমাণ করতে চায়—আমি দীন নই, আমার ভিতর ঐশ্বর্য্য আছে, শক্তি আছে, মনুষ্যত্ব আছে। হীন নই আমরা, পশু নই আমরা—আমরা মানুষ। আমাদের নিজের কলা আছে, শিল্প আছে, ধর্ম্ম আছে, সমাজ আছে, জ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আছে। তোমরা সব নিজের স্বার্থের ও অহঙ্কারের যাঁতাকলে পিষে দিতে

* জব্বলপুর পার্কে জনসভায় সভানেত্রীর অভিভাষণ।

চাচ্ছ, আমরা পিষ্ট হব না। আমরা নিজের গান গাইব, নিজের ছবি আঁকব, নিজের ভাষা বলব, নিজের ধর্ম্ম মানব, নিজের কাপড় পরব।

আজ ২৫।৩০ বৎসর থেকে আমরা অনেকেই স্বদেশী ব্যবহারী। ভারতবর্ষ ও এশিয়া-জাত কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় জ্ঞাতসারে কিনিনি। তখন স্বদেশী বল্‌তে ভারতবর্ষে বোনা কাপড় বোঝাত, সে কাপড়ের সুতা যেখান থেকেই আসুক। তিলক মহারাজ তাই প্রচার করতেন, গান্ধীও তাকেই স্বদেশী বলে ব্যবহার করতেন।

আজ বছর পাঁচ থেকে গান্ধী মহারাজের চোখে ধরা পড়ল যে, শুধু স্বদেশের তাঁতে বা কলে বোনা হলেই কাপড় স্বদেশী হয় না, সুতোটাও এই দেশেরই হওয়া চাই। দেশের সুতো দিয়ে তৈরী দেশের বোনা কাপড়ই যথার্থ স্বদেশী কাপড়। দেশ থেকে সুতা কাটা উঠিয়ে দেওয়াটাই ইংরেজ বণিকের হাতে দেশের আত্মশক্তি লোপকরার একটা প্রধান অস্ত্র হয়েছে। ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়ের পিছনে আছে দেড় শত বৎসর ধরে ইংরেজজাতির রাষ্ট্রশক্তি। প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে কিছু করতে পারে না। তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য চাই আমাদের মধ্যে সংহতিশক্তি।

পরিধান ক্ষেত্রে খাদি প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর মূর্ত্তিমান সংহতিশক্তি। এই প্রতিষ্ঠান যদি গড়ে উঠ্‌তে পারে, নিজেদের দেশের লজ্জা নিবারণের যোগ্য কাপড় নিজেরাই যদি আবার করতে পারে, তবে মাথাও আমাদের উঁচু হবে, আর অগণ্য নিরন্ন দেশবাসীর পেটে অন্নও কিছু পড়বে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বর-শিষ্য সতীশ বাবু প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছেন। গুরুর নাম ও মূর্ত্তি সুমুখে রেখে তিনি পশ্চাতে থেকে সব করছেন। তাঁরও পশ্চাতে চাই দেশের গণ্য-মান্য লোকের সহানুভূতি, ও সম্মতি ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সাহচর্য্য। ছেলেদের ভিতর আজকাল ফুটবল খেলার রেওয়াজ খুব বেড়ে উঠেছে। এখানে অনেক ছেলে উপস্থিত আছ। তোমরা যদি 'কেমেরণ' বা অমনি কোনো একটা ইংরেজ টিমকে হারাতে পার, তবে তোমাদের মাথা গর্ব্বে উন্নত হয়ে ওঠে। খাদির এই সঙ্ঘকেও একটা 'টিম' মনে করে নিতে পার। এই টিম দিয়ে যদি বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের টিমকে তোমরা হারাতে পার, তবে তোমরাও ধন্য হবে, দেশের মুখও গৌরবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে। তোমরা কতরকমে খাদিকে সাহায্য করতে পার। খাদির কাজে যোগ দিয়ে একে সাহায্য করা চলে—তা যদি কারো পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে খাদি কিনেও একে সাহায্য করা যায়। একলক্ষ টাকার খাদি দেশে বিক্রয় হচ্ছে না,—এ দেশের পক্ষে অসীম লজ্জার কথা।

যাঁর ভিতর আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তিনিই একটু তলিয়ে দেখ্‌লে স্বীকার করবেন, জাতির আয়াস, শ্রম, উদ্যম, শক্তি ও কর্ম্মজাত খাদির পরিধান, গতগৌরব, হৃতআসন, লজ্জানতমস্তক ভারতবাসীকে নরসমাজে সকলের পশ্চাৎ হতে আবার সম্মুখে নিয়ে আসার একখানি মস্ত দলিল।

খদ্দর। *

ভগ্নীগণ, কন্যাগণ, আজ তোমরা কোন্ মেলা দেখতে এসেছ? এ সোণার বাঙ্গলার ভাঙ্গা মেলা। আজ মেলায় সাজাবার কিছু নেই, দেখবার কিছু নেই। না আছে সে ঢাকাই মস্‌লিন, যার একখানা ওড়না একটি বড় এলাচের খোসার ভিতর পোরা যেতে পারত, যা দেশবিদেশের রাজরাণী, বাদশাবেগম পরতে চাইতেন, যা তিন হাজার বছরের আগেকার মিশরের বড়লোকদের মৃতদেহের উপর আজও দেখা দিয়ে জগতের চক্ষুরঞ্জন করছে। না আছে সে জামদানি, না আছে সে শুলবাহার। সোনার বাঙ্গলার সে কৌশল নেই, সে হাত, সে অভ্যাস নেই। একলব্য গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বুড়ো আঙ্গুলটি দ্রোণাচার্য্যকে কেটে দিয়ে ধনুর্ব্বিদ্যায় কুশলতা হারিয়েছিলেন; ইংরেজ বণিকসম্প্রদায়ের উৎপীড়নে বাঙ্গলার তাঁতিরা বুড়ো আঙ্গুল কেটে বয়নবিদ্যায় কৌশলশূন্য হয়ে বসে আছে। আজ দেশের তাঁতে দেশের লোকের লজ্জা নিবারণোপযোগী আটপৌরে মোটা কাপড়ও হয়ে ওঠে না,—কলা, কীর্ত্তি, কর্ত্তব্য সবই খুইয়ে বসে আছে।

আজ সেই ভাঙ্গা কীর্ত্তিকে ফের গেঁথে তোলার জন্যে, লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্যে খাদি প্রতিষ্ঠানের এই মেলা। ভাঙ্গাকে গড়া সে কি সোজা কথা?—সেকালের সব সুন্দর সুন্দর মন্দির, সুন্দর সুন্দর রাজপুরী ভেঙ্গে খসে খসে পড়ছে, তার এক একখানি ইঁট একত্র করলেও সেকালের চূণ সুরকী, সেকালের কারিগরের অভাবে ঠিক তেমনটি আর দাঁড় করান নাও যেতে পারে; কিন্তু ততদূর নাও যদি বা হয়, যতদূর হতে পারে, তারই চেষ্টাই ত মানুষের মত মানুষের কাজ।

আজ এই যে মোটা মোটা খদ্দর দেখছি, এই একদিন ঝিন্‌ঝিনে মস্‌লিন হয়ে উঠবে,—চরকায় বাঙ্গালীর মেয়ের হাত টিঁকে থেকে যদি তাদের হাত সুতাকাটায় আবার পেকে ওঠে। আজকের এই মোটা খদ্দর যাঁরা গায়ের রক্ত জল করে তৈরী করছেন, তাঁদের শ্রম সার্থক হয়; যদি গাঁটরি খুলতে না খুলতে তোমরা পাঁচজনে আপাততঃ এই মোটা কাপড়ই ঘরের আটপৌরে প্রয়োজনে লাগাবার জন্যে কিনে নাও। যে টাকাটা এই কাপড়গুলো করাতে এঁদের আটকে গেছে, সেইটে মজুরী সমেত এঁদের হাতে ফিরে এলে তখন আর একটু পাতলা সুতো কাটানর জন্যে এঁরা সেটা লাগাতে পারবেন। ক্রমে আরও পাতলা, আরও পাতলা এবং অভ্যাসে কারিগরদের হাত দুরস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু করে সস্তা এবং ক্রমে ক্রমে বিলাতী কাপড়ের মতই সস্তা করে আনতে পারবেন।

পাল্লা এখন দেশের মালদের বিদেশী বণিকদের সঙ্গে। বিদেশী বণিকদের পক্ষে আছে রাজার অক্ষৌহিণী, আর দেশের রথীদের সহায় শুধু বাঙ্গলার গৃহলক্ষ্মীরা। কৃষ্ণসারথে

* মির্জ্জাপুর পার্কে মহিলা-সভায় সভানেত্রীর অভিভাষণ।

সৈন্যহীন পাণ্ডবেরা জয়ী হয়েছিলেন, গৃহলক্ষ্মীদের সারথ্যে সোনার বাঙ্গলা জয়ী হবে না? ভ্রাতা বাসুদেব যেদিন যুদ্ধরত, সেদিন ভগ্নী সুভদ্রার হাতে রথ-অশ্বের বল্গা। ভাইবোনে মিলে বিপদ ভূমি হতে বেরিয়ে পড়ে নিরাপদ সম্পদক্ষেত্রে পৌছতে হবে। আজ বোনদের রথ চালাবার দিন এসেছে, ভাইয়েদের ভার লাঘব করো, তাদের হাত কঠিনতর কাজের জন্যে মুক্ত রাখো, তোমরা কৌশলে চালাও রথ—সুতো কাটো, যেমন তাঁত থেকে কাপড় বেরিয়ে আসবে, অমনি সে কাপড় সবাই মিলে কিনে ফেলো, পরো, বিলোও, পর্দা করে টাঙ্গাও, টেবিলের ঢাকনা করো, বিছানার চাদর করো, বালিশের ওয়ার করো—যেমন করে হোক্ ব্যবহারে লাগিয়ে ফুরিয়ে ফেলো—জমতে দিও না। আবার আসুক, আবার আসুক, আবার আর এক দলে কিনো। এই রকমে ক্রমে ক্রমে সস্তা হোক্, সুন্দর হোক। কত দিকে কত বাজে খরচ করো, এই দিকেই একটু বাজে খরচ করে দেখো ক্রমে লাভ হবে।

আর একটি কথা বল্‌বার আছে। আমাদের হিন্দুদের বুকে একটি সংস্কার আছে যে, দেশী জিনিষ শুদ্ধ। সেই সংস্কারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিলাতী বেগুণ খান না, গাজর শালগম খান না। সেই সংস্কারেতেই পূজোপাটে বস্‌তে গেলে পট্টবস্ত্র ব্যবহারের বিধি আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে। এই সংস্কারটিই স্বদেশী জিনিষকে বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে আবহমানকাল রক্ষা করত। এই যে পট্টবস্ত্র ব্যবহারবিধি তা থেকেই দেখ। পট্টবস্ত্র আর চীনাংশুক এক জিনিষ নয়। দুটো নামেতেই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি একটি চীনদেশ থেকে আসত, একটি দেশী পাট থেকে তৈরী হত। চীনাংশুক অর্থাৎ বিদেশী রেশমী কাপড় যতই সুন্দর ও মহামূল্য হোক, তা পট্টবস্ত্রের সঙ্গে পবিত্রতায় একস্তরের বলে গণ্য হত না।

আজও সেই মনের ভাব আমাদের রয়েছে। আজও পুজোয় বা কোন শুভ ক্রিয়াকর্ম্মে বসলে আমরা পরিৎপক্ষে জাপানী বা ফরাসী সিল্কের শাড়ী পরে বস্‌তে চাইনে—বহরমপুরী তসরের বা গরদের শাড়ীখানি বা বেনারসের চেলি পরতে চাই। তুলোর সঙ্গে আবার পাট মিশিয়ে কাপড় বোনার উদ্যোগও আরম্ভ হয়েছে। আমাদের সনাতন পট্টবস্ত্র ফিরে আসছে। পাট মেশান বা না-মেশান খদ্দরকে যাঁরা বিলাস সজ্জার কাপড় করে ব্যবহার করতে না পারেন, অন্ততঃ যেন পূজার কাপড় করেন। এই পূজা উপলক্ষে সকলেই যেন এক একখানি খদ্দর পট্টবস্ত্রস্বরূপ কিনে হিন্দু মেয়েদের চিরাগত সংস্কারের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। তাতেই তাঁরা দেশের কলা ও কীর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়তা করে কর্ত্তব্যপালন করবেন। দেশের রথচালনায় তাঁদের সারথ্য এই রকমে চাই।

আপনারা আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা যেন একেবারে খালি হাতে ফিরে না যান। বেশী না হোক্, অন্ততঃ কিছু-না কিছু খাদি আজ আপনাদের কিন্‌তেই হবে। তা ছাড়া পাড়ার সকলে যাতে খাদি কেনে, সে জন্যেও আপনাদের সাহায্য দরকার। আপনারা দল বেঁধে সকলকে দিয়ে খাদি কেনাবার চেষ্টা করুন।

আমার আরো একটা নিবেদন আছে আপনাদের কাছে। মহা অষ্টমীর দিন আপনারা

উপবাস করেন, কিন্তু এ উপবাসের কারণ কি জানেন? বাঙ্গলার মায়েরা এ উপবাস করত —এই আকাঙ্ক্ষা করে যে, আমার পুত্র বীর হোক্, সাহসী হোক, নির্ভীক হোক। কাপুরুষতা যেন তাকে স্পর্শ কখনো না করে। মায়েদের এই কামনার কথা বাঙ্গলার মায়েরা আজ ভুলে গেছেন। আপনারা যাঁরা পুত্রের মা, তাঁরা পুত্রকে বীর করে গড়ে তুল্‌বার সেই ব্রতই আবার গ্রহণ করুন। বীরাষ্টমীর দিন পুত্রের বীরত্ব কামনা করে তাদের হাতে রাখী বেঁধে দিন—বীরোচিত খেলা-ধূলায় তাদের উৎসাহিত করে তুলুন। লাঠি খেলায়, কুস্তির লড়াইয়ে, তলোয়ার ভাঁজিয়ে, শক্তির পরিচয়ে ছেলে যাতে জয়ী হয়, এই ছিল সেকালের মায়েদের কামা। আপনারাও ছেলেদেরকে আর আঁচলের আড়ালে ঢেকে রাখবেন না—তারা যাতে শক্তিমান হয়ে গড়ে ওঠে সেজন্য বীরাষ্টমী ব্রত গ্রহণ করুন।

কালের প্রবাহ

কবি ও কর্ম্মীর লড়াই

কবি ও কর্ম্মীর লড়াই এই প্রথম নহে। ১৯২০ সালে গুজরাট সাহিত্য পরিষদে গুজরাটের সাহিত্যরথিগণের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া যখন বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ আহমদাবাদে অভিভাষণ করেন, গুজরাটের গান্ধি তাঁহার সহিত একমত হন নাই। তিনি সভাস্থলেই উক্ত ভাষণের সমালোচনা করেন, সভামঞ্চেই তাঁহার মতদ্বৈধ প্রকট হয়। আহমদাবাদ সহরে সে সময় বেশ একটি দলাদলি পাকিয়া উঠিয়াছিল, কবি ও গান্ধির অমিল ঘরে ঘরে চর্চ্চার বিষয় হইয়াছিল। বিদেশে কবির দল সেদিন বড় ছিল, গান্ধির দল ক্ষুদ্র। লড়াইয়ের বিষয়টা তখন চবকা ছিল না। তারপরও 'ইয়ং-ইণ্ডিয়া'র স্তম্ভে লোকের কাছে বিশ্বভারতী ও শান্তি-নিকেতনের প্রতি কটাক্ষপাতের জন্য কবিভক্তদের বা কবির অভিযোগ শান্তিপ্রয়াসে গান্ধি মহাত্মা জবাবদিহি করিয়াছেন, বলিয়াছেন—"বিশ্রম্ভালাপে লোকে যা কিছু বলে তা অপরের কাণের জন্য নয়, সেটা ধর্ত্তব্য নয়।"

একবার আধবার নয়, যতদূর মনে পড়ে দু'তিনবার এইরূপ কথোপকথনে কবির বিরুদ্ধে কৃত মন্তব্য কর্ম্মীকে সবিনয় সৌজন্যপূর্ণ লিখিত কৈফিয়তে শোধরাইয়া লইতে হইয়াছে।

চরকার প্রতি কর্ম্মবীর গান্ধির উদগ্র পক্ষপাতিতা সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 'রবি-রশ্মি'তে ভারতীর পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। কবির উত্তর কর্ম্মী তাঁহার 'ইয়ং-ইণ্ডিয়া' পত্রে দিয়াছেন। বিশ্বকবির সর্ব্বদিক্‌প্রসারিণী প্রতিভার কিরণচ্ছটা তাঁহার মন্তব্যে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গান্ধি-উত্তর

যে সুললিত বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়াছেন তাহাও কম সুখপাঠ্য হয় নাই। লড়াইয়ে দু'পক্ষকে শুনিতে সকলের আগ্রহ হয়, এবং তাহার দ্বারা উভয়পক্ষকে নির্লিপ্তভাবে বিচার করিবারও সুবিধা হয়। তদনুসারে কর্ম্মীর জবাবটি আমরা 'আনন্দবাজার' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কিছুদিন পূর্ব্বে স্যর রবীন্দ্রনাথের চরকা সম্বন্ধীয় সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার সময় আমার কতিপয় সুহৃৎ উহার উত্তর দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নানা গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, আমি তখন সবটা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু মোটামুটী উহার আসল কথা জানিবার মত পড়া হইয়াছিল। উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে আমার তাড়াতাড়ি করিবার কিছু ছিল না। যাঁহারা ঐ প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা এত বেশী উত্তেজিত অথবা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, আমি সময় পাইলেও তখন যাহা লিখিতাম তাহা ধীরভাবে প্রণিধান করা কঠিন হইত। অতএব এখন আমার পক্ষে লিখিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। এখন কি কবির সমালোচনা, কি আমার উত্তর, সকলেই প্রশান্ত চিত্তে বিবেচনা করিতে পারিবেন।

চরকা সম্বন্ধে কবি ও আচার্য্য শীলের ঔদাসীন্য সম্পর্কে আচার্য্য রায়ের অধীরতার তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ উক্ত সমালোচনা লিখিত। সর্ব্বাপেক্ষা চরকার প্রতি আমার অতিরিক্ত ভালবাসার প্রতিও মৃদু ভৎর্সনা উহাতে আছে। প্রথমে সর্ব্বসাধারণের এটা জানা উচিত যে, কবি চরকার অর্থনৈতিক উপযোগিতা অস্বীকার করেন নাই। এই সমালোচনা লিখিবার পর কবি নিখিল-ভারত দেশবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

আবেদনপত্রখানি ভাল করিয়া পাঠ করিয়াই তিনি তাহাতে দস্তখত করিয়াছিলেন এবং আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি চরকা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন, যাহা আমার প্রীতিপ্রদ নাও হইতে পারে। আমি তখনই কবির উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু সমালোচনা পাঠ করিয়া আমি অসন্তুষ্ট হই নাই। আমার সহিত মতে না মিলিলেই অসন্তুষ্ট হইব, এমন কি কথা! যদি প্রত্যেক মতের অমিল অসন্তোষের সৃষ্টি করে, তাহা হইলে দুইজন লোকের মধ্যে যখন সকল বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভবপর নহে,—তখন মনুষ্যজীবন অসন্তোষে ভরিয়া উঠিয়া দুর্ব্বহ হইবে। বরং সরল সমালোচনায় আমি প্রীত হই। উহাতে আমাদের মতানৈক্যের মধ্যেও বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়। সুহৃদকে, সুহৃদ্ হইতে হইলে যে অধিকাংশ বিষয়ে একমত হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কেবল মতানৈক্যের মধ্যে তীব্রতা ও তিক্ততা না থাকিলেই হইল। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, কবির সমালোচনায় তাহা নাই।

আমি এতখানি ভূমিকা করিলাম, কেননা আমি লোক মুখে শুনিয়াছি, ঈর্ষার প্রেরণাতেই এই সমালোচনার উদ্ভব। এইরূপ অমূলক সন্দেহ দৌর্ব্বল্য ও অসহিষ্ণুতার প্রমাণ। একটু চিন্তা করিলেই এই নিষ্ঠুর সন্দেহ অন্তর্হিত হইবে। কবি আমাকে কেন ঈর্ষা করিবেন! ঈর্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা সূচিত করে। আমি তো জীবনে দুই লাইন কবিতা লিখিতেও সক্ষম হই নাই। আমার মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব নাই। তাঁহার মহত্ত্বের প্রতি আমার কোন দুরাকাঙ্ক্ষা নাই। সে ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। আজকাল জগতে তাঁহার সমকক্ষ কবি নাই।

আমার "মহাত্মা পদবী"র সহিত কবির অপ্রতিদ্বন্দী মর্য্যাদার কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং কোন ক্ষেত্রে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র পরস্পরের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। কবি তাঁহার সৃষ্ট এক রূপৈশ্বর্য্যময় জগতে বাস করেন। এ জগত ভাবগঠিত। আমি পরের সৃষ্টির ক্রীতদাস—সে সৃষ্টি চরকা! কবি তাঁর সৃষ্ট গোপীদিগকে তাঁহার বাঁশরী বাজাইয়া সেই সুরের ছন্দে নৃত্যপরা করেন। আর আমি প্রিয়তমা সীতারূপী চরকাকে জাপান, ম্যানচেষ্টার, পারিস প্রভৃতি দশমুণ্ড রাবণের কবল হইতে উদ্ধারের জন্য ঘুরিতেছি। কবি একজন স্রষ্টা, তিনি সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন এবং সেই ধ্বংস হইতে আবার নবীন সৃষ্টি গড়িয়া তোলেন। আমি একজন অনুসন্ধিৎসু মাত্র। একটি মাত্র বস্তু আবিষ্কার করিয়া আমি তাহাতেই মগ্ন আছি। কবি জগতকে নিত্য নূতন মনোমুগ্ধকর বস্তু সমূহ উপহার দিতেছেন, আর আমি এক সুপ্রাচীন জরাজীর্ণ বস্তুর মধ্যে যে গুপ্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে যাদুকর অভিনব নেত্রাকর্ষক বস্তু সৃষ্টি করেন, জগতে সম্মানের আসন পাওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ। আমাকে এই জীর্ণ বস্তুটি লইয়া কঠোর পরিশ্রম দ্বারা জগতের এক কোণে স্থান সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব আমাদের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। বরং আমি সবিনয়ে বলিব, আমাদের একের কর্ম্মপ্রচেষ্টা অপরের কর্ম্মের পোষকতা করিতেছে।

'কবি নিরঙ্কুশ', অতএব তিনি কবির সমালোচনাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহার পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। একজন প্রাচীন কবি বলিয়াছিলেন যে, সুলেমান তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তি ও যশোমণ্ডিত হইয়াও একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের সমকক্ষ নহেন! এ ক্ষেত্রে কবি পদ্মের সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের সহিত, সুলেমানের বৈভব এবং বহু সদ্‌গুণ সত্ত্বেও, ত্রুটি বিচ্যুতির তুলনা করিয়াছেন। কবি যে নিরঙ্কুশ তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের প্রবেশও সহজসাধ্য, কিন্তু ধনীর পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ আরও কঠিন।' আমরা জানি যে সূচীছিদ্রের মধ্য দিয়া কখনো উষ্ট্র প্রবেশ করে নাই এবং জনকের ন্যায় ধনীব্যক্তিও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অথবা দাড়িম্ব-দানার সহিত হাস্যবিকশিত দশনের তুলনার কথা ধরুন। কোন কোন লঘুচিত্তা নারী কবির অত্যুক্তি সত্য মনে করিয়া তাহাদের দন্ত রঞ্জিত করিয়া আরও কুৎসিত করিয়াছে এবং অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। কবি ও চিত্রকর তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তুকে ফলাইয়া ধরিবার জন্য অনেক সময় স্বভাবের সীমা অতিক্রম করিতে বাধ্য হন। অতএব যাঁহারা কবির চরকা-নিন্দাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা কবির প্রতি অবিচার করিবেন। এবং নিজেরও অনিষ্ট করিবেন।

কবি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়েন না, তিনি পড়িবেন এমন আশাও করা যাইতে পারে না, তাঁহার পড়িবার প্রয়োজন নাই। তিনি বর্ত্তমান আন্দোলন-সম্পর্কে যাহা জানেন, তাহা কথোপকথন হইতে সংগৃহীত। অতএব তিনি চরকা-আন্দোলনের মধ্যে যাহা কিছু অতিরিক্ত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহারই তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

কবি মনে ভাবেন, আমি প্রত্যেক নরনারীকে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ চরকা

কাটিতে উপদেশ দেই। অর্থাৎ আমি চাই, কবি তাঁহার কাব্য, কৃষক তাহার হল, উকীল তাহার নথী, ডাক্তার তাহার ছুরি একেবারে পরিত্যাগ করুক। কিন্তু এ বিষয়ে সত্য এই যে, আমি কাহাকেও স্ব স্ব জীবিকা ত্যাগ করিতে তো বলিই নাই, পক্ষান্তরে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের উপর প্রত্যহ মাত্র ৩০ মিনিট চরকা কাটিয়া সমগ্র জাতির জন্য কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকারে অনুরোধ করিয়াছি। যে সমস্ত ক্ষুধাতুর নরনারী কর্ম্মের অভাবে বে-কার বসিয়া আছে, তাহাদিগকে আমি চরকাই জীবিকারূপে এবং যে সমস্ত কৃষক-পরিবার অর্দ্ধাশনে কাল কাটায়, তাহাদিগকে অবসরকালে চরকাদ্বারা আয় বৃদ্ধি করিতে অবশ্যই আমি বলিয়াছি। যদি কবি প্রত্যহ আধ ঘণ্টা করিয়া চরকা কাটেন, তাহা হইলে তাঁহার কবিতা আরও সমৃদ্ধ হইবে। কেননা, তাহাতে দারিদ্র্যের অভাব ও বেদনা অধিকতর সত্যভাবে কবির মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

কবি ভাবেন, চরকা জাতির মধ্যে মৃত্যুর ন্যায় সমতা আনিবে এবং ইহা ভাবিয়া চরকাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিবার কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু সত্য এই যে, ভারতের বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে এক সাধারণ স্বার্থের জীবনগত ঐক্য রহিয়াছে। জগতের পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে যে উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ও রূপের ঐক্য-স্বভাব পুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহাও এক অভ্রান্ত সত্য। দুইটি লোক একরূপ নহে, এমন কি যমজভ্রাতাদ্বয়ের মধ্যেও অনৈক্য আছে। তথাপি অনেক বিষয়ে মনুষ্যজাতির মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে বিদ্যমান এবং এই সাধারণ বাহ্য অবয়বের পশ্চাতে একই প্রাণশক্তি সকলের মধ্যেই অনুস্যূত। এই সাদৃশ্য বা ঐক্যের ভাব আচার্য্য শঙ্কর সর্ব্বোত্তম যুক্তিদ্বারা স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন এবং তিনি শুনাইয়াছেন, সত্য এক—সত্য ব্রহ্ম—নামরূপাদিবিশিষ্ট সমস্তই মায়া, নশ্বর। আমরা যাহা দেখি তাহা অসৎ কিনা' এবং এই অ-সতের পশ্চাতে আমাদের দৃষ্টির বাহিরে সৎ আছে কিনা —ইহা লইয়া তর্কের আবশ্যক নাই। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, উভয় অবস্থাই সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পার। আমি কেবল বলিতে চাই, এই বৈচিত্র্য বহুত্বের মধ্যেও একত্ব ও সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং এই জন্যই আমার ধারণা, জীবিকার্জ্জনের কর্ম্ম-বৈচিত্র্যের পশ্চাতেও একটা ঐক্য আছে। কৃষিকার্য্য কি সমগ্র মানবজাতির সাধারণ জীবিকা নহে? অল্প দিন পূর্ব্বেও চরকা কাটা তেমনি সমগ্র মানবজাতির সাধারণ কর্ম্ম ছিল। যখন রাজা-প্রজা সকলেরই অশন-বসনের প্রয়োজন, তখন এই প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সকলেরই পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। রাজা অবশ্য ইহা স্বার্থত্যাগের দ্বারা বা সম্মতিসূচক কোন ইঙ্গিতের দ্বারা সাধন করিতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি নিজের প্রতি এবং তাঁহার প্রজাদের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে চাহেন, তাহা হইলে ইহা করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইউরোপ আজ এই অপরিহার্য্য প্রয়োজন নাও বুঝিতে পারে; কেননা, ইউরোপের বাহিরের আর সমস্ত দেশ শোষণ করা ইউরোপের ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অন্যেত জাতিরা চিরদিন এভাবে শোষণ সহ্য করিবে না। এই মিথ্যাচার-ধর্ম্ম, অদূর ভবিষ্যতে, অনিবার্য্যরূপে ধ্বংস হইবে। এই সমস্যা

সমাধানের এক মনুষ্যোচিত, শান্তিপূর্ণ এবং সত্য উপায় নির্দ্দেশ করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি। ইহার পরিবর্ত্তে যদি টানাটানি কাড়াকাড়িই প্রবল হয় এবং পরস্পরকে ভূতলশায়ী করিবার প্রবৃত্তি উগ্র হয়, তাহা হইলে এই পন্থা পরিত্যক্ত হইবে। এবং তখনই, যখন অ-শ্বেত জাতিরা শ্বেতাঙ্গদিগকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিবে, তখন চরকার সত্য অধিগম্য হইবে। যদি আমাদের বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু অথবা খাদ্য ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিলে চলিবে না, সেইরূপ বস্ত্রও ইংলণ্ড হইতে আমরা আমদানী করিব না। আমি এই মতবাদকে সম্পূর্ণ যৌক্তিকতার সহিত ব্যক্ত করি বলিয়াই একথা বলিতে দ্বিধাবোধ করি না যে, বোম্বাই এমন কি বঙ্গলক্ষ্মী হইতেও বাঙ্গলাদেশের কাপড় আমদানী করা উচিত নহে। যদি বাঙ্গলাদেশ তাহার স্বাভাবিক ও স্বাধীন জীবন পাইতে চাহে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অথবা বহির্জ্জগৎ শোষণ করিতে না চাহে, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যেক গ্রামে শস্যের মত বস্ত্রও উৎপাদন করিতে হইবে। কলকারখানারও স্থান আছে—ইহা টিকিয়া থাকিবে; কিন্তু যে শ্রম মানুষের পক্ষে অতি আবশ্যক, তাহা কলের উপর দেওয়া চলিবে না। উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল খুব ভাল। কিন্তু যদি দৈবক্রমে কোন ব্যক্তি কোন নবউদ্ভাবিত যন্ত্রদ্বারা সমগ্র ভারতের জমী চষাতে আরম্ভ করে এবং সমস্ত উৎপাদিত শস্য নিজের আয়ত্তে রাখে এবং লক্ষ লক্ষ লোকের আর কোন উপজীবিকা না থাকে,—তাহা হইলে তাহারা অনাহারে থাকিবে, এবং অলস হইয়া নির্ব্বোধ হইবে। ইতিমধ্যেই অনেকে এইরূপ হইয়াছে এবং আরও অনেকের সেইরূপ হইবার আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তে বিদ্যমান। কুটীর-শিল্পের যন্ত্রগুলির উন্নতিসাধন আমার কাম্য, কিন্তু কলচালিত টাকুদ্বারা হাতের কাজ বন্ধ করা এবং লক্ষ লক্ষ কৃষককে বাড়ীতে অল্প অর্থকরী কাজ না দেওয়া—আমি অপরাধজনক মনে করি।

আয়র্লণ্ডের তুলনা আমাদিগকে খুব বেশী সাহায্য করে না। অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজন সম্পর্কে ইহা আমাদের যতটুকু সচেতন করে, এতটুকুই ইহার মূল্য। কিন্তু ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন হওয়ায়, সেই অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার প্রয়োগও বিভিন্ন হইবে। ভারতের দারিদ্র্যের প্রতিকারোন্মুখ সহযোগিতাকে চরকার চারিপাশেই কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে—তাহা হইলেই এই ১৯০০ মাইল দীর্ঘ এবং ১৪০০ মাইল প্রস্থ বিরাট দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি যোগ দিতে পারিবে। একজন স্যর গঙ্গারাম একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র করিতে পারেন, কিন্তু যে দরিদ্র কৃষকের ৮।৯ বিঘা জমী আছে এবং তাহাও প্রতি মুহূর্ত্তে কমিবার সম্ভাবনা, তাহার নিকট ঐ আদর্শ নিষ্ফল।

চরকাকে কেন্দ্র করিয়া অর্থাৎ অনলস এবং পরস্পরের সহযোগিতায় কর্ম্ম নিষ্পাদনের সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন জনসাধারণের মধ্যে একজন দেশকর্ম্মী অনায়াসেই ম্যালেরিয়া নিবারণ, স্বাস্থ্যোন্নতি, গ্রাম্যবিবাদ মীমাংসা, উত্তম পশু-প্রজনন এবং অন্যান্য শত শত কল্যাণকর কার্য্য করিতে পারেন। যেখানেই চরকা-কার্য্য অনেকাংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইখানেই কর্ম্মী ও পল্লীবাসীদের শক্তি-সামর্থ্যানুযায়ী অন্যান্য হিতসাধক কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

কবির সমস্ত যুক্তিগুলিই বিশদভাবে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। কবির যুক্তির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা অনুমোদন করিলে, চরকা সম্বন্ধে আমাকে পূর্ব্বধারণা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। চরকার অনেক বিষয় লইয়া তিনি যে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা আমি বলি নাই। চরকার যে সমস্ত গুণ আমি দাবী করি, কবির উক্তির শরবর্ষণে তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

তবে একটি কথায় আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। কবির বিশ্বাস, কাহারও নিকট শুনিয়া তিনি বিশ্বাস করেন যে, আমি রামমোহন রায়কে 'বামন' বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমি কখনও রামমোহনকে 'বামন' বলিয়া বর্ণনা করি নাই—ধারণা করা তো দূরের কথা। তিনি কবির নিকট যেরূপ আমার নিকটও মহান্। আমার যতদূর মনে পড়ে, একবার ছাড়া আর কোনস্থলে আমি রামমোহনের নাম উল্লেখ করি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে একবার আমি তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। সে কটকে, চার বৎসর পূর্ব্বে। আমি বলিয়াছিলাম, আমার স্পষ্ট মনে আছে—পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যতীত একজন ব্যক্তির পক্ষে উচ্চতম জ্ঞানার্জ্জন করা সম্ভব। এবং একজন রামমোহন রায়ের কথা উল্লেখ করায় আমি বলিয়াছিলাম, উপনিষদের অজ্ঞাতনামা রচয়িতাগণের সহিত তুলনায় তাহাকে বামন ধারণা করার সহিত ইহা অনেক পৃথক। যদি আমি মিল্টন ও সেক্সপীয়রের সহিত তুলনায় টেনিসনকে ক্ষুদ্র বলি, তাহা হইলে টেনিসনকে অবজ্ঞা করা হয় না। আমার মনে হয়, তাহাতে উভয়েরই মাহাত্ম্য বাড়ান হয়। আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সত্ত্বেও আমি কবিকে ভালবাসি তাহা তিনি জানেন, এবং যিনি বাঙ্গালার সোশাল সংস্কার আন্দোলনকে সম্ভব করিয়াছিলেন তাঁহার মহত্বকে আমি ক্ষুণ্ণ করিতে চাই না; কেননা, কবি সেই সংস্কার আন্দোলনের একটি শ্রেষ্ঠ ফল।"

গুরু-গঞ্জনা

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, গান্ধি মহারাজ বলিতেছেন, তিনি লোকমুখে জানিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রেরণাতেই কবির এই সমালোচনা। ইহাও বলিতেছেন :—"রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাপ্রকাশিত হওয়ার সময় (তখন তিনি কলিকাতার ১৪৮নং রসারোডে অবস্থিত) আমার কতিপয় সুহৃৎ উহার উত্তর দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নানা গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আমি তখন সবটা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু মোটামুটি উহার আসল কথা জানিবার মত পড়া হইয়াছিল। উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে আমার তাড়াতাড়ি করিবার কিছু ছিল না। যাঁহারা এই প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা এত বেশী উত্তেজিত অথবা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, আমি সময় পাইলেও তখন যাহা লিখিতাম তাহা ধীরভাবে প্রণিধান করা কঠিন হইত। অতএব এখন আমার পক্ষে লিখিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। এখন কি কবির সমালোচনা, কি আমার উত্তর, সকলেই প্রশান্ত চিত্তে বিবেচনা করিতে পারিবেন।"

ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া গান্ধিজী নিজে উত্তেজিত বা বিচলিত হওয়ার দরুণ যে উত্তেজনা শান্তির পর লেখা ভাল ভাবিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন তাহা বলিতেছেন না। অন্যদের শান্তভাবে বিচারের অবসর দেওয়ার জন্য বিলম্ব করিয়াছেন জানাইতেছেন। কবির 'ভৎর্সনার পাত্র' আচার্য্য রায় ও গান্ধিজী, কিন্তু গান্ধিজীর ভৎর্সনার পাত্র তাঁর 'কতিপয় সুহৃৎ' যাহারা তাঁহাকে বলিয়াছে কবি তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তিনি তাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, কবির সম্বন্ধে তাদের "এইরূপ অমূলক সন্দেহ দৌর্ব্বল্য ও অসহিষ্ণুতার প্রমাণ।"

গুজরাটে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কবির গুজরাটী ভক্তেরা কর্ম্মী গান্ধীকে কবির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতার অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস, সেদিন কবির কাছেও যদি কেহ স্পষ্ট করিয়া সেরূপভাবে গান্ধী-গ্লানি করিয়া থাকে, তবে কবিও তাহাদের গঞ্জনা দিয়া থাকিবেন। কিন্তু মহাত্মাপদবীবান্ গান্ধীর তূণীরে গঞ্জনাটা সদাসর্ব্বদা মজুদ রাখিতে হয়। কেননা, তিনি নিজেকে "an amaturish teacher of youth" বলেন, তিনি আজ ভারতবর্ষের নৈতিকগুরুর পদে অধিষ্ঠিত। তাই বলিয়াছেন,—"আমার মাহাত্ম্যের (Mahatmaship) সহিত কবির (কবিত্বের) অপ্রতিদ্বন্দ্বী মর্য্যাদার কোন সম্পর্ক নাই।"

গুরু গঞ্জনার দ্বারাই শোধরাইবেন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও গুরুর গঞ্জনা কবির সমালোচনার অপেক্ষাও 'নিরঙ্কুশ' হওয়ার যে দাবী রাখে তাহা মহাত্মা গান্ধি বিশেষভাবে সাব্যস্ত করিয়াছেন—বহরমপুর কলেজে বাঙ্গালী ছাত্রসম্প্রদায়কে তীব্র ভাবে আঘাত দিয়া। লোকের মুখে শুনা কথা তাঁর যে গঞ্জনার ভিত্তি। তিনি বলিয়াছেন :—

"Throughout my travels in Bengal I have heard a lot about the students of Bengal..... I have been told that the life of the college student in Bengal, if not throughout India, is not particularly pure. .....I recall myself a story told by a Hindu widow some weeks ago, with tears in her eyes. She has got several daughters, some of whom are not yet married. She asked me what she was to do with her daughters. They are all educated. She is not sparing herself in order to give her daughters a decent education. I asked her what the ages of these daughters were. In my opinion they are not yet fit to be married. The mother said, "How can I help marrying my girls? Can you show me a place where I can hide them, where I can consider that my girls will be in safety? She said, you do not know the youngmen of Bengal, you do not know how dangerous it is

for young girls to walk about unprotected; they are not free from the lustful eyes of students who walk about the streets of Calcutta".

অতঃপর গান্ধিজী ছাত্রদের প্রশ্ন করিতেছেন :—

"Can this be true? I hope it is not".

পরক্ষণেই ছাত্রদের উত্তরের অবসর না দিয়াই বলিতেছেন—

"But that widowed mother is not an illiterate woman. Let me tell you she is a great Congress worker, she spoke from knowledge, she spoke from the bitterness of her own experience and she said, you may ask anybody you like, and you will find that, in general, my remarks will be corroborated by the parents in Bengal".

একজন রমণীর সাক্ষ্য—তিনি কংগ্রেসের কর্ম্মী হউন বা না হউন—এক আধ পাঁচ দশটি ছাত্র নয়, বাঙ্গলার সমগ্র ছাত্রসমাজ ভদ্রলোকের মেয়েদের প্রতি কামদৃষ্টিদূষিত—এরূপ গঞ্জনা মহাত্মামুখনিঃসৃত হইলেও বাঙ্গলার ছাত্রসমাজের একেবারেই মুখরোচক হয় নাই শুনিয়াছি। তাহারা যে এ বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করে নাই তাহা বাঙ্গলার ছাত্রদের আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি সৌজন্য, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের একান্ত পরিচয় প্রদান করিতেছে! পুত্রকল্প বাঙ্গালী ছাত্রদের এই সৌজন্যে আমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। কিন্তু সেই পুত্রদের হইয়া আমি গান্ধি মহারাজকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, সেদিনকার রমণীবিশেষের টাটকা 'লাগানর' ছাত্রদের প্রতি প্রযুক্ত কটূক্তি আজ তিন মাস পরে তিনি নিজেই পড়িয়া দেখুন, এবং শান্তভাবে বিচার করুন, সেই রমণীর অত্যুক্তির এরূপভাবে প্রশ্রয় দেওয়ায় বাঙ্গলার ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রতি নিদারুণ অন্যায় করিয়াছেন কি না।

— — —

গান

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী সরলা দেবী।

সিন্ধু—ঠুংরি

চোখের জলের মিলন আমার
তোমার সাথে হে আজ
বজ্রাতপ্ত বধূর হৃদয়
লইও হৃদয়-রাজ।
আজ ঘরে নেই
অহঙ্কারের
রাঙ্গা চীনাম্বর
পরে আছি শুধু, অনুতাপ-চীর
বিবর্ণ ও ধূসর।
নেইক রতন,
কাঙ্গালিনীর
বলয় শূন্য হাত,
তোমার পাণির
পরশটি হোক্
মণিভূষণ নাথ।

| | | |

| | | |

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল

অন্তঃপুর-স্ত্রী শিক্ষা

বিগত ১৫ বৎসর বঙ্গদেশে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল প্রধান কার্য্য হইয়াছে অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা। যতদিন য়ুরোপের সহিত এশিয়ার সংযোগ হইয়াছে, প্রায় ততদিন হইতেই বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশনারী সম্প্রদায় ভারতের অন্তঃপুরশিক্ষার ভার স্ব স্ব স্কন্ধে বহন করিয়াছেন—স্কচ্, ইংলিশ, আইরিশ, ফরাসী, রুষ, পর্ত্তুগীজ, ডানিশ, সুইস, জার্ম্মাণ, আমেরিকান কেহই পশ্চাৎপদ থাকেন নাই। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে আমাদের মা-মাসীদের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা অনেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি। এখন সময় আসিয়াছে নিজের শিক্ষার ভার নিজেরা বহন করিতে, বিশেষ মিশনারীদের অদম্য উৎসাহ সত্ত্বেও ধর্ম্ম-বিপ্লবের ভয়ে ভারতের অধিকাংশ পরিবারই তাঁদের প্রতি বিমুখ, তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে নারাজ। আমাদের সেই সকল গৃহে শিক্ষার দীপ হস্তে আমরা নিজেরাই এখন যাইব—ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের এই প্রধান উদ্দেশ্য। আর নিরুদ্যমে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিব না, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদেশিনীরা যে কার্য্যকলাপ করিতেছেন শুধু তাহা দেখিয়া দেখিয়া তাঁদের প্রশংসায় হতভম্ব হইয়া বসিয়াই থাকিব না, তাঁহাদের প্রশংসা-যোগ্য কর্ম্মশীলতার অনুসরণ করিব, তাঁদের কার্য্যকুশলতা নিজেদের মধ্যে সঞ্চার করিব, খ্রীষ্টীয় নারীদের স্বার্থত্যাগ, কষ্টস্বীকার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের অনুকরণে আমাদের অন্তঃপুর-শিক্ষা আমরা নিজেরাই চালাইব এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের ব্রত। এই ব্রত সাধনের উদ্দেশ্যে আজ প্রায় পনেরো বৎসর হইল ভারতস্ত্রী মহামণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে।

অন্তঃপুর-শিক্ষা ব্যতীত ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের আরও উদ্দেশ্যাবলী আছে। সেগুলি নিয়মসহ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী

১। এই মহামণ্ডল স্থাপন দ্বারা ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নারীদিগকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া তাঁহাদিগের নৈতিক ও অবস্থাগত স্থায়ী উন্নতি সাধন করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

২। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে (ক) ভারতীয় সকল প্রদেশের স্ত্রীজাতিকে একত্র করিবার জন্য মেম্বরগণের সাময়িক সম্মিলন হইবে। (খ) বয়স্থা নারীদিগের পারিবারিক অবস্থা অনুযায়ী বিদ্যাশিক্ষা দিবার নিমিত্ত অন্তঃপুর শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হইবে। (গ) ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের পুষ্টি ও বিস্তারের জন্য উৎসাহ দিয়া যাহাতে নারীদিগের মধ্যে

আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞানের প্রসার হয়, সদ্‌গ্রন্থ সকল স্বল্প ব্যয়ে ও সহজে তাহাদের হস্তগত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইবে। (খ) সেবাব্রত বা 'নার্সিং' প্রভৃতি নারীদের হিত ও উন্নতিকারী সকল প্রকার অনুষ্ঠানের সহিত সংস্রব রক্ষা করা হইবে এবং আবশ্যকানুযায়ী প্রতিষ্ঠান খোলা হইবে। (গ) নারীদিগের দ্বারা প্রস্তুত শিল্প দ্রব্য সকল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য বিভিন্নস্থানে মহিলা ভাণ্ডার খোলা হইবে। এইরূপে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্থ স্ত্রীলোকের কৃত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিলে উহার দ্বারা অনেক দরিদ্র পরিবারের ভরণ-পোষণের উপায় হইবে।

৩। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই সমিতির শাখা স্থাপনের দ্বারা যাহাতে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্য সকল প্রদেশে ও নগরে সুশৃঙ্খলরূপে চালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। অন্যান্য যে কোন মহিলা সমিতি বা নারী সভা এই মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করিতেছেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করার চেষ্টা করা হইবে।

৫। জাতি, ধর্ম্ম ও শ্রেণীনির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য পালনে সহায়তা করিবেন, তিনিই উহার মেম্বর হইতে পারিবেন। প্রবেশিকা ফি ১৲ এক টাকা ও বার্ষিক চাঁদা অন্যূন ১৲ এক টাকা মাত্র। মুখ্য মেম্বরগণের অন্যূন চাঁদা বার্ষিক ১০৲ টাকা।

৬। অন্তঃপুরস্থ নারীদিগের শিক্ষার জন্য সম্পন্ন ছাত্রীদের নিকট হইতে শিক্ষয়িত্রীদের পারিশ্রমিক লওয়া হইবে। ক্রমশঃ সমিতির আয় বৃদ্ধি হইলে দরিদ্র পরিবারদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৭। নারীজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী উদার ব্যক্তিগণ ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলকে যে কোন প্রকারে সাহায্য করিবেন তাহাই ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

বাঙ্গলায় অন্ততঃ দশ সহস্র মেম্বর চাই।

ইংরাজ মেমদের "ইয়ং উইমেন্স ক্রীশ্চান্ অ্যাসোসিয়ন," প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিবার এত বল আসে কোথা হইতে? মেম্বর হইয়া যোগাযোগে, মেলা মেশায়। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের অন্ততঃ দশ সহস্র মেম্বর বাঙ্গলাদেশে হওয়া চাই। তবেই পরস্পরের সহিত যোগাযোগ সাধনের দ্বারা আমরা এমন একটী শক্তিশালী যন্ত্র গড়িতে পারিব যে যন্ত্রবলে অন্তঃপুর শিক্ষার রেলগাড়ী অবাধে চলিতে পারিবে ও নিঃস্ব পুরনারীগণের নির্ব্বাহের একটা উপায় খুলিয়া দিতে পারা যাইবে। অর্থবল বাড়িলে নির্য্যাতিতা নারীর রক্ষার ভার আমরাই লইতে পারিব। ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের দ্বারা আমাদের ঘরের সব কাজগুলি আমরা নিজেরাই করিব, মেমহিতৈষিণীদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। অথচ মেম্বর

স্বরূপ তাঁহাদের ভগিনী-প্রীতির আমরা দাবী রাখিব। আমরা অযোগ্যা, অক্ষমা, নিষ্কর্মা, নিকৃষ্টমনী, এক কথায় মেম্বেদের তুলনায় আত্মহিতসাধনে আত্মশক্তিহীনা এ নিন্দার আর অবসর থাকিবে না।

উপায়।

১। প্রত্যেক বঙ্গনারীর ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের মেম্বর হওয়া।

রিনিষ্ট মেম্বর হওয়ার ইচ্ছা হইলে ১৲ প্রবেশিকা ও ১০৲ টাকা বাৎসরিক চাঁদা ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল আফিসে লোক মারফৎ বা মণি অর্ডার যোগে প্রেরণ করা। কেবল সাধারণ মেম্বর মাত্র হইয়াই যোগ রক্ষা করিতে চাহিলে ১৲ টাকা প্রবেশিকা ও অন্যূন ১৲ বাৎসরিক চাঁদা লোক মারফৎ বা মনিঅর্ডারে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের আফিসে প্রেরণ করা।

২। প্রত্যেক মেম্বরের নিজ নিজ আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে মেম্বর বাড়ানর সঙ্কল্প ও চেষ্টা করা।

পুরুষদের কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলার প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক পুরুষের ঘরে ঘরে নিজ নিজ আত্মীয়াদের ও বন্ধু বান্ধবের পরিবারস্থ মেয়েদের মেম্বর ভুক্ত করিয়া তাঁদের নাম ধাম ও চাঁদা ভারতস্ত্রী মহামণ্ডল আপিসে প্রেরণ করা।

ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডল ভারত-দুহিতাদের হৃদয়ের মিলন ক্ষেত্র, শক্তির প্রয়োগক্ষেত্র, উদ্যমের কার্য্যক্ষেত্র, এবং পরসেবার তীর্থক্ষেত্র। ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডল কলিকাতার এক পাড়ার মেয়েদের সহিত আর এক পাড়ার মেয়েদের সংযোগ করায়, বাঙ্গলাদেশের এক সহরের স্ত্রীলোকদের সহিত আর এক সহরের স্ত্রীলোকগণকে সংযুক্ত করায়, ভারতের এক প্রদেশের মহিলাদের সহিত আর এক প্রদেশের মহিলাগণের সম্মিলন করায়, এবং ভারত মহাদেশের নারীগণের সহিত অন্যান্য মহাদেশের নারিগণের আধ্যাত্মিক মিলন সংঘটন করায়। ইহার শাখা-প্রশাখা বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ ও কাশীতে বিস্তারিত আছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার মেয়েরা ইহার বার্ত্তা শুনিয়া অর্থসাহায্য দ্বারা ইহার প্রতি প্রীতিজ্ঞাপন করিয়াছেন। কর্ম্মের বন্ধনের মত এমন কাছে টানা অথচ দৃঢ় বন্ধন আর কিছু নাই। যেখানে এক কর্ম্ম, এক লক্ষ্য সেইখানেই এক হৃদয় ও প্রীতি। স্ত্রী-মহামণ্ডলের সূত্রে কত অজানা নারীগণের পরস্পরের সহিত কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রীতির গ্রন্থি বাঁধা হইতেছে। কর্ম্মের সেতু দিয়াই ভারত-মহিলাগণ পরস্পরের নিকট পৌঁছাইতে পারেন, নতুবা রাস্তা নাই। স্ত্রী-মহামণ্ডল সেই সংযোজক সেতুবন্ধ।

শ্রীসরলা দেবী
প্রতিষ্ঠাত্রী-অধিনায়িকা।

গ্রন্থ-সমালোচনা

রয়েল অক্সান্ ব্রীজ—শ্রীঅরুণোদয় সিংহ প্রণীত। এই পুস্তক খানিতে অরুণ বাবু রয়েল অক্সান ব্রীজ নামক ইংরাজী তাস খেলার দ্বাদশটীয় তত্ত্বগুলি সরল বাঙলা ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই দিবারাত্রনির্ব্বিশেষে ব্রীজ খেলিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজী ভাষায় ব্রীজ সম্বন্ধে উত্তম পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অরুণ বাবু ব্যতীত বোধ হয় আর কেহই বাঙলা ভাষায় ব্রীজের আলোচনা করেন নাই। প্রভাতী পত্রিকায় কয়েক মাস পর্য্যন্ত ধারাবাহিক-রূপে ব্রীজের আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। অরুণ বাবুর পুস্তকখানি "হ্রবার্টসন্" "ডালটন্" প্রভৃতি ইংরাজ গ্রন্থকারের প্রণীত ব্রীজ গ্রন্থের সমকক্ষ না হইলেও ইহাতে ব্রীজের জটিল তত্ত্ব সকল যেরূপ সরল ও প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে অতি অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে অনেকেই সুচারুরূপে ব্রীজ খেলা শিখিতে পারিবেন। যাঁহারা কখনও ব্রীজ খেলেন নাই কিংবা ব্রীজখেলা জিনিষটি কি তাহাও জানেন না প্রধানতঃ সেই শ্রেণীর পাঠকের জন্যই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু গ্রন্থকার পুস্তকের প্রারম্ভে খেলার পরিচয়ে গ্রন্থের অনেকাংশ ব্যয় করিয়াছেন। অভিজ্ঞ ব্রীজ খেলোয়াড়ের নিকট এই অংশটী অত্যন্ত নীরস বোধ হইলেও গ্রন্থের মধ্যে ব্রীজের জটিল তত্ত্বের এমন কয়েকটি সুচারু ব্যাখ্যা আছে যাহা পাঠ করিয়া পরিপক্ক খেলোয়াড়ও ব্রীজ সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব শিখিতে পারিবেন। গ্রন্থের পরিশেষে ব্রীজ সম্বন্ধে সতেরটি জটিল সমস্যা ও তাহার সমাধানে দেওয়া হইয়াছে। সমস্যাগুলির বিশেষত্ব এই যে সেঁ গুলিই গ্রন্থকারের স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। কোনটি ইংরাজী পুস্তক হইতে উদ্ধৃত নহে। "স্বদেশী মানুষের উপর কালা দেশী লোকে খেলিয়া এই সমস্যাগুলি পাইয়াছে সুতরাং আজকালকার দিনে এর ডালি পাঠকের নিকট অনাদৃত হইবে না" এই ভাবেতেই গ্রন্থকার এগুলি পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্রীজগৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসনা প্রেস, ১৪এ নন্দ ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

THE CALCUTTA REVIEW OFFICE
CALCUTTA UNIVERSITY

৪৯শ বর্ষ | ১৩৩২ | শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন,

মানুষ-গড়া রাজনীতি

(অশ্বিনীকুমার দত্তের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় সভানেত্রীর অভিভাষণ)

পুণ্যস্মৃতি অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিসভায় সভানেতৃত্বের পদে আমন্ত্রণ করে আমায় আপনারা তাঁর চরিত্রের পুনরনুশীলনের যে সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য আপনাদের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। মহাপুরুষদের স্মৃতিসভা আহূত করার উদ্দেশ্যই বোধ হয় এই। তাঁদের মহৎ চরিত্রের কথা বারবার স্মৃতিপথে ফিরিয়ে এনে, তাঁদের কোন কোন গুণ নিজেদের ভিতর সঞ্চারের জন্য, তাঁদের অনুবর্ত্তনের জন্যই স্মৃতিসভায় সকলকে একত্রিত করা হয়।

একই সূর্য্য বর্ণভেদে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রঙে প্রকাশ পায়, তেমনি একই মহাপুরুষ চিত্তভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হন। রাজনীতিমদে মাতাল যুবকেরা অশ্বিনীবাবুকে একজন রাজনৈতিক সর্দ্দাররূপে সম্মান করে, তাদের মধ্যে একজন এসে আমায় বল্লে—"অশ্বিনীবাবুর সভায় আর আপনি রাজনীতি থেকে পালাতে পারবেন না। দেশ আপনার কাছে যা চায় এবার তাই দিতে হবে। রাজনীতি ছাড়া আর কোন্ বিষয়ে এ সভায় বলবেন? এবার স্পষ্ট দেশের স্বাধীনতার নামে, রাজনীতির নামে আমাদের আহ্বান করতেই হবে।"

কিন্তু এই যুবকের চক্ষে আমি অশ্বিনীবাবুকে কেবল রাজনৈতিক হিসেবে দেখতে পাই নে। আমার চিত্ত তাঁতে পায় প্রধানতঃ একজন ঈশ্বর প্রেমে গদগদ ভক্ত, মানব প্রেমে গলা সেবক। তিনি রাজনৈতিক ছিলেন একথা সত্য। কে কেউ মানবপ্রেমিক সেই

স্বজাতি প্রেমিক, এবং স্বজাতীয় মানবের পূর্ণবিকাশের জন্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রয়াসী হতেও সে বাধ্য। কারণ জাতীয় অধঃপতনের দিন চিন্তায়, কার্য্যে, সাহিত্যে, সমাজে, শিক্ষায়, বাণিজ্যে, জীবনের সর্ব্বাংশে স্বাধীনতা হতে মানুষ বঞ্চিত থাকে।

অথচ পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। এর মধ্যে যে কোন একটি অংশের পরাধীনতার গ্রন্থি খুলে ফেলতে পারলে বাকী অংশের গ্রন্থিগুলিও সহজে খুলে যায় সত্য, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকলে সকল বিষয়েই স্বাধীনতা লাভ সহজতর হয়। আবার এ কথাও ঠিক অনেক সময় পররাষ্ট্রের অধীন না হলেও অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে দেশ স্বাধীন হলেও জাতির উচ্চনীচের, সমাজের বিভিন্নাংশের পরস্পর-অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে যায়, সে অবস্থায় দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতায় কোন লাভ হয় না, গুটিকত কর্ত্তা ব্যক্তির সুখসমৃদ্ধি ভোগবিলাস অবাধে স্ফূর্ত্তি পায় মাত্র। তাতে গোল বেধেই থাকে। দেশের লোকেই দেশের বৈরী হয়। তাই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব, পরস্পরের প্রতি ভরসার অভাবই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়। সুতরাং পাকা ভিত্তির উপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইমারৎ গাঁথা দরকার। সেই পাকা ভিত্তি হচ্ছে চরিত্রবান মানুষ গড়া। যুবকেরা রাজনীতি বলতে বুঝে হৈ চৈ; দরকার পড়লে হৈ চৈ করতে হবে, কিন্তু তার আগে সরঞ্জাম তৈরী থাকা চাই। যদি আগুন লাগে তবে ফায়ার এলার্ম দিতে হবে, কিন্তু তার জন্যে বালতী, জল, পাম্প এসব আগে থাকতেই হাতের কাছে মজুত রাখা চাই।

অশ্বিনীবাবুর রাজনীতি ছিল মানুষ-গড়া রাজনীতি, সরঞ্জাম-যোগাড়-রাখার রাজনীতি। তাই বঙ্গবিভাগের দিন বরিশালে ঢাকার প্রাচীন নবাববংশধরের বা সুবেবাঙ্গলার অর্ব্বাচীন নবাব ফুলারের প্রতাপ তাঁর প্রতাপের কাছে পরাস্ত হল। স্বদেশী হাট উঠল না, বিদেশী হাট বসল না। অশ্বিনীবাবু একা কিছু করেছিলেন কি? না, একাকে সহস্রায়িত করেছিলেন, তাঁর চরিত্রবল, তাঁর দৃঢ়তা সহস্রে সঞ্চারিত করে। আর নন্-কো-অপারেশনের অপ্রস্তুত কাঁচা ভিত্তির উপর স্বাধীনতাস্পৃহা তোলার দিন বাঙ্গলার বাহিরে কোন কোন স্থানে স্বচক্ষে কি দেখেছি? ছেলেরা মদের দোকানে পিকেটিং করছে; জোর করে বোতল তুলে ভেঙ্গে দিচ্ছে, এক একটী গান্ধী টুপী পরা ছেলে এক একটী মহীরাবণ, অহীরাবণ। তাদের ভয়ে দোকানী পসারী সব সন্ত্রস্ত। কিন্তু যেমন অশ্বের খুরধ্বনি শোনা গেল, খবর এল মাউন্টেড পুলিশ আসছে—অমনি গান্ধী টুপী নর্দ্দমায় ফেলে দে দৌড়, এক চম্পটে নজরাতীত, দোকানের সামনে ভিড়ও নেই ভাড়ও নেই, খালি কতকগুলি সাদা টুপী নর্দ্দমায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। নন্-কো-অপারেশনের ইমারৎ যে দু'এক ফুৎকারে হুড়মুড় করে পড়ে গেল তার কারণ এই যে, হৈ চৈয়ের উপর তাকে তোলা হয়েছিল, চরিত্রের উপর নয়। এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ হাসিল করতে হবে, সুতরাং চরিত্র গঠনের জন্যে সময়ক্ষেপ করার অবসর ছিল না।

হে যুবকেরা অত অধীর হলে চলবে না। দলগড়া-রাজনীতি এক জিনিষ, আর মানুষ-গড়া-রাজনীতি আর এক জিনিষ। অশ্বিনীবাবুর ছিল মানুষ-গড়া রাজনীতি। সেই নিরীহ নিঃশব্দ পাকা রাজনীতি চর্চ্চার জন্যই তিনি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ভারতবিশ্রুত হলেন, রাজনৈতিক সকরে ভারত-জোড়া আন্দোলনের ফেণা তুলে নয়। তার আগে বঙ্গের বাহিরে অল্প লোকেই তাঁর নাম জানত। সেই প্রথম ভারতবাসী তাঁরও নাম জান্‌লে এবং বরিশালেরও নাম জান্‌লে। তখন থেকে বরিশাল বল্লেই বোঝাত অশ্বিনীনিবাবু, অশ্বিনী-বাবু বল্লেই বোঝাত বরিশাল। কোথায় সেই বরিশালের ছেলেরা, কোথায় সেই সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গের ছেলেরা! সেই মহাপুরুষের উত্তরাধিকারিতাসূত্রে সেই স্বদেশপ্রেম, সেই স্বদেশী-প্রেম, সেই দৃঢ়তা, সেই নিঃস্বার্থপরতা, সেই নির্ভীকতা তোমাদের মধ্যে আছে কি? কে কত ত্যাগ করতে পার? হৈ চৈয়ের দলগড়া-রাজনীতি অনেক সময় এক জাতীয় অত্যাচারীর পরিবর্ত্তে আর এক জাতীয় অত্যাচারীর সৃষ্টি করে। দলের আধিপত্য, দলপতির প্রভুত্ব বজায় রাখাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। দলাদলি বৃদ্ধি হয়, দেশের উন্নতির উদ্দেশ্যটা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। হৈ চৈয়ের রাজনীতিতে শুধু অধিকার বুদ্ধি জাগায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগায় না। কিন্তু কর্ত্তব্য সম্পন্ন না করলে অধিকার লাভও হয় না, কিম্বা উপযাচক হয়ে কেউ অধিকার দিলেও তা রক্ষা হয় না। ম্যাটসিনি যিনি অশ্বিনীকুমারের রাজনৈতিক গুরু তাঁর Duties of man গ্রন্থে ইতালির শ্রমিকগণকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন :—

"শুধু অধিকারনীতির দ্বারা তোমরা কোন স্থায়ী উন্নতি লাভ করতে পারবে না। কর্ত্তব্য সম্পাদন ছাড়া কোন অধিকারই আসতে পারে না। যদি অধিকার করায়ত্ত করিতে চাও, তবে কর্ত্তব্যপথে চলতে থাক।"

সে কর্ত্তব্য কি? পরস্পর-প্রেম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, সাহায্য, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা, সত্য রক্ষা। যেখানে দুশো পেট্রিয়টের মধ্যে দেড়শো ইন্‌ফর্মার ও অ্যাগ্রভার, যেখানে আজ যে পুলিশের চাকুরেকে ঘৃণা করছি, কাল সেই চাকরীর সুযোগ হলে নিজে অম্লান বদনে তাতে গিয়ে ভর্ত্তি হচ্ছি, যেখানে ব্যক্তিগত আরাম ও সুখই চরম লক্ষ্য—সেখানে স্বাধীনতার সুযোগ কোথায়?

রাজনৈতিক স্বাধীনতার চরম উদ্দেশ্যই বা কি? শুধু পার্থিব উন্নতি? তা ত নয়, পার্থিব উন্নতি একটা উপায় মাত্র। পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার দ্বারা মানবত্বের উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্য—নিজেকে মহত্বের উচ্চতর স্তরে উঠানোর অবসর ও সুযোগ প্রাপ্তিই তার লক্ষ্য। ব্যক্তির শক্তি সামর্থ্য ও সুযোগ সমষ্টির শক্তি সামর্থ্য ও সুযোগের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। তাই চাই ব্যক্তির পিছনে সমষ্টির বল, তাই চাই জাতীয় ঐক্য। বাঙ্গলার যুবকগণ, অশ্বিনীবাবুর স্মৃতির যদি সম্মান রাখতে চাও, তবে তাঁর মৃত্যুপূর্ব্বের সেই শেষ কথাটি মনের মধ্যে নাড়া চাড়া করে দেখো। তিনি বলেছিলেন—"আমি মুক্তি

চাইনে, সেবা করতে চাই, ফের জন্মাতে চাই, এই বরিশালে—কার ঘরে? কার পুত্র হয়ে? ফাঁসি দণ্ডে দণ্ডিত নির্ভীক দস্যু আব্দুলের পুত্র হয়ে।"

এই কথাটার ভিতর কত গভীর আক্ষেপ আছে। জাতীয় আত্মজ্ঞানে, বাঙ্গালীর পরিচয়ে তিনি বাঙ্গালী চরিত্রে কতখানি ভীরুতা পেয়েছিলেন যার দরুণ তাঁর শেষ ইচ্ছা এই ভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল যে নির্ভীক দস্যুর রক্তে জন্মাতে চান, যাতে অণু-পরমাণুতে কোথাও আর ভয়ের লেশ না থাকে। বাঙ্গালী যুবকদের কথায় কথায় ভয়, মরতে ভয় বাঁচতে ভয়। যে স্বাধীনতাপ্রয়াসী তারও বুকের পরতে পরতে ভয়, খাবার ভয়, শোবার ভয়, পরবার ভয়। কোন কিছুর ভয় অন্তরে পোষণ করে স্বাধীনতা লক্ষ্মীকে কোনদিন করায়ত্ত করতে পারবে না। ইটালীতে, রুসিয়াতে, আয়ার্লণ্ডে বংশের পর বংশ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে যুবকেরা জেলে গিয়ে, দ্বীপান্তরে গিয়ে তবেই দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রেছে। গুপ্তহত্যা ক'রে পার পেয়ে জেলে যেওনা, প্রকাশ্য মানুষ গড়ার কাজে রত থাক, তাতেও যদি জেলে যেতে হয় পরোয়া করোনা, অশ্বিনী বাবুর বরিশালে পুণর্জন্ম নেওয়ার প্রতীক্ষায় থেকো না, তোমরা নিজেরাই এই জন্মে পুনর্জন্ম নাও, দ্বিজ হও, অভয় হও। গীতায় উল্লিখিত দৈবীসম্পদের মধ্যে সব প্রথম সম্পদ বলা হয়েছে "অভয়"। সেই সম্পদে সম্পন্ন হও। স্বাধীনতা তোমাদের মুঠোর ভিতরে এসে পড়বে।

অশ্বিনী বাবুর আর একটি উক্তি আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। শোনা যায় তিনি কোন ছাত্রকে বলেছিলেন "গোরার এক ঘা খেয়ে দশ ঘা ফিরিয়ে দিও।" যে দেশে যীশু খ্রীষ্টের প্রপৌত্র বলে নয়—কিন্তু ভয়ের দরুণ কিল খেয়ে কিল হজম করে, লাথি খেয়ে ল্যাজ-গুটান কুকুরের মত শুধু হেউ হেউ ক'রে কেঁদে বাড়ীভিতরে ঢোকে, যে দেশে অধিকাংশ পুরুষের পৌরুষ কাপুরুষতায় অদৃশ্য—সে দেশে পৌরুষকে জাগ্রত করার জন্যে এই কথা বলারই দরকার। এতে বুঝতে হবেনা যে অশ্বিনীবাবু হিংস্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। চেনা বামুনের পৈতার দরকার নেই। যাঁর দয়া কলেরা-রুগী হাঁড়ি মুচির সেবায় অকুণ্ঠিত ছিল, যাঁর সার্ব্বজনীন প্রেম কর্ত্তব্যপরায়ণ ব'লে বিষ্ঠার-হাঁড়ি-মাথায় মেথরকে কোল দিতে ডেকেছিল, সেই ভগবদ্ভক্ত সেই বিশ্বমানব-প্রেমে-প্রেমিক মানুষ সব হিংসার সব প্রতিহিংসার ঊর্দ্ধে ছিলেন। কিন্তু অগস্ত্য মুনির মত, বশিষ্ঠ ঋষির মত নিজে হিংসাশূন্য হলেও ভিন্ন অধিকারীর প্রয়োজন অনুসারে তাকে হিংসা ও প্রতিহিংসার দ্বারাই উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে এ প্রজ্ঞা তাঁর ছিল। ভীরুর ক্ষমা একটা ভাণ মাত্র। ভীরুকে ক্ষমার উপদেশ দিলে তার ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

তথা-কথিত অহিংস অসহযোগেরও ভিত্তি প্রতিহিংসার উপর। গবর্ণমেণ্টকে বলা হয়েছিল "জালিয়াঁওয়ালাবাগের দুষ্কৃতকারী রাজকর্ম্মচারীদের পেন্সন বন্ধ কর, খেলাফতের মামলা দুরস্ত কর—নয়ত তোমাদের জব্দ করব, তোমাদের সঙ্গে অসহযোগ করব।"

অসহযোগের ভেলা যেমনি জব্দ করার উদ্দেশ্যে ভাসান হয়েছে, অমনি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেই কাজ নেওয়া হয়েছে। প্রকারান্তরে 'একঘা খেয়ে দশঘা ফিরিয়ে দাও' এই নীতিই প্রচার করা হয়েছে। 'অহিংস' বিশেষণটা কাণা ছেলের নাম পদ্ম-লোচনবৎ হয়েছে। 'বিনা হাতাহাতির' বা 'বিনা মারকাটের' বিশেষণে তাকে বিশেষিত করলে সঙ্গত ও সত্য হ'ত, ইংরেজী 'Non-violent' শব্দের সঙ্গে বেশী খাপ ও খেত। কিন্তু নামে ভুল থাকলেও কাজে ভুল হয়নি। প্রতিহিংসারই প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। কোন ক্ষতি হয়নি, ঠিকই হয়েছে। কারণ অক্ষমতাবশতঃ ভয়ভীরুতাবশতঃ হতবস্তু হয়ে, নিস্তেজ হ'য়ে, নিষ্কর্ম্মণ্য হ'য়ে ব'সে থাকার চেয়ে প্রতিহিংসা বুদ্ধিতে জাগ্রত হওয়া শ্রেয়। তাও আধ্যাত্মিকতার স্তর, মনুষ্যত্বের একটা সোপান। নিরস্ত্র বেশ পরপীড়ন দোষ থেকে বেঁচে যায় সত্য কিন্তু আত্মরক্ষায়ও অসমর্থ হয়। তেমনি হাতাহাতি মারকাট একটা জাতির পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ করলে জাতিটি দাসে পড়ে সুশীল হবে বটে; কিন্তু দরকার পড়লে বেমক্কা বনে যাবে, কিম্বা অদরকারে চৌরিচৌরার মত রক্ত বমন করবে। একদল লোকের, এক প্রকৃতির লোকের হাতাহাতিতেই পৌরুষ স্ফূর্তি পায়, তাদের বৃত্তিটা ঠিক পথে না চালিয়ে একেবারে দাবিয়ে দিলে তাদের মনুষ্যত্বই আর মাথা তুলতে পারে না। স্থান-অস্থানের ধর্ম্ম-অধর্ম্মের বুদ্ধি জাগ্রত করে, দেশকালপাত্রতার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মারের প্রবৃত্তি একদিকে জাগ্রত অপরদিকে নিয়ন্ত্রিত করলে কল্যাণই সাধিত হয়, তাদের সাত্ত্বিকতারই প্রথম সোপানে চড়ান হয়। ভারতবর্ষের ঋষিজ্ঞানীদের এই সনাতন শিক্ষা।

বাঙ্গলার যুবকগণ তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বাধীনতার জন্যে সত্যই পিয়াসী—উঠ; বল বাপু, হৈ চৈয়ের জন্য নয়,—নীরব সাধনার জন্য, মানুষ হওয়ার জন্য। এক একজনে নিজের রুচি অনুযায়ী এক একটী কর্ত্তব্যের ব্রত নাও, এবং তা অচল-অটলভাবে সুসম্পন্ন কর। স্বাধীনতার উপায়স্বরূপ রাজনীতি চর্চ্চা মানে যদি বুঝে থাক শুধুই কূটচালে কৌশলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি, রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতির কোন সংস্রব নেই, স্বাধীনতালাভের জন্য মহত্বের পথে, কর্ত্তব্যের পথে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে চলার কোন দরকার নেই, তবে ভুল বুঝেছ,—তবে স্বাধীনতাকেও এখনও চেননি, এবং অশ্বিনীবাবু যাঁর আত্মার সম্মানার্থে আজ সকলে সম্মিলিত হয়েচ, তাঁকেও চেননি।

অশ্বিনীবাবুর প্রকৃত ভক্ত যদি হও, তাঁর অনুবর্ত্তন যদি কর্ত্তে চাও—তবে খুঁজে বের কর তাঁর প্রিয় শিষ্যদের, তাঁর সহকর্ম্মিদের, তাঁদের এক একজনকে কেন্দ্র করে মানুষ গড়ার এক একটি power-house স্থাপন কর—তাঁদের ত্যাগের, নিঃস্বার্থপরতার, নির্ভরতার বৈদ্যুতিকে ভরে যাও; এক একটি ছোট লোহার টুকরো এক একটা চুম্বকের সঙ্গে লেগে যাও, প্রত্যেকে ম্যাগনেটীজমে ভরে উঠ।

তারপর যেদিন ডাক আসবে বেরিও, হৈ চৈ কোরো; তোলপাড় কোরো। তোমাদের এখনকার হৈ চৈ হাওয়াই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ—সেদিনকার হৈ চৈ হবে ভরা বন্দুকের গুরুগম্ভীর সন্ধান।

শ্রীমতী সরলা দেবী

ত্রিপুরেশ্বরী

(ঐতিহাসিক নাটিকা)

প্রস্তাবনা

নারী ও বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত।

প্রলয়ের কালে যখন কারণ জলে ডুবল ধরা
পুরুষ হলেন পরুষ হারা বিশ্ব হ'ল জ্যান্তেমরা
এ জগত উঠ্‌লো জেগে আদ্যানারীর বীণার তানে
নারী যেথায় সম্পূজিতা (জেনো) নারায়ণের বাস সেখানে।
যেদিনে নারীর মুখে বেদ বেদান্ত হ'ত গীত
সেদিনের নরের মর্ম্মে মৃত হ'তো সঞ্জীবিত
মহিষ-মর্দ্দিনীর কোলে জন্ম নিলেন তারকারি
বাল্মীকি-ব্যাস অমর হ'লেন বাগ্‌বাদিনীরই সেবা করি
পদ্মযোনির আরাধনায় হয় ত জীবের মুক্তি ঘটে,
পদ্মালয়ার করলে পূজা বিশ্বমাঝে কীর্ত্তি রটে,
নারীর মুখের তিরস্কারে সৃষ্টি হ'ল তুলসী-গাথা,
কালিদাসের অমর কীর্ত্তি সেথানে সেই নারীর কথা,
স্মরণ রেখ এই কথাটি বিশ্বপতির অর্দ্ধ যিনি
শক্তি তিনিই সকল জীবের, তুচ্ছ তিনি নন কখনই। [প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—ত্রিপুরাধিপতি সিংহতুঙ্গের অন্তঃপুরস্থ শয়নকক্ষ, ত্রিপুরেশ্বর শয্যায় অর্দ্ধশায়িত-ভাবে বৈপ্রহরিক বিশ্রাম করিতেছেন। একজন কিঙ্করী ব্যজন করিতেছে, অপরা পাদ-সেবানিরত।]

রাজা। (স্বগত) কি হ'বে অনর্থক এই বলক্ষয়ে? এই সুখের পৃথিনী, এই অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজসম্পদ, এমন অলোকসামান্যা প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী, আনন্দময় দুর্লভ জীবন, এ সমস্তকে অনাবশ্যক বৈরিতায় এক মুহূর্ত্তে ধ্বংস করে ফেলায় লাভ কি? মন্ত্রীদলের প্ররোচনায় আরাকানরাজ প্রেরিত গৌড়পতির বহুমূল্য উপঢৌকনগুলি গ্রহণ করাই তখন ধৃষ্টতা হয়েছিল! কিন্তু এখনও তার প্রতিকার আছে। সেই রত্নরাজি ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলে নিশ্চয়ই গৌড়েশ্বর তা' সমর্থন করবেন। এখনই তার ব্যবস্থা করিয়ে ফেলি—ইহাই সঙ্গত।

[ত্রিপুরেশ্বরীর প্রবেশ]

ত্রিপুরেশ্বরী। মহারাজ! মহারাজ কি শত্রু শিবিরে শয়ে এমনই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন যে এই উচ্চ আহ্বানও তাঁর কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না? ধন্য।

রাজা। (মনেমনে) প্রেমময়ীর আজ এমন কঠোর স্বর! এমন কর্কশ ভাষা! একি হল!

ত্রিপুরেশ্বরী। (অঙ্গস্পর্শপূর্ব্বক) সুখনিদ্রা পরিত্যাগ করুন বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে!

রাজা (চক্ষু চাহিয়া) কি হয়েছে মহারাণি?

রাণী। শুনিলাম গৌড়পতির সহিত সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে? একি অবিশ্বাস্য জনরব মহারাজ?

রাজা। অবিশ্বাস্য কেন দেবি?

রাণী। অবিশ্বাস্য কেন? মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ কি যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ছিলেন না? আপনি কি তাঁদের বংশধর নহেন? আপনার ত্রিপুরবিজয়ী ত্রিপুরারিসম সহস্র সহস্র শিক্ষিত সৈন্যদল তো কই আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই? আপনিত বার্দ্ধক্য-জীর্ণ জরাজর্জ্জর ও রোগদুর্ব্বল নহেন! তবে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব রাজেন্দ্র, যে স্বয়ং যে বিবাদের সূচনা তৈরী করিয়া দূরদেশ হ'তে তাদের আমন্ত্রণ করে এনেছেন, এখন সেই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে সেই দ্বারসমাগত অতিথির যথোচিত ক্ষাত্র ধর্ম্মানুমোদিতভাবে অভ্যর্থনা সশস্ত্রে না করে, পাদ্যার্ঘ দানে সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক হয়েছেন! এ যে একান্তই অবিশ্বাস্য মহারাজ!

রাজা। (লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, পরে কহিলেন) বৃথা এ অনুযোগ মহারাণি! অনর্থক আত্মপ্রাণভয়ে ভীত হয়েই যে আমি আমার যুদ্ধাভিমুখী সৈন্যদলকে বিমুখ করছি এরূপ সন্দেহ করো না। নারি তুমি, জানো না যে, পঞ্চাক্রান্ত গৌড়াধিপতির সেনাবল কি অপরিমিত, তাঁর ধনবলও আবার সেই জনবলেরই অনুরূপ! সেই অসীম সৈন্য-সাগরের তুলনায় আমার সৈন্যগণ সমুদ্রের নিকট গোষ্পদের মতই নগণ্য। কোন্ ভরসায় আমি ওই উন্মত্ত সাগরসদৃশ বিশাল গৌড়বাহিনীর অসম্ভব প্রতিরোধ চেষ্টায় আমার নিরপরাধ প্রজাবৃন্দকে উৎসাহিত ও বিনষ্ট করবো?

রাণী। কোন্ ভরসায়? উত্তর সারথী পার্থ কোন্ ভরসায় অনন্তসহায় একা সেই সংক্ষুব্ধ সমুদ্র বীচিমালা সমতুলিত অসংখ্য মহাপরাক্রান্ত কৌরব বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিলেন? কোন্ ভরসায় সুরক্ষিত লঙ্কা পুরীর প্রাসাদ তোরণে অশিক্ষিত বন্য বাহিনী সঙ্গে রঘুকুলপ্রদীপ দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘিয়া অবরোধ করেছিলেন? ত্রিপুরেশ্বর! সেই ক্ষাত্র শোণিত কি তোমারও শিরাসমূহে প্রবাহিত হচ্ছে না? নারী আমি? না মহারাজ!

আমার সংশয় হয়, বিধাতা নরদেহে তোমাকেই আমার পরিবর্ত্তে নারীত্ব প্রদান করে ফেলেছেন !

রাজা। (সোদ্বিগ্নে) অর্জ্জুন ও রামচন্দ্র একবারই জন্ম লয়েছিলেন, কোথায় কত উচ্চে তাঁদের স্থান আর কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি !

রাণী। (স্বগত) তোমার ভীরুতা লইয়া তুমি এই রত্নপর্য্যঙ্কে শয়ান থাক, আমার ত্রিপুরসৈন্যকে আমি তাদের মর্য্যাদা হারাইতে দিব না। (দাসীদের প্রতি) তোরা চলিয়া যা।

[দাসীদের সসম্ভ্রমে প্রণামান্তর প্রস্থান]

(মহারাজের চরণে মস্তক রাখিয়া)

শুধুন মহারাজ ! যতক্ষণ না গৌড়সেনা ত্রিপুর সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে ততক্ষণের জন্য আপনি আমার বন্দী। আজ্ঞা দিন আপনাকে বন্দী করিতে— মহারাজ ! দাসীর এ অনুরোধ রাখুন !

রাজা। (আদর করিয়া) তোমার অনুরোধ কি ঠেলিতে পারি ? তথাস্তু ! আমি তোমারই বন্দী।

[ত্রিপুরেশ্বরী সিংহিনী সদৃশ অটলচরণে কক্ষ বাহিরে আসিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন]

রাণী। কে আছিস !

প্রতিহারীদ্বয়। কি আদেশ মহারাণী !

রাণী। বিনা অনুমতিতে কেহ যেন এই কক্ষের দ্বার মুক্ত না করে। স্বয়ং রাজেশ্বরের আদেশেও নয়। এ তাঁহারই আজ্ঞা।

প্রতিহারীদ্বয়। স্বয়ং রাজেশ্বরের আদেশেও নয়—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ত্রিপুরা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর

কাল অপরাহ্ণ, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, যুবরাজের প্রমোদগৃহ। পুষ্পাভরণা রাজবধূ বিজয়াদেবী বীণাযন্ত্রে বর্ষারাগিণী আলাপ করিতেছেন, যুবরাজ তানপুরা লইয়া সঙ্গত করিতেছেন।

বিজয়ার গীত

বাদল রাতে ঝরিছে ধারা
ঝরে, ঝরে, ঝরে, অঝোরে পাগল পারা।
চপলা উঠে হাসিয়া গভীর ধ্বান্ত নাশিয়া,
মত্ত মাতুরী, জাগিছে মুকারী,
বাতাস কাহা করে আপন হারা।
তারই ব্যাকুল স্বরে পরাণ কেমন করে

[সহসা কক্ষমধ্যে মহারাণীর প্রবেশ]

রাণী। (তীব্রস্বরে) কুজ, বিজয়! এই কি তোমাদের প্রেমালাপ ও সঙ্গীতালাপের উপযুক্ত কাল?

[উভয়েই চমকিয়া যন্ত্র ফেলিয়া দিলেন ও সলজ্জে উঠিয়া প্রণাম করিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইলেন]

রাণী। গৌড়সৈন্য নগরাবরোধ করিতে আসিতেছে সংবাদ রাখ ত্রিপুরার যুবরাজ?

যুবরাজ। (গভীর লজ্জায় সবিনয়ে) জানি মা! কিন্তু গৌড় হইতে আমাদের আর অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা নাই। মহারাজ কল্য প্রত্যূষেই সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত প্রেরণ করিবেন।

রাণী। ধিক্ ধিক্ কাপুরুষ! কেন মাতৃগর্ভে তোমার মৃত্যু ঘটে নাই; শোন কুজ! গৌড়সেনা নগর দ্বারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ত্রিপুর সৈন্য তাদের অস্ত্র দ্বারা যথাবিহিত সংবর্দ্ধনা করিবে। আমি এ যুদ্ধের সেনাপতি। সাহস থাকে আমার পশ্চাতে এস, না থাকে এইখানে বন্দী থাক, যুদ্ধান্তে মুক্তি পাইবে। বিজয়া!

রাজবধূ। (নিকটে আসিয়া) আর্য্যা! আমায় আপনার সঙ্গে লউন; আপনার দত্ত শিক্ষা আজ সার্থক হউক।

রাণী। (সস্নেহে) বীরপুত্রের জননী হয়ো! এস মা!

যুবরাজ। মা! আমি কি তোমার গর্ভে বাস করিনি? যতই অসাধ্য হোক, তবু তোমার আদেশ যখন, তখন হোক জয়, হোক পরাজয়, এ যুদ্ধ যাত্রা তো করতেই হবে।

রাণী। হোক জয়, হোক পরাজয় কেন এ দ্বিধা? না না, হৃদয়ে অনন্ত বল, অন্তরে অদীম ভরসা লয়ে এস, অন্তরেরও অন্তঃস্থল হ'তে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে বল হবে জয়, নাহি পরাজয়!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিপুর সৈন্যগণ

[দুর্গপ্রাকারে উঠিয়া সৈন্যদল দেখিতেছিল, দূরে দক্ষিণ প্রান্তে আকাশ জুড়িয়া ধূলিজাল উড়াইয়া গৌড়াধিপের সর্ব্বজয়ী বিপুল সৈন্যদল ত্রিপুরার নগরদ্বারাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে]

১ম সৈনিক। এখনও গৌড়সেনার মূর্ত্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু অশ্ব পুরোত্থিত ধূলিপটলমধ্যে অসংখ্য মুণ্ড লহরী চেনা যাচ্ছে।

২য় সৈনিক। উঃ মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট পর্ব্বত প্রাচীর সচল হয়ে ছুটে আসছে!

৩য় সৈনিক। অথবা একটা প্রবল জলপ্লাবন। দেখতে দেখতে সেটা এসে এখনই সমস্ত ত্রিপুরাকে তার করাল জঠরতলে গ্রাস করে নেবে।

১ম। দাবানলও বলতে পার। ঐ শোন, এইবার তাদের অশ্বগজদের হ্রেষা ও বৃংহিত রব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ওঃ কি পরিতাপ! নির্বীর্য্য শিশুর মতন অসহায়ভাবে ওই বৈদেশিক বাহিনীর প্রবল তরঙ্গে মর্দ্দিত হয়ে মরতে হবে, এতটুকু বাধা দিবার সামর্থ্যও নাই! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এ কি ভীষণ লজ্জা! কি পরিতাপ!

বহুকণ্ঠে। কি ভীষণ লজ্জা! কি অপমান!

(অনেকেই কোষ হইতে অসি মুক্ত করিল)

২য়। রাজার আদেশ, শত্রুকে শস্ত্র দ্বারা নয়, প্রণতি দ্বারা অভিনন্দন করতে হবে, কিন্তু আমরা ক্ষত্রিয় সন্তান, নট ভাটের কার্য্য আমরা কেমন করে করবো? করতে জানলেও। শত্রু সম্ভাষণের একই সরল পন্থা আমাদের জানা আছে।

৪র্থ। এ কি বীরধর্ম্মের বিরোধী আদেশ!

৫ম। যদি এ আদেশ আমরা না মানি, তা'তেও আমাদের অপরাধ হয় না। প্রভুর আদেশ যেখানে ধর্ম্মের চানিকর সেখানে রাজাদেশ অগ্রাহ্য। ধর্ম্ম রাজারও উপর।

৩য়। ধর্ম্মবিরোধী রাজাদেশ অগ্রাহ্য করলে অন্যায় হয় না? তা'হলে—

(নেপথ্যে) না ধর্ম্মবিরোধী রাজাদেশ অগ্রাহ্য করলে অন্যায় বা অপরাধ হয় না। পুত্রগণ! তোমাদের সিদ্ধান্তই ঠিক! বীর শত্রুকে তার সনাতন পথেই অভ্যর্থনা করতে অধিকারী। সৈন্যিকবৃত্তি গ্রহণ করে ভাটবৃত্তি করতে তোমরা কখনই বাধ্য নহ।

(বর্ম্ম চর্ম্মাবৃতা বীরেন্দ্রানী বেশে ত্রিপুরেশ্বরীর প্রবেশ, তরুণ তরুণী তদ্রূপ যোদ্ধৃবেশে তাঁহার পশ্চাতে প্রবিষ্ট হইলেন।)

রাণী। —ত্রিপুরাধিষ্ঠিত ত্রিপুর-বিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেবের ভক্ত ত্রিপুরবীরবৃন্দ! তোমরা কি বৈদেশিকের সগর্ব্ব পদলাঞ্ছিতা ধরণীর ধূলির উপর শির লোটাইয়া তাদের স্পর্দ্ধিত মস্তককে আরও উচ্চতর দেখতে চাও? অথবা দেবী ত্রিপুরার নিকট উৎসর্গিত, চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট নিবেদিত ও তাঁদের প্রসন্নতার চিহ্ন পরিচায়ক পবিত্র যজ্ঞমাংসে উদর পূর্ণ করে, তাঁর প্রত্যাদেশ মত শত্রুকে যথার্থ বীর ধর্ম্মানুমোদিত ভাবে তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র দ্বারাই সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করবে?

বীরগণ। (সমকণ্ঠে আষাঢ় মেঘের মতই গর্জ্জিয়া উঠিয়া)—অস্ত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করতে চাই।

রাণী। এস তবে দেবতার প্রসাদ গ্রহণে বলবীর্য্য ও সাহস সঞ্চয়িত করে নিয়ে এই রাত্রি নিশীথেই আমাদের যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। নির্ভীক প্রথম আক্রমণকারীই বিজয়লাভ করে থাকে ইহা নিশ্চিত জেনে রাখ।

১ম ও ৫ম সৈন্যিক। মহারাজ আমাদের সেনাপতিত্ব নেবেন, কই তাঁকে ত দেখ্‌চি না মা?

রাণী। তিনি অসুস্থ, আমিই তোমাদের এ যুদ্ধের সেনাপতি।

৭ম। মহারাজ অসুস্থ—

রাণী। সৈন্তিক! এখন কুলগৌরব রক্ষার সময়, স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষায় মনোযোগী হও, রোগী পরিচর্যার প্রশস্ত কাল পড়ে আছে।

সকলে। জয় ত্রিপুরাধিষ্ঠাত্রীর জয়! জয় মহারাণী চম্পামহাদেবীর জয়!

গীত

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে তোরা জীবন আহবে চল্‌,
বাজবে সেথা রণভেরি আসবে প্রাণে বল।
জীবন আহবে চল্‌
বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে, মাতৃক জীবন দেশের কাজে,
জীবন গেলে জীবন পাবে, হবে এ জীবন সফল
চল্‌ চল্‌ চল্‌

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

তোরণ বহির্ভাগ

ত্রিপুরেশ্বরী, কুলফা, বিজয়া, ত্রিপুর সৈন্তিকগণ ও বহুতর নাগরিক, যুবা, বৃদ্ধ বালক ও নারীগণ সশস্ত্র প্রবেশ করিল।

সমবেত কণ্ঠে—জয় চম্পামহারাণীর জয়! জয় মা ত্রিপুরেশ্বরীর!

গীত

হও গো ধন্ত দেশের জন্ত জীবন করিয়া পণ,
জননীর তরে সঁপি অকাতরে জীবন যৌবন ধন,
তাহে মৃত্যু বরিতে হয়, হোক না, কিসের ভয়,
অমর কেহ তো নয়, ভঙ্গুর এ জীবন,
জীবন কর রে পণ
যদি স্বদেশের হিতে প্রাণ পার দিতে জন্ম সফল হবে,
যাবৎ এ ক্ষিতি রহিবে কীর্ত্তি অক্ষয় যশরবে,
দিয়ে নশ্বর প্রাণ, লও অবিনশ্বর মান,
যেজন কীর্ত্তিমান, চিরজীবী সেই ভবে,
শুধু বাঁচিয়া কি ফল তবে?
যদি প্রাণ পেতে চাও মান পেতে চাও
অর্পহ প্রাণমন,
দেশের জন্ত দশের জন্ত জীবন করিয়া পণ।

পঞ্চম দৃশ্য

রুদ্ধকক্ষে মহারাজা সিংহতুঙ্গ আসীন।

রাজা। কই কোথাও কোন শব্দটী পর্য্যন্ত নাই; পুরী একেবারে জনহীন শ্মশানের মতই স্তব্ধ নিঃসাড়। মহারাণী ত্রিপুরাবাসী নরনারী সকলকেই দেখ্‌ছি এই মহাহবে আহুতি দান করতে নিয়ে গেছেন। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কা'কেও দেখ্‌ছি বাদ দেন্‌নি। উঃ কি দুর্দ্দমনীয় তেজ ও অধর্ম্মিকা ঐ নারীর। সিংহিনী বা সিংহবাহিনী কি যে ওকে মনে করবো ভেবে পাইনে। নারী হয়ে এতবড় রক্ত পিপাসিনী আমি আর কখনও কা'কেও দেখিনি এবং শুনিও নি! হায় আমার ত্রিপুরা! অসহায় ক্ষুদ্র ত্রিপুরা! শাস্ত্রনিষিদ্ধ স্ত্রী-নায়কের হাতে পড়ে তুমি অনর্থক আজ ধ্বংস হ'তে বসেছ।

ঐ উষাদেবী তাঁর রক্তপদ্মপ্রভ চরণ ফেলে ধীর মন্থর গমনে পূর্ব্বাকাশ উপকূলে দেখা দিলেন! ঐ লোহিত রক্তরাগ! উঃ এযে আমার সহ্য হচ্ছে না, একি আমার ত্রিপুর প্রজার রক্তস্রোতের প্রতিচ্ছবি! হয়ত এতক্ষণে প্রবল শত্রুসেনার হস্তে কৃষকের হস্তে শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় আমার ত্রিপুরবাসী নর-নারী সকল মর্দ্দিত ধর্ষিত বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে। ঐ উজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটা! ওকি শত্রু সৈন্যের বর্ষাফলকে প্রতিবিম্বিত হয়ে অমন তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে!

সূর্য্য অবসানের পথে ঢলে পড়েছেন! ত্রিপুরার সুখসূর্য্যও এতক্ষণে অস্তাচলগামী হতে বাকি নেই! উঃ কি ভীষণ অন্ধকার! এম্‌নি নিবিড় ঘন অন্ধকারেই ত্রিপুরার চির ভবিষ্যৎ আজ ডুবে গেল!

(নেপথ্যে ঘোর কোলাহল) ঐ শোন! ঐ গৌড়সেনার জয় কোলাহল! আর কি! এইবার শত্রুসৈন্য শূন্য পুরী অধিকার করতে আসছে! কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! আমি কি এমনি জালবদ্ধ মূষিকের মতই শত্রু হস্তে নিহত হবো! ওরে অকর্ম্মণ্য ভীরু! ক্ষত্রিয়াধম! তোর ভীরুতার এই বুঝি সমুচিত ফল। নারী হয়ে সে অক্ষয় কীর্ত্তির অম্লান যশের অধিকার নিয়ে রণভূমে প্রার্থিতভাবে প্রাণ দিলে, আর তুই— (কোলাহল নিকটতর হইল) নাঃ এক-খানা তরবারি পর্য্যন্ত নেই, ওঃ ওঃ পাষাণি! পাষাণি! একি তোর নির্ম্মম প্রতিশোধ! (দ্বারমুক্ত হইল) নারীর অবিমৃষ্যকারিতার এই ফল! একি! একি!

[আলুলায়িত কুন্তলা দীনবেশিনী চম্পাদেবী আসিয়া নতজানু হইলেন]

রাণী। রাজন্! গৌড়সৈন্য ত্রিপুর সৈন্যের হস্তে ধ্বংস হইয়াছে। ত্রিপুরা আজ গৌড়-জয়ী। এক্ষণে এই রাজদ্রোহিনীর যথোচিত শাস্তিপ্রদান পূর্ব্বক রাজধর্ম্ম রক্ষা করুন।

রাজা। (উঠিয়া) দেবি!

(নেপথ্যে) জয় মা ত্রিপুরেশ্বরীর জয়! জয় চম্পামহারাণীর জয়। পটক্ষেপ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

বর্ষামঙ্গল ও শেষবর্ষণ।

জ্ঞানীরা মায়াবিনী প্রকৃতির মায়াজাল ছিন্ন করিতে প্রয়াসী, সৃষ্টির কুহক এড়াইয়া সৃষ্টির আদি মহাশূন্যের অতলে মগ্ন হওয়ার আনন্দলিপ্সু। কবিরা কিন্তু প্রকৃতির কুহকেই জাল ফেলিয়া অনাদি অতলস্পর্শের রত্নভাণ্ডার তুলিয়া আনেন, মায়াবিনীর মায়াই কবির উপজীব্য। কবিরা প্রকৃতির মোহিনীতে ও সৃষ্টির সৌন্দর্য্যেই শিবের চরণপদ্ম অঙ্কিত দেখেন এবং নিজ মানসে তাহার যে প্রতিলিপি পড়ে, দীন সংসারীকে তাহারই স্পর্শ দান করিয়া কৃতার্থ করেন। জ্ঞানীর অনুচারিতা কঠোর ও নীরস, কবির অনুকারিতা সরস ও সুখদ, তাই একদিকে রাজপুরুষগণের অত্যাচারের পীড়ন অপর দিকে নেতাগণের ত্যাগের প্ররোচনার দিন কবি যখন প্রথম "বর্ষামঙ্গল" এর শঙ্খ বাজাইলেন, দেশের লোক অপমান ও অত্যাচারের বেদনা ভুলিল, ত্যাগের মহিমা ছাড়িল, শুধু আনন্দের ডাকেই সাড়া দিল—সে ক্ষণিকের সৌন্দর্য্যবোধের আনন্দ, মুহূর্ত্তের অনন্তে নিমজ্জনের আনন্দ। শাশ্বতের যাত্রীও হঠাৎ গাহিয়া উঠিল।

"ক্ষণিকের গান, গায়ে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের পুলকে।"

কর্ম্মপথের পথিকও দুদণ্ডের জন্য কর্ম্মের বোঝা মাথা হইতে নামাইয়া নিজের হৃদয়ের অনুরণন কবির কণ্ঠে শুনিতে বসিল।

এমন ঘন ঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়।
সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব!
• •
আঁধারে মিশে গেছে আজ সব।
• •
তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
• •
নামাই ক্ষণ তরে মনোভার।
তাহাতে আসে যাবে কি বা কার?
আছে ত তার পরে বার মাস
আসিবে কত লোক, কত না দুখ শোক
জগৎ চলে যাবে আপন পাশ।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে, রহিয়া গেল মনে,
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায় !"

প্রথম 'বর্ষা-মঙ্গল' যখন অভিনীত বা গীত হয়, তখন দেশে ধর-পাকড়, শত শত অসহযোগী কর্ম্মবীর তখন কারাবরণ করিয়াছেন, দেশের মনের উপর একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। কবির "বর্ষামঙ্গল" অকস্মাৎ সেই সময় সব কালিমা ধুইয়া মুছিয়া দেশকে সঙ্গীতরস-মাধুর্য্যে প্লাবিত করিয়া দিল। চির-মানব তাহাদের চিরদিনের রসবোধে আপ্লুত হইল, তার পাশে দেশাত্মবোধের উত্তেজনাই যেন ক্ষণিকের জিনিষের মত গিন্টি করা ঠুন্‌কো দেখাইতে লাগিল। রাজ্য ভাঙ্গে গড়ে, জাতি উঠে পড়ে, রাজা প্রজা লড়ে মরে, কিন্তু বর্ষা চির-মানবের বুকে চিরভৈরব হরষে দেখা দেয়, চিরবিরহের গান গায়, চিরমিলনের আশা জাগায়।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;
নিখিল চিত্ত-হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা !

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতময় তরু লতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে,
জাগিয়া তুলিছে মন্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত-গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।

জগৎ-রচয়িতা প্রথম কবির সৃষ্টি বর্ষা শরদাদি ঋতু ঋতুতে বিকশিত মাধুরিমার বিন্যাসে কাব্যে নাট্যে চিত্রে নূতন মানসী সৃষ্টি মানব-কবির। মানবের মনোময়ী সৃষ্টি কখনও স্থির নহে, তাহার মনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল। কবির মনে একই প্রকৃতি আন দিনে আন ছায়া ফেলে, ছায়াবাজীর সৃষ্টিও তাই নানারূপ ধরে। 'বর্ষা মঙ্গল' বারে বারে কবির মন হইতে নানারূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়াছে। ১৩২৯ এর সৃজন প্রথম 'বর্ষামঙ্গল' চক্ষে দেখি নাই, তার ধ্বনি কিন্তু পরে কাণে আসিয়াছে। প্রথম 'বর্ষামঙ্গল' এর দুই একটি গানের শব্দযোজনাকুশলতা ও সুরবৈচিত্র্য শ্রোতার কাণে মধু ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহাদের নূতনত্ব ও মাধুর্য্য আজও ক্ষীণ হয় নাই। যেমন—বাদল মেঘে মাদল বাজে—এই গানটি। প্রথম 'বর্ষামঙ্গল' এর পুস্তিকা কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। তার গান কিন্তু গায়ক গায়িকার কণ্ঠে কণ্ঠে রহিয়াছে। ১৩২৯ এর দ্বিতীয় 'বর্ষামঙ্গল' এর মুদ্রিত কপি হস্তগত হইয়াছে। প্রথমবারকার চিত্তহারী গানগুলির পাত্তাই ইহাতে নাই। শ্রুতিপ্রসিদ্ধ না হইলে দ্বিতীয় 'বর্ষামঙ্গল' এর ঠাটটি দেখিয়া শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া কেহই জানিতে পারিত না প্রথমবারের কত রত্ন ইহাতে স্থান পায় নাই। অথচ দুইটিই কবির বিন্যাস, তাঁর চিত্তের বহিঃরূপ।

প্রথমবারের বেকয়টী গান অতীব লোকপ্রিয় হইয়াছিল সেই কয়টী মাত্র গায়কদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দেরে।
ঘন শ্রাবণ ধারা
যেমন বাঁধন হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে' ফেরে।
হারে রে রে রে রে—
আমায় রাখবে ধরে' কেরে!
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে।

২

বাদল মেঘে মাদল বাজে
গুরু গুরু গগন মাঝে।
তারি গভীর রোলে
আমার হৃদয় দোলে
আপন সুরে আপনি ভোলে।
কোথায় ছিল গহন প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে।
আজি সজল বায়ে
শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে—গানে গানে।

৩

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠেছে আবার বাজি,
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।
রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
"এসেছে এসেছে" এই কথা বলে প্রাণ,
"এসেছে এসেছে" উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

৪

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে
আমার চোখের পরে নাচে।
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখ
তালবনের ঐ গাছে গাছে।

বাদল হাওয়া পাগল হ'ল
সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায়
মাঠ হতে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ
আমার গানের পাখার পাছে।

৫

ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি
অশ্রুভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়
বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।
ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে
মনে ভাবি তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারি গানে
সেই আঁখি তার মনে আনে,
আকাশ ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।

৬

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি'
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
আজি সঘন শর্ব্বরী মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝরি' ঝরিছে জলধারা,
তমাল বন মর্ম্মরি' পবন চলে হাঁকি।
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
যে কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি
জানিনা কোন্ মন্ত্রে তাহারে দিব বাণী।
রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাব বাটে,
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি কাটে!
কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি,
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী

১৩২৯ এর দ্বিতীয় 'বর্ষামঙ্গল'এর গানগুলির সমাবেশ নিম্নে দিতেছি—

দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে।
রজনী নিদ্রাহীন,
দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আরাম নাহি যে জানে :
শুষ্ক কানন শাখে
ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে।
ভয় নাহি, ভয় নাহি।
গগনে রয়েছি চাহি।
জানি ঘনায় বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে।

২

এস এসহে তৃষ্ণার জল,
ভেদ কর কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কলকল ছলছল!
এস এস উৎস স্রোতে গূঢ় অন্ধকার হ'তে
এস হে নির্ম্মল,
কলকল ছলছল।
রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়।
তুমি যে খেলার সাথী
সে তোমারে চায়।
তাহারি সোণার তান
তোমাতে জাগায় গান,
এস হে উজ্জ্বল,
কলকল ছলছল।

হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয়, আয়, আয়"। সে তোমায় খুঁজে যায়।

তাহার মৃদঙ্গরবে
করতালি দিতে হবে,
এস হে চঞ্চল,
কলকল ছলছল।
মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণ শৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা
এস বন্ধহীন ধারা,
এসহে প্রবল,
কলকল ছলছল।

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে
আঁচল খানি দোলে
ওরি গানের তালে তালে
আমে জামে শিরীষ তালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায়
আকুল কল্লোলে।
আমার দুই [illegible]
যায় হারিয়ে সজল ধারায়
ঐ ছায়াঘন দূরে।
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন্ সাথী মোর যায় যে ডেকে
একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে।

৪

হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর
বৈশাখী ঝড় আসে।
ঘেড়া-ডাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে।

তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে
আঁধিয়া ঢাকা জটিল কেশে,
বুঝি এল তোমার সাধন ধন
চরম সর্ব্বনাশে।
বাতাসে তোর সুর ছিল না
ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর
শুষ্ক কঠিন ধরা।
এবার জাগ্‌রে হতাশ আয়রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
বুঝি এল তোমার পথের সাথী
বিপুল অট্টহাসে।

৫

কখন বাদল ছোঁয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে।
এলায়ে ঘনঘোর
ধরণীতল হল [illegible]তল
চিকণ [illegible]র ভরে ;
[illegible]া গানের মত
[illegible]ণের বেগে।
[illegible]প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা।
[illegible]থে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি
ওদের খেলাঘরে।
ওদের দোল দেখে আজ প্রাণে আমার
দোলা জেগে ওঠে।

৬

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে।

আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে।
কেমন করে যায় যে ডেকে
বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে
ক্ষণে ক্ষণে।
বাঁধন হারা জলধারার
কলরোলে
আমার কোন্ পথের বাণী
যায় যে বলে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানসলোকে গানের শেষে,
চিরদিনের বিরহিণীর
কুঞ্জবনে!

আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
দিগ্বিদিক্ কালো জলের পরে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কাণাকানি ঐ আকাশের সনে।
ম্লান স্মৃতির বাণী যত
পল্লব মর্ম্মরের মত
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।

৮

এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি মনের বীণায় কি সুর বাঁধারে।

ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর করে তোলে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁদারে।
ছায়ায় তলে তলে জলের ধারা ঐ
কের দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।
মন যে আমার পথ হারানো সুরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদারে।

৯

পূব সাগরের পার হতে কোন্
এল পরবাসী।
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন
সাপ খেলাবার বাঁশী।
সহসা তাই কোথা হতে
কুলুকুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা
ছুটেছে উল্লাসি।
আজ দিগন্তে ঘন ঘন
গভীর গুরু গুরু
ডমরুরব হয়েছে ঐ সুরু
তাই শুনে আজ গগনতলে
পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরণ নাগনাগিনী
ছুটেছে উদাসী।

১০

আজি বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ আলো মেশে।
বেণুবনের মাথায় মাথায়
রং লেগেছে পাতায় পাতায়,

রঙের ধারায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে।
এই ঘাসের ঝিলিমিলি
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন
একতালে যায় মিলি।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে
রক্তে আমার পুলক লাগে,
বনের সাথে মন যে মাতে
ওঠে আকুল হেসে।

শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ্‌ভোলা।
ঐ যে পূরব গগন জুড়ে
উত্তরী তার যায়রে উড়ে
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা।
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে
আকাশে কি ধরার বাসা কোন্‌খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউতোলা॥

বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষণে।
যে মিলনের মালাগুলি
ধূলায় মিশে হল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে
আজি সজল সমীরণে।
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।

মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিল পথের দিকে
সেই চাহনি এল ভেসে
কালো মেঘের ছায়ার সনে।

১৩

বাদল-বাউল বাজায়রে একতারা
সারা বেলা ধরে ঝরঝরঝর ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা।
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা।

১৪

একি গভীর বাণী এল
ঘন মেঘের আড়াল ধরে'
সকল আকাশ আকুল করে।
সেই বাণীর পরশ লাগে,
নবীন প্রাণের বাণী জাগে,
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে
ধরার হৃদয় ওঠে ভরে'।
সে কে বাঁশী বাজিয়েছিল
কবে প্রথম সুরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিল
সুদূর আঁধার আদিকালে।
তার বাঁশীর ধ্বনিখানি
আজ আষাঢ় দিল আনি,
সেই অগোচরের তরে
আমার হৃদয় নিল হরে'।

১৫

আমার হৃদয় আজি যায় যে ভেসে
যায় পাওনি দেখা তার উদ্দেশে।
বাঁধন ভোলে হাওয়ার দোলে
যায় সে বাদল মেঘের কোলে রে,
কোন্ যে অসম্ভবের দেশে।
সেথায় বিজন সাগর কূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে।
রাজার পুরে তমাল গাছে
নূপুর শুনে ময়ূর নাচে রে,
সুদূর তেপান্তরের শেষে।

১৬

ভোর হল যেই শ্রাবণ-শর্ব্বরী
তোমার বেড়ায় উঠ্‌ল ফুটে
হেনার মঞ্জরী।
গন্ধ তারি রহি রহি
বাদল বাতাস আনে বহি,
আমার মনের কোণে কোণে
বেড়ায় সঞ্চরি'।
বেড়া দিলে কবে তুমি
তোমার ফুল-বাগানে,
আড়াল করে রেখেছিলে
আমার বনের পানে।
কখন্ গোপন অন্ধকারে
বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হয়ে
ডাকে মর্ম্মরি'।

১৭

বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে
বইছে ধীরে ধীরে।
ভরিয়া কেন বেড়ায় ও যে
বুকের শিরে শিরে।

অলখ্ তারে বাঁধা অচিন্ বীণা
ধরার বক্ষে রহে নিত্য লীনা, এই হাওয়া,
কত যুগের কত মনের কথা
বাজায় ফিরে ফিরে।
ঋতুর পরে ঋতু ফিরে আসে
বসুন্ধরার কূলে।
চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে
ফুলের পরে ফুলে।
গানের পরে গানে তারি সাথে
কত সুরের কত যে হার গাঁথে, এই হাওয়া,
ধরার কণ্ঠ বাণীর বরণ মালায়
সাজায় ঘিরে ঘিরে।

১৮

বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর।
ছাড়্‌ল খেয়া ওপার হতে
ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুলচে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বল্গুর।
কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি,
চৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস
বৃষ্টির বিন্দুর॥

উপরোক্ত 'বর্ষামঙ্গল'এর সহিত যাঁহারা পরিচয়লাভ করিয়াছিলেন ১৩৩২এর রূপান্তরিত "বর্ষামঙ্গল" তাঁহাদের চেনা কঠিন হইবে। এবার সেই আপাদমস্তক পরিবর্তিত রূপ দেখুন :—

১

আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ভেসে যায়
আয় আয় আয়।
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই
যাই, যাই, যাই।

উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়।
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ডেকে যায়—
আয় আয় আয়,
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায়॥

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে
গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নব ঘন বরিষণে
গোপনে গোপনে এলি কেয়া।
পূরবে নীরব ইসারাতে
একদা নিদ্রাহীন রাতে
হাওয়াতে কি পথে দিলি খেয়া।
(আষাঢ়ের খেয়ালের কোন্ খেয়া)
যে মধু হৃদয়ে ছিল মাখা
কাঁটাতে কি ভয়ে দিলি ঢাকা।
বুঝি এলি যার অভিসারে
মনে মনে দেখা হল তারে
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া।
(আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া)

শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে
কি বাণী আসে ওই র'য়ে র'য়ে—
গোপন কেতকীর পরিমলে,
সিক্ত বকুলের বনতলে,
দূরের আঁখি জল ব'য়ে ব'য়ে।
কি বাণী আসে ওই র'য়ে র'য়ে।

কবির হিয়াতলে ঘুরে ঘুরে
আঁচল ভ'রে লয় সুরে সুরে।
বিজনে বিরহীর কানে কানে
সজল মল্লার গানে গানে
কাহার নাম খানি ক'য়ে ক'য়ে—
কি বাণী আসে ওই র'য়ে র'য়ে!

৪

আজ কিছুতে যায়না মনের ভার।
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার।
মনে ছিল আসবে বুঝি,
আমায় সেকি পায়নি খুঁজি?
না-বলা তার কথাখানি
জাগায় হাহাকার।
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে।
বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে
জানায় আমায় ফিরবেনা সে,
বুকভরে সে নিয়ে গেল
বিফল অভিসার।

৫

এই শ্রাবণ-বেলা বাদলঝরা
যূথীবনের গন্ধে ভরা।
কোন্ ভোলা-দিনের বিরহিণী
যেন তারে চিনি চিনি,
ঘন বনের কোণে কোণে
ফেরে ছায়ার ঘোমটা পরা॥
কেন বিজন বাটের পানে
তাকিয়ে আছি কে তা জানে।
যেন হঠাৎ কখন অজানা সে
আস্‌বে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে
গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা।

আজি ঐ আকাশ পরে সুধার ভরে
আষাঢ় মেঘের ফাঁক।
আমার হৃদয় মাঝে মধুর বাজে
কি উৎসবের শাঁখ॥
একি হাসির বাঁশির তান?
একি চোখের জলের গান?
পাইনে দিশে কে জানি সে
দিল আমায় ডাক॥
আমার নিরুদ্দেশের পানে
কেমন করে টানে
এমন করুণ গানে।
ঐ পথের পরে আলো
আমার লাগল চোখে ভালো,
গগন পারে দেখি কারে
সুদূর নির্ব্বাক্॥

৭

পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী।
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না
পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী॥

৮

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে সখি কৈসে যাওব
অবলা কামিনীরে।

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ,
দমকত বিদ্যুত পথ তরু লুণ্ঠিত
থরহর কম্পিত দেহ।
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌
বরখত নীরদ পুঞ্জ।
শাল পিয়ালে তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
কহসে সজনি এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান,
দারুণ বাঁশী কাহে বাজায়ত
সকরুণ রাধা নাম।
মোতিম হারে বেশ বনাদে
সখি লাগাদে ভালে।
উরহি বিলুণ্ঠিত লোলচিকুর মম
বাঁধহ চম্পক মালে।
গহন রয়ননমে ন যাও বালা
নওল কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন বহুডর পাবত
কহে ভানু তব দাস॥

৯

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসব সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচ উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে।

গহনরাতে শ্রাবণ ধারা পড়িছে ঝরে
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ?
এখনো দুটী আঁখির কোণে যায় যে দেখা,
জলের রেখা ।
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে ।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ।
না হয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়ন দ্বারে ।
না হয় রেখো মালতী-কলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে
না হয় রাখী পরায়ে যেয়ো কুলের ডোরে ।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ॥

১১

যেতে দাও গেল যারা,
তুমি যেয়োনা যেয়োনা
আমার বাদলের গান
হয়নি সারা ।
কুটীরে কুটীরে বন্ধ দ্বার,
নিভৃত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল,
অধীর সমীর তন্দ্রাহারা ।
দীপ নিবেছে নিবুক নাকো ।
আঁধারে তব, পরশ রাখ ।
বাজুক কাঁকন তোমার হাতে,
আমার গানের তালের সাথে,
যেমন নদীর ছল ছল জলে
ঝরে ঝর ঝর শ্রাবণ ধারা ।

১২

সখি, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না
কিসেরি পিয়াসে কোথা যে যাবে সে
পথ জানে না ।

ঝর ঝর নীরে নিবিড় তিমিরে
সজল সমীরে গো।
যেন কার বাণী কভু কানে আনে,
কভু আনে না।

১৩

বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা।
তোমার যন্ত্র বলে
পাষাণ গলে ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে
ফুলের ডালা।
মর মর পাতায় পাতায়
ঝর ঝর বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের বাদ
বাজে তোমার কি উৎসবে?
সবুজ সুধার ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী
বন্যা মরণ ঢালা।

আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ১৩০২এর "বর্ষামঙ্গল"এর সহিত। পূজনীয় কবির যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে 'বিচিত্রা' গৃহে একদিন সন্ধ্যায় গুটি দশ বারো মেয়ে আর গুটি সাত আট ছেলেতে মিলিয়া 'বর্ষামঙ্গল' গাহিল। কোন আড়ম্বর নাই; কিন্তু সাজসজ্জা নাই তাহা নহে, তবে এমন মোলায়েম সাজ যে সুন্দরের একটা আভাসে মনকে শীতল করে, উৎক্ষিপ্ত করে না। আমাদের ঘরের মেয়েরাই গান গাহিতেছে, এই আমাদের অনু তনু মিনু—তারাই বটে, অথচ ঠিক তারা নয়। ওরই মধ্যে একটু স্বাভাবিক রকমে অস্বাভাবিকতায়, সাধারণের মধ্যে অসাধারণ্যের হিল্লোলে চোখের পল্লব আটকাইয়া যাইতেছে। সকলেই লাল সাড়ী পরা, সকলের গলায় একগাছি ফুলের মালা আর প্রায় সকলেরই কপাল চন্দনচর্চ্চিত। এই মাত্র সাজ, আর কিছু নয়। সেই কত যুগের পর হইতে যেন এই গোরোচনাবরণী মেয়েগুলি একালের মিলন করিল। ছেলেদের সাজও

অতি সহজ, প্রাত্যহিক শুভ্র ধুতি উত্তরীয়, কারও কারও গলায় মালা এবং কপালে চন্দন—সকলের নহে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কবি স্বয়ং উপবিষ্ট, তাঁর স্বাভাবিক পোষাকে। কবি অসুস্থ, ডাক্তারের আদেশে তাঁর ইভ্যালী যাওয়া স্থগিত হইয়াছে। কাজ কর্ম দেখা পড়া বারণ, কবি শুধু গান গাওয়ান আর গান শুনেন—গানের জগৎ রচনা করিয়া তারই মধ্যে নিজেকে সঞ্জীবিত রাখেন এবং শ্রোতা ও দর্শককে একটা অনির্বচনীয় আনন্দের অভিঘাত দেন। গানগুলির মধ্যে একবার কবি নিজে একটি কবিতা পাঠ করিলেন। শ্রোতা ও গায়ক গায়িকাদের মধ্যে ব্যবধান রাখা হইয়াছে কেয়াপাতা ও রজনীগন্ধার ডাঁটাসহ ফুলের একসার মালা খাড়া করিয়া। এই অনুপম 'প্রোসিনিয়ম' বা রঙ্গমঞ্চের প্রাচীর গীতাবসানে শ্রোত্রীদের করতলস্থ হইয়া ঘরে ঘরে ফুলদানিতে কিছুদিন ধরিয়া সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পরে 'শেষবর্ষণ' হইল। ইহাতে শেষ 'বর্ষামঙ্গল'এর রূপের আবার বদল হইল, উপরন্তু নামেরও বদল হইল। নামের বদল কবির মনের ইতিহাস বিবৃত করে। কবির মন এখন ভাবে—'চলিলাম, জীবনের খেয়া মরণের পারে আসিয়া লাগিল।' শেষ-বর্ষণও পাঁচ বারে তিন রকম হইল, প্রথমবার গৃহে, দ্বিতীয় (তৃতীয় চতুর্থ যার অন্তর্গত) এবং শেষবার অঙ্গনে।

'বর্ষামঙ্গল'-এ শুধু একের পর এক গানের ধারা চলিয়াছিল। 'শেষবর্ষণ'-এ বর্ষা, আষাঢ়ের পূর্ণিমা, শারদলক্ষ্মী ও ক্ষণেকের অতিথি মূর্তি ধারণ করিয়া একে একে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন। তাঁদের ঘিরিয়া গায়ক গায়িকারা গান করিতে লাগিল।

প্রথম 'শেষবর্ষণ' দেখিয়া মনে যে ছাপ পড়িয়াছিল—একজন রসজ্ঞা দর্শকিত্রীকে তার একটি চিত্র অঙ্কন করিতে অনুরোধ করি। এই সুযোগে সব প্রথম 'বর্ষামঙ্গল' এর যে ছাপ তাঁহারই মনে পড়িয়াছিল তাহারও একখানি চিত্র সংগ্রহ করিয়া প্রথমে সেইটি ও পরে 'বর্ষামঙ্গল এর ছাপ দিতেছি :—

প্রথম বর্ষামঙ্গল।

প্রথম বর্ষামঙ্গলের সন তারিখ মনে নেই. কিন্তু ইংরেজী কোন এক সপ্তম্বর মাসের ১লা ২রা দুইদিন এই মঙ্গল অনুষ্ঠান বিচিত্রা সৌধের অঙ্গনে সামিয়ানার তলায় সুসম্পন্ন হয়েছিল, আর যতদূর মনে আছে টিকিট বিক্রী হয়নি ; তবে আমার ভুল হ'তে পারে।

কিন্তু এ বিষয় কোন ভুল নেই যে উৎসুক দর্শকবৃন্দের সমাগমে স্থানটি পূর্ণ ছিল, এবং রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে বেলফুলের মালা লম্বমান ছিল, ও সামনে আল্পনা দেওয়া ঘটে কেয়া-ফুল ছিল। মোটের উপর বৃক্ষপটের সাজসজ্জায় চোখে আঙুল দিয়ে বর্ষা ঋতুর লক্ষণ দেখাবার কোন প্রয়াস ছিল না, আভাসে ইঙ্গিতে যতটা হয়। প্রথমে রঙ্গমঞ্চে শুধু পুরুষ গায়কগণ বসেছিলেন, তার মধ্যে দিনেন্দ্রনাথপ্রমুখ বোলপুরের দলই প্রধান। কারো

কারো হাতে ২।১টি এস্রাজ ছিল মাত্র, তা' ভিন্ন সঙ্গতের বেশি আয়োজন দেখলুম না। সব প্রস্তুত হ'লে কবিবর রবীন্দ্রনাথ গায়িকা সঙ্ঘ সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে আসরে প্রবেশ করলেন। মনে আছে তাঁদের পরণে লালপেড়ে দেশী সাড়ি ও মাথায় কাপড়। অলঙ্কারের মধ্যে কেবল বেলফুলের মালা নিপুণ শিল্পীর হাতে বিচিত্র ভঙ্গিতে পরানো।

সকলে আসন গ্রহণ করলে পর গান আরম্ভ হল। প্রত্যেক গানটী এখন অবশ্য মনে নেই। কবি বলেছেন মহৎ কবিদের পদধ্বনি কালের অলি গলি বেয়ে আমাদের কাণে এসে পৌঁছোয়। তেমনি বহুর মধ্যে অল্প যে কয়টি স্মরণে জেগে থাকে, বিস্মৃতি-পয়োধি জলের মধ্যে স্মৃতিবরাহ যা-কিছু উদ্ধার করতে পারে, ভাসমান বিচ্ছিন্ন শৈবালের মধ্যে থেকে যে শতদল শৈবলিনী ফুটে উঠে,—সেইগুলিকেই যোগ্যতমের উদ্বর্তন বলে' ধরে' নিতে হবে। শ্রীমতী চিত্রলেখার একল গান "বাদল মেঘে মাদল বাজে" যেন এখনও কাণে বাজছে। মনে আছে তাকে সেইদিনই পরে আশীর্ব্বাদ করি যে তোমার কণ্ঠ যেন অক্ষয় হয়ে এমনি করেই আমাদের কাণে মধু বর্ষণ করতে থাকে।' "আবার এসেছে আষাঢ়" গানটিও বড় মনোরম। সত্যি কথা বলতে গেলে সেবারের বর্ষামঙ্গলের গানগুলি গান যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল, পরের বারের কোন গান তেমন দাঁড়াবে কি না সন্দেহ অবশ্য কালের আদালতে কোনগুলি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় তা' পরে জানা যাবে, এখন নয়। তবে এটুকু বলতে পারি যে তখন বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়ে পর্য্যন্ত "বাদল মেঘে"র "গুরু গুরু গুরু গুরু" আধো আধো ভাষায় গাইত। "কে তুমি মমঅঙ্গনে" গানটিতেও কেদারা রাগিণীর চেহারা অতি সুন্দরভাবে ফুটেছে, আর কথার সুরে মিলে একটি অভিনব অনুপম মাধুরী সৃজন করেছে। একজন বলেছিলেন যে প্রথমে "কে তুমি" কথাগুলির পুনঃ পুনরাবৃত্তি যেন ঠিক্ ধমকের মত শোনায়! শুধু ছেলেরা "হা রে রে রে" বলে' আর একটা গান গেয়েছিল, সেটাও যেন বাড়ীতে ডাকাত পড়ার মত! "শ্রাবন মেঘের পেয়াতরীর মাঝি"র সুমিষ্ট করুণ রসও সহজে ভোলবার নয়। কিন্তু আর বেশি বিস্তার করতে গেলে খুব সম্ভব দ্বিতীয় বর্ষামঙ্গলের এলাকায় অনধিকার প্রবেশের দায়ে দূষিত হয়ে পড়ব, তাই এখানে কলম সম্বরণ করাই ভাল। শেষে একটা কি বাউলের সুর ছিল তার কথাগুলি ভুলে যাচ্ছি, আর কাগজগুলিও আমার কাছে নেই, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে সেটা এমন জমে উঠেছিল যে নাটোরাধিপতি তাঁর পাখোয়াজের সঙ্গত থেকে তালে তালে হাত না তুলে থাকতে পারেন নি।

প্রথম শেষ-বর্ষণ।

মানুষের জীবনে ও মনে কোন ছাপ দীর্ঘকালস্থায়ী হ'বার সুযোগ পায় না। আজ আছে, কাল নেই,—এই রকম তার অবস্থা। নতুন নতুন দৃশ্য, ঘটনা ও নতুন ভাবের আন্দোলনের দ্রুত পরম্পরা এসে তার প্রথম জ্যোতি অচিরে ম্লান ক'রে দেয়, যা' শ্রুতি ছিল ক্রমশঃ স্মৃতি

এবং অবশেষে বিস্মৃতিতে পরিণত হ'তে তার বেশি বিলম্ব লাগে না। ভূতত্ত্বের অনুকরণে মনস্তত্ত্বেও স্তর পড়ে, কেবল অতি ক্ষিপ্রগতিতে, এই তফাৎ।

এমন সময় যখন কোন ভূতপূর্ব্ব ঘটনার যথাযথ রিপোর্ট লেখবার জন্য সম্পাদকের কড়া তাগিদ আসে, তখন প্রত্নতাত্ত্বিক ও স্মৃতিচূড়ামণি ভিন্ন সকল সাধারণ মানুষই কিছু ফাঁপরে পড়ে, এবং মনচৈতন্যে হাবু ডুবু খেতে থাকে।

শেষবর্ষণের দৃশ্যের মধ্যে যেটুকু এখনো চোখে লেগে আছে প্রধানা অধিদেবীদের বেশে নূতনত্ব। বর্ষার অধিষ্ঠাত্রী মামুলী ঘোর ছাই রং বা নীল রঙে রঞ্জিত ছিলেন না; কোথাও হয়ত একটু ঘোর রঙের চিহ্ন ছিল, কিন্তু বাকী সবটা মুকুটে ও মালায় ঝলমল করছিল, কতকটা অজন্তার ছবির মত। শরতের সোণালী বেশ উপযোগী ও মানানসই হ'য়েছিল, তবে চুল বাঁধা থাকায় যেন একটু বেশি পরিপাটি দেখাচ্ছিল, বোধ হয় খুলে দিলে আরও ভাল হ'ত। আষাঢ়ে পূর্ণিমার একদিকে কালো ও একদিকে আলো ঠিকই হ'য়েছিল, অর্থাৎ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল,—আজকালকার দিনে প্রাঞ্জলতা দুর্লভ ব'লেই আরামদায়ক। ঋতিকের অভিপ্রি কেন এল কেন গেল ভাল বোঝা গেল না, কারণ একই সঙ্গে গানের কথা সুর ভাব ও দৃশ্যপটের প্রতি সমান মনোযোগ রাখা শক্ত। দেবীদের অপলক অচঞ্চল স্থির-ভাবে জীবন্ত ছবির মত বসে' থাকা প্রশংসনীয়। গানের মধ্যে কাণে লেগে আছে—'এস নীপ-বনে', 'শ্যামল ছায়া' এবং পূর্ব্ব পরিচিত সুর ব'লে 'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা'। হিন্দী সুর ভাঙ্গা দু'একটি গানও বেশ মিষ্টি লেগেছিল,—অবশ্য একক গায়িকাদের গলাও ভাল ছিল। পর পর এতগুলি নতুন গান একসঙ্গে মন ও কাণ ঠিক গ্রহণ করতে পারে না, আশা রাখে সেগুলির রসাস্বাদন করবার অবসরের আশা রাখে।"

যে ক'টি গান প্রথম 'শেষবর্ষণে' কেবল ছিল, যাহা পরবর্ত্তী শেষবর্ষণ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১

ওগো আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার
আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে॥
আপনারি মনে জানিনা একেলা
হৃদয় আঙ্গিনায় করিছ কি খেলা॥
তুমি আপনার খুঁজিয়া ফের,
কি তুমি আপনায় হারালে॥

একি মনে রাখা, একি ভুলে যাওয়া;
একি স্রোতে ভাসা, একি কূলে যাওয়া।

কভুবা নয়নে কভুবা পরাণে
কর লুকোচুরি কেন যে কে জানে,
কভুবা ছায়ায় কভুবা আলোয়
কোন্ দোলায় যে নাড়ালে ॥

২

কোথা যে উধাও হোল,
মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা ভাদরে।
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে
ঝর ঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে
অনন্ত অশান্ত বাতাসে ॥

৩

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে
তাই তাই ফাগুন শেষে দিলেম বিদায়।
তুমি গেলে ভাসি নয়ন নীরে
এখন শ্রাবণ দিনে মরি খিধায় ॥
এখন বাদল সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
এক ঝর ঝর বারি ধারে
ভাবি কি ডাকে ফিরাব তোমায় ॥
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে।
ভরা দিনের ভবনাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে
তোমাহারা নিজন রাতে
হারাই হারাই বাজে হিয়ায়।

৪

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার
কত রঙে রঙ করা ॥
মোর সাথে ছিল দুঃখের ফলের ভার
অশ্রুর রসে-ভরা।

সংসা আসিল কহিল সে সুন্দরী
"এস না বদল করি",
মুখ পানে তার চাহিলাম ঘরি ঘরি
নিদয়া সে মনোহরা ॥
সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা,
চাহিল পকোতুকে।
আমি লয়ে তার নব ফাগুনের মালা
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
"মোর হল জয়" যেতে যেতে কয় হেসে,
দূরে চলে গেল ত্বরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা ॥

৫

একল বসে বাদল শেষে শুনি কত কী।
'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে
ডেকে গেল আকাশপারে,
তাইতো সে যে উদাস হল
নইলে যেত কি ॥
ছিল সে যে একটী ধারে
বনের কিনারায়,
উঠ্‌তো কেঁপে তড়িৎ আলোর
চকিত ইসারায়।
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যা-তারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি ?

৬

এস শারদের কিরণ প্রতিমা
এস হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে ॥

বিরহ ভবনে আকুলে সে যে দোলে
আকুল সমীরে ॥

ওলো শেফালি,
আমার সবুজ ছায়ার আঁধারে তুই
জ্বালিস দীপালী ॥

আমার তারা আকাশ থেকে
রূপের লিপি দিল এঁকে,
শ্যামল পাতার থরে থরে
আখর রূপালি ॥

বুকের খসা গন্ধ আঁচল
রইল পাতা সে ।
আমার গোপন কাননবীথি
বিবশ বাতাসে ।

সারাটা দিন ঘাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
সন্ধ্যা বেলায় বাজে তোমার
করুণ ভুপালি ।

যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে যেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন ।
দেখেছি যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়,
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুর গুঞ্জন ॥

অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধ খানি মেলে যেত গোপন আসা যাওয়ায় ।
আজ শরতের ছায়া নটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ ॥

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ "শেষবর্ষণ" অঙ্গনে ষ্টেজ বাঁধিয়া সাজসজ্জা ও ধূমধামের সহিত করা হয়। গানের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। দ্বিতীয় বারের একটী নূতন মূর্ত্তি আলুলায়িত-কুন্তলা শুকতারা, শুভ্রবসনা, তার মাথায় ও চুলে শ্বেত চন্দ্রমল্লিকার একটী একটী ফুল শোভিত। এক শান্ত মাধুরীর দৃশ্যে নয়ন ভরিল। এবারকার আর একটী নূতনত্ব মেয়েদের নাচ। শান্তিনিকেতন হইতে অনেকগুলি নূতন বালিকা-গায়িকা আসিয়াছে—তাদের গুজরাটী 'গর্বা'র অনুকরণে নাচের সঙ্গে সঙ্গে দেবীদের ঘিরিয়া গানে, সঙ্গীতের সহিত নৃত্যকলার সংযোগে বর্ষামঙ্গলের অপরূপতা অনেক গুণিত হইল। কিন্তু মূর্ত্তিগুলির ভাব, আবির্ভাব ও তিরোভাবের রহস্য অস্পষ্টই রহিয়া গেল। দেখিতে ভাল লাগিল, কিন্তু ঠিক মর্ম্মটী বোঝা গেল না—দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে এইরূপ একটা চর্চ্চা চলিতে লাগিল। শেষ "শেষবর্ষণ"কে রীতিমত নাট্যাকার দিয়া কবি সেই অস্পষ্টকে স্পষ্ট করিলেন।

রাজা, পারিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য্য ও গায়ক-গায়িকা।

গান আরম্ভ।

রাজা।

ওহে থামো তোমরা, একটু থামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালা গানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।

নটরাজ।

[পুঁথি দিয়া] এই নিন্ মহারাজ।

রাজা

তোমাদের দেশের অক্ষর ভাল বুঝতে পারিনে। কি লিখছে? "শেষবর্ষণ"।

নটরাজ।

হাঁ মহারাজ।

রাজা।

আচ্ছা বেশ ভাল। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ।

কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তারপরে জগতে তার মত অদরকারী আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে বাকি যা থাকে তাকে আর ঘরে রাখা চলে না। তাই সে পালিয়েছে।

রাজা।

পরিহাস ব'লে ঠেকছে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালালো কেন?

নটরাজ।

পাছে মহারাজ বলে বসেন, ভাব, অর্থ, সুর, তান, লয় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, সেই ভয়ে। লোকটা বড় ভীতু।

রাজ-কবি।

এ তো বড় কৌতুক! পাঁজিতে দেখা গেল তিপিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলো ঝাপ্‌সা।

রাজা।

তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলাম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ।

ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুদ্ধ পালান নি। অস্তসূর্য্য নিজে লুকিয়েছেন, কিন্তু মেঘে মেঘে রং ছড়িয়ে আছে।

রাজ-কবি।

তুমি বুঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড় সাদা।

নটরাজ।

ভয় নেই, এই সাদার ভেতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রং খুলতে থাকবে।

রাজা।

কিন্তু আমার রাজবুদ্ধি, কবির বুদ্ধির সঙ্গে যদি না মেলে? আমাকে বোঝাবে কে?

নটরাজ।

ইসারায় বুঝিয়ে দেব।

রাজা।

আমার কাছে ইসারায় চল্‌বে না। বিদ্যুতের ইসারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝবার আশঙ্কা নেই। আমি স্পষ্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কি দিয়ে?

নটরাজ।

বর্ষাকে আহ্বান করে।

রাজা।

বর্ষাকে আহ্বান? এই আশ্বিন মাসে?

রাজ-কবি।

ঋতু উৎসবের শব সাধনা? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে তুল্‌বেন! অদ্ভুত রসের কীর্ত্তন।

নটরাজ।

কবি বলেন, বর্ষাকে না জান্‌লে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ, তারপরে আলো।

(পারিষদের প্রতি)

মানে কি হে ?

পারিষদ ।

মহারাজ, আমি ওঁদের দেশের পরিচয় জানি। ওঁদের চেয়ালি বরফ বোঝা যায়, কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজ-কবি ।

যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, টানলে আরও বাড়তে থাকে।

নটরাজ ।

বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তাহলেই সহজে বুঝবেন। জুঁই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা ।

বর্ষাকে ডাকা কি রকম ? বর্ষা ত নিজেই ডাক দিয়ে আসে।

নটরাজ ।

সেত আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা ।

গানের সুরগুলো কি কবিশেখরের নিজেরি বাঁধা ?

নটরাজ ।

হাঁ মহারাজ।

এই আর এক বিপদ।

রাজ-কবি ।

নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্ত্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্ব-দলকে খবর দিন না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক, তাহলে কবির পক্ষে "শেষবর্ষণ" নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ ।

রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উল্টে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খৎ দিয়ে চলতে থাকে তবে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অন্তত আমার দেশের চাল এ রকম নয়।

রাজা ।

ওহে নটরাজ, রস জিনিষটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিষটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা

নাই পাই, রাগিণীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলেন তাহলে তো আমার মতো লোকের মুস্কিল।

নটরাজ।

মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাত্মা।

পারিষদ।

অনমতি বিস্তরেণ। তোমাদের ধর্ম্ম যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মত সহ্য করব।

নটরাজ। (গায়ক গায়িকাদের প্রতি)

ঘন মেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী, কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে,
এস কর স্নান নবধারা জলে॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পর দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্ম্মরে।
ঘন বরিষণে জল-কলকলে
এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে॥

নটরাজ

মহারাজ এখন একবার ভিতরে দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা।

ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সবচেয়ে দুর্গম।

নটরাজ।

গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করেছেন কি, প্রাণের আকাশে পূব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো 'ঝরে ঝর ঝর'।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর
বিরহকাতর শর্ব্বরী।
ফিরিছে এ কোন অসীম রোদন
কানন কানন মর্ম্মরী॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজ এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি॥

নটরাজ

শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না। ঐ শুনুন মহারাজ মেঘমল্লার।

কোথা যে উধাও হ'ল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা-বাদরে॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নাদে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে॥

রাজা।

পূব দিক্‌টা আলো হয়ে উঠ্‌ল যে, কে আসে?

নটরাজ।

শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজ-কবি।

শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে ইসারায়।

রাজা।

নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমার পূর্ণতা কোথায়? ও ত বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ।

মহারাজ, বসন্ত পূর্ণিমাই ত অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমার মিথ্যে, কান্না বলছে আমার সত্য। কুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালা বদল। ওগো কদম্বরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো, ও কী আন্‌লে?

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল ॥
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল ॥
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
কেরে সে কোন্ স্বপন লোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে
জানে না সে পাবে কারে,
আসা যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

রাজা।

বেশ, বেশ এটা মধুর লাগল বটে।

নটরাজ।

কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর? সেও তো অসম্পূর্ণ?

রাজা।

ঐ দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। কথার চলন নেই বুঝি?

নটরাজ।

মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিল হলে তবেই হয় হরপার্ব্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা ॥
তোমার মন্ত্র বলে
পাষাণ গলে ফসল ফলে
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা ॥
মর মর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে?

সবুজ সুধার ধারায়
প্রাণ এনে দাও শুষ্ক ধারায়,
বাজে রাগ ভয়ঙ্করী
বজ্র মরণ ঢালা।
রাজা।

সব রকমের ক্যাপামিই ত হল। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইল কী?

নটরাজ।

বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্তর্থাবৃত্তি চেতঃ", সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আনমনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য্য, ধর হে,—

পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী॥
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী॥

নটরাজ।

বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়ালো, ঘন বর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেলো কিন্তু ওর বাণীটি আছে, তোমার কণ্ঠে মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥

রাজা।

আর নয় নটরাজ বিরহের পালাটাই বড় বেশী হয়ে উঠলো, ওজন ঠিক থাকছে না।

নটরাজ ।

মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটী ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটী তারা একদিকে তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারিদিকে ছল ছল করচে, মিলন পদ্মটি তারই বুকের একটী দুর্লভ ধন।

রাজ-কবি ।

তাই না হয় হোলো। কিন্তু অশ্রু বাষ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেল্‌লে ত চলবে না।

নটরাজ ।

মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড় মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য্য একবার শুনিয়ে দাও ত।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে ॥
উৎসব সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে ॥

রাজা ।

আঃ, এতক্ষণে একটু উৎসাহ লাগলো। থাম্‌লে চল্‌বে না। মাদলওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়েচে, ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ ।

বলি ও ওস্তাদ, ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটলো, ওরা যে ক্যাপার মত চলেচে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলো না, একেবারে নৃদঙ্গ বাজিয়ে বুক ফুলিয়ে যাত্রা জমে উঠুক না সুরে, কথায়, মেঘে, বিদ্যুতে, ঝঁড়ে।

পথিক মেঘের দলজোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে।
মনরে আমার, উদাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গে নে ॥
দিক-হারানো দুঃসাহসে,
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে ॥

বেদনা তোর বিজুলিশিখা জ্বলুক অন্তরে ;
সর্ব্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে কর্‌লি গাহন,
ঝড় সে পথের তরে বাহন,
শেষ করে দিস্ আপনারে তুই
প্রলয় রাতের ক্রন্দনে ॥

রাজ-কবি।

ঐরে আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। মহারাজ, আর দেরী নেই, আবার কান্না নামলো বলে

নটরাজ।

ঠিক ঠাউরেছ। বোধ হচ্ছে চোখের জলেরই জিৎ। বর্ষার রাতে সাথী-হারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ার স্বপ্নের মতো ; আজ বুঝি বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা, ভৈরবীতে করুণ সুর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে ॥
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে ॥
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে ॥

রাজা।

কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই ত খণ্ড খণ্ড করে হোলো এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ।

ভাল কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য্য, তবে ঐটে সুরু করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা ॥

গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;
নিখিল-চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িত-চকিত-নয়না,
মালতি-মালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা ।
ঘন বনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা ।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা ।
আন মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী ।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় কর নবগীত রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী ।
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী ।
কেতকীকেশরে কেশপাশ কর সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁক নয়নে ।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকসিত বয়নে ;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে ।
এসেছে বরষা এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,

দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মন্ত্রমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।

রাজা।

যাঃ বেশ জমেচে। আমি বলি আজকের মত বাদলের পালাই চলুক।

নটরাজ।

কিন্তু অগস্ত্যের দেখা নেই, মেঘে মেঘে পালাই পালাই ভাব। শেষ কেয়াফুলের গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ায় ভরে' উঠলো। ঐ যে, "এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী।

একলা বসে বাদল শেষে শুনি কত কী।
"এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী।
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তা'রে
ডেকে গেল আকাশ পারে,
তাইতো সে যে উদাস হ'ল
নইলে যেত কি।
ছিল সে যে একটী ধারে বনের কিনারায়,
উঠ্‌ত কেঁপে তড়িৎ আলোর চকিত ইসারায়।
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি।

রাজা।

নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।

নটরাজ।

তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালার বর্ষা এবার যাব যাব করছে।

রাজা।

তুমি তো দেখি বিদ্রোহীদলের একজন, কবির কথাই মানো, রাজার কথা মানো না? আমি যদি বলি যেতে দেব না।

নটরাজ।

তাহলে আমিও তাই বলবো। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো কঙ্কণিকা, বাদলের শ্যামল ছায়া কোন্ লজ্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য্য।

নটরাজ, ও বল্‌চে ওর সময় গেলো।

নটরাজ।

গেলোই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনি ত সুরু হয় অকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেল্‌তে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগল মিলন।

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল নিলোল আঁচল মেলে।
পূব হাওয়া কয়, "ওর যে সময় গেলো চ'লে,"
শরৎ বলে, ভয় কি সময় গেল ব'লে,
বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে।"
কালো মেঘের আর কি আছে দিন?
ও যে হ'ল সাথীহীন।
পূব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো",
শরৎ বলে, "মিল্‌বে যুগল কালোর আলো,
সাজবে বাদল সোণার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।"

নটরাজ।

শরতের প্রথম প্রত্যূষে ঐ যে শুকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ ক্ষমা করবেন, কথা কবেন না।

রাজা।

নটরাজ, তুমিও ত কথা কইতে কসুর করো না।

নটরাজ।

আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা।

আর আমার হলো তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার না হয় হোলো মুক্তি, দুইয়ে মিলেই ত ঝরণা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ। যে বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁরই সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ।

এবার বুঝেছি আপনি ছন্নছাড়া রসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইলো না। গীতাচার্য্য গান ধরো।

দেখ শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো, সখি,
কাহার আশে আকাশ উঠিল পুলকি'।
মালতীর বনে বনে
ঐ শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়
আয় আয় আয়॥

নটরাজ।

ঐ দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌঁচেছে। আকাশে আলোকের যে লিপি, সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিলো ঐ শেফালি। সে লেখার শেষ নেই তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্ত্যে, তার ব্যথা ক'জন বোঝে? সেই করুণার গান সন্ধ্যার সুরে তোমরা ধরো।

ওগো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি॥
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিলো এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি॥
বুকের খসা গন্ধ আঁচল রইল পাতা সে
কানন বীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি॥

রাজা।

নটরাজ, অঘন করে শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে?

নটরাজ।

আর দেরী নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে মাধুরী হাওয়ার হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়া-রূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ারূপিণীর নূপুর বাজলো, কখন চমক দিলো কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে-ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন॥
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুর গুঞ্জন॥
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে মেত' গোপন আসা-যাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়াবটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ॥

নটরাজ।

শুভ্র শান্তির মূর্তি ধ'রে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোলা থেমে যাক্—আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে
দিবা যামিনী আকুল সমীরে॥

(বাদল লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

রাজা।

ও কী হল নটরাজ, সেই বাদল লক্ষ্মীই ত ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠ! রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ।

চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোর রাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখীর কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান

গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে তাই আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা!
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছো মিলায়ে পবনে পবনে?
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া?
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছো লুকায়ে আপন মায়াতে?
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো না॥
আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লব জীবনে,
নামো জলে ছায়া-ছবি স্বপনে,
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না॥
ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা!
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
আলি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা॥
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
ঐ বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা, শ্বেতচন্দন তিলকে
আজি তোমায়ে সাজায়ে দিলো কে?
আহা বরিলো তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা॥

নটরাজ।

প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদল লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎ প্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলি বনে তাঁরই গান, আলতা বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হোলো॥
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্ম্মর গানে তব মর্ম্মের বাণী বোলো॥
গোপন অশ্রুজলে মিলুক সরম হাসি—
আলতা বিতানতলে বাজুক বধূর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ-মিলন গাঁথা নব
প্রণয়-দোলায় দোলো॥

(অবগুণ্ঠন মোচন)

নটরাজ।

অবগুণ্ঠন ত খুললো। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ না বাণী? এ কি আমার মনেরি মধ্যে, না আমার চোখেরই সাম্‌নে?

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎ প্রাতের আলোর বাণী।
সারা বেলা শিউলি বনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার বুকের ব্যথার বাঁশিখানি।
আমি যা বলিতে চাই হলো বলা
ঐ শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে অঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি।

রাজা।

শরৎশ্রী কা'কে ইসারা ক'রে ডাকচে? বলো তো এবার কে আসবে?

নটরাজ।

উনি ডাকচেন সুন্দরক। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটলো আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

(সুন্দরের প্রবেশ)

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিলো মোর প্রাণে?
ফুটে দিগন্তে অরুণ কিরণ-কলিকা।
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয় কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা।

রাজা।

নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরি মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন?

নটরাজ।

শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া আসায় স্বর্গ মর্ত্যের মিলন পথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া।
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন-ভুলানো-মোহন তানে
গান-লাহিরী।

নটরাজ।

এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে।
তোমার বুকে বাজলো ধ্বনি
বিদায়-গাথা, আগমনী, কত যে,
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে।
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।
সময় যে তার হ'ল গত
নিশি শেষের তারার মত
শেষ ক'রে দাও শিউলি ফুলের মরণ সাথে।

রাজা।

ওকি! একেবারেই শেষ হয়ে গেলো নাকি? কেবল দুদণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হোলো, গান সারা হোলো! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা,—তারপরে।

নটরাজ।

"তারপরে" প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা। এতো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিত ব্যয়! মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশীতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম তারপরে? কেউ চুপ করে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে রাখে, কেউ ভোলে কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায়?

গান আমার যায় ভেসে যায়।
চাস্‌নে ফিরে সে তারে বিদায়॥
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধূলায় আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির ফোঁটায় ঘোলা গাঁথা বনের আঙিনায়॥
কাঁদন হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে যাওয়ার বোঝাই তরী
গেলো চলে কতই ত্বরী
উজান বায়ে কেরে যদি সে রয় সে আশায়॥

উত্তম হয়েছে।

রাজ-কবি।

আরও অনেক উত্তম হতে পারত।

এই নাট্যাকারের বর্ষামঙ্গলে রাজা সাজিয়াছিলেন অবনীন্দ্র নাথ এবং নটরাজ ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। গতিকলা মাধুরী সৃজনকারিণী বালিকা ও তরুণীরা গুজরাটী কাঠিবাড়ী পঞ্জাবি প্রভৃতি ভারতীয় নানা দেশের পরিচ্ছদে অপচ অত্যন্ত ঢঙে চিত্রশিল্পী শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সুনিপুণ হস্তে সজ্জিতা হইয়াছিল, তাঁহার পঞ্চবর্ষীয়া কন্যা নন্দিনী পুষ্পমধ্যে ভ্রমরের মত বড়দের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাদের নাচের তালে তালে ঠিক পা ফেলিয়া কমলা নেবুর রঙের ওড়নাটি উড়াইয়া বর্ণ গীত ও গতির আর একটা সুন্দর সমবায়ের হাওয়া বহাইয়া দিয়াছিল।

ছেলেরা শান্ত নিরীহভাবে চুপচাপ বসিয়াই মেয়েদের সঙ্গে গাহিয়াছিল। কেবল শেষরাত্রে নটরাজের ইঙ্গিতে হঠাৎ—"পথিক মেঘের দল জুটেছে" গাহিতে গাহিতে তারা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং হাত নাড়ার দ্বারা এবং মুখে চোখে স্ফূর্তি ব্যঞ্জনার দ্বারা যতদূর সম্ভব নিজেদের ভিতরকার সজীবতার পরিচয় দিল 'শেষবর্ষণ' শেষ হইয়াছে। এখন ঘরে ঘরে তার গান গাওয়ার আর শেষ নাই। এ বছর বর্ষাও যেন অফুরান, প্রায়ই দেখি ছেলে মেয়েরা জানলার ধারে গিয়া আকাশপানে চাহিয়া ভাবে ভোর হইয়া সুরে বলিতেছে—"শ্যামল ছায়া তুমি নাই বা গেলে"। কবির ভাবের ঢেউ ছেলেদের প্রাণে আসিয়া লাগিয়াছে।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

জোয়ার ভাঁটা

(উপন্যাস)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাশের গ্রামে গিরীন্দ্র রায় না কার একটা দল ছিল। ইহাঁরা পল্লী সমাজের ব্যবস্থায় একটু অন্য রকম নীতি চালাইতে উদ্যোগী। স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তন, নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়ন, বিলাত ফেরতাকে সমাজে লওয়া, সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানেই নর্ত্তকীর নূপুর-নিক্কণ বন্ধ রাখা প্রভৃতি মৃদু রকমের সংস্কারের কাজ ইহাঁরা হাতে লইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেরা এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য ত করিতেনই, এ ছাড়া সহর হইতে দুই একজন বিশেষজ্ঞ বক্তা আসিয়াও মাঝে মাঝে পল্লীবাসীদের কাছে কোন বিশেষ প্রসঙ্গে কিছু বলিত। ইহাদের সমিতির নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে শ্যামাকান্ত বাহিরে একটু আধটু যোগ দিলেও, সহানুভূতি অপেক্ষা অবশ্য বিদ্বেষের মাত্রাটাই ইহাদের উপর তাহার বেশীই ছিল কারণ ইহারা পল্লীর এমন কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করিতেন, যেগুলো বন্ধ হইলে শ্যামাকান্তের আমোদ ও প্রতিপত্তির অনেকটা ব্যাঘাত ঘটে।

আর বৃদ্ধ পণ্ডিতের এই নব্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন রকম যোগ থাকিবার ত কথাই নয়। অবশ্য ইহারা এমন কোন কাজ করিত না, যাহা ভোলানাথের বেদান্তজ্ঞানের প্রতিকূল। কিন্তু এই বৈদান্তিক জ্ঞানটা বেদান্ত বাগীশের একটা পোষাকি সজ্জা মাত্র, তাঁহার ব্যবহারিক জীবনটাই ত তাঁহার কাছে যারপর নাই ঘনিষ্ঠ। তাঁর এই ব্যবহারিক জীবনটা যে অনেকাংশেই কি পুরাণ বেদান্ত কি নব্য বিজ্ঞান কোনটার সঙ্গেই তেমন খাপ খাইত না, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই নব্য সম্প্রদায়টি শ্যামাকান্ত ও ভোলানাথ উভয়েরই একটা বিদ্রূপের বিষয় ছিল। এই সংস্কারক আখ্যাটিও এই সম্প্রদায়ের নিজের লওয়া নয়, পরের দেওয়া একটা ব্যাজস্তি মাত্র।

ভোলানাথের সঙ্গে আলাপেরসূত্রে এই সম্প্রদায়ের নাম ওঠাতেই শ্যামাকান্ত নিজের আসল বক্তব্যটা ছাড়িয়া ইহাদের সমালোচনার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। এই সমালোচনা প্রায়ই যেরূপ হইয়া থাকে, সেরূপ নির্ভাজ গালাগালি হইলে, ভোলানাথ নিশ্চয় আরও কণিকক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে তাহা শুনিতেন। কিন্তু শ্যামাকান্ত এবার এই সমালোচনার মধ্যে নির্ভাজ গালি অপেক্ষা ভেজাল তত্ত্বজ্ঞানের উদ্গার তুলিতে থাকায়, ভোলানাথের কাছে এটা বড় যেন মুখসই ঠেকিল না। তাই তিনি শ্যামাকান্তের রসনার বেগটা অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন।

শ্যামাকান্ত অবশ্য ভোলানাথের প্রশ্নটাকে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল বলিয়াই ধরিল, তাহার কথার উপর কোন বাধার মত মনে করিল না। শ্যামাকান্ত কহিল, "হ্যাঁ, ডুমুরগাছার ঠাকুর বাড়ীতে বক্তৃতা হ'ল। শুনলাম, বক্তা নাকি একজন প্রকাণ্ড দার্শনিক ও প্রচণ্ড ভক্ত।"

"কি বললেন?"

"আহা, কি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাই যে করলেন—যেমন ভাষা তেমনই ভঙ্গী, কখন নরম, কখন গরম, প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে এতগুলো লোককে যেন একেবারে পুতুল বানিয়ে ফেলেছিল।"

ভোলানাথের মনটা সংশয়ে যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "গীতার ইংরেজি—ব্যাখ্যা বুঝি?"

এই ইংরাজি ব্যাখ্যা বলিয়া জিনিষটা শ্যামাকান্তের বুদ্ধির অতীতই ছিল। সে ভোলানাথের ব্যঙ্গটুক ধরিতে পারিল না। শ্যামাকান্ত আগ্রহে প্রতিবাদ করিয়াই কহিল,—"না খুড়ো মশায়, সে গীতাও নয়, আর তার ইংরেজি অনুবাদও নয়। বক্তৃতার সিকি অংশ প্রায় সংস্কৃত। এক পাই আন্দাজ ইংরেজি ছিল কি না সন্দেহ!"

"তবে বক্তৃতার বিষয় ত একটা কিছু ছিল?"

শ্যামাকান্ত উৎসাহে উত্তর দিল "বিষয়? তার মধ্যে ছিল না এমন জিনিষ নাই। ইতিহাস, ভূগোল, বেদ-বেদান্ত, প্রকৃতি-প্রত্যয়—"

ভোলানাথ এবার একটু যেন খোঁচা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"কার প্রত্যয়, কলাপ না—?"

প্রশ্নটা শেষ না হইতেই শ্যামাকান্ত প্রথমে ঝোঁকের মাথায় কহিল,—"সে যে কি ব্যাপার, নিজে না শুনলে কারও প্রত্যয় জন্মানই কঠিন।"

কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাসল শব্দটা তাহার মনে পড়িল। সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই একটু হাসিয়া বলিল,—"ওঃ প্রত্যয় বলে ফেলেছিলাম বুঝি? বাস্তবিক, খুড়ো মশায়, সে বক্তৃতার মর্ম্মটা মনে এলে যেন আত্মহারা হয়ে পড়তে হয়। হ্যাঁ, প্রকৃতি পুরুষ নিয়ে তিনি যেন এক মধুর ভাবের জগৎ গড়ে' তুললেন।"

এই বলিয়া শ্যামাকান্ত একবার ভোলানাথের দিকে চাহিল। কিন্তু ভোলানাথ আর কথায় কোন সাড়া দিলেন না, তবে অবশ্য বেশ যেন সমুৎসুক ভাবেই শুনিবার ভান করিয়া রহিলেন। শ্যামাকান্ত ইহাতে না দমিয়া বরং ফুলিয়াই উঠিল।

শ্যামাকান্ত বলিতে লাগিল, "তিনি কপিলের সাংখ্য থেকে আরম্ভ করে শেষে গণিতের সংখ্যায় এসে পড়লেন। সত্যই এমন বিশ্লেষণ, এমন বর্ণন খুব কমই শুনেছি। বক্তা যখন ভক্তির আবেগে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের প্রেমলীলা বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন এমন লোক সেখানে ছিল না যার চোখে অশ্রুধারা বয়নি। কয়েকজন বৈষ্ণব ত ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে সুরু করলে। দুজন দণ্ডী না বৌদ্ধ ভিক্ষু সেখানে ছিল, তাহাদের উদ্দাম নৃত্য দেখে

কে! মানুষের কথা ছেড়ে দিন, অবোলা প্রাণী পর্য্যন্ত ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। দেখ্‌লাম, ঠাকুর বাড়ীর গরুগুলো কোনটা পুচ্ছ তুলে লাফাচ্ছে, কোনটা বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রয়েছে।"

ভোলানাথ এবার যেন একটু বিস্ময়ের ভাণ দেখাইয়া টিপ্পনী কাটিলেন—"সে কি, বক্তৃতার টানে এত গরু এসে জুটেছিল?"

শ্যামাকান্ত উল্লাসে বলিয়া উঠিল, "বল্‌ব কি খুড়োমশায়, এই মানুষ আর গরুতে মিলে যে একটা দৃশ্য ফুটিয়ে তুল্‌লে, সে যেন একটা অভিনব বৃন্দাবন!"

এই সময়ে ভিতরের রোয়াকে যেন পায়ের শব্দ হইল। শ্যামাকান্তের কাণে তাহা পৌঁছাইতে তাহার রসনা যেন আরও একটু চড়া অথচ করুণ সুরে সেই অদ্ভুত বক্তৃতার মর্ম্মগাথা ভাঁজিতে লাগিল। বক্তা কেমন করিয়া আধ্যাত্মতত্ত্ব হইতে সমাজতত্ত্বে অবতরণ করিলেন, সামাজিক সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে বৈষ্ণব তত্ত্বকে কেমন করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান দিলেন, হিন্দু বিধবা যে হিন্দু-সমাজের কতদূর আরাধ্যা—সমাজ এই দেবীর চরণে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেয় বলিয়াই এখনও বাঁচিয়া আছে, শ্যামাকান্ত প্রায় দণ্ডখানেক ধরিয়া এই সকল আবৃত্তি করিল।

বক্তার নিজের কথা যাহাই থাকুক, শ্যামাকান্তের মুখে তাহার আবৃত্তিটা যেরূপ প্রকাণ্ড মীনরাজের মত দর্শন-বিজ্ঞানের খাল বিল ঘোলাইয়া বিদ্যুৎ বেগে ছুটিল, তাহাতে সেটাকে কোন রকম অর্থের জালে আয়ত্ত করা ভোলানাথের সাধ্যে যেন কুলাইল না। ভোলানাথ অবশ্য সে জন্য বিশেষ ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং দুই চারিটা উৎসাহদায়ক শিরঃ সঞ্চালনের দ্বারা শ্রোতার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভোলানাথ ছাড়া শ্যামাকান্তের এই আবৃত্তিটার আর একজন শ্রোতা জুটিয়াছিল। মুরলা এখন আর সরোজের কাব্যগুঞ্জার দিকে অবশ্য মোটেই ঘেষিত না, কিন্তু আজ শ্যামাকান্তের মুখে তত্ত্বকথার আভাস পাইয়া তাহার মনটা সেই আলোচনায় একটু আকৃষ্ট হইল। শ্যামাকান্ত তাহারই সাড়া অনুভব করিয়া শেষের দিকে তাহার সাধা গলায় খাঁদা তান ছাড়িয়াছিল। উদ্দেশ্য আর কিছু না হোক, সকলের কাছেই বিশেষতঃ মুরলার মত পূর্ণ যৌবনার কাছে বাহাবা লইবার ইচ্ছা শ্যামাকান্তের বেশ প্রবলই ছিল।

শ্যামাকান্তের এই উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয় নাই। তাহার সেই দর্শন-বিজ্ঞানের খিচুড়ীটা তত্ত্বজ্ঞানী ভোলানাথের বিস্বাদ ঠেকিলেও, মুরলার যেন খুব ভালই লাগিল। কারণ তাহার মধ্যে জ্ঞান-যুক্তির চাল-ডাল কদর্য্য হোক, তাহাতে গোটা কত বেশ সুরভি শব্দের মসলা ছিল। মুরলার চিত্তটা এই মসলার গন্ধেই ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল, আসল জিনিষটাকে পরখ করিবার তাহার অবসর ছিল না, সম্ভবতঃ জ্ঞানও তত ছিল না।

তাহা হইলেও এই মসলাটাই এ ক্ষেত্রে মুরলার পক্ষে বেশ একটা টনিকের কাজ করিল। এমনটা যে ঘটিল, ইহা রাধুনী বা মসলার গুণে তত্টা নয়, যতটা 'স্বাদগ্রাহিণীর' বর্ত্তমান মনের গুণে। সরোজের সংস্রব হইতে দূরে থাকিলেও, মুরলা সরোজকে মন হইতে এখনও বড় দূর করিতে পারে নাই। সরোজের কাব্যালাপের মাদক অনুরণন মুরলার শ্রুতিতে আর না পৌঁছাক, তার স্মৃতিটাকে তাহার চিন্তা-পাশ হইতে এখনও যে কিছুই সে মুক্ত করিতে পারে নাই।

মুরলা নানা রকম অস্ত্রে এই পাশটার উপর আঘাত করিতেছিল, কিন্তু সেটা যেন কাটিয়াও কাটে না। মুরলা এই পাশ হইতে মুক্তির জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিল বলিয়াই, সে শ্যামাকান্তের সেই ছোটা তত্ত্বের স্তূপেই একটা যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্র খুঁজিয়া পাইল। শ্যামাকান্তের যুক্তি-তর্কের আবর্জ্জনা ঠেলিয়া তাহার হিন্দু-বৈধব্যের বন্ধনটাই মুরলার চোখের সামনে যেন ঝকমক উঠিল। শ্যামাকান্তের এই মৌখিক স্মৃতিটা মুরলার যেন একটা আন্তরিক গর্ব্বের আকারে পরিণত হইল। মুরলা তাহার এই নূতন গর্ব্বের অস্ত্রে তাহার সেই দুশ্ছেদ্য স্মৃতির পাশকে লোপাট করিতে চাহিল।

হাতে হাতেই মুরলার এই চেষ্টার ফলও মিলিল বেশ। কারণ এই গর্ব্বটা মুরলার পক্ষে খাটিয়া গেল ঠিক যেন বিষস্য বিষমৌষধং। মুরলার প্রথম চিন্তার মাদকতা তাহাকে এক ভাবে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তার এই নূতন মাদকতা তাহাকে অন্যভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মুরলা নূতন ঝোঁকের বলে পুরাণ ঝোঁকটা যেন এক নিমেষে কাটাইয়া উঠিল। তাহার যে চিত্ত সরোজের টানে তাহার কাব্যের নায়িকা সাজিতে গিয়াছিল, আজ সেটা যেন সকলের পানে অধিনায়িকার মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

প্রেম ও গর্ব্ব দুইটাই মাদক বটে, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়া ঠিক এক রকমের নয়, অন্ততঃ মুরলার উপর তাহাদের প্রভাব খুবই বিভিন্ন আকারে দেখা দিল। মুরলার মনের ভিতর প্রথমটার ক্রিয়া বড়ই ধীরে ধীরে চলিয়াছিল,—এত ধীরে যে গোড়ায় সেটা মুরলার সজাগ অনুভূতির ভিতরেই বড় আসে নাই। কিন্তু শেষটার ফল দাঁড়াইল একেবারে উল্টা। নিমেষের মধ্যেই একটা যেন উগ্র উন্মাদনা মুরলার সমস্ত দেহ-মনে তীব্র গতিতে ছড়াইয়া পড়িল।

ঐ প্রথম ভাবের স্পর্শটুকু মুরলার হৃদয়ে আসিয়া লাগিয়াছিল ঠিক যেন ভোরের আলোর মত। এই আলোর রেখাটা যখন তাহার জীবনের আকাশে ঈষৎ ফুটিয়া উঠিল, তখন সে প্রায় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। ইহার মৃদু বিকাশ ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুট ও পরিব্যাপ্ত হইয়া তবে তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু অন্যটার আবির্ভাব যেন তড়িতের উন্মেষ—তেমনই তীব্র আকস্মিক ও জ্বালাময়। আর এটি নিজের আগমন বার্ত্তা একেবারে বজ্রনির্ঘোষেই মুরলার কাছে জ্ঞাপন করিল। তবে মৃদু ভোরের সমুখে একটা গোটা দিন, আর তড়িতের তীব্র জ্বালার পরেই আবার যে কে সেই,—মুরলার বেলা এমনটা না ঘটিলেই রক্ষে।

মুরলা আগে যেন পূজার অর্ঘ্য অর্পণ করিতে হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সে যেন পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে উন্নত শীর্ষে দাঁড়াইল। কোনা পূজারিণী একেবারে দেবীর মহিমা-মঞ্চের উপর গিয়া খাড়া হইল। মুরলার চারিদিকের বাতাসে মনটা যেন কোটী কণ্ঠের স্তুতিরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। যেন রাশিকৃত ধূপ ধুনার গন্ধে তাহার দেবভাবাপন্ন নাসারন্ধ্র স্ফীত করিয়া তুলিল। মুরলার সমস্ত অবসাদ সমস্ত ক্লৈব্য পরাভূত করিয়া তাহার হৃদয়ের কাতর ভিক্ষার স্থানটা একটা যেন জবর দাবী আসিয়া দখল করিয়া বসিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্যামাকান্ত চলিয়া যাইবার পরেই মুরলা পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জোর গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ভাদুড়ী দাদা যা বল্‌লেন, তা কি সম্পূর্ণ সত্য নয়?"

ভোলানাথ কন্যার কণ্ঠস্বরেই একটু চম্‌কাইয়া উঠিলেন, পরক্ষণে মুরলার দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে ভোলানাথের এই চম্‌কান ভাবটা আরও যেন বাড়িয়া গেল।

বেদান্তবাগীশের শাসনের কঠোরতা মুরলার দেহ ও মন দুইটাকেই বেশ সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সমস্ত ভাবটুকুর একটু ব্যত্যয় দেখিয়াই ভোলানাথ তাহার শিক্ষার প্রথম পদ্ধতিটা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গার্গী গড়িতে গেলেই যে প্রশ্নের অধিকার দিতে হয়, আর এই অধিকার দিলেই যে এই সন্ন্যাসের হ্রাস অনিবার্য্য। তাই ত ভোলানাথ এই প্রশ্নের অঙ্কুরটাকে নষ্ট করিবার জন্য তাহার উপর এমন সব শাসন-বিধির পাথর চাপাইয়াছিলেন। তবুও কি সেটা আজও বাঁচিয়া আছে? মুরলার মুখে সহসা সেই প্রশ্নটা শুনিয়া ভোলানাথ অবশ্য কিছু বিস্মিত হইলেন। আবার তাহার চেহারায় ও স্বরে তাহার এই অত্যন্ত সন্ন্যাস ও জড়তার এতটা অভাব দেখিয়া ভোলানাথের বিস্ময় যে আরও বেজায় বাড়িয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

ভোলানাথ কন্যার প্রশ্নের অবশ্যই কোন জবাব দিলেন না। তিনি গম্ভীরমুখে উল্টাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামাকান্তের কথাগুলো কি সবই শোনা হয়েছে?"

পিতার স্বরে যে তিরস্কারটুকু ছিল, কন্যার তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। এই কারণে অকারণে অনেক সময় মুরলাকে তাহার পিতার এরূপ কথার খোঁচা খাইতে হইত। সেই জন্য ইহার আস্বাদটা সে সহজেই ধরিতে পারিত। বাহিরের কোন আলোচনায় অন্দরের যোগ রাখা অসঙ্গত, এইটাই ছিল ভোলানাথের কথার ইঙ্গিত।

মুরলা কিন্তু এই ইঙ্গিতে এবার বড় দমিল না। বরং সে একটু যেন প্রতিবাদের স্বরে উত্তর দিল, "কেন, তাঁর কোন কথা ত অশ্রাব্য ছিল না!"

ভোলানাথ একটু গরম হইয়া কহিলেন, "অশ্রাব্য না হলেই যে সেটা সকলের শ্রাব্য হবে, এমন কোন কথা নাই।"

মুরলা এবার একটু অনুযোগের সহিত কহিল, "আপনাদের কাব্যচর্চায় যোগ-দেওয়া হয়ত সঙ্গত না হতে পারে, কিন্তু এমন জ্ঞান ও যুক্তির আলোচনার উপকার বৈ ত অপকার নাই।"

বলা বাহুল্য, মুরলা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সরোজের কাব্যালাপের উপর বড়ই চটিয়াছিল। এই আলাপটার উপলক্ষেই তাহার মতিগতি অন্যদিকে ফিরিয়াছিল বলিয়া মুরলা ইহার উপর এখন একটু গায়ের ঝাল না ঝাড়িয়া যেন থাকিতে পারিল না।

বেদান্তবাগীশের বৈঠকখানা অবশ্য বেয়াদপের আড্ডা নয়; এখানে এমন সব আলোচনা কমই উচিত, যাহা অনেকের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের অশ্রাব্য। কোন্যাদির চর্চ্চায়ও ভোলানাথ পণ্ডিত লোক হইলেও একটু সতর্কভাবেই আদিরসের ব্যাখ্যা করিতেন। বাহিরের আলোচনায় মুরলার কাণ দেওয়ায় বাস্তবিক পক্ষে ভোলানাথের তত আপত্তি ছিল না। তবে তিনি যে কন্যাকে এই ইঙ্গিতের আঘাতটুকু দিলেন, এটা তাহার এই আলাপে কাণ দেওয়ার জন্য ততটা নয়, যতটা তাহার এই বর্ত্তমান অসঙ্গত ও বড় বেশী সপ্রতিভ ভাবের দরুণ।

যাই হোক, এবার কন্যার অনুযোগে ভোলানাথের মন কিছু নরম হইল কাব্যের প্রতি মুরলার আক্রোশটায় ভোলানাথ না চটিয়া বরং একটু আশ্বস্ত হইলেন কাব্য জিনিষটা আর যাহারই হোক, বিধবার ততটা উপভোগ্য নয়, ভোলানাথের সম্ভবতঃ এইরূপই একটা ধারণা ছিল। তাই তিনি এবার মুরলার ঐ আক্রোশটা লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "কাব্যের সুর আর ধর্ম্মের সুর এক নয় গো। কাব্য সৌন্দর্য্যের সুরে সাধা; আর ধর্ম্ম—মঙ্গলের সুরে বাঁধা।" তোমাদের পক্ষে এই মঙ্গলের সুরের কাণ ফুটলেই যথেষ্ট; সৌন্দর্য্যের সুরে কান দেবার তোমাদের কোনই দরকার নাই।"

মুরলার তার্কিক মন হয়ত বলিয়া উঠিত দরকার ত শুনছি নাই; কিন্তু কাণ না দিয়াও যে থাকা যায় না মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দর যে বড় ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া আছে।

তবে মুরলার সেই আদি তার্কিক মন অবশ্য না মরিলেও মুষড়াইয়া ছিল। ইহা ছাড়া আজ যে মনটা মুরলার মধ্যে বেজায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সে এখন তর্ক করিতেও চাহে না, হার মানিতেও চাহে না। সে এখন আপনার পূজার দ্রব্য প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত দেখিতেই সমুৎসুক।

মুরলা তাই এই কথা ছাড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "যে বক্তৃতার মর্ম্মটা এতক্ষণ শুনলাম, তার মধ্যে কি মঙ্গল নাই?"

ভোলানাথ সস্মিতে কহিলেন, "সেটা 'সত্য কিনা' তাই ত জান্‌তে চাইলে, আবার তার মঙ্গলটাও বল্‌তে হবে? একটা জান্‌লেই ত আর একটা জানা যাবে; মঙ্গল ত মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।"

মুরলার এই ধারণাটার সম্পর্কে ভোলানাথের মনে যাহাই থাকুক, মুখে কিন্তু তিনি

বলিলেন, 'তা না হোক, কিন্তু শ্যামাকান্তের এই আবৃত্তিটাই যে কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইটাই যে ঠিক বুঝতে পারি নি।"

মুরলা যেন কিছু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "কেন বাবা, আমার ত মন্দ লাগেনি।"

ভোলানাথ এবার হাত ছাড়িয়া একটু গম্ভীরমুখে বলিলেন, "ওর এক একটা কথা বেশ ভাল লাগতে পারে, কিন্তু সব কথাগুলো জড়িয়ে যা দাঁড়ায়, সেটা যে কি রকম লাগে, তা বলাই যায় না। ওর একটা কথা অবশ্য এক এক গাঁই সুতোর মত, কিন্তু সবগুলো মিলে-মিশে না হয় একখানা কাপড় না হয় একটা দড়ি। কেবল সেটা হয়ে পড়ে একটা বিষম গোঁটলো গেঁরো, যা কারও বাধ্য নাই যে খোলে।"

মুরলা পিতার উপমাটা বুঝিল বলিল, "না বাবা, আমি ওর সবটা ত বুঝতে চাইনে, ওর মধ্যে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, সেইটার কথাই কিছু জান্‌তে চাচ্ছিলাম।"

শ্যামাকান্তের ঐ আবৃত্তির সময় ভোলানাথ শুনিবার ঔৎসুক্য দেখাইলেও, বাস্তবিক ওটাকে মন দিয়া শোনার যোগ্যই তিনি মনে করেন নাই। এখন মুরলার এই প্রশ্নে ভোলানাথ যেন একটু ফাঁপরে পড়িলেন। স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে বিশেষ কিছু উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া বলিলেন, "সমাজতত্ত্ব ও সম্বন্ধে শ্যামাকান্ত ত অনেকক্ষণ বকেছিল। আচ্ছা একটু খাঁই ধরিয়ে দাও দেখি, যদি কিছু বলতে পারি। তবে ঐ গাঁটের মধ্যে তেমন খাঁই পাওয়া অবশ্য দায়।

শ্যামাকান্তের আবৃত্তির উপর ভোলানাথের এরূপ অশ্রদ্ধা দেখিয়া মুরলার মন যেন একটু সংশয়ে বাথিত হইয়া উঠিতেছিল। মুরলার এমন নূতন আবেগময় ধারণাটা ভোলানাথের মত শাস্ত্রজ্ঞানীর কাছে বা অপঘাত হয়।

মুরলা আর ইতঃস্তত না করিয়া এবার সোজাসুজি আসল কথাটা পাড়িয়া বলিল, "অন্য বিষয় যাই হোক, আমি যেটার কথা বলছি, সেটা ত কিছুই অস্পষ্ট হবার নয়। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে ঐ বক্তৃতার মধ্যে আছে,—স্বর্গের দেবীরাই হিন্দু বিধবাদের ভিতর অবতীর্ণ হয়ে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মুরলা একটু থামিয়া পড়িল। কথাটা একটু যেন বাধিয়া বাধিয়া বলিল, "হাঁ, অবতীর্ণ হন। এটা কি মিথ্যা কল্পনা?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তিলতা ঘোষ।

স্বরাজের 'স্ব'

গত মাসের 'ভারতী'তে স্বরাজের 'স্ব' এর আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন একটা স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য বা স্বালক্ষণ্য আছে, তেমনি ব্যক্তির সমষ্টি বা সংঘাত যে জাতি, সেই জাতিরও প্রত্যেকেরই এক একটা স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য বা স্বালক্ষণ্য আছে। এইটাই তার 'স্ব'—এই স্বধর্ম্মপালনেই তার স্বস্তি, শান্তি ও কল্যাণ—পরধর্ম্ম যদি বা কখনো তার পক্ষে প্রেয়ঃ হয়, কিন্তু কখনই শ্রেয়ঃ নয়। কারণ, গীতার কথায়—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

আমরা আরও দেখিতেছি যে, যাকে আমরা জাতি বলি, যেমন হিন্দু জাতি গ্রীক জাতি, ইহুদি জাতি, ইংরেজ জাতি ফরাসি জাতি—এ সব জাতি ব্যক্তির রাশি মাত্র নয়, এরা ব্যক্তি পুঞ্জের এক একটা সুতনিদ্ধ সংযোগ বা Organised unity—এক একটা সংঘাত বা Organism ; আর এই সকল Organism বা সংঘাতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বকীয় ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যই তাহার 'স্ব'। হিন্দু জাতির 'স্ব'টা কি?

ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে যে, খেলোয়াড়ের চেয়ে দর্শকেই খেলাটা ভাল ক'রে দেখতে পায়। হিন্দুজাতির জীবননাটকের অভিনয় নিগূঢ়ভাবে দর্শন ক'রে একজন ভারত প্রবাসী প্রবীণ মিশনরি (ডক্টার মিলার) লিখে গেছেন যে, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য এক কথায় বলতে বলতে হয়—The Immanence of God and the Solidarity of Man। কথাটা বেশ খাঁটি কথা, খুব সত্য কথা। ধর্ম্মের অভিমানে ও বিজেতার আভিজাত্যে অনেকেরই চক্ষে পরদা পড়ে' থাকে—সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা সেই পরদা ভেদ ক'রে এই পাদরিপুঙ্গব যে একটা আর্য্য সত্যের সাক্ষাৎ কর্ত্তে পেরেছেন, এবং সাহস ক'রে তা' প্রকাশ করেছেন, এটা কম বাহাদুরি নয়। যা হ'ক কথাটা একটু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা যাক। Immanence of God—অর্থাৎ চরাচর, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মের অনুস্যূতি (Pervation বা Permeation) এটা হিন্দু সাধনার একটা মূর্দ্ধা কথা—মূল উপদেশ। উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি বেদীতরগ্রন্থের মধ্যে এ কথা সর্ব্বত্র ধ্বনিত দেখা যায়। দু' চারিটা বচন উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে।

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ—তৈত্তি ২।৬ 'জগৎ সৃষ্টি ক'রে ব্রহ্ম তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'লেন।'

ভূতেষু চরতি প্রবিষ্টঃ—মৈত্রী ৫।২

'তিনি ভূতের মধ্যে প্রবেশ করলেন।'

ঘৃতস্য ইব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্—ব্রহ্মবিন্দু, ২০

'দুধের মধ্যে ঘৃত যেমন প্রচ্ছন্ন হ'য়ে বাস করে, তেমনি ক'রে সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বাস করেন।' সেই জন্য তাঁকে বলে 'সর্ব্বভূতাধিবাস'। তিনি সকলের অন্তরে অথচ বাহিরে—তিনি বিশ্বানুগ (Immanent) অথচ বিশ্বাতিগ (Transcendent)।

তদ্ অন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যত :—ঈশ ৫

ইত্যেষো আত্মা অন্তর্বহিশ্চ—মৈত্রী ৪।২

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্—গীতা ১৩।১৫

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা

অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণ স্থিতঃ ॥

নারায়ণ উপনিষদ—১৩ অনুবাক

'জগতে যে কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, সে সমস্তের অন্তরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন এবং তিনি সে সমস্তের বাহিরেও আছেন।'

নারায়ণ ভগবানের নামান্তর।

গীতা এ সকল কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন :—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদ্ অব্যক্ত মূর্ত্তিনা

'অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ভগবান সমস্ত জগৎ ব্যেপে আছেন।'

ইহা ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন কথা—

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্।

পুরুষ সূক্ত আরও বলেছেন :—

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্।

অর্থাৎ ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বে অনুপ্রবেশ করলেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর সত্তা নিমজ্জিত হ'য়ে গেল না। কারণ,—ঋতো জ্যায়ান্ চ পুরুষ :—বিশ্বানুগ হ'লেও তিনি বিশ্বাতিগ। তাই যদি হয়, ব্রহ্ম যদি সর্ব্বঘটে বিরাজিত থাকেন—তা হ'লে ?

সন্মূলম্ অন্বেচ্ছ। সন্মূলাঃ সোম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

—ছান্দোগ্য ৬।৮।৪

'হে বৎস! সৎরূপ মূলের অন্বেষণ কর। সমস্ত জাত বস্তুর সৎই মূল, সৎই আশ্রয়, সৎই প্রতিষ্ঠা।

স য এষ অনিমা এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো।

—ছান্দোগ্য ৬৮.৭

'যে সেই অনিমা, তদাত্মক এই সমস্ত, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। তুমিই তিনি, হে শ্বেতকেতু।'

এইখানে আমরা ডক্টার সিলারের দ্বিতীয় উক্তির—Solidarity of mankএর মূল সূত্র পেলাম। যদি এ কথা ঠিক হয় যে, সকল জীবের মধ্যে ভগবান বাস করছেন—সর্ব্বত্র চাহং

হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (গীতা)— তবে ত' মানুষের দেহ প্রকৃতই ব্রহ্মপুর (Tabernacle of God), সত্যিকার দেবালয়। হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে :—

তস্মিন্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম—ছা, ৮।

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ যো জীবঃ স সদাশিবঃ

'দেহ হয় দেবালয়, তাহে সদাশিব রয়।' একথা যদি ঠিক হয়, তবে ত' কেহই হীন নয়, মলিন নয়, হেয় নয়, ঘৃণ্য নয়, পতিত নয়, ধিক্কৃত নয়, অনাথ নয়, আতুর নয়—সকলেই ত' সচল জগন্নাথ। অতএব

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।

ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্ ইতি॥

'বহুমান সহকারে, সম্ভ্রমের সহিত এই সমস্ত জীবকে নমস্কার করবে। কারণ, ভগবানই জীবরূপে তাদের মধ্যে প্রবিষ্ট রয়েছেন।'

গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ—এই তোমার আমার দেহে পরমেশ্বর বাস কর্চ্ছেন। অতএব উচিত কি? প্রপুষ্য পুরুষং দেহে—সেই পুরস্থায়ী পুরুষকে এই পুরীতে অর্চ্চনা কর।

ইউরোপ আমাদের শিখাচ্ছে বটে—"All men are born equal"—'সব মানুষ জন্মগত সমান'। এ' কথা হয়তো সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কারণ আধারের আবিলতায় অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্যোতির স্পষ্ট প্রকাশ হয় না; কিন্তু তাহা হ'লেও মূলতঃ, তত্ত্বতঃ সব জীবই ব্রহ্ম। প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান বসতি করছেন। যেমন অগ্নি থেকে বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাগ্নি থেকে জীবরূপ চিৎকণা সকল বিচ্ছুরিত হয়েছে। একদিন এই সমস্ত স্ফুলিঙ্গই অগ্নিরূপে বিকশিত হবে—সমস্ত জীবই এ রসামৃত—সিন্ধুর বিন্দু সেই সিন্ধুতে সম্প্রসারিত হবে। তখন তারা বেদের মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করে বলতে পারবে—

"সোঽহং" "অহং ব্রহ্মাস্মি।"

যে জীব ব্রহ্মচক্রে বিবর্ত্তিত হয়ে এখন প্রবৃত্তিমার্গে ভগবদ্‌বিমুখ হয়ে আছে, সেই নিবৃত্তি মার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হ'য়ে অচিরে ভগবানের সম্মুখ হ'বে এবং চরমে গন্তব্যস্থানে ফিরে যাবে। শুধু মানুষ নয়, কৃমি কীট পর্য্যন্তও স্ব সদনে প্রত্যাবর্ত্তন করবে'। এই কথার ইঙ্গিত পেয়ে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছেন—From God who is our Home.

ইহাই বিবর্ত্তন, জীবের ক্রমাভিব্যক্তি—জীব যে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বীজরূপে উপ্ত হয়, ব্রহ্মরূপে তার চরম সার্থকতা। জীবের এ নিয়তি একদিন না একদিন পূর্ণ হবেই হবে। যতদিন না হয় ততদিন আমাদের স্মরণ রাখা ভাল যে, আধারের প্রভেদে আধেয় ভিন্ন হয় না। সেই জন্যই বেদের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি', "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। সেই জন্যই উপনিষদের ঋষি তারস্বরে ঘোষণা করেছেন, ব্রহ্মদাশাঃ ব্রহ্মকিতবাঃ। কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্রহ্ম নয়; দীনহীন, মূর্খ, স্খলিত, আর্ত্ত, পীড়িত সকলেই ব্রহ্ম। সেই জন্য গীতা পাশ্চাত্য Social Equalityর এক গ্রাম উপরে উঠে বলেছেন :—

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নয়, এমন কি শুধু অন্ত্যজ, চণ্ডালও নয়, গরু, কুকুর, হাতি—তত্ত্বদৃষ্টি যাঁর আছে তিনি এদের মধ্যেও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন।

অতএব ডাঃ মিলার যাকে Solidarity of man বলেছেন, সেই 'জীবসংগ্রহের' এর চেয়ে আর প্রশস্ত ভিত্তি কি হতে পারে?

বস্তুতঃ এই দু'টী ভাব হিন্দু জাতির মজ্জাগত—প্রকৃত স্ব—ভাব। এই ভাবে যে যতদিন ভাবিত ছিল, ততদিন কেউ তাকে খর্ব্ব করতে পারে নি। আজ যে আমরা দেশের মধ্যে ছুঁৎমার্গের প্রাদুর্ভাব দেখছি—আজ অস্পৃশ্য সমস্যা (Untouchability) ও Pariah Problem (প্যারিয়া প্রবলেম) আমাদের সম্মুখীন হয়েছে—হিন্দু জাতিকে স্ব ভাবে ভাবিত না করতে পারলে, স্বধর্ম্মে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে, এর কিছুতেই সমাধান হবে না। জাতীয় জীবনে যে অন্ধকারের সঞ্চার হয়েছে, রাজনৈতিকদের আতস বাজিতে এ অন্ধকারে কোনদিন আলোক ফুটবে না। আমরা চাই সেই প্রাচীন আলোকবর্ত্তিকা যাহা একদিন এ দেশের তমঃ নাশ করেছিল।

যে ব্যক্তি বা জাতি ঐ ভাবে ভাবিত হয়, সে ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের ঘনিষ্ঠতা —Immanence of God and Solidarity of Man—অনুভব করতে পারে, তার মন থেকে গণ্ডী ও গোষ্টির সংকীর্ণতা দূর হয়—একটা উদাত্ত উদার সুর তার চিত্ত-বীণায় নিয়ত ঝঙ্কৃত হ'তে থাকে; সে দ্বৈপায়ন (Insular) থাকতে পারে না, বিশ্বায়ত (Universal) হয়, জাতীয়তা বা Nationalismএ তার হৃদয় ভরে না, সে অন্তর্জ্জাতিকতা বা Internationalismএর জন্য উৎসুক হয়। • এবং চরমে এ ভাব বদ্ধমূল হলে বিশ্বজনীনতায় বিভোর হয়ে বলতে থাকে :—

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মনুষ্যাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

যে জাতির মধ্যে এ ভাব সাধনা আংশিকভাবেও সিদ্ধিলাভ করে, (যেমন হিন্দু জাতির মধ্যে করেছিল) তারা কাহাকেও, কিছুকেও বর্জ্জন করে না—সমস্তকে গ্রহণ করে এবং

• সুখের বিষয় সেদিন লণ্ডনে লোকার্ণো সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে গিয়ে পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি এ কথার প্রতিধ্বনি করেছেন :—

Count Skrizynski, the Polish Premier, cited the words of one of Poland's great men of letters that "love of country must be augumented, amplified, and beautified, by love of humanity, and love of country must never turn against humanity."

গ্রহণ ক'রে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আত্মসাৎ ক'রে নেয়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা বিরাট বুভুক্ষা একটা সর্ব্বগ্রাসী গ্রহিষ্ণুতা থাকে। তাদের কোন কিছু ত্যাগ করবার দরকার হয় না, কারণ তারা সমস্তই গ্রাস করতে পারে—তাদিকে আপনার চারিদিকে বেড়া দিয়ে বেষ্টনীর মধ্যে কায়ক্লেশে আত্মরক্ষা করতে হয় না (যেমন ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও আপান করত); কারণ সে স্ব-ভাবে এমন অচল প্রতিষ্ঠ থাকে যে, পৃথিবীর যত ভাবনদী ও কালচার প্রবাহিনী তাদের মধ্যে অবাধে প্রবেশ ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়।

আপূর্য্যমাণমচল প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

* * *

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে।
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়॥

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের ধারার অনুসরণ করলে, এ সত্যের সমর্থন পাওয়া যায়। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ যখন আর্য্য জাতি এই ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হল, তখন তারা একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির ও ভিন্ন রকমের সভ্যতার সংস্পর্শে এল। কিছুদিন দ্রাবিড়দের সঙ্গে খুব সংঘর্ষ চল্‌ল—অনার্য্য জাতি 'দাস' 'দস্যু' এই সব আখ্যায় আখ্যাত হতে লাগল। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যে অনার্য্যেরা আর্য্য সমাজের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করলে—এমন কি অনার্য্য দেবতারা পর্য্যন্ত আর্য্যদের মণ্ডলীর মধ্যে আসন পেতে বসল। কিছুদিন পরে শোনা গেল যে আর্য্যদের যে 'শেবধি'—সাধনার নিধি বেদ—শূদ্রদের তা থেকেও বঞ্চিত করা হবে না।

যথেমাং বাচং কল্যাণীম্ আবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চরণায়॥

—যজুঃ, ২৬ ২

আপস্তম্ব তখনকার আর্য্যসমাজে প্রচলিত রীতির অনুসরণ ক'রে সূত্র করলেন—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণম্ আপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।

মনুসংহিতা আরও খুলাখুলি বলিলেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।

তারপর কত জাতি কত সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রবেশ করলে—ইরাণ এল, তুরাণ এল, গ্রীক এল, শক এল, হুন এল, পহ্লব এল, দরদ এল, পাঠান এল, মোগল এল—কিন্তু তারা কেহই হিন্দু সভ্যতাকে নষ্ট করতে পারলে না। বরং ঐ সকল cultureএর সংস্পর্শে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন আরও সম্পন্ন আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এর কারণ কি? কারণ ঐ হিন্দু জাতির গ্রসিষ্ণুতা। যখন ইস্‌লামের বৈজয়ন্ত প্লাবনে এশিয়া প্লাবিত হল—প্রাচীন ইরাণী জাতি ও ইরাণীয় সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল, মিসর, তুরস্ক, আভার, মেসো-

পটেমিরা, মোঙ্গলিয়া ইস্‌লামকে বরণ ক'রে নিলে, কিন্তু ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে সেই ইসলামের প্রভাব স্তিমিত স্থগিত হ'য়ে গেল। শত চেষ্টাতেও মোগল পাঠান হিন্দুকে লুপ্ত করতে পারলে না। ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কি দেখতে পাই? ধীরে ধীরে হিন্দু 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পারসিক, গ্রীক প্রভৃতির ন্যায় পাঠান মোগল সভ্যতাকেও আত্মসাৎ করেছে। ইংরেজ কার কাছ থেকে রাজ্য নিয়েছে? মোগলের দুর্ব্বল হস্ত থেকে রাজদণ্ড পূর্ব্বেই খসে পড়েছিল। একদিকে পাঞ্জাবে শিখ, ওদিকে রাজপুতনায় রাজপুত জাতি, অন্যদিকে দক্ষিণে মহারাষ্ট্র। এইরূপে প্রায় ৮০০ বৎসর সংগ্রামের পর আবার হিন্দু নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। কেন পেরেছিল? তাদের যে বিশিষ্টতা সেটা রক্ষা করেছিল বলে পেরেছিল। তা না হ'লে হিন্দু জাতির এতদিন বেঁচে থাকবার যোগ্যতা হত না। হিন্দু ইতিহাস যদি মোগল পাঠানের হীন অনুকরণ হত, তবে হিন্দু জাতি বাঁচতে পারত না। কিন্তু মোগল পাঠানের সঙ্গে সংগ্রামে যখন হিন্দু বিজয়ী হল, তখন বিধাতা তার অদৃষ্টে আর একটা তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করলেন। সেটা ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সংগ্রাম।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল যে এতদিন হিন্দু আত্মরক্ষা করিতে পেরেছিল, কিন্তু এবার এমন সভ্যতার সংঘর্ষে এসেছে বুঝি এবার তাকে পর্য্যুদস্ত হতে হবে। যাঁরা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর 'একাল ও সেকাল' গ্রন্থ মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তাঁরা এ আকাঙ্ক্ষাকে অমূলক মনে করিবেন না। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন কর্ণেল অলকট ও ম্যাডাম ব্লেভাট্‌স্কি কলিকাতায় প্রথম বার আসেন তখন কর্ণেল অলকট এক বক্তৃতায় বলেছিলেন 'চারিদিকে অনেক B. A's and M. A's দেখিতে পাচ্ছি তাদের আমি Bachelor of Arts ও Master of Arts জ্ঞান করি না। তারা প্রকৃত পক্ষে Bad Aryans ও Mad Aryans।' কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। আমরা নিজের দেশের ইতিহাসে ধর্ম্মশিক্ষা, সাধনা, বিশিষ্টতা, বৈলক্ষণ্য সব ভুলে যাচ্ছিলাম, হৃদয়কে বন্দী করিলে যেমন হয়, আমাদের তেমনি দশা ঘটিল। কিন্তু এখন আমরা কি দেখিতে পাই? যে রকম ক'রে হিন্দুসভ্যতা ভারতের ইতিহাসে ৮ শত বৎসর সংগ্রামের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আবার সেই সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর মানে এ নয় যে ইউরোপের শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন কিছুই নেব না, সমস্তই ত্যাগ করিব; তা নয়। অসহযোগ ভারতের ধাত, তা নয়। ভারতবর্ষের ভিতর যে একটা বিরাট গ্রসিষ্ণুতা আছে, সেই শক্তি বলে সে সমস্ত জিনিষকে গ্রাস ক'রে আত্মসাৎ ক'রে নেবে। পশ্চিমের দর্শন বিজ্ঞানকে আমরা ভারতীর ভারতীর শুদ্ধদাসী ক'রে রাখবো। বর্জ্জন করিলে কি হ'ল? এই যে বৈদিক যুগের হিন্দুসভ্যতা—শিবাজীর সময় পর্য্যন্তও যে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, কত জাতি এদেশে এসেছে; তারা এসে নিজেদের বিজয়স্তম্ভ প্রথিত করিতে চেষ্টা করেছে; হিন্দু তাদের সম্বন্ধে কি করেছে? তাদের সভ্যতার যেটা গ্রহণীয় সেটা সংগ্রহ করেছে এবং এতদ্বারা হিন্দু সভ্যতা আরও মহীয়ান্, আরও বলীয়ান্

হয়েছে। বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায় যদি স্বীকার করিতে হয়, এ সংসার যদি দৈবের রচনা না হয়, তবে হিন্দু সভ্যতার এই মৃত্যুঞ্জয়ত্বের মধ্যে একটা নিগূঢ় সত্য আছে, একটা প্রচ্ছন্ন নিয়তি আছে। বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট সেই নিয়তির অনুসার হিন্দুকে করতেই হবে। নিজের নির্দ্দিষ্ট নিয়তির পালন করিতে পেরেছে বলেই হিন্দুজাতি এখনও জীবিত আছে। সেই পথে থেকে যদি আমরা ভ্রষ্ট হই, তবে হিন্দুজাতি থাকিবে না। যদি হিন্দুসভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ হয়, হীন, অধম, অক্ষম অনুকরণ হয়, তবে এ জাতিকে রাখবার দরকার নেই। যদি বৈদিক যুগ থেকে হিন্দুজাতির ইতিহাস আলোচনা করি, তা হ'লে দেখবো এ জাতির কাছে এখনও জগতের অনেক কিনিষ শেখবার আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে দেখিতে পাচ্ছি, একটা বিপুল বিতণ্ডা চলেছে। অভিজাত ও অবজাতির মধ্যে কলহ, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সমাজের সকল স্তরে একটা বিপ্লবের, একটা অস্বস্তির আগুন জ্বলে উঠেছে, যেন এর শেষ নাই। এই পাশ্চাত্য জাতিদের জীবন যদি সমঞ্জস করতে হয়, তা হ'লে যে আদর্শ প্রাচীনকালে ঋষিরা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; যতদিন সেই বর্ণাশ্রম আদর্শ ইউরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন তাদের মঙ্গল হবে না। ভাববেন না আমরা সে আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি; পারি নাই বলিয়াই আমাদের অধঃপতন হয়েছে। হিন্দু আদর্শ একটা monastic আদর্শ নয়। প্রাচীন হিন্দুদিগের শুধু পরলোকের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, জগতের দিকে তাদের চোখ উদাসীন ছিল একথা সত্য নয়। আমাদের শাস্ত্র বলেছে,—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, ত্রিবর্গেরই সেবা করবে।

ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ
যোঽেকসক্তস্ত্রয়ে স জনো জঘন্যঃ।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বলেছেন, অর্থ ও কামের উচ্ছৃঙ্খল অনুধাবন একেবারেই শ্রেয়ঃ নয়। তাই তাঁরা আর্য্য জীবনকে চারি আশ্রমে সুবিন্যস্ত করেছিলেন—ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহীভবেৎ, গৃহীভূত্বা বনীভবেৎ, বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ। Die in harness—বল্গা কামড়ে মৃত্যু, সাঁজোয়া পোরে মহাশয্যা—এটা তাঁদের আদর্শ ছিল না। এইসব ভেবেই তাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন আমরা বর্ণও হারাইয়াছি ও আশ্রমও হারাইয়াছি।

"চতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"—একথা যদি সত্য হয় তবে সমস্ত জগতে চতুর্ব্বর্ণ থাকতেই হবে। চতুর্ব্বর্ণ সমাজই আদর্শ সমাজ। এমন সব লোক আছে, যাদের ভিতর সত্ত্বগুণ প্রধান, তারা ব্রাহ্মণ। যাদের মধ্যে রজঃগুণ প্রধান, তারা ক্ষত্রিয়। যাদের রজঃগুণ তমের অনুবেধ, তারা বৈশ্য; আর যারা তমঃ প্রকৃতি, তারা শূদ্র। শূদ্র প্রকৃতি শূদ্র জাত নয়। চতুর্ব্বর্ণের গুণ বৈষম্যেই কর্ম্ম বিভাগের ভিত্তি।

পৌরাণিক গ্রন্থে আমরা অনেক উদাহরণ পাই, যেখানে স্বভাবের বলে কেহ ব্রাহ্মণ প্রকৃতি পেয়েছে, কিন্তু কর্ম্মফলে অন্য বর্ণে জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের তাঁরা তুলে নিতেন। এইরূপ

চতুর্বর্ণ বিভাগ দ্বারা তাঁরা মনুষ্য সমাজ সুবিন্যস্ত এবং চারি আশ্রমের প্রতিষ্ঠান দ্বারা মানব-জীবন সমঞ্জস করেছিলেন—মানুষে মানুষে একটা খামখেয়ালি বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী করেননি।

এই তথাকথিত সাম্য যুগে এ সকল কথায় হয়ত অনেকেই কর্ণপাত করবেন না, অতএব এর সম্প্রসারণ কর্তে চাই না ; বিশেষতঃ এটা এখন কতকটা অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু মুখ্য কথা এই যে ভারতকে নিজের স্ব-ভাব থেকে চ্যুত হ'লে চলবে না। সেই ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের ঘনিষ্ঠতা—Immanence of God and Solidarity of man—আঁকড়ে থাকতে হবে। যদি আমরা ঐ মহান্ আদর্শ ভুলে যাই, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হই, তবে কখনই কল্যাণ হবে না। হিন্দুজাতির হৃদয়তন্ত্রীতে যে সুর বেজেছিল, সে সুর বাজাবার জন্য হিন্দুজাতিকে ভগবান এতদিন জীবিত রেখেছেন। সেই ঝঙ্কার জাতীয় হৃদয় বীণাতে আবার ঝঙ্কৃত করতে হবে, তা না হ'লে হিন্দুজাতির বেঁচে লাভ কি ?

হিন্দুজাতির সমবেত চিত্তে যেদিন ঐ সুরের ঐকতান বেজে উঠবে, সেই দিনই আমরা নিজেদের 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত হব—সেইদিনই দেশের মধ্যে প্রকৃত 'স্ব'-রাজের প্রতিষ্ঠা হবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

রবি-রশ্মি

বিশ্বভারতীর পরিচয়

আমরা এই সংসার চক্রের মধ্যে যখন ঘুরি, তখন বিশ্বব্যাপারের একটা অংশ মাত্র হয়ে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু মানুষের একটা বিশিষ্টতা আছে, সে একদিকে যেমন জ্ঞানের বিষয় অন্যদিকে তেমনি জ্ঞাতা, তাই সে আপনাকে তথ্যরাশির মধ্যে হারিয়ে ফেলে না, সত্যের মধ্যে উদ্ধার করে নিতে পারে।

এবার অসুস্থ শরীর নিয়ে মৃত্যুর পশ্চিম কূলে বসে ম্লান প্রাণের আলোকে অত্যন্ত জীবন যাত্রা থেকে দূরে আপনাকে ও বিশ্বকে দেখবার অবকাশ পেয়েছিলুম। কলিকাতায় যেখানে ছিলুম সেখানে সহরের পাথরে-বাঁধানো শুষ্কতা ছিল না, চারিদিক গাছ পালায় ছিল শ্যামল। সেখানে এবার অনেকদিন পরে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন স্পষ্ট করে দেখতে পেলুম। হঠাৎ গাছপালায় ত্রস্ততা ছুটে গেল, বিশ্বযজ্ঞের নিমন্ত্রণ তাদের কাছে এসে পৌঁছল, সাজসজ্জার সাড়া পড়ে গেল ; কিকে সবুজে গাঢ় সবুজে, নীলে লালে সোনালীতে প্রত্যেকে নিজের

বিশেষত্ব নিয়ে আনন্দিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে এল; দেখে আমার মন পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল। কোথা থেকে এ ডাক এল; যার সাড়া সমস্ত পৃথিবীর বুক থেকে উঠছে! আকাশের কোন্ সুদূর অনন্ত চঞ্চলতা দক্ষিণ হাওয়াকে ব্যাকুল করে তুলেছে। তরুলতার প্রাণশক্তি রূপের ধারায় দিকে দিকে বিচিত্র হয়ে উঠল! প্রত্যেক গাছ আপনার স্বরূপকে পরিস্ফুট করে তুল্‌ছে। প্রাণ যেখানে আপন বিশেষত্বের ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্য, সেইখানে সে বিশ্বকে উদারভাবে আহ্বান করে। একধারে অশথ, তারি পাশে শিরীষ, তারি পাশে কাঞ্চন—তারা সকলেই রূপে স্বতন্ত্র অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতা-তেই তাদের পরস্পরের ভাবের মিল। আকাশ-বীণার একই আলোকের সুরে তাদের নিজ নিজ বিভিন্ন রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে। অরণ্যব্যাপী প্রাণের আনন্দ-সঙ্গীতে তাদের অবিরোধ মিলন। প্রত্যেক গাছ আপনার বিশেষ আতিথ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আপন আত্মী-য়তা জানাচ্ছিল। তা না হলে গাছ দেখে আমার মনে কোনোভাব আসত না। যখনই সে নিজেকে পূর্ণ করলে, তখনই সে আমাকেও আহ্বান করলে—তার আপনার পূর্ণতা আমারও পূর্ণতাকে উদ্বোধিত করলে।

বসন্তে এই পূর্ণরূপকে যেমন বাইরে থেকে দেখলুম, তেমনি আমাদের এই বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানটিকে তখন দূর থেকে দেখবার একটী অবকাশ হয়েছিল। চঞ্চল বর্ত্তমানের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমাদের দৌড়ে চল্‌তে হয় তখন অতি-প্রত্যক্ষের নিকট ধাক্কায় নিখিল সত্যকে সমগ্র করে দেখবার সুযোগ পাইনে। তখন নিজের দৃষ্টির অসম্পূর্ণতাকে সত্যের প্রতি আরোপ করে' তাকেই অসম্পূর্ণ বলে জানি। কিন্তু যখন ঘটনা ও তথ্যের ভিতর একেবারে তলিয়ে ডুবে না থাকি, তখন সমাপ্তির সঙ্গে অসমাপ্তি, গোচরের সঙ্গে অগোচর এক হয়ে সত্যের বিশ্বরূপকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

কোনও মানুষ নিজের মধ্যে পূর্ণ নয়। সকলের সঙ্গে যোগের সত্যতাতেই সে সত্য। অহঙ্কার মানুষকে এই সত্য থেকে বঞ্চিত করে। ব্যক্তিগত মানুষের মধ্যে বিষের বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিকে আমরা রিপু বলে' বিপদ বলেই জানি—সমষ্টির মধ্যে তাকেই আমরা অনেক সময় ভাল বলেই মনে করি। সব মানুষের মধ্যে সব জাতির মধ্যেই এই মোহটি আছে—কিন্তু সে-মোহ অতিক্রম করবার কিছু না কিছু চেষ্টাও সর্ব্বত্র দেখা দিয়েছে। যে জাতিরা সঙ্ঘবদ্ধ তারা কেবলি স্বার্থ ও অহঙ্কারকে প্রকাশ করছে এ কথা সম্পূর্ণ সত্যের নয়, মানুষের মহত্তম সত্যকেও তারা কিছু না কিছু প্রকাশ করছে। যদিও ভূরি পরিমাণে বাধাও রয়েছে। এই বাধাকেই সংহত করে দেখা এবং দেখানো সহজ। তার অনেক সাক্ষী আছে, তারা অনেক প্রমাণ দিতে পারে যে, মানুষের প্রকৃতি ক্ষুদ্র, সে স্বার্থপর, সে পশুরও অধম। কিন্তু তবু মানুষের মধ্যে এই "না"এর দিকটাই কি সব? দেখিনি কি মানুষ পরের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েছে। শত্রুকেও ক্ষমা করতে হবে—এত বড় উল্টা কথাও যে বলেছে, মানুষ তাকে মেনেছে, তাকে প্রণাম করেছে। এই যে তার ধর্ম্ম অর্থাৎ তার প্রকৃতির মধ্যে

এইটিই যে চরম সত্য, মানুষ তা স্বীকার করেছে। অর্থাৎ বলচে বৃহতের মধ্যে গভীরের মধ্যে এই সত্যটি বড় হয়ে আছে। দূরং দৃষ্টিতে পৃথিবী যে কমলালেবুর মতই গোল এই সত্যকে হিমালয় পর্ব্বতের প্রত্যক্ষ উচ্চতাও যেমন অপ্রমাণ করতে পারে না—তেম্‌নি মৈত্রীই যে, মানুষের সবচেয়ে বড় সত্য, মহা মহা যুদ্ধ বিগ্রহ অনিশ্চিত স্বার্থের উৎপীড়নেও তার চূড়ান্ত প্রতিবাদ করতে পারে না।

বসন্তের বাতাসে কোথাও পাতা ঝরে কোথাও পাতা বেরয়, কোথাও বা কুঁড়ি, কোথাও বা ফুল দেখা দেয়। মানবপ্রীতির বসন্তের হাওয়া নিত্য বইচে, তবু সব গাছে কিশলয় জাগেনি বলে তাকে অবিশ্বাস করব কেন! একটা গাছে যখন নতুন পাতা ফুটে ওঠে তখন তাকে ত বসন্তের প্রামাণ্য সাক্ষী বলে ধরি,—মানুষের মধ্যে যেখি রক্তের আভাস দেখা দিয়েছে, সব জায়গায় সমান নাই বা হল তাতে যায় আসে না। সত্যের সেই বসন্তের আহ্বান আজ এসেচে মানব সমাজে। মানুষ যানবাহনের নানা সুযোগ পেয়ে পরস্পরের অত্যন্ত কাছে এসেছে। এই ঘটনাটী সফল হবার চেষ্টা নিশ্চয়ই সকল বিরোধের মধ্যেও ভিতরে ভিতরে কাজ করচে, কেননা সেইটেই যে মানুষের ধর্ম্ম। ছুটি একটি নবজীবনের কিশলয় এখানে ওখানে ফুটে ফুটে উঠ্‌চে, উপলব্ধি জাগ্‌ছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের ব্যাঘাতই পাপ, এই কথাটাকে বিশ্বাস করে না, এমন বড় বড় পালোয়ান পৃথিবীতে আছে। তারা আপন আপন অস্ত্র শানাচ্ছে, তাদের বিপুল আয়োজন, প্রভূত শক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারাই ক্ষণকালের, তারাই ক্ষুদ্রসীমার; বৃহৎ বাস্তবের মধ্যে, সমস্ত কালের মধ্যে তাদের স্থান নেই। অপর পক্ষে নাই রইল সৈন্য সামন্ত, নাই রইল অর্থ সামর্থ্য, তাদের দিকে বৃহৎ রয়েছেন, ব্রহ্ম রয়েছেন—নিত্যকালের মধ্যে তাদের দেখ, তারা সার্থক হয়েই আছে।

মানুষের ক্ষুদ্রতা দেখবিদেশে অদ্ভুতই বড়, পশুত্বই তার ধর্ম্ম এই কথাটি বলে' যারা সংসারে চলেছে তাদের দোষ দিতে পারি না, তাদের কথার জবাব দিতে পারি না। মানুষ মানুষকে যেমন করে মেরেছে তেমন পশুও মারেনি। তবুও সত্য এই যে, মানুষ মানুষ, পশু নয়। মানুষের মধ্যে বড় যাঁরা তাঁদের মধ্য দিয়ে তার বাণী ধ্বনিত হয়েছে, অতীত কালে তাঁরা যা বলেছেন অনাগত কালেও সেই বাণী অম্লান।

আমরা সত্যের দিকেই দাঁড়াব। সয়তান যতই বড় হোক, তার কুটিল হাতের শক্তি যতই থাক, তাকে শ্রদ্ধা করব না। আশা করি এই সঙ্কল্পই আমরা বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে পারচি। কেউ কেউ বলবেন ঐ সব বিশ্ব প্রভৃতি কথাগুলো অস্পষ্ট ভাবের বাষ্প; ওর আয়তন আছে, রূপ নেই; আয়তনের দ্বারা ভাব বড় হয় না, বড় ভাব যখন নির্দ্দিষ্ট রূপ পায় তখনই তার মূল্য। আমি কবিও সেইকথাই বলি, সেই হল আমাদের সাধনা।

এখানেও যেসব কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়েছে, তাকে কি—রূপকার যেমন করে পাথর

কেটে কেটে মূর্ত্তি গড়ে—আমরা তেমনি করে গড়িনি। দিনে দিনে এ যে আকারে পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে। অনেকে "বিশ্ব" শব্দ শুনলেই হাসে। যতক্ষণ তার অর্থ কেবলমাত্র শব্দের মধ্যে বাঁধা থাকে ততক্ষণ তা হাস্যকর হতেও পারে। কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বের ভাবটী কেবলমাত্র শব্দ নীহারিকা সৃষ্টি করে' ত নেই। নিকটের অশিক্ষিত গ্রামবাসীরাও আজ এর চারিদিকে এসে একত্র হতে পারছে, আবার দূর মহাদেশের শিক্ষিত পুরবাসীরাও। তাদের হৃদয় যে আমরা পেয়েছি সেত শুধু কথার দ্বারা হয়নি, ভাব কর্ম্মরূপ নিয়েছে বলেই তা দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হবার দিকে চলেছে। মানুষ কোনো না কোনো আকারে তাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চে বলেই তার চারিদিকে এসে জুটছে। আপন বাহু দেহের কাঠই ভাবের অন্তরের বাণী ফুটে উঠল—নইলে শূন্য হাওয়ায় হাহাকার কি কোনো মানুষকে নাম ধরে ডাকতে পারে? এ ডাক যাদের নিজে শোনবার শ্রদ্ধা বা অবকাশ নেই তারাই মনে করে যে, এ ডাক কোথাও বুঝি তাদের পেল না, কোনোখানেই বুঝি পৌঁছতে পারল না। কিন্তু সত্যের ডাক সম্বন্ধেই একথা খাটে যে, নিকটের অনাদরে বর্ত্তমানের অবজ্ঞায় তার ব্যর্থতা নেই, কারণ, কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী:।

বিশ্বভারতীর তিনটী পরিচয় আছে। একটী হচ্চে এর দেহটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের। আশ্রমে ছোট বড় যারা কেউ এসেছে তাদের ত্যাগের দ্বারা ভোগের দ্বারা, তাদের বাধার দ্বারা আনুকূল্যের দ্বারা, তাদের বাসনার দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা এর শরীর-প্রকৃতি বিশেষভাবে গড়ে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পরিচয়, এর মনঃপ্রকৃতি। ভারতের বেদের থেকে এ আপনার মন্ত্র গ্রহণ করেছে—সেই মন্ত্রটি হচ্চে "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং"—সত্যকে এ সেইখানেই সন্ধান করে যেখানে বিশ্ব একনীড়রূপে প্রকাশ পায়। এর তৃতীয় পরিচয়,—এর সম্বন্ধটা বিশ্বের। এর যা বিশেষত্ব তা বিশ্বকে স্বীকার করবার জন্যে, গ্রহণ করবার জন্যে। এর যদি নিজের কোনো বিশেষ রূপ না থাকত তাহলে বিশ্বের সঙ্গে এর যোগের কথা নিতান্তই ফাঁকা কথা হত। এর দেহকে গড়ে তোলবার জন্যে আমাদের প্রয়াস, এর মনকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে আমাদের সাধনা। এর লক্ষ্য হচ্চে মানুষের সঙ্গে মানুষের অহৈতুক আত্মীয়তার যে ঐক্য তাকেই বিশ্বাসের দ্বারা বাক্যের দ্বারা ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে ঘোষণা করা। বিশ্বভারতীর এই রূপটী ও এই বাণীটী সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে বলেই এখানকার গ্রামবাসীরা এত সহজে আমাদের কাছে আসতে পারছে, সহজে বুঝতে পারছে বেড়াতোলা স্বাতন্ত্র্যকে আমরা জানিনে। সেই জন্যেই দূর দেশ থেকে যে-সব অতিথি এখানে এসেছেন তাঁরা এখানে অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের স্বাদ পেয়েছেন। এই যে সার্থকতা এটা আমাদের কারো গড়া জিনিষ নয়। ভিতরের থেকে এ আপনাকে আপনি পূর্ণ করে তুলেচে, সেই জন্যেই এ আমাদের নিজেদেরও বিস্ময়ের বিষয়। আমাদের সঙ্কল্পের সমস্ত কৃত্রিমতাকে পাশ কাটিয়ে এ আপনার পথ আপনি প্রস্তুত করেচে। আমরা এ'কে তৈরি করিনি, আমরা এর দ্বারা তৈরি হয়ে উঠ্‌চি। দেশ বিদেশে একান্ত অনাস্থা ও বিরুদ্ধতার

দিনেও সত্যের প্রতি আমরা হত। দেখেছিলুম এইটুকু আমাদের পুণ্য ; সেই পুণ্যফলের একটু আশা রাখি। যে-সত্যের আমরা পূজা করেছি আমাদের মন্দিরে তাঁর প্রতিষ্ঠা স্পষ্ট দেখে যেতে পারব এইমাত্র আমাদের কামনা।

যখন তিনি অনভিব্যক্ত ছিলেন তখন কখনো তাঁকে বিশ্বাস করেছি কখনো বা মনে সন্দেহও জন্মেছে : ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়েছে, মানুষ নিষ্ঠুর, মানুষ স্বার্থপর এইটেই বুঝি মানুষের শেষ কথা। অদৃশ্য দক্ষিণ হাওয়া যেমন প্রথমে কোথা থেকে অরণ্যে একটি অস্ফুট বাণী নিয়ে আসে তার পরে সেই বাণী নিগূঢ় শক্তিতে পুষ্পে পল্লবে চারিদিকে বিচিত্ররূপে মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠে, যা কিছু ছিল সুপ্তির আচ্ছাদনে, অলক্ষ্য সোনার কাঠির স্পর্শে তাই যেমন প্রকাশিত হয়ে পড়ে, আমরা তেমনি যেন দেখ্‌তে পাই সত্যের বাণীর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেওয়া হয়েচে,—যা ছিল স্বপ্নের মধ্যে অবরুদ্ধ তাই জাগরণের মধ্যে উদ্ঘাটিত হ'ল ; বল্‌তে যেন পারি আমরা স্পষ্ট করে দেখেছি, জেনেছি ; চারদিকে অশ্রদ্ধার ঢেউ ও ঠ ত উঠুক, কিন্তু তারি মাঝখানে একটী বিকশিত পদ্মের উপরে দেবতা আসন গ্রহণ করেচেন এইটেই যেন আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

ভাববিলাসিতা বলে একটা রিপু আছে জানি ; সেই রিপুতে যাদের পেয়ে বসে তারা সত্যকে নেশার জিনিষ করে তুলে তাতেই অহরহ মত্ত থাক্‌তে চায়। বাইরে থেকে মনে হয় যেন তারা ভক্ত কিন্তু ফুলের ভিতরকার কীট যেমন ফুলের ভক্ত তারাও তেমনি। তারা আপনার ভোগের দ্বারা সত্যকে বিকৃত করে। সত্যে যার অশ্রদ্ধা সেও সত্যের তেমন শত্রু নয় সত্যে যার মত্ততা সে যেমন।

কেউ কেউ এমন কথা বলে থাকেন, যে, ভাব ভোগ করবার জন্যে এখানে আমরা একটা নেশার আড্ডা করেছি। অর্থাৎ এখানে সত্যকে রূপ দেবার সাধনা আমাদের নেই, সত্যকে ছুঁইয়ে রস নেবার বাসনাই প্রবল। দূরের থেকে যাঁরা অশ্রদ্ধাভরে এই অপবাদ দেন তাঁরা অশ্রদ্ধাভরে দূরেই থেকে যান, সুতরাং যে রূপটীকে আমরা দেখ্‌তে পেলুম সে-রূপ তাঁদের দেখাতে পারলুম না। ক্ষতি নেই, কারণ, নমস্কারের সঙ্গে যাকে দেখা উচিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকে দেখায় অপরাধ আছে। সত্যের সৃষ্টিক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত করচি, ভাবের কুহক-লোক নয়, এ কথা দেশসুদ্ধ সকলে অস্বীকার করলেও আমরা বঞ্চিত হব না।

আজকের দিনে, নববর্ষের আরম্ভের দিনে সেই-রূপটী দেখ, যে রূপ নানা আঘাতে অভাবে অপমানে, আমাদের নানা ত্রুটিতেও বড় হয়ে উঠ্‌ছে। এ'কে শুধু বাহিরের বস্তু বলে' দেখোনা, এ'কে অন্তর্নিহিত সত্যের প্রকাশ বলে' দেখ। আমি একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের এই লাইব্রেরী। এ ত ধনীর টাকায় হঠাৎ-তৈরি করা আড়ম্বরের জিনিষ নয়। এ যে বিশ্বভারতীর অঙ্গ হয়ে ধীরে ধীরে অভাবনীয় রূপে বেড়ে উঠেছে। আমাদের কাছে বিশ্বভারতীর সাধনা যত সত্য হয়েছে, লাইব্রেরীও সেই সত্যের জোরেই তত পূর্ণ হয়ে উঠেছে ; এমন একটী ভাবের দ্বারা এ পুষ্ট যে, অর্থের অভাবও এ'কে দরিদ্র করতে

পারেনি। বনস্পতির মত এ আপনার রস আপনিই আকর্ষণ করে নিয়েছে, বাইরে থেকে জল সেচন করতে হয়নি।

আমি ঘুরে সরে' গিয়েছিলুম বলেই আমাদের কাজের এই রূপটী আমার কাছে উজ্জ্বল হয়েছিল। ছোট খাটো খুঁটি নাটি তখন চোখে পড়েনি। এর যা তুচ্ছ সেগুলোকে মানুষ ধ্রুব করে রাখবে ভেবে, পাথরের পর পাথর গাঁথে, তার মধ্য দিয়ে অশ্বত্থ গাছ ওঠে। বিশ্বসত্যের মধ্যে যাকে পাই, মৃত্যু তাকে পুনঃপুনঃ প্রাণের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনে; নিয়ম লুপ্ত হতে পারে, বাইরের সব ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু তার বিনাশ নেই। আমাদের সংস্কার এমনি জড়পূজক যে, সে মনে করে বাইরের কঠিন উপকরণ দিয়ে সত্যকে সে রক্ষা করবে। কিন্তু প্রাণ যে সুকুমার, কাঁচা; তার মত ধ্রুব কে! সে মরাকে অবজ্ঞা করে। জড়তা যত ধ্রুবত্বের ভঙ্গী করুক না, সে লোপের দিকেই চলেছে। প্রাণকে বিশ্বাস করব। প্রাণবান সত্য চিরপরিবর্ত্তন-শীল, জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়ে তার আবির্ভাব হয়। সত্যের সেই চির-প্রবহমান অমৃতরূপের ধারা দেশে কোথাও প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না, তবুও সে মরুকে একটু একটু করে জয় করেছে। সেই শ্যামলতার বিজয়ীরূপকে রেখে দিতে পারি যেন আমাদের মধ্যে, সংস্কারের আচ্ছাদন সরে যায় যেন, দৃষ্টির উপর থেকে কুহক যেন কেটে যায়, চিত্তের উপর আবরণ যেন না থাকে। সত্যকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে তার জন্যে আমাদের ত্যাগ যেন সহজ হয়, আমাদের পূজা যেন আমাদের অন্তরের মধ্যেই সার্থকতার ফল দান করে। আমাদের বাণী সেবা কর্ম্ম ত্যাগ এই মহৎ সত্যের উপযুক্ত হোক্, বিশ্ব-বিধাতার কাছে এই আমরা আশীর্ব্বাদ চাই।

বর্ষশেষ

কাল শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে প্রবল ঝড় উঠেছিল। এই সূত্রে আবার আর একদিনের কথা মনে পড়ে গেল। ১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্ত্তে একটা প্রচণ্ড ঝড় দেখেছি। তখন আমি পদ্মাতীরে বিষয় কর্ম্ম ও সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত ছিলুম। এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা' কিছু পুরাতন ও জীর্ণ, তা'র আসক্তি-ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনি ভাবে, চির-নবীন-যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্য। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছেন। ঝড় থামল, বল্‌লুম, অভ্যস্ত কর্ম্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম এতে ত চিত্ত প্রসন্ন হল না। যে-আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায় তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়; ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার হিৎকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝ্‌লুম বেরিয়ে আস্‌তে হবে।

একদিন তাই নদীতীরের সেই ছায়া-সুশীতল আবাস পিছনে ফেলে আমাকে বড় বিশ্ব-ক্ষেত্রে আস্‌তে হল, আমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। আহ্বানটা যে কিসের, কোন্‌দিকে এর গতি

তখনো তা ভাল করে বুঝ্‌তে পারি নি ; পথে বেরিয়ে পড়েচি, গমাস্থানের কথা স্থিরভাবে বিচার করা হল না। পাঁচ সাত ছেলে নিয়ে গাছতলায় আসন করে আমার সাধ্যমত পড়াতে বসে গেলুম—মনে হল এমনি করে একটী কর্ম্মধারার নিয়ত আঘাতে জীবনের স্বার্থবেষ্টন ধীরে ধীরে ক্ষয় পেয়ে আস্‌বে। এমনি করে পাথরের সঙ্কীর্ণ গুহা থেকে ছোট ঝরণা বেরিয়ে এল, তখন সে আপনার নদীরূপ কল্পনাও করেনি। এই যে আমার নিষ্ক্রমণ, এর পরে আমার আর ফেরবার পথ রইল না—সংসারে আমার গৃহের দ্বার একে একে বন্ধ হতে লাগ্‌ল, মৃত্যুশক্তি প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সংসার আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। বিশ্বের মধ্যে জীবনের নূতন পর্ব্ব সুরু হল।

কালকের দিনে যে ঝড় তাকে সেদিনকার বর্ষশেষের ঝড়েরই পুনরাবৃত্তি বলে গ্রহণ করেছিলুম। কাল ঝড়ের অবসানমাত্রেই পশ্চিম দিগন্ত থেকে হঠাৎ উজ্জ্বল একটী রশ্মিরেখা আশ্রমের প্রান্তরকে এক মুহূর্ত্তের স্পর্শে উদ্ভাসিত করে দিল। সুন্দরের রুদ্রবেশ সহসা খসে পড়ল, তিনি ক্ষণ কালের জন্য সন্ধ্যাকাশে দাঁড়িয়ে আমাদের রুদ্ধদ্বারে আলোকের আঘাত করলেন,—বল্‌লেন "আমি এসেছি, আমাকে গ্রহণ কর"। আকাশে যেন বেদমন্ত্র বেজে উঠ্‌ল "আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি"। যিনি সত্য তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। ঝড়ের শেষে বাণী এল তিনি যেন সেই আনন্দরূপেই আমাদের জীবনে আমাদের কর্ম্মে প্রকাশ পান। যে সব আবর্জ্জনা আমাদের আপনার মধ্যে জমা হয়ে উঠে সেই প্রকাশকে আবৃত করে, প্রলয় এসে তাকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিক্। বর্ষশেষের সায়াহ্নে যে-অবসানের সুর বেজে উঠেছে তার মর্ম্ম কথাটাও এই।

অবসান ত শূন্যতা বলে আপনার পরিচয় দিতে আসে নি। জীর্ণকে সে সরিয়ে দিতে চায়, পূর্ণের নবীনরূপ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করবার জন্য ; মৃত্যুর আচ্ছাদন ছিন্ন করে দেয়, সত্যের অমৃতরূপকে তার অসীম সিংহাসনে বসিয়ে দেখার জন্য। কালকের ঝড় প্রথমে ধূলো উড়িয়ে অন্ধকার করে দিলে, শুক্‌নো পাতায় দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল—কিন্তু এইখানেই ত থাম্‌ল না,—সোনার সিংহদ্বার খুলে গেল, দেখা দিল একটী নির্ম্মল আলোকের ছটা। এসেই ত জানিয়ে গেল বর্ষ-শেষের আহ্বান, অবসানের পরপারের কথা। সে বলে গেল আনন্দরূপকে আপন জীবনের মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে যদি প্রকাশমান করতে চাও তবে তার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। এই জায়গা করে দিতে পারে বৈরাগ্যে। একবার সব ধূলো ঝেঁটিয়ে দিতে হবে, শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিতে হবে ; সব জঞ্জাল সব জঞ্জাল পুড়িয়ে দেওয়া চাই। একবার বর্ষ অবসানে বৈরাগ্যের ঝড় আসুক তার পরে নববর্ষের আনন্দ আলোক নির্ম্মল হয়ে দেখা দেবে।

উপনিষদে আনন্দরূপের এই প্রকাশকে তিন দিক থেকে দেখছেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে, লোকালয়ে, আত্মায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে তিনি শান্তং লোকালয়ে শিবং আত্মায় অদ্বৈতং। এই তিন ভাবের মধ্যেই দেখতে পাই সংযম, যাকে বলেচি বৈরাগ্য। বিশ্বপ্রকৃতিতে নানা

শক্তির যে আন্দোলন চলচে তাতে আকাশ ব্যাপ্ত করে প্রলয়ের সংঘাত আনচে না তো। সকল প্রকার গতির মধ্যে শান্তিকেই দেখচি। তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিমাণ রক্ষা হচ্চে। যেখানেই অসামঞ্জস্য এসে পড়ে সেখানেই দরবারে মামলা কাটা যায়।

বিশ্বসম্বন্ধের মধ্যে অসংযমই হচ্চে রিপু, এতেই বিনাশ এসে পড়ে। সম্বন্ধের মধ্যে যেখানে শান্তি সেইখানেই আনন্দরূপের প্রকাশ, সুন্দরের আবির্ভাব। লোকালয়েও তাই মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের সামঞ্জস্যকেই বলি কল্যাণ—তার ত্রুটি যেখানে সেইখানেই কুৎসিত, সেইখানেই দুঃখ, আনন্দরূপ সেইখানেই প্রকাশে বাধা পায়। সেইখানেই বারেবারে বিপ্লবের ঝড় এসে পড়ে। আত্মার মধ্যে অদ্বৈত বোধ পরাস্ত হয় কোথায়? কোথায় অন্যের সঙ্গে মিলনের দ্বারা আপনার সত্যকে উপলব্ধি করতে বিঘ্ন ঘটে? যেখানে অহঙ্কার উদ্ধত হয়ে থাকে, যেখানে লুব্ধ স্বার্থপরতা অসংযত। আত্মার মধ্যে সত্যের আনন্দরূপ প্রকাশ পায় সেইখানেই যেখানে ত্যাগের দ্বারা প্রেম আপনাকে সার্থক করে। যেখানে বৈরাগ্য অনুরাগের আসন পেতে দেয়।

প্রকৃতির সঙ্গে যোগরক্ষাকে আমাদের আশ্রমে আমরা কখনই অবজ্ঞা করিনি। আমাদের গানে আমাদের উৎসবে নানা উপলক্ষ্যেই আমরা বিশ্বের হৃদয়বাসী সুন্দরকে অভ্যর্থনা করে থাকি। কিন্তু এই কথা বারবার আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অন্তরের মধ্যে কেবলমাত্র রসভোগের দ্বারা সুন্দরের উপলব্ধি নয়—সেবার দ্বারা সাধনার দ্বারা সুন্দরকে উদ্বোধিত করে তুলতে হয়। যেখানে অজ্ঞান, আলস্য, ঔদাসীন্য সেখানে কুৎসিত। মরুর আবরণ ভেদ করে শ্যামলকে উদ্ধার করতে হয়। তাতে বুদ্ধি চাই, জ্ঞান চাই, বীর্য্য চাই। এখানকার গাছপালা পশু পাখীর সঙ্গে আমাদের সাধনার সম্বন্ধ নানা কর্ম্মের দ্বারা সার্থক করে তুলতে হবে। আমরা জ্ঞানময় কর্ম্মের যোগে সুন্দরের সত্যকে যথার্থভাবে জানি, আমরা প্রীতিময় সেবার দ্বারা সত্যের সৌন্দর্য্যকে যথার্থভাবে ভোগ করি। দুর্ব্বল যে সে কখনও সুন্দরকে পায় না। আমাদের শ্রীহীন সুখহীন প্রাণহীন গ্রামগুলিতে গেলে কি এইটেই আমরা বুঝতে পারিনে? সেখানে যা কিছু অসুন্দর, অপূর্ণ, তা নিয়ে কার সঙ্গে আমাদের লড়াই, নিজের সাধনাহীন কর্ম্মহীন চিত্তের জড়ত্বের সঙ্গেই কি নয়?

তাহলেই বোঝা যায় দেশের বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আনন্দ রূপের প্রতিষ্ঠা করতে যদি চাই, সেখানে যিনি শান্তং তাঁকে যদি উপলব্ধি করতে যদি চাই তাহলে যিনি শিবং লোকালয়ের মধ্যে তাঁর আসন নির্ম্মাণ করতে হবে। দুইয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগ। এই জন্যই আমাদের দেশে যে বিশ্বশক্তিকে আমরা শ্রী বলি তার মধ্যে সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ এক হয়ে আছে। আনন্দের যে শক্তি বাহিরের প্রকৃতিতে শান্তিরূপে শোভারূপে, সেই একই শক্তি লোকালয়ে শিবরূপে। অর্থাৎ সে শক্তি হচ্চে সংযম, সে শক্তি, সামঞ্জস্য। সে শক্তি ত্যাগের শক্তি। ত্যাগের মানেই হচ্চে, নিজেকেই একান্ত করে' তোলার মধ্যে

যে সর্ব্বনেশে ক্ষতি সেই ক্ষতির কারণকে দূর করা। সেই ক্ষতি হচ্ছে সত্যের ক্ষতি। যেখানে সত্যের ক্ষতি সেইখানে অমঙ্গল, সেইখানে বিনাশ। যে সমাজে মানুষ আপনাকেই বেশি করে দেখে, পরস্পরের সেবায় সহায়তায় ত্যাগ করতে জানে না সে সমাজে মানব-ধর্ম্মের অনাদর বশতঃই যত দুঃখ গ্লানি অপমান, যত দুর্ব্বলতা অসৌন্দর্য্য জমা হয়ে উঠে। ত্যাগের দ্বারা সত্যের সাধনা করলে তবেই সত্যের আনন্দরূপ প্রকাশ পায়, কি বাহিরের প্রকৃতিতে কি লোকালয়ে। আনন্দরূপের সেই প্রকাশই হচ্ছে শান্তি, সেই প্রকাশই হচ্ছে কল্যাণ। এখানে আমাদের আশ্রমে লোকসেবার সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। দিনে দিনে ত্যাগের এই সাধনার সেবার অভ্যাস তোমাদের অন্তরের মধ্যে বল লাভ করুক। ভালো করে ভেবে দেখ আমাদের দুর্গতিগ্রস্ত দেশের সমস্যাটা কি? যে সত্য আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পান, এদেশে তারই প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সেই অপ্রকাশের দুঃখ বাহিরের চারদিকেই কিন্তু তার বাধা আমাদের অন্তরের মধ্যে। আমরা কল্যাণের শক্তিকে অন্তরে পাইনে বলেই শান্তকে শিবকে বাহিরে পাইনে। তাই কেবলি আমাদের পরাভব আমাদের অপমান, আমাদের বিনাশ।

এই সেবার এই ত্যাগের শক্তিকে আমরা অন্তরের মধ্যে সত্য করব কি উপায়ে? অদ্বৈত বোধের দ্বারা। শান্তং শিবং অদ্বৈতং, আনন্দরূপের এই তিন ভাবের প্রকাশের মধ্যে নিবিড় মিল আছে। যে সংযমের মধ্যে শান্তি, যে সামঞ্জস্যের মধ্যে মঙ্গল তার মূল কোথায়? অদ্বৈতের মধ্যে। এক আছেন অনেকের মধ্যে এই কথাটাই সত্য বলে সংযম সত্য, সামঞ্জস্য সত্য। এই জন্যেই সংযমে শান্তি, ত্যাগে কল্যাণ। এই জন্যেই অত্যাচারে বিপ্লব, অহমিকায় বিনাশ। এই অদ্বৈতবোধের গণ্ডী যেখানেই আমরা প্রবল করে খাড়া করি সেইখানেই পাপ লুকিয়ে থাকবার আশ্রয় পায়; তার পরেই সেই পাপ আজ হোক্ কাল হোক্ শান্তিকে কল্যাণকে এই বেড়ার বাহিরে নির্ব্বাসিত করে দেয়।

আমাদের অন্তরে অদ্বৈতের বাধা প্রেমের বাধাই সব চেয়ে কঠিন। অহঙ্কারের মূল আমাদের স্বভাবের অদৃশ্য ভূগর্ভের মধ্যে—যেমন তা গভীর তেমনি তা বহুবিস্তৃত। আমরা তাকে কোনো কারণেই কোনো বর্ত্তমান সুবিধার দোহাই মেনে স্বীকার করতে পারব না।

এখানে আমরা সেই অদ্বৈতের দ্বার কি খুলে দেই নি? সুদূর বিদেশ থেকে অতিথি এখানে সমাগত হয়েছেন, তাঁরা এখানে প্রীতি পেয়েছেন, প্রীতি দিয়েছেন। আমরা এদেশে আভিজাত্য ভেদবুদ্ধির চর্চ্চা করেছি, আচার ব্যবহারের প্রভেদ নিয়ে মানুষকে অবজ্ঞা করেছি, এই চির অভ্যাস আমাদের কঠিন অন্তরায় হয়ে রয়েছে, কিন্তু আমাদের আশ্রমে সেই ভেদের প্রাচীর কিছু কিছু বিদীর্ণ করতে পেরেছি।

আজ বর্ষ শেষের দিনে নিজের মনকে একবার ভালো করে বলিয়ে নিই, আমরা আনন্দ স্বরূপকে অন্তরে বাহিরে লোকালয়ে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মধ্যে স্বীকার করেছি।

সত্যকে স্বীকার করবার যে মহৎ দায়িত্ব সে যেন আমরা পালন করতে পারি। দেশের লোক আমাদের সাধনায় যদি বিশ্বাস না করেন নম্র হয়ে তাঁদের ভর্ৎসনা স্বীকার করে নেব কিন্তু আমাদের ব্যবহারে আমাদের ব্রতের অগৌরব যেন না ঘটে।

ভারতবর্ষের বিবাহ।

ভারতবর্ষের বিবাহের তত্ত্ব জানতে হলে ভারতবর্ষের গৃহমূলক সমাজের তত্ত্ব ঠিকমত জানা চাই। তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে, এমন সমাজে বিবাহে নিজের ইচ্ছার পথে চলতে চাইলে বিপদ ঘটে; এখানে বিবাহের বাঁধা বাঁধা থাকলে সমাজের বাঁধা টেঁকে। হিন্দু বিবাহ ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও প্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যকে খাতির করে না, ভয় করে। কোনো য়ুরোপীয় এই মনোভাবকে যদি বুঝতে চায়, তবে গত যুদ্ধকালের অবস্থা চিন্তা করে দেখুক। সাধারণত য়ুরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহের বাধা নেই। কিন্তু যুদ্ধের সময় যখন একটীমাত্র উদ্দেশ্যের কাছে মানুষের আর সমস্ত অভিপ্রায় ছোটো হয়ে গেল, তখন শত্রুজাতির মধ্যে বিবাহ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এমন কি পূর্ব্ব হতেই যারা বিবাহে বদ্ধ ছিল তাদের মধ্যে কঠোরভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে সমাজের সঙ্কোচ রইল না। এ'র কারণ য়ুরোপে যুদ্ধরত জাতিদের মধ্যে তৎকালে সমবায়ের ভাব নিবিড় হওয়াতে, কেবল বিবাহ নয়, আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা সকলকে সমভাবে সঙ্কুচিত হ'য়ে চলতে হয়েছিল। তখন পরস্পরের আচরণের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রায় লোপ পেয়ে গেল। য়ুরোপীয় দেশের সেই অবস্থা অনেকটা পরিমাণে আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় অর্থাৎ এখানে সমস্ত সমাজের একটা সম্মিলিত অভিপ্রায় অত্যন্ত নিবিড়; তাই পালন করাকেই যদি ধর্ম্ম ব'লে স্বীকার করতে হয়, তবে ব্যক্তিগত মানুষের স্বভাবগত প্রবৃত্তি-গুলিকে পদে পদেই সম্বরণ করা চাই। ভারতবর্ষে মানবসত্তা তাকে বিশুদ্ধ রাখবার সমস্যার এই ভাবেই সমাধান হওয়াতে সকলের কাছেই এখনকার সমাজ নানাদিক থেকেই, বিশেষত বিবাহ সম্বন্ধে, ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের খর্ব্বতা কঠোরভাবে দাবী করেছে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা রয়ে গেল। কারণ এই সমাজ ভারতবর্ষে একমাত্র সমাজ নয়—নানাপ্রকারের ভিন্ন আচার ব্যবহারের দ্বারা এই সমাজ চারিদিকে বেষ্টিত। তাদের আক্রমণ থেকে নিজের সত্তাকে রক্ষা করবার জন্যে এ'কে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়েছে। এই জন্যে এ সমাজ সর্ব্বদাই গণ্ডির মধ্যে বাস করে। এই জন্যে আত্মপরের ভেদ ও বিরোধ সম্বন্ধে এ সমাজ এত অতিমাত্রায় সসঙ্কোচভাবে সচেতন। অন্য কোনো সভ্যদেশে হিন্দুসমাজের মতো অবস্থা কোনো সমাজের নাই। এই জন্যে সে সকল সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এতদূর খর্ব্বতা ঘটেনি। আমাদের সমাজে এই খর্ব্বতা খাওয়া-ছোঁওয়া প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে—সকলের চেয়ে বেশি বিবাহে,—কারণ বিবাহ গৃহবন্ধনের মূলে, এবং গৃহই আমাদের সমাজের মূলভূত। যাই

হোক, আমাদের সমাজকে ঠিকমত বিচার করতে হলে বোঝা চাই যে, এ সমাজে যুদ্ধের অবস্থার বিরাম নেই এবং এই অবস্থা বহুযুগ হ'তে চলে আস্‌চে। এই যুদ্ধের দুর্গ হচ্চে গৃহ, এই যুদ্ধের যোদ্ধা হচ্চে গৃহী।

কিন্তু সকল বিবাহে সামাজিক ইচ্ছা নয়, ব্যক্তিগত মানুষের ইচ্ছাই প্রবল। কন্যাকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া আসুর বিবাহ, তাকে বলপূর্ব্বক হরণ করা রাক্ষস বিবাহ। সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়া পৈশাচ বিবাহ। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইগুলোকে অগত্যা স্বীকার ক'রেও নিন্দা করা হয়েছে। কেননা অর্থবল বা বাহুবল, বা রিপুর বল স্বভাবতই উদ্ধত, তা' পরের বিধি মানতে চায় না।

গান্ধর্ব্ব-বিবাহও নিন্দিত, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত এ'র স্থান ভারতবর্ষীয় সমাজে প্রশস্ত ছিল, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে সাহিত্যে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনু বলেছেন, বরকন্যার পরস্পর ইচ্ছাসংযোগে বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। কিন্তু তাকে কামসম্ভব ব'লে তিনি একটু খোঁটা দিয়েছেন। কামনার দীপ্ত মশাল যে বিবাহে পথ দেখায়, সে বিবাহের মুখ্য লক্ষ্য সমাজবিধি রক্ষা নয়, প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। এমন কি, অপেক্ষাকৃত শিথিলবন্ধন ইউরোপীয় সমাজেও নরনারীর দ্বন্দ্ব সংঘটনে কামনার বেগে মানুষকে পদে পদে যে অসামাজিক সঙ্কটে নিয়ে যায় তা সকলের জানা আছে। কিন্তু সেখানকার সমাজ অনেকটা চলিষ্ণু ব'লেই এ রকম সঙ্কট সমাজের পক্ষে আমাদের দেশের মত একেবারে সাংঘাতিক হয় না। আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য। এই বিবাহের রীতি অনুসারে কন্যাকে বর প্রার্থনা কর্‌বে না, অযাচক বরকে কন্যা দান কর্‌তে হবে। বর যে কন্যাকে নিজে প্রার্থনা করে তার সামাজিক উপযোগীতাকে সে নিরপেক্ষভাবে বিচার কর্‌তে পারে না। অতএব বিবাহ অনুষ্ঠানকে সামাজিক হিসাবে যদি বিশুদ্ধ রাখতে হয়, তবে বর-কন্যার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সতর্কভাবে বাঁচিয়ে চল্‌তেই হবে। ইউরোপে রাজকুলে বিবাহ যে রকম কঠিন ও সঙ্কীর্ণ নিয়ম, আমাদের সমাজে সর্ব্বত্রই তাই।

ভারতবর্ষে বিবাহরীতির মূলে যে মনোভাবটী আছে, কোন ইউরোপীয় যদি তা স্পষ্ট ক'রে বুঝতে চান তা হ'লে পাশ্চাত্যে আজকাল সৌজাত্য (Eugenics) নিয়ে যে আলোচনা চল্‌ছে সেইটে বিচার ক'রে দেখলে সুবিধা হ'তে পারে। বিজ্ঞান ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে যথেষ্ট আসন দিতে চায় না। বিবাহে সুসন্তান হবে এই যদি লক্ষ্য হয়, তা হ'লে কামনা প্রবর্ত্তিত পথকে নিষ্ঠুরভাবে বাধা না দিলে চলে না। বিজ্ঞান বলে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেখানে কোন বংশনাশকারী দৈহিক রোগ বা মানসিক বিকার আছে, সেখানে রাজদণ্ডের বা সমাজ শাসনের সাহায্যে বিবাহকে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একথা স্বীকার কর্‌লেই বিবাহকে ভাবাবেগের টান থেকে সরিয়ে এনে বুদ্ধির এলাকায় দাঁড় করাতে হয়। কেননা ভাবাবেগকে এর মধ্যে স্থান দিতে গেলেই সমস্যা কঠিন হ'য়ে ওঠে। ফলাফল বিচার কর্‌তে সে চায় না; বিচা-

রকের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ সর্ব্বদাই অনিবার্য্য, ভারতবর্ষ নিশ্চয়ভাবেই তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

ইউরোপীয় সমাজের মূলপ্রকৃতি রাষ্ট্রিক, আর্থিক ; তার আকার, আয়তন ও প্রভাব যতই বৃহৎ ও প্রবল হ'য়ে উঠবে ততই তার প্রয়োজনের কাছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়ে চল্‌তে হবে। তার নানা লক্ষণ সেখানে দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশে সামাজিক মূলপ্রকৃতি সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ শ্রেণীবিশেষের আচারধারাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্ম্মকে (culture) বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাতন্ত্র। এই ব্যবস্থার প্রয়োজন এতদিন অত্যন্ত বলবান হওয়াতে তার কাছে ব্যক্তিগত বিচার ও ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যকে এ দেশে অত্যন্ত খর্ব্ব করা হয়েছে। আমাদের দেশের সমাজনীতি ও বিবাহরীতি আলোচনা করবার সময় আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যার কথা বাহিরের লোকের চিন্তা ক'রে দেখা দরকার।

• • • • •

মাতৃত্বের যে অংশ শরীরগত এবং সন্তানপালনের সঙ্গে জড়িত, মোটের উপর সেটা তার প্রাণীদের সঙ্গে অভিন্ন। সেটা সাধারণ জীবসৃষ্টির পর্য্যায়ভুক্ত, তাতে মানুষের সৃষ্টি-শক্তির কর্তৃত্ব নেই, তাতে প্রকৃতির দূত প্রবৃত্তিরই শাসন। কিন্তু মাতা যখন ভাবী কুমারের জন্ম তপস্যা করেন, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত ক'রে শরীরের ক্রিয়ার উপর মন ও আত্মার কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখনই সেটা যথার্থ তাঁর সৃষ্টিশক্তির অধীন হয়। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়েরা মাতৃত্বের মধ্যে হীনতা অনুভব করে, অর্থাৎ মেয়েদের উপর প্রকৃতির জবরদস্তিকে তারা অপমানকর বলেই জানে। কিন্তু এই অপমান থেকে রক্ষা পাবার উপায় মাতৃত্বকে পরিহার করে নয়, মাতৃত্বকে আপন কল্যাণ অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গত করে তাকে আত্মশক্তির দ্বারা নিয়মিত করা। প্রাচীন ভারতে সুসন্তান লাভের সেইরূপ একটা সাধনা ছিল, তা যথেচ্ছাকৃত ব্যাপার ছিল না। সেই সাধনা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নিয়মসঙ্গত কিনা সে প্রশ্ন বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্য নয়,—কিন্তু এই আত্মসংযত মানসিক সাধনার দ্বারাই মানবমাতা আপন মর্য্যাদা লাভ করেন এইটেই বড় কথা। কালিদাসের কয়টী কাব্যের মধ্যে সেই মর্য্যাদার গৌরব বর্ণিত দেখি।

কালিদাসের সময়ে ক্ষত্রিয় রাজারা বিবাহে সংযত আর্য্য আদর্শ লঙ্ঘন ক'রে কামনার অনুচরপে সমাজে অপজনন (Dogeneracy) ঘটাচ্ছিলেন। এই সর্ব্বনেশে ব্যাঘাতকে দূর করবার জন্যে শিবের জ্ঞান-নেত্রের ক্রোধাগ্নির প্রয়োজন হয়েছিল। নইলে সমাজকে দৈত্য-রাজকতা থেকে বাচাবার উপায় ছিল না। তাই কবি বিবাহকে কন্দর্পের শাসন থেকে উদ্ধার ক'রে শিবের তপোবনে আহ্বান ক'রে আন্‌তে চেয়েছিলেন।

• • • • •

এইখানে প্রশ্ন ওঠে, বিবাহ থেকে ইচ্ছাকে যদি সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করা হয়, তা হ'লে দাম্পত্যের মধ্যে প্রেমের স্থান হয় কি ক'রে ? এদেশের সঙ্গে যাদের যথার্থ পরিচয় নেই

এবং যাদের বিবাহপ্রথা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরূপ, তারা গোড়াতেই ধরে নেয় যে, আমাদের বিবাহ প্রেমহীন। কিন্তু সেই ধারণা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আমরা প্রত্যক্ষ জানি। খাঁটী প্রেম নরনারীর স্বেচ্ছাসম্মত বিবাহেও যে সুলভ নয়, তার অনেক প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যায়। বিবাহকে যদি মান্‌তে হয়, তবে এ কথাও স্বীকার কর্‌তে হবে যে, মানুষ এমন কোন ব্যবস্থাই কর্‌তে পারে না, যাতে বিবাহের পূর্ব্বে যা স্থির করা যায়, স্ত্রীপুরুষের সুদীর্ঘ বিবাহ-কালে তা অক্ষুণ্ণ সত্য হয়ে টিকতে পারে। এই জন্যই বাইরের দিক থেকে এত লোকলজ্জা, এত আইনের শাসন। অথচ যে সম্বন্ধ পরস্পর প্রেমের উপরেই সত্য, যখনই তাকে বাহিরের বাঁধনে জোর ক'রে বাঁধা যায়, তা অত্যন্ত অশুচি হয়, তার মত দুঃখ অপমান মানুষের পক্ষে আর কিছু নেই। সন্তানের দায়িত্ব চিন্তা ক'রে মানুষ এ সমস্তই স্বীকার করে, কিন্তু আজও কোন সমাজই বল্‌তে পারেনি যে বিবাহ-সমস্যার নির্দ্দোষ সমাধান সে করেছে। সর্ব্বত্রই অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে, তারপরে আকস্মিক সুযোগ দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে হয় তলায় তলানো, নয় ঘাটে পৌঁছানো হ'য়ে থাকে।

এই সমস্যার সমাধান চিন্তা কর্‌তে গিয়ে ভারতবর্ষ বলেছে বিবাহের গোড়াতেই ইচ্ছার বেগকে স্বীকার না করাই নিরাপদ। ইচ্ছা কল্যাণ বিচার কর্‌তে অসমর্থ। তা হ'তে পারে, কিন্তু যে ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই, সেটা যে প্রকৃতির সবচেয়ে বড় সৈনিক। যখন সে অস্ত্র উদ্যত করে তখন তাকে ঠেকাবে কে? ভারত বলেছে, যে ইচ্ছা স্ত্রীপুরুষের হৃদয় ঘটায়, তার একটা বিশেষ বয়স আছে। অতএব যদি বিবাহকে সমাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছামূলক করাই শ্রেয় হয়, তবে সেই বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ চুকিয়ে দেওয়া ভাল। ভারতে অল্প বয়সে বিবাহের মূল কারণই হচ্ছে এই।

* * * *

আমাদের সমাজে সতী স্ত্রীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও একটা সংস্কারের প্রচলন আছে। স্ত্রীর প্রতি সাধ্বী গৃহিণীভাবে একটী ভক্তিভাবের চর্চ্চা আমাদের দেশে দেখা যায়। অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের প্রেম ব'লে যে একটী স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আছে, তাকে অতিক্রম ক'রে দাম্পত্য-প্রেম নামক একটী সামাজিক হৃদয়বৃত্তিকে সাধনার দ্বারা গ'ড়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা আমাদের দেশে আছে। কিন্তু এ কথা মান্‌তেই হবে যে, মেয়েদের স্বভাব হৃদয়-প্রবণ (Emotional) ব'লে এই দাম্পত্যপ্রেম মেয়েদের পক্ষে যত সহজ হয়েছে, পুরুষের পক্ষে তত সহজ হয়নি। পুরুষের পক্ষে দাম্পত্য একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সমাজের কিঞ্চিৎ অনুমোদন আছে, কিছুমাত্র অনুশাসন নেই। এমন কি স্ত্রীর বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে এই একনিষ্ঠতা রক্ষণের পক্ষে বিশেষ বিধিরও অভাব দেখিনে। তা ছাড়া অবৈধ রমণকে শাসন করবার সামান্য চেষ্টা মাত্রও দেখা যায় না। বস্তুতঃ একপক্ষে দাবীকে অত্যন্ত বেশী কড়া করার দ্বারাই অন্যপক্ষে শিথিলতাকে সহজ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

অতএব ভারতীয় বিবাহের বিচার কর্‌তে হ'লে এ কথা জানা চাই যে এ বিবাহে স্ত্রীপুরু-

যের অধিকারের সাম্য নেই। এখানে অধিকার বলতে আমি বাহ্য অধিকারের কথা বলছি নে। এই অসাম্যের দ্বারা স্ত্রীলোকের চরিত্রে হীনতা ঘটতে পারত। তা যে ঘটেনি তার কারণ, স্বামী তার পক্ষে আইডিয়া। ব্যক্তির কাছে পাশববলে সে নত হয় না, আইডিয়ার কাছে ধর্মবলে সে আত্মসমর্পণ করে। স্বামী যদি মানুষের মত হয়, তা হ'লে স্ত্রীর এই আইডিয়াল প্রেমের শিখা তার চিত্তেও সহজে সঞ্চারিত হয়। আমরা এমন দৃষ্টান্ত দেখেছি। এই আইডিয়াল প্রেম হচ্ছে যথার্থ মুক্ত প্রেম। এ প্রেম প্রকৃতির মোহবন্ধনকে উপেক্ষা করে।

এ কথা মনে রাখা চাই, ভারতসমাজ গৃহকেই চরম ব'লে স্বীকার করেন নি। মুক্তির অন্বেষণে একদিন গৃহকে পরিত্যাগ করতে হবে, এই ছিল তার উপদেশ। ভারতের উদ্দেশ্য ছিল গৃহকে মুক্তিপথের সোপান ক'রে গ'ড়ে তোলা। সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে আজও আমাদের দেশে অনেক গৃহী গৃহ ছেড়ে তীর্থে বাস করে। ভারত সভ্যতার মূলে এই একটী স্বতোবিরোধ আছে। একদিকে এ সভ্যতা গৃহপ্রধান এবং এই গৃহ মানুষের সঙ্গে আপন সম্বন্ধ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে স্বীকার করে। ভারত আবার আর একদিকে আত্মার মুক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে সকল সম্বন্ধই একে একে ছিন্ন করতে বলে। সম্বন্ধকে স্বীকার করতে বলবার কারণ এই যে, তার মধ্য দিয়ে না গেলে তাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। মানুষের মনে যে সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাদের ক্ষয় করতে গেলেও তাদের ব্যবহার করতে হয়। এই ব্যবহারকে নিবৃত্তির দ্বারা নিয়মিত ক'রে তবে প্রকৃতির বন্ধনগুলিকে একদিন কাটান সম্ভবপর হয়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই তফাৎ। প্রকৃতির শাসন সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম গোড়া থেকেই একেবারে নৈরাজ্যপন্থী anarchist.

ভারত সমাজের মুস্কিল এই যে, চারিদিক থেকে অতি যত্নে রক্ষিত না হলে এ সমাজ বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে। কারণ, এ সমাজ বিচারকে শ্রদ্ধা করতে সাহস করে নি; আচারকেই একান্তভাবে অবলম্বন করেচে; প্রধানতঃ এর বন্ধন আভ্যন্তরিক স্নায়ু শিরায় নয়, বাহ্যিক জোড়াতাড়ায়। এই জন্যেই নড়াচড়ার সম্বন্ধে এ'র এত বেশী সতর্কতা। বাহিরের বন্ধনের গ্রন্থি পাছে বাহিরের একটুমাত্র আঘাতে খুলে যায় এই জন্যেই বাহিরকে সে এত বেশী ভয় করে। এই সতর্কতা আর তো খাটে না। সমুদ্রের এ পারের লোককে ওপারে যেতে আটকানো যায় কিন্তু ওপারের লোক যখন এপারে এসে পড়ে তখন কি করা যাবে? নূতন শিক্ষা, নূতন মত, নূতন অভ্যাস বাঁধ ভাঙা বন্যার মত ভারতের উপর আছড়ে পড়েছে। যেসব বিশ্বাস ছিল তার সমাজের স্তম্ভ, সেসব বিশ্বাসে প্রতিদিনই ছোটবড় ছিদ্র দেখা দিচ্ছে। মত বিশ্বাসের এই পরিবর্তন হ'ল ভিতরকার কথা, কিন্তু বাইরের দিকের প্রবল আক্রমণটা আর্থিক। অন্নস্বচ্ছলতা না থাকলে বহুসহস্রবিশিষ্ট সমাজের নিয়ম কখনই পালিত হ'তে পারে না। পর সমাজের মতবিশ্বাসের স্রোত যেমন নিয়তই আমাদের চিত্তের উপর এসে পড়েছে, আমাদের অন্নের স্রোতও তেমনি নানা শাখায় পরদেশের দিকে ছুটেছে। এখন এদেশের মানুষ খুব বড়াবড় ক'রেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বিচার করতে বাধ্য হল। প্রত্যেক

গৃহের সামাজিক পরিধি দিনে দিনে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছে। তাই একদিন এ সমাজে যেসকল মনোভাবচর্চ্চার বিচিত্র অবকাশ ছিল, এখন তা না থাকাতে সে সকল মনোভাব নির্জ্জীব প্রায়। অথচ সমাজের কাঠামো কখনো সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে নি। সেই জন্যে আজকাল আমরা সমাজের সমস্ত বাধাকেই বহন করছি, অথচ লক্ষ্যকে স্বীকার করতে পারছি নে। এই কারণে এই প্রভূতবাধাগ্রস্ত সমাজে মানুষের পরাভবের আর অন্ত নেই। আমাদের পরিবারবন্ধন সকলের চেয়ে সাংঘাতিক বন্ধন হ'য়ে উঠেছে। তার বহু বিচিত্র জটিল জালে মানুষকে বিশ্বক্ষেত্র থেকে সে নিরন্ত করে জড়িয়ে রেখেছে। আমরা যতই বেশী পারিবারিক হ'য়ে উঠছি ততই বিশ্বব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছি। কেন না, আজকালকার দিনে যারা নিছক ঘরের ছেলে, তারা কেবলই চ'টে যাবে। আমরা একদিন ঘর ছাড়ব ব'লেই ঘর জোড়েছিলুম। আজ আমরা আর সমস্তই ছেড়েছি কেবল ঘরখানাই আছে। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যারা, তারা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্যেই শক্তি সঞ্চয় করে, অবশেষে তাদের শক্তিই তাদের স্বাতন্ত্র্যের ঘাড়ে চেপে বসে। আমাদের দেশে তাই ঘটেছে, আমরা মুক্তির প্রেমে বন্ধনকে মেনেছিলুম, আজ বন্ধনের প্রেমে মুক্তিকে খুইয়ে বসেছি।

আজ ভারতের দুর্গতির প্রধান কারণ তার গৃহধর্ম্মের গভীরতা। অর্থাৎ গৃহের সেই প্রবল ও বিচিত্র দাবী যাতে মানুষের সকল শক্তিকে আপাকে তলার দিকেই নিয়ে যায় ঘাটের দিকে না। এই গার্হস্থ্যের আবর্ত্তে প্রতিদিন ভারতের বড় বড় নৌকাডুবি চলছে, এই আমাদের সকলের চেয়ে দুঃসহ ট্রাজেডি। উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য ক'রে তোলার মানেই হচ্ছে ছোটোকে বড় ক'রে তোলা। পথকে আদর করে যে, তার মত দরিদ্র আর নেই। বিশ্বকেই স্বীকার করবার অনুশীলনক্ষেত্র ছিল যখন গৃহ, তখন গৃহের দাবী মানুষকে ছোট করে নি। আজ হিন্দুসমাজের সেই দাবী নিজের দিকেই অত্যন্ত বড় হ'য়ে উঠেছে ব'লে মনুষ্যকে অত্যন্ত ছোটো করছে। আমাদের যে ত্যাগ বিশ্ববিধাতার প্রাপ্য প্রতিমুহূর্ত্তে সেই ত্যাগ গৃহের উপদেবতা চুরি করছে; এই চুরি স্বীকার ক'রে যারা স্বচ্ছন্দে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছে বিশ্বসমাজে তাদের স্থান দাসশালায়। আজ ভারতবাসী বিশ্বসমাজের পরিত্যক্ত; গৃহগুহার অচল অন্ধকারে সেই অকিঞ্চনের নির্ব্বাসন। এইখানে আপন প্রদীপ জ্বেলে, আপন দেবতার বেদী প্রতিষ্ঠা ক'রে বরঞ্চ নারী আপন মহিমা রক্ষা করতেও পারে, কিন্তু পুরুষ এখানে বন্দী, এখানে তার নিরন্তর আত্মবিস্মৃতি। পুরুষের আত্মবিস্মৃতির সেই অপরিসীম অবসাদে সমস্ত ভারতবর্ষ আজ ভারগ্রস্ত।

এতদিন ভারতীয় সমাজের যে আধারের উপরে তার বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই আধারের বিকৃতি হওয়াতে-বিবাহের মূলগত ভাবসকল ও তার ব্যবহার সকল কিছুর সঙ্গে ঠিকমত খাপ খাচ্ছে না। সত্যযুগের জন্যে একদল আক্ষেপ করছে, সে আক্ষেপের ডাকে সত্যযুগ সাড়া দিচ্ছে না। এখন সময় এসেছে নূতন ক'রে বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায় করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিত্তের ও অভিজ্ঞতার মিল ক'রে ভাববার।

সন্তান সৃষ্টিতে পুরুষের দায়িত্ব গৌণ অথচ অপরিহার্য্য। নারীর অপেক্ষাকৃত অক্রিয় বীজকে পুরুষের সক্রিয় বীজ প্রাণ চঞ্চল ক'রে দেওয়ার পর থেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের সুদীর্ঘভার নারীর, কঠিন দুঃখ স্বীকার তারই।

জীবজননে পুরুষের প্রয়োজন নগণ্য ব'লেই কীট পতঙ্গ রাজ্যে অনেক স্থলেই স্ত্রীকীট অনাবশ্যক পুরুষকীটকে সংহার করে। পশুরাজ্যেও পুরুষ-পশুর স্বভাবে যে ঈর্ষাপরায়ণ হিংস্রতা আছে তাতে পুরুষ-পশুর সংখ্যা হ্রাস ক'রে রাখে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে জীব-প্রকৃতির দিক থেকে সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের প্রয়োজন স্ত্রীলোকের চেয়ে সামান্যতর।

মানুষের মধ্যে মনঃপ্রকৃতি বড় হ'য়ে দেখা দিল। তখন সংসারে পুরুষ আপন যথার্থ পাবার অবকাশ পেলে। যে প্রাণপ্রকৃতি এতকাল স্ত্রীকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে, তারই দায়িত্ব বন্ধনে স্ত্রী যখন বাঁধা থেকে আপন কাজে জড়িয়ে হইল তখন বন্ধনমুক্ত পুরুষ মনঃপ্রকৃতির উত্তেজনায় মানসসৃষ্টির বিচিত্র অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে পারল। পুরুষ আপন আবশ্যকতা প্রবলভাবে সৃষ্টি করতে লাগল।

গোড়ায় এই সৃষ্টি যখন অত্যন্ত বেশী প্রাধান্য লাভ করলে তখন সভ্যতার প্রথম দিকের অধ্যায়ে নারী অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক ব'লেই গণ্য হয়েছিল। তাই নয়, নারী এই সৃষ্টিতে অনেক পরিমাণে বাধাস্বরূপ। কারণ যে সংসার নারীর, সে সংসার পুরুষের আত্মবর্ধনশীল মনকে বেঁধে রাখতে চায়! সভ্যতাসৃষ্টিকার্য্যে নারীর এই স্বল্প-প্রয়োজনীয়তার অগৌরব আজও লেগে আছে! সেই জন্য আজ বিদ্রোহিনীর দল প্রাণ প্রকৃতির দায়িত্ব লাঘব ক'রে সমাজ-সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের সমকক্ষতা দাবী করছে।

কিন্তু বাহিরের দিক থেকে কৃত্রিম চেষ্টার অবকাশ সৃষ্টি করলেই অবকাশ পাওয়া যায় না। নারীর প্রকৃতির মধ্যে যে হৃদয়-বৃত্তির প্রাবল্য আছে তাকে বাহির থেকে তাড়া দিয়ে বিদায় করা যায় না। সেই হৃদয়বৃত্তিগুলি স্বভাবতই চলবার দিকে প্রমুখ নয়, আঁকড়াবার দিকেই তার ঝোঁক। এইজন্যে স্থিতির মধ্যে যে সম্পদ, নারী তারই সাধনা করলে সার্থকতা লাভ করে। গতিবান্ অধ্যবসায়ের কাজে যদি সে জোর ক'রে যায় তাহলে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব সাধনে এবং সেই নিরন্তর দ্বন্দ্বের বিক্ষেপ বহন ক'রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে প্রধান স্থান কখনই পাবে না।

কিন্তু পুরুষ যেমন প্রাণপ্রকৃতির শাসনতন্ত্রে দীর্ঘকাল নিম্নপদে থেকে অবশেষে মনঃ-প্রকৃতির রাজ্যে প্রাধান্য পেলে, নিজের অপেক্ষাকৃত নিরাবশ্যকতার দাগনা মুছে ফেলতে পারলে, তেমনি সভ্যতার একটা উচ্চ স্তর আছে সেখানে নারী আপন অগৌরব দূর করবার অধিকারী। তাকে কি নাম দেব হঠাৎ ভেবে পাওয়া শক্ত;—আধ্যাত্মিক শব্দটার ঠিক সংজ্ঞা নিয়ে নানা তর্ক উঠতেপারে, কিন্তু দায়ে পড়ে আপাততঃ ঐ নামটাই গ্রহণ করা যাক্।

হৃদয়বৃত্তির একটা আনুষঙ্গিক উৎপন্ন জিনিষ আছে তাকে [illegible]

মাধুর্য্য আলোর মত, এ একটী শক্তি। ঐ'কে স্পষ্ট ক'রে ধরা-ছোঁওয়া মাপাজোখা যায় না—কিন্তু এ'রই অমৃত না পেলে মনঃপ্রকৃতির কাজ পূর্ণ সফলতায় পৌঁছয় না। গাছের শিকড় মাটি আশ্রয় ক'রে দাঁড়ায়, মাটির থেকে রস ও খাদ্য সংগ্রহ করে, এসব জিনিষের মোটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু সূর্য্যের আলোকটিকে সেই সুনির্দ্দিষ্ট হিসাবের অঙ্কে বাঁধা যায় না, কিন্তু তবু সেই আলো যদি শক্তি সঞ্চার না করে, তবে গাছের সকল উদ্যমই অসাড় হয়।

পুরুষের সৃষ্টিকার্য্যে নারীস্বভাবের এই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য চিরদিনই যোগ দিয়েছে। তা অলক্ষিত কিন্তু অপরিহার্য্য। পুরুষের চিত্তকে নারীর এই প্রাণবান মাধুর্য্য ভিতরে ভিতরে সক্রিয় না করলে তা আপন পূর্ণ ফল ফলাতে পারে না। বীরের বীর্য্য, কর্ম্মীর কর্ম্মোদ্যম, রূপকারের কলাকৃতিত্ব প্রভৃতি সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারী প্রকৃতির গূঢ় প্রেরণা আছে।

নারীর দুইটিরূপ, একটী মাতৃরূপ, অন্যটী প্রেয়সীরূপ। মাতৃরূপে নারীর একটী সাধনা আছে সেকথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই সাধনায় সন্তানের নয়, সুসন্তানের সৃষ্টি, সেই সুসন্তান সংখ্যা পূরণ করে না, মানব সংসারে পাপকে অভাব অপূর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষচেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে। যে গুণেরদ্বারা তা সিদ্ধ হয় পূর্ব্বেই বলেছি সে হচ্ছে মাধুর্য্য। একথাও বলেছি ভারতবর্ষ এই মাধুর্য্যকে শক্তিই বলে। আনন্দলহরী নামে একটী কাব্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত। তাতে যাঁর স্তব গান আছে তিনি হচ্ছেন বিশ্বের মর্ম্মগত নারীশক্তি, সেই শক্তি আনন্দ দেন। একদিকে বিশ্বকে যেমন আমরা জানি, ব্যবহার করি; অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অহৈতুক তৃপ্তির যোগ। বিশ্বকে আমরা জানি, তার কারণ বিশ্বে সত্যের আবির্ভাব। বিশ্বে আমাদের তৃপ্তি, তার কারণ বিশ্ব আনন্দের প্রকাশ। ঋষিরা বলেছেন এই বিশ্বব্যাপী আনন্দেরই নানা মাত্রা জীব সকল নানা উপলক্ষ্যে ভোগ করে। "কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ", কারো প্রাণচেষ্টার উৎসাহমাত্র থাকত না যদি আকাশ পূর্ণ করে' এই আনন্দ না থাকতেন। ইংরাজ কবি শেলি Intellectual Beauty নাম দিয়ে তাঁর কবিতায় যাঁর স্তব করেছেন তাঁর সঙ্গে এই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের ঐক্য দেখি। বিশ্বগত আনন্দকে আনন্দলহরীর কবি নারীভাবে দেখেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে মানবসমাজে এই আনন্দশক্তির বিশেষ প্রকাশ নারীপ্রকৃতিতে। এই প্রকাশকে আমরা বলি মাধুর্য্য। মাধুর্য্য বলতে কেউ যেন কমনীয়তা না বোঝেন। তার সঙ্গে ধৈর্য্যত্যাগসংযমযুক্ত চারিত্রবল, সহজ বুদ্ধি, সহজ নৈপুণ্য, চিন্তার ব্যবহারে ভাবে ও ভঙ্গীতে শ্রী, প্রভৃতি নানা গুণের মিশেল আছে, কিন্তু এর গূঢ় কেন্দ্রস্থলে আছে আনন্দ যা আলোর মত স্বভাবতই আপনাকে নিয়ত বিকীর্ণ করে, দান করে।

প্রেয়সীরূপিনী নারীর এই আনন্দশক্তিকে পুরুষ লোভের দ্বারা আপন ব্যক্তিগত ভোগের

পথেই আজ পর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে নিক্ষিপ্ত করেছে, বিকৃত করেছে, তাকে বিষয় সম্পত্তির মত নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বদ্ধ করেছে। তাতে নারীও নিজের অন্তরে যথার্থ শক্তির পূর্ণ গৌরব উপলব্ধি করতে বাধা পায়। সামাজিক লীলার মধ্যে মনোরঞ্জনের লীলায় পদে পদে তার ব্যক্তিস্বরূপের মর্য্যাদা হানি ঘটেছে। তাই মানবসমাজের বৃহৎক্ষেত্রে নারী আপন প্রকৃত আসন পায় নি বলেই আজ সে আত্মমর্য্যাদার প্রমাণে পৌরুষলাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত। অন্তঃপুরের প্রাচীর থেকে বাইরে চলে আসার দ্বারায় নারীর মুক্তি নয়। তার মুক্তি এমন একটী সমাজে যেখানে তার নারীশক্তি, তার আনন্দশক্তি আপন উচ্চতম প্রশস্ততম অধিকার সর্ব্বত্র লাভ করতে পারে। পুরুষ যেমন আপন ব্যক্তিগত ব্যবসায় অতিক্রম করেও বিশ্বক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করবার অবকাশ পেয়েছে, তেমনি যখন গৃহস্থালীর বাইরেও সমাজসৃষ্টি-কার্য্যে নারী আপন বিশেষ শক্তির ব্যবহারে বাধা না পাবে তখন মানবসংসারে স্ত্রীপুরুষের যথার্থ যোগ হতে পারবে। পুরাকাল হতে আজ পর্য্যন্ত যে বিবাহ প্রথা চলে আসচে তাতে স্ত্রীপুরুষের সেই পূর্ণ যোগ বাধাগ্রস্ত; আর সেইজন্যেই পুরুষ সমাজে নারীশক্তির প্রভূত অপব্যয় ও বিকার; সেইজন্যেই পুরুষ নারীকে বাঁধতে গিয়ে তার দ্বারা নিজেরই দৃঢ়তম বন্ধন সৃষ্টি করেছে। বিবাহ এখনো সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নারীকে বন্দী করে রাখবার পিঞ্জর। তার পাহারাওয়ালার পুরুষ-প্রভুত্বের হুকুমা পরা। তাই সকল সমাজেই নারী আপন প্রকৃতির পরিপূর্ণতার দ্বারা সমাজকে যে ঐশ্বর্য্য দিতে পারত তা দিতে পারচে না, আর এই অভাবের দৈন্যভার সকল সমাজই বহন করে চলেছে।

এই মাধুর্য্যের শক্তি সভ্যতার অপেক্ষাকৃত বর্ব্বর অবস্থায় অনভিগোচর ও গৌণভাবে আপন কাজ করে। তখন যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দুরন্ত ভাঙাগড়ার যুগে এই শক্তির ক্রিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। কিন্তু মানবসভ্যতা যখন আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, অর্থাৎ যখন মানুষের পরস্পর বিচ্ছেদের চেয়ে পরস্পর যোগই মূল্যবান ব'লে স্বীকৃত হবার সময় আসে তখন নারীর মাধুর্য্যশক্তি গৌণভাবে নয় মুখ্যভাবে আপন কাজ করবার অবকাশ পায়। তখন পুরুষের জ্ঞানের সঙ্গে নারীর ভাবের সমান যোগে তবে সংসার টিঁকতে পারে। তখন উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যদ্বারা উভয়েই সভ্যতাসৃষ্টির এক মহা-গৌরবের সমান অংশী হ'তে পারে। তখন সেই পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে উচ্চনীচতা সৃষ্টি করে না।

আজও মানুষের মধ্যে সভ্যতার সেই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে ঠিকমতে স্বীকার করা যায় নি। এই জন্যে, বিবাহে আজও স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ সত্য হয় নি। আজও এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছু না কিছু বিরোধ ও কোনো না কোনো পক্ষের অসম্মাননা আছে। তাই আজও বিবাহে গায়ের জোর আপন জায়গা ছাড়তে চাচ্ছে না, স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা সন্দেহ নিত্য আন্দোলিত। এইজন্যেই মানুষের সব চেয়ে বড় দুঃখদুর্গতি বড় অপমান ও

গ্লানি নর নারীর এই বিবাহ সম্বন্ধেই। কিন্তু যাঁরা মানবসমাজে আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস করেন তাঁরা বিবাহ সম্বন্ধকে সামাজিক পাশব বলের অত্যাচার থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে সমাজে প্রেমের শক্তিকে সত্যভাবে বিকীর্ণ করবার উপায় অন্বেষণ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিবাহ অনুষ্ঠানে এখনো সমস্ত প্রথায় অভ্যাসে ও আইনে আমরা বর্ব্বর যুগে আছি ব'লেই বিবাহ আজও নরনারীর মিলনকে পূর্ণ কল্যাণরূপে প্রকাশ না ক'রে তাকে আবৃত ক'রে রেখেছে। সেই জন্যেই আমাদের দেশে কামিনী-কাঞ্চনকে দ্বন্দ্বসমাসের সূত্রে গেঁথে নারীকে ইতর ভাষায় অপমান করতে পুরুষ কুণ্ঠিত হয় না। কেননা পুরুষ এখানে এখনো মনে করে যে সেই হ'ল মানুষ, তারই মুক্তি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য, নারীকে সে কাঞ্চনের মত নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে স্বীকার করতেও পারে ত্যাগ করতেও পারে। ত্যাগ করার দ্বারা সে যে আত্মহত্যা করে তা সে জানেই না। তা ছাড়া নারীর মাধুর্য্য বিলাস-সামগ্রী নয়, তা যে মানুষের সকল সাধনাতেই পরম সম্পদ একথা বোঝবার মতো সময় তার আজও হ'ল না,—আমাদের সর্ব্বব্যাপী শক্তিহীনতার সে একটা প্রধান কারণ।

(শান্তিনিকেতন)

"অসহ-যোগ"

(গল্প)

টেকচাকুলে আমি হইয়াছিলাম প্রহ্লাদ—লোকে এই কথা বলিত। আমাদের গ্রামে যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল সকলেই ব্রহ্মোত্তর জমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেন এবং পঞ্চ-মকার সাধন করিয়া পুরুষানুক্রমে কাটাইয়া গিয়াছেন। বাবা মরিবার সময় ছেলেকে গাঁজার কলিকা ও একগাছি লাঠি উত্তরাধিকারীসূত্রে দিয়া যাইতেন। যার কলকে যত পুরানো ও লাঠি যত পাকা সে তত বনিয়াদি বংশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিত। এহেন গ্রামের ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি পানটি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া মহাত্মা গান্ধির এক ডাকে কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপ দিলাম।

একদিন সোণালি গগন দেখিয়া পাগল হইলাম, পাখীর কলতান, মলয়বাতাস সব যেন কাব্যের কথা না হইয়া সত্যই আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

পরদিন পঞ্চগব্য খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। বালিশ মাথায় দেওয়া ছাড়িয়া দিলাম—ইট মাথায় দিয়া শুইতে লাগিলাম। নানা কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া ভাবিলাম আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে উঠিয়াছি।

গ্রামে গ্রামে চরকা লইয়া ঘুরি—মেয়েদের নিকট আমার অবাধ গতি। চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে একদিন কোনও মৃগনয়নার চাহনির সহিত আমার অপলক দৃষ্টির অসহ-যোগ বশে আমার চরকা হঠাৎ থামিয়া গেল!

ঘোরাঘুরি বন্ধ করিলাম। দেশের কাজ তো করিতে হইবে। একটা জাতীয় বিদ্যালয় খুলিয়া বসিলাম। প্রথমে ছোট ছোট ছেলেরা পড়িত। ভাবিলাম মেয়েরাই বা পড়িবে না কেন? ছেলেদের চেয়ে সুকোমল মেয়েদের উপরই আমার টান অধিক ছিল। গ্রামবৃদ্ধগণ মেয়েদের পাঠাইতে অনুমতি দিলেন। ছোট হইলে কি হয়, পুতুলের ঘরকন্নার ভিতর দিয়ে তারা না শিখিয়াছে এমন জিনিষ সংসারে নাই। আমিও তাদের সঙ্গে খেলিতে লাগিলাম।

পাঁচি চরকা কাটায় ফাষ্ট, পড়াশুনায় ফাষ্ট, সেলাইয়ের কাজে ফাষ্ট—সবটাতে তার কাছে কোনও মেয়ের পারিবার জো-টি ছিল না। সেদিন অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে আমি উপদেশ দিতেছিলাম। আমার জাতীয় বিদ্যালয়ে জাতিভেদ থাকিতে দিব না—মুচিদের মেয়েগুলি আসিয়া সসঙ্কোচে একপাশে বসিত। আমি আদেশ দিলাম সকলকে একসঙ্গে মিশিয়া বসিতে হইবে। প্রথম বলিলাম পাঁচিকে,—সে ঠোঁট উল্টাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া উত্তর দিল—"দায় পড়েছে, মুচির মেয়ের গায়ে ঘেঁস দিয়ে বসবার অঙ্গে। তোমার ইস্কুলে না-ই বা পড়লাম।"

অহিংস অসহযোগী হইলেও এবং বিশুদ্ধ পন্দর ভিন্ন অন্য কিছু ব্যবহার না করিলেও আমি পাঁচির চুলের মুঠি ধরিয়া আমার হাতের সঙ্গে তাহার গালের ভীষণ শব্দে অসহ-যোগ করিয়া দিলাম।

চরকা বন্ধ হইয়াছিল, এবার ইস্কুল ভাঙ্গিয়া গেল। দেশ উদ্ধারের নেশা কাটিল। এখন আমি ৩০৲ টাকা মাহিনায় একটী একাউণ্টেণ্টের কাজ করিতেছি। কিন্তু রোজই হিসাবে গড়মিল হয়, পকেটের পয়সা আর আপিসের টাকায় অসহ-যোগ হয়—গরীবের চাকুরিটাও কোন্ দিন না যায়!

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

— - —

সম্পাদকের দরবার

শ্রীযুক্তা ভারতী সম্পাদিকা মহাশয়া

মান্যবরাষু—

দরবারী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীর সম্পাদকের দরবারে যেসব প্রশ্ন পেশ করেছেন, সেগুলি সুগপৎ ন্যাসনাল কংগ্রেসে ও সিলভফিকাল কংগ্রেসের দরবারে পেশ করা উচিত ছিল, কারণ প্রশ্ন কটিরই জিজ্ঞাস্য হচ্ছে ethicsএর সঙ্গে politicsএর সম্বন্ধ কি? এসব প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব তিনিই দিতে পারেন যিনি একাধারে চূড়ান্ত পলিটিসিয়ান ও পরম ধার্ম্মিক। কিন্তু পৃথিবীতে যদি এমন কোনও ক্ষণজন্মা পুরুষ থাকেন ত তাঁকে কোনও প্রশ্ন করা হয় নি, কেননা এক দেহে ও দুই ব্যক্তি বাস করতে পারেন কি—এই হচ্ছে প্রশ্নকর্ত্তার আসল জিজ্ঞাস্য।

এ প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য যে, এ যুগের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা আবিষ্কার করেছেন যে, একই লোকের ভিতর কখনো কখনো দুই ব্যক্তি থাকে; এমন কি অনেক সময়ে দেখা যায় যে, সে দুটী, একটী অপরটির বিপরীত। এই যুগল-মিলনের ফল কি হয়, এই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পৃথিবীতে moral politics আর political morals বলে দুটী আলাদা আলাদা ধর্ম্ম আছে। এর কোন্‌টি কার কাছে গ্রাহ্য হবে, তা অবশ্য নির্ভর করে তার প্রকৃতির উপর। যে ধর্ম্মবীর সে প্রথমটি অবলম্বন করবে আর যে রাজনীতি বীর সে দ্বিতীয়টি অবলম্বন করবে। তবে যার অন্তরে double personality আছে সে এ দুটোর ভিতর এককে আর বলে ভুল করতে পারে।

The end justifies the means, এ হচ্ছে political-moralsএর চূড়ান্ত কথা। যেমন "যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়" নিষ্কাম ধর্ম্মের চূড়ান্ত কথা। ফল নিরপেক্ষ হয়ে কর্ম্ম করার অর্থ—end নিরপেক্ষ হয়ে ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। নিষ্কাম ধর্ম্মের এ যদি অর্থ না হয়, তাহলে তার কোনও অর্থ নেই। কারণ জেনে শুনে নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবার মানে অপ্রবৃত্ত হওয়া।

যদি প্রশ্ন কর্ত্তার আসল জিজ্ঞাস্য এই হয় যে, ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্‌সের যোগ কি তাহলে তার উত্তর আমরা কেউ দিতে পারব না। এর কারণ পলিটিক্‌স্ আমরা আজও শিখি নি, অপর পক্ষে ধর্ম্ম ভুলে গিয়েছি।

আমরা ভাবি পলিটিক্‌স্ মানে মুক্তি আর ধর্ম্ম মানে বাঁধা। কিন্তু এমনও হতে পারে যে এই বাঁধার মধ্যেই জন্মায় শক্তি, আর তার থেকে মুক্তি আনে বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ দুর্ব্বলতা। স্ব পদার্থটি বাদ দিয়ে স্বাধীন শব্দের কোনও অর্থ নেই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আপনার

কাগজের মারফতই আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন যে, অতীতের যোগউপনিষদে এই "স্ব"র উন্নতি ও মুক্তির নামই স্বরাজ।

এই সেকেলে স্বরাজের সঙ্গে অবশ্য একেলে স্বরাজের কোন যোগ নেই। আর সেইজন্য সেকাল আর একালকে এক হাঁড়িতে চড়িয়ে আমরা যে খিচুড়ি পাকাই তা সকলে গলাধঃকরণ করতে পারে না। এ খিচুড়ির নাম meta-politics অর্থাৎ তা politicsও নয় meta-physicsও নয়।

প্রশ্নকর্ত্তা পলিটিক্স্ সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করেছেন, সে সবই হচ্ছে এই meta-politics সম্বন্ধে প্রশ্ন। ওসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে শুধু ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ফিলজফিকাল কংগ্রেস একত্র বস্‌লে ও একমত হলে। চাণক্যকে এবং বুদ্ধদেবকে বগলদাবা করে দুজনের মুখ এক করে দেবার শক্তি আমাদের নেই, আছে শুধু ক্ষণজন্মা পুরুষদের। শুকদেব পরীক্ষিতকে বলেছিলেন যে, যাঁর ঐশ্বর্য্য আছে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি আছে তাঁর চরিত্র যেমন অলৌকিক তেমনি অদ্ভুত। ও চরিত্র ভক্তি করবার জিনিষ, অনুকরণ করবার জিনিষ নয়। আমি সেই সঙ্গে বলি যে, ও চরিত্র আমাদের পক্ষে বোঝবার জিনিষও নয়। লৌকিক মন অলৌকিক মনের সাক্ষাৎ পেলে শুধু "হাঁ" করে থাকতে পারে—রা কাড়তে পারে না।

এই সূত্রে প্রশ্নকর্ত্তার আর একটী প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তিনি জান্‌তে চেয়েছেন যে, মহাপুরুষকে দিবারাত্র পথে ঘাটে শঙ্খ ঘণ্টা ধূপ দীপ দিয়ে পূজা কর্‌লে তাঁর অহমিকা বাড়ে কি না? মহাপুরুষের মনের উপর কোন্ জিনিষের কি ফল হয়, সে কথা বল্‌তে পারেন শুধু মহাপুরুষ। ও রকম ভক্তির বাড়াবাড়ি ও হুড়াহুড়িতে যদি সত্যই কোন কুফল ফলে, তাহলে তার জন্য দায়ী তাঁর ভক্তরা।

তারপর প্রশ্ন হচ্ছে স্বদেশপ্রেম কাকে বলে? এর উত্তর-আপনার দেশের প্রতি যে মমতা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। স্বদেশপ্রেম ও পলিটিক্স অবশ্য এক জিনিষ নয়। স্বদেশপ্রেমিক সবাই হতে পারে, কিন্তু পলিটিসিয়ান সবাই হতে পারে না। তাই অনেক স্বদেশপ্রেমিক আছে যারা পলিটিসিয়ান নয়, অপর আবার তেমনি অনেক পলিটিসিয়ান আছে যারা পলিটিসিয়ান নয়। স্বদেশপ্রেম হচ্ছে একটা মনোভাব—আর পলিটিক্স হচ্ছে একটা কাজ। কবি ও কর্ম্মীর ভিতর প্রভেদ কি, সে বিষয়ে ত অনেক লেখালেখি হয়েছে, তার থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, কবি স্বদেশপ্রেমিক হতে পারেন, কিন্তু কর্ম্মীই হচ্ছেন একমাত্র পলিটিসিয়ান। পৃথিবীতেও দুই চাই, কারণ পৃথিবী নামক দেশটা আধখানা ভাবের দেশ আর আধখানা কাজের দেশ। কথাটা যে ঠিক তা বোঝাতে গেলে এমন অনেক কথা বল্‌তে হয় যার উপর অনেক তর্ক চলে। অতএব সে সব বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ।

আমার বিশ্বাস যেসব জিনিষ নিয়ে প্রশ্নকর্ত্তার মনে খটকা লেগেছে সে সব আসলে কথার মানে নিয়ে। ধর্ম্ম শব্দের নানারকম মানে হয়, সুতরাং এ কথা দিয়ে নানারকম

মানসিক গোলযোগের সৃষ্টি করা হয়। পলিটিক্স কথার অর্থও স্পষ্ট নয়। কারণ পলিটিক্স বল্‌তে আমরা ইকনমিক্সও বুঝি। রাজনীতির উপর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত অথবা অর্থনীতির উপর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত তা নিয়ে আজও তর্ক চলছে। সুতরাং politicsএর সঙ্গে religionএর বিবাহ দেওয়ার অর্থ ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থের বিবাহ দেওয়া। এ মিলনের ভিতর কিছু না কিছু বিরোধ থাকবেই থাক্‌বে, কিন্তু তাই বলে কেউ ধর্ম্মচ্যুত অর্থ ও অনর্থক ধর্ম্মের পক্ষপাতী হতে পারেন না।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেছেন যে, সাত্ত্বিক লোকে পলিটিসিয়ান হতে পারে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, সাত্ত্বিক শব্দের অর্থ কি? এ দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, তামসিকতাই সাত্ত্বিক নামে চলে যায়। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণা নারীসঙ্ঘ।

বাঙ্গালার দশটি প্রধানা লেখিকার নাম।

বছর পাঁচেক হ'ল কল্‌কাতা সহরে একটী নারীসমিতি স্থাপিত হয়েছে, কেবলমাত্র কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভূষিত মেয়েরাই তার সভ্য হ'তে পারেন। তার উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বত্র সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধন, মিলিতভাবে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের যোগরক্ষণ ও সাধারণতঃ বিদ্যাচর্চ্চা এবং বর্ত্তমান সমস্যার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ। এ সভার কোন বাংলা নামকরণ হয় নি, কারণ প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়-উপাধিধারীর কোন সহজবোধ্য স্বদেশী শব্দ এ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় নি, "গ্র্যাজুয়েট" শব্দেই কাজ চালাতে হয়; দ্বিতীয়তঃ এর উৎস অনুসন্ধান কর্‌তে হ'লে বিলাত পর্য্যন্ত যেতে হয়। সেখানে আরো কয়েক বৎসর পূর্ব্বে International Federation of University Women (সংক্ষেপে I. F. U. W.) নামক একটী সভা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্ত্তমানে প্রায় আঠারটি বিভিন্ন দেশে তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণাদের এই জাতীয় সভাকে সেই দেশের National Unit বলা হয়, তারা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হলেও উক্ত মূল মাতৃসমিতির সঙ্গে সামাজ্য চাঁদা-সূত্রে গ্রথিত এবং সৌরমণ্ডলের ন্যায় একটী প্রকাণ্ড পরিবারভুক্ত। আমাদের এই ভারতীয় সমিতিটী বোধ হয় সকল হিসেবেই কনিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ। এর নামটি Federation of Indian University Women (সংক্ষেপে F. I. U. W.)। তবে এর সঙ্গে বোম্বায়ের গ্র্যাজুয়েট নারীসভা এবং ভারতবাসী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণা মণ্ডলী যোগ কর্‌লে এটি ওজনে ভারী হয় এবং তখন এর নামও ঈষৎ বদ্‌লে Fed. of University Women in India এইরূপ (সংক্ষেপে F. U. W. I.) হয়। এই যুক্ত সমিতি ঐকাডোরে বাঁধবার নিয়মাদি আপাততঃ বিচারাধীন। এঁরা আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে কখনও একক ও কখনও যুক্তভাবে কাজ করবেন। মিলিত কাজের নমুনাস্বরূপ বলা যেতে পারে, তাঁরা কলেজের মেয়েদের একটি ছাত্রী নিবাসের আবশ্যকতা বোধ করায় তার জন্য সম্প্রতি চাঁদা তুল্‌তে ব্যস্ত আছেন। অবান্তর হ'লেও এখানে ব'লে রাখি যে এ কাজে যাঁদের সহানুভূতি আছে তাঁরা, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত পুরুষরা যদি এই উদ্দেশ্যে যৎকিঞ্চিৎ দান কর্‌তে ইচ্ছা করেন, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে তা সাদরে গৃহীত স্বীকৃত এবং যথাসময়ে উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে।

কর্ম্ম বিভাগেই কর্ম্মের সুশৃঙ্খলা, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সমিতিকে

আমরা কুদ্রতর কয়েকটী শাখাসমিতিতে বিভক্ত করেছি। তার মধ্যে সাহিত্য শাখা যে কাজটি প্রথম হাতে নিয়েছে,' তার সহায়তা প্রার্থনা করাই এই বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক ফরাসী মহিলাবন্ধু আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের দেশের কয়েকটী বিশিষ্ট লেখিকার সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ তাঁদের গদ্য-পদ্য রচনার নমুনা যেন ইংরাজীতে তর্জ্জমা ক'রে পাঠাই; তিনি আমার তা ফরাসীতে তর্জ্জমা ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রবেন; কারণ আজকাল ফরাসী মেয়েদের মধ্যে ভারতীয় নারী সম্বন্ধে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে। আমরা তাই কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভর না করে' বাঙ্গলাদেশের পাঠক পাঠিকাসাধারণের দ্বারস্থ হলুম; তাঁরা যদি আমার এই নির্ব্বাচন ব্রতে সাহায্য করেন এবং তাঁদের মতে ব্রিটিশযুগের দশটী শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-লেখিকা ও তাঁদের দুই একটী শ্রেষ্ঠ রচনার নাম লিখে আগামী শ্রীপঞ্চমীর (১৮ই জানুয়ারী ১৯২১-এর) মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করেন, তা হ'লে বিশেষ বাধিত হইব।

২০ মেকেঞ্জার,
বালীগঞ্জ,
কলিকাতা।

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী
প্রেসিডেণ্ট, F. I. U. W.

শ্রীজগৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসনা প্রেস, ১৪এ শরৎ বোষের ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৯শ বর্ষ | ১৩৩২ | কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ,

জলের রাণী *

ওগো জলের রাণি,
ঢেউ দিয়োনা ঢেউ দিয়োনা গো
আমি যে ভয় মানি ॥
কখন্ তুমি শান্ত গভীর, কখন্ টলমল,
কখন্ আঁখি হাস্যমদির, কখন্ ছলছল,
কিছুই নাহি জানি ॥
যাও কোথা চঞ্চলি,
লওগো ব্যাকুল বকুল বনের
মুকুল অঞ্জলি ॥
দখিণ হাওয়ায় বনে বনে জাগল মরমর
তোমার বুকের পরে পুলক ভরে কাঁপুক থরথর
সুনীল আঁচল খানি ॥
হাওয়ার দুলালি
নাচের তালে শ্যামল কূলের মন ভুলালি।
অরুণ আলোর মাণিক মালা দোলাব ঐ স্রোতে,
দেবো তোমার হাতে গোপন রাতে আঁধার গগন হ'তে
তারার ছায়া আনি ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* কবি একখানি নূতন নাটক লিখিতেছেন, ইহা তাহার আরম্ভের প্রস্তাবনা-গীতি।

স্বদেশীসভার সভাপতিত্ব।

অল্পদিন হইল কলিকাতা সহরে স্বদেশীকালীর প্রবর্ত্তক বাগ্চী মহাশয়ের স্মৃতি উপলক্ষ্যে একটি সভা আহূত হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বার অ্যাটল। সভার উদ্যোক্তাগণের অন্যতম শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচন কালে ব্যোমকেশ বাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে এই বলিয়া জোর দিলেন যে তিনি "বারেন্দ্র কুলভূষণ"। শ্যামসুন্দর বাবুর প্রস্তাবের সমর্থনকারী কোন বারেন্দ্রশ্রেণীর পণ্ডিতও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঐ বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়াই তাঁর সভাপতিত্বের দাবীটি সভা হইতে মঞ্জুর করাইতে চাহিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু ক্ষমা করিবেন যদি আমি স্বীকার করি তাঁর এই ঝোঁকটা আমার কানে একটা বেসুরা তানের খটকা লাগাইয়া দিয়াছিল। পি, এম, বাক্‌চীর কালী-আবিষ্কর্ত্তা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁর জন্য লোকসভা আহূত হয় নাই, শুধু বারেন্দ্র মর্য্যাদার দিক দিয়া তিনি স্মরণীয় হইলে তাঁর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটা জ্ঞাতি ভোজ দেওয়াই সঙ্গত হইত। তিনি একটা স্বদেশী বস্তুর আবিষ্কর্ত্তা বা প্রচারকর্ত্তা হইয়াছিলেন বলিয়াই স্বদেশনেতৃগণকে এবং স্বদেশী-মাত্রকে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনার জন্য সেদিন সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। আর ব্যোম-কেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা তাঁর বারেন্দ্রত্বের উপর নির্ভর করে নাই,—সেদিন তিনি বারেন্দ্র বা রাঢ়ী, ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য, বাগ্দী বা নমঃশূদ্র সে কথাটা সভার সামনে আনা অপ্রয়োজন ছিল—তিনি স্বদেশী যুগের একজন স্বদেশীকর্ম্মী এবং বর্ত্তমানেও তাঁর সেই স্বধর্ম্ম, ভস্মে প্রচ্ছন্ন অগ্নির মত কোন কোন দিকে আত্মবিকাশ করে এই তাঁহার সেদিনকার সভায় সভাপতি হওয়ার দাবী। সেই দাবীটাই সভামধ্যে পেশ করিয়া তাঁর সভাপতিত্ব মঞ্জুর করার প্রয়োজন ছিল। অবান্তর দলিল দস্তাবেজ বাহির করিয়া সভার সময় নষ্ট করা এবং বারেন্দ্র ও অ-বারেন্দ্রর মধ্যে অযথাক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগ উত্থাপন করা শুধু নিষ্প্রয়োজনীয় হয় নাই, অনুপযুক্তও হইয়াছিল।

শ্যামসুন্দর বাবু স্বয়ং রাঢ়ী বা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা আমরা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না। সেই অজ্ঞতার দরুণ দেশনায়ক হিসাবে তাঁর প্রতি ভক্তির ন্যূনতা কোনদিন হয় নাই। এবং সেদিন যে তাঁরই জবানী জানিতে পারিলাম যে তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-রাঢ়ী নয়,—সেই জ্ঞানের দরুণ তাঁর প্রতি ভক্তির পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল না। জনসভায় আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাত্যভিমান বর্জ্জন করিতে হইবে, নতুবা আমরা এক মহাজাতি হইয়া গড়িয়া উঠিব কেমন করিয়া?

আমরা মনে করি সেদিনকার সভায় ৺ কিশোরীমোহন বাক্‌চীর স্মৃতি উপলক্ষ্য মাত্র ছিল, লক্ষ্য ছিল সেই সভার ছত্রতলে স্বদেশী নেতাদের একত্র করিয়া সর্ব্ববিষয়ক স্বদেশীর পুনঃ-

প্রবর্ত্তনের হাওয়া বহাইয়া দেওয়া। সেদিনকার বক্তার তালিকাই তাহার প্রমাণ। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশী সম্বন্ধে যে একটা জোয়ার আসিয়াছিল তাতে সব প্রথম যাঁরা গা ভাসাইয়া ছিলেন—মিঃ জে চৌধুরী, বিপিনবাবু, হীরেনবাবু প্রভৃতি—নির্দ্দিষ্ট বক্তাদের মধ্যে তাঁরাই প্রধান ছিলেন। জে চৌধুরী মহাশয়ের স্বদেশী ষ্টোর সেকালের স্বদেশী চেষ্টার একটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান। শুধু ব্যবসাগত নয়, তাঁর প্রাণ হইতে উত্থিত ব্যক্তিগত স্বদেশীপ্রীতি তাঁর গৃহের সাজসজ্জায়, নিজের বসনভূষণে সেকালে মূর্ত্তিমতী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিন পাল ও হীরেন দত্ত মহাশয় সেদিনকার শিক্ষাবিভাগে বিদেশিষ্টা ভাঙ্গা ও স্বদেশিভাগড়ার পাণ্ডা ছিলেন। সে যুগের ন্যাশন্যাল কৌন্সিল অব্ এডুকেশন আজ বেঙ্গল টেক্‌নিক্যালে বিকশিত। আর ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রথম যুগের দেশ হিতকারী সব রকম অনুষ্ঠানের সঙ্গেই এত ওতঃপ্রোত ছিলেন যে যখন নন্-কো-অপেরেসনের সাপক্ষে গান্ধি মহারাজের অনুরোধে আমি প্রথম মিটিং আহ্বান করি, দলে দলে ছেলেরা আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করে,—"আজ কি, চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোথায়? তিনি কেন এ আসরে নামলেন না? তাইত কেমন খট্‌কা লাগছে।"

নাই নাই করিয়াও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এ যুগের স্বদেশের ঝোলে ঝালে বা অম্বলে কোথাও না কোথাও রহিয়াছেন। এ কালেও মাত্র গত বৎসর একটি স্বদেশী ব্যাপারে বিপুল-সাহসে সম্ভাবিত বিপদ্‌বরণের দ্বারা নেতৃত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক যখন যায় যায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজের সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক দিয়া সেই সময় তাকে বাঁচাইয়াছেন। জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান সহায়। ইংরেজ বণিকের সহায়, ইংরাজী ব্যাঙ্ক; দশের টাকায় দশের কাজ, দশের কাজে দশের লাভ—এই হইল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের মূল সূত্র। যে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি, সে বাণিজ্য-প্রাসাদের ভিত্তি মহাজনের বা ব্যাঙ্কের অর্থবলের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেই ভিত্তির গোড়া নড়িলে দেশের লক্ষ্মীও যাই যাই করেন।

ইংরেজ জাতির আদত গুণ এই—দলবদ্ধভাবে স্বজাতির রক্ষণ বা স্বজাতিপোষণ—তা ত্যাগে, ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হউক। শোনা যায়—একটি বড় সাহেবী ব্যাঙ্ক যখন আভ্যন্তরীন গোলযোগে ডুবডুবু হইল, সাহেব কর্ত্তৃপক্ষরা যখন দেখিল ব্যাঙ্ক ডুবিলে শত সহস্র সাহেব খাবি খাইবে—কেন না এ ব্যাঙ্কে সাহেবদেরই টাকা বেশী - অমনি নিজেদের ভিতর পরামর্শ আঁটিয়া ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার স্থলে আরও কিছু টাকা ফেলিয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেক বড় বড় সহরে ধুমধাম করিয়া শাখা প্রশাখা খোলা হইল; জানান হইল ব্যাঙ্ক সামলিয়া লইয়াছে, এখন খুব বেশী লাভজনক হইতে চলিয়াছে। মিথ্যা ঘোষণায় দেশীয়দের প্রলুব্ধ করিয়া তাদের টাকা ব্যাঙ্কে আকর্ষণ করা হইল। সাহেবদের নিঃশব্দে ব্যাঙ্ক হইতে নিজেদের টাকা তুলিয়া লইতে অবসর দেওয়া হইল। যখন ফুটা নৌকায় দেশী যাত্রী ভরিয়া গেল, সাহেবরা সরিয়া পড়িল, তখন আর ছিদ্র টাকার বা জল ছেঁচার বৃথা পরিশ্রম অনাবশ্যক বোধ করিয়া নৌকা ডুবিতে দেওয়া হইল। দেশীয়দের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া স্বজাতিকে রক্ষা করা হইল। এত

বড় নিষ্ঠুর ছুঁচোর পাপ হজম করিল স্বজাতিপ্রীতির দোহাই। গিনির মূল্য কমান সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার দেশী ব্যাপারীদের সঙ্গেও ঠিক এই চালটাই চালিয়াছিলেন বলিয়া নাগপুর স্পেশাল কন্‌গ্রেসে অভিযুক্ত হন। সে সময় ইংরেজ ব্যাপারীদের সামলাইয়া লইবার অবসর দিয়া দেশী ব্যাপারীদের ডুবান হয়। দেখা যাইতেছে ইংরেজ জাতের "Even failings lean to virtue's side"—তাদের প্রবঞ্চনারূপ পাপও স্বজাতিপ্রেমরূপ পুণ্যের দিকে ঝোঁকা। স্বজাতি পোষণটা তাদের একটা বিশেষ বৈলক্ষণ্য। যদি দেশী দোকানে বিলিতি কাঁচি ছ' আনায় পাওয়া যায়, আর হ্যারিসন হাথওয়েতে সেই কাঁচিই পাঁচসিকাতে পাওয়া যায়, ইংরেজ স্বজাতিকে পাঁচসিকা দিতে প্রস্তুত হয়, দেশীকে ছ আনা দিতে রাজী হয় না।

আমাদের প্রত্যেকের 'স্ব' টা কিন্তু স্বজাতি পর্য্যন্ত ওরূপ ভাবে প্রসারিত নয়, প্রায় প্রত্যেকের স্ব নিজের নিজের শরীরে আবদ্ধ, তার বিস্তৃতির দৌড় স্ব শরীর জাত পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত। তাই স্বদেশ জাত সব রকমের কলাকৌশলের পোষণ আমরা সবাই করি না। আজ কাল আংশিকভাবে স্বদেশী কেহ কেহ হইয়াছি, কিন্তু পূর্ণভাবে হওয়ার প্রবৃত্তি নাই, কেন না পূর্ণ স্বজাতি প্রেমের প্রেরণা নাই, সমগ্র জাতিতে আত্মবিস্তৃতি বোধ নাই। তাই কেউ বা স্বদেশী কালীর পক্ষপাতী, কারণ তাহাতে হয়ত আমার ব্যক্তিগত বা পরিবার গত লাভ আছে—কিন্তু স্বদেশী ব্যাঙ্কের পোষক নই, কেন না তাহাতে আমার শেয়ার নাই বা হাত নাই, তাতে দেশের অন্য দশটা লোকের ক্ষতি বৃদ্ধি মাত্র—সে দশের সঙ্গে আমার একাত্মবোধ প্রসারিত করি নাই। স্বদেশী কালী বা যে কিছুর আবিষ্কর্ত্তার সম্মান উদ্দেশ্যে যাঁরা জনসভার আয়োজন করেন, এবং যাঁরা সেই আয়োজনে যোগদান করেন—বিশেষতঃ মুখ্য স্থান গ্রহণ করেন—তাঁদের এক বিষয়ে স্বদেশীর পোষক হওয়া এবং আর বিষয়ে স্বদেশীর দ্বেষক হওয়া শোভা পায় না। তাঁরা প্রকারান্তরে স্বীকার করেন স্বদেশী যা তা স্বদেশী, কালীই হউক আর কাপড়ই হউক, ব্যাঙ্কই হউক আর ব্যাপারই হউক—একটার পোষণ করিব আর অন্যটার করিব না, অসঙ্গত। যদি বিলাসিতা চাই সৌখীনতা চাই আপাততঃ দেশের কলা বা কলের দ্বারা সেটা যতদূর সম্ভব ততদূরই করিব। দেশী কালীতে যেখানে কাজ চলে, সেখানে বিদেশী কালী ব্যবহার করিব না, দেশী কাপড়ে যে স্থলে ভদ্রতা রক্ষা হয় সে স্থলে বিদেশী কাপড় গায়ে দিব না; দেশী ব্যাঙ্কে যদি লেন দেন সুগম হয়, বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিব না,—এই রকম প্রত্যেক বিষয়ে স্বদেশী পোষণ সম্বন্ধে দৃষ্টিপাত যাঁর আছে তিনিই এরূপ জনসভার সভাপতি পদের যোগ্যতা রাখেন—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হউন বা না হউন,—কেন না তিনি নিজের আচরণের দৃষ্টান্তের দ্বারা সভাস্থ সকলকে তাঁর প্রদর্শিত পথে আহ্বান করিবেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

THE CALCUTTA REVIEW OFFICE
CALCUTTA UNIVERSITY

জোয়ার ভাঁটা

উপন্যাস

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কথাটা বলিতে বলিতে মুরলার সহসা ঐরূপ থামিয়া পড়ার একটু হেতু ছিল। শ্যামাকান্তের উক্তির যেখানটায় আসিয়া তাহার স্বর আটকাইয়া গেল, ইহার ঠিক পরেই ছিল—সমাজের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করেন। কিন্তু এটুক যেন মুরলার মুখ থেকে বাহির হইতে চাহিল না। তাই সে উক্তিটাকে সম্পূর্ণ না করিয়া একটু বাদ দিয়াই তাহার কথাটা এক রকমে সারিয়া ফেলিল।

বক্তা বা তাঁহার আবৃত্তিকার শ্যামাকান্তের পক্ষে এ মতটা এমন ভাবে প্রচার করিতে কোন বাধা না ঠেকিতে পারে, কিন্তু বিধবা মুরলার মুখ হইতে বৈধব্যের এতটা দাবীর প্রতিষ্ঠায় একটু দ্বিধা ঘটিবারই কথা। তবে ভোলানাথের সমক্ষে মুরলা বোধ হয় এই দ্বিধাটুকু কাটাইয়া উঠিত, কারণ এই ঐ, পুরা মতটার পুরো সমর্থনই ছিল তার একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঠিক এই সময় আর একজন সেখানে আসিয়া বাহিরের রোয়াকে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সরোজকুমারকে দেখিয়াই মুরলার রসনায় কেমন একটু জড়ত্ব জন্মিয়া গেল। তাহা হইলেও কন্যার এই অপূর্ণ কথাতেই শ্যামাকান্তের পূর্ণ উক্তিটাই ভোলানাথের মনে পড়িল। বক্তার এই মতটা একটু অদ্ভুত রকম বলিয়াই বোধ হয় ভোলানাথের মনে এটা একটু বিশেষ লাগিয়াছিল। যাই হোক, বেদান্তবাগীশ ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ে বড় একটা যুক্তি-তর্কের দিকে যেঁষিলেন না, কিন্তু শ্যামাকান্তের আবৃত্তির প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা এবার যেন এক নিমিষে উড়িয়া গেল, তিনি পুরো মতটার পুরোপুরি প্রশংসা ও সমর্থন করিয়া তাঁহার বক্তব্য সম্পন্ন করিলেন।

এই ধারণাটার উপর মুরলার যে একটু সংশয়ের ছায়া পড়িতেছিল, এবার বেদান্ত-বাগীশের এমন প্রবল সমর্থনে সেটুক অবশ্য একেবারেই কাটিয়া গেল। সরোজের দর্শন-জনিত সঙ্কোচকে সে এবার জোরে ঠেলিয়া রাখিয়া আবার বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ভোলানাথ ধূমপানের কাজটা সারিতে উঠিয়া পড়িলেন, সরোজের সঙ্গে এখন তাঁহার একটু বাজারে যাইবার দরকার।

মুরলার এবার সেখান হইতে সরিবারই সম্ভাবনা, সরোজের সংস্রবটা ত সে বড় নিরাপদ মনে করিত না। কিন্তু আজ সে আর চকিতা হরিণী নয়, আজ সে যেন বলদৃপ্তা কেশরিণী। আজ সে যেন সমস্ত ভীতি ও সঙ্কোচের অতীত এক অপূর্ব্ব তৈজস ধামে উঠিয়া পড়িয়াছে। ভোলানাথের মত শাস্ত্রজ্ঞানীর সমর্থনে তাহার শিরায় এখন শক্তির প্রবাহ যেন দ্বিগুণ বেগে

খেলিয়া গেল। তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্যটুকুর উপর এখন তাহার মনে একটা অবজ্ঞা ও আক্রোশের ভাব জাগিয়া উঠিল। সে ঐ সঙ্কোচটাকে বিশেষরূপে সাংঘাতিক করিবার জন্যই যেন কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে সরিয়া পড়া দূরে থাক, সে বেশ সহজ ও স্পষ্ট স্বরেই সরোজকে ডাকিয়া বলিল,—

"সরোজদা, দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এসে বসুন না।"

এতদিন মুরলা যে সরোজের সম্মুখে বড় আসিত না, এটা সরোজ একটু লক্ষ্য করিলেও, ইহাতে তেমন কিছু বিশেষত্ব সে দেখিতে পায় নাই। কারণ মুরলা ও তাহার মধ্যে ব্যবধান যে কোন দিক দিয়া তেমন কিছু কমিয়াছে, ইহা তাহার মনেই কখন পূর্ব্বে আসে নাই।

কিন্তু মুরলার আজকার এই আকস্মিক মুক্ত ভাবটা সরোজের মনে বড়ই যেন লাগিল। মুরলার এমন স্পষ্ট ও সহজ কণ্ঠটাই তাহার কাছে নিতান্ত অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া ঠেকিল। সরোজের বোধ হইল মুরলার এই মুক্ততা এমন সহজ ভাবে প্রকাশ পাইলেও, বাস্তবিক ইহা যেন নিতান্তই একটা জোরাবরি। কি একটা স্বাভাবিক বন্ধন যেন সহসা ছিঁড়িয়াইয়া এমন অস্বাভাবিক মূর্ত্তির আকার ধরিয়াছে। স্ত্রীজাতির লজ্জাটুকু সরোজের খুব ভাল লাগিলেও সে তাহাদের জড়ত্বটা অবশ্য পছন্দ করিত না। মুরলার বর্ত্তমান আচরণটা সরোজের কাছে স্বাভাবিক ঠেকিলে, সে নিশ্চয় ইহার খুব প্রশংসাই করিত। কারণ ইহাতে যেমন জড়ত্ব ছিল না, তেমনই কোনরূপ নির্লজ্জতাও ছিল না। কিন্তু মুরলার এই ভাবটার মধ্যে এমন যেন কি একটা সরোজ অনুভব করিল, যাহাতে তাহার মনে প্রশংসার ভাব তেমন উঠিলই না, বরং কেমন যেন একটু করুণাই জাগিল।

তাই মুরলার ঐ সহজ আহ্বানের একটা সহজ সাড়া সরোজের নিকট হইতে মিলিল না। সরোজ মুরলার আহ্বানে ভিতরে গিয়া বসিল বটে, কিন্তু তাহার চেহারায় কেমন যেন একটা স্বচ্ছন্দতার অভাব ফুটিয়া উঠিল। সে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এ ভাবটাকে একেবারে গোপন করিতে পারিল না।

মুরলা সরোজের এই ভাবটুকু লক্ষ্য করিল, কিন্তু তাহার কাছে ইহার ব্যাখ্যা অবশ্য অন্য রকম রূপ ধরিল। মুরলা ভাবিল, তাহাদের পিতাপুত্রীর প্রশ্নোত্তর শুনিয়াই সরোজের মনে এমন একটা ভাবান্তর ঘটিয়াছে। সরোজের ঐ গম্ভীর ভাবটুকু আর কিছু নয়, ঐ প্রশ্নোত্তরের প্রতি তাহার নীরব উপেক্ষা মাত্র।

অনেক দিনের পর মুরলা সরোজের সম্বন্ধে আজ একটা শুধু অসঙ্কোচ দেখাইতে পারিয়াই বোধ হয় ক্ষান্ত থাকিত। কিন্তু সরোজের প্রতি তাহার আরোপিত ঐ কল্পিত উপেক্ষাটা মুরলার আবেগে উচ্ছ্বসিত মনের উপর যেন একটা খোঁচা লাগাইল। সে এই খোঁচার একটা শোধ না দিয়া আজ থাকিতে পারিল না।

মুরলা সরোজের ঐ কল্পিত উপেক্ষাকে যেন উপেক্ষা করিয়া একটু স্মিত মুখে কহিল,"সরোজ-দার কাছে এটা বুঝি একটা হাসির জিনিষ বলে, মনে হ'ল?"

তাহার ঐ মুক্ত আচরণ অপেক্ষা তাহার এই কড়া প্রশ্নটা সরোজের নিকট বড় কম বিস্ময়কর ঠেকিল না। মুরলার আকস্মিক মুক্ত আচরণের মত তাহার এই আকস্মিক প্রশ্নের ভাবটাও সরোজ প্রথমে ভাল রকম যেন ধরিতেই পারিল না। সে সহসা কোন জবাব দিতে না পারিয়া পাল্টা জিজ্ঞাসা করিল, –

"কোনটা ?"

আবার সরোজের এই পাল্টা প্রশ্নের ব্যাখ্যাতেও মুরলা বেজায় ভুল করিল। মুরলা মনে করিল, সরোজ নিজের উপেক্ষাকে যেন আরও চাকিয়া উপভোগ করিতেই এমন বিশেষ রকম জানিয়াও আবার তাহার মুখ হইতে কথাটাকে শুনিতে চাহিতেছে।

মুরলা এবার তাই বেশ একটু চটা বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "কেন যেটা আপনার আলোকিত মনের সমুখে যেন একটা জমাট আঁধারের মত খাড়া হয়ে উঠেছে।"

সরোজ এবার মুরলার প্রশ্নটা অবশ্য বেশ বুঝিল, কিন্তু তাহার এই চটিয়া ওঠার ভাবটুকু সে তেমন বড় বুঝিতে পারিল না। সরোজ অবশ্য খুব ধীর কণ্ঠেই উত্তর দিল, "ও, ঐ যে মতটার কথা হচ্ছিল, তাই বলছ বুঝি ?"

"হাঁ, ঐ মতটাকে কোন মতেই কেউ কি আমল দিতে পারে না ?"

সরোজের এখন তর্ক করিবার কোন ঝোঁকই পড়িল না। ঐ মতটা তাহার কাছে যতই অদ্ভুত ঠেকুক, সে সম্বন্ধে কোন রকম মাথা ঘামাইতে যেন সে বড়ই এখন অনুৎসাহী।

সরোজ শুধু বলিল "তা কেউ পারবে না কেন ?"

মুরলা কিন্তু এত সহজে কথাটাকে ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। সে একটু সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"অপরের কথা থাক আপনি নিজে ?"

"আমি ওটাকে বড় বুঝি নাই।"

মুরলা এবার একটু ব্যঙ্গোক্তি করিল "কেন, আপনাদের নতুন বিশ্বাস ওটা কেমন কেমন ঠেকে,—না ?

"তা কিছু ঠেকতে পারে বৈ কি। তবে ওটা নিভাজ বিশ্বাসের কথা, বিশ্বাসের উপর যতটা পারে খাড়া থাক। জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে ওটাকে ঠেলে তোলবার দরকার নেই—বোধ হয় তোলাও অসম্ভব।"

মুরলা সরোজের কথাটা উল্টাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তার মানে, আপনার পক্ষে জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে ওটাকে ঠেলে ফেলাই বুঝি বেশ সম্ভব ?"

সরোজ এবার একটু হাসিয়া বলিল, "আমার কথা থেকে এতটা মানে এখন নাই বা টেনে বার করলে। আমি ওটাকে তোলবার কি ফেলবার কোন রকম কাজেই এখন অগ্রসর হতে অপারগ।"

কথাটার মধ্যে সরোজকে এইরূপ পাশ কাটাইতে দেখিয়া মুরলাও এবার একটু সগর্বে থামিয়া পড়িল। সে বেশ একটু উচ্ছ্বসিত ভাবেই বলিল, "সরোজদা, কেউ ওটাকে তুলুক বা

ফেলুক তাতে কিছুই আসে যায় না। ও মতটার জন্মস্থান বড় সামান্য নয়। মনে রাখুন, ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মন থেকেই ওটা উদ্ভূত হয়েছে।"

এই বলিয়া যেন বিস্ময়ের আলোক চারিদিকে বিসর্পিত করিয়া মুরলা সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইল। ত্রিকালজ্ঞ ঋষির দোহাই দিয়া এই মতটা এত সহজে এমন জবর হইয়া উঠিতে পারে কি না, অন্য সময়ে সরোজ হয়ত এইটাই আলোচনা করিত। কিন্তু তাহার চিত্ত এখন এই মত অপেক্ষা মতধারিণীর দিকেই বেশী উন্মুখ হইয়া রহিল। মুরলার এই অদ্ভুত মত অপেক্ষা তাহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তনটাই সরোজের মনের চারিপাশে যেন ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

ভোলানাথের তামাক চিলিমটা প্রায় ছাই হইয়া আসিল। তাঁহার ছাত্র ও ছাত্রীর কথা-বার্ত্তা তিনি রোয়াকে বসিয়া কতক শুনিতেছিলেন, কিন্তু ইহার শেষ পর্য্যন্ত তিনি একটিও বাক্য নিষ্পত্তি করেন নাই। মুরলার এই নূতন ভাবটা সরোজের কাছে যতই রহস্যপূর্ণ হৌক ভোলানাথের অবশ্য বেশ রোচকই লাগিল। মতটার সম্পর্কে তাঁহার আন্তরিক ধারণা যাহাই থাক, শ্যামাম্বরের বাকচাতুরীর তিনি একটু বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রামখানি বিবাহ ও পূজার বাজনায় ভরপুর। বাসন্তী-ঠাকুরাণী এবার বসন্ত কাবার] করিয়া বৈশাখের মধ্যে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। নূতন বর্ষে প্রজাপতিও অবশ্য তাহার নূতন সংসার পত্তনের কাজে বেশ আগ্রহেই লাগিয়াছেন।

ওপাড়ার মুখুয্যেদের বাড়ী বিসর্জ্জনের ঢাক গজরাইয়া উঠিল। মেয়ে মহলে অমনই একটা সাজ-সজ্জার সোরগোল পড়িয়া গেল। পল্লীর পথগুলো একটু পরেই বিচিত্র বসন ও ভূষণের আভায় চম্‌কাইতে লাগিল। বেদান্তবাগীশের বিধবা কন্যার কোন রকম পরিচ্ছদের মোহ থাকিবার কথা নয়। তাহার মনের কোণে ও কানায় ইহার ছিটা ফোঁটা যাহা কিছু লাগিয়াছিল, তাহাও যেন এই কয়দিনের সেই নূতন উত্তেজনায় একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। তবে মুরলা এখনও ঠেট ধরে নাই। সে একখানা মোটা অথচ ফর্সা শাড়ী পরিয়া রায়-বুড়ীর সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। এই রায়-বুড়ীটি ভোলানাথের গৃহের ঠিক বাঁধা না হৌক আধা ঝি।

পথে দানু দত্তের শুভ বিবাহ উপলক্ষে জল সওয়ার মিছিল বাহির হইয়াছে। দানু দত্তের পুত্রবধূর মাথায় ছিল মঙ্গল ভাড়। আর তার কন্যার হাতে ছিল শ্রী। কথাটা রাম না হইতে রামায়ণের মত একটু শুনাইল বুঝি! কিন্তু মনে রাখা উচিত, দানু দত্ত পুরুষ মানুষ। সে ইচ্ছা করিলে চিতায় উঠিবার আগে পর্য্যন্ত এমন অনেকবার নিজের শুভ বিবাহের জল-সওয়াইতে পারে।

মুরলা এই মিছিলের পাশ কাটিয়া চলিয়াছে। বৈবাৎ তাহার আঁচলটা উড়িয়া দত্তদের

পুত্রবধূর কুলায় গিয়া ঠেকিল। বধূটি একটু যেন চম্‌কাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অসংযত আঁচলটা টান খাইয়া তখনই যথাস্থানে আসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু ইহারই মধ্যে সে সেই দত্ত-কন্যার করতল সমাসীনা কদলী-কলাই-তণ্ডুলাক্ষিকা শ্রীমূর্ত্তির চূড়াটি একটু স্পর্শ না করিয়াও ছাড়িল না।

এই ছোটখাট কাণ্ডটুকু নিমেষমধ্যে শেষ হইলেও, এটা দত্তজার আত্মীয়া বোসগিন্নীর শ্যেন-চক্ষুকে অবশ্য এড়াইল না। বধূটির মুখ ভতটা না ফুটুক, দত্ত-কন্যা কোন প্রতিবাদ করিবার আগেই, বোসগিন্নী যেন আছাড় খাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"ওমা, কি হ'ল গো।"

বোসগিন্নীর এই আকস্মিক আর্ত্ত চীৎকারে জল-সওয়ার সেই আমোদের আব্‌হাওয়াটা অবশ্য বেশ একটু বদ্‌লাইয়া গেল। মিছিলের মধ্যস্থ ও বহিঃস্থ অনেকেরই কানে এমন সময়ে এমন চীৎকারটা বড়ই অদ্ভুত ঠেকিল, তাহারা সকলেই একটা অপ্রত্যাশিত আশঙ্কায় একটু না আঁত্‌কাইয়া পারিল না। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে শানাই ও ঢোলের শব্দ পর্য্যন্ত নিভিয়া আসিল। বলা বাহুল্য—দামু দত্তের শুভ জল সওয়ার এতক বাজনাটি অবধি বেবাক অঙ্গই কেন, অটুট ছিল।

কিন্তু হায় বিধির বিপাকে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানের উপরেও কোথা হইতে সহসা যেন একটা কঠিন হানির কঠোর কুঠারের আঘাত পড়িল। সহসা রাকা যামিনীর বক্ষে অসার করাল ছায়া উঁকি মারিল। ভরপুর অমৃতের ভাণ্ডে কে যেন গরল ছিটাইল। কোকিলের তানের মাঝে কাক ডাকিল, ফুলরাশিতে কীট পশিল, সাদায় কালির আঁচড় পড়িল, শিব বিগ্রহের মধ্য হইতে ডারউইনের আদি পুরুষ যেন দাঁত খিচাইয়া উঠিল।

যাক, এতটা যে ঘটিল, এর মূল কারণটা কি? তরঙ্গিণীর জিজ্ঞাসায় বোসগিন্নী হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—

"ঐ আবাগীর আক্কেলটা কেউ দেখনি।"

এই কথাটা যাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইল, একজন প্রকাণ্ড দার্শনিক ও শাস্ত্রব্যাখ্যাতার মতে তিনি নাকি একটি বিধবাবেশী অবতীর্ণ দেবতা। কিন্তু বোসগিন্নীর এই ভাষার নমুনায় কোন রকম পূজা—স্তুতির অবশ্য বড় আভাস পাওয়া গেল না। মুরলার মনে নিজের দেবত্বের গর্ব্ব এখনও বেশ গর্‌-গর্‌ করিতেছিল। তাহার দ্বারা যে এই অনুষ্ঠানের কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে, এ ভাবটা এখন যেন তার খেয়ালে বড় আসিল না।

মুরলা একটু রুষ্ট স্বরে উত্তর করিল, "মিছামিছি গালমন্দ পাড়ছ কেন গা।"

দত্ত-কন্যা এবার একটু গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "একটু হুঁস্ করে' পথ চল্‌তে হয়।"

বোসগিন্নী সুর আরও চড়াইয়া টিপ্পনী কাটিলেন, "ও হুঁস্ করবে কেন, ওর ইচ্ছে, ওর কেমন পোড়া কপাল, সকলেরই কপাল ঐ রকম পুড়ুক।

বৃদ্ধা ও তরুণী উভয়ের দ্বারা এইরূপ আক্রান্ত হইয়া মুরলা একটু যেন হতবুদ্ধি বনিয়া গেল।

এই আক্রমণের কারণটা এখনও সে বড় ধরিতে পারে নাই। তাহার সেই চিন্তিত ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলী হইতে একজন প্রৌঢ়া বিধবা কহিলেন,—

"তা বাছা, আঁচলটা একটু সাম্‌লে নিতে হয়, দেখ্‌ছ ওরা এমন মতলব কাজে বেরিয়েছে।"

একজন আধা-বয়সী সধবা এই কথায় যোগ দিয়া বলিলেন,—"এমন বিধবাদের এ পথে দাঁড়ানই উচিত নয়, ছোঁয়া ছেড়ে ওদের মুখ দেখলেই এ সময় অকল্যাণ হয়।

বোসগিন্নী আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"তা ঐ শতেক খোয়ারী কি একটুও বুঝলে না!"

মুরলার সঙ্গিনী রায়বুড়ী এবার বোসগিন্নীকে একটু শান্ত করিতে চেষ্টা করিল। কহিল, "ছেলে মানুষ, অতটা জ্ঞান হয়নি গো।"

কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটিল। রায়বুড়ীর কথায় বোসগিন্নী একটা বিশেষ ইসারা ও ভঙ্গির সহিত হাতমুখ ঘুরাইয়া বলিল,—"তুমি আর ন্যাকামো কর'না বাছা। তোমার ও রকম কচি খুকীর এমন কত দেমাকই না দেখ্‌লাম। আবার দুদিনেই সে দেমাক চুমার হতেও বাকি রইল না।"

কয়েকজন ভদ্রবেশী যুবক সেইখান দিয়া যাইতেছিল। তাহারা সমস্ত শুনিয়া মুরলার মত যুবতী বিধবার এরূপ অপদস্থ ভাবটুকুতে বেশ একটু যেন আমোদ অনুভব করিল।

একজন এমন ঝগড়টা আরও একটু ঘোরাল করিবার চেষ্টায় বোসগিন্নীকে ডাকিয়া বলিল—

"দিদিমা, কার দেমাক গা?"

বোসগিন্নী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা মুরলার দিকে ফেলিয়া কহিলেন,—

"যার হতে পারে।"

আর একটি যুবক অমনই চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, 'তা ত হবেই, ও যে বয়েসের গুণ।"

ইহাদের আর একজন সঙ্গী তখনই বন্ধুদের কানের কাছে মুরলার দেমাক সম্বন্ধে কি একটা গানের পদ গুণ গুণ করিয়া আওড়াইল। তাহার এই রাগ সই রসিকতায় তাহার বন্ধুমহলে খুব একটা মজার তুফান যেন খেলিয়া গেল। তাহারা কোন রকমে তাহাদের উদ্দাম হাসির বেগটা একটু চাপিয়া রাখিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। দামু দত্তের শুভ বিবাহের শাঁক ও সানাই আবার কাতরাইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এই কি দেবত্ব, আর এই কি তার পূজা!—নিজের ব্যক্তিগত অপমান অপেক্ষা এই সামাজিক বৈষম্যটাই মুরলাকে যেন এখন বেশী করিয়া বিঁধিতে লাগিল। সে সামাজিক অনুষ্ঠানে বড় বেশী না মিশিলেও, এই সব প্রভেদ সম্বন্ধে তার জ্ঞান একেবারেই যে ছিল না, তাহা নয়। তবে এই সব বৈষম্য এতটা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে যে, অপর সাধারণের মত এ গুলো এত-

দিন তাহার চোখে পড়িলেও, মনে বড় লাগে নাই। কিন্তু আজ তাহার দেবগর্ব্বে অভিমানী হৃদয়ে এ গুলো কেমন যেন একটা অস্বস্তির হুল ফুটাইল।

যার আঁচলের এমন একটু বাতাসেই মঙ্গলের মধ্যে এতটা অমঙ্গল টানিয়া আনে, শ্রী এমন বিশ্রী হইয়া যায়, সে আবার কেমনতর দেবী। এই সামান্য ঘটনাটুকুর মধ্যে মুরলা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নিকট হইতে যে আচরণের আস্বাদ পাইল, তাহাতে এইরূপ একটা সংশয় তাহার মনে ধোঁয়াইয়া উঠিল। তাহার নূতন উত্তেজনার অমন উন্নত মাথার উপর যেন একটা অবসাদের গুরুভার একটু একটু করিয়া চাপিয়া বসিল।

কিন্তু এই ক্ষোভ ও অবসাদের মধ্যে একটা কথা তাঁহার মনটাকে আবার একটু চাঙ্গা করিয়া রাখিল। দেবতার পূজার জন্য যে ভক্তির প্রয়োজন, তাহা যে পথে ঘাটে সব যায়গায় মিলিবে, এতটা আর ত আশা করা যায় না। সমাজে বোসগিন্নীর মত কুবুদ্ধি লোক থাকিলে শ্যামাকান্তের মত সুবুদ্ধি লোকেরও ত অভাব নাই। অবোধের বৈষম্যের সৃষ্টি করিলেও, সুবোধদের কাছে সে-গুলো অবশ্য একান্ত নিন্দনীয়। মুরলা এইরূপ একটা সান্ত্বনায় তাহার বর্ত্তমান অবসাদটাকে মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মুখুয্যেদের বাড়ী লোকে লোকারণ্য। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো পণ্ডিত-মূর্খের একত্র সম্মিলন। বড়বৌয়ের সাধের পূজায় কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি ঘটিবে না। জামডাঙার জমিদারদের মত বড়বৌয়ের প্রতিমাটিকেও আগে নৌকার উপর নদীবক্ষে ঘুরাইয়া তবে বর্জ্জন করা হইবে। প্রতিমার সহযাত্রী অপর বজরায় নাচ-গানেরও বন্দোবস্ত আছে। পূজাবাড়ীতে এখন লোকের ভিড় তাই এতটা জমাট হইয়া উঠিয়াছে—মুখুয্যেদের পাকা ইমারৎ একেবারে ঘাটের উপরেই।

বহুদিন হইতেই মুখুয্যেদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। বিধবা হইবার পর স্বামীর গচ্ছিত অনেকগুলি টাকা বড়বৌয়ের হাতে আসে। তিনি একরকম নিজের ব্যয়েই এই পূজা আনিয়াছেন, দেবর কালীমোহনের তোয়াক্কা বড় রাখেন নাই। কালীমোহন এ কাজে কিছু ব্যয় করিতে যে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল, তাহা নয়। কিন্তু দেবর ও দেবর পত্নীর প্রতি নিজের চিরপোষিত বিতৃষ্ণার দরুণই হোক কিংবা পূজার পুণ্যটা এই রকমে নিঃশেষে নিজের অংশে ফেলিবার কারণেই হোক, বড়বৌ কালীমোহনকে এ কাজে বড় টানিতে চাহেন নাই।

শুধু এ কাজের ব্যয় সম্বন্ধেই নয়, ইহার তত্ত্বাবধান হইতেও তিনি দেবরকে অনেকটা দূরেই রাখিয়াছিলেন। বাড়ীতে পূজা বলিয়া কালীমোহনকে অবশ্য একটা সাক্ষীগোপাল কর্ত্তা সাজিতে হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত বন্দোবস্তের ভার পড়িয়াছিল প্রতিবেশী শ্যামাকান্তের উপরেই প্রায় পূজার অঙ্গ অঙ্গ যাহাই হোক, শ্যামাকান্ত না থাকিলে আজিকার এই বিসর্জ্জনের সমারোহটা কখনই এমন অনাবশ্যক রকমে জমকাল হইয়া উঠিত না।

ঠাকুর-বরণের সময় আসিল। প্রতিবেশিনীরা কালীমোহনের স্ত্রীকে এই কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। শাস্ত্রমতে বিধবার বরণে নাকি অধিকার নাই। কিন্তু বড়বৌয়ের মাথার একটু দোষ ছিল। এই কয়দিনের ঘাটা-ঘাটনিতে ঐ দোষটা অবশ্য একটু বাড়িয়াই থাকিবে। এখন দেবর পত্নীর নাম শুনিয়া তাঁহার মাথাটা বুঝি একেবারে বিগড়াইয়া গেল। তিনি কোমর বাঁধিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"আমার ঠাকুর আমিই বরণ করব।"

দর্শকমণ্ডলী একেবারে যেন আড়ষ্ট! মুহূর্ত্ত পরেই চারিদিক্ হইতে কোমল ও কড়ি নানা প্রতিবাদের স্বর ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"ওকথা মুখে আন্‌তে নেই বড়বৌ।"

"খুড়ীমা, মাথা ঠিক রাখুন।"

"একি তোমার ঘরকন্নার কথা গা।"

এতে কেপামি খাটে না গো।

বড়বৌ তবু না-ছোড়-বন্দা। এইরূপ চারিদিকের প্রতিবাদে তাহার ক্ষিপ্ততা আরও যেন বৃদ্ধি পাইল।

তিনি গলা আরও চড়াইয়া বলিলেন,—"আমি এ কাজ ক'রে তবে ছাড়্‌ব, দেখি কে ঠেকিয়ে রাখে।"

বড়বৌ এবার ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ঠাকুর-দালানের দিকে ছুটিলেন। আশঙ্কায় সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। নিমেষ মধ্যে কত দর্শকের দৃষ্টিতে সিংহের গোঁপগুলো আরও খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, অসুরের কাঁধে বর্ষার আগাটা কাঁপিতে লাগিল, প্রতিমার মুখখানা সহসা ঐ পশ্চিম গগনের মত লাল হইয়া উঠিল।

সত্য সত্যই বড়বৌ বরণের জিনিষের দিকে হাত বাড়াইলে, কয়েকজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে সাপটাইয়া ধরিয়া একটু দূরে আনিল। তিনি এবার কিছু দূরেই প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। মাটিতে কপাল ঠুকিয়া কাতর চীৎকারে বলিলেন,—

"মা, মা, আমার বরণ কি নিবিনে, মা?"

উন্মাদের এই কথায় মৃন্ময়ী কি নিষেধের ইঙ্গিত করিলেন, ভক্ত দর্শকবৃন্দ তাহা বুঝুক, কিন্তু চিন্ময়ীর কাছে এটা কি প্রলাপ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল?

বড়বৌকে এমন অসঙ্গত কাজে উদ্যত দেখিয়া সকলের ভয় হইয়াছিল, পাছে একের পাপে গ্রামটারই বা কোন অনিষ্ট ঘটে। এখন তাঁহার এই সময় মত আটকে সকলে যেন একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। এখন চারিদিকে দর্শকমণ্ডলী পাগলের এই পাগলামিতে বেশ মজা পাইয়া দিব্য আরামে হাসিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ

বিক্রোত্তমা

নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজ অন্তঃপুর বিক্রোত্তমার গৃহ। বিক্রোত্তমা আসীনা।

বিক্রোত্তমা। কেউ কিছু জানে না! বড় বড় পণ্ডিত বলে, যারা গর্ব্বে অন্ধ হয়ে বেড়ায় তারা যথার্থ অন্ধই! ওরা আবার অন্য সকলকে জ্ঞান দান করবে, হয়েছে! নিজেদের হৃদয় ভরা পুঞ্জ পুঞ্জ অজ্ঞানান্ধকার আর অপরকে দেবে কিনা তারা আলো! কেমন করে দেবে?

অসৎ হ'তে সতের উদ্ভব হয় না। তা হয় না বলেই ত বেদ বলিয়াছেন—

'ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিং চ নাস॥'

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ু সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যদি অসৎ হ'তে সতের উদ্ভব সম্ভব হ'তো তা হলে এত করে' এ বিষয়টীকে বোঝাবার তো দরকারই হোতো না যে তখনকার সে অবস্থা এক অনির্ব্বচনীয় 'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং'—যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। এক কথায় সর্ব্ব শূন্যং ও দানীং এই কথাতেই তো জানাতে পারতো, যে, তখন কিচ্ছুই ছিল না! তা নয় তা নয় যাতে যানেই তা'তে তা আনা তার সাধ্য নয়! উপনিষদ বলেছেন—

"স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতামন্যমানা দন্দ্রম্যমানা পরিযন্তিমূঢ়া অন্ধেনৈবনীয়মানাযথান্ধা" বাঃ, বেশ বলেছেন! (হাস্য) এ অন্ধগুলোও তেমনি অপর অন্ধদের পরিচালনা করতে গিয়ে দেবে তাদের শুদ্ধ খানা-সই করে!

[কঞ্চুকীর প্রবেশ]

কঞ্চুকী। ভর্ত্তদারিকে! আমাদের সর্ব্বজন পূজ্য প্রভু আপনাকে জানাতে আদেশ করলেন যে কেবল দেশবাসী কএক জন মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত আপনার বিদ্যাখ্যাতি শ্রবণ করে' আপনার সঙ্গে শাস্ত্র বিচার কামনায় রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের পরম রমণীয় কান্তি এবং জ্ঞানগর্ভ বাক্যে আমাদের গুণগ্রাহী প্রভু বিশেষ প্রীতি লাভ করে, তাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেছেন এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।

বিদ্যোত্তমা। উত্তম! আমার ও তাঁদের ভিক্ষা পূর্ণ করতে কোনরূপ আপত্তি নেই একথা তুমি পিতা মহারাজকে নিবেদন করতে পারো। যারা ভারবাহী গর্দ্দভের মত নিজেদের ব্যর্থ পাণ্ডিত্যের বৃথা ভার বহন করে' অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের সে দুঃখ নাশ কর্ব্বার জন্যই আমার এই পণ করা মাত্র! তা যেমন অনেকেই এ থেকে মুক্তিলাভ করতে পেরেছে এরাও তেমনি পার্ব্বে, এতে আমার মনে কোনই সংশয় নেই, যাও তুমি সবাইকে প্রস্তুত হতে বলোগে, শীঘ্রই আমি যাচ্ছি।

কঞ্চুকী। [অভিবাদন করিয়া] আদেশ মতই জানাইব [প্রস্থান।]

বিদ্যোত্তমা। মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত! এই বয়সে কতই মহামহো দেখলাম। কেউই কিন্তু নিজেদের সেই মহত্বটুকু সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে যেতে পেলেন না এই আমার বড় দুঃখ রইলো! তবে এদের আমি সাবাস দিই, যে এরা এতেও নিরুৎসাহ হয় না! এই চোখের উপর কত কত মহা মহা পণ্ডিতকে নারীপদানত হয়ে অপমানাহত মাথা হেঁট করে' ফিরতে দেখ্‌ছে তবু ওদের পরীক্ষা স্পৃহা দূর হয় না। তা এ পৌরুষের অর্থ আর কিছু না, এর মধ্যে পুরস্কারের লোভটাই যেন বেশী প্রবল। ওরে রূপলুব্ধ পতঙ্গের দল! কেন মিথ্যে দগ্ধ হবার জন্যে দূর দূরান্তর হতে এমন করে তোরা ছুটে আসিস্? যাকে লক্ষ্য করে' আসিস্, তার নিকট তোদের মূল্য কতটুকু তা জানিস্‌নে! ঐ ক্ষুদ্রতম পতঙ্গেরই মত [হাস্য]

যাই, আবার কোন্ হতভাগ্যের কপাল ভাঙ্গলো দেখিগে। [প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা

রাজা মন্ত্রী, সভাসদগণ যথাযোগ্য স্থানে আসীন।

মধ্যে বিচার বিতর্ককারী পণ্ডিতমণ্ডলী একধারে রাজ কন্যার জন্য সিংহাসনে স্থাপিত।

(সখীগণসহিত রাজ কন্যার প্রবেশ)

বিদ্যোত্তমা। আমার পরম পূজনীয় জনক এবং মহারাজকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করি। বয়োবৃদ্ধ মহা মন্ত্রীকেও আমার প্রণাম।

রাজা। চিরায়ুষ্মতী হও বৎসে!

মহামন্ত্রী। সাবিত্রী সমান হও।

বিদ্যোত্তমা। [মনে মনে হাসিয়া আত্মগত] হাঁ সত্যবান বিবর্জ্জিত থেকে!

রাজা। বৎসে, এঁদেরও তুমি অভিবাদন জানাতে পারো এঁরাই তোমার সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচার প্রার্থনা করে' এই সভা আহ্বান করিয়েছেন।

বিদ্যোত্তমা। [সাবজ্ঞ ভঙ্গিতে বারেক নেত্রপাত করিয়া] ভালই তো পিতঃ, ওঁরা নিজেদের সম্মান নিজেরা প্রমাণ করেই তা গ্রহণ করবেন। [আসন গ্রহণ]

পণ্ডিত দেবদত্ত। [স্বগতঃ] উঃ কি গর্ব্বিতা নারী! বিদ্যার অহঙ্কারে এ রমণী নিজের নারীত্ব অবধি যেন বিস্মৃত হয়ে গ্যাছে। [প্রকাশ্যে] মহারাজ! আমরাও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করছি।

রাজা। তবে তাই হোক। বিদ্যোত্তমা! এই কেবল পণ্ডিতগণ রূপ, গুণ এবং কুলশীলে সর্ব্বাংশেই অনুপমেয়। ইহাঁদের সহিত তুমি তোমার পূর্ব্বাপনানুসারে শাস্ত্রীয় তর্কে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে যথা নিয়ম শপথ গ্রহণ করে' এই সভামধ্যে অঙ্গীকার বাক্যে বদ্ধ হও যে যদি এঁদের কারো নিকট তুমি বিচারে পরাস্ত হও, তা'হলে তুমি তাঁরই কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ কর্ব্বে, আর আপনারা অঙ্গীকার করুন যদি আপনারা পরাভূত হন তবে এই সভাজন মধ্যে নিজেদের পরাজয় স্বীকার লিখে দিয়ে বিনা বাক্যে বিদায় নেবেন।

বিদ্যোত্তমা। এই সভা মধ্যে এই অষ্টদিক্ পালের অংশসম্ভূত রাজসকাশে পরমেশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করছি, যিনি আমায় শাস্ত্র বিচারে পরাজয় করতে পার্ব্বেন আমি কায়মনোবাক্যে তাঁরি পত্নীত্বে নিজেকে সমর্পণ কর্ব্বো।

পণ্ডিতগণ। সর্ব্বসান্নিধ্যে এবং সর্ব্বলোকপাল রাজসান্নিধ্যে পরম পিতার নাম নিয়ে আমরাও অঙ্গীকার করছি, যে যদি এই রাজকন্যার সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে আমরা পরাজিত হই, তবে অবনত শিরে তাঁর কাছে সে হার স্বীকার করেই যাবো।

রাজা। তাহলে তোমরা উভয় পক্ষই এই পণে স্বেচ্ছায় নিজেদের বদ্ধ করলে?

বিদ্যোত্তমা ও পণ্ডিতগণ। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমেই মহারাজ।

রাজা। উত্তম! এখন মধ্যস্থতাকারীগণের অনুমতি গ্রহণ করে' তোমরা বিচার আরম্ভ করতে পারো।

[কতিপয় পণ্ডিত মধ্যস্থ রূপে অবস্থিত হইলেন]

দেবদত্ত। সর্ব্ব প্রথমে শান্তি উচ্চারণ পূর্ব্বক আমি ব্রাহ্মণোচিত আশীর্ব্বাদানন্তর জিজ্ঞাসা করি কোন্ শাস্ত্র বিষয়ে আপনি বিচার করতে প্রস্তুত আছেন।

বিদ্যোত্তমা। [সগর্ব্ব হাস্য] কোন শাস্ত্র! ব্রাহ্মণ! আপনার এ প্রশ্ন আমি আপনাকেই ফিরিয়ে দিয়ে প্রতি প্রশ্ন করছি, আপনি কোন্ শাস্ত্রের তর্ক করতে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন?

দেবদত্ত। [অপমানিত বিস্ময়ে স্বগত] উঃ এর অহঙ্কারের সীমা দেখা যায় না।

[প্রকাশ্যে] ভদ্রে! আমি শাস্ত্র জীবি ব্রাহ্মণ ষড়দর্শনের সকল দর্শনেরি কিছু কিছু আমাদের শিক্ষা করতে হয়। কোন এক বিষয়ে প্রস্তুত হয়ে আসিনি।

বিদ্যোত্তমা। তবে সর্ব্ব শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত! যে কোন দর্শন নিয়ে বিচার করতে চান অনায়াসেই প্রশ্ন করতে পারেন, আমি যথা সাধ্য উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

জনৈক পণ্ডিত। [দেবদত্তের কানে কানে] ভায়া বেশ সুবিধা বোধ হচ্ছে না, এই সর্ব্বদর্শন-জ্ঞান গরীয়া ধৃষ্টা সরস্বতীর কাছে তুমি আমি গঙ্গাস্রোতে ঐরাবতের মতই ভেসে যাবো এমনি মনে হচ্ছে! এখনও না হয় থেমে যাও।—

দেবদত্ত [জনান্তিকে] ছি ছি চিন্-বিলাস! এই প্রচণ্ড অহঙ্কারে আত্মহারা নারীর দুটো গর্ব্বিত প্রলাপকেই তুমি ঋষি বাক্য বোধ করলে নাকি? বলা এবং প্রমাণ করায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। [প্রকাশ্যে] ভদ্রে! আমি প্রথমে সামান্য নীতিশাস্ত্র বিষয়ে একটি প্রশ্ন করতে চাই 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' এই বাক্যের কোন সার্থকতা আছে কি না?

বিদ্যোত্তমা। [মনে মনে রুষ্ট হইয়া] আছে বৈকি। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম্। পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্ নীতিশাস্ত্র এইরূপেই বিদ্যানের লক্ষণ প্রকাশ করেছেন। যার মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই তখন বিদ্বান বলে' গ্রহণ করতে বাধ্য হই। অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় দান করে বিনীত ব্যক্তিই যথার্থ সৎপাত্র সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিই ধনলাভ করে এবং সেই ধন হতেই সে ধর্ম্মের ও অধিকারী সুখী হয়।

দেবদত্ত। [স্বগতঃ] আমার দারিদ্রকে কটাক্ষ করা হলো! (প্রকাশ্যে) মান্‌লেম। কিন্তু পুরাণকার বলেছেন 'বহবোঽবিনয়াদ-ভ্রষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদঃ বনস্থাশ্চৈব রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে। অর্থাৎ বিনয়হীনতা প্রযুক্ত সাজোপাঙ্গ বল কোষ পরিপূর্ণ বিপুল রাজপরিচ্ছদ সমন্বিতরাজন্যবর্গকে রাজ্যভ্রষ্ট হতে দেখা যায়, আবার রাজ্যভ্রষ্ট নির্ব্বাসিত ব্যক্তির বিনয় দ্বারা জগদ্বর্শি ভূত করে, স্বীয়রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হতে পারে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?"

বিদ্যোত্তমা। আমি 'বিনয়' শব্দের সকল প্রকার প্রয়োগেরই পক্ষপাতী—বিশিষ্টোনয়ঃ নীতিঃ বিনয়ঃ, এটা সম্বন্ধে আপনার কিরূপ বিবেচনা হয়? এ সম্বন্ধে ব্যবহার শাস্ত্র বলেছেন পূর্ব্ব বাক্যারম্ভেষ্বস্থ নিয়তং স্যাৎ সন্দেহভাক্। *

পশ্চাদঙ্গঃ সোহপ্যসংকারী পূর্ব্বে তু বিনয়ো গুরু॥

দেবদত্ত। [স্বগতঃ] আমার আক্রমনও অনায়াসেই ব্যর্থ করে' দিলে! স্ত্রীলোকের সঙ্গে কলহে পুরুষ আমি পারবো কেন? সোজা পথই ভাল। [প্রকাশ্যে] আসুন আমরা এইবার শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হই।

বিদ্যোত্তমা। [সহাস্যে] তবে এতক্ষণ আপনি যে অ-শাস্ত্রীয় তর্ক করছিলেন, ইহা নিজ মুখেই স্বীকৃত হলেন? [রাজার দিকে চাহিল]

দেবদত্ত। [নিরুত্তর, রাজার বিষন্ন নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাদপীঠ হইতে চরণ উত্তোলন পূর্ব্বক আসন বদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট হওন]

বিদ্যোত্তমা। [দেবদত্তের প্রতি] প্রশ্ন করুন।

রাজা। আসুন তবে সকলে বিচারগৃহে গমন করি। সকলের প্রস্থান।

---

* ঋণ, শাস্তি, বিশিষ্টনীতি অবলম্বনে ইহার বিধান হইয়া থাকে। ইহা পরস্পর-বিবাদকারীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ যে অগ্রে বিবাদ সূচনা করিয়াছে তাহা হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী অধিকতর বাক্ পারুষ্যোপাদক হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রতি গুরুতর অপরাধিহিত হইবে।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা

(বিভোত্তমা রাজা, পণ্ডিতগণ ও সভাজন)

বিভোত্তমা। [সভাজনের দিকে চাহিয়া] এই সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর বিচারে যে পরাস্ত হয়েছেন তা'তে বোধ করি এখন আর কারও কোন সংশয় কর্ব্বার নেই ?

অনেকেই। [অস্ফুটে] না।

বিভোত্তমা। তাহলে এখন আমি নিজস্থানে গমন করতে পারি, মহারাজ ? অথবা আর কারও কোন প্রশ্ন কর্ব্বার কিম্বা কোনপ্রকার সংশয় মিটাবার যদি প্রয়োজন থাকে তবে আমি হৃষ্টচিত্তেই তাঁদের সে-সুযোগ দান করতে প্রস্তুত আছি।

দেবদত্তের সখী ভবদেব। আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে।

বিভোত্তমা। [বলুন।

ভবদেব। বেদে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই, আপনি ইহা স্বীকার করেন কি না ?

বি—মা। হাঁ, নিশ্চয়ই করি।

ভ…ব। [সোৎসাহে] তা যদি করেন, তবে নিজেই আপনি সে অধিকার কি প্রকারে গ্রহণ করে থাকেন ? আপনি যে সকল উপনিষদ বাক্য উচ্চারণ করেন সেই উপনিষদ তো বেদেরই জ্ঞানকাণ্ড।

বি…মা। উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড সত্য, কিন্তু জ্ঞান মার্গের অনধিকারী কাকেওতো করা হয়নি। এই জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপনিষদ হ'তেই বেদান্তের উৎপত্তি, সেই বেদান্ত 'জাতি নীতি কুল গোত্র 'দূরীভূতকারী' সন্ন্যাসী সঙ্ঘের ধর্ম্ম। যাঁহারা জাতি প্রকৃতি সমুদয় জাগতিক ভোগই পরিত্যাগ করেন, তাঁদের নিকট স্ত্রী, শূদ্রাদি ভেদও থাকিতে পারে না। সেই হেতু স্ত্রীলোকের বেদে অনধিকার, বেদের হ্রস্ব-দীর্ঘ্য মন্ত্রভাগ সম্বন্ধেই বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমি পুরুষ বলি তাঁহাকেই, যাঁর মধ্যে স্ত্রী-শক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে যিনি সম্পূর্ণরূপেই জয় করে, নিজেকে জীবন্মুক্ত করতে পেরেছেন; একমাত্র পুরুষ তিনিই। আর তাঁরই যথার্থরূপে বেদে অধিকার জন্মেছে, কারণ তিনি নিজেই বেদময় হয়েছেন। তদ্ভিন্ন অপর সকলেই প্রকৃতির দাসানুদাস তাঁরা পুরুষ দেহধারী হলেও যথার্থতঃ পুরুষ নহেন, নারীই। তাঁদের যেমন বেদে অধিকার আছে, সে-রূপ অধিকার সকলেরই আছে, সে অধিকার তো সত্যকার অধিকারই নয়।

ভবদেব। অনুপবীতের বেদপাঠে অধিকার বেদে নিষেধ করা হয়েছে, তাকি মন্ত্রভাগের কি ব্রাহ্মণ ভাগের জন্যই। ব্রাহ্মণে তরগণ উপনিষদেও অধিকারী নহেন।

বি…মা। ব্রাহ্মণ আপনি কা'কে বলছেন পণ্ডিতপ্রবর ? দ্বিজ হলেই যদি ব্রাহ্মণ হতেন, তাহলে

পক্ষীরাও তো দ্বিজত্বে ব্রাহ্মণের দাবী করতে সমর্থ। শাস্ত্র ব্রাহ্মণের এই লক্ষণ নিরূপন করেছেন :—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারা দ্বিজ উচ্যতে ; বেদপাঠাৎ ভবেৎ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥"

অতএব যিনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন তিনি ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃত হতেই পারেন না, এবং ব্রহ্মজ্ঞ যিনি —সূর্য্য উদিত হলে যেমন তাঁর জগত জাগ্রতকারী অংশু দ্বারা তিনি নিজেকে কখনই গোপন রাখতে পারেন না, তেমনি তিনিও নিজের সর্ব্বশক্তি মহিমায় সর্ব্ব পরিচিত হয়ে পড়বেনই পড়বেন। এ স্থলে 'আমি ব্রহ্মাতে' এ অলীক তর্ক উঠতেই পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ কাশ্যপ বেদমন্ত্রে স্তব স্তুতি মুখরিত করেছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ বিশ্বামিত্র বেদমন্ত্রে নবীন সৃষ্টি করেছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যাসদেব বেদমন্ত্রে ভারত যুদ্ধে মৃত কুরু পাণ্ডবসৈন্যগণকে মৃত্যুর রাজ্য হতে আহ্বান করে, এনে ছিলেন। এ সকল শক্তি যার নেই সে ব্রহ্মজ্ঞ নহে, এবং যে ব্রহ্মজ্ঞ নয় সে ব্রহ্মণ্য লাভেও বঞ্চিত আছে, একথা নিশ্চিত করে মানতে হবে, আর ব্রাহ্মণ যখন সে নয় তখন বেদে তার কিসের অধিকার। অতএব এ স্থলে আপনাদের ও যদি অধিকার থাকে, তবে আমারও আছে ; তারপর ক্ষত্রজাতি যে উপনিষদে অভিজ্ঞ মধ্যাহ্নগণ—এ যুক্তি অকাট্য।

ভবদেব [অধোমুখ]

বিদ্যোত্তমা। আপনারা পরাভব স্বীকার করছেন ?

ভবদেব। [অস্ফুট] হ্যাঁ।

বিদ্যোত্তমা। সকলেই আপনারা শ্রবণ করলেন। আর কিছু কারু বলবার আছে ? আমি তাতে বরং বিশেষ আনন্দ লাভই কর্ব্বো।

[সকলেই লজ্জা ম্লিন মুখে নীরব হইয়া রহিল রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন]

বিদ্যোত্তমা। [উত্থিত হইয়া] তবে আমি তার কি করতে পারি ?

মহারাজ ! বয়ঃবৃদ্ধ ও পূজ্যগণকেও আমি নমস্কার করি। [তথাকরণ] তবে অনুমতি দান করুন আমি এক্ষণে বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে গমন করি।

রাজা। যাও বৎসে, সর্ব্বদা বিজয়িনী হয়ো। [আত্মগত] তোমার অদৃষ্টে এই বিদ্যার অহঙ্কার-টুকুই সার হবে দেখছি, বিবাহ আর তোমার হবে না। এমন সুন্দর সুরূপ, সুধীর বিদ্বান্ পাত্রও যখন তোমার কাছে পরাভূত হলেন, তখন আমার আর কোন আশা ভরসাই নাই। [দীর্ঘ নিশ্বাস]

বিদ্যোত্তমা। পিতঃ ! নিজ স্বীকৃতি অনুসারে এই পণ্ডিতগণ এক্ষণে আমার দাসানুদাস কিন্তু আমি ক্ষত্র কন্যা, এত গুলি বিপ্রদাস আমার কোন কাজে লাগবে ? রন্ধন কার্য্যেই এক মাত্র লাগাতে পারা যায় ; কিন্তু রন্ধন শাস্ত্র নীতি বা দর্শন শাস্ত্র হতে সম্পূর্ণই সতন্ত্র। সর্ব্বশাস্ত্রবিদগণ নিশ্চয়ই সে শাস্ত্রটা শিক্ষা করেন নাই, কাজেই ওঁরা আমার পক্ষে একান্তই অনাবশ্যক ভার স্বরূপ হয়ে থাকবেন মাত্র। তাই ওঁদের আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। [সগর্ব্বে

গ্রীবা ফিরাইয়া দেবদত্ত প্রভৃতির প্রতি] তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হলে, এখন যথেচ্ছ গমন করতে পারো। [উদ্ধত ভঙ্গীতে সখীগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান]

রাজা। [সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া কৃতাঞ্জলি] আপনাদের স্বেচ্ছা পণ হইতে এক্ষণে আপনারা মুক্ত হয়েছেন, এখন আমার এই ক্ষুদ্র গৃহে ব্রাহ্মণ-অতিথি আপনারা, এ দীনকে আপনাদের যথাসাধ্য সেবা পূজার অধিকার দান করে কৃতার্থ করুন।

দেবদত্তাদিগণ [উঠিয়া] রাজন্! আপনি চিরদিন জয়যুক্ত হোন! আপনার বিনয় বাক্যে আমরা নিজেদের যথেষ্টই পূজিত বোধ করছি কিন্তু এইরূপে নারী হস্তে পরাজিত হবার পর আপনার গৃহে আর তিলার্দ্ধ কাল অবস্থিতিও আমাদের পক্ষে শোভন হয় না। এখন বিদায় দান করুন, শীঘ্র শীঘ্র এ রাজ্য ত্যাগ করে এ মহা লজ্জার হস্ত হতে কথঞ্চিৎও মুক্তি লাভ করি।

রাজা। নিজ নিজ মহত্ত্ব বলে আপনারা আমার বিদ্যামদগর্ব্বিতা অবোধ কন্যার ধৃষ্টতার উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারেন সে বিশ্বাস আমার আছে, কিন্তু আমারও এই অতি বড় দুঃখ রৈলো, যে আপনাদের মত কুল শীল ও রূপ গুণ যুক্ত মহাপণ্ডিতগণের মধ্যে কাহাকেও জামাতা পদে বরণ করে, মানব জন্ম সফল করতে পারলেম না। আমার কন্যাকে পরাস্ত করতে আপনারাই পার্ব্বেন এ আশা আমার ছিল।

ভবদেব। আপনি যথার্থই তার পরাভব কামনা করছেন কি?

রাজা। [সাগ্রহে] কায়মনে।

ভবদেব। তবে আর একবার আমরা এ বিষয়ে চেষ্টিত হবো, আপনাকেও তখন আমাদের একটু সহায় হতে হ'বে মহারাজ!

রাজা। [সানন্দে] আনন্দের সহিত আমি সে কার্য্য করবো। বিদ্যোত্তমার বিদ্যার গৌরবে পূজ্যগণের পুনঃ পুনঃ অবমাননা আমায় যেন সর্ব্বদা আতঙ্কিত করে রেখেছে। না জানি এর জন্য কোন সময় কখন কার ব্রহ্মশাপেই বা পতিত হতে হয়।

সভা পণ্ডিতগণ। মহারাজ, একথা যথার্থই বলেছেন। কুমারী নিজজাতীয় সীমাতিক্রম করে, অত্যধিক উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করে, ফেলেছেন। সেখান থেকে একটুখানি অবতরণ না করলে যেন তাঁর জাতীয়ত্বে আঘাত লাগতে থাকে।

ভবদেব। তবে এই কথা রইলো; এ বিষয়ে আর একবার চেষ্টা করা যাবে। আজ তবে বিদায়।

রাজা। নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠ তস্তে (সম্মুখবর্ত্তী এবং পশ্চাদ্বর্ত্তীকে প্রণাম করি) [প্রণাম করণ]

ভবদেব: [হাসিয়া] নমস্তুতে সর্ব্বতঃ এব সর্ব্বঃ (সকলকেই নমস্কার)

দেবদত্ত প্রভৃতির সহিত প্রস্থান।

রাজা। এই জন্য স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার দেওয়া হয় না। নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পেলে সে-আর নিজের পরিধীকে ঠিক রাখতে পারে না, নাঃ! মেয়েটাকে পণ্ডিত হয়ে

উঠতে দিয়ে দেখছি নিজের মূর্খত্বই প্রমাণ করে দিয়েছি, অত বাড়াবাড়ি কি কিছুই ভাল? আচ্ছা, এইবার তবে সভাভঙ্গ হোক্। নেপথ্যে বৈতালিক কর্ত্তৃক গান—

গীত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

শ্রাবণ।

তোমার শ্রাবণ এল আমার এ পারে,
মায়ার পরশে তব স্নিগ্ধ করি রৌদ্র লেখা মম,
একখানি যবনিকা নিঃশব্দে প্রসারে
শান্ত সব অভিনয়, ক্ষণতরে ওগো প্রিয়তম!
যে কান্ত পরশ লাগি আলোক বিধুর,
তাই বুলাইয়া দিলে তুমি মোর ভুবনে নয়নে,
আকাশ গভীর নীল অঞ্জনে মেদুর,
কদম্ব পুলকে ভরা, আজি ধরা ভূতল শয়নে।
তুমি দিলে ছায়া, আমি ভরিয়া অঞ্জলি
অর্ঘ্য আনিয়াছি বহি আমার এ বরষার ফুল,
আমার অপরাজিতা, বকুল আবলি,
কূটজ, কেতকী মোর নিশি গন্ধা ব্যথিত ব্যাকুল।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

রাজ-পরিচ্ছদ

(হঙ্গেরীয় লেখক—কলোমান মিক্সজাথ—হইতে)

ঐতিহাসিকদের সময়ে-সময়ে বড় ভুল হয়ে থাকে। তাঁরা আমাদের রাজা মোরাসের কাহিনী বলে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর রাজত্ব যে কোথায় ছিল, সে-কথা বলেন নি। যাই হোক্, তা নিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই ; কেননা, যারা বিশ্বাস করতে চায়, করুক না কেন। ঠিক সে ব্যাপারটা কি, সেই কথাই আমি এখানে বলব।

একদিন বিকালে রাজা মোরাসের রাজকার্য্য শেষ হল ; রাজকার্য্য আর কিছুই নয়, মন্ত্রীর মুয়-করে'-পড়া সত্তরখানা কাগজে নাম সই করা। মহারাজ চোখ বন্ধ করে এই সকল অপরিহার্য্য কাগজগুলি অনুগ্রহ করে শুনলেন শেষ পর্য্যন্ত। তার মধ্যে ছিল কতকগুলা নতুন লেখক কাজে বাহাল করার কথা, গোটা কতক মৃত্যুদণ্ডের আদেশ এমনি আরো দু-একটা ছোট খাট কাজের কথা। শুনতে শুনতে তিনি মাঝে মাঝে হাই তুলছিলেন। শেষে মন্ত্রী বল্‌লেন,—আমাদের কাজ শেষ হয়েছে—বলে রাজার নামাঙ্কিত মোহরটা পকেটে রাখলেন আর কাগজের বাণ্ডিল বগলে পুরে ফেললেন।

রাজা বল্‌লেন,—নারকিজ, একটু অপেক্ষা কর ; একখানা খালি কাগজে মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা লিখে দাওতো, কারো নাম থাকবে না তাতে। তার ওপর মোহরটার ছাপ মেরে আমাকে দাও, আমি নাম সই করে দিচ্ছি।

মন্ত্রী অবাক হয়ে বল্‌লেন,—নাম থাকবে না কারো ?

—আমি জানতে চাই তোমার এতে কি আপত্তি থাকতে পারে ? বোধ হয় তোমার মনে আছে যে, তুমি আমার মন্ত্রী আর মোহর কোথায় দিতে হবে সেটা জানা তোমার কাজ। তুমি দিন দিন ছেলে মানুষ হয়ে যাচ্ছ, নারকিজ !

—মহারাজ ! মহারাজ, একি কথা ! আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূপতির দীন ভৃত্য।

রাজা মোরাস অনুগ্রহ করে, পিঠ চাপড়ে তাকে অভয় দিলেন, তারপর কাগজখানা নিয়ে তাঁর সোণার কোটের ভেতর পকেটে রেখে দিলেন।

—শোনো বুড়ো, আমি গোপনে বলছি তোমায়, এ মৃত্যুদণ্ডের পত্রোয়ানা দিয়ে আমি কি করব।

মৃদুস্বরে নারকিজ বল্‌লেন,—মহারাজের অসীম দয়া।

—আমি একটী পরমাসুন্দরী নারীর অনুগ্রহ পেতে চাই—সে-ই আমার কাছে এই সামান্য জিনিষটা চেয়েছে। বুঝতেই পার, আমি এই সামান্য জিনিষ তাকে না দিয়ে পারি না।

—মহারাজের অনুগ্রহের শেষ নেই।

—নারকিজ, আমি বোকা নই। মুস্কিল হচ্ছে এই মেয়েটীর স্বামী রয়েছে বলে সে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারছে না। আমার কাছে ক্ষমতা পেলেই সে স্বামীর কাছ থেকে আপনাকে মুক্ত করে নেবে। কিন্তু নারকিজ, বুঝলে একটী কথাও যেন ফাস না হয়—

প্রশংসায় গদগদ হয়ে নারকিজ বললে,—কিন্তু প্রাণ বধের চেয়ে চুম্বন ঢের মধুর।

—ঠিক বলেছ। আমি এখন তার কাছে এই কাগজখানা নিয়ে যাচ্ছি, কেননা, রাজ-অনুগ্রহ কখনো নিষ্ফলা হয় না। এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রাজত্বের সোণার বইয়ে লিখে রাখ। কাল তোমাকে জমীর খাজনা হিসাব করা সম্বন্ধে যা বলেছিলাম লেখা হয়েছে তো?

—নিশ্চয়ই, মহারাজ।

—পড়তো, কি রকম শোনায়!

মন্ত্রী সোণার বইখানা খুলে শেষের দু'এক ছত্র পাঠ করলেন,—যে-মালী গাছকে প্রায়ই ছেঁটে রাখে, ভালো রাজাও ঠিক তারি মতো।

—খাসা হ'য়েছে,—বলে রাজা তাঁর 'ফেজ' মাথায় দিলেন, দিয়ে তিনি চললেন পুণ্যক্ষোয়া। নীলনদীর ধারে তাঁর নিজের যে একটী বাগান আছে সেই দিকে। সে-বাগানে কারো প্রবেশের হুকুম ছিল না।

যে-সমস্ত ভৃত্য আর পারিষদের সঙ্গে তাঁর পথে দেখা হল, তাঁরা সকলেই ভূমি নত হয়ে বললে,—প্রবল পরাক্রান্ত রাজা মোরাসকে আমরা অভিবাদন জানাচ্ছি।

তাঁর উজ্জ্বল সোণার পোষাক সকলের চোখে ধাঁধা লেগে গেল, আর তাঁর গর্ব্বিত পদক্ষেপে ধরণী কেঁপে উঠল। রাজার মনের কথাটী যেন বুঝতে পেরে নাইটিঙ্গেল প্রেমের গান গাইতে সুরু করলে। শাদা লিলিফুলগুলি মাথা নত করলে। গোলাপ তাঁর চলার পথে আপন সুগন্ধে ভরা পাপড়িগুলি ছড়িয়ে দিলে; 'আজেলিয়া' গুলি কার যেন নাম চুপিচুপি বললে; সে নাম রাজার নয়,—সে নাম মনোহারিণী ফ্লোরিলার, নারকিজের স্ত্রীর পূর্ব্বপক্ষের মেয়ে। প্রাসাদের সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, মহারাজ কোথায় চললেন! মন্ত্রী ছেলের কাণে কাণে বললেন,—উনি কোনো হতভাগ্যের মাথা পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছেন।

রোগাস ভয় পেয়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখলে। দেখলে সেটা ঠিক আগের মতই আছে, দুই কাঁধের মধ্যে গলার ওপরে।

বাগানের দরজায় যে-প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল, সে তখনি তাকে বললে,—তোমাকে একখানি স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি। আমার সঙ্গে তোমার পোষাক বদল করে, আমায় বাগানে ঢুকতে দাও।

প্রহরী রাজী হল না; বললে,—আমি পারব না, রাজা ফিরে এলে আর আমার মাথা থাকবে না।

রোগাস বললে,—তুমি একটী গাধা। রাজা যতক্ষণ না ফেরেন, ততক্ষণ তো আর তোমাকে

মারতে পারবেন না, কিন্তু আমার কথা না শুনলে আমি এক্ষুনি তোমায় মেরে ফেলব। কাজেই বুঝতে পারছ, তুমি সময়ও পাবে, অর্থও পাবে।

প্রহরী রাজী হল। রোগাসের অনেকদিন থেকেই একটা সন্দেহ ছিল, তাই সে প্রহরীর পোষাক পরে রাজাকে অনুসরণ করলে। তারও সমুখে লিলিয়া মাথা নত করলে। গোলাপগুলি সুগন্ধী পাপড়ি ছড়িয়ে দিলে; আজেলিয়া চুপিচুপি বললে,—ফ্লোরিলা। কিন্তু রোগাস তাদের পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল। বাগানের মধ্যেকার একটা গুপ্ত দরজা দিয়ে নদীর ধারের প্রমোদ-নিবাসগুলিতে পৌছানো যায়; এই দরজার চাবি থাকে রাজার কাছে। এই সব প্রমোদ-নিবাসের মধ্যে একখানি বাড়ী ছিল রোগাসের; এটা রাজা গেল গ্রীষ্মকালে তৈরী করে তাঁর এই বিশ্বস্ত ভৃত্যকে উপহার দিয়েছিলেন। তেমনি ঠিক এক বছর আগে মন্ত্রী সোণার বইয়ে লিখে রেখেছিলেন যে, রাজার অনুগ্রহ নিষ্ফলা হয় না।

রোগাস রাজাকে অনুসরণ করে চলল। এখন আর এতে কোনো বাধা ছিল না, কেননা, রাজা বাগানের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

নদীর তীরে গভীর নীরবতা; এমন কি কলধ্বনিও নীরব। ঘনায়মান সন্ধ্যার আলোতে নীলনদীর স্রোতখানি বাঁকা তলোয়ারের মতো দেখাচ্ছিল।

রোগাসের বাড়ীতে পৌছে রাজা একটী রূপার বাঁশী বার করে তিনবার ফুঁ দিলেন। সেই শব্দে একটী যুবতী অলিন্দে দেখা দিল। তার সম্বন্ধে এইটুকু বললেই হবে যে, সে-সময়কার শিল্পীরা মডেলের জন্যে তার চেয়ে সুগঠিত মুখ আর পায়নি।

নীচুস্বরে রাজা ডাকলেন,—ফ্লোরিলা।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রোগাস শুনতে লাগল। অনেকদিন থেকে সে ঠিক এই সন্দেহই করেছিল।

ফ্লোরিলা উত্তর দিলে,—এই যে মহারাজ।

—স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি পাব কি?

—জিজ্ঞাসা করছেন? রাজার কাজ হুকুম দেওয়া।

—তোমার স্বামীকে আমি রাজসভার কাজে ব্যস্ত রেখে এসেছি, সে হঠাৎ এসে পড়তে পারবে না। তার দিনও বোধ হয় ঘনিয়ে এসেছে। এই তার মৃত্যুদণ্ডের হুকুমনামা।

—মন্ত্রীর মোহর দেওয়া?

—নিশ্চয়ই।

রোগাস ভাবলে,—বাবার এ নীচ চাতুরী।

চুপিচুপি ফ্লোরিলা বললে,—আমার কাছে ওটা একঘণ্টা পরে নিয়ে আসবেন। তার মধ্যে আমি সমস্ত দাসীদের ঘুমাতে পাঠিয়ে দেব।

যে-রাজা প্রেমে পড়েছেন, তাঁর কাছে একঘণ্টা অত্যন্ত দীর্ঘকাল। বিকালটাও গরম,

মাটী থেকে তাপ উঠছিল। বাতাস নেই, নদীর জলও দর্পণের মতো মসৃণ। একটা গর্ব্বিত মৌমাছি গোলাপের ওপর এসে বসল।—

জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ রাজার একটা খেয়াল জাগল। রাজার খেয়াল, সুতরাং—রোগাস যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, তারি কাছে বসে, তিনি হলুদ রঙের জুতা খুলে ফেললেন; বেগুনীরঙের গায়ের কাপড় এবং সোণালি বর্ণের হীরার বোতাম বসানো কুর্ত্তিও খুলে রাখলেন। রূপার বাঁশীটী বার করলেন; তারপর একে একে তাঁর বহুমূল্য রাজবেশ সব খুলে ফেলে নরম ঘাসের উপর রেখে দিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। জনমানবের চিহ্ন নেই। পবিত্র নীলনদীর এই নিষিদ্ধ অংশে কেইবা অনধিকার প্রবেশ করতে আসবে!

দর্পণের মত জলই কেবল নির্লজ্জের মতো তাঁর দিকে চেয়ে আপন বুকে তাঁকে প্রতিবিম্বিত করলে। মোরাস জলে ঝাঁপ দিতেই জলরাশি তোষামোদ-ছলে তাঁর সারা উত্তপ্ত দেহখানিকে চুম্বন করলে। তাঁর ভারী ভালো লাগল। দ্রাক্ষালতা-জড়িত গাছগুলি সেখানে একটা দেওয়ালের সৃষ্টি করেছিল, তারি আড়ালে তিনি চকচকে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে চললেন।

বহুক্ষণ ধরে স্নান করার পর যখন প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলনের সময় হয়ে এল, তিনি জল থেকে উঠে এসে পরিচ্ছদের সন্ধানে চলে গেলেন। প্রথম ঝোপের আড়ালে না পেয়ে মনে করলেন বোধ হয় ভুল হয়েছে, তাই তিনি চললেন পরের ঝোপটীর কাছে। কিন্তু রাজবেশের কোথাও চিহ্ন নেই। তিনি প্রত্যেক ঝোপে সন্ধান সুরু করলেন, শেষে নদীতীরের প্রত্যেক অংশ খুঁজে দেখলেন, কিন্তু কোথাও ফল হলনা।

—কোথায় আমার পরিচ্ছদ? কে চুরি করেছে? মানুষে কখনোই করেনি। শুনছ পৃথিবী, তুমি যদি গিলে ফেলে থাক, আমি আমার রাজ্যের যত গাছ, যত ঘাস, সব উপড়ে ফেলব তা হলে।

মাটীতে পড়ে তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। শেষে লাফিয়ে উঠে চাঁদকে উদ্দেশ করে বললেন,—এই বুড়া নিশালোক, আরও জোরে জ্বলনা! নইলে তোর মন্দির গুড়ো করে দেব।

কিন্তু চাঁদ শুনলে না; সে যেন ভয় পাওয়া মেয়ের মতো মেঘের আড়ালে আপনাকে গোপন করলে। বৃষ্টি সুরু হল। ধুলা আর গাছ থেকে জল করে তাঁকে একেবারে বি-শ্রী করে দিলে। নিরুপায় হয়ে তিনি ভাবলেন, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে নতুন পোষাক পরে ফের আসবেন। প্রহরীরা তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ফেলবে,—এ লজ্জা তাঁকে সইতেই হবে; অবশ্য তারও উপায় তাঁর জানা আছে। তিনি তাদের মাথা কেটে উড়িয়ে দেবেন; কাজেই এ বিষয় নিয়ে পরিহাস করবার অবসরই পাবে না তারা।

তাড়াতাড়ি তিনি চললেন সেই গুপ্ত দরজাটীর দিকে। দরজা বন্ধ। তাঁর মনে পড়ল তিনি চাবি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন নি। নদীর ধার দিয়ে দক্ষিণ দুয়ার পার হয়ে বহু রাস্তায়

মধ্যে দিয়ে প্রাসাদে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রজারা তাঁকে এই অবস্থায় দেখলে কতই না হাসির গান রচনা করবে! সৌভাগ্যক্রমে কেউ তাঁকে দেখলে না; পথে লোকজন মোটেই ছিল না। কেবল মন্দিরের দ্বারে একজন ভিখারী ঘুমিয়ে ছিল; রাজা তার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন,—তোমার গায়ের কাপড়টা আমায় দাও।

ভিখারী ভয় পেয়ে তাঁকে বেত দিয়ে আঘাত করে বললে,—বেরিয়ে যা! না গেলে মেরে গুঁড়ো করে ফেলব।

রাজা বুঝলেন ভিখারীর জোর তার চেয়ে বেশী, তাই তিনি দ্রুতপদে চলে গেলেন। একদল ক্ষুধিত কুকুর চীৎকার করতে করতে তাঁর পিছু নিলে। প্রহরী দ্বারে ঘুমাচ্ছিল এমন সময় কে তার পিঠে আঘাত করলে; সে বলে উঠল,—এই, কে তুই? কি চাস?

—আমাকে ঢুকতে দাও, তোমার গায়ের কাপড়টা দাও।

প্রহরী ভাবলে, এ বুঝি বিদ্রূপ; সে প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়ে শেষে হেসে বললে,—এই তোর চাই? কাছে কোন ভিখারীদের আশ্রয় নেই মনে করে দুঃখ হচ্ছে।

রাজা রেগে বললেন,—আমার হুকুম তুমি মানতে বাধ্য।

রাজার অবিন্যস্ত চুল আর রক্তমাখা পা-ওয়ালা কিম্ভূত চেহারার দিকে সে তার বর্শাখানা লক্ষ্য করে বললে,—বেরিয়ে যা।

—আমাকে তুমি চেননা?

—না।

—আমি রাজা।

—না, আহাম্মক। যা, বেরিয়ে যা! আমার ভারি ঘুম না পেলে তোকে রাজার নাম দিয়ে খেলা করবার জন্যে আচ্ছা করে ঘা কতক দিয়ে দিতাম।

রাজা মোরাস তখন বোঝাতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ল যে, ছোটলোকদের সঙ্গে এই রকম করে ব্যবহার করতে হয়।

—শোনো বাপু, আজ রাতে আমি নদীতে স্নান করতে নেমেছিলাম; আমার কাপড় কে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি হলপ করে বলছি আমিই রাজা মোরাস।

প্রহরী জবাব দিলে,—তুমি উজবুক!

বিষণ্ণ হয়ে দেওয়ালের গায়ে গুঁড়ি মেরে রাজা ফিরে চললেন তাঁর প্রিয়তমার ভবনের উদ্দেশে। তিনি ভাবলেন সেখানে গিয়ে দরজায় আঘাত করে কাপড় চাইবেন। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন,—একবার কাপড় পেলে হয়; সমস্ত সহরকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন।

একবার তাঁর মনে হল, পরিচ্ছদই কি রাজার সর্ব্বস্ব? তারপর তিনি সেই ভিখারীকে দেখতে পেলেন। অকর্ম্মা বুড়া উঠে বসে অপেক্ষা করছিল কখন মদের দোকান খুলবে বলে।

রাজা বললেন,—তোমার গায়ের কাপড়খানা আমাকে দাও।

তাচ্ছিল্য-সূচক ভঙ্গীতে ভিখারী জবাব দিলে,—তোমার নিজেকে কি এই অবস্থায় খুব ভালো দেখাচ্ছে? কাপড়-চোপড়গুলো সব কোথায় বাঁধা দিলে বাপু? বাস্তবিক কিন্তু মদ-ওয়ালাদের জ্বালায় আর বাঁচবার যো নেই। আমি রাজা হলে সবাইকে ফাঁসিকাঠে চড়িয়ে ছাড়তাম।

—আমিও ঠিক তাই করব, যদি তুমি তোমার গায়ের কাপড়খানি দাও।

—আমার সঙ্গে জোচ্চুরি করতে এসেছিস! বদমায়েস কোথাকার!

—আমি রাজা।

ভিখারী অবাক হয়ে চাইলে।

—তুমি কি স্বর্ণমুদ্রায় আমার মুখ আঁকা দেখনি?

—আমি! আমি জন্মে সোণার টাকা চোখেই দেখিনি,—বলে সে গায়ের কাপড়খানা রাজাকে দিয়ে দিলে।

এখন আর তাঁর রোগাসের প্রাসাদে যাবার কোন বাধা রইল না। যদিও তখন খুব সকাল, তবু সদর দরজায় অনেক লোক জমা হয়েছে। তারা সবাই চুপিচুপি কথা বলছিল। রাজা তাঁর অনুগত কর্ত্যদের দেখতে পেলেন। তারা কিন্তু তাঁকে যেন চিনলেই না; পাছে তার নোংরা গাত্রাবরণ তাদের চমৎকার পোষাকের সঙ্গে লেগে যায়, এই ভয়ে তারা সরে গেল। রাজা দরজায় একটা ঘুসি দিয়ে আঘাত করলেন।

—খোলো, আমি রাজার নামে হুকুম করছি।

দ্বারের প্রহরী হেসে বললে,—কোথাকার মূর্খ এটা!

রোগাস তখন মিনতি করে বললেন,—তোমরা কি আমায় চিনতে পারছ না? আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ দিকি! আমিই তোমাদের রাজা।

উত্তরে কেবল একটা হাসির রব উঠল।

—কাবুল, তুমি চুপ করে রইলে যে? আমি তো মাত্র গেল-হপ্তায় তোমাকে প্রচুর অর্থ দিয়েছি! আর তুমি—নাইলস—তোমাকে আমি দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করেছি, তুমিও কি আমায় চিনবে না?

কাবুল বা নাইলস কেউই রাজাকে চিন্‌তে পারলে না।

চটে গিয়ে তিনি বললেন,—অকৃতজ্ঞ! সে কোথায়—ফোরিলা? সে নিশ্চয়ই আমাকে চিনবে।

এই সময়ে রাজার নকীব বেরিয়ে এল। তার উন্নত বর্ষার ওপর গাঁথা ছিল একটা মাথা,—সে মাথা ফোরিলার।

আর সে তাকে চিনবে কি করে? সে যে চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেছে। দীর্ঘ কর্কশ চুলগুলি তার মুখখানির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; তাতে দীর্ঘ বর্ষার খানিকটাও ঢেকে গেছে। সমবেত লোকেরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। রাজা দুঃখিত হয়ে জানতে চাইলেন, কে একাজ

করেছে। উত্তর কেউ দিলে না বটে- কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন তখনি। নকীব একটী ঘোষণা পাঠ করে সেটাকে পেরেক দিয়ে দরজায় এঁটে দিলে যাতে সবাই দেখতে পায় যে, তাতে মন্ত্রীর মোহর দেওয়া আছে। রাজা মোরাস নিজের কপাল টিপে ধরে মনে মনে বললেন,—বোধ হয় আমি রাজা মোরাস নই।

জনতা বেড়ে উঠল। যত 'নাইট' আর সম্ভ্রান্ত মহিলারা বেরিয়ে এলেন সেই সুগঠিত মাথাটী দেখতে যা আর কখনো ঈর্ষা বা প্রেম জাগাতে পারবে না। সেই ভিখারীও এল। রাজার সঙ্গে কেবল সে-ই কথা কইলে; আর কেউ না।

বললে,—চলে এস এখান থেকে; নইলে সবাই তোমাকে মেরে তাড়িয়ে দেবে, আর আমি তোমায় যে কাপড়খানা দিয়েছি, তাও কেড়ে নেবে।

ভিখারী তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চলল; তাঁর নিজের ইচ্ছাশক্তি সব যেন হারিয়ে গেছে।

কিছুদূর গিয়ে নারকিজের দেখা পেয়ে আবার তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মন্ত্রী তখন বগলে একগাদা কাগজ নিয়ে রাজার কাছে চলেছিলেন। রাজা ছুটে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন,—নারকিজ! নারকিজ! তোমায় দেখা পেয়ে বেঁচে গেলাম।

মন্ত্রী দারুণ বিপত্তিতে পড়ে জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললেন,—কোথাকার নির্লজ্জ তুমি হে?

—আমাকে চিনতে পারচ না? আমি রাজা।

হেসে উঠে মন্ত্রী বললেন,—অসম্ভব! তোমাকে দেখতে অনেকটা তাঁরি মতো বটে, তবে গলাটা তোমার অত্যন্ত ভাঙা,—বলে নিজের জন্মদিন উপলক্ষে রাজারই দেওয়া সোণা মোড়া ছড়িটা দিয়ে তাঁর পিঠে দুচ আঘাত করে চলে গেলেন।

প্রাসাদে প্রবেশ করলেন মন্ত্রী খুব প্রফুল্ল মনে। ভৃত্যেরা তাঁর আগে আগে চলল দ্বার খুলে দেবে বলে। শেষে তিনি এসে পৌঁছালেন যেখানে রাজা—রোগাস—অপেক্ষা করছিলেন।

রোগাস তাঁকে সব কথা খুলে বললে। কেমন করে সে ফোরিলা আর রাজার গুপ্তকথা শুনেছিল; কেমন করে রাজ পরিচ্ছদ পরেছিল, আর নামহীন মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানায় ফোরিলার নাম লিখে দিয়েছিল।

তারপর কি হল সে কথা ঐতিহাসিকেরা লিখে গেছেন বটে, কিন্তু আমি আর তার পুনরাবৃত্তি করব না; কেননা আমি তাঁদের শেষের কথাগুলো মোটেই বিশ্বাস করি না।

শ্রীবিজয় সেন গুপ্ত,

বাংলা সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য

বৈষ্ণব সাহিত্য যে বাংলা সাহিত্যের একটা বিপুল অঙ্গ, এ কথা আজ অবিসংবাদিত। আর বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর যে অর্দ্ধেকের বেশীই পরকীয়া প্রেম নিয়া, তাহাও অস্বীকার করায় কোন পুণ্য নাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্য বলিতে বৈষ্ণব সাহিত্যের চেয়ে কিছু বেশী বুঝায় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর ও পরকীয়া প্রেম ভিন্ন অন্য বস্তুও রহিয়াছে। এই দুটাই সোজা কথা; কাহারও মানিয়া লইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

কিন্তু বর্ত্তমানে সাহিত্যে উপন্যাস অতি বড় হইয়া উঠিয়াছে; ইহা ভাল কি মন্দ তাহা আমরা বলিতেছি না; আমরা বিবৃতি করিতেছি মাত্র, বিচার করিতেছি না; উপন্যাস যে বাস্তবিকই আধুনিক সাহিত্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রমাণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। মানসিক সাহিত্যের দিকে চাহিলেও বুঝা যাইবে, যে উপন্যাস ছাড়া তাহার অস্তিত্বও সম্ভব হয় না।

সাহিত্যের এই যে এত বড় অঙ্গ উপন্যাস, তাহার ভিতরের শাসটুকু প্রেম ভিন্ন আর কিছু নহে। সুতরাং সাহিত্যে প্রেমের স্থানও আজ অতি উচ্চে। পরকীয়া স্বকীয়ার ভেদটুকু বাদ দিলে, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ও প্রেম ভিন্ন আর কিছু নহে।

যে মানসিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ আজ প্রেমের সাহিত্যকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে, যাহার অনুসরণে বাংলা দেশেও উপন্যাস আজ এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেই প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়াই আমরা আজ বৈষ্ণব সাহিত্যকে নিতান্ত আপনার বলে করিতে শিখিয়াছি। প্রেমের প্রতি, প্রেমের বস্তুর প্রতি, সাহিত্যের একটা অনুরাগ একটা আসক্তি আমাদের জন্মিয়াছে; এই জন্য বিচিত্র লীলাময় প্রেমের স্থূল সূক্ষ্ম গতির কথা, নিটোল, সুঠাম ভাষায় যে প্রকাশ করে, তাহাকেও আমরা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। প্রেমের কথা মনোজ্ঞ ভাষায় বলিতে পারিয়াছেন বলিয়া বৈষ্ণব কবিদের প্রতি ও আমাদের প্রাণের টান রহিয়াছে। সত্যি সত্যি পরকীয়া প্রেমটাই আমরা ঠিক চাই কি না সন্দেহ; সেটা সমাজে বেশী চলিতে আরম্ভ করিলে যে কাহারও সুবিধা হইবে না, ইহাও কে না জানে? এই জিনিষটা আংশিক ভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেও, অনেকের পক্ষেই 'ঘর সামলানো' যে দায় হইয়া পড়িবে, তাহাও অস্বীকার করিবার জো নাই। সুতরাং বৈষ্ণব লাইনের প্রতি আমাদের যে টান, সেটা ঠিক 'পরকীয়া' প্রেমের স্বাদ দিবার জন্যেই বোধ হয় নয়; এ শ্রদ্ধাটুকু প্রেমের আদরেরই রূপান্তর মাত্র। প্রেমের কাহিনী আমাদের আদরনীয়, বৈষ্ণব সাহিত্য ও প্রেমেরই কাহিনী; সেটা যে প্রধানতঃ পরকীয়ার প্রেম, এটা একটা অবান্তর ঘটনা মাত্র—হয় ত বা, একটা আকস্মিক,

অনভিপ্রেত দৈবঘটনা মাত্র; যেমন করিয়াই হউক, এই 'পরকীয়া-র' বিশেষণ টুকুর উপরই যে আমাদের সকল অবজ্ঞা, এমন নয়। প্রকৃত পক্ষে, প্রেমের গান প্রাণের সুরে গীত হইয়াছে বলিয়াই, আজ এই প্রেম-সাহিত্যের যুগে বৈষ্ণব-সাহিত্য এতটা সম্মান পাইতেছে।

ইহা ছাড়া, বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রদ্ধালাভের আর একটী প্রধান কারণ এই যে ইহা একটী সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সাহিত্য। ধর্ম্মীর নিকট ধর্ম্ম সাহিত্য সাধারণতঃ যে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকে, সেই সামান্য সম্মানটুকু বৈষ্ণব সাহিত্য বৈষ্ণবের নিকট না পাইবে কেন? তাছাড়া, আজ যেখানে প্রত্যেক ধর্ম্মের লোকই অপর ধর্ম্মের প্রতি একটা সাধারণ সহানুভূতি, সৌহার্দ্দ এবং ঔদার্য্য দেখাইতে উন্মুখ, সেখানে অবৈষ্ণবেরাও বৈষ্ণবদের প্রতি একটা সৌহার্দ্দ দেখাইবে এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সাহিত্যকেও একটু শ্রদ্ধাচক্ষে দেখিবে, ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু এই সৌহার্দ্দ এবং সম্মান দেখাইতে গিয়া, আমরা অনেক সময়ই একটা কথা ভুলিয়া যাই যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম যেমন সমগ্র বাংলা গ্রহণ করে নাই, বৈষ্ণব সাহিত্যকে ও তেমনই সমগ্র বাংলাই একান্ত আপন বলিয়া কখনও স্বীকার করিয়াছে কি না সন্দেহ; বোধ হয়, এখনও করে না। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরোধের কথা কে না জানে? যে বিরোধ শুধু ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যের আসরে—এমন কি, ভাষার আসরে ও ইহা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

শাক্তেরা প্রাণিহিংসা করে, মাংস খায়; বৈষ্ণবেরা তাহার বিরোধী; ফলে, একই বাংলা ভাষার কথা কহিলেও, প্রবীণ বৈষ্ণবেরা কতকগুলি শব্দ বর্জ্জন করিয়া চলিতেন,—যেমন 'রক্ত', 'মাংস' 'কাটা' ইত্যাদি। এমন কি শাক্তদের দেব দেবীর নাম গ্রহণ ও বৈষ্ণবেরা বর্জ্জন করিয়া চলিতেন, যথা, 'কালী" 'দুর্গা', 'গণেশ' ইত্যাদি। শাক্তরাও একেবারে 'অহিংস অসহযোগ' করিয়া বসিয়া ছিলেন না; তাঁহারাও প্রতিশোধ নিতে ছাড়িতেন না। তবে, ঐতিহাসিক ভাবে দেখিতে গেলে, শাক্তদের পশু হিংসামূলক ধর্ম্ম বৈদিক- ধর্ম্মেরই ছায়া বলিয়া প্রাচীনতর; এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্কার হিসাবে পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেইজন্যে কলহটা বৈষ্ণবেরাই আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। শাক্তদের আচারাদির প্রতি একটা ঘৃণা পোষণ করা তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। পূর্ব্ববঙ্গে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, এই ঘৃণা কত দূর গভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

পথে চলিতে চলিতে এক বৈষ্ণব যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন এবং যাহা দেখিয়া তিনি নিশ্চয়ই মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন:—

"গাতী ভাঁড়ার মায়ের মাঠে ত্রিফলার ডালে।
প্রভুরে বানাইয়া থুইছে আঠা পড়ে নালে।"

ইহার সোজা অর্থ এই যে 'দুর্গার মাঠ' নামক এক মাঠে একটা বেলগাছে, (অবশ্যই কোন্ এক শাক্ত) একটা পাঁঠা কাটিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে এবং সেই পাঁঠার কণ্ঠনালী বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে।

এখানে সমস্ত জিনিসটাই শাক্ত আবহাওয়ার পরিপূর্ণ; মাঠের নাম—সেও 'দুর্গার মাঠ' কিন্তু মাংসাশী দেবী দুর্গার নাম সেখন হইবে না,—বৈষ্ণব বলিতে চান, 'গণেশ-জননী'; কিন্তু গণেশ নাম উচ্চারণ করিতেও তিনি নারাজ; বোধ হয় শাক্ত দেবতার ছেলে বলিয়া; তাই বলিতেছেন 'হাতীওড়ার মায়ের (=দুর্গার) মাঠ'। বেল পাতা এবং বেল ফল, মহাদেবের প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, আর, মহাদেব স্বয়ং শক্তির স্বামী, সুতরাং শাক্ত না হইলেও বৈষ্ণব নিশ্চয়ই নহেন। সুতরাং তাঁহার পূজায় ব্যবহৃত হয় যে বিল্ব, তাহার নামও বর্জ্জনীয়। বেলপাতায় তিনটা 'ফল' থাকে—সুতরাং 'ত্রিফলা' বলিয়া বেলগাছকেই বুঝান হইতেছে। 'পাঁঠা' নামটী ও বর্জ্জনীয় কেননা শাক্তেরা উহা পূজায় বলি দেয়। অথচ সে জীব, এবং সর্ব্বজীবেই ভগবান্ বিষ্ণু বর্ত্তমান; সুতরাং পাঁঠাকে একবারে সাফ 'প্রভু' বলিয়াই অভিহিত করা হইতেছে। 'কাটা' ক্রিয়া শাক্ত সংস্কারে সমাচ্ছন্ন—সুতরাং অন্য ধাতু প্রয়োগ করিয়া বলা হইতেছে 'বানাইয়া থুইয়াছে'। সেই একই কারণে, 'রক্তের বদলে বলা হইতেছে 'আঠা'।

এই কিম্বদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে শপথ করা অসম্ভব। এমনও সম্ভব, যে, কোন শাক্তই হয়ত বৈষ্ণব দিগকে ভ্যাঙচাইবার ইচ্ছায় উহা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবদের ভিতরে যে এমন একটা গোঁড়ামি ঢুকিয়াছিল, তাহা ও অস্বীকার করিবার জো নাই। এমনকি, নিরামিষ তরকারীর সম্বন্ধে ও তাঁহারা হিংসাত্মক 'কাটা' ধাতু প্রয়োগ না করিয়া অনেক সময় বলিয়া থাকেন 'বানানো'; —শাক্ত বলিবে 'তরকারী কাটিতেছে (কিংবা কুটিতেছে); সুতরাং বৈষ্ণব হয়ত বলিবেন, 'তরকারী বানাইতেছে"। সুতরাং শব্দ প্রয়োগের বেলায় ও বৈষ্ণবেরা যে শাক্ত-গন্ধ দূষিত শব্দ বর্জ্জন করিয়া চলিতেন তাহা একেবারে অমূলক কথা নহে।

শাক্তেরা ও কম করে নাই। অতিবড় বৈষ্ণব তরকারী যে কুমড়া; তাহাকে তাঁরা যে শুধু 'কাটিয়া' রাঁধেন তা নয়, উহাকে 'বলি' দেওয়া হয়। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে দেখা যায়, শাক্ত রমণীরা কুমড়া কুটীবার পূর্ব্বে কোনও পুরুষ দ্বারা উহার উপর একটা 'কোপ' দেওয়াইয়া লয়—উহারই নাম 'বলি' দেওয়া। 'বলি দেওয়া' না হইলে মেয়েরা কুমড়া কাটেন না। তাছাড়া, অনেক স্থলে শাক্তেরা পূজায় পশু বলির পরে সেই যূপকাষ্ঠেই দস্তুর মত খড়্গ দ্বারা আক, শসা, কুমড়া প্রভৃতি বৈষ্ণব উদ্ভিজ্জকেও 'বলি' দিয়া থাকেন।

ভাষা ব্যবহারে এবং আচারে পর্য্যন্ত যে বিরোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সাহিত্যে এবং প্রেমের আদর্শে কি তাহার কোন প্রমাণই ছিল না? বৈষ্ণব কবিরা যে আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সম্মান লাভ করিতেছেন, সেটী তাঁদের সমসাময়িক কালে তাঁরা পাইতেন কিনা সন্দেহ।

যে আসরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী গীত হইত, সেই আসরেই ঠিক মুকুন্দ রামের চণ্ডী—ভুলুয়ার রায় মাস্যা কিংবা কালকেতুর মৃগয়া—অন্নপূর্ণা পূজার প্রবর্ত্তন প্রভৃতির কাহিনী গীত হইত বলিয়া কোন প্রমাণ ত পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী যুগে যাঁরা আমাদেরই মত প্রায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁরা হয় ত সাহিত্য-চর্চ্চা হিসাবে রাজকিনীর

প্রেম এবং মনসা-মঙ্গল একই সঙ্গে আলোচনা করিতেন; কিন্তু যেখানে ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে সাহিত্যের চর্চ্চা হইত সেখানে ত এমন সমন্বয়টী ছিল কিনা সন্দেহ। মনসা-মঙ্গল যে বাড়ীতে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে গীত হইত, সে বাড়ীতে বিদ্যাপতির কিংবা গোবিন্দ দাসের কোন পদাবলী কখনও গীত হইতে ত শুনা যায় নাই। আবার, যেখানে কৃষ্ণলীলাই প্রধান শ্রোতব্য বিষয় ছিল, সেখানে মনসা কিংবা অন্নপূর্ণা কিংবা হরগৌরী আসন পাইতেন কিনা সন্দেহ। এখন অবশ্যই শাক্তেরাও পরম শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন; শাক্তের বাড়ীতে ও কথকেরা রীতিমত ভাগবত কথা শ্রবণ করাইয়া থাকেন; কিন্তু এটা বোধ হয় আধুনিক যুগের সমন্বয় চেষ্টার (Eclectic tendency) ফল। কখন হইতে বাঙ্গালী এইরূপে ধর্ম্মের সকল বিরোধ মিটাইয়া ফেলিয়া একমাত্র সাহিত্য রসে রসিক হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়; কিন্তু চিরকালই যে এমনটী ছিল না, তাহা বোধ হয় সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে।

সাহিত্যের এই বিরোধ যে প্রেমের আদর্শেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, ইহাও বোধ হয় প্রমাণ সহকারেই বলা যাইতে পারে। আজ আমরা প্রেম বলিতেই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম বুঝি, প্রেমিক বলিতেই 'কানু'কে মনে করি, প্রেমিকা বলিতেই রাধিকা কিংবা চণ্ডীদাসের রজকিনীর কথা মনে ভাবি,—কিন্তু চিরকালই এবং বাংলার সমাজের সকলস্তরেই এরূপটী ছিল কিনা সন্দেহ। এখনও আমরা তথা কথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমটাকে যত বড় করিয়া তুলিয়াছি, ততটা খাঁটি বাংলার প্রাণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। যাত্রা গানে, ধুমর মাঠে কিশোর রাখালের গানে রাই একজন মস্ত প্রেমিকা হয়ত বা সতী সাধ্বী প্রেমিকা ও বটেন; রাখালদের মুখের একটী গানে রাই বলিতেছেন—দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি, তারে লোকে বলে সতী; একা কৃষ্ণ মোর পতি, আমি কেন হ'লেম অসতী"—অর্থাৎ তিনি সতীত্বের দাবীও করিয়া থাকেন। আর, 'কানু,—তিনি ত কোন প্রেমিক নহেন, তিনি যে স্বয়ং ভগবান্।

এই রাই কানুর প্রেমলীলা—জন-লীলা রাসলীলা—প্রকৃতি হিন্দু সমাজ ছাড়াইয়া বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে, তাহাদের 'ঘাঁটু' গানে, ভাটিয়ালী গানে এবং জারিগানে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই প্রেমলীলা নিয়া যে বাঙ্গালী মাতিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তথাপি ইহাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রেমের একমাত্র আদর্শ নয়।

খুল্লনা অবশ্যই প্রেমিকা নায়িকা নন। তাঁহার 'বারমাস্যা' সতী গৃহিণীর দুঃখের কাহিনী; —সতীনমানা সপত্নীকে সরাইয়া দিবার জন্যই ইহা কথিত হইয়াছে; পতিনিন্দার ছলে নয়। কিন্তু নায়িকা না হইলেও তাঁহার প্রেমের গভীরতা অস্বীকার করা চলে না; সেটা করিলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। তথাপি আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য যে, নায়িকা হিসাবে, এমন কি পত্নী প্রেমের আদর্শ হিসাবেও খুল্লনার কথা বাঙ্গালী ভাবে নাই। কিন্তু বেহুলা লখিন্দরের প্রেম কাহিনী কে না জানে? এবং বাঙ্গালীর প্রাণ কি সেটাকে রাইকানুর প্রেমের চেয়ে সত্য সত্যই ছোট মনে করিত? পরবর্ত্তী যুগে অবশ্যই রাই-কানুর প্রেম নিয়া যে

একটী বিরাট সাহিত্য—যাত্রা এবং গান—সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনটী বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী নিয়া হয় নাই। তার কারণ পুরাণতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিকেরা অনুসন্ধান করিতে পারেন। কিন্তু যে যুগে এই প্রেমের কাহিনী রচিত হইয়াছিল, এবং তার পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বেহুলার কাহিনী শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছে এবং সাহসে করিয়া বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে,—রাইয়ের চেয়ে বেহুলাকে অনেক বড়-ও মনে করিয়াছে।

আরও একটী প্রেমের চিত্র আমাদের সাহিত্যে আছে, সেটীর কথা ভুলিয়া গিয়াও আমরা ভাল করি নাই। সেটী হর গৌরীর প্রেম। ইহা শুধু বাংলা সাহিত্যের সম্পত্তি নয়—সমগ্র ভারতের সম্পত্তি।—সমগ্র ভারতের সম্পত্তি সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার অতি উচ্চ স্থান রহিয়াছে। "তথাবিধং প্রেম, পতিশ্চ তাদৃশঃ—কোথায় আর আছে? এত কদম-তলায় কিংবা জীর্ণ মন্দিরের কোণে হঠাৎ দেখায় প্রেম নয়; এ যে পরীক্ষিত, তপস্যা দ্বারা পরিশোধিত, যুগ যুগান্তের সঞ্চয় দ্বারা দৃঢ়ীকৃত প্রেম। কালিদাস যে প্রেমের কাহিনী কহিতে গিয়া প্রাণের কোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিলেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও তাহার স্থান কম নয়। মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতে গিয়া মায়ের যে কষ্ট, পর্ব্বত-রাজ-পত্নী তাহার ফুটন্ত ছবি; মেয়ে, স্বামীর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে আসিলে পিতা মাতার যে আনন্দ, আশ্বিনে শারদোৎসব তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি; আর, ছেলেপিলে নিয়া স্বামীস্ত্রীর সংসারের ছবি, দাম্পত্য কলহ ও তাহার সমাধান—এ সমস্তই ত প্রাচীন বাংলার কবিরা আপনার দেশের মত করিয়া হর-গৌরীর প্রেম চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কন্যাদানের আদর্শ গৌরীদান,—নগরাজের দুহিতা সম্প্রদান; পতী প্রেমের আদর্শ—সতী; সুতরাং সতীত্ব আর এমন কোথায় মিলিবে? আর সতীর শব স্কন্ধে লইয়া যিনি ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই হর-ভিন্ন পতিপ্রেমের আদর্শ আর কে হইতে পারে? এবং যে প্রেমেতে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গভাক্ হইয়াছিলেন, তার চেয়ে বড় প্রেম কোথায় মিলিবে?

বিবাহাদি উৎসবে বাংলা দেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গে মেয়েরা এখনও যে গান গায়, তাতে প্রেমের কথা থাকে; কিন্তু সে রাই-কানাইয়ের কদমতলার প্রেম নয়, সে যে হর-গৌরীর দাম্পত্য প্রেম। সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষিতা আধুনিক মেয়েদের কথা বলিতেছি না; সাবেকী ধরণের মেয়েরা যে প্রেমের গান জানেন এবং গাহেন, তাহার বেশীর ভাগই সতী-সতীপতির প্রেমের বিষয় নিয়া সহরবাসী সাহিত্য রসিক অনেক নব্য ব্যক্তিই শুনিয়া হয় ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না, যে, ধর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত উপনয়নাদি সংস্কারে আজও মেয়েরা অনেক সময় যে সব গান গাহেন, তাতে বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে নেওয়া হয় মা যশোদার পুত্র বাৎসল্য; কিন্তু প্রেমের কথা কহিবার সময় আবির্ভূত হন, ত্রিপুরারি।

সুতরাং যাত্রাগান কিংবা ভাটিয়ার গান প্রভৃতি বাদ দিয়ে, সত্যকার জীবনে যে প্রেমের গান হয়, তাহার ছবি রহিয়াছে, বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়,—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণবতার শাখায়। তাদের দৈনন্দিন জীবন গঠিত করিতে গিয়া প্রাচীন যুগের বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাহিত্য

হইতে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল মাতৃ প্রেমের আদর্শ স্বরূপ যশোদাকে ; আর কানুকে গ্রহণ করিয়াছিল বন্ধুপ্রেমের আদর্শ হিসাবে—সখা হিসাবে, এবং এখনও প্রাচীন ধারা হইতে যাহাদের জীবন একেবারে মুক্ত হয় নাই, এমন বাঙ্গালীরা শ্রীরাধার প্রেমটাকেই একেবারে প্রেমের শীর্ষস্থানীয় মনে করে কিনা সন্দেহ।

পরকীয়া প্রেমকে যে আমরা আজ এতবড় দেখিতে পাই তাহার কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদত্ত একটী উপমা। তিনি ভগবৎ প্রেমের আদর্শ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, পরবাসিনী নারী যেমন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও সর্ব্বদাই উপপতির চিন্তা করে, সেইরূপ সংসারের কাজে বদ্ধ থাকিয়াও ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবানেরই চিন্তা করিবে। ইহা হইতেই ভাব প্রবণ বাঙ্গালী বোধ হয় ধরিয়া লইল যে, ভগবৎ প্রেমের স্বাদ পাইতে হইলে পরকীয়া প্রেম করিতে হয়। এইরূপে ভগবৎ প্রেমের উপমাস্থল হইয়াই রাধিকার প্রেম বাঙ্গালীর মনে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দৌরাত্ম্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবদের ভক্তিধর্ম্মে যাঁরা ততটা প্রবুদ্ধ নন, তাঁরা প্রেমের আদর্শ হিসাবে শ্রীরাধিকার প্রেমকে কখনও তেমন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ বাঙ্গালী জীবনের উৎসবে কৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং কৈশোর লীলা যতটা স্থান পায়, গোপীদের সহিত লীলা ততটা হয় বলিয়া ত মনে হয় না।

বৈষ্ণব কবিদের প্রেম-গীতি যে আজ নব্য বাঙ্গালীর এত প্রিয় তার জন্য কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথও কতক অংশে দায়ী। অবশ্যই উক্ত কবিদের ভাষার লালিত্য ও আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেম-গীতিতে তাঁদের ভাষা এবং ভাব যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, সেইটীই বোধ হয় বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকে আজ আমাদের কাছে এত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু হাজারই প্রিয় হউক, বৈষ্ণবদের পরকীয়া প্রেমই বাঙ্গালীর প্রেমের আদর্শ নয়, এবং বৈষ্ণব সাহিত্যই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র উল্লেখ যোগ্য স্তর নয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মই যেমন বাংলার একমাত্র ধর্ম্ম নয়, বৈষ্ণব আদর্শই যেমন একমাত্র আদর্শ নয় ; তেমনই বৈষ্ণব সাহিত্য এবং বৈষ্ণব প্রেমই বাংলার একমাত্র উপজীব্য নয়। সুতরাং আজকার দিনে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে গিয়া কোন দুর্দ্দান্ত কালাপাহাড় এই পরকীয়া প্রেমের সাহিত্য সম্বন্ধে যদি সত্য সত্যই বলিয়া বসে যে—

"চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও উহাকে,
ভস্মরাশি করে ফেল কর্ম্মনাশা জলে"—

তাহা হইলে তেমন আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। বিশ্বসুন্দরকে যারা ত্যাগ করিয়াছে শুধু পদলালিত্যের মোহে পড়িয়া তারা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে একটু চড়া কথাও কহিতে পারিবে না, এমন কি যুক্তি আছে ?

শ্রীউমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রবীন্দ্র বারমাস্যা *

কার্ত্তিক।

১। বেলা দ্বিপ্রহর ;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
* * * * স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি,
ঘুমায়ে পড়েছে ; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম।

* * *

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায়।

* * *

হেমন্তে তার সময় হল এবে,
পূর্ণ করে' আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত।

* *

হেমন্তে কোন্ বসন্তেরি বাণী
পূর্ণ লহ ঐ যে দিল আনি।

* * *

শিউলি-ফোটা ফুরলো যেই, শীতের বনে
এলে যে সেই শূন্যক্ষণে।

* * *

আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলি বিলীন ভূষণ বিহীন।

* * *

---

* গতবৎসরের ভারতীতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বারমাস্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

গিয়েছে আশ্বিন,—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্ম্মস্থানে।

হেমন্তের প্রভাত শিশিরে
ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণী নদীতীরে।

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।

আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।

অগ্রহায়ণ।

ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

অঘ্রাণে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশির মাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কি করিয়া॥

সোনার-ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোট ছোট ভরী পাল তুলে যায়,
মাঝি বসে' গায় গান॥

একটি মেয়ে একেলা
সাঁঝের বেলা
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারি দিকে সোনার ধান ফলেছে!

* *

ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার॥

পৌষ।

যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারী ব্রত, হিমবস্ত্র পরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব্ব আভরণ হীন॥

* * * *

আসিবেক শীত, বিহঙ্গ গীত
যাইবে থামি'
ফুল পল্লব ঝরে' যাবে সব,
রহিব আমি॥ (কণ্টকবৃক্ষ)

* * *

পৌষ প্রখর শীতে জর্জ্জর, ঝিল্লি মুখর রাতি;
নিদ্রিত পুরী, নির্জ্জন ঘর, নির্ব্বাণ শিখ বাতি।

* * *

পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ, শিহরে নগ্ন শাখা॥

* * *

পউষের পাতা ঝরা তপবনে
আজি কি কারণে
টলিয়া পড়িল আসি' বসন্তের মাতাল বাতাস।
নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্চ হাস,
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশির—মন্থর॥

• • •

আরম্ভিছে শীতকাল পড়িছে নীহার জাল,
শীর্ণ বৃক্ষ শাখা যত ফুল পত্র হীন;
মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতি মাতা শুভ্র বাষ্পজালে গাঁথা
কুজ্ঝটী-বসন খানি দেছেন টানিয়া॥

• • •

সহসা কঠিন শীতে মানসের জলে
পদ্মবন মরে' যায়, হংস দলে দলে
সারি বেঁধে উড়ে যায় সুদূর দক্ষিণে,
জনহীন কাশ ফুল্ল নদীর পুলিনে॥

• • •

শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন
আমলকিরে এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্ শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।

• • •

এল যে শীতের বেলা বরষ পরে,
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে।

• • •

প্রথম শীতের মাসে
শিশির লাগিল ঘাসে,
হু হু করে' হাওয়া আসে,
হি হি করে' কাঁপে গাত্র।

—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সঙ্কলিত।

খেয়াল খাতা।

গৃহপতি।

খেয়ের—

ভোগী গৃহপতি খাইয়ে লোককে
খাওয়াইয়া পায় সুখ।
বাজে লোকে ভোজে নিমন্ত্রিতে বড় সে পরাঙ্মুখ।
রবাহুত প্রভুদিগেরে আটকান যায় তবু কি ?
মিঠাইমোণ্ডা বেচিতে বসি কে রাখে মাছি আটকি ॥
ব্যাওরাটা তবে ভাঙ্গিয়া বলি
শুনিয়া পাবে আনন্দ।
ভোগী গৃহপতি আর কেহ নহে—
রচে যে ছন্দ-বন্দ ॥
ভোজে যে-আহুত বোদ্ধা যে নয়,
—গুণগ্রাহী সদিচ্ছু।
রবাহুত সে, বকে যে ম্যালা, বোঝে না
সোঝে না কিচ্ছু।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর্টের অগ্নিহোত্রী।

['আর্ট ও সাহিত্যাগ্নিক' নামক গ্রন্থ রচয়িতা, আর্টের ধ্যানী শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত সেন মহাশয় আমাকে তাঁর কোন বক্তৃতায় সভানেতৃত্ব করিতে নিমন্ত্রণ করেন। উহার সবিনয় অঙ্গীকার পত্রের উত্তরে তিনি আমায় যে চিঠিখানি লিখিয়াছেন তাহা শুধু ব্যক্তিবিশেষের পাঠোদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও উহাতে আর্টের মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসু ধ্যানীর ধ্যানলব্ধ সত্যের যে অযাচিত দান ভরা আছে তাহা একলা ভোগ করা নিতান্ত স্বার্থপরতা হইবে বিবেচনা করিয়া, সে পত্রখানি রচনা-সঙ্গতির সুষ্ঠুতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিনা কাটছাঁটে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। পাঠকপাঠিকারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সৌজন্য-নীহারটুকু বাদ দিয়া আসল বিষয়টির ক্ষীর গ্রহণ করিবেন। ভাঃ সং]

মাননীয়াসু

আপনার অনুগ্রহ লিপিখানি যথাসময়ে পেয়েছি।—আপনি আর্টের সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন—আমি দেশের পক্ষে এটা একটা পরম সৌভাগ্য মনে করি। আমার মনে হয় আপনার প্রতিভা ও প্রতিপত্তির আনুকূল্য লাভ করতে পারলে দেশে আবার একটা অঘটন সাড়া পড়ে যাবে—সমস্ত জীর্ণ ছিন্নতা ও চলিত ক্ষুদ্রতা দূর হয়ে যাবে নূতনের রূপাবর্ত্তের সাম্‌নে। নূতনত্ব, রূপের ভিতর দিয়া এখন ও জনতার চোখে পড়ে নি—এখনও চারিদিকে 'টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে'—তা' তিলের মত ছড়ান রয়েছে। তাকে তিলোত্তমার অখণ্ড রূপরেখা দিয়ে কেউ সৃষ্ট করে নি এজন্য জনতা পড়ে' আছে দূরে—আগ্রত জীবনযাত্রার বাইরে। নূতনত্ব যে সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে মনের মন্দিরে আহ্বান কর্ত্তে হবে - তাকে চিত্রের বর্ণ ও রেখার হিল্লোলিত নাগপাশে বেঁধে সকলের সাম্‌নে উপস্থাপিত কর্ত্তে হবে—তবেই তা সকলকে একপথের পথিক করবে। এমন কি নূতন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সাহায্যে এযুগের সমস্ত রূপ-সাধনাকে অসীম কালের ধূসর ললাটরেখা-রাগ রেখে যেতে হবে, এ দুঃসাহস ও নূতনত্বকে কর্ত্তে হবে।

এ'ত বেশী কিছু নয়। এমনিভাবে নব্য আইরিষআর্ট নূতন আয়র্লণ্ডকেতো তৈরী করেছে। আয়র্লণ্ড যতদিন নিজের কথা দেখেনি ততদিন পরের ঝুলির ভিতর আটকে ছিল!

নব্য আইরিষ এজন্য নূতন mythology তৈরী করলে folklore হ'তে; নব্য আইরিষ কাব্য ও নাট্য আয়র্লণ্ডকে একটা নূতন রূপ দান করেছিল ললিতকলার ভিতর দিয়ে। বল, ছন্দ ও গন্ধলীলার ভরপুর নাট্যমঞ্চ নূতন আয়র্লণ্ডকে একটা স্বাধীন স্বরূপ দেয় যা' একান্তভাবে শুধু আইরিষ জাতিরই। আইরিষের নূতন কাব্য ও নাটক য়ুরোপীয় জাতির ভিতর এমনি করে' তাদের স্বাতন্ত্র্য ও ভাবগত ঐক্য প্রমাণ করেছিল—এবং সব চেয়ে বেশী এমনি করে' আইরিষের গওপ্রাণকেও এক করেছিল।

শুধু ভাষায় তা' হয়না—রূপলীলায় বা আর্টেই তা হয় কারণ ভাষা হচ্ছে প্রতীয়মানীয়। ঠিক এ উপায়ে নূতন Russian Art—Soviet Russiaকে এক কর্চ্ছে আধুনিকতার কটাক্ষে প্রাচীন রুষিয়া ধাতুখণ্ডের মত গলিত হয়ে গেছে; এই গলিত ধাতুদ্রব্য হ'তে তারা নব্য রুষিয়ার অন্তর দেবতাকে হিরণ্ময়ী সীতার রূপ দিয়েছে। Soviet idiel যতদিন abstraction মাত্র ছিল—যতদিন তা পুঁথির লিখায় আবদ্ধ ছিল—ততক্ষণ তা উপহাসের ব্যাপারেই ছিল—বিরাট রুষ-জনতা তাকে দেখেনি ও বোঝেনি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তা সুরের জবা পেয়ে রুষ মন্দির ও রুষ-প্রান্তরকে ধ্বনিত করে' তুললে, চিত্রের আশ্লেষ পেয়ে দিকে দিকে, প্রাসাদে, কুটীরে বর্ণের মুখড়োর পরিব্যাপ্ত করে চোখকে ত্রস্ত করে তুললে মূর্ত্তির প্রগল্‌ভতায় আকাশতল পূর্ণ করে' দীপ্যমান হ'ল কার্য্যের নবীন রূপছন্দের তালে তালে নটীর নূপুর-নিক্কণের মত ধাঁধাঁ উপস্থিত করলে সে মুহূর্ত্তেই তা সার্থক হল—তা' সত্য হল—তা' রুষজনতার কাছে রাজা রাজেশ্বরী মূর্ত্তি লাভ করে' জনগনমনের অধিনায়িকা হয়ে পড়ল—কোটী ভক্ত তারই সাম্‌নে নূতন আরতির পঞ্চদীপ জ্বালালে!

এ সমস্ত জাতি নূতন ভাষা ও রূপের বা প্রতীক ও প্রতিমার ভিতর দিয়ে অল্পদিনের ভিতর নিজকে গড়ে' তুলেছে—আর্টই তাদের বেঁধেছে। সকল জাতিকেই আর্ট বাঁধে। এদেশে ও অবশ্যম্ভাবী রাষ্ট্র বিপ্লব হুহুকরে আসছে—সমাজ পীড়িত ও ক্ষুব্ধ হয়ে' বাঁধন ছেড়ে দিয়েছে—অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। প্রাচীনতার এই যে প্রলয়ের শিহরণ দেখা যাচ্ছে—এ বলতেই থাক্ যে যতক্ষণ না একটা নূতন খণ্ডতাকে গড়ে' তোলা যায়, এর ভিতর হ'তে নূতনের রূপ কল্পনা করা, নূতন আনন্দ নূতন সত্য, নূতন মঙ্গলকে গড়ে' তোলা আর্টের কাজ।—সেটা সব চাইতে গভীর-সূর্য্য-ও রেস': ধ্বংসের অঙ্গভঙ্গলীলা ও চারিদিকে এদেশে ধূমায়মান হচ্ছে এটা আনন্দেরই মুহূর্ত্ত—বিষাদের লয়-কালে এটা সৃষ্টির ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। এই মাহেন্দ্রক্ষণে নূতন রাজ্যের নূতন জাতির স্রষ্টাকে চাই এই প্রলয়কে স্বাগত বলে' বরণ করতে, চাই এই সুযোগের জন্য এই নূতন আনন্দের জন্য। কিন্তু সে স্রষ্টা কৈ? বা স্রষ্টার সে চক্ষু কৈ? দেশে কি কেউ এবং আজ ভাববার সুযোগ পাচ্ছে? সকলেই নীড় রচনা করে' ঘুরে' বসে' আরম্ভ হচ্ছেন বাইরের ভাবনা দূর করে'! দেশের উদ্বেলিত চিত্ত তাই পুড়ে' গলে' মোমের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে আধার না পেয়ে নূতন 'form' না পেয়ে! দেশে নূতন কোন Philosophy বিদের আর্ট ও নয় অথচ সকলেরই পণ্ডিত হওয়ার ঝোঁক চেপেছে!

দেশের এই মুহূর্ত্ত ভাগোপজীবীর এক পরম মুহূর্ত্ত -কেউ কি তা' ভাববার অবকাশ পাবেনা ? কেউ কি ভাববে না যে আবার ভাঙ্গা মন্দিরের টুক্‌রো নিয়ে নূতন কলাকৃতি রচনা কর্ত্তে হবে—রক্তের গলিত চূর্ণ নিয়ে আর একটি অজানা অজাতাকে নিদ্রিত সুন্দরীকে জাগাতে হবে ? ধূলি-লুণ্ঠিত ও চুম্বিত চিত্ত—তাজমহল হ'তে আবার নূতন আর্টের অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে ললিততর তাহাকে সৃষ্টি কর্ত্তে হবে ? আমাদের সবই কি অতীতে—পেছনে ? সাম্‌নে কি কিছুই নেই ? নূতন সৃষ্টি চাই-ই-চাই—তা'তে এ জাতির সমস্ত বর্ব্বরতার, দীনতা ও জর্জ্জরিত ব্যাকুলতার ছায়া সংস্কার থাকবে অথচ নূতন বিচারের, নূতন ব্যাপ্তির ও নূতন বিকাশের আলোকে তা সবাই হয়ে উঠ্‌বে। আর্টের বিচিত্র পথে যেতে যেতে বার বার এসব কথা মনে হয় আপনার মত প্রতিভাসম্পন্ন ভাব—ব্যক্তির সাম্‌নে এজন্য এসব কথা বল্‌তে আনন্দ পাচ্ছি -কথার কথা হিসেবে নয় অন্তরতম সত্য হিসাবে। সব দেশেই এরকম একটা সময় এসেছে -পুরাতন ভেঙেছে কিন্তু নূতন আপনা আপনি গড়ে' ওঠেনি। ভাবুকের মননে তা' শরীরী হয়ে উঠেছে আর্টের ভিতর দিয়ে। রাষ্ট্রধর্ম্ম ও সমাগত সমস্ত বিপ্লব বা সৃষ্টির backword হত হচ্ছে আর্ট। অথচ এরকমের সংহত ও অনন্ত ভাবনা কৈ ?

আপনাকে একথা বল্‌তে আমার বিশেষ উৎসাহ হচ্ছে যে আর্ট জিনিসটা দু' একখানি ছবি, দু'চারটি গান বা কয়েকটা Curios সংগ্রহের ব্যাপার নয়—ওটা একটা whole—এখন হ'ল Symptoms ; এই whole টাকে মনন করা চাই—তবেই তা নানা দিকে বর্ণে-গন্ধে, ছন্দে, ও মর্ম্মরে অশোক-শাসনের মত ছড়িয়ে পড়্‌বে। যে যুগ আস্‌ছে সে যুগ—এখনও দেশের চোখের সাম্‌নে ফোটেনি সে যুগের মূল কথা আমাদের দেশে রূপ পায়নি—ধ্যান পায়নি -ফল পায়নি—কেউ জানে না কি যে চাওয়া হচ্ছে এ অজানার একটা বহুমুখী রূপ দিতে পার্‌লেই 'পুরুন' ভাগ্য লাভ করবে—না হলে সব ধোঁয়া,—সকলের পায়ের নীচে আমাদের থাকতে হবে।

Logic বা গণিত শাস্ত্র এ রূপকে যমিয়ে তুল্‌তে পারবে না। আপনি ভাবের alcheuist, তাই এসব কথা আপনা আপনি এসে পড়্‌ল, বাজে কথা কল্পনা করবেন। যাতে দুইখানি বইর কথা লিখেছেন তা আমার' আছে yolstoy র বইর কোন মূল্য নেই—তা একেবারে গোঁড়ামি বিশেষতঃ ও yolstoy কালে আধুনিক আর্ট জন্মেনি, এ দিগর আর্টও 'ভাল করে' কেউ বোঝেনি এজন্য সে আলোচনার কোন মূল্যই নেই। Pearweldetr বইর গন্ডী অতি যৎ-সামান্য কিন্তু তাতে অনেক Uretevic truths আছে। য়ুরোপীয় Phelosdply যেমন তেমনি আর্ট ও ইদাণীর একেবারে ওলট পালট হয়ে গেছে সে-সব আপনাকে আমি যথা সময়ে বল্‌ব ও দেখাব।

আমার দ্বারাবাহিক বড় তার সেদিন "Phelordply and Art" বিষয়ে একটা বক্তৃতা পাঠ কর্‌লুম। হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ পাঠান্তে মন্তব্য কর্‌লেন। এত রকমের বক্তৃতা তিনি দেশে কখনও শোনেননি, এবার এবিষয়ে [illegible] যে

কেউ এতটাভাবে বক্তৃতা দিতে পারে তা মনে করেন না। তাঁর মন্তব্য শুনে ভগবানের নিকট নতশীর্ষ হয়ে প্রার্থনা করলেন যেন এ দেশের সামান্য কাজ করার অধিকারও তিনি আমাকে দিয়ে একথা প্রমাণ করতে আমাকে অবকাশ দিন যে, যে মানুষ সৌন্দর্য্য সদনের তীরে একটি পলকের জন্যও আসতে পেরেছে সে নিজেকে কত নত, কত ভঙ্গুর, ও কত সামান্য মনে করে অসীমের বিরাট ও বিশ্বরূপের সামনে। অলঙ্কার আশা করি ভাল থাকে ভবদীয়।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

নবীন দুনিয়ার সূত্রপাত।

( )

পশ্চিমা সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে পূরবী সমাজ ও সভ্যতার তুলনা সাধন করা দেশী-বিদেশী সকল চিন্তাশীল লোকেরই দর্শন আলোচনার অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু তুলনায় সমালোচনা চালাইতে হইলে যে মাপকাঠি দরকার হয় সেই মাপকাঠি লইয়া প্রায় সকল লেখক এবং বক্তাই গোলে পড়িয়া থাকেন।

পশ্চিমের ডাক মহলে একটা রব উঠিয়াছে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা পঞ্চত্ব পাইতে বসিয়াছে। এই রব শুনা যায় প্রধানতঃ সোশ্যালিষ্ট বা কমুনিষ্ট কিম্বা এই সকল শ্রেণীর ঘেঁষা সমাজ সংস্কারকের মহলে মহলে। রুশ পণ্ডিত ক্রোপট্‌কিন এবং ফরাসী সাহিত্যবীর রমাঁ রলাঁ ইত্যাদির নাম ভারতে সুপরিচিত।

আমাদের দেশেও পশ্চিমা ভাবুকদের এই মতটা বেশ চলিতেছে। বিগত মহা লড়াইয়ের সময় বোধ হয় ভারতের লেখক এবং বক্তার এই সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই রাখেন নাই। আমাদের সাহিত্য সেবী সাংবাদিক, দর্শনাধ্যাপক, রাষ্ট্রীক, সমাজ সমালোচক, ধর্ম্মপ্রচারক, সকল আসরেই পশ্চিমের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি এক প্রকার প্রথম স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে "পশ্চিমের আদর্শকে" এবং ইয়োরামেরিকার সমাজকে কেওড়াতলায় পাঠাইয়াই ভারতীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নিজ নিজ আলোচনা খতম করেন না। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার বাজারে বাজারে প্রাচ্যকে, পূরবী "আদর্শ"কে, এশিয়ার সভ্যতাকে একছত্র রাজত্ব ভোগের দলিল দেওয়া আমাদের অনুসন্ধান গবেষণার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। এশিয়া দুনিয়াকে চালাইবে,—আর এশিয়ার ব্রাহ্মণ যে ভারতসন্তান সেই ভারতসন্তানই বিশ্ববাসীকে

মানুষ করিয়া তুলিবার ভার পাইতেছে, এইরূপ চিন্তাপ্রণালী ভারতীয় নরনারীর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যারপর নাই প্রবল আকারে দেখা যায়।

কিন্তু কি পশ্চিমার সভ্যতা-সংস্কারকের কর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শবাদ ও ভাবুকতা, কি ভারতীয় সভ্যতার দাবী প্রচারকের আকাশ কুসুম-কল্পনা,—উভয়েরই পশ্চাতে একটা বিপুল গোঁজামিল ও ঘবরল বিরাজ করিতেছে। এই গোঁজামিল ও ঘবরল দরুন পশ্চিমা আদর্শবাদীদের বেশী কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কেননা,—সংস্কারকের চাবুক খাইয়া খাইয়া ইয়োরামেরিকার নর-নারীরা সর্ব্বদা সজাগভাবে নিজ নিজ সমাজরাষ্ট্র, আর্থিক ব্যবস্থা ও ধর্ম্মকর্ম্ম শুধরাইয়া লইতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু ভারতে আমরা পশ্চিমের নিন্দা, দুর্গতি এবং কথাকথিত সর্ব্বনাশের সংবাদ প্রচার করিয়া অতি মাত্রায় আলস্য এবং নিশ্চেষ্টতার প্রশ্রয় দিতেছি মাত্র। "ছোট মুখে বড় কথা" যে বস্তু আজকালকার ভারতসন্তানের পক্ষে বিশ্ববাসীর উপর গুরুগিরি চালাইবার কথা আলোচনা করা তাহার চেয়েও খারাপ কিছু। যুবকভারতের চিন্তা ও কর্ম্ম যে একদম জাহান্নামে পাঠাইতে যাঁহারা চান একমাত্র তাঁহাদের পক্ষেই পশ্চিমা সভ্যতা ও আদর্শের গঙ্গাযাত্রা প্রচার করা শোভা পায়।

কোনো কোনো পশ্চিমা আদর্শবাদী পশ্চিমের নিন্দা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের কথাগুলা পূরবী আমরা বিনা বিচারে বেদবাক্যের মতন গিলিয়া ফেলিব কেন? সভ্যতার প্রত্যেক স্তরেই সু-কু দুইই থাকে। কাজেই প্রত্যেক অবস্থারই সমাজ সংস্কারকেরা কু'র অখ্যাতি রটাইতে বাধ্য এবং তাহার ঠাঁইয়ে নতুন কিছু কায়েম করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। পশ্চিমের পরিবার পশ্চিমের সামাজিক লেন-দেন, পশ্চিমের দেশ-শাসন, পশ্চিমের মজুর কিষাণ আজ যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেই অবস্থায় সেখানকার ঘরে বাইরে নানা অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে এবং আছেও নিশ্চয়। পশ্চিমের স্বদেশ সেবকেরা নিজ নিজ দেশোন্নতির জন্য চৌপর দিনরাত নয়া নয়া মোসাবিদা করিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে?

কিন্তু পশ্চিমে আজ ১৯২৫ সালে যে যে গলদ দেখা দিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের নালিশগুলা স্বাভাবিক বলিয়া কি প্রাচ্যের নরনারীও আহাম্মকের মতন বুঝিয়া না বুঝিয়া পশ্চিমের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের বর্ত্তমান "কাঠ" হইতে এই সকল তিরস্কার বেমালুম চালাইতে অধিকারী? যদি কোনো পশ্চিমা দার্শনিক কোনো পূরবীকে পশ্চিমের উপর গালিগালাজ করিবার এইরূপ অধিকার দিয়া বসেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দার্শনিক মহাশয় তুলনা মূলক সমালোচনার মাপকাঠি সম্বন্ধে আনাড়ি। পশ্চিমের সভ্যতা জীবনযাত্রা প্রণালী এবং আধ্যাত্মিক ধরণ ধারণ, আজকালকার প্রাচ্য সমাজ, আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার অনেক ধাপ উপরে অবস্থিত,—এই কথাটা তাঁহার অজানা, অথবা জানা থাকিলেও তাঁহার জ্ঞান এই সম্বন্ধে নেহাৎ অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। কাজেই তাঁহার চিন্তাপ্রণালীতে গণ্ডগোল অথবা হেঁয়ালি-ময় ভাবুকতাপূর্ণ বস্তুনিষ্ঠাহীন মিথ্যারাশি প্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিমা মিথ্যার উপরওয়ার

করিয়া ভারতীরেরা যে জাতিকে ভয় অবজ্ঞা কৃপা ইত্যাদি করিয়া আসিতেছেন। মোটের উপর, দুনিয়ার চিন্তাস্রোতে একটা গোলক ধাঁধার চক্রান্ত চলিতেছে।

ধরা যাউক, আমি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া দু-দুগুণে চার, চার দুগুণে আট ইত্যাদি মুখস্থ করিতে করিতে হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। তাহার পর আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কিন্তু ঐটুকু দখল করিতে করিতেই "ইচড়ে পাকা হইয়া বসিলাম। আর আমার মুখে "বাণী" বাহির হইল,—"আঃ দুনিয়া কি অনন্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞান অসীম। জগতের কিনারা পাওয়া কি মুখের কথা?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই অসীম তত্ত্ব প্রচার করিয়া আমি হয়ত একটা প্রকাণ্ড সভ্যতা প্রচার করিলাম সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে হয়ত খানিকটা নিজের নম্রতা এবং "কাণে মৌনং"ই বা জাহির করা হইল। কিন্তু নিউটন যখন নিজকে জ্ঞান সমুদ্রের কিনারায় মাত্র অবস্থিত দেখে সেই বিনয় আর অসীমের ইঙ্গি কি আমার দু'চক' মুখে কথার উপর অনন্তের দুনিয়ার অসীমতা প্রচারের সমান? অথবা আইনষ্টাইন অঙ্ক গণিত আর পদার্থ বিজ্ঞানের যে কোঠায় দাঁড়াইয়া বলিতেছেন যে, "দুনিয়ার সীমানা এখনো চোখে ঠেকিতেছে না, চিন্তায় ও কল্পনা করিতে পারিতেছি না" সেই কোঠার অসীম তত্ত্ব আর নিউটনের অসীম তত্ত্ব কি একই বস্তু? না আমার দু—দু গুণে চার, চার দুগুণে আট ইত্যাদির দৌড় আর আইনষ্টাইনের আঁক কষা একই আখড়ার মাল? নিউটনের অসম্পূর্ণতা দেখাইতেছেন কোনো কোনো পশ্চিমা সুধী। আবার কেহ কেহ বা আইনষ্টাইনেরও গলদ বাহির করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া নিউটন আইনষ্টাইনের গলদ দেখাইয়া ইয়োরামেরিকার দোষ, দুর্গতি ও সর্ব্বনাশ দেখাইতে বসা আর্য্যভট ভাস্করাচার্য্যের মুখে সাজে কি? কিন্তু অথচ আজকালকার দেশী বিদেশী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঠিক এই অশোভন কাজই করিতেছেন।

সভ্যতা জরীপ করিবার মাপকাঠিটা লইয়াই যত আপদ। পণ্ডিত মহলে সাধারণতঃ এই সম্বন্ধে কোনো বাস্তব যন্ত্র চোখের সম্মুখে রাখা হয় না। প্রায় সর্ব্বত্রই কতকগুলা বিশেষণ ও বিশেষণ অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া যেখানে সেখানে আওড়াইয়া যাওয়া দেশী বিদেশী উভয় জাতীয় সমালোচকেরই দস্তুর। তাহার জোরে পাশ্চাত্য সমাজকে যেন তেন প্রকারেণ সয়তানের নরককুণ্ড সপ্রমাণ করিতে পারিলেই ভারতীয় স্বদেশ সেবকেরা খুসী হন। পশ্চিমা সভ্যতার ভিতর নিখুঁট মাল কিছুই নাই অথবা থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। কাজেই ইয়োরামেরিকার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে অথবা এমন কি উহার ইতিমধ্যেই সভ্যতা লীলা সংবরণ করিয়াছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া আমাদের দর্শনাভিমানী বক্তা, কবি, রাষ্ট্রবীর, সমাজ সংস্কারক ইত্যাদি শ্রেণীর অনেকেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া গোপে চাড়া মারিতে অভ্যস্ত।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মরিয়াছে বা মরিতেছে কি? অতি শীঘ্রই বা এই সভ্যতার মরিবার সম্ভাবনা আছে কি? সভ্যতার চিকিৎসকদের পক্ষে এই বিষয়ে জবাব দেওয়া যেহাৎ কঠিন

নয়। জীবনবস্তা মাপিয়া জুকিয়া আলোচনা করা সম্ভব। তাহার জন্য বাস্তব ঘর কায়েম করাও সম্ভব। যখন তখন যেখানে সেখানে যুক্তকি-বা হেঁয়ালিপূর্ণ তথ্যহীন শব্দের আড়ম্বর চালাইবার দরকার নাই। ইয়োরামেরিকা এশিয়ার গুরু, কি এশিয়া ইয়োরামেরিকার গুরু, এই প্রশ্ন করাটা অতি সহজেই সোজা চোখে, রক্তমাংসের হাতপার প্রমাণের সাহায্যে বুঝিয়া উঠিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইবে না।

১৯১৪-১৮ সালের লড়াইয়ের আগুতায় ভাবুকেরা ভাবিতেছিলেন, "বার বার এইবার। ইয়োরামেরিকার সভ্যতাকে বাঁচাইবার আর কোনো উপায় নাই। পাশ্চাত্য নরনারী এ যাত্রায় মরিবেই মরিবে।" কিন্তু ১৯১৮-১৯ সালের পুনর্গঠনে ইয়োরামেরিকার অবস্থা কিরূপ দেখিতেছি? পাশ্চাত্য সভ্যতা এক অপূর্ব্ব নবযৌবনের পরশে চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে যে নবীন জীবন-যাত্রার সূত্রপাত হইতেছে তাহাকে এক বিরাট যুগ'স্তরের প্রাথমিক ভিত্তি মাত্র বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। তাহার তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সবই ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছু নয়। ইয়োরামেরিকার মনের বিংশশতাব্দীর বিশ্ববাসীকে এক অভিনব দুনিয়া উপহার দিবার ক্ষমতা দেখাইতেছে। তাহাদের জ্যান্ত হাত-পার জোরে এই যে নবীন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার আধ্যাত্মিকতা বুঝিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা আজকালকার এশিয়াবাসীর আছে কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমানে ভারতীয় মগজের পক্ষে ১৯১৮ সালের ইয়োরামেরিকান জীবনবস্তা সমঝিয়া উঠা বড় সহজ কথা নয়।

( )

দফায় দফায় খুঁটিয়া খুঁটিয়া এই আধ্যাত্মিকতার, এই নবীন জীবনবস্তার কয়েকটা বাস্তব লক্ষণ দেখাইতেছি। মামুলি চোখ কানের সাহায্যেই মালুম হইবে যে সত্যসত্যই ইয়োরামেরিকা মরে নাই। বরং ইয়োরামেরিকাই গোটা দুনিয়াকে বাঁচাইয়া রাখিয়া জগদ্‌বাসীর জীবন স্পন্দন বাড়াইয়া তুলিবার নানা কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। আর এই সকল আবিষ্কার এশিয়ার নরনারী স্বাধীনভাবে হিস্যা লইবার অধিকারী হইতে পারিলেই তাহারাই "বাপের বেটা" বলিয়া পরিচিত হইবার দাবী চালাইতে সমর্থ হইবে।

১৮৭০ সালের সমসময়কালে ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্র এবং জাপানেও সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হয়। সেই আইন ভারতে আজ ১৯২৫ সালেও ষোলকলায় কায়েম হয় নাই। মাত্র কোনো কোনো নগরের কোনো কোনো মহাল্লায় নির্দ্ধনদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারিবে এইরূপ আইন জারি হইয়াছে। কিন্তু এই আইন মাফিক কাজ এখনো বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

১৯১৮ সালের ইয়োরামেরিকা এই কর্ম্মক্ষেত্রে কতদূর উঠিয়াছে? পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০।৫০ বৎসর ধরিয়া আইনটা খাটিত-মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সের বালক বালিকাদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে

কিন্তু বিশেষ সাত বৎসর ধরিয়া আঠার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের প্রত্যেক তরুণ তরুণী এই ধারাতা [মূলক অবৈতনিক শিক্ষা-পদ্ধতির অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

আঠার বৎসর বয়স,—এই বস্তুর অর্থ কি? সেকালে আমরা এই বয়সে কলিকা ৎা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পাশ করিতে পারিতাম। আজকালকার নিয়মে অন্ততঃ পক্ষে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করা দস্তুর। বুঝিতে হইবে যে,—১৯১৮ সালের আইন অনুসারে জার্ম্মাণিতে, ফ্রান্সে [ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকার এবং অন্যান্য অগ্রগামী দেশে আঠার বৎসর প্রত্যেক লোকই ভারতীয় মাপের ইণ্টারমিডিয়েট পাশ-করা নরনারী। ঝাড়ুদার, ভিস্তী, মুটে, কেহই আর ঐ সকল সমাজে ইণ্টারমিডিয়েটের কম বিদ্যা-ওয়ালা লোক থাকিতে পারিবে না। গবর্মেণ্ট, নগর-প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ফ্যাক্টরি ইত্যাদি সকল কর্ম্মকেন্দ্রই আঠার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের প্রত্যেক কর্ম্মচারীও মজুরকে বিনা পয়সায় শিক্ষা প্রদান করিতে বাধ্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মরিতে বসিয়াছে কি? এই সভ্যতার আবহাওয়ায় যে সকল নরনারী চলা ফেরা করিতেছে তাহাদের সঙ্গে ভারতীয় নরনারী টক্কর দিতে পারিবে কি? আর ইহাদের শিক্ষা-পালীতে দুইবার দশটা দোষ যদি থাকেই তাহা হইলে সে সব লইয়া আমরা ভারতে ইয়োরামেরিকার কুৎসা রটাইতে ঝুঁকিয়াছি কিসের জোরে? "সংপাপিষ্ঠ স্ততোঽধিকর" সেই লোকালয় কি যাঁহারা রাস্তায় রাস্তায় বলিয়া বেড়াইতেছেন:—"ইয়োরামেরিকা মরিয়াছে। এইবার দুনিয়ায় গুরুগিরি করিতে ভারতের নরনারী?" যে জাতের অভিজ্ঞতায় এবং জীবন যাত্রায় ১৮৭০ সালই এখনো আসে নাই সে-জাত ১৯২৫ সালের দুনিয়ার উপর ওস্তাদি চালে সমালোচনা সাজিতে অগ্রসর হয় কোন্ সাহসে?

জীবনযাত্রার জরীপ করা যাউক আর এক দিক হইতে। ইয়োরামেরিকার ইস্কুল কলেজের অধ্যাপকেরা নিজ নিজ বিদ্যার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান-গবেষণা ইত্যাদি চালাইয়া থাকেন। একথা আমাদের অজানা নাই। বিদ্যার সীমানা বাড়াইবার আয়োজন ঐ সকল দেশে দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার প্রভাবে একমাত্র পাশ্চাত্য নরনারীর জীবনই বদলাইয়া যাইতেছে এমন নয়। এশিয়ায় আমরাও পশ্চিমা আবিষ্কারের আওতায় পড়িয়া নানা উপায়ে জীবনীশক্তি বাড়াইয়া তুলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।

১৯১৮ সালের যুগে পশ্চিমা লোকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চৌহদ্দি বাড়াইয়া দিবার জন্য তুমুল আন্দোলন সুরু করিয়াছে। দুজন চারজন বা দশবিশজন নামজাদা কৃতিৎকর্ম্মা বিজ্ঞান বীরের স্বাধীন খেয়ালের উপর ইয়োরামেরিকার আবিষ্কার শক্তি আর নির্ভর করিতেছে না। ইস্কুল কলেজে এই সকল অনুসন্ধান কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে বহুবিধ সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছেই আসল কথা এই যে, জার্ম্মাণি ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি মুলুকে গবেষণা ভবন, অনুসন্ধানালয়, পরীক্ষা গৃহ, রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট ইত্যাদি নামের জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্র বিপুল আকারে মাথা তুলিতেছে। এইগুলির কোনো কোনোটা ঠিক যেন এক একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে। কয়লা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, চামড়া,

চিনি, কাচ, দুধ, তুলা, রেশম ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তু লইয়াই অতি উচ্চ দরের ল্যাবরেটরি, কর্ম্মশালা বা পরীক্ষা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই সমুদয়ের তদারক করিবার জন্য ডজন ডজন পাকা মাথা চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েম আছে।

এ সব পয়সার খেলা সন্দেহ নাই। ক্রোর ক্রোর টাকা পশ্চিমা মনোরা এই সকল রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে ঢালিতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি এই সমুদয়ের সাহায্যে দুনিয়ায় দেখা যাইতেছে যে দেশে দেশে আর্থিক উন্নতিও ঘটিতেছে। লোকেরা চোখ কান খুলিয়া হাতেকলমে সজাগ ভাবে চলা ফেরা করিতেছে। গৎখানাকে লইয়া ভাঙা-গড়ার আনন্দ উপভোগ করা পশ্চিমা সমাজের অলিতে গলিতে দেখিতে পাইতেছি। বিদ্যার জোরে "অমৃত" চাখা যদি কবি-কল্পনা মাত্র না হয় তাহা হইলে ১৯১৮ সালের পুনর্গঠিত ইয়োরামেরিকা যে নবীন অমৃতের সন্ধানে রণ-যাত্রা করিয়াছে সেই অমৃতের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী শত বৎসরের অমৃত নেহাৎ "পান্সা" বা "ফিকে" কিম্বা "গুধের বদলে ঘোল" মাত্র বিবেচিত হইবে। সেই নয়া অমৃতের আর আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তির আন্দাজ পর্য্যন্ত করা আজকালকার যুবকভারতের পক্ষে অতিমাত্রায় কঠিন বলিলেও কিছু নরম করিয়া বলা হইবে! যুবকভারতও জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমানা বাড়াইবার আন্দোলনে কিছু কিছু হিস্যা লইতে সুরু করিয়াছে। একথা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই হিসাবে ১৯২৫ সালের দুনিয়ায় আমরা মোটের উপর ১৮৫০ সালের অবস্থায় আছি কি? ১৮৭০-৮৫সালের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগে রহিয়াছি তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়।

ইয়োরামেরিকার মরিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। আবার আর এক দফায় জীবনবত্তা জরীপ করিবার জন্য বাস্তব যন্ত্র ব্যবহার করিতেছি। শিল্প কারখানার পরিচালনা সম্বন্ধে ১৯১৮ সালের পশ্চিম এক জবর আইন কায়েম করিয়াছে। আইনটা সুরু হয় অষ্ট্রীয়ায়, ক্রমশঃ ইহার ধারাগুলা চেকোস্লোভাকিয়া হইতে আটলান্টিকের অপর পার পর্য্যন্ত নানা দেশে অল্পবিস্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আইনটা এই। যে-যে ফ্যাক্টরিতে অন্ততঃ বিশজন মজুর কেরাণী ও কুলী কাজ করে সেই সকল ফ্যাক্টরীতে এই সকল মজুর কেরাণী-কুলীর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি ফ্যাক্টরির প্রত্যেক কাজকর্ম্মে মালিক এবং কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে এক আসনে বসিয়া বাদানুবাদ, তর্কপ্রশ্ন এবং মোসাবিদা চালাইতে অধিকারী। অর্থাৎ একমাত্র ধনজীবী শিল্প-পতি অথবা মস্তিষ্কজীবী এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক এবং ব্যাঙ্কার মহাশয়েরাই ১৯১৮ সালের পুনর্গঠিত ইয়োরোমেরিকায় সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা নয়। শ্রমজীবী এবং মসীজীবীরাও নিজ নিজ চৌহদ্দিতে দেশের আর্থিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার এক্তিয়ার পাইয়াছে।

এই তথ্যটা যুবকভারত বুঝিতে পারিবে কি? সহজে নয়। কেননা, মাত্র এই বৎসরের প্রথম দিকে ভারতে "ট্রেড্ ইউনিয়ম্ অ্যাক্ট" জারি হইয়াছে। এই আইন বিলাতে আজ প্রায় নব্বই একশ বৎসরের পুরোণো চিজ্। আর ভারতীয় ট্রেড্-ইউনিয়ম্ অ্যাক্ট্ ১৯২৫ সালের এমন কিছু হাতী-ঘোড়াও নয়। মজুরেরা নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে

পারিবে, আর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক ও আর্থিক স্বার্থ পুষ্ট করিতে সমর্থ হইবে। এই সকল অ, আ, ক, খ ছাড়া আর বেশী কিছু এই অধীনেহ বিধানে নাই। পাশ্চাত্য নরনারী আজ যে ধরণের গভীর ও সুবিস্তৃত "আর্থিক স্বরাজ" ভোগ করিতে চলিল তাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বপ্নেরও অতীত।

এই "আর্থিক স্বরাজ"টাকে এখনো খাঁটি বোলশেভিক স্বরাজ বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মামুলি সোশ্যালিজম্‌ই একশ বৎসর টোল্‌ খাইতে খাইতে টোল্‌ খাইতে খাইতে এই অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাহা ছাড়া খাঁটি "রাষ্ট্রীয় স্বরাজের" রঙ ও সোশ্যালিষ্টদের প্রভাবে ইয়োরিমেরিকার সর্ব্বএই বদলাইয়া গিয়াছে। "মজুর রাজ" অথবা মজুর ঘেঁষা রাষ্ট্রীয় দলের কর্ত্তৃত্ব পশ্চিমা মুলুকের সর্ব্বত্রই আজকাল এক প্রকার প্রথম স্বতঃসিদ্ধে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। ভারতে এখনো খাঁটি মজুর-সমাজ সংখ্যাই বিশেষ পুরুষ নয় আর প্রভাবেও কিছু প্রবল নয়। অধিকন্তু মজুরের রাষ্ট্রীয় দল অথবা মজুর পক্ষীয় মন্ত্রিকর্ত্তাদের দল এখনো পরিষ্কাররূপে দানা বাঁধে নাই। কাজেই সোশ্যালিজমের দিগ্‌বিজয়ের যুগে যুবকভারতের দৌড় কতটুকু তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বরাজ কোথায় গিয়া ঠেকিতেছে তাহা কোনো পুরাতনপন্থী নরনারীর পক্ষে কল্পনা করা এক প্রকার অসম্ভব। উদীয়মান নব্য স্বরাজের তুলনায় আজকাল দুনিয়ায় যে স্বরাজ চলিতেছে তাহাকে স্বরাজ বলাই চলিবে না। ১৯১৮—১৯ সালের পাশ্চাত্য নরনারী সত্য সত্যই এক বিশাল নবজীবনের সূত্রপাত করিয়া বসে নাই কি?

এখন জমি জমার কথা কিছু বলিব। ভারতে আজও জমিদারী প্রথার জয় জয়কার চলিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে "রাইয়ত"—"বাবু"র সম্বন্ধ। জার্ম্মাণিতে এই ধরণের ব্যবস্থা চলিয়াছিল ১৮৪৮ পর্য্যন্ত। ফ্রান্সে এই প্রথা পক্ষত্ব প্রাপ্ত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ শেষি। কাজেই রাইয়ত প্রধান ভারত সন্তানের পক্ষে পাশ্চাত্য জীবনের আধ্যাত্মিকতা সহজে হজম করা সম্ভব নয়।

তাহার উপর ১৮৯৫ সালের পর হইতে জার্ম্মাণিতে এবং জার্ম্মাণির দেখাদেখি ডেনমার্কে, ইংলাণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে জমিহীন মজুরকে ছোট ছোট জমির মালিকে পরিণত করা হইতেছে। আর ছোট ছোট মালিককে কথঞ্চিৎ বড় মালিক দাঁড়াইয়া যাইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু এই সকল জমি জুটিতেছে কোথা হইতে? বড় বড় জমির মালিককে নিজ নিজ সরকারের নিকট বিক্রী করিতে বাধ্য করা হইতেছে। কোনো জমিদার এক্ষণে ৮০০।৯০০ বিঘার বেশী জমি নিজ দখলে রাখিতে অধিকারী নয়। বড় বড় জমিদারদের জমি কিনিয়া গবর্মেণ্ট মজুরদের নিকট অথবা ছোট ছোট জমির মালিকদের নিকট সহজ শর্ত্তে বিক্রী করিবার ভার লইতেছে। এই গেল পুনর্গঠিত জার্ম্মাণির ১৯১৯ সাল। যে বৎসর দুনিয়ার হেঁয়ালি প্রচারক, ভাবপন্থীর ভাবিতেছিলেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা খাটে উঠ' উঠ' সেই বৎসরই নতুন জীবন যৌবনের ডিক্রী হাতে করিয়া পশ্চিমের নরনারী জমি জমা সম্বন্ধে একটা আধ্যাত্মিক বিপ্লব খাড়া করিয়াছে।

এশিয়ার বোধ হয় এই বিপ্লবের কাহিনী এখনো পৌঁছেই নাই। পৌঁছিলেই এশিয়ান নর-নারী আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিতে থাকিবে,—"তাইত! এ যে বোলশেভিকীর লঙ্কাকাণ্ড?" ভিতরকার কথা, এসব আইন বোলশেভিক পথের লাগাও কোনো কোনো পথে চলিতেছে বটে। কিন্তু খাঁটি বোলশেভিজ্‌ম আরও অনেক দূরে। কেননা রুশিয়ার সমাজ সংস্কারকেরা জমিজমা কাড়িয়া লয়,—তাহার জন্য মালিককে ক্ষতি পূরাণের টাকা দিতে মাথা খামায় না। জার্মাণ আর ইংরেজ গবর্মেণ্ট জমিদারদিগকে জমি জমা বেচিতে বাধ্য করে বটে, কিন্তু "কথঞ্চিৎ" উচিত মূল্যে এই সকল জমির দাম দিতে গররাজি নয়! যুবক ভারত এই জার্মাণ-ডেন-বিলাতী আইনগুলা ঘাঁটিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইবে কি? এই সব ব্যবস্থা আমাদের দেশে কায়েম হইতে এখনো অনেক দেরি। তবে "কত ধানে কত চাল" বুঝিয়া রাখাটা মন্দ নয়।

নারী-সমস্যার একটা খুঁটা তুলিয়া বর্ত্তমান আলোচনা শেষ করিব। পাশ্চাত্য সভ্যতার সজীবতা হাতে হাতে ধরা পড়িবে। ভারতে আমরা আজও বিধবার অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে বসিবামাত্রই "ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ" ইত্যাদি জন্মজন্মান্তরের স্বামী-স্ত্রীর অনন্ত সম্বন্ধটা কল্পনার চোখে দেখিয়া ফেলি। আপত্তি নাই। ইয়োরামেরিকার রোমণ ক্যাথলিক পন্থা বিধবারাও লাখে লাখে এতদূর চরম মাত্রায় না হউক অনেকটা এই "আদর্শেই" জীবন গড়িয়া চলিতে অভ্যস্ত। অবশ্য বিধবার বিবাহ সকল সমাজে নিন্দনীয় হয় অনেক বিধবাই সুযোগ সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করে না।

কিন্তু একমাত্র এই "আদর্শই" বিধবা জীবনের সর্ব্বস্ব নয়! বাস্তব জীবনের তরফ হইতে বিধবা সমস্যার মীমাংসা অনেক খানি সাধিত হইতে পারে! পশ্চিমারা তাহা করিয়াছেও। এই মীমাংসাটা বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত সন্তানের মাথায় প্রবেশ করা কঠিন। তবে প্রণালীটা যে অতি সহজ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে যে সকল লোক গবর্মেণ্টের চাকুরী করে একমাত্র তাহারাই বুড়া হইবার পর মৃত্যু পর্য্যন্ত বিনা কাজেই "পেন্‌শন" পায়। অন্যান্য কর্ম্মকেন্দ্রে যে সকল লোক কেরাণী বা কর্ম্মকর্ত্তা তাহাদিগকে পেন্‌শান দিবার কোনো ব্যবস্থা নাই। এইজন্য গবর্মেণ্ট কোনো প্রকার জীবন বীমার আইনজারি করিয়া কর্ম্মকেন্দ্রের মালিকদিগকে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করে নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের কোনো কোনো ও বাধ্যতামূলক নরনারী বীমা প্রথা আজ পঁচিশ ত্রিশবৎসর ধরিয়া জারি আছে। জার্মাণ রাষ্ট্রবীর বিস্‌মার্ককে দুনিয়ায় এই নিয়মের জন্মদাতা রূপে বিবৃত করা যাইতে পারে।

এই গেল পেনশুনের এক দিক। অপর দিক আরও বিচিত্র। ভারতে যে সকল লোক পেন্‌শন পায় তাহাদের আয়ু ফুরাইবা মাত্র সরকারী দায়িত্ব ও ফুরাইয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য মুল্লুকে বিধবা (এবং বিধবার স্ত্রীপুত্রেরা ও) বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একটা নির্দ্দিষ্ট হারে মৃত স্বামীর পেন্‌শন ভোগ করিতে অধিকার। পদ হিসাবে পেন্‌শনের হার বাঁধা আছে। কাজেই ভারতীয় বিধবার হাহুতাশ আজকালকার খ্রীষ্টিয়ান সমাজে দেখা যায় না।

আমাদের বিধবারা যখন কাঁদে তখন তাহারা মৃতস্বামীর প্রতি সতীত্ব দেখাইবার জন্য কাঁদে? না অন্নচিন্তা চমৎকারা বলিয়া বলিয়া কাঁদে? এই প্রশ্নটা বাস্তব যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে যুবকভারত অগ্রসর হউক। বিধবা-সমস্যার ভিতর যেসব আজগুবি হেঁয়ালি প্রবেশ করানো হইয়া থাকে,—কম-সে-কম চিন্তাক্ষেত্র হইতে সেই সব হেঁয়ালি দূরীভূত হইতে পারিবে। আর্থিক তাড়নায় দীর্ঘশ্বাস বিধবার প্রাণ হইতে পেন্‌শন পাইবার পর ভারতীয় নারীত্বের অন্দরে আধ্যাত্মিকতা কতখানি আছে তাহার যাচাই করা সম্ভব হইবে। সেই যাচাইয়ের আখ প্রায় পশ্চিমা নারীরা ধীরে ধীরে আসিয়া পাড়াইতেছে। ভারতীয় নারী আধ্যাত্মিকতার এই নবীন ডাকে সাড়া দিবার পর্য্যন্ত উপযুক্ত কিনা এখনো তাহা অনিশ্চিত।

অসংখ্য খুঁটি নাটিই উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোনোটাই মন-গড়া অলীক বা আড়ম্বর মাত্র নয়। সহজ বুদ্ধির লোক চোখে চাহিয়া কানে শুনিয়া পায়ে হাঁটিয়া হাতে ছুঁইয়া যে সকল তথ্য বুঝিতে পারে সেই সব নিরেট তথ্যের জোরেই দেখিতেছি যে, এশিয়া ইয়োরামেরিকার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম চিরকাল একই পথে চলিয়াছে এবং একই আদর্শের প্রভাবেই জীবন যাত্রা চালাইয়া আসিয়াছে। আজ ও দুনিয়া সর্ব্বত্রই এক পথেই অগ্রসর হইতেছে। আবার কালও,—বহুকাল পর্য্যন্ত—যতদূর দৃষ্টি যায়,—দুনিয়ার গতি থাকিবে একই দিকে। পূর্ব্বে পশ্চিমে কোনো "আদর্শ-গত" প্রভেদ নাই। তবে জীবনবত্তা, আধ্যাত্মিকতা, রক্তের স্রোত, চিন্তাও কর্ম্মরাশির জোয়ার ইত্যাদি যা-কিছু সবই —শতকরা নিরানব্বুই অংশ বর্ত্তমান কালে পশ্চিমাদেরই সমাজে ও সভ্যতায় ছুটিতেছে। ১৯১৮।১৯ সালের পুনর্গঠিত ইয়োরামেরিকা এক অদ্ভুত নবীন দুনিয়ার সূত্রপাত করিয়াছে। বিনা গোঁজামিলে বুজরুকিবিহীনভাবে এই তথ্যটা স্বীকার করিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত যুবকভারতের শক্তিযোগ পদে পদে অনর্থক বাজে কাজে নষ্ট হইতে থাকিবে।

শ্রীবিনয় কুমার সরকার।

জার্ম্মানীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্ম্মান অধ্যাপক ভারতীর জন্য এই প্রবন্ধটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা সাদরে ইহা প্রকাশ করিতেছি। ভারতবর্ষে ইনি প্রোফেসর ড্যাক নামে প্রসিদ্ধ, থিয়োডর লিড্ ইহার জার্ম্মাণ লেখক-নাম।]

জার্ম্মানীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি দানের ব্যবস্থা নাই। সেখানে কেবলমাত্র সরকার পরিচালিত পরীক্ষা আছে। জার্ম্মাণীতে কঠিনতম এবং ছাত্রভীতিকর পরীক্ষা হইতেছে ম্যাট্রিকুলেশন্ বা প্রবেশিকা পরীক্ষা। ১৯, ২০ অথবা কমপক্ষে ১৮ বৎসর বয়সে এই পরীক্ষা দিতে হয়। লিখিত ও মৌখিক—দুই ভাবেই এই পরীক্ষা দিতে হয়; এবং মৌখিক পরীক্ষাই ছাত্রের ভাগ্য নিরূপণ করে, ইহাই কঠিন ও অত্যন্ত ক্লেশকর।

ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা বা পরিণতির পরীক্ষা জার্ম্মান্ gymnasiumএ অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়ে শেষ পরীক্ষা। এখানে পাঠ শেষ করিলে ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার দক্ষতা ও অধিকার লাভ করে। জিমন্যাসিয়ামে বা অপর উচ্চ বিদ্যালয়ে তিন বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ছাত্রদিগকে ৯, সাধারণত দশ বৎসর পড়িতে হয়। জিমন্যাসিয়ামে প্রধান পাঠ্য বিষয়—লাটিন, গ্রীক, ইতিহাস, ফরাসী, জার্ম্মান্ (রচনা. সাহিত্য, দর্শন); আর রিয়াল্‌জিমন্যাসিয়ামে ফরাসী, ইংরেজী, ইতিহাস, অঙ্ক, প্রাকৃতিক ইতিহাস, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জার্ম্মান। এই সব বিষয়ে যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, অন্তত পক্ষে জার্ম্মান, লাটিন, গ্রীক ও ইতিহাসে যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, তাহা পরিমাণে ও উৎকর্ষে ভারতবর্ষের এম্ এ পরীক্ষার সমান। আর অপরাপর বিষয়ে সে পরীক্ষা ভারতের বি-এ বা বি-এস্‌সি পরীক্ষার সমান।

জার্ম্মান উচ্চ বিদ্যালয়কে লোকে নিষ্ঠুরতার প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে, আর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকে মনে করে ছেলেদের মনের উপর একটা অত্যাচার। কারণ, ছেলেদের বিশ্ববিদ্যার সমস্ত বিষয়ই পাঠ করিতে হয়,—বিশ্ববিদ্যালয়ে পরে তাহারা কি পড়িবে অথবা ঐ সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিবার মত তাহাদের মানসিক দক্ষতা বা ঝোঁক আছে কি না সে বিষয়ে দেখা হয় না। জিমন্যাসিয়ামের যে-ছাত্র পরে প্রাচীন শব্দতত্ত্ব পড়িতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সমান মাত্রায় অঙ্ক ও পদার্থ বিজ্ঞান পড়িতেই হইবে। আবার যে ছাত্র পরে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বা ভোজবিদ্যা পড়িবে তাহাকে প্রাচীন শব্দতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের মতন সমান মাত্রায় লাটিন্

গ্রীক ও ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই আমি বলিতেছি কাসেলের জিম্‌ন্যাসিয়ামে ইতিহাস পড়িতে গিয়া আমাদিগকে সৃষ্টির গোড়া হইতে পরীক্ষার দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস পড়িতে হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা বিশ্ব ইতিহাস বিজ্ঞানের ব্যাপক জ্ঞান কল্পনা করা যায় না। মনে রাখিতে হইবে, জার্ম্মাণীতে কলা ও বিজ্ঞানে—আর্ট ও সায়ান্সে কোন প্রভেদ নাই। সবই সেখানে বিজ্ঞান। গ্রীক ভাষায় আমরা 'জলের মত' হোমার পড়ি, আর আমাদিগকে ইতিহাসে শব্দতত্ত্বে বা সাহিত্যিক আলোচনায় লাটিন ভাষায় দীর্ঘ রচনা তৈরী করিতে হইয়াছিল।

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, জিম্‌ন্যাসিয়ামের বা রিয়াল্‌জিমন্যাসিয়ামের দুই তিনটি উচ্চতম শ্রেণী বাস্তবিকই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠশ্রেণী, যদিও এখানকার ছেলেদিগকে ১৯ বা ২০ বৎসর বয়স অবধি পাঠার্থী মাত্র মনে করা হয়, পাঠকৃতী বলিয়া গণ্য করা হয় না। জার্ম্মান ছাত্র যে জ্ঞান লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তাহা প্রভূত ও বিস্ময়কর। বস্তুত তখন সে তিনটি বা তদোধিক বিষয়ে এখানকার এম-এ উপাধি ধারীর সমান হয়।

জিমন্যাসিয়ামের পাঠের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সহজ ও প্রীতিকর। জার্ম্মান ছাত্রের জিমন্যাসিয়ামের পাঠকাঠিন্যের ক্ষতিপূরণ হয় ৩, ৪ বা ৫ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকায়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে তাহার মনোমত বিষয় বা বিষয়গুলি গ্রহণ করে, দাসত্বভোগের পর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বাধীনতা প্রবাদ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেখানকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির ইহাই দ্বিতীয় কারণ। শারীরিক ও নৈতিক ভাবে ছাত্রদের শতকরা ৩ হইতে ৫ জন এই স্বাধীনতায় ধ্বংসলাভ করে, এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অবধি কড়া শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিয়া যে সব ব্যক্তি দেশের অথবা সরকারের কাজে ক্ষতি বা অপবাদ ঘটাইবে, এইরূপে জার্ম্মান জাতি ও রাজসরকার তাহাদিগের হইতে মুক্তিলাভ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা—মৌখিক ও লিখিত—বেশ কড়া কিন্তু সহজ। যে ছাত্র গ্রীক, ফরাসী ও ইতিহাস, অথবা লাটিন, ইংরেজী ফরাসী ও জার্ম্মাণ, অথবা গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান অথবা রসায়ন গ্রহণ করে তাহাকে ঐ ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইলেই সে তাহার নির্দ্ধারিত বিষয়ে জিম্‌ন্যাসিয়ামে, রিয়াল জিমন্যাসিয়ামে বা অপর উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিবার অধিকার লাভ করে। এই পরীক্ষাকে সরকারী পরীক্ষা বলা হয়। ইহাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তি সরকারী কাজ পাইতে পারে। যে Dr. (ডাক্তার) উপাধি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে বা পরে ইচ্ছা করিলে লাভ করা যায় তাহা কেবল যাহারা নিজেদের নামের আগে শোভা স্বরূপ দিতে ইচ্ছা করে তাহাদের জন্যই,—সরকারের কাজে ইহার মূল্য নাই। উক্ত সরকারী পরীক্ষায় পাশ না করিলে কোন পি-এচ-ডি বা এম-ডি-কে সরকারী কাজ দেওয়া হয় না।

জার্ম্মান্ সরকারী পরীক্ষা (দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত পাঠ শেষ

করিবার দুই বৎসর পরে ধর্মতত্ত্ব ও আইনে ডক্টর) হইতেছে জার্ম্মানীতে উচ্চতম পরীক্ষা ; এই উচ্চতম পরীক্ষা ভারতবর্ষে গণ্য হয় না। কিন্তু জার্ম্মাণী ভারতের বি-এ ও বি-এস্‌সিদের গণ্য করে ও তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দেয়। এমন কি আমার অনুরোধে আই-এ ও আই-এস্-সিগণও স্থান পাইয়াছিল।

একজন ভারতীয় ভদ্রলোক জার্ম্মাণীর কৃষি বিদ্যালয়ে কৃষি ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সেখানকার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া এখানে আসিয়া কলিকাতার কোন কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপনার জন্য আবেদন করেন। সে কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার কোন আশা নাই, কেননা তাঁহার কোন উপাধি নাই। এই ভদ্রলোক উপাধিবিহীন বলিয়া নিজের দেশে কাজ পাইলেন না, কিন্তু জার্ম্মাণীর যে-কোন কৃষি বা উচ্চ বিদ্যালয়ে ইনি কাজ পাইতে পারেন। উপাধি মোহ হেতু ভারত-সরকারের এই অন্যায়ের প্রতীকার আবশ্যক।

থিয়োডর লিঙ্ক।

হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা *

টাকশাল হইতে King George এই ছাপমারা মুদ্রার ন্যায় আমাদের ছাত্রগণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একই ডিগ্রির ছাপমারা হইয়া বাহির হইতেছে। তাহাদের সকলের কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতেছে সত্য, কিন্তু যাহাদ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন মানুষ প্রস্তুত হয়, তাহাদের সে প্রকার শিক্ষা হইতেছে কি ?

তাহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখে, সংসারের সকল মানুষই এক প্রকার নহে। তাহাদের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন প্রকৃতি আছে। প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন বিশেষত্ব আছে, যাহা তাহাকে অন্য জাতি হইতে পৃথক্ করে। এই বিশেষত্বের মূলে স্রষ্টার এক হইতে বহু হইয়া সৃষ্টিলীলা প্রকাশের ইচ্ছা। স্রষ্টার সৃষ্টির অর্থ হইতেছে বিচিত্রতা প্রকটন (differentiation) ; এইরূপ জগতের বিচিত্রতাই সৃষ্টির অবস্থা, আর সাম্য হইতেছে প্রলয়ের অবস্থা। যে শিক্ষা দ্বারা সব মানুষ এক ছাঁচে গড়া হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে ; কারণ তাহা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলা প্রকটনের সাহায্য হয় না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু, বিভিন্ন প্রকার মানব প্রকৃতি, বিভিন্ন প্রকার মানুষের আকৃতি, ও বিভিন্ন প্রকার

---

* বারাণসী সারস্বতসম্মিলনী সভায় বার্ষিক উৎসবে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মানুষের ভাষা। যে শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির বিশিষ্টত্ব বিকসিত হয়, তাহাই তাহার প্রকৃত শিক্ষা।

আমাদের ভারতবর্ষের, হিন্দুস্থানের, হিন্দুজাতির বিশেষত্ব কি তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের শাস্ত্রে কর্ম্মভূমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মভূমির অর্থ ধর্ম্মকার্য্য সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যত প্রকার শীতোষ্ণাদির প্রভাব আছে, এক ভারতবর্ষে তাহা সমস্ত আছে। ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বসন্ত এই ছয় ঋতু বর্ত্তমান; পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইহার দুইটি, তিনটি অথবা চারিটির বেশী নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার বৎসরের অধিকাংশ সময়ে প্রবল শীত থাকে, সেই শীতের সঙ্গে আবার বৃষ্টি ও তুষার পাত ক্রমাগত লাগিয়াই আছে। সে সব দেশে হেমন্ত ও বসন্ত নাম মাত্র আছে। ভারতবর্ষে এই ষড় ঋতুর প্রভাবে প্রায় সকল প্রদেশই প্রচুর শস্যশালী ফুলফলে পূর্ণ। ভারতের নির্ম্মল আকাশ যেরূপ শশিসূর্য্যের প্রভায় সৌন্দর্য্যশালী আর কোন দেশই সেরূপ নাই। সুতরাং আমাদের ভারতবর্ষ সৌন্দর্য্য ও শস্যসম্পদে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। এদেশে উদরের অন্ন সংস্থানের জন্য লোককে আগে প্রাণপাত করিতে হইত না, সেজন্য বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশের লোক আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। এই কারণেই ঋষিগণ ভারতকে কর্ম্মভূমি ও যজ্ঞভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি কেবল এই ভারতবর্ষের নানাস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এই বারাণসী ক্ষেত্রে সেইরূপ কতশত যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য এই স্থানে হিন্দুর যজ্ঞে এতদূর পবিত্র। অদ্যাবধি দশাশ্বমেধ ঘাট সেই সকল দেব যজ্ঞের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আবার ভারতবর্ষের প্রদেশ সকল সপ্তসিন্ধু, পঞ্চনদ, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সরযূ ব্রহ্মপুত্র নর্ম্মদা-কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীগণের দ্বারা বিধৌত হইয়াছে। এই সকল নদনদী দেবতাত্মা হিমালয় বিন্ধ্যাচল হইতে পবিত্র মৃত্তিকারাশি বহন করিয়া আসিয়া ভারতের ভূমি গঠন করিয়াছে। সুতরাং ভারতের প্রত্যেক ধূলিকণা পবিত্র। এই কারণে ভগবান্ নারায়ণ পুনঃ পুনঃ ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। এই কারণে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্ন সতীদেহের প্রত্যেক অঙ্গ এই ভারতবর্ষে পতিত হইয়াছিল। সকলেই জানেন সেই সকল স্থান মহাপীঠ রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের আকাশ বাতাস অরণ্য গিরিগুহা নির্ঝর নদীতীর সকল তপঃ সাধনের অনুকূল, সেজন্য এখনও কতশত সাধু সন্ন্যাসী ইহার নানাস্থানে সাধন ভজনে নিযুক্ত আছেন। পৃথিবীর আর কোন দেশে এরূপ দৃষ্টি দেখা যায় না

পৃথিবীর অন্য জাতির মধ্যেও ঈশ্বরপরায়ণতা এবং যথেষ্ট ধর্ম্মভাব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু পার্থিব সুখকেই তাহারা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য summuen (bonuer) বলিয়া মনে করে। হিন্দুজাতি ধর্ম্মজীবন লাভ ও ঈশ্বর প্রাপ্তিকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া চিরদিন মনে

করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণে অভিলাষি হইয়া তাঁহার দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে তাঁহার বিষয় বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, বুদ্ধা কাত্যায়নী মৈত্রেয়ী বলিলেন "ভগবান্, আপনি যদি আমাকে বিত্তপূর্ণ সমগ্র পৃথিবীও দান করেন, আমি তাহা দ্বারা কি অমৃতত্ব লাভ করিব" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, অমৃতত্বলাভ করিবে না।" মৈত্রেয়ী কহিলেন, "তবে আমি বিত্ত লইয়া কি করিব! আমাকে অমৃতত্ব লাভের উপদেশ প্রদান করুন।" সেই অমৃতত্বলাভই হিন্দুজাতির জীবনের আদর্শ। হিন্দু-জাতি এই অমৃতত্ব লাভকে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের উপরে স্থান দিয়াছে। বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবিন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণের সময় এই কথা শুনাইয়া দিয়া আসিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন হিন্দুজাতির পার্থিব সুখসম্পদ্ বিমুখতাই তাহাদের অধঃপতনের কারণ, এই কারণেই ভারত পরাধীন হইয়াছে। হিন্দুজাতি সংসারকে অনিত্য বলিয়া মনে করে, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" হইতেছে তাহাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র, সেজন্য তাহারা পার্থিব সুখ-সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করে না, এবং এই কারণেই তাহারা সুখসম্পদ হারাইয়া আজ বিদেশীর পদানত হইয়াছে।

আমি একথা স্বীকার করি না। "কা তব কান্তা কস্তে পুত্র" ইহা হইতেই সন্ন্যাসীর কথা হিন্দুজাতির সকললোকই সন্ন্যাসী নহে। পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের সুখভোগের চেষ্টা বিলক্ষণ ছিল, এবং এখনও আছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই সকল উচ্চবর্ণের জীবন প্রণালী মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা শাসিত হইত; কাজেই উচ্চবর্ণের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, পরে বানপ্রস্থ, এবং সর্ব্বশেষে ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিতে হইত। ইচ্ছা করিলেই কেহ প্রথমেই বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিত না। শূদ্রের ত সন্ন্যাসে অধিকারই ছিল না। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়েষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনি বৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ আমি যে রঘুবংশীয় রাজাদিগের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য রঘুবংশ লিখিতেছি, তাঁহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, যৌবনকালে বিষয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজ্যশাসন, শত্রুজয় প্রভৃতি কত কীর্ত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই বিষয়ভোগ তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই; বৃদ্ধকালে তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তপস্যার জন্য বনগমন করিতেন, এবং অন্তিমকালে যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিতেন।

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে পারি, ভারতের অধিকাংশ নৃপতির ইহাই জীবনের আদর্শ ছিল। হিন্দুর সেই গৌরবময় যুগে প্রধান প্রধান নরপতিগণ রাজসূয়, অশ্ব-মেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন; তদুপলক্ষে তাঁহাদিগের কত যুদ্ধবিগ্রহ হইত, তাঁহারা কত দেশ জয় করিতেন, কত রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং তাহা অকাতরে ব্যয় করিতেন।

এক এক জন রাজা অনেকগুলি করিয়া বিবাহ করিতেন এবং অনেকগুলি করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতেন। "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ভাবিয়া সন্ন্যাসী হইলে কি এ সকল সম্ভব হইত।

প্রকৃত বিষয়বৈরাগ্য লাভ করা বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল। আজন্ম সন্ন্যাসীদের ও কদাচিৎ সে অধিকার জন্মিয়া থাকে। দেবী ভাগবতে আছে, মহাত্মা শুকদেব জন্মগ্রহণ করিয়াই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ব্যাসদেব তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ গার্হস্থ্য অবলম্বন করিবার জন্য কত প্রকার বুঝাইলেন। অবশেষে তাঁহাকে গৃহী হইয়াও কি প্রকারে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, ইহা শিক্ষা করিবার জন্য রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠাইলেন। এই জনক রাজাই ছিলেন পূর্ব্বকালের একজন আদর্শ নৃপতি। তিনি সমোপযুক্তরূপে রাজ্যশাসন ও রাজসুখ ভোগ করিতেন, অথচ তাঁহার মন পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যাদি মহর্ষিগণের সঙ্গে তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন, অথচ রাজার কর্ত্তব্যকার্য্য সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেন।

ঐতিহাসিক যুগে হিন্দুজাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ঐহিক সুখলাভকেই—তাহারা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিত, বানপ্রস্থ অবলম্বন ত বহুকাল হইতেই উঠিয়াগিয়াছিল, এমন কি কালের প্রভাবে ধর্ম্মের অনুশাসনও তাহারা গ্রাহ্য করিতেন না। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ ভোগসর্ব্বস্ব হইয়া ক্ষীণবীর্য্য, যুদ্ধবিমুখ এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া পড়িল। তাহার ফলেই ভারতবর্ষ পরাধীন হইল।

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সমস্ত লোকই ত পার্থিব সুখভোগের জন্য লালায়িত, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সকলেই উদরের জন্য "হা—অন্ন" "হা—অন্ন" করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এবং নানাপ্রকার হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ও গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। এমন শতকরা ৯৯ জন সাধু সন্ন্যাসীরও ঐ দশা। সুতরাং হিন্দুজাতির পরকাল সর্ব্বস্ব হওয়ার অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তবে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুজাতি পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যাপেক্ষা ধর্ম্মকেই বেশী আদরণীয় মনে করিত। দুইজন সাহেবের পরস্পর দেখা হইলে, কথা হয় কে কয়টা জানোয়ার স্বীকার করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দুইজন বাঙ্গালীর দেখা হইলে কথা হয়, কে কত টাকা জমাইতে পারিয়াছে। পূর্ব্বকালে দুইজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইলে, এক জন আর একজনকে প্রশ্ন করিতেন, "অপি তাপস্তে বর্দ্ধতে?" আপনার তপস্যা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে? এখন অর্থ যেমন আভিজাত্যের গৌরব সূচনা করে, পূর্ব্বকালে তপঃ সেই স্থান অধিকার করিত। তাই এক জন কপর্দ্দক শূন্য ছিন্নাবস্থাবলম্বন তপস্বীর চরণতলে রাজেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীর মণিময় মুকুট লুণ্ঠিত হইত। তপঃ কেবল বানপ্রস্থাবলম্বী তপস্বীদের নহে, গৃহস্থ আশ্রমীর ও গৌরবের মাপকাঠি (Standard of wasth) ছিল। সেকালে গৃহস্থাশ্রমীরাও পার্থিব সুখ সম্পদ লাভের জন্য—কেহ বা স্বর্গের অন্ন লাভের জন্য, কেহ বা অমরবর লাভের জন্য, কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য তপস্যা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জাতির

কত উদ্যোগী পুরুষ সিংহ, কেহ বা হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্য, কেহ বা চির তুষারাবৃত উত্তরমেরু আবিষ্কারের জন্য, কেহ বা নব নব বৈজ্ঞানিক অস্ত্র আবিষ্কারের জন্য, জীবন তুচ্ছ করিয়া কত দুঃসাহসের কার্য্য করিতেছেন। ইহাই ত পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য তপস্যা। প্রাচীনকালে হিন্দুগণ পারমার্থিক সম্পদ লাভের জন্য ইহা অপেক্ষা কত কঠোর তপস্যা করিতেন। ইহাই হিন্দু জাতির একটা প্রধান বিশেষত্ব। বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাই; ধর্ম্ম লাভের জন্য হিন্দু যতটা ক্লেশ স্বীকার, যত কঠোরতা অবলম্বন করেন, তত কোন জাতিই পারে না। এখন পর্য্যন্তও কত নরনারী তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হিমাচলের দুরধিগম্য কেদার বদরী মানসসরোবর, পশুপতিনাথ প্রভৃতি স্থানে কত ক্লেশ সহ্য করিয়া, কেহ বা জীবন তুচ্ছ করিয়া পদব্রজে যাইতেছেন। যখন পুরী পর্য্যন্ত রেল পথ হয় নাই, তখন রথযাত্রার সময় কত সহস্র সহস্র নরনারী হাঁটা পথে কেহ বা দশদিনের দিন কেহ বা এক মাস অনবরত চলিতেন, তাহার মধ্যে কত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের চলিতে চলিতে পায়ের তলা ক্ষত বিক্ষত হইত, তাহার উপর নেকড়া বাঁধিয়া তাঁহারা চলিতে থাকিতেন, সে চলার কিছুতেই বিরাম নাই—আবার কত জন কলেরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইতেন। ধর্ম্মের জন্য এতটা করিতেছে, এতটা স্বার্থত্যাগ আর কোন্ দেশে আছে? ইহাও এক রকম তপস্যা।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সন্তানদিগকে পার্থিব ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। হে আমার ছাত্রবন্ধুগণ! তোমরা সেই তপস্যায় ব্রতী হও। কিন্তু সেজন্য তোমাদিগকে লোটা কম্বল সম্বল করিয়া গিরি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। তোমরা গৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্য তপঃ সাধন কর, চরিত্র গঠনের জন্য তপঃ সাধন কর, মনুষ্যত্ব লাভের জন্য তপঃ সাধন কর।

আমাদের শাস্ত্রেই আছে, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"—ছাত্রদের বিদ্যাভ্যাসই তপস্যা। এখানে তপস্যার অর্থ—Singleminded devotion—গভীর একাগ্রতা। বিদ্যালাভ করিতে হইলে সেই গভীর একাগ্রতা আবশ্যক। চরিত্র গঠনের জন্য যেরূপ তপঃসাধন করিতে হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অতি সুন্দররূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তপঃকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—"শারীর তপঃ", "বাচিক তপঃ", এবং "মানস তপঃ"।

"দেব দ্বিজগুরু প্রাজ্ঞপূজনং শৌচ মার্জ্জবং;
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে॥"

দেব দ্বিজ গুরু ও প্রাজ্ঞজনের পূজা অর্থাৎ-উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, শৌচাচার, ঋজুতা অর্থাৎ সরল ব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা ইহাকেই শারীর, তপঃ বলে।

"অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয় হিতাকথাৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥"

সত্য, প্রিয় অথবা হিতজনক এবং অন্যের চিত্তে অনুদ্বেগজনক বাক্য ব্যবহার এবং বেদাধ্যয়নকে বাঙ্ময় তপঃ বলা যায়।

"মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌন মাত্ম বিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধি রিত্যেতৎ তপোমানস মুচ্যতে॥"

চিত্তের প্রসন্নতা ও সৌম্যভাব, মৌনাবলম্বন, ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিগ্রহ এবং ভাবশুদ্ধিকে মানস তপঃ বলা হয়।

গীতায় প্রোক্ত এই ত্রিবিধ তপঃ একজন প্রকৃত সাধকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ইহার মধ্যেই আমরা হিন্দুর জাতীয় শিক্ষার প্রণালী পাইতেছি; ছাত্রদিগের চরিত্র গঠনের জন্য ইহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়।

(১) শরীরতপের মধ্যে পিতামাতা গুরুজন ও অধ্যাপকদিগের যথোপযুক্ত পূজা অর্থাৎ তাঁহাদের সম্মান করা, তাঁহাদের বাধ্য হইয়া চলা উচিত। শৌচাচার পালন করা উচিত, তাহা দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় এবং মন পবিত্র হয়। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা অর্থাৎ বীর্য্যধারণ করা উচিত। অনেক বালকই কুসঙ্গে পড়িয়া নানাপ্রকার কুঅভ্যাস আরম্ভ করে, তাহার দ্বারা শরীরের বল, চক্ষুর জ্যোতিঃ এবং মনের উৎসাহ ও প্রফুল্লতা নষ্ট হয়। সেরূপ কুঅভ্যাস সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বীর্য্যধারণ দ্বারা একৌ ওজের বৃদ্ধি হয়; আমাদের শারীরিক ও মানসিক বলের মূল হইতেছে সেই ওজোগুণ। শাস্ত্রে আছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—বলহীন ব্যক্তি কখনও আত্মা বা ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্ম লাভ ত দূরের কথা, বলহীন ব্যক্তি পৃথিবীর কোন সুখসম্পদই লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে বিদ্যার্থিগণ গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে দার পরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। আজকাল অনেক অভিভাবক কলেজের পড়া শেষ না হইলে যুবকদিগের বিবাহ দেন না। অবশ্য অনেকে বিবাহের বাজারে তাহাদের দর বাড়াইবার জন্য এরূপ করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, ইহা দ্বারা সেই যুবকদিগের উপকারই হইয়া থাকে, যদি তাহারা কুসংসর্গে পড়িয়া কুপথে না চলে।

এই প্রসঙ্গে একথা বলা আবশ্যক, কুসঙ্গীর ন্যায় খারাপ পুস্তকও বালকদিগের পক্ষে অপকারী। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত বাহিরের বই পড়িতে বলেন। ভাষা শিক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই সকল পুস্তক বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইতে হইবে। আজকাল স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচারের কথা পরিপূর্ণ অনেক নাটক নভেল গল্পের বইয়ের দ্বারা বাজার ছাইয়া গিয়াছে। বালকবালিকাদিগের মধ্যে সেই সকল আপাত রমণীয় বই পড়িবার আগ্রহ অত্যন্ত বেশী দেখা যায়। কোন কোন ক্ষমতাশালী গ্রন্থকার তাঁহাদের আর্টের গুণে তাঁহাদের পুস্তক সকল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করিয়া রচনা করেন। কিন্তু তাহাতে যে বিষটুকু লুকান থাকে তাহা অলক্ষিত ভাবে তরুণ তরুণীদিগের তরলচিত্তে বিসর্পিত হইয়া চিত্তবৃত্তি কলুষিত করে। সেই সকল পাপ চিত্তের সহিত ক্রমাগত মনের

ব নিষ্ঠতা জন্মিলে পাপের প্রতি মনের সহজাত ঘৃণা কমিয়া যায় এবং নিজেরও সুযোগমতে পাপ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে কুগ্রন্থ কুসঙ্গীর ন্যায় তরলমতি বালকবালিকাদিগকে পাপের পথ চিনাইয়া দেয় এবং ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। সে জন্য এই সকল পুস্তক বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মচারীগণ স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না। যাঁহারা অরণ্যে বাস করিতেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল, এখন নগরে অথবা পল্লীসমাজে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অসম্ভব। তবে সমস্ত স্ত্রী জগন্মাতার অংশ, স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃস্থানীয় বাল্যকাল হইতে এই প্রকার শিক্ষা বদ্ধমূল হওয়া উচিত। স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে দেখিবার অভ্যাস করিলে বালকগণের চরিত্র কলুষিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। শারীরিক বল বৃদ্ধির জন্য কুস্তি, লাঠিখেলা, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি ব্যায়াম একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয় এ বিষয়ে এখন বালকদিগের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়! সন্তরণের ও দৌড়ের প্রতিযোগিতা দ্বারা অনেক বালক ও যুবক খ্যাতি লাভ করিতেছেন। কিন্তু এই সকল ব্যায়ামচর্চ্চার একটা regularity (শৃঙ্খলা) থাকা আবশ্যক। বালোচিত উৎসাহের বশে যেন মাত্রা ছাড়াইয়া না যায়। শৃঙ্খলার সহিত অভ্যস্ত হইলে ব্যায়ামকেও শারীর তপঃ বলা যাইতে পারে।

(২) বাঙ্ময় তপের মধ্যে প্রধান কথা হইতেছে দুইটি—সত্য কথা ও শাস্ত্রাধ্যয়ন। সকলে সত্য বাক্য বলিবে, কিন্তু কেবল সত্য নহে—সে সত্যবাক্য অন্যের হিতজনক হইবে, প্রিয় হইবে এবং কাহারও মনে পীড়া দিবে না। কিন্তু অন্যের প্রিয় হইবে বলিয়া কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবে না। যে সেরূপ বাক্য বলে, তাহার নাম চাটুকর। চাটু বাক্য বা তোসামোদ দ্বারা অন্যের হিত না হইয়া অহিতই হইয়া থাকে। সেই জন্য গীতা বলিতেছেন, তোমার বাক্য অন্যের প্রিয় হইবে অথচ হিতজনক হইবে। অনেক সময়ে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অপ্রিয় সত্য বাক্যও ব্যবহার করিতে হয় এবং তাহা অন্যের মনে পীড়াও দেয়। তাহা অবশ্য মিথ্যা বলা অপেক্ষা ভাল। মিথ্যা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বাঙ্ময় তপস্যা বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ পরীক্ষা পাশ করিতে হইলে বাধ্য হইয়াই বালকদিগকে পাঠ্য পুস্তক পড়িতে হইবে। তবে অপাঠ্য, কুপাঠ্য পুস্তক পাঠে যে অনিষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৩) মানস তপের প্রধান কথা হইতেছে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তের প্রসন্নতা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। কাম ক্রোধ ঈর্ষ্যা অসূয়া হিংসা প্রভৃতি রিপু প্রবল হইয়া আমাদের মনে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করে। চিত্তপ্রসন্ন নির্ম্মল রাখিতে হইলে এই সকল রিপুকে দমন করা আবশ্যক, তখন চিত্ত-বীচিবিক্ষোভশূন্য প্রশান্ত সরোবরের ন্যায় স্থির ও শান্ত হয় এবং সেই প্রশান্ত নির্ম্মল চিত্তে, প্রশান্ত সরোবর বক্ষে শশাঙ্ক কিরণের ন্যায় জ্ঞানালোক প্রতিফলিত হয়। আমাদের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা বিষয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য লালায়িত। তাহারাই বাহির হইতে কামক্রোধাদি রিপুর আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়। সুতরাং এই সকল রিপু দমন করিতে

হইলে, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে সংযমাধীনে রাখা আবশ্যক। চক্ষু একটি সুন্দরী রমণীতে জগজ্জননীর প্রকাশ না দেখিয়া যদি ভোগ্যভাব অবলোকন করে, তবে তাহাকে কঠোর শাসন করিতে হইবে। কর্ণ যদি সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে ইচ্ছুক না হইয়া পরনিন্দা বা কুকথা শ্রবণের জন্য লালায়িত হয়, তবে তাহাকে শাসন করিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। যে স্থানে সেরূপ কথা উচিত নয়, অনেক সময়ে সেইরূপ কথা বলার প্রবৃত্তি হয় সেই জন্য বাক্ সংযম এবং মৌনাবলম্বন অভ্যাস করা উচিত। অনেক সময়ে ক্রোধবশে আমরা লোককে কটু কথা বলিয়া ফেলি, সেই সময় মৌনাবলম্বন করিলে অনেক অশান্তি হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও দেশহিতৈষি বাগ্মী ৺অম্বিকাচরণ মজুমদারের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি ক্রোধের বশীভূত ছিলেন এবং ক্রোধ হইলে লোককে কটু কথা বলিতেন। এই জন্য তাঁহার বৈঠকখানায় কয়েক খানা কলকে বড় বড় অক্ষরে "আবার" "চুপ কর" প্রভৃতি বাক্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইলে, এই সকল লেখা দেখিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিতেন। পরে এই ক্রোধ দমিত হইয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ তেজস্বী পুরুষে পরিণত করিয়াছিল।

গীতোক্ত এই উপসাধন একটা মস্ত moral discipline অর্থাৎ আত্মনিগ্রহ। হিন্দুর শিক্ষার মূলে এই প্রকার আত্মনিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আজকাল আত্মনিগ্রহের নামে অনেকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাঁহারা বলেন, একটি গাছ যেমন মাটির রস, আলোক উত্তাপ পাইয়া স্বভাবের নিয়মে বাড়িয়া উঠে, মানুষকেও সেইরূপ স্বভাবের নিয়মে বাড়িতে দাও। কতকগুলি বড়া নিয়মের অধীনে ফেলিয়া তাহার স্বাভাবিক পরিণতির পক্ষে বাধা জন্মান উচিত নহে। কেহ কেহ একথাও বলেন, বালক ও যুবকদিগকে তাহাদের স্বাধীন প্রবৃত্তির বলে উদ্দাম গতিতে ছুটিতে দাও, তাহারা তাহাদের নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সকল বাছিয়া লইয়া স্বভাবের নিয়মে পরিণত হইবে। শাস্ত্রের শাসন কিম্বা স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের পীড়ন যেন তাহাদের স্বাভাবিক পরিণতির কোন বাধা না জন্মায়। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর "সবুজ পত্র" নামক মাসিক—পত্রিকায় নব্য যুবকদিগকে সমাজ ও শাস্ত্রের শাসনের খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া উন্মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই—উপদেশ অনুসারে স্থানে স্থানে "সবুজ সংঘ", "নবযৌবনের দল" প্রভৃতি যুবক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু এই স্বভাবের নিয়মে পরিণতির ও বৃদ্ধির সম্বন্ধে মানুষের সহিত উদ্ভিদের, এমন কি ইতর জন্তুর কোন সৌসাদৃশ্য নাই। উদ্ভিদ্ ও ইতর জন্তু সকল প্রকৃতি মাতার ক্রোড়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াই, তিনি তাহাদিগের লালনপালনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের মন বুদ্ধি বিচারশক্তি আছে বলিয়া মানুষ সব বিষয়ে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া চলিতে চায়। নিজের বুদ্ধিবলেই সে নিজের পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেই পথে চলে এবং উপযুক্তরূপে শিক্ষা না পাইলে পদে পদে তাহার ভুল হইয়া তাহার বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা।

পূর্ব্ববর্ত্তী মানবগণ সংসারের পথে চলিয়া যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রাকারে গ্রথিত হইয়া আছে। শাস্ত্র জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া মানুষকে পথ দেখাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলেও পরিণামে তাহার মঙ্গলই—হয়।

দ্বিতীয় কথা এই, মানুষের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ দুর্দ্দমনীয়; মানুষ স্বভাবত শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়কেই যায়। কিন্তু প্রেয় অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা রমণীয় কেবল তাহাই—বরণ করিলে, প্রবৃত্তির ইন্ধনে ঘৃত জোগান হয়। তাহা দ্বারা মানুষের দুর্দ্দমনীয় কাম ক্রোধাদি রিপু অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। এই কারণে শাস্ত্রের ও গুরুজনের শাসনের অধীন থাকিয়া সংযম শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

কয়েকদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ভারত গৌরব শ্রীযুক্ত স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন সভায় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"Many misgivings are agilating your mind, some of you thought of setting yourselves adrift from the retraint misposed in a place of learning, mistaking the necessary discipline as Coercion in ensuring a spirit of subserviency. Did you ever realise that the most irresistable force is that who is held in restraint, and that this is the only period of your life when you can acquire that habit of restraint and of discipline ?"

অর্থাৎ—

তোমরা হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছ, তোমাদিগকে বিদ্যালয়ে কঠোর শাসনের অধীনে আনিয়া তোমাদের স্বাধীনতালোপের চেষ্টা করা হইতেছে, সেজন্য তোমরা এই স্বাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া বাহিরে হইবে। কিন্তু একথাটা তোমরা একবার কি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছ যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় শক্তিই তাহা, যাহাকে বাধা দিয়া ধরিয়া রাখা হয়, এবং তোমাদের জীবনের সময়টাই তোমাদের আত্মনিগ্রহ অভ্যাস কেবল এক করিবার পক্ষে অনুকূল?

নদীর স্রোতের বেগ কখন্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দমনীয় হয়? যখন সেই স্রোতের মুখে একটা বাঁধ দিয়া তাহাকে বাধা দেওয়া হয়। যে ইঞ্জিনের অপ্রতিহত শক্তিতে রেলগাড়ী অথবা ষ্টীমার চলে, তাহার বল ও বয়লারের মধ্যে আবদ্ধ বাষ্পরাশি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং আত্মনিগ্রহের দ্বারা যুবকদিগের যে স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হয়, তাহা তাহাদের ভবিষ্যতে কর্ম্ম করার জন্য শক্তিসঞ্চয় মাত্র—ইহার অপর নাম Conservation of energy. মহাত্মা গান্ধী ইহাকে Gathering of soul force বলিয়াছেন। সুতরাং যৌবনমদে মত্ত হইয়া শাস্ত্র এবং সমাজের বিধি নিষেধের বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়াতে কিছুমাত্র গৌরব নাই। তাহাতে বরং কুষ্ঠাস্বারূঢ় ব্যক্তির মত গর্ত্তে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

আত্মনিগ্রহে দুঃখ আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যে সুখ অগ্রে

অমৃতের ন্যায় ও পরিণামে বিষের তুল্য, তাহা অপেক্ষা যে সুখ অগ্রে বিষোপম ও পরিণামে অমৃত-তুল্য তাহাই সকলের বাঞ্ছনীয়। ইহা গীতায় শ্রীশ্রীভগবানের উক্তি।

আর জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্-জীবনের সহিত মনুষ্য-জীবনের তুলনা করিয়া জগতীয় অনুকূলে আর একটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন,—

"What is the source of strength that confers on the tree its great power of endurance, by which it emerges Victorious from all peril? It is the strength derived from the place of its birth, its perception and quick readjustment to change and its inherited necessary of the past. The afflorescence of life is then the supreme gift of the place, and its associations. Insoluted from these, what fate awaits the poor Wretch nurtured only in the alien thought and ways? Death dogs his footsteps and annihilation is the nievitable end."

একটি গাছ যে শক্তির দ্বারা নানা বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া উঠে তাহার সেই শক্তির মূল কোথায়? না যে শক্তি সে তাহার জন্মস্থান হইতে, তাহার অতীতের স্মৃতি হইতে এবং তাহার চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তি হইতে প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তাহার জীবনধারণের মূল শক্তিটা তাহার জন্মস্থানের ও তৎসম্বন্ধীয় আবহাওয়ারই উৎকৃষ্ট দান। এই সকল হইতে বিচ্যুত হইয়া যদি সে কেবল বিজাতীয় চিন্তা বা ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে চায় তবে তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে? না অবশ্যম্ভাবী বিনাশ ও মৃত্যু।

হিন্দুজাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আজ এই জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে বাঁচিতে হইলে তাহার দেশীয় ও জাতীয় ভাবের ধারাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। একটি উদ্ভিদ্ যেমন তাহার উৎপত্তি স্থানের স্মৃতিকর রস সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার বীজ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া বাহিরের বিপদকে তুচ্ছ করিয়া জীবনধারণ করে আমাদিগকেও সেইরূপ আমাদের জাতীয়ভাব ও পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। একটি গাছ যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবনধারণ করে, আমাদিগকেও পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনের সহিত সুর মিলাইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা পরানুকরণের দ্বারা কখনও আত্মবিলোপ করিব না। আমাদের জাতির পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষগণ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আমরা চলিব।

হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা অতি উদার তাহা কখনও হিন্দুকে সঙ্কীর্ণতা শিক্ষা দেয় না। সেই শিক্ষা হিন্দুকে অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা শিক্ষা দিতেই পারে না। আমরা আমাদের ইষ্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিয়া প্রণাম করি। তিনি কেবল হিন্দুজাতির,

লোকাপের রক্ষক নহেন, তিনি জগতে হিত কর্ত্তা। দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া প্রত্যাগত হইল, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন.—বৎস! বল দেখি রাজা মিত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, আর শত্রুর সহিতই বা কিরূপ ব্যবহার করিবেন।

তদুত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন,,—

"সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র-কথা কুতঃ॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণু-র্ময়ি চান্যত্র চাপ্যসৌ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্কৃতঃ॥"

হে পিতঃ! জগন্ময় জগন্নাথ গোবিন্দ যখন পরমাত্মা-রূপে সর্ব্বভূতের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র আর শত্রু এরূপ কথা কেন? ভগবান্ বিষ্ণু তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, অন্যত্রও আছেন। সুতরাং ইনি মিত্র, ইনি শত্রু এরূপ ভেদজ্ঞান থাকিবে কেন?

এই প্রকারে উদার শিক্ষা পৃথিবীর আর কোন্ জাতির মধ্যে আছে? প্রহ্লাদ অবশ্য জন্মান্তরীণ সুকৃতি বলে শৈশবেই এই পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ হিন্দুগণ জীবনব্যাপী শিক্ষা ও আচারানুষ্ঠান দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারেন। হিন্দুর প্রতিদিনের তর্পণ মন্ত্রে দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীকেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জল ও পুষ্প দান করিবার বিধি রহিয়াছে। আজকাল কথায় কথায় বিশ্বমানবতা বিশ্বপ্রীতির কথা শুনিতে পাই, কিন্তু তাহা মুখের কথা নহে; তাহা জীবনব্যাপী এই প্রকার সাধনার দ্বারাই লাভ হইতে পারে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ভারতবর্ষে হিন্দুজাতি কি প্রকার শিক্ষার (Culture) দ্বারা এক সময়ে পার্থিব সুখ সম্পদ ও পারমার্থিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। হিন্দু সন্তানগণ যদি তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে সেই পূর্ব্বতন শিক্ষার ধারা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা যে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এক সময়ে দেবগণও এখানে জন্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করিতেন। এই পুণ্যভূমিতে একদিন বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ ধর্ম্ম ও সত্যপালন শিক্ষা দিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া গীতার ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক ধর্ম্মরণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ পূর্ব্বক অহিংসা ও মৈত্রী ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞান ও লুপ্তপ্রায়

হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়া আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়াছিলেন। এতগুলি মহাপুরুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার মৃত্তিকাজল আকাশ বাতাসের একটা পুণ্যপ্রভাব অবশ্যই আছে। এই সকল মহাপুরুষ উপদেশ দ্বারা ও তাঁহাদের জীবনের কার্য্যাবলী দ্বারা যে সকল শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের আচীন জীবনের বিশেষত্ব স্থাপন করিতেছে। আসুন আমরা সেই সকল শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিয়া এই পুণ্যভূমির উপযুক্ত সন্তান হই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

পরশ-পাগল।

তোমার সাথে কি চিরদিন হ'বে
দূরে দূরে পরিচয়?
তব সাথে দেখা হৃদয়-বাহিরে—
অন্তর মাঝে নয়?
এত দিবসের ক্ষুধাতুর আশা,
আর্ত্ত শুষ্ক হৃদয়-তিয়াসা
মিটাবেনা তুমি অমৃত-বরষে?
তোমার অপার প্রেমে
আঁধারের মাঝে অপলক-জ্যোতি
আসিবেনা তুমি নেমে?

ক্ষণে-ক্ষণে শুধু চমকে চমকে,
তব সাথে পরিচয়?
মোর তরে তুমি বিজলী-চমক?
ধ্রুবতারা-জ্যোতি নয়?
আঁধার হইতে আঁধারের কূলে
বেড়াব কি আমি নিতি পথ ভুলে?
আমার তরণী আলোক-সরণী
বাহিয়া পাবেনা কূল?
দুরাশার স্রোতে ভেসেছি কি আমি
সৃষ্টির মহা ভুল?

নিরাশা-বেদনা-লাঞ্ছনা-ঘাতে
লুটা'ব ধূলির তলে ?
আড়াল হইতে দেখে চলে' যা'বে
হেসে পরিহাসছলে ?
আসিবেনা পাশে, ধরিবেনা হাত ?
করিবেনা তব কম আঁখিপাত ?
মিশা'বেনা তব নয়ন-আসার
আমার নয়ন-জলে ?
আপনার দাহে আপনি জ্বলিব
ত্রিলে ত্রিলে, পলে পলে ?

ও গো, তবে কেন এ হৃদয়ে মোর
দিলে বুক ভরা আশা ?
সব এ হৃদয় মুখর করিয়া
কাঁদিবারে দিলে ভাষা ?
আশা ভরা কেন দিলে তনয়ান
যদি না হেরিবে তোমার বয়ান ?
শুধু নিশি দিন দূর সাগরে
ডুবনা কেন মে রে ?
কেন মরীচি-কা দেখে
নিঠুর-নিরাশা ডোরে ?

তোমার আমার মাঝে যদি র'বে
সীমাহীন ব্যবধান,
পরশ-পাগল করিলে গো কেন,
সারা-দেহ-মন-প্রাণ ?
রু পথে
শুষ্ক পাষাণ দূর পর্ব্বতে

সৃজিলেনা কেন ? কেন এ জগতে
মানুষ [illegible]
কেন বাঁধিলে
আশা-ভাল ।।

কেন গো জাগালে অপার বাসনা
আমার হৃদয়-সরে ?
ফুটাইলে কেন মানস-কমল
তোমার কোমল-করে ?
বারেকের তরে এস পথ ভুলে,
নিজ হাতে তুমি লহ তা'রে তুলে,
ছিন্ন করিয়া ফেলো ধূলি [illegible]
[illegible]
মৃত্যু ? তবু সে তোমারি পরশ ।
প্রাণ আজি তাই মাগে ।

শ্রীসুবোধ রায় ।

কুমার লাইব্রেরীর কুমারগণের প্রতি।*

তোমরা ক'টিতে মিলে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেছ তারই উৎসব আজ। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে একটি ছুটী করে' পুস্তক সংগ্রহ করে' এই লাইব্রেরী টীক করিয়েছ। সংগ্রহটা মানুষের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। কেউ অর্থ সংগ্রহ করে, কেউ বস্ত্র সংগ্রহ করে, কেউ দাস দাসী যান বাহন ও ভোগ বিলাসের নানা উপকরণ সংগ্রহ করে। প্রয়োজনের অতীত সংগ্রহ পূর্ব্বগুরুরা তার নাম দিয়েছিলেন পরিগ্রহ, এবং ব্রহ্মচর্য্য অস্তেয় সত্য ও অহিংসার সঙ্গে অপরিগ্রহও একটি সংযমসাধ্য বিষয় বলে' পরিগণিত হয়েছিল। এই সংগ্রহ বা পরিগ্রহের মোহ যাকে পেয়ে বসে সে বস্তু বদ্ধ হয়ে পড়ে, তার মুক্তি নেই, তার ভিতর ব্যাপ্তি বাধা পায়। তোমরা বালক, বৃদ্ধ নও, তাই মুক্তি শব্দটা তোমাদের কাছে ভীতিজনক হতে পারে, সেইজন্যে সহজে বুঝিয়ে দিই—মুক্তি মানে ছুটী—আর কিছু নয়। এক জায়গায় বদ্ধ হয়ে থাকাটা প্রীতিকর নয় এটা বোঝ, মন বাইরে ছুটে যেতে চায়, অনেক কিছুকে আলিঙ্গন করতে চায়, এটা জান। পরিগ্রহ জিনিষটা তার অন্তরায়। পরিগ্রহে বস্তুটুকু সব মন জুড়ে বসে থাকে, আর তিলেরও স্থান হয় না, বিশ্বকে বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে' নিয়ে বসাবে কোথায়? আবার পরিগ্রহের দ্বারা সেই ছোট বস্তুর স্বামিত্ব বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তির আমিত্বের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি খায়, প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় লেগে থাকে পাছে কেউ ভাগ বসাতে চায়, পাছে কেউ কেড়ে নেয়, পাছে চুরি হয়। ভোগের সুখ যতনা, ভয়ের আস্ফালাঘাতি তার শতগুণ। তাই বিচক্ষণ পুরুষরা উপদেশ দিয়েছেন—"সংগ্রহের দিকে যেও না, বোঝা বাড়িও না, হাল্কা থেকো যতটুকু প্রতিদিনের জীবনযাত্রার জন্যে আবশ্যক ঠিক ততটুকু গ্রহণ কোরো—অতিরিক্ত বর্জ্জন কোরো—এমন কি যদি পাকা বুদ্ধিমানের মত কাজ করতে চাও, একেবারে ভাবনাশূন্য হয়ে—Think not for the morrow—কালকের জন্যেও আজ সঞ্চয় করোনা, কালকের অভাব কালই পূরণ হবে। যাঁর অজ্ঞাতে একটা পাখারও পতন হয় না, তোমার অভাব তাঁর অজানা থাকবে না, যথা প্রয়োজন অভাব পূরণ হবে, তুমি ব্যস্তসমস্ত হয়ে সংগ্রহ করতে বসে যেওনা।

কিন্তু সংগ্রহের যে দুর্ব্বার প্রবৃত্তি তাকে রোধ করা ভারি কঠিন। গীতাতেই শ্রীকৃষ্ণের মত পরম মনস্তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানীপুরুষও বলেছেন।

---

* রামমোহন লাইব্রেরী হলে কুমার লাইব্রেরীর ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহ কিং করিষ্যতি' প্রকৃতিকে নিগ্রহ করা নিষ্ফল, সে চেষ্টায় পেলে নিগৃহীত ক্ষুব্ধ প্রকৃতি ছলে বা কৌশলে প্রতিশোধ নিয়ে দাঁড়াবে, দুর্যোগাকারে মানুষকে পেয়ে বসবে। তাই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ চলে না, সন্ধি চলে। সন্ধির অর্থ পরাজয় স্বীকার নয়। সন্ধিতে কোন পক্ষই জয় পরাজয় নেই; দুই পক্ষেই সর্ত্ত করে কিছু স্বত্ব ছাড়াছাড়ি করা হয়। তাই প্রবৃত্তির ভরা গাঙ্গে যখন বান ডাকে তখন তার সঙ্গে সন্ধি করা চাই, তার উপদ্রব থেকে নিজেকে বাঁচানর জন্যে বাঁধ বেঁধে স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া চাই। এই হচ্ছে বিচক্ষণতা, এই হচ্ছে এঞ্জিনিয়ারিং।

পরিগ্রহের বৃত্তি বা সংগ্রহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে বিলাসবস্তু সংগ্রহ থেকে সরিয়ে নিয়ে পুস্তকসংগ্রহে লাগানয় প্রকৃতির উপর একটি বাঁধ বাঁধা হয়। শারীরিক ভোগের স্পৃহা থেকে নিবৃত্ত হয়ে মানসিক ভোগমুখী হলেই পুস্তকসংগ্রহে প্রবৃত্তি জন্মে। আবার সংগৃহীত পুস্তকাবলী সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য অবারিত রাখলে, তাকে পাব্লিক লাইব্রেরীতে পরিণত করলে, কল্মষকে মুক্ত করার প্রথম সোপানে আরূঢ় হওয়া যায়। তোমরা এই পথে বিশ্বের দিকে বাহু সম্প্রসারণ করেছ। একটি বিষয়ে সতর্ক হয়ো। পুস্তকের ভোজ একটা মহা ভোজ। এতে জগৎকে আমন্ত্রণ করার আগে ভেবে নিও পুস্তক-কটোরায় থাকতে না পারে এমন মনের খোরাকই নেই; দুষ্পাচ্য এবং সুপাচ্য উভয়ই। যেমন মনের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও বল বৃদ্ধি করতে পারে, তেমনি মনকে অবনতির রসাতলে টেনে নিয়ে যেতে পারে—এমনও অখাদ্য পুস্তকে ভরা থাকে। সেইজন্যে উপযুক্ত পরীক্ষকের দ্বারা পরখ করিয়ে দেখে শুনে তবে পুস্তকবিশেষকে লাইব্রেরীতে স্থান দিও।

তোমাদের কিশোর মন যেদিন পরার্থের জন্যে প্রথম পদক্ষেপ করেছিল সেই দিনের স্মৃতি উৎসবের শুভদিন আজ। মা আমি, তোমাদের উৎসবে যোগদান করতে, তোমাদের আনন্দে আনন্দী হতে আমায় ডেকেছ। আজ আয়োজনের তোমাদের ত্রুটী নেই; অভাব কিছুরই নেই, ঘর তোমাদের সঙ্গীত-আবৃত্তির মিঠাই মণ্ডায় ভরা। তবুও আশা করে আছ জন্মোৎসবের শুভদিনে মা খালি হাতে আসবে না। মা কিছু দেবে। কি দেবে? শুধু আমার ডাক দেবার আছে—ব্যাপ্তির পথে, ভূমার পথে। শোনাবার আছে নিজে যা উপলব্ধি করেছি।

'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখং।' ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। এই সভায় উপস্থিত বা অনুপস্থিত বাঙ্গলার প্রত্যেক কুমারকে বলতে ইচ্ছে যায়—কে আছ কিশোর, কে আছ তরুণ নিঃস্বার্থ আনন্দে বিকশিত হও। দেশের কাজে, দশের কাজে, বিশ্বের কাজে নিজেকে খরচ করে ফেলো। যদি স্বার্থের কৌটোটে একবার গড়ে ওঠ, আর নিজেকে সহজে বদলাতে পারবে না। স্বার্থ মৃত্যু, পরার্থ জীবন। মৃত্যুর পথে যাবে কি অফুরান জীবনের পথে যাবে এখন থেকে সেটা স্থির করে নাও। তোমরা নবীন বিহঙ্গ, এখনও তোমরা উড়তে পার, ডানা আছে আজও,—চিরদিন থাকবে না, এ ডানা ঝরে যাবে। ডানা থাকতেও ক্ষুদ্র-স্বার্থের খাঁচায় বসে থাকবে, না, ডানা মেলে মহত্ত্বের আকাশে উড়ে বেরিয়ে পড়বে? এখনও নীড় বাঁধতে

পার উপরে সুনীল আকাশতলে, নির্ম্মল বায়ুমণ্ডলে। বেছে নাও এই বেলা পছন্দ করে নাও কোথায় আবাসভূমি করবে—নর্দ্দমার ধারে না নির্ম্মল স্থানে!

বাঙ্গলার কুমারেরা তোমাদের মাতৃভূমিকে রত্নগর্ভা আখ্যা দেবে তোমাদেরই এই বয়সের নির্ব্বাচন ও ভবিষ্যের কীর্ত্তি। যদি তোমাদের সত্তার ভিতরকার সঙ্গীত দিয়ে জগৎকে মুগ্ধ করবে—তবে প্রস্তুত হও, নিজেকে সুরে বাঁধ। এই সুরে বাঁধাটাই আসল কাজ—যন্ত্রকে যত কষে বাঁধবে ততই ঠিক সুরটি টন্ করে বেজে উঠে' শ্রোতার কাণে মধু ঢালবে। এরই নাম চরিত্রগঠন, এরই নাম সংযম, এরই নাম ছন্দ। হে আমার দেশের কুমারেরা নিজেকে বাঁধ বাঁধ বাঁধ সংযত হও, ধ্বনিত হও, ছন্দিত হও।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

বাইবেলের ইন্‌জেক্‌সান্‌।*

পাশ্চাত্য জগৎ অর্থাৎ য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের সংস্পর্শটা একটা সঙ্ঘাত, শুধু পরিচয় নয়। রাজনৈতিক দিক দিয়েও, মানসিক দিক দিয়েও। দুটো রাসায়নিক পদার্থ পাশাপাশি রাখলে দুয়েরই পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়, কোনটাই—আগে যা ছিল, ঠিক তাই থেকে যায় না—এ সেই রকম। বাইরের চেহারা ও ভিতরের গুণ—এই দুয়েতেই এত পরিবর্ত্তন হয় যে, ঠিক সেই একই ধাতু, তা আর চেনা যায় না। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে তাই হয়েছে। আমরা যখন এ বিষয়ে হিসেব করি, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের যুক্তিমূলক শিক্ষাকেই আমাদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলে মনে করি। বেন, হাক্সলি, মিল, স্পেন্সার এবং সমগ্র ইংরাজী সাহিত্য চিন্তারাজ্যে আমাদের বিষম নাড়া দিয়ে হিন্দুধর্ম্মের অযুক্তিমূলক শাসন-পাশ ছিঁড়ে ফেলে স্বাধীন চিন্তার পথে ঠেলে বের ক'রে নিয়ে এসেছে, এই মনে করি। একশ বৎসর আগেকার জড়ভরত মন্ত্রতন্ত্রগ্রস্ত বাঙ্গালীর ছেলে ও আজ-কালকার কলেজের ছাত্রদলের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, সেটা শুধু শিক্ষা বিভাগের পাঠ্য ও অপাঠ্য পুস্তকের ফলে হয়েছে এই জানি। কিন্তু য়ুরোপ বল্‌তে য়ুরোপের বিজ্ঞান ও দর্শন যদি শুধু বুঝি, ভারি ভুল হ'বে। দর্শন ও বিজ্ঞানটা য়ুরোপের গায়ের উত্তরীয় মাত্র, তার রক্তমাংসের শরীরটা হচ্ছে, তার ধর্ম্ম বা খ্রীষ্টভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টর উক্তি সর্ব্বাংশে সকলে পালন কর্‌তে পারুক্‌ আর নাই পারুক্‌, য়ুরোপের ছেলে মেয়ে বাইবেলের প্রতি অন্ধশ্রদ্ধায় পালিত ও পুষ্ট বাইবেলনিষ্ঠ য়ুরোপ বাইবেল হাতে ক'রে জগৎ প্রদক্ষিণ করেছে। বাইবেলের বাণী দিয়ে জগৎকে বেষ্টন করেছে। আমরা যদি ভাবি, আমরা পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান নিয়েছি, কিন্তু বাইবেল বর্জ্জন করেছি, তবে ভারি ভুল হ'বে। নতুন যুগের বাঙলা দেশ পাদরীদের ইচ্ছামত ক্রীশ্চান হয় নি, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছামত বাইবেল-ধাত্রীর অঙ্কে মানুষ হয়েছে।

নব্য বাঙলা দু'জন বিপুলকর্ম্মীর হাতে গড়ে উঠেছে। প্রথম রামমোহন রায় দ্বিতীয় কেশবচন্দ্র সেন। অন্যান্য মহাপুরুষেরা এঁদের সহকর্ম্মিতা করেছেন, এঁদের যজ্ঞে যোগও দিয়েছেন। আসল ভাঙ্গন ও গড়নের মূলে এই দুইজন। পাদরীদের হিন্দুধর্ম্মাগ্নিতে জাতীয় আত্মসম্মানে আহত রামমোহন রায় স্বধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করার জন্যে তার উপর বহুকালের

---

* আলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট হলে কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতি সভায় পঠিত।

সঞ্চিত ধূলা আবর্জ্জনা ঝেড়ে ফেলায় বদ্ধপরিকর হলেন। যে হিন্দুধর্ম্ম গতানুগতিকের অচলায়তন হ'য়ে পড়েছিল, তাকে প্রথম নাড়া দিলেন। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ডে অবরুদ্ধ উপনিষদের জ্ঞানকে উদ্ধার করলেন। হিন্দুর ছেলে দলে দলে ক্রীশ্চান হওয়া বন্ধ হ'ল, কিন্তু এক জায়গায় পাদরিদের কাছে তিনি পরাস্ত হলেন। পরাজিত বাইবেলের জয়ধ্বজা সেইখানে উড়ল। আজ পর্য্যন্ত ভারতে যা হয়নি, তা হ'ল—আর্য্যমনীষীদের সাকার ও নিরাকার উপাসনার নির্দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল, সেমিটিক প্রফেটদের মূর্ত্তি ও অমূর্ত্তপূজার দ্বন্দ্বে ভারতবর্ষ মাথা নোয়ালে, ভারতে মূর্ত্তিপূজাদ্রোহ স্থাপিত হ'ল। ব্রহ্মজ্ঞান আব্রহ্মস্তম্ব থেকে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ" বাণী একাধারে স্থগিত ও খণ্ডিত হল। এই ছিদ্রপথে বাইবেল বা য়ুরোপের ধর্ম্ম আমাদের সমাজশরীরে অনুপ্রবেশ করলে। দ্বিতীয় ইন্‌জেক্‌শন দিলেন, কেশবচন্দ্র সেন। এই যে যীশুধর্ম্ম, এটি একটি মস্ত ডাইনামিক ধর্ম্ম, এটি জীবন্ত, জাগ্রত, চলৎ, চালক, নড়ান, নাড়ান ধর্ম্ম। এটি সাত্ত্বিক হিন্দু ধর্ম্মের মত শান্ত, শিষ্ট, উপবিষ্ট নয়। এর সাত্ত্বিকতা বসে থাকতে দেয় না, মালা ঘুরিয়ে দিন কাটাতে দেয় না, বৌদ্ধধর্ম্মের মত ক্রমাগত বলে—"ওঠো, খাড়া হও, যাত্রা করো, প্রচার করো, দুঃখীর সেবা করো, দীনে দয়া করো, বিদ্যা দাও, জ্ঞান দাও, ব্রহ্মের লীলার অনুবর্ত্তন করো, বিশ্বকর্ম্মা হও, যীশুর অনুকরণ করো, পরার্থে আত্মবলি দাও," স্থিতিশীল প্রাণকে গতিশীল করার বারুদ ও বোমায় বাইবেল ভরা, হৃদয়ে নিদ্রিত ভগবানকে জাগ্রত করার মন্ত্রে ভরা। ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদাদেশ জননের খনি বাইবেল। হিন্দুধর্ম্মে নানা পুস্তকে নানা স্থানে যা বিক্ষিপ্তভাবে আছে, তা বাইবেল এক ঘাঁটগাঁট সংহত ভাবে রয়েছে। এই খনির ভিতর মণি আছে। তাতে প্রবেশ করতে পারলে মণিলাভ অবশ্যম্ভাবী। কেশবচন্দ্র দু'হাত ভরে সেই মৃতসঞ্জীবনী মণি তুলে নিয়েছিলেন। সেই মণিস্পর্শে জীবনীশক্তিতে ও কর্ম্মশীলতায় নিজে ভরপুর হ'য়ে দেশকে মাতিয়েছিলেন। এইরূপেই তিনি বাঙ্গালার শরীরে বাইবেলের ইন্‌জেক্‌শন করেছেন। এ কাজ পাশ্চাত্য পাদরীর অসাধ্য ছিল। যে জাতের রুগী, সেই জাতেরই রোজা চাই; ধাত বোঝা চাই। অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে কত অভিনব অনুষ্ঠান কত প্রতিষ্ঠানের তোড়ের ভিতর দিয়ে, শুধু ধর্ম্মজীবনে নয়—সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও কেশব-বাবুর হাতের ঠেলায় কোথা থেকে কোথায় যে বাঙ্গালী গড়িয়ে এসেছে, আজ যদি পিছু তাকিয়ে দেখে, তবে বিস্ময়ের শেষ থাকবে না।

বিধাতার নির্দ্দেশে নব্য বাঙ্গালা প্রথমে ত্যাগ করেছে, তার পরে সার গ্রহণ করেছে। প্রথমে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে এক ব্রহ্মে লীন করেছে, তার পরে এককে আবার বহু ক'রে দেখতে শিখেছে। কেশব-বাবু অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্য দিয়েই এই সামঞ্জস্যের সূত্রপাত করেছেন। প্রথমাবস্থায় দেশের পুনর্জাগ্রত ব্রহ্মজ্ঞান ধর্ম্মসাধনার সহায়ক অনেক কিছু বাহ্য অনুষ্ঠানকে কুসংস্কার ভরে বর্জ্জন করেছিল, শেষাবস্থায়—"কেশবের দল স্বপাক নিরামিষ খায়, গৈরিক পরে, একতারা বাজায়, ঈশ্বরকে হরি, প্রাণপতি, জগদ্ধাত্রী, জননী বলিয়া ডাকে, হরিসংকীর্ত্তনে

যাতে, নাচে এবং এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবীর অর্ঘ্য ঘটায়, পৌত্তলিকদের ব্যবহৃত বস্তু এবং নাম ব্যবহার করে। উপাসনাকালে ব্রহ্মের অষ্টোত্তর শত নাম পাঠ করে ও দীর্ঘ উপাসনা ধ্যানে মগ্ন থাকে।

যদি আরও কিছুকাল জীবিত থাকতেন, তবে হয়ত নবযুগের জনসাধারণ পুই জাতীয় ধর্ম্মদেহের 'নববিধান' নাম তুলে দিয়ে তাকে নববিকশিত সনাতন বিধান বলেই ঘোষণা করতেন।

সত্যের দেশভেদ, জাতিভেদ নেই; তাই সত্যানুসন্ধিৎসু কেশব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শন বা ধর্ম্ম থেকে যা কিছু গ্রহণীয়, তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পাদরী-দীক্ষিত দেশীয় খৃষ্টান বা ভোগবিলাসী সাধারণ বিলাত ফেরতের সঙ্গে তাঁর একটা মস্ত প্রভেদ ছিল। তিনি বড় ইংরাজের বন্ধুত্ব ও সাহায্যের সুযোগ তাচ্ছিল্য করতেন না, কিন্তু না ইংরাজের পদলেহী ছিলেন, না তাঁদের খাওয়া পরার অনুকরণ করতেন। বিলাতেও কোন দিন বিদেশীয় পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করেননি, লণ্ডনের সভাতে—"ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" শীর্ষক বক্তৃতায়, ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজ কর্ম্মচারীর উৎপীড়ন, ইংলণ্ডের আধ্যাত্মিকতার অভাব, ইংরাজ স্ত্রীর বেশবিন্যাসে কৃত্রিমতা প্রভৃতির উপর, যে সব কথা বলেছিলেন, তা'তে সেখানে মহা আন্দোলন পড়ে গিয়েছিল, তিনি হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে স্বদেশানুরাগী ও স্বজাতি পক্ষপাতী ছিলেন; তিনি পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত দেশীয় সদাচার ও সদনুষ্ঠানগুলির রক্ষণশীল ছিলেন, নিজের উদ্ভাবনী প্রতিভাবলে তার মধ্যে নূতনত্ব দিয়ে তাদের সজীব করে তুলতেন, তাঁর এক একটি বক্তৃতায় শ্রোতার হৃদয়ে দেশহিতৈষণা প্রজ্বলিত হয়ে উঠত। সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্বদেশ-প্রেমাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গও যদি আজকালকার কোন নিষ্প্রেমিকের হৃদয়ে পড়ে, তবে দেশ ধন্য হয়। দেশ ভক্তিহীন খৃষ্টভক্ত ভারতীয়েরা মনে রাখিবেন,—যে বিশ্ববন্ধু, সে সর্ব্বাগ্রে দেশবন্ধু—যেমন জাইষ্ট জীসাস্ এবং তাঁর ভক্ত কেশব।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ভারতে হিন্দু ও মুসলমান—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক আর্য্য পাব্‌লিশিং কোং, পি ৫৭ রসা রোড সাউথ, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বর্ত্তমান ভারতে জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যাসমূহের অন্যতম—হিন্দু মুসলমান সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান এক দুরূহ ব্যাপার। বহু শতাব্দি ধরিয়া মুসলমান হিন্দুর পাশে ভাইর মত বাস করিতেছে; তথাপি উভয়ের মিলন আজও ঘটিয়া উঠে নাই; তাহার অন্তরায় অনেক। এ অন্তরায় কি জাতীয়, ইহার দূরীকরণ সম্ভব কি না—এই সমস্ত কথা এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার-মহাশয় চিন্তাশীল সুলেখক; তাঁহার চিন্তায় স্বাধিনতা আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব কি জিনিষ, মুসলমানের মুসলমানত্ব কি জিনিষ, কোনখানে কাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও কোন্‌খানে কাহার হীনতা—গ্রন্থকার তাহা অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি দ্বারা সাধারণের সমক্ষে ফুটাইয়া ধরিয়াছেন। এই সমস্যা সমাধান সম্পর্কে লেখকের আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান। বইখানি সময়োপযোগী; সুতরাং দেশহিতেচ্ছু সকলেরই পঠনীয়।

কবির স্বপ্ন—শ্রীরাধাচরণ দাস প্রণীত। পাবনা রজনীকান্ত পুস্তকাগার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যের আলোচনা ইহাতে আছে। কাব্য আলোচনা, বিশেষ করিয়া 'খেয়া'র আলোচনা, করিতে হইলে যে অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ শক্তি থাকা প্রয়োজন আলোচ্য বইখানির লেখকের তাহার অভাব। সুতরাং বইখানি পড়িয়া আমরা সুখী হই নাই।

অত্যাচারী শাসক—আর্য্য পাব্‌লিসিং কোং, পি ৫৭ রসা রোড সাউথ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা।

মনীষী টলষ্টয় লিখিত Rule by Murder অবলম্বনে পুস্তিকাটি লিখিত। টলষ্টয়ের মানব-কল্যাণমূলক চিন্তার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সুতরাং এই অনুবাদ পুস্তিকাটি সাধারণের নিকট আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লিলাপ্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ)—শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস, চিড়িমারসাই, মেদিনীপুর। মূল্য আট আনা।

রামকৃষ্ণ কথামৃতে ধর্ম্মতত্ত্ব সরল করিয়া বুঝাইবার জন্য রামকৃষ্ণ দেব দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক ছোট ছোট গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক সেই সমস্ত গল্প একত্র করিয়া কবিতার আকার দিয়াছেন। ঈশপের গল্পগুলি যেমন এক হিসাবে মূল্যবান, এ গল্পগুলিও সেইরূপ অধিকতর মূল্যবান। সুতরাং এগুলি একত্র পদ্যে গ্রথিত করিবার কল্পনা ভাল। গ্রন্থকারের পদ্যানুবাদ

মন্দ হয় নাই। মাঝে মাঝে ছন্দের কিছু কিছু দোষ আছে। তবুও বইটি ছেলেদের হাতে দিবার উপযুক্ত।

সত্যের সন্ধানে—শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক—গ্রন্থকার, ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন্, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

বইখানি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধ গুলির সব কয়টিই বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, অধিকাংশ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বইটির নাম হইতেই বুঝা যাইবে যে গ্রন্থকার সত্যের সন্ধানে এ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। জীবনের নানা বিভাগের চিন্তায় সমাজের বিচিত্র ধারায় সত্য কি রূপে অবস্থিতি করিতেছে তাহাই সুন্দর চিন্তাশীলতার সহিত গ্রন্থকার অনুসন্ধান করিয়াছেন। জ্ঞানপিপাসু লোক বইটির মূল্য বুঝিবেন। বাজে একঘেয়ে উপন্যাসের অত্যাচারে বাঙ্গলা সাহিত্য এখন পীড়িত। সুতরাং এরূপ চিন্তাপূর্ণ পুস্তকের এখন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

স্বাস্থ্য কথা—শ্রীমরেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত। স্বাস্থ্য সমাচার কার্য্যালয়, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র বসু মহাশয় বহুদিন ধরিয়া তাঁহার "স্বাস্থ্য সমাচার" পত্রিকায় বাঙ্গালী জাতির শরীর রক্ষা ও শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রচুর মূল্যবান আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এবং ডাঃ চুনীলাল বসুর প্রচেষ্টার ফলে অনেক চিকিৎসক এই কাজে আজকাল মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহারই পত্রিকায় এই পুস্তকটী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এবং ইহাতেই ইহার মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে। পুস্তকটিতে আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, উপাদান, পরিপাক-প্রণালী, গুণাগুণ, মাত্রা নিরূপণ, খাদ্য দোষে রোগভোগ প্রভৃতি অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীর বইখানি পাঠ করা উচিত। স্বাস্থ্য বিষয়ে বাঙ্গালী অপর সমস্ত প্রদেশবাসী অপেক্ষা হীন; সুতরাং এই পুস্তকের সাম্বোন্নতিমূলক আলোচনা বাঙ্গালী সাদরে গ্রহণ করিবে, আশা করি। কিন্তু আলোচনা আরো বিস্তৃত হইলে ভালো হইত।

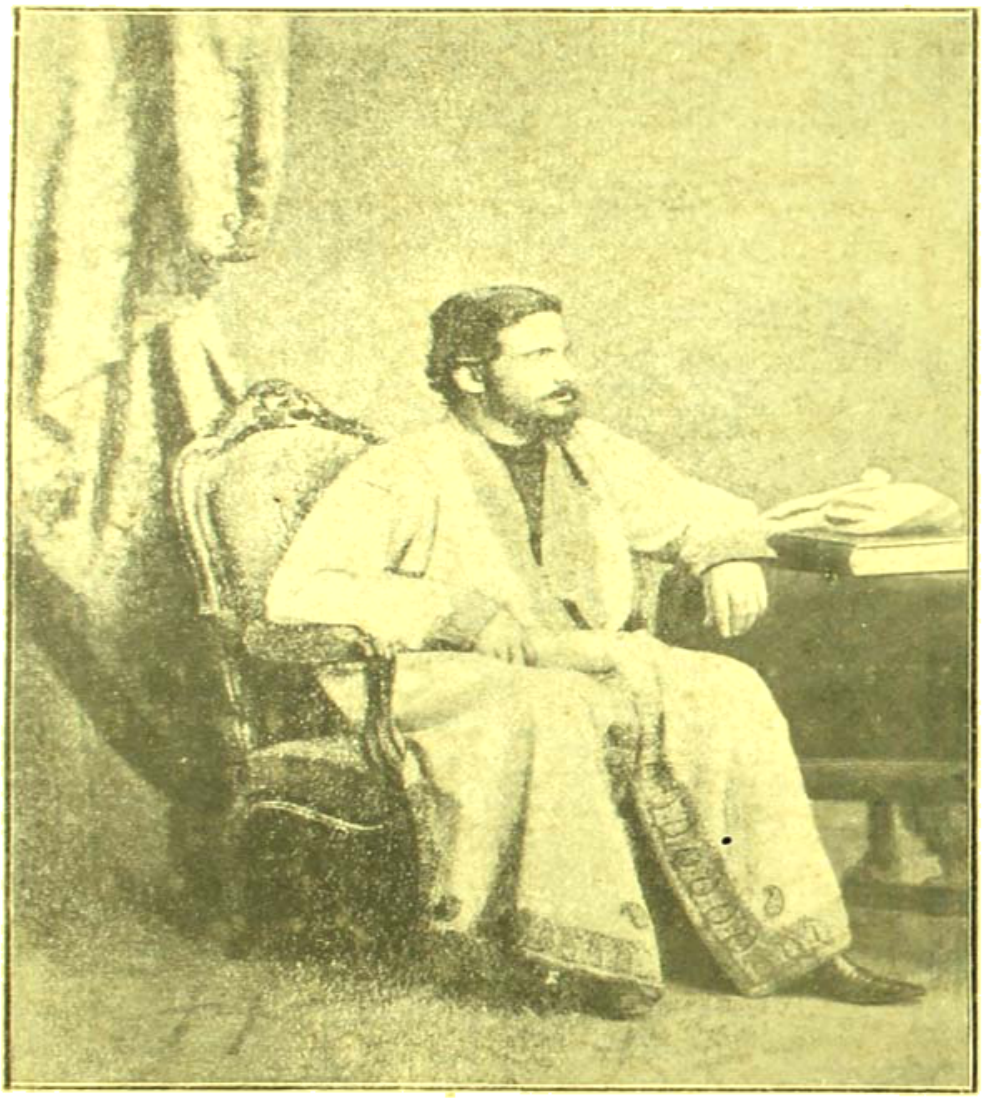

ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা—
৺ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৯শ বর্ষ | ১৩৩২ | মাঘ।

দ্বিজের ত্রিজত্ব।

(৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহাবসানের কয় পূর্ব্বে লিখিত শেষ কবিতা)

কী দেখচি এ! কী করুণা। কী প্রেম! কী স্নেহ!
এমন স্নেহ-করুণা-প্রেম, তাবে নাই কভু কেহ।
যে যন্ত্রণা পাইনু আমি বাঁধা পড়ি গিয়া করমে,
ছাড়িব না চরণ কভু ছাড়িব না কোনো জনমে।
জ্বলছিল হৃদে অহর্নিশি তাপানল অনিবার,
নাহি ঠাঁই সেথায় আজ আনন্দ রাখিবার।
দেখা দিলে নয়নে যেই, বাঁধা পড়ি গেল দিঠি,
যত কিছু মনে আছিল সাধ, মুহূর্ত্তে গেল মিটি।
পাষাণে অঙ্কুরে বীজ, করুণা ধারায় তব,
ত্রিজ জয় দ্বিজ এ দীন, জনম লভি নব।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসন্ত পঞ্চমী।

খেলায় পূজা

(১)

(মনোহর পুকুর বালক সমিতিতে সভানেত্রীর অভিভাষণ)

আজ বসন্ত পঞ্চমীর দিন প্রকৃতির ঘরে মুকুলের জাগরণের দিন। সংসারের ঘরেও তাই বালকদের উৎসবের উপযুক্ত দিন আজ। আজ বালকরা কচিকিশলয়ের সঙ্গে, অফুট কুঁড়ির সঙ্গে, সবুজ পাতার সঙ্গে মাঠে ঘাটে মুক্ত আকাশ তলে পাল্লা দেবে, ছুটবে ছুটবে। আজ বালক সমিতিতে বালকদের মধ্যে এসে বালকদের খেলায় যোগ দিতে আমার তাই ভারি আনন্দ। আজ পৌঢ়া পৃথিবী তার শীতের জরাজীর্ণতা ফেলে দিয়ে আবার নবীন হয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে। মানুষের প্রৌঢ়হৃদয়ও আজ মনের জীর্ণবাস ছেড়ে বালকদের কচিহৃদয়ের আনন্দের সংস্পর্শে আসছে সতেজ হচ্ছে, নূতনতা পাচ্ছে। যুগে যুগে আজকের দিনটি হচ্ছে হলদে পাতার সঙ্গে সবুজের পাকা ফলের সঙ্গে কুঁড়ির মিলনের দিন। বালকদের সভায় তাই আজ আমি সভানেত্রী, গুরুগম্ভীর শুষ্ক উপদেশ শোনাবার জন্য নয়—আমারি ভিতর যে চির-বালক রয়েছে সে তার খেলারসাথীদের সঙ্গে খেলা করবে বলে। আজ সরস্বতী পূজোরও দিন। এই সরস্বতীকে আমরা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বলে শুধু মনে করি। কিন্তু তাত নয়। তিনি শুধু নীরস জ্ঞান দেন না, তিনি সরস প্রাণ ঢেলে দেন। তিনি শুধু বিদ্যার দেবী নয়, তিনি প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তোমাদের সহজে বুঝিয়ে দিই। এই জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি প্রথমে সৃষ্টি করলেন পাঁচটা জড় পাঁচটা জিনিষ—এই জল, বাতাস, আকাশ অগ্নি আর মাটি। তাদের একসঙ্গে মিশিয়ে নানা রকম আকার দিয়ে নানা রকম জীবদেহ তৈরি করলেন। কিন্তু তখনও তারা জড় রইল, তারা নড়েনা চড়েনা, বলে না কয় না। তারপরে সৃষ্টি কর্ত্তা তাঁর প্রাণরূপিনী শক্তি তার ভিতর পুরে দিলেন, অর্থাৎ নিজেই তাদের ভিতর প্রাণ হয়ে প্রবেশ করলেন। তখনই জীবাকার জড়দেহে চৈতন্য এল, দেহের ভিতর দেহী এল। যে প্রাণশক্তি ইনিই সরস্বতী। জীব শ্বাস ও প্রশ্বাসের দ্বারা ক্রমাগত হং—সঃ সো—হম্ এই রকম একটা শব্দ উচ্চারণ করছে। তোমরা নিজেরা এখনি নিঃশ্বাস টেনে আর ফেলে দেখ ঐ হং—সঃ শব্দ শুনতে পাচ্ছ কি না? পাচ্ছ? সেই হংস বাহিনী, অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া বারনকারিণী যিনি, তিনিই প্রাণের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সরস্বতী। তিনি প্রাণ দিয়েছেন বলেই আমরা বেঁচে আছি, শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি। প্রাণের ভিতরেই বল। যার প্রাণ ক্ষীণ হয়। তার বলও ক্ষীণ হয় এত আমরা

দেখতেই পাই। এই যে প্রাণ বায়ু প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে থাকে, প্রাণ চলে গেলেই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়—সেই বায়ুটির পাঁচটা ভাগ আছে। সে পাঁচভাগ শরীরের পাঁচদিকে বিচরণ করে' পাঁচরকম কাজ করে। মুখ্য প্রাণ বায়ু যাকে বলা যায় সে মুখের ভিতর দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজে নিযুক্ত। আর এদের মধ্যে একটি বায়ুর কাজ হচ্ছে বলের সহায়তা করা বলকে ধারণকরা। যে বায়ু মন্দ হলে; অর্থাৎ শরীরে তার অবাধ চলাফেরা বন্ধ হলে বলের হ্রাস হয়—কোন রকম বলজনক কাজ বা খেলা ধূলা আর মানুষে করতে পারে না—যেমন এই ভার তোলা, সাঁতার দেওয়া, দৌড়ণ. লাফান, ঘুঁষো-ঘুষি—কিছুই না। তাই প্রাণের সঙ্গে বলের সঙ্গে বিশেষ যোগ। প্রাণ যত পুষ্ট হয় বলও তত পুষ্ট হয়। আজ প্রাণের দেবীর পূজার জন্যে যেদিন নির্দ্দিষ্ট সেদিন যে তোমরা পরস্পরে বলবীর্য্যের পরীক্ষার উৎসব করেছ সেটীও ভারি সঙ্গত হয়েছে। ভারতের চাই প্রাণ আর বল, প্রাণ আর বল, প্রাণ আর বল। আমাদের দেশের প্রাণের মান্দ্য হয়েছে তাই বলের মান্দ্য হয়েছে, কিম্বা বলের চর্চ্চা হ্রাস হয়েছে বোলে প্রাণের বিকাশ ক্ষীণ হয়েছে। আজ শ্রীপঞ্চমীর দিনে, সরস্বতী পূজার দিনে, বসন্ত উৎসবের দিনে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বালকেরা প্রাণবান্ হোক্, বলবান্ হোক্, শ্রীমান্ হোক্। এই জাতীয় উৎসব গভীর ভাবে জাতীয় প্রাণতার উৎস হোক্। যিনি প্রাণদা বলদা তাঁকে আজ হরিপ্রদানের দ্বারা তুষ্ট করে' নিজেরা পুষ্ট হও। তাঁর হরি আর কিছু নয় পড়াশুনার মাঝে মাঝে খেলা—ধূলা, আনন্দ।

চমৎকার সরল ঠাকুর না তিনি?

শ্রীমতী সরলা দেবী।

তারুণ্যের অভিষেক।

(২)

(চেৎলা বয়েজ হাইস্কুলে সভানেত্রীর অভিভাষণ)

বসন্ত পঞ্চমীর দিন আজ বিশেষ করে' তারুণ্যে সিঞ্চিত হবার দিন। আজ প্রাণের অভিষেকের দিন। সারস্বত সম্মিলনে আজ তোমরা তরুণ বিদ্যার্থীরা যে দেবীর উৎসব করছ তিনি কি শুধু বিদ্যাদায়িনী? এত ছোট করে' তাঁকে দেখো না। তিনি প্রাণের উৎস, প্রাণের প্রাণ তিনি। প্রাণ দেন তিনি। নিখিলে পঞ্চভূত নির্জ্জীব জড় হয়ে পড়েছিল, যেদিন সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর প্রাণশক্তি দেবী সরস্বতীরূপে তাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হলেন সেইদিন চরাচর প্রাণবান হল। যে দেহে প্রাণ নেই, সে দেহে চৈতন্য নেই, জ্ঞান নেই। জ্ঞান ও প্রাণ দুই সখা, দোসর।

কাল আমি একটি বালক সমিতিতে সারস্বত উৎসবে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে আমার

একটি শ্বেতাঙ্গিনী বন্ধু ছিলেন—ভারত-সুহৃদ আমেরিকার বিশপ ফিশারের পত্নী-মিসেস ফিশার। তিনি গাড়ীতে আসতে আসতে পথে অনেক সরস্বতীর প্রতিমা দেখে বলেন—"একবার মিষ্টার গান্ধীর সঙ্গে আমার স্বামীর মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। গান্ধিকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বল্লেন, মূর্ত্তিপূজা তাঁর নিজের পক্ষে চরম সত্য নয় কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তার প্রয়োজন আছে বলে' তিনি তাতে উৎসাহ দেন। সেখানে ভারতের আর একজন মনীষী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বল্লেন 'আপনি নিজে যা চরম সত্য বলে' জেনেছেন সেই সত্যর চেয়ে ন্যূন কোন জিনিষ অপরকে কেন দেবেন? আপনি নিজে যখন মূর্ত্তিতে বিশ্বাস করেন না, তখন অপরকে মূর্ত্তি পূজা করতে কেন প্রশ্রয় দেবেন? গান্ধী নিরুত্তর রইলেন।"

আমি মিসেস ফিশারকে বল্লুম—"এর উত্তর আমার কাছে আছে, শুনুন"। আমার যা বক্তব্য ছিল তাঁকে বল্লুম। সব শুনে তিনি বল্লেন—'আপনি যা বল্লেন সর্ব্বসাধারণ ত এ কথাগুলো জেনে মূর্ত্তিপূজা করে না। অন্ততঃ আপনিত এটা স্বীকার করবেন সর্ব্বসাধারণকে এ সব তত্ত্ব জানান উচিত?"

"তা নিশ্চয়ই স্বীকার করছি।" তারপর সভাস্থানে উৎসব প্রসঙ্গেই সরস্বতীর মূর্ত্তির পার্শ্বে হংস দেখে তিনি আমায় জিজ্ঞেস্ করলেন—"এ হংসের অর্থ কি? সরস্বতীর সঙ্গে হংস কেন?" দুঃখের বিষয় (হিন্দুধর্ম্মে অনভিজ্ঞ) খৃষ্টান মহিলাকে আমায় সেদিন যা বলতে হয়েছিল আজ স্বধর্ম্মে অনভিজ্ঞ হিন্দু যুবকদেরও সেই কথাগুলো বলতে হবে। মাদাম ব্লাভাট্স্কি Isis unveiled বলে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। আমাদের দেবদেবীর মত প্রাচীন মিশরেও অনেক দেবদেবী ছিল, তার মধ্যে একটির নাম—'আইসিস্'। 'Isis unveiled. নামক পুস্তকে আইসিস্ দেবীর নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, তিনি আইসিসের অবগুণ্ঠন খুলে দিয়েছেন। ভারতের দেবদেবীর উপরও অজ্ঞতার যে অবগুণ্ঠন এসে পড়েছে তাকে খুলে ফেলার একান্ত প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে আমাদের গুরুস্থানীয়দের অত্যন্ত কার্পণ্য দৃষ্ট হয়। তাঁরা সর্ব্বসাধারণকে অজ্ঞতার ভিতরেই ফেলে রেখেছেন। জ্ঞানের আলোকপথে তাদের চালাবার প্রয়াস স্বীকার করেন না। তাই ভিন্নধর্ম্মীদের একটুখানি যুক্তিযুক্ত আক্রমণেই আমাদের শ্রদ্ধা থতমত খেয়ে যায়। আমি মিসেস ফিশারকে যা বলেছিলুম তা এই। হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা বাইবেলে উল্লিখিত মূর্ত্তিপূজা নয়। হিন্দুরা তাদের নিজের হাতের সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর বলে পূজা করে না। আমাদের মূর্ত্তিগুলি কতকগুলি ভাবের প্রতীক, সেই ভাবগুলির স্মারক। যেমন ক্রীশ্চানেরা বড় বড় অক্ষরে motto লিখে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখেন, যখনই সেই motto'র প্রতি দৃষ্টি পড়ে, অমনি মনে চিন্তাবিশেষ উদ্রিক্ত হয়, তার ধারা প্রবাহিত হয়—এ সেই রকম। চীনেদের অক্ষর যেমন আমাদের অক্ষরের মত অর্থহীন ধ্বনি নয়, এক একটা অক্ষর এক একটা অর্থসমন্বিত সম্পূর্ণ ভাব—idograph—আমাদের মূর্ত্তিগুলি তেমনি। এ ধর্ম্মজগতে কিণ্ডারগার্টেন, বড় বড় ছবি বা প্রতীকের দ্বারা এক একটা ভাবকে মূর্ত্তিমান্ করা। দুর্গার দশভুজ এই মনে করিয়া দেবার জন্যে যে ঐশ্বরী শক্তি দশদিকে প্রসারিত। ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ এই

চেনাবার জন্যে যে যিনি জগৎস্রষ্টা তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বত্র। সরস্বতী হলেন তাঁর প্রাণশক্তি ও জ্ঞানশক্তি; মূর্ত্তিমতি তাই তিনি জ্ঞানের আধার পুস্তকখানি এবং তিনিই হংসবাহিনী। প্রাণীর প্রাণ প্রাণবায়ুতে নিশ্বাস প্রশ্বাস চালনার অভিব্যক্ত—সেই শ্বাসপ্রশ্বাসের একটা স্বাভাবিক শব্দ হচ্ছে হং—সঃ, সঃ—হম্। তাই প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হংসারূঢ়া, প্রাণী আপনার অজ্ঞাতসারে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে তাঁর অজপা জপ করছে—হম্—সঃ সো—হম্, এই শ্বাস শব্দের দ্বারা। তাই তরুণেরা, আজ তারুণ্যের উৎসবের দিন। আজ প্রাণ-ভরে, ওঠার দিন। প্রাণের পরিচয় কিসে? প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখ। সেখানে প্রাণের পরিচয় প্রথমতঃ গতিতে। আজ পাতার মরমর, বাতাসের ঝর্‌ঝর্। আজ হিমানী গল্‌ছে, ঝরণা চল্‌ছে, তটিনী কুল্‌কুল্—চারিদিকে গতির শ্রী অতুল।

আর কিসে প্রাণের পরিচয়? রসে। রস ও প্রাণ একই কথা। যে দেহে রস নেই, সে দেহে প্রাণ নেই। আজ যে শুষ্কতা ফেলে দিয়ে, নূতন রস টেনে নিয়ে বৃক্ষপল্লব অনুপ্রাণিত হচ্ছে, সেই রসই প্রাণ। যিনি 'রসো বৈ' তিনিই সকলের প্রাণের প্রাণ। তিনিই 'রসো বিষ্ণু'। প্রাণ বলো, রস বলো, একই কথা। রসই প্রাণ প্রাণই রস।

আর কি আছে প্রাণের ভিতর? কিসে তার পরিচয়? আছে বল। বলই প্রাণব্রহ্ম, বলেই তাঁর পরিচয়। যে পঞ্চ প্রাণবায়ু শরীরের কার্য্য করেছে, সেই পাঁচের একটি বায়ু বিশেষ করে বলসহায়ক। যে শরীর বলহীন, তাতে প্রাণশক্তি জীবনীশক্তি ক্ষীণ। যে দুর্ব্বল তার প্রাণ উড়ো উড়ো। যে সবল তারই ভিতর প্রাণ পূর্ণমাত্রায় বিকাশ করে।

প্রকৃতির দিক থেকে এই দেখলুম। এখন মানুষের দিক থেকে কি দেখি? তরুণের পরিচয় কি? তারুণ্যে পাই কি? গতির আবেগ রস ও বলের সঙ্গে সঙ্গে তারুণ্যের আর কি ধর্ম্ম মানুষশরীরে অনুভব হয়? তারুণ্যের ভিতর পাই সরলতা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, কল্পনা, উৎসাহ ও উৎসর্গ। যে তরুণের ভিতর এই সকল গুণের আভাস নেই, সে তরুণ নয়, অকালবৃদ্ধ। যে তরুণস্রোগী নয়, স্বার্থপর, যে-তরুণ সরল নয়, কপট, যে শ্রদ্ধাহীন, শ্রদ্ধাযুক্ত নয়, যার কল্পনাশক্তি নেই, যে অসম্ভবকে সম্ভব বলে করতলগত দেখে না—সে বুড়োর পাকামিতে ভরা, তরুণের কোনও শ্রী তাতে নেই। শ্রীপঞ্চমীর উৎসব তাই—আজকের দিনে আর শ্রীমান হয়ে ওঠার দরকার। গতি ও বল, সরসতা ও সরলতা, উৎসাহ ও ত্যাগ, জ্ঞান ও প্রাণের শ্রীতে ভরে ওঠার দিন আজ। আজ তারুণ্যে দীক্ষার দিন। বাঙ্গালীর এই জাতীয় উৎসবকে যদি সার্থক করতে হবে বাঙ্গলার তরুণেরা আজ তারুণ্যের পূর্ণ অভিষেক গ্রহণ করো। এবং বাঙ্গলার বৃদ্ধেরা যাঁরা সরস্বতীর ভক্ত উপাসক তাঁরাও যেন সর্পের নির্ম্মোকের মত, বৃক্ষের শুষ্কপত্রের মত তাঁদের মনের বৃদ্ধত্ব নীরসতা, ও নিরুৎসাহ ফেলে দিয়ে আজকের দিন তারুণ্য পুনর্গ্রহণ করেন। বর্ষে বর্ষে প্রকৃতির এই নবজীবনগ্রহনের দৃষ্টান্তে নবপ্রাণ, নবোৎসাহ, নববিশ্বাস ও নবভরসা ভরে উঠে চিরনবীনকে নিজের ভিতর অধিষ্ঠিত রাখেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

আমেরিকান সমাজ।

আমেরিকান সমাজ সাম্যবাদী অর্থাৎ সমাজ পদমর্য্যাদার তারতম্যতা হেতু বিভিন্নস্তরে বিভক্ত নহে। এই পদমর্য্যাদার বিভিন্নতার পরিচায়ক নানা প্রকারের পদবী? (titles) লোকমধ্যে প্রচলিত নাই। এক কথায় আমেরিকান লোক সমাজে সকলেই "বরাবর" অর্থাৎ সমান। আর্থিক অবস্থার তারতম্যতাজনিত কোন বৈষম্য সমাজে উপস্থিত হয় না, সামাজিক বিষয়ে সকলেই এক সঙ্গে আহার বিহার করে, বিবাহাদি করে; সকলেরই সমান অধিকার ও দাবী, সকলেই Mr. a gentleman।

আমেরিকান ষ্টেট্ জন-তন্ত্রের উপর সংস্থাপিত এবং ঔপ-নিবেশিক সময় হইতেই তৎকালিন সমাজ সাম্যবাদী। ষ্টেটের constitution সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছে, এইজন্যই আজ পর্য্যন্ত সাম্যবাদের "হাওয়া" এ দেশে বিশেষভাবে প্রবল। যে ব্যক্তি অতি গরীব সেও নিজ অধ্যবসায়গুণে অতি উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিতে পারে এবং প্রেসিডেন্ট পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাহার হীন বংশও সাংসারিক দুরবস্থা, ও শিক্ষার সংকীর্ণতা প্রভৃতি জীবনের উৎকর্ষতা ও সফলতালাভের অন্তরায় হয় না। তৎ-দেশে মানবের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিবার কোন ব্যবস্থা নাই; এইজন্য সকলেই জগৎকে মায়াময় বলিয়া দেখেন না, সকলেই optimist, জগৎকে বিষবৎ বলিয়া কেহ ত্যাগ করিতে চায়না বরং প্রকৃতিকে তাহার অধীনে আনিয়া জগৎকে ভোগ করিতে চায়।

প্রকৃতিরশক্তি সমূহকে বীর্যবলে লইয়া আসিয়া জগৎকে ভোগ কর, মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের প্রতিরোধ বা খর্ব্বতা করা বিধেয় নয়, যত নিপীড়িত ও নির্য্যাতিত লোক সমূহ তথায় আসিয়া নিজেদের মনুষ্যশক্তির প্রস্ফুটন ও উৎকর্ষতার জন্য সাধনা করুক; ইহাই হইতেছে আমেরিকান সাম্যবাদের মূলমন্ত্র; ইহাকেই নবাগত ঔপনিবেশিকদল বলে "americanism"। কিন্তু ইহা হইল আমেরিকান সাম্যবাদের একটি বাঁধাগৎ (established dogma) কাজের বেলায় ইহা কতটা সাফল্যলাভ করে তাহাই এই স্থলে আলোচ্য।

উত্তর আমেরিকার উপনিবেশ সমূহ ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য নির্য্যাতিত, রাজনৈতিক অত্যাচারে প্রপীড়িত, ধনী শ্রেণী দ্বারা নিষ্পেষিত, অর্থ কষ্টে ক্লিষ্ট ইউরোপীয়ান লোক সমূহের দ্বারা সংস্থাপিত। অবশ্য দক্ষিণে (ভার্জিনিয়া প্রভৃতি স্থলে) জনৈকতক ইংরেজ ধনীবংশের বংশধরেরা তথায় cotton plantation স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিল। দক্ষিণের জমি অতি উর্ব্বরা, তথায় তুলারচাষে প্রচুর লাভ হয় এবং এই চাষ করিবার জন্য ইংরেজ ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট

আফ্রিকা হইতে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানি করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে অল্পখরচায় তুলার আবাদ করিবার জন্য যে জনকতক ধনাঢ্যবংশীয় ইংরেজ দক্ষিণে বসবাস করিয়াছিল তাহারাই তথাকার aristocracy রূপে গণ্য হইত। ইহারাই আমেরিকান সমাজের গৌরবেরস্থল যে, ইহাদের দ্বারা ইউরোপীয়ান "আভিজাত্য বংশের রক্ত" তাঁহাদের ভিতরে আসিয়াছে! এই কতিপয় বংশের দ্বারা নাকি anglo-norman আভিজাত্য বংশের রক্ত আমেরিকান সমাজে বহমান হইতেছে এবং ইহারাই আভিজাত্য গর্ব্ব আকাঙ্ক্ষী লোকদের মুখ বাঁচান! আবার অন্যদিকে উত্তরের নব ইংলণ্ডের (New England) ঔপনিবেশিকেরা May flower immigrantsদের বংশধর তজ্জন্য তাহাদের বংশধরেরা তৎস্থানের আভিজাত্যশ্রেণী! ইঁহারা "May flower society," "sons and daughters of may flower" ইত্যাদি নামদিয়া বিভিন্ন সমিতি করিয়া নিজেদের বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁহাদের বংশ তালিকাদি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এক হিসাবে তাঁহারা তথাকার "কুলীন" হইবার চেষ্টা-করেন কিন্তু কার্য্যত অন্য লোক হইতে তাহাদের কোন বিশেষত্ব বা পার্থক্য নাই। আবার বর্ত্তমানের ঔপনিবেশিকেরা উপরোক্তদের পরিহাস করিয়া বলেন যে, may flower এর ঔপনিবেশিকেরা শ্রমজীবি ছিল, তাহারা সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয় কিন্তু আজ যুক্ত সমাজের দশকোটি লোকেই তাহাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছে। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তৎদেশের রাজা প্রথম জেমস্ তথাকার presbyterian দের উপর নারাজ ছিলেন। ইহাদের গোঁড়ামির নাম দেওয়া হইয়াছিল puritanism। এই দলভুক্ত কতিপয় শত লোক যাঁহারা বেশীর ভাগ কায়ীক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা রাজ রোষ হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া অবাধে স্বীয় বিশ্বাস ও বিবেকানুযায়ী ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার জন্য may flower নামক একটি জাহাজে আরোহণ করিয়া উত্তর আমেরিকায় পালাইয়া যান। তাঁহারা ত আবার উত্তর পশ্চিমদিকে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে ক্রমশঃ অনেক ইংরেজ তথায় আসিয়া বাসস্থান করে ও সময়ে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এই সব ইংরেজ ঔপনিবেশিকেরা স্বীয় নব বাসভূমিকে জন্মভূমির নাম অনুসারে নব ইংলণ্ড বলেন। এই জন্যই আজপর্য্যন্ত, Rhode Island, connecticut, vermont, massachusetts প্রভৃতি Statesকে New England বলে। এই স্থানের অধিবাসীরা এককালে বিশুদ্ধ ইংরেজ বংশীয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানযুগে আইরিশ ও অন্যান্য জাতি সমূহ তথায় বসবাস করিয়াছে আর পুরাতন অধিবাসীর অনেকে অর্থান্বেষণে অন্যত্র বাহির হইয়া গিয়াছে। এই স্থান ইংরেজ প্রধান উপনিবেশ ছিল, বলিয়া এইখানকার সর্ব্ব বিষয়ে ইংরেজি আচার বর্ত্তমান, অনেকের উচ্চারণ (accent) ইংরেজের ন্যায়; অনেক সময়ে বাহ্যিক আকারে ইংলণ্ড ও নব ইংলণ্ডের লোকদের পৃথকভাবে চেনা যায়না। নৃতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক starr বলেন যে জলবায়ুর পৃথকতা জন্য উভয় দেশের লোকদের মধ্যে বর্ত্তমানে বাহ্যিক পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদি সম্মত বৈজ্ঞানিক মত নহে।

যাই হউক যত প্রকারের নিপীড়িত ও নির্ধন লোক আমেরিকায় আসিয়া বন কাটিয়া আদিম অধিবাসীদের প্রবঞ্চণা করিয়া, তাড়াইয়া বা মারিয়া জমি দখল করিয়া বসবাস করিয়াছে। স্বভাবতই ইহাদের ভিতর আভিজাত্য বা শ্রেণীগর্ব্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু যখনই গরীব ব্যক্তি ধনী বা নামজাদা হয় তখন সে "হটাৎ বাবু" (nonveau riche) হওয়া জনিত petty—bourgeois psycholgyর দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উচ্চের দিকে তাকায়। সে তখন উচ্চবংশ মর্য্যাদার জন্ত ও সামাজিক সম্মানের জন্ত লালায়িত, নিজেকে সাধারণ শ্রেণী হইতে পৃথক করিবার জন্ত "চন্দ্র, সূর্য্য" হইতে বংশোদ্ভব বলিয়া নিজের বংশতালিকা সৃষ্টি করে এবং নানাপ্রকারে নিজেকে উপরিস্তন শ্রেণীতে উত্তোলিত করিবার জন্ত চেষ্টা করে। এই মনঃতত্ত্ব প্রণোদিত হইয়াই গরীব আদিম ঔপনিবেশিকদের বর্ত্তমান বংশধরগণ পরবর্ত্তী ঔপনিবেশিকদের উত্তরাধিকারীগণ হইতে সমাজে বেশী সম্মানলাভ করিবার জন্ত নানা প্রকারের সমিতি স্থাপন করিয়া নিজেদের বিশিষ্টতা জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করে। এবমপ্রকারে, যাহাদের উত্তরপুরুষেরা জাতীয় স্বাধীনতা সমরে ও পরবর্ত্তী অন্তঃযুদ্ধে (civilwar) যোগদান করিয়াছিল তাহারা "sons and daughter of the revolution" প্রভৃতি সমিতি করিয়া নিজেদের বংশের বিশিষ্টতা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু প্রাচীন ঔপনিবেশিক সময়েও তৎপরবর্ত্তীকালে বংশ বাধনের তারতম্যতার জন্ত সমাজে বাঁধাবাঁধি বিভিন্নস্তর যথা; শ্রেণী (class) বা জাতি (caste) গঠিতে পারে নাই। ঔপনিবেশিকেরা ইউরোপের আভিজাত্য তন্ত্র (aristocracy) বা সামন্ততন্ত্র (Feudalism) নবজগতে প্রতিষ্ঠিত করে নাই কারণ বেশীর ভাগ লোকই নিম্নশ্রেণী সম্ভূত। আর দুই চার জন যে দক্ষিণে "বড়বংশের" ছেলে ছিল তাহারাও নবদেশে নিজেদের পার্থক্য রাখিতে পারে নাই। তৎপরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর "মুড়ি মিছরির একদর হইয়াছিল"। " Declaration right of men" সকলকেই সমান করিয়াছিল। ইহার পর বাকি থাকে, মুষ্টিমেয় সুইডিস্, জার্ম্মাণ, ডাচ ঔপনিবেশিকের দল; তাহাদের ঔপনিবেশ সমূহ ইংলণ্ড কর্ত্তৃক বিজিত হইলে তাহারা কালে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সহিত মিশিয়া যায় যদি ৬ আজ পর্য্যন্ত Penoylvanuia তে জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকদের বংশধরেরা জার্ম্মাণ ভাষার কথা কহে। ইহাদের জার্ম্মাণকে plat dentoch (low-german) বলে; ইহা জার্ম্মাণের গ্রাম্য ভাষা। ইহাদের গ্রামে গিয়া কেহ ইংরেজিতে কথা কহিলে তাহারা অবাক হইয়া বলিবে যে "সে বিদেশী"। এই ঔপনিবেশিকদের মধ্যে আর একটি দল সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা প্রথমে সমাজের বাহিরে থাকে; ইহারা ক্রীতদাসের দল শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ক্রীতদাস প্রথা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টেই তথায় প্রচলিত করে, সেইজন্ত অনেক আমেরিকান উক্ত গভর্ণমেণ্টের উপর অনুযোগ করে। শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসেরা ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহী কয়েদীদ্বারা গঠিত হইত। এই বিদ্রোহিদের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণের তুলার আবাদিদের কাছে বিক্রয় করিত। তৎপরে অনেক গরীবশ্বেতাঙ্গ স্বদেশ হইতে ক্রীতদাসরূপে বা indentured labour রূপে দক্ষিণে আনীত হইত। শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসেরা কিন্তু জীবনের শেষ দশায় মুক্তি লাভ করিয়া শ্বেতাঙ্গ

সমাজে মিশ্রিত হইয়া যাইত, আর কৃষ্ণকায় নিগ্রোক্রীতদাসেরা মুক্তি পাইত না এবং রং ব্যবধানের জন্য চিরকাল পৃথক থাকিতে বাধ্য হইয়া বর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে! এবমপ্রকারে আমেরিকার যুক্ত সম্রাজের ভিত্তি পত্তন হইয়াছে।

এই প্রকারের সমাজের প্রথমাবস্থায় বেশীর ভাগ লোকই কৃষিজীবি ছিল। যত দিন দেশ কৃষি প্রধান ছিল তত দিন সমাজে বৈষম্যের উৎপাদন হয় নাই। তৎপরে ঔপনিবেশিকদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় নূতন জমির অন্বেষণে alleghamy পর্ব্বতমালা উল্লঙ্ঘণ করিয়া দলে দলে অসম-সাহসিকের দল পশ্চিমে মিসিসিপি উপত্যকার দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। ইহাদের pioneers বলিত; ইহারা নবস্থানে গিয়া আদিম অধিবাসীদের মারিয়া বা তাড়াইয়া জঙ্গল কাটিয়া বসবাস করিতে লাগিল। ইহাদের সঙ্গে এবম প্রকার চরিত্রের নবাগত ইউরোপীয়ান pioneers রাও জুটিতে লাগিল। যাঁহারা ফরাসী De To equville এর "আমেরিকায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামক পুস্তকে বিবৃত এই pioneer দের জীবন সংগ্রামের কার্য্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বোধগম্য করিবেন যে এবমপ্রকারের সমাজে সাম্যবাদই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু যতই দেশ সমৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল, ব্যক্তি বিশেষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই সমাজে অল্পে অল্পে বৈষম্যের রেখা প্রকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্বেতজাতি সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্বাঞ্চলে বস বাস করে। আমেরিকান চর্চ্চা এই পূর্ব্বদিকেই প্রথমে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়, এই চর্চ্চা ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বংশধরদের দ্বারাই উৎকর্ষ সাধনলাভ করে। তথায় যখন জনকতক বংশের মধ্যে অপরিমিত ধনের সঞ্চার হইল, তখন তাহারা নিজেদের নির্ধন উত্তর পুরুষদের বিবরণ বিস্মৃত হইয়া গিয়া ইংরেজি সামাজিক চাল গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ইহারা ইংলণ্ডে আসিয়া তথাকার রাজদরবারে প্রবেশলাভ করিতে চেষ্টা করে। অর্থের সাহায্যে ইহারা ইংলণ্ডের আভিজাত্য বর্গ মধ্যে মিশিতে আরম্ভ করে, আর অনেক দেউলিয়া ইংরেজ ও ইউরোপীয় আভিজাত্য শ্রেণীর লোক এই আমেরিকান "নূতনধনীর"কন্যা বিবাহ করে। এই প্রকারে ইউরোপের শ্রেণী ও জাতি বৈষম্য প্রধান সমাজের ছায়ায় আসিয়া আমেরিকান ধনীরা স্বদেশে শ্রেণীবিভাগ স্থাপন করে। ইহার ফলেই পূর্ব্বে New port সমাজের সৃষ্টি এ স্থলে কোটিপতি নিজেদের বাসস্থল করিয়াছেন, নিজেদের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে সামাজিক আদান প্রদান করেন এবং সুবিধা পাইলে ইংলণ্ডের আভিজাত্য বংশের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন।

মানবসমাজে আর্থিক বৈষম্যতার জন্যই শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং এই শ্রেণী বিভেদ পুরুষপরম্পরায় দৃঢ় ও বংশগত হইলে জাতি caste বিভেদে পরিণত হয়। তদ্রূপ আমেরিকায় ধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় পুরাতন সাম্যবাদ বিনষ্টপ্রায় ও অনেকস্থলে বিনষ্ট হইয়াছে। যেখানে ব্যক্তি বিশেষ নিজের সৎ বা অসৎ উপায়ে অবাধে ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহা "স্বীয় সম্পত্তিতে" পরিণত করে ও তাহার তেজে নিজেকে মূল্যধনী capitalistরূপে রূপান্তরিত করিয়া অন্যকে শোষণ Exploit করে সেই capitalist লক্ষণাক্রান্ত সমাজে আর্থনীতিক তারতম্যের জন্য সামাজিক বৈষম্যের উদয় হয়। তথায় ধনীরা উচ্চশ্রেণীর লোক আর নির্ধনেরা তদধীনশ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হয়। এই

আর্থনীতিক কারনেই আমেরিকার সমাজে বিভিন্নস্তরের আবির্ভাব হইয়াছে যথা—ধনকুবেরের শ্রেণী, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও নির্ধন কায়িক শ্রমজীবিশ্রেণী।

সাধারণতঃ এই বলা যাইতে পারে যে আমেরিকার শ্বেত সমাজে caste এর আবির্ভাব এখনও হয় নাই, যদিচ শ্বেতকায় ও কৃষ্ণ কায় আমেরিকানদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য জনিত caste সৃষ্ট হইয়াছে। এই উভয় দলের মধ্যে কোন প্রকারের সামাজিক ও আহারাদির আদান প্রদান নাই; এস্থলে এই বিভেদ দৃঢ় ও বংশগত হইয়াছে অতএব এস্থলে জাতি বিভাগ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সমাজে কি এবম্প্রকারের "জাতি বিভাগ" উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এই স্থলে বিবেচ্য। যখন Newport এর এবং তাহার বাহিরের ধন কুবেরেরা সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক সম্বন্ধ নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে সংকীর্ণ করিয়া গণ্ডীবদ্ধ করেন, যখন এই সমাজের কোনও ব্যক্তির কন্যা গরীবের ছেলের সহিত স্বেচ্ছায় বিবাহ করিলে সেই কন্যাকে আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ত্যক্ত্য হইতে হয় তখন এই বংশগত শ্রেণী বিভাগকে caste বলা ব্যতীত অন্য নামে অভিহিত করা যায় না। অবশ্য আমেরিকার নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে ইউরোপের সামন্ত তন্ত্রিক সমাজের (feudelist society) ন্যায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে connubial (পরস্পরের বিবাহের অধিকার) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ রহে। আমেরিকান সমাজ Bourgeois প্রধান সমাজ) অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লব যে সাম্যের আদর্শ দেখাইয়াছিল তাহাতে feudalism ভাঙ্গিয়া bourgeois (মধ্যবিত্ত) শ্রেণীর আধিপত্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকান সমাজ সেই আদর্শে পরিচালিত। আমেরিকান বিপ্লবের সময় এই আদর্শকেই সাম্যবাদীর আদর্শ বলিয়া বিবাহ হইয়াছিল আর ফরাসী বৈপ্লবিকদের মধ্যে তাহার ঢেউ আসিয়া পড়ে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধান আমেরিকান সমাজে প্রথম হইতেই feudalism এর বীজ ছিলনা; সকলেই খাটিয়া খায়, সকলেই Gentleman বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু কালে আর্থনীতিক প্রভেদ বশতঃ সমাজশরীরে ধনী ও নির্ধনীর আবির্ভাব হইল, সে অবস্থায় ধন প্রধান মূলক সমাজে (Capitalistic society) শ্রেণী বিভাগ অপরিহার্য্য। তৎপরে আধুনিক কালে ধনের গরমে ধনকুবেরেরা snobs হইয়াছেন। তাঁহাদের উত্তর-পুরুষদের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন; অনেকেই "চন্দ্র, সূর্য্য" হইতে বংশোৎপত্তির তালিকা সৃজন বা আবিষ্কার করিতেছেন আর গরীবদের সঙ্গে Connubial স্থাপনে অনিচ্ছুক। অবশ্য অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত বংশ যথা: - উকিল বা ডাক্তারের সঙ্গে, বিবাহাদি ধনকুবেরেরা করিতে পারেন কিন্তু তাহা প্রেমেরই রূপ স্বরূপ রূপে দৈবাৎ ঘটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে একটি ঘটনা উল্লিখিত হইতে পারে; ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত কোটি পতি—একজন ডাক্তারের কন্যাকে মনোনিত করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য বাগদত্তা হয়েন। এ বিবাহটা একটু অসাধারণ ভাবে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ইহা সংবাদপত্রে অধিকভাবে আলোচিত হয়। প্রথমে কোটিপতি তাঁহার প্রথমা স্ত্রী হইতে বিবাহবন্ধনে (ডিভোর্স) বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন কিন্তু নিউইয়র্কের আইন অনুসারে কারণত দিয়া দ্বিতীয় বার দার গ্রহণের জন্য যে ব্যবধান সময় উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন তাহা এস্থলে হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ পাত্রী

১৮ বৎসরের কন্যা ও পাত্র ৪০বৎসরের উর্দ্ধে ৫০সের কাছাকাছি এবং পাত্রী এক সামান্য ডাক্তারের কন্যা। এমন অবস্থায় এবিবাহে "প্রেম" কতটা লীলা করিয়াছিল তাহা সন্দেহের স্থল! সংবাদপত্রের লোকেরা যখন এই পাত্রীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল তিনি উত্তরদান করেন যে তিনি ধনের লোভে নহে প্রেমের জন্যই বিবাহ করিতেছেন। আবার অন্য দিকে Newport এর একজন প্রধান সামাজিক নেত্রী মিসেস-ম (যিনি আর একজন কোটিপতির স্ত্রী) তিনি সংবাদ পত্রের রিপোর্টারকে বলিয়াছিলেন যে "আমি জানিনা মিঃ এ, কি দেখিয়া ইহাকে বিবাহোচ্ছুক (What did me A Saw in her!) তবে জানিনা সমাজ এই পাত্রীকে কিভাবে গ্রহণ করে, মিঃ এর টাকা আছে, বজরা (yacht) আছে ইত্যাদি, জানিনা সমাজ ইহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবে।" এইপ্রকারের অনুলোম বিবাহ জাতি বৈষম্যের ততটা পরিচায়ক নহে কারণ এই দৃষ্টান্তের পাত্র ও পাত্রী উভয়েই কুর জোড়া সমাজ-ভুক্ত। ঐ আমেরিকান পাত্রটী ইউরোপীয় থিউডলে বংশোদ্ভব নহে সেই জন্য বৈষম্য বিশেষ-ভাবে প্রকাশ হইতে পারে না। যে শ্রেণী বৈষম্য এই স্থলে দৃষ্ট হয় তাহা পত্রের অর্থদ্বারা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু একটি প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত দিতেছি যাহাদ্বারা জাতি বৈষম্যের প্রকটতা স্পষ্টই প্রতীত হয়। ১৯১৩ খৃঃ সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে উক্ত Newport সমাজের এক অনূঢ়াকন্যা তাহার পিতার chaffeur এর সঙ্গে পলাইয়া (elope) লুকাইয়া বিবাহ করিয়াছে! সংবাদপত্রে আরও প্রকাশ যে কন্যার পিতা ও মাতা এ সংবাদ পাইবামাত্র দুইদিকে মোটরগাড়ি করিয়া বাড়ীর মেয়েকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়াছিল, কিন্তু পলাতকেরা অন্য রাস্তা দিয়া এক গ্রামে গিয়া সেই রাত্রেই তথাকার ধর্ম্মযাজককে নিদ্রা হইতে উত্তোলন করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছে! যখন উভয়ে ধর্ম্মমতে গির্জ্জায় গিয়া স্বামী ও স্ত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইল তখন গুরুজনের আপত্তি আর চলিতে পারেনা! এই ঘটনা আমেরিকান সমাজে বড়ই হুলুস্থুল পড়ে! কন্যার গুরুজনের মুখ হেঁট হয় যে তাহাদের বাড়ীর চাকরের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ হইল! এক বৎসর বাদে সংবাদ পত্রে প্রকাশ পায় যে উক্ত কন্যা পুত্রবতী হইয়াছে ও পিতামাতার সহিত পুনর্মিলন হইয়াছে কিন্তু কন্যার স্বামীকে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে কখনও গ্রহণ করিবেনা, অর্থাৎ সে স্ত্রীর পৈতৃক সমাজে কখন গৃহিত হইবে না! এই প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত কি আমেরিকায় বীজ রূপে caste system এর পরিচায়ক নহে? তৎপর আর একটি দৃষ্টান্তদিই যাহা আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি। আমি বষ্টনে একটি শিক্ষিতা মহিলার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম যিনি প্রতিলোম বিবাহ করিয়া পিতৃভবন হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। ইনি একজন ধর্ম্মযাজকের কন্যা কিন্তু একজন অজ্ঞ আইরিশ চাকর শ্রেণীর লোককে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া পিতার গৃহ হইতে পরিত্যক্তা হইয়াছেন! অবশ্য আমেরিকায় প্রাচীন রোম, মধ্যযুগের ইউরোপ বা ভারতের ন্যায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে Connubial (বিবাহের অধিকার) অপ্রচলিত নহে বলিয়া এই Caste-system হিন্দুদের মতন দৃঢ় হইতে পারে নাই ও প্রতিলোম বিবাহ প্রসূত সন্তান মাতার আত্মীয়দের দ্বারা

তাহা হয়না। আমেরিকায় বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক যুবতীদের মধ্যে বিবাহের ইচ্ছায় পাত্র বা পাত্রী মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার নিয়ম আছে, আর আইন কোন কোন স্থানের নিগ্রো, ভারতবাসী, আদিম অধিবাসী, চীনা ও জাপানী ব্যতীত সকলকার মধ্যে অবাধে বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে সেই জন্য Caste system যেতাঙ্গ জাতির মধ্যে অতটা দৃঢ়ীভূত হইতে পারিতেছে না যদিচ উপরোক্ত দৃষ্টান্ত গুলিতে দেখাযায় যে ইহার বীজ সমাজে নিহিত হইয়াছে। একবার কোনও আমেরিকান শিক্ষিতা মহিলার সহিত ভারতের জাতি বিদ্বেষের আলোচনা কালে আমি New Port সমাজের রীতির উল্লেখ করিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে আমেরিকায় যে "জাতিভেদ" আছে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই কিন্তু Newport এর দৃষ্টান্ত দেখাইলে অগত্যা স্বীকার করিলেন যে হাঁ, আমেরিকার সমাজে কতিপয় ব্যক্তিরা ভূস্বামী হইয়া নিজেদের মধ্যে একটি Casis সৃষ্টি করিতেছে! অবশ্য সকলেই বলেন যে ইহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, আর বিশাল আমেরিকান সমাজ সাম্যবাদী। আর আমেরিকান সাম্যবাদ বুঝিতে হইলে পশ্চিমে যাইতে হইবে যথাকার লোকেরা ঘোর সাম্যবাদী। পশ্চিম অপেক্ষাকৃত সাম্যবাদী কারণ উপনিবেশ তথায় নূতন হইয়াছে ও এখন ও হইতেছে। তাহারা pioneer দের বংশধর। সকলেই কুলীমজুরের সন্ততি, কৃষিজীবিকা সম্বল, কাযেই তাহারা সাম্যবাদী! তথাকার সমাজ আবার প্রাচীন হইলে কি আকারে পরিণত হয় তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

আমেরিকান সমাজ সাম্যবাদী বলিলেই কেহ না বুঝেন যে তাহা নহে; সকলেই সমাজের এক মঞ্চে অধিষ্ঠিত আছেন। কোনও মানব সমাজ homogeneous নহে; তাহা নানা শ্রেণী নানা স্তরে ও গণ্ডীতে বিভক্ত। আমেরিকা সাম্যবাদী অর্থে তথায় সকলকার সমান রাজনীতিক অধিকার আছে, 'one man one vote" প্রথা তথায় প্রচলিত। ইহার জোরে একজন কুলীর সন্তান নিজের অধ্যবসায় গুণে দেশের প্রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার হীন বংশে উদ্ভব হেতু ঘটনা তাহার রাজনীতিক ও অর্থ নীতিক জীবনের উন্নতির অন্তরায় হয় না, দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রেসিডেণ্ট Andrew jackson নিরক্ষর ছিলেন ও Garfiled গরীবের পুত্রছিলেন। কিন্তু সমাজে যথার্থ সাম্যতা থাকিলে পরস্পরের মধ্যে যে প্রকার সমবেদনা, সহানুভূতি সমবায় ও আর্থিক সামঞ্জস্য থাকে যাহার ফলে সকলেই স্বীয় গুণানুসারে যথাসম্ভব উচ্চে উঠিতে পারে আর কেহ কাহাকেও ধ্বংশ করিবার চেষ্টা করে না, আমেরিকান সমাজে তাহার অত্যন্ত অভাব! এ সমাজে ধনীরা কোটিপতি হইয়া বিলাসে গড়াগড়ি দিতেছেন আর অন্যদিকে নির্ধনেরা দারিদ্রে নিষ্পেষিত হইতেছেন। আর্থিক অবস্থা ভেদে সমাজে উভয় প্রকারের লোকের স্থানেরও তারতম্য হইতেছে, অতএব কি প্রকারে বলিতে পারা যায় যে সমাজে যথার্থ সাম্য আছে? আমেরিকান সমাজে আজকাল ধনীর জয়জয়কার তাহার ক্ষমতা অসীম, সে গভর্ণমেণ্টকে গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, যুদ্ধ বিগ্রহাদি তাহার স্বার্থানুদিত হইয়া ঘটিতেছে, সে বিশ্বাপীঠ স্থাপন করিয়া নিজের স্বার্থানুযায়ী দর্শনের প্রচার

করিতেছে, তাহার ভয়ে কেহ মুখ খুলিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে পারে না, তাই বলি এ যেন capitalist প্রধান সমাজে সাম্য কোথায় ?

আমেরিকান জাতীয় শরীর উপরোক্ত প্রকারে ধনী ও ধনহীনে বিভক্ত। তৎপরে গণ্ডীর ভিতর আবার নানাপ্রকারের গণ্ডী আছে যথা :—অবস্থাপন্ন মধ্যবিৎ শ্রেণীদের এক সমাজ, অবস্থাহীন অথবা কারিকর দল (mechanics) প্রভৃতি যাহাদের গরীব মধ্যবিৎ শ্রেণীভুক্ত বলা যায় তাহাদের এক সমাজ ; তৎপর গরীব ও মজুরদের পৃথক সমাজ। এই সমাজের অর্থ এই যে, লোকেরা নিজেদের সমযোগ্য ব্যক্তিদের সহিত সামাজিকভাবে মেলামেশি করে। ধনীর গণ্ডীর ভিতর কুলীর বাড়ীর লোক আসিয়া সামাজিকতাও আহারবিহারাদি করিতে পায় না ; আবার প্রথমোক্তের সমাজে গরীব মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের সহবাস পোষায় না, সে সেস্থলে fish out of water (খাপছাড়া) রূপে প্রতীত হয়। আবার অন্যদিকে বুরজোয়ার সমাজে কুলীর বাড়ীর লোকের স্থান নেই ! কিন্তু আমেরিকান সমাজে ইউরোপীয় "Feudalism" বা হিন্দুর "caste" এর গন্ধ নাই বলিয়া গরীবের ছেলে যখন ক্রোড়পতি হয় তখন সে তাহার পূর্ব্বশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া ধনকুবেরের শ্রেণীভুক্ত হয় ও ধনীদের সহিতই তাহার দহরম্ মহরম্ চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধনকুবের হারিম্যান ও এনড্রু কারনেগী প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। অর্থের মাহাত্ম্যে ইহাদের পূর্ব্বস্মৃতি ও বংশগৌরব অভাবের "কালীমা" সবই চাপা পড়িয়া যায়। অবশ্য ইহারা বহু ক্রোড়পতি বলিয়া জগতের সর্ব্বত্রই ইহারা সম্মানিত হইয়াছেন। কিন্তু আর যে সব nouveau riche ২।৪ মিলিয়নপতি তাহাদের অবস্থা কিরূপ ? এই বিষয়েই একবার আমার কোন আমেরিকান বন্ধুর বাড়ীতে আলোচনা করিতেছিলাম ; ইহাঁরা অবস্থাপন্ন মধ্যবিৎ শ্রেণীভুক্ত পেশায় উকিল ও সামাজিক ব্যক্তি। আলোচনাকালে আমি বলিয়াছিলাম যে nouveau riche এরা স্বকীয় উপার্জ্জনে একপুরুষে ধনী) কি সমাজ পায় না ? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছিলাম যে অমুকের wholesale grocery store আছে, সে ২ মিলিয়নপতি, তাহার স্ত্রী ইংলণ্ডের উচ্চ সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে ও রাজ দরবারেও গমন করে, আর অমুকের Beer factory আছে, সে জার্ম্মানি হইতে কপর্দ্দকশূন্য ঔপনিবেশিকভাবে আমেরিকায় আসিয়াছিল। এক্ষণে সে ৬ মিলিয়নপতি ; ইহাদের কি সমাজের উচ্চস্তরে গ্রহণ করা হয় নাই ? ইহার উত্তরে গৃহস্বামী আমায় বলিয়াছিলেন "হাঁ, ইহাদের সমাজ আছে কিন্তু কি প্রকারের সমাজের সহিত ইহারা আদান প্রদান করে ?" আমার বন্ধুবংশ নব-ইংলণ্ডের একটি প্রাচীন ঔপনিবেশিক বংশ এবং ইংলণ্ডবিজেতা নর্ম্মাণ william the conqueror এর ধ্বজ বাহকের বংশধর বলিয়া গরিমা করে। অর্থ হিসাবে এই বংশের কর্ত্তা উপরোক্ত দুইজন ধনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট কিন্তু বংশ গরিমার মাহাত্ম্যে নিজেকে সমাজের "কুলীন" বলিয়া গণ্য করেন, কারণ নবইংলণ্ডে (বষ্টন প্রভৃতি স্থানে) আভিজাত্য গৌরব নির্দ্দোষ বংশতালিকা ও বিদ্যাগর্ব্বের উপর নির্ভর করে।

ইহাতে প্রতীত হয় যে পূর্ব্বাঞ্চলে বংশগৌরব কেবল ধনের উপর নির্ভর করে না, যে সব প্রাচীনবংশ সমূহ আর্থনীতিক অথবা অন্যান্য কারণ জন্য বহুকাল হইতে অসম্মানিত হইয়াছে তাহারা সমাজে "কুলীনত্ব" প্রাপ্ত হইয়া তজ্জনিত বিশেষত্বের দ্বারা নিজেদের লোকমধ্যে গৌরবান্বিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। এখানে এক গণ্ডীর মধ্যে আর এক গণ্ডী আর এক গণ্ডী অঙ্কিত হইয়াছে, এক সমাজ চক্রের ভিতর আবার বিভিন্ন ক্ষুদ্র চক্র গঠিত হইয়াছে।

এইরূপে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ সমাজে প্রথমে আর্থনীতিক তারতম্যানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর (Class) উদয় হইয়াছে আবার এই বৃহত্তর শ্রেণীর মধ্যে বংশমর্য্যাদা, বিদ্যাগরীমা, পেষা ইত্যাদি লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজচক্রের উদ্ভব হইয়াছে। বাহির হইতে লোক বলিবে যদ্যপি আমেরিকায় পদমর্য্যাদাসূচক শ্বেতাব সমূহ (Titles) নাই ; সকলেই মিষ্টার ; সকলেরই সমপ্রকারের অধিকার ও দাবী ; স্বীয় ক্ষমতা ও বুদ্ধি অনুসারে স্ব স্ব জীবনকে সফল করিতে পারে, এবং জাতীয় জীবনের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে ; তৎপরে শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে অবাধে পরস্পরের সহিত বিবাহের আদান প্রদান ও একত্র ভোজন (Connubial and Commeasality) প্রচলন আছে অতএব "সাম্যবাদ" তথায় বর্ত্তমান ! একজন ইউরোপীয় এশিয়াবাসীর নিকট এই সব অনুষ্ঠানগুলি সাম্যবাদের পরিচায়ক হইতে পারে কারণ তাহাদের দেশে ইহার অত্যন্ত অভাব, কিন্তু আমেরিকার সমাজ শরীরে প্রবেশলাভ করিয়া তাহার প্রত্যেক অঙ্গকে তন্নতন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিলে পর্য্যবেক্ষকের অন্য ধারণা হইবে।

আমেরিকার তথাকথিত সাম্যবাদ অষ্টাবিংশ শতাব্দীর চিন্তাপ্রসূত। ফরাসী বিপ্লবে তাহার উৎকর্ষতা লাভ করে। এ যুগের সাম্যবাদের মূলমন্ত্র ছিল যে প্রাচীন বংশানুক্রমিক আভিজাত্যবর্গকে (Feudal aristocracy) বিনষ্ট করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমাজের হর্ত্তা-কর্ত্তারূপে উত্থান করান। সাম্য, উপরিস্থর ব্যক্তিদের সহিত করিতে হইবে অর্থাৎ রাজা, শ্বেতাবওয়ালা আভিজাত্যের দল স্বীয় উচ্চাসন হইতে অবতরণ করিয়া উকিল, ডাক্তার ব্যবসায়ী-দলের সহিত একমঞ্চে বিবাহ করিবে। তৎকালীন সাম্যবাদ অর্থে ইহাই ছিল ; কিন্তু এ সাম্যবাদ নিম্নস্তর কৃষিজীবি ও শ্রমজীবিদের উপর ব্যবহৃত হইবে না ! তাহাদের সহিত সমতা সম্ভব নহে কারণ তাহারা "ছোটলোক" ! ফরাসী বিপ্লবের প্রাগ্‌কালে abbe sieyeis "What is Third Estate (তৃতীয় শ্রেণী কি ?) নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহাতে ফরাসী বিপ্লবের দর্শনশাস্ত্র ও উদ্দেশ্য এক কথায় বিবরিত করা হইয়াছে। তিনি ইহাতে বলিয়াছিলেন যে যদি ফ্রান্সের আভিজাত্যবর্গ (Feudal aristocracy) পঞ্চাশ হাজার পালক বিলম্বিত শিরস্ত্রাণ পরিহিত, অশ্বারোহি ফ্রাঙ্ক (Frank) বিজেতৃবর্গের বংশধর বলিয়া জগতের সমস্ত সুখ সম্ভোগের অধিকারী বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে তাহারা জার্ম্মানীতে ফিরিয়া যাউক (বিজেতৃ ফ্রাঙ্কেরা জার্ম্মাণজাতীয় ছিল) আমরা তাহাদের চাহি না ; তৃতীয় শ্রেণী (মধ্যবিত্তশ্রেণী যাহা তৎকালে ফ্রান্সে উদ্ভব

হইয়াছিল) সব (Third Estate is everything), অর্থাৎ "দেশ" অর্থে ইহাদেরই জ্ঞাপন করে, ইহারাই ফ্রান্সের সমাজ ও সমস্ত সম্পদের অধিকারী! আর পদদলিত চতুর্থ-শ্রেণী (Prolexariat) যাহা দ্বারা মধ্যবিত্তশ্রেণী স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইল তাহাদের দাবী হইল Directory গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়ন দ্বারা grape-shot গুলি দাগিয়া ভাগাইয়া দিল! যাহাই হউক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাম্যবাদ (bourgeois democracy) উনবিংশ-শতাব্দীর অর্দ্ধ সময় পর্য্যন্ত ইউরোপের এবং সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আদর্শ ছিল। ইহারই ফলে ইউরোপে feudalism ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যায় ও প্রত্যেকেরই সমান অধিকার, প্রত্যেকেরই স্বীয় শক্তি অনুসারে জীবনকে উন্নতি করিতে পারে, পরস্পরের সহিত অবাধে বিবাহ চলিতে পারে ইত্যাদি। (One man one vote, career is open to all) নবভাব আনয়ন করে। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাম্যবাদ ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেও ধনের আধিপত্য সমাজ হইতে নিরাকরণ করিতে পারে নাই, বরং প্রাচীন বংশগত আভিজাত্যশ্রেণীর প্রাধান্য নষ্ট করিয়া ধনী শ্রেণীর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, এই জন্যই জনতন্ত্রের নামে আমেরিকায় ধনতন্ত্র (Plutocracy) বিরাজ করিতেছে! এই মধ্যবিত্তশ্রেণীতন্ত্র বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতে Capitalism আনয়ন করিয়াছে, সাম্যের নামে নির্ধনদের নিষ্পীড়ন ও লুণ্ঠন করিতেছে; সাধারণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিবার জন্য one man, one vote নামক সম্মোহনের সৃজন করা হইয়াছে, জনসংঘকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও "আমার দেশ" (My country right or wrong) প্রভৃতি জাতীয়তার বাঁধাবুলি, বীর্য্য জন্মাইবার জন্য শেখান হইতেছে—আর যাহারা কায়িক শ্রমদ্বারা ধন উৎপাদন করিতেছে তাহারা পরিশ্রমানুযায়ী পারিশ্রমিক চাহিলে, তাহাদের ভাগ্যে lockout আর প্রয়োজন হইলে পুলিশ ও সিপাহি ডাকিয়া গোলাবর্ষণ করিয়া, আর্থনীতিক ন্যায্য বিচারের (Economic justice) প্রার্থনার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইতেছে। ইহারই ফলে, আমেরিকায় একদিকে ধনীরা ভোগবিলাসের নিমজ্জিত আছে, আর অন্যদিকে গরীব ধনবিহীনেরা কষ্টে দিনযাপন করিতেছে। ইহারই ফলে—অনেক অর্থনীতিবিদের মতে—আমেরিকার জাতীয় ধন (National wealth) যাহা একশত বিলিয়ন বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহা দুইজন বংশেতে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে। ইহারই ফলে—আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদদের মতে সমাজে একদিকে upper fourhundreds (উপরের স্তরে কেবলমাত্র চারিশত লোক ভোগবিলাস করিতেছে) আর সর্ব্বনিম্নে submerged tenth (দশমাংশ একেবারে নিমজ্জিত অর্থাৎ জগতের দুঃখ হইতে তাহাদের উদ্ধারের কোন উপায় নাই) বিরাজ করিতেছে। আর এই ঘোর বৈষম্যের ফলে সমাজে সোসালিষ্ট, কমুনিষ্ট, আনার্কিষ্ট, Industrial workers of the world, শ্রমজীবি সংঘ প্রভৃতি গরীব ও পতিতদের উদ্ধার ও আর্থনীতিক ন্যায্যতার ও বিচারের জন্য নানাপ্রকারের আন্দোলন উদয় হইয়াছে; সমাজশরীরে শ্রেণী-সংগ্রাম (Class struggle) ঘোরতর বেগে চলিতেছে। গরীবেরা সাম্যবাদকে যথাযথরূপে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য সামাজিক

সাম্যবাদের (Social democracy) আদর্শগণ সংঘের সম্মুখে ধরিতেছে আর বলিতেছে :— আমরা সাম্যবাদ এ জগতে আনয়ন করিতে চাই, সমাজে তাহার প্রয়োজন। তাই বলি আমেরিকায় সাম্যবাদ কোথায়? লোকে যেখানের সাম্যবাদের অনুসন্ধান করে, তথায় ধনের প্লুটিয়ার প্রাধান্য দেখে, তাই পর্য্যবেক্ষক বলে সাম্যবাদ কোথায়?

আমেরিকা অষ্টাবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সাম্যবাদ মূর্ত্তিমান করিয়াছেন, কিন্তু সেই সাম্যবাদ রাজনীতিক সাম্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তথাকার নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের ক্রম-বিকাশের ফলে ও ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সমাজশরীরে বৈষম্যের উদয় হইয়াছে। (আজ ধনতন্ত্র সে দেশ শাসন করিতেছে) ধনীরই জয় ও প্রাধান্য; সমাজ ও শাসনযন্ত্র তাহাদ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারই ধনিয়াদি শ্রেণীস্বার্থ (Vested class interest) সাধিত করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। এক্ষণে যে কোন ব্যক্তির ক্রোড়পতি হইবার সুবিধা আর নাই; ধনের উৎপত্তি স্থলসমূহ লোক করকবলিত হইয়াছে তাহার ফলে ধনীই ধনশালী হইতেছে, গরীব জীবন-ধারণের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ব্যয়ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে আর মধ্যবিত্ত-শ্রেণী চাকরি বা পেশাগতপ্রাণাঃ হইয়া ত্রিশঙ্কু রাজার ন্যায় মধ্যভাগে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাই সাধারণ অবস্থা।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দত্ত।

বিদ্যোত্তমা।

(নাটক)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(স্থান রাজবর্ত্ম, বৃক্ষ সমাকীর্ণ ফলোদ্যান। বৃক্ষ-শাখায় আসীন হইয়া কালিদাস সেই শাখাই কুঠার দ্বারা ছেদন করিতেছে।)

কালিদাস। হতভাগা বামুন আমায় তাড়িয়ে দিলে! বল্লে কি না, পয়সা নেই যার সে মরেনা কেন? কেন আমি মরবো বলো দেকি? মরলেতো আর ভাত খেতে পাবো না? আবার বল্লে,—বারমাস পরের ঘায় ভেঙ্গে খেতে একটু লজ্জা করে না? কেন আমার লজ্জা করবে? আমি কি কারু ঘাড় ভেঙ্গে খাই যে আমার লজ্জা করবে? আমিতো ভাত খাই, রুটি খাই, তা কেনা খায়? সবাইতো খায়। যত দোষ আমারি ব্যালা? বলে 'পয়সা আন্ ভাত খা'। কেন সবাই কি পয়সা এনে ভাত খেতে বসে? হ্যাঁ আন্‌বে তাই! ঐতো আমি চালের বাতায় বসে বসে দেখি ওর বামনি মাগি এক কাঁসি করে ভাত বেড়ে হাঁষ্ হাঁষ্ করে গোগ্রাসে সব গিলে ফেলে, সেকি কখন ওকে পয়সা দ্যায়? ছাই, ছাই, কক্ষনো দ্যায় না। তবে শুধু আমার ব্যালাই বা অ্যাতো ট্যাকা, ট্যাকা, পয়সা, পয়সা ক্যানো? ফুঁদে, ফুটে ওর ব্যাটা ছুটো করে ক'টা পয়সা ওকে এনে দিয়েচে ও বলুক দেকি? তার ব্যালায় ব্যাটা কানা। চারচক্ষু কেবল আমারই ব্যালায়! আচ্ছা, আমিই তেমনি। এইযে আমায় বলেচে কাঠ কেটে বেচে পয়সা নে' আয়! তা এই দেখ না কত কাঠ কাটি [বৃক্ষশাখায় কুঠারাঘাত] এই কাঠ কাটবো এই আটি বেঁধে বেচ্‌বো, ট্যাকা নে' এসে বুড়ো মিন্‌সের মাথায় ছড়্ ছড়্ করে' ফেলে দিয়ে এক খানা আমোট কলার পাত পেতে ভাত খেতে বসে যাবো। আর তো তখন কেউ কিছু বল্‌তে পারবে না [আহ্লাদে জোরে জোরে কুঠারাঘাত করিয়া] হা-হা-হা, কেমন মজা,—কেমন মজা!

আন্‌বো কেটে পাত, কলার পাত্ খাবো ভাত,
পয়সা পাবে, খুসী হবে, বেরিয়ে যাবে দাঁত, (এদের) বেরিয়ে যাবে দাঁত।
দেবেনা কেউ ভাতের নাড়া,—আন্‌বে মেখে বেগুনপোড়া,
হাপুস্ হুপুস্ নেবো খেয়ে লঙ্কা দিয়ে সাথ
উঠ্‌তে মুখে নাম্‌তে পাতে ভেরে যাবে হাত, দখিন হাত।

(দেবদত্ত, ভবদেব, চিদ্‌বিলাস প্রভৃতির প্রবেশ।)

দেবদত্ত। অপমান! নারীর হাতে এত বড় অপমান! সর্ব্বশরীর যেন এই তীব্র অপমানের জ্বালায় রাত্রিদিন জ্বলে যাচ্ছে! যেদিন সেই গর্ব্বিতা রাজকুমারীর সগর্ব্ব তাচ্ছল্য ব্যবহার প্রাপ্ত হয়ে তার হাতে সভামধ্যে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এসেছি, সেদিন থেকে এ জীবন যেন বিষম ভারগ্রস্ত মনে হচ্ছে। এতবড় ঘৃণিত জীবন ধারণ করতেও যেন আর ইচ্ছা যাচ্ছে না, তোমরা ফিরে যাও ভবদেব, আমি আর এ পরাজিত মুখ দেশের লোককে দেখাতে পার্ব্বো না, বারানসীধামে গমন করে সবার অজ্ঞাতভাবে জীবন যাপন কর্ব্বো এই স্থির করেছি।

ভবদেব। কেন তুমি এমন করচো? বলেছিতো যে শিক্ষামদোদ্ধতা নারী নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সকলকে এমন করে অপমানিত করচে তাকে এর জন্য অনুতাপিত না করে আমি দেশেও যাবো না, কোথাও যাবো না। নিজের চেয়ে পাণ্ডিত্য যে কা'কেও দিতে প্রস্তুত নয়, নিজের বিদ্যার গৌরবে সে সারা জগৎকে তুচ্ছতার অবজ্ঞায়, চেয়েও দেখে না তার কি শাস্তি দিতে হবে জানো? না, সে তোমরা আন্দাজ করতে পার্ব্বে না। তাকে জগতের মধ্যে সবচেয়ে একটা মহা মূর্খের সঙ্গে পরিনীতা করাতে হবে। তবেই তার কৃতকর্ম্মের সামান্য কিছু ফল তাকে দেওয়া যাবে।

দেবদত্ত। [সাগ্রহে] ভাই ভবদেব! তোমার এ পরামর্শ যে বড়ই সুন্দর হয়েছে তা' আমিও স্বীকার করচি। যে মহামহা পণ্ডিতগণকে এতকাল ধরে ঘোর অবজ্ঞায় একবার চোখের কোণেও ফিরে চায় নাই, তার পক্ষে এইই সমুচিত হত! যদি না তোমার একপেনা একান্তই অসম্ভব হতো তা'হলে আমি আনন্দের সঙ্গেই এ বিষয়ে চেষ্টা করতাম।

ভবদেব। তুমি এতে অসম্ভব কি পেলে শুনি? দেখ দেবদত্ত, কর্ম্মার আগে কোন কাজকেই অসম্ভব মনে করতে নেই। চেষ্টা যত্নে এ জগতে কোন কর্ম্ম কবে না কার দ্বারা সু-সাধিত হয়েছে? অতএব পরাক্রমশালী বীরবর রাবনের পক্ষকে সামান্য বানর-বাহিনী নিয়ে জটাধারী রামচন্দ্র যদি বিপুল উদ্যমে আক্রমণ না ক'রে অসম্ভব বোধে দূরে পিছিয়ে থাকতেন তাহলে কি তাঁর সীতা উদ্ধার হতো, না সমস্ত মহামহা রাজাদের পরাভূত হতে দেখে পরাভবের লজ্জায় জড়সড় হয়ে সরে থাকলে অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করতেই সমর্থ হতেন? চেষ্টা—যথাসাধ্য চেষ্টা করে একবার দেখতে দোষকি? আর সেই চেষ্টার মূলে ধরে রাখতে হবে বিশ্বাসের দৃঢ়তা। সর্ব্বান্তঃকরণে মনে করতে হবে,—হবে, পারবো, নিশ্চিত জয় কর্ব্বো।

দেবদত্ত। (সানন্দে ভবদেবের হাত ধরিয়া) ভবদেব, বন্ধু! তোমার উৎসাহে আমার মনও আবার উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ছে। এসো বন্ধু সবাই মিলে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা একজন মূর্খের অনুসন্ধান করি।

কালিদাস। [সশব্দে বৃক্ষশাখায় কুঠারাঘাত করিতে করিতে] 'কাটবো কলার পাত খাবো ভাত' হা হা হা, কি মজা! কি মজা! খাবো ভাত, খাবো ভাত।—

দেবদত্ত। [ঊর্দ্ধে চাহিয়া] একি! কেএ? এতবড় মূর্খ এ কে? এযে দেখছি যে গাকে অবলম্বন করে' আছে তাকেই কর্ত্তিত করচে, শাখা মৃগেরাও যে এর চেয়ে বুদ্ধিমান।

ভবদেব। দেবদত্ত! এই ব্যক্তিই কি আমাদিগের অন্বিষ্য বস্তু নয়?

দেবদত্ত। হাঁ ভাই যথার্থ বলেছ! এর মতন নির্ব্বোধ আর বোধ হয় দ্বিতীয় খুঁজে মিলান যাবে না। ওখানে কি হচ্ছে মহাশয়! একবার অনুগ্রহ করে নেমে আসুন না।

কালিদাস। [সজোরে ডাল কাটিতে কাটিতে] বেরেনা কেউ ভাতের নাড়া, আনবে মেখে বেগুন পোড়া।

ভবদেব। বাঃ বাঃ, চমৎকার গলা, চমৎকার গান যে তোমার বন্ধু! তা একবার নেমে এসে শোননা, দুটো কথা বলি।

কা। নাঃ আমি নামবো না কাঠ কেটে হাটে বেচে পয়সা দেবো পেটভরে ভাত খাবো।

ভব। ভাত খাবে? তুমি ভাত খাবে! তা বেশতো আমার সঙ্গে এসোনা? আমি তোমায় ভাত খাওয়াব, শুধু ভাত নয় মোণ্ডা, মিঠাই যত তুমি খেতে পার দুহাতে ভরে ভরে দেবো, যাবে?

কা। [সহর্ষে] হ্যাঁ, যাবোনা আবার! খু-উব যাবো। [বৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া অবতরণ] হ্যাগা! কখন যাবে, এক্ষুনি চলোনা, আমি ভাত খাবোনা মণ্ডা খাবো।

দেব। চমৎকার! ভবদেব! ভবদেব এ এক অতি আশ্চর্য্য পদার্থই আজ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হলো! কোথায় সেই বিদ্যামদগর্ব্বিতা সর্ব্ব-বিদ্যাবিভূষিতা মহীয়সী নারী আর কোথায় এই মূর্খ-কুলতিলক নরপশু? কিন্তু সখে! একি প্রতিশোধ উঃ না না, কিসের মমতা? সেই নারীকৃত আমাননার মহাজ্বালার এই উপযুক্ত প্রলেপ! বিদ্যাভিমানিনী ধৃষ্টার এই সমুচিত দণ্ড! কি বল চিত্ত বিলাস? তুমি নীরব কেন? বাক্সখা! তোমার কি মত?'

সঙ্গিগণ। আমরা সকলেই এবিষয়ে এক মত কিন্তু এ অঘটন ঘটিবে কিরূপে?

ভবদেব। সেজন্য তোমরা চিন্তিত হয়োনা, শুনছতো বিদ্যোত্তমার পিতা মহারাজ আমাদিগের সপক্ষ হইতে স্বীকৃত হয়েছেন। সভাপণ্ডিতেরাও এবার আমাদের সাহায্য করিতে সম্মত। এই সুযোগ এই মহামূর্খকে আমাদিগের গুরু, মৌনী মহাপুরুষ পরিচয়ে ইঙ্গিত-বিচারে জয়ী করাইব। ওরে, তোর নামকি?

কালিদাস। আগো, আমি কালিদাস,—

ভবদেব। বেশ বেশ! আয় আমাদের সঙ্গে আয়, কিন্তু একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বি, তোকে যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে গিয়ে তুই একটীও কথা কইবিনা, কিছুতেই না, শুধু যখন তোকে সভায় বসিয়ে একজন মেয়ে এসে বসবে, আর তোকে আঙ্গুল দেখাবে, তখন তুই তাকে বদলা আঙ্গুল দেখিয়ে দিবি, তারপর বাকি যা'কিছু করতে হবে সে সব আমি বুঝেসুঝে রাখব। এ সহে, এসো,—এখন শ্রীহরি স্মরণকর পুনর্যাত্রা করা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—অন্তঃপুর, কাল-সায়াহ্ন।

বিরহরস খচিত পর্য্যঙ্কোপরি বিস্তোত্তমা অর্দ্ধ শায়িতা।

(সখীদিগের প্রবেশ ও গীত।)

হাসে চাঁদ হাসে যামিনী—
কেন একাকিনী বিষাদিনী বসি স্বজনী ?
ওই, শুন বাজে বাঁশী!
আকাশে বাতাসে হাসা-হাসি,—
হের, জ্যোৎস্না আলোকে প্লাবিতা ধরণী,
—ঐ হের স্বজনী!
হের, জলে স্থলে,
হাসে দলে-দলে,
যত, কুসুম কলিকা বিচিত্র বরণী,
তারা সৌরভে সৌরবে ভরয়ে অবনী,
তুমিও স্বজনী,
হাসগো তেমনি,
ফুল্ল কুসুম কায়া, সুবিমল বরণী,
কেন, একাকিনী বিরহিনী বসে আছ অমনি!

বিস্তোত্তমা। যাঃ ছ্যাবলামী করবার তোরা যেন আর জায়গা পেলি না? আমায় আবার 'বিষাদিনী' কোথায় দেখলি বল্‌তো শুনি? আর 'বিরহিনী'ই বা আমি হ'তে গেলাম কিসের দুঃখে? কার জন্ত বিরহ হ'বে, যে আমি বিরহিনী হবো? আমার যে, প্রিয়তম তার বিরহ সহ্য করবার দরকার হয় না, সে আমার বাপের ঘরে অজগরাকারে বর্ত্তমান রয়েছে, জনৈক সখী। ঐ পুথি তো? ঐতেই তোমায় মাটী করে ফেলেছে! এখনও ওদের ছাড়, না হলে শেষটায় বাল্মিকী মুনির মতন সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদনে উই ঢিপির পাহাড় গজাবে! ভাল চাওতো ওদের এখনও ছেড়ে দাও। (সহাস্তে) গজায় গজাবে, কবিগুরু বাল্মিকীর মতন বিস্তোত্তমা। যদি অমর নাম রেখে যেতে পার্ত্তুম, আর আমি চাইতুম কি? (সদীর্ঘশ্বাসে) ভগবান এত দিয়েও ওই খানেই যে আমায় মেরে রেখেছেন! কবিতা যে আমার সঙ্গে বিমাতা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, মহাকাব্য লেখবার দুরন্ত তৃষা আমায় মনে প্রাণে দগ্ধ করলেও সে সাধ মিটবার নয়! (গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন) বেশতো, বেশ একটী কবি দেখে বিবাহ কর, সখী, তাহলেই ও সাধটীও আর অপূর্ণ থাকবে না। স্ত্রীলোকের তো স্বামীর পরিচয়েই গৌরবের পরিচয় তুমি মহাকবি না হলে কবি পত্নী বলেও যে জগতে চির-পরিচিতা থাকতে পারবে

বিত্তোত্তমা। কেন আর ময়ার উপর খাড়ার ঘা মারিস্ বল্লরী! দেশে কি সে রকম মহাকবি কেউ আছেন যে যিনি আমার পণে জিতে নিয়ে কবি-পত্নীর অমর গৌরব প্রদান করতে পারবেন, দেশ-বিদেশের যিনি যেখানে ছিলেন, সবারই বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড়খানা দেখা গেল, এখন চুপচাপ ঘরে বসে নিজের কাজ করে যাওয়া যাক্, পদ্য কাব্য না পারি, একখানা সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ এখন করে লিখে রেখে যাব, যা আমার আগে পরে কেউ কখন কোন দিন মনের কোণে কল্পনাও করতে পারেনি!

(মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লি। ভর্ত্তৃদারিকে। পরম ভাগবত রাজাধিরাজ আপনাকে জানাতে আদেশ করলেন যে, সে দিন যে কেরল দেশীয় পণ্ডিতবর্গ আপনার নিকট বিচারে পরাস্ত হয়ে, ভগ্ন মনে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, তাঁরাই আজ আবার তাঁদের শিক্ষাগুরু অদ্বিতীয় পণ্ডিত প্রবর মহাকবি কালিদাস কাব্যকে সঙ্গে করে পুনর্বিচারার্থ আগমন করেছেন। এই পণ্ডিতরাজটী এক্ষণে মৌনী হইয়াছেন, ইনি ইঙ্গিত দ্বারা বিচার করবেন। তারপর পণে যদি তাঁর বিজয় লাভ ঘটে তবে বিবাহের পরদিন বিরাট সভা আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার স্বরচিত মহাকাব্য তিনি স্বমুখে সকলকে শ্রবণ করাবেন। আপনি যদি এই বিচার জন্য ইচ্ছুক থাকেন তবে প্রস্তুত হোন, অথবা যদি ইহাতে ভরসা না করেন তবে—

বিত্তোত্তমা। পিতাকে গিয়া নিবেদন কর যে তাঁর আশীর্ব্বাদে তার প্রিয়কন্যা কোথাও ভরসা বিচ্যুত হয়, আমি এখনই প্রস্তুত আছি।

বল্লরী। মল্লিকে! এই পণ্ডিতটী কি বয়োবৃদ্ধ এবং কুদর্শন?

মল্লি। (হাসিয়া) আজ্ঞে ঠিক ইহার বিপরীত! এত অল্পবয়সে কেমন করিয়াই যে ইনি এমন সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী হইয়াছেন, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। রূপেও ইহাকে কালিদাস না বলিয়া সরস্বতীর মানস পুত্র বলা উচিত, একেবারে কন্দর্প মূর্ত্তি! রাজাধিরাজকে সংবাদ জ্ঞাপন করি। [প্রস্থান।

বল্লরী। সখি! কুমারী! এতদিনে বুঝি তোমার কবিপত্নী হওয়ার সাধ মিটতে চল্লো! দেখো ভাই! এমন সুযোগকে ব্যর্থ হ'তে দিয়ে যেন চিরকাল ধরে আপশোষে খুন হয়ো না। ভাল করে এবার হেরে গিয়ে জয়ী হয়ো। এই হারেতেই জেনো ভাই সত্যিকারের বিজয়, মহাকবি, মহাপণ্ডিত আবার কন্দর্পকান্ত তরুণ পুরুষ! এ যোগাযোগ কি ছাড়তে আছে।

বিত্তোত্তমা। (স্বগত) কি জানি এই সংবাদটা হঠাৎ কেন আমার মনটাকে এমন করে উতলা করে দিলে? তরুণ পুরুষ আর কন্দর্প কান্তি দেখে দেখে তো জন্মাবধি চোখ ক্ষয়ে গেল! তার জন্য আমার কিছুমাত্র এসে যায় না, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরও দেশে দুর্ভিক্ষ দেখ্‌ছিলে, সেও অনেক দেখলেম, অনেক ঘাটলেম—শ্রদ্ধা হলো না, বাকি ঐ মহাকবি শব্দটাতেই বোধ করি মনের মধ্যে আজ সর্ব্বপ্রথম এই হারমানবার সাধটা বেগে উঠ্‌ছে। ভগবান! সব

দিলে তো ঐটুকুতে বঞ্চিত রাখলে কেন? তা'হলে তো আর এই দাস জাতীর দানীর স্পৃহা মনে জাগতে পারতো না?

বরদা। কি ভাবছো ভাই? বুঝেছি এইবার আমাদের বিজয়িনীর বিজয় ভেরীর স্বর রুদ্ধ হয়ে এসেছে। জয় হোক তোমার মহাকবি! যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, তোমার যশোগাথা সপ্তদ্বীপা ধরাতলে বিঘোষিত হোক! ওলো তোরা এমন শুভ মুহূর্ত্তে একটা গান গেয়ে নে, দেখ, সখীর আমার অটল আসন আজ টলেছে।

গীত

টলেছে অটল আসন, আর করিনে' আর করিনে' আর করিনে' ভয়,
অবলা ছিলে যখন,—করেছ করেনে'ছ শতেক জনে জয়,
ফিরেছে ছাওয়া এবার, এসেছে দিন শোধটী নে'বার
দিয়ে যাও যা' দিয়ে যে'বার ভুলোনা ভুল করোনা, দিন কি সমান রয়?
এসেছে সাধনের ধন, সগর সেঁচো মাণিক রতন,
ভুলে নাও করে' যতন,—হেরে যাও তারই কাছে হার্‌তে কিসের ভয়?
হার্‌লে এবার বিজয় তাতেই (ভয় ক'রোনা হার্‌তে সখী) হারেই এবার জয়!

[গাহিতে গাহিতে বিদ্যোত্তমাকে লইয়া প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজসভা

রাজা, ও সভাসদবর্গ, কৌষেয় বস্ত্রাবৃত কালিদাসকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া কন্দর্প গর্ব্বিত দেহ ভবদেব দেবদত্ত প্রমুখ বহুতর অবমানিত পণ্ডিতবর্গ উপবিষ্ট।

[সুসজ্জিতা বিদ্যোত্তমার সখীসহ প্রবেশ ও পিতৃ উদ্দেশ্যে প্রণাম]

রাজা। বৎসে! পরমেশ্বর তোমার প্রকৃত মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করুন।

বিদ্যোত্তমা। [স্বগতঃ] আঃ কি ভিড় করেছে দেখ। কই, মহাকবি আমার কোথায়? কি বিপদ! কিছুই যে দেখা যায়না? অথচ কি জানি কেন, ওদিকে চাইতেও একটু লজ্জা লজ্জা বোধ করছি! নাঃ এতো ভাল লক্ষণ নয়, নিশ্চয় আজ কপালে হার লেখা আছে দেখছি! কবির নামেই এই, দর্শনে না জানি কিই হয়। ঐ যে মেঘাপাতে শরচ্চন্দ্রের মতই তাঁর দীপ্ত মূর্ত্তি চোখে পড়লো না। এর কাছে হেরেও সুখ! অতবড় পণ্ডিত, মহাকবি অথচ মুখ দেখে কারসাধ্য, বল্‌বে? যেন একটী সরল কোমল বস্ত-শিশু! কেমন মৃদু মৃদু হাসছেন! আর কি আপনা ভোলা ভাবে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন! এমন কি যে

সে একজন পারে? সাধ্য কি? তারা দেখবে সেই, অথচ সেটা লুকিয়ে আড় নয়নে।—না; একেই বলে কবি! কবি না হ'লে কি এমন সরস হয়। (প্রকাশ্যে) বলনা করি কবি!

ভবদেব। (স্বগতঃ) ওষুধ ধরে এসেছে! কবিনামে রাজকন্যার মনে ভাব লেগেছে! ভাগ্যে সভাপণ্ডিত মশাইটী সেদিন কথার কথায় রাজ কন্যার এই কাব্যাকাঙ্ক্ষার কথাটা বলে ফেলেন, তখনই মাথায় ঢুকলো যে 'মহাকবি কালিদাসাচার্য্য দ্বারা কার্য্যসাধন হ'তে পারে। আচ্ছা এখন দেখা যাক। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! আজ আপনার নিকট আমাদের সর্ব্বদেশ-পূজ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য কবি-সম্রাট গুরুদেবকে আমরা আনয়ন করেছি। তবে বড়ই দুঃখের বিষয় ইনি এক্ষণে মৌনী তাই ইঙ্গিত-বিচারে অদ্বৈততত্ত্বালোচনা দ্বারা একে পরাভব করিতে হইবে। কি বলিবো যদি এঁর মৌনাবলম্বন না থাকতো, তবে ইহাঁর রচিত সুললিত পদ্যাবলী দ্বারাই বিচার কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারতো, কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্য, তবে ঈশ্বর যদি দিন দেন, কবিগুরুত্বেরও উপরে যে ইহাঁর আসন উর্দ্ধে বিস্তৃত হচ্ছে তাহার প্রমান আমরা আপনার কাছে প্রদান করিয়া তবেই এখান হ'তে বিদায় গ্রহণ করিবো।

বিদ্যোত্তমা (সংশঙ্কিত মুখে) তাহাই হোক অর্থাৎ যদি আপনাদের পক্ষ জয়ী হয় তখনকার কথা বলছি,—তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিচারের অনুমতি দান করুণ, আর বৃথা বিলম্বে প্রয়োজন কি?

দেবদত্ত। (স্বগতঃ) মাছ জালে পড়েছে! সে বিদ্যোত্তমা আর নাই! সেদিনকার যে সমস্ত গর্ব্বাভঙ্গী, উদ্ধত বচন চাতুরী, আর আজ কণ্ঠরুদ্ধিমায় ব্রীড়াবনতমুখী, কম্পিত কণ্ঠা, ঔৎসুক্য-অধীরা, বিনীতা, হায় নারি! জানো না আজ মণিহার বোধে স্বেচ্ছায় তুমি নিজ কণ্ঠে কি তুচ্ছ অস্থিমালা তুলিয়া লইতেছ দুর্ব্বিনীতে! তোমার তীব্র অবহেলায় কি অমোঘ দণ্ড, প্রদান করতে এসেছি, তাহা ভাবিতে গেলে আমিই যেন জ্ঞান হারা হইয়া পড়িতেছি! ওই চারু দেহলতা ওই অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ মস্তক আজ শ্মশান-কুক্কুরের পদতলাশ্রয়ী হবে! যজ্ঞের পবিত্রকাষ্ঠ অপবিত্র চণ্ডালের হস্তে অর্পিত হলো; যখন ঐ মৌনমুকে মুখাধামের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারবে, তখন জীবন তোমার কি অসহনীয় পরিতাপে অসহ্য হ'য়ে দাঁড়াবে, আজ আমি যেন তার কল্পনাও করতে পারিনা—না না পারি বই কি। যেদিন তোমার হস্তে পরাভূত ও অকথ্য অপমানে অপমানিত হয়ে এ জীবন আমার অসহনীয় বোধ হয়েছিল, সেদিনের কথা কি এরই মধ্যে ভুলেগেলাম না কি! না না এই তার উপযুক্ত প্রতি শোধ!

ভবদেব। উত্তম! আপনারা এইবার বিচার আরম্ভ করুণ!

বিদ্যোত্তমা। একটী অঙ্গুলী প্রদর্শন (একমেবাদ্বিতীয়ম্ তিনি এক্ এবং অদ্বিতীয়)

কালিদাস [একটী অঙ্গুলী দ্বারা একটী চোক গালিয়া দিবে, অতএব আমিও উহার দুইটী চোখেই আঙ্গুল দিয়া দিতে সক্ষম এই সঙ্কেতার্থে] দুইটী অঙ্গুলী প্রদর্শন।

সভাস্থ সমুদয় পণ্ডিতবর্গ। [সমুৎসুক্যের সহিত] ঠিক ঠিক! পরব্রহ্ম এক

অদ্বিতীয়ই বটেন, কিন্তু তখন তিনি সমস্ত মানসগোচর, তাঁর সেসময়কার অবস্থা ল'য়ে তো তর্কই চলতে পারে না, সেতো অস্তি নাস্তির অতীতাবস্থা জীব ও ঈশ্বর এই দ্বৈতাবস্থায় নেমে এলে হবেই না বিচারারম্ভ! আবার এদিকে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দ্বৈতকে না মান্‌লেও সৃষ্টিকে মানা চলেনা, অতএব এক্ষেত্রে শুরু দেরই জয়ী হইয়াছেন।

বিদ্যোত্তমা। তিনটী অঙ্গুলী প্রদর্শন করিলেন, অর্থাৎ সত্ত, রজ, তম এই গুণত্রয় দ্বারাই জগতের সৃজন পালনাদি বিবর্জ্জিত হইতেছে, ব্রহ্ম নিজে নিষ্ক্রিয় হইয়া আছেন।

কালিদাস। [ভাবিলেন আঙ্গুল ও যতই দেখাক না কেন, আমি বৃহতের দুইটী চক্ষে ঘাত চিহ্ন দেখাইয়া পুনশ্চ কেন দেখাইব, ওকি আমার সঙ্গে পারিবে?] ক্রমান্বয়ে চক্ষুও কিল দেখাইল।

পণ্ডিতমণ্ডলী। [এবার তারস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন] ধন্য ধন্য! হে মহাকবি ও দার্শনিক! বাস্তবিকই উপনিষদ বলিয়াছেন সত্যকো বহুধাস্তবন্তি; তিনি এক হইয়াও বহুভাবে বিরাজ করিয়াছিলেন। আবার তবেই দেখ, গুরুদেবের পক্ষেই জয়!—জয় মহাকবি! জয় পণ্ডিত রাজ! জয় চির বিজয়িনী - বিজয়ী পুরুষ সিংহ!—

বিদ্যোত্তমা। (নত মুখী স্বগতঃ) হারাই ভাল, মনও যে আজ আমার হারতেই চাইচে আবার কেন? তবে হেরেই যাই।

রাজা (সাগ্রহে) মা আমার! সত্যই কি আজ আমার এই সর্ব্বজ্ঞ বেদজ্ঞ, কবিকুল শেখর পরম কান্তিমান পুরুষ বরকে বরণ করে নিতে সহায় হলে? নীরব কেন? এত তোমার পরাজয় নয় বৎসে! এই তো প্রকৃত বিজয় লাভ! তবে এসো আজ বিজয়ী-বীর! সহস্র নরবাহিত এই তোমার বিজয় মাল্য কণ্ঠে ধারণ কর, (ভবদেবাদির প্রতি) আপনাদের অনুগ্রহ চিরদিন স্মরণ থাকবে।

ভবদেব। সকলই ঈশ্বরেচ্ছা, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা আমরাতো উপলক্ষামাত্র। (স্বগতঃ) মনে চিরদিন রাখতে হইবে।

দেবদত্ত। (স্বগত) কি করবো? এই সময় সব বলে ফেল্‌বো না কি? আহা, এমন অঘটনও ঘটতে দেবো? আহা ওই শরচ্চন্দ্রের মত অনিন্দ্যরূপ রাহুর ভক্ষ্য হবে। অজ্ঞা যদি জানিয়েদিই সেই কৃতজ্ঞতাতেও কি আমার পরে' স্নেহ হবে না?—না তা সম্ভবই নয়, বরং এরূপ ফাঁস হলে অধিকতর কুপিত হয়ে আমাদের লাঞ্ছিতই করবে ও আরও কি করে বলা যায় না! থাক কাজ নেই।

চিদ্‌ বিকাশ। (জনান্তিকে ভবদেবের প্রতি) ভায়া এই বার গাত্র উৎপাটন করে ফেলে প্রধান শাস্ত্র বাক্যটাকে স্মরণ করো আরও কি বসে থাকতে ভরসা হচ্ছে নাকি?

ভবদেব (জনান্তিকে) সে বাক্যটা কি শুনি?

বিদ্‌। কেন; তাও কি আবার বলে দিতে হবে না কি? 'যঃপলায়তেস জীবতি,'—তা তোমার বুকের পাটা বেশী; তুমি বিয়ের ভোজটা খেয়ে যাবার ইচ্ছে রেখেও থাকতে পার

কিন্তু আমার ভাই প্রাণে অত ভরসা বা নির্ভরতা নেই, আমি কিন্তু মহাজনের বাক্যানুসরণ করছি।

ভবদেব। আঃ একটুখানি থামোইনা,—এমন সুযোগ্য মিলনটা দর্শন করে চক্ষুটাকে সার্থক করে যাবে' নাহে!

রাজা। (কালিদাসের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কন্যার হস্ত তদুপরি প্রদান করিয়া) পূর্ব্ব পনানুসারে আজ আমি আমার প্রাণাধিকা প্রিয় নন্দিনীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান কর্‌লেম, এখন আপনি প্রসন্ন মনে ইঁহাকে গ্রহণ করুন।

কালিদাসের (মৃদু মৃদু হাস্য ও বিন্তোত্তমার হস্ত গ্রহণ)।

বিন্তোত্তমা। (সলাজমুখী)

সখীগণের গীত ও পুরনারী বর্গের আগমনও উহাতে যোগদান।

জয়হে জয়হে জয়হে; কবিহে এসো, এসো!—
তোমারই কারণে, পথ পানে চাহিয়ে রয়েছি, সকালে এসো এসো;
ভারত গগনে তরুণ রবি, উদিত হয়োহে নবীন কবি,
উদয় অচলে মহিম ছবি ফুটায়ে তুলিয়ে এসো এসো,
অনিলে গাহিবে বিজয় কথা, আকাশে ভাসিবে অমর গাথা,
সাগরে পাথারে, কাননে নগরে, ছড়ায়ে যশ ভাতি এসো এসো,
ওই হৃদয় সরোজে আসনরাজে, এসহে অতিথি মোহনসাজে,
কীর্ত্তিধ্বজা সারা বিশ্বমাঝে, উড়ায়ে দিয়ে আজি এসো এসো।

পটক্ষেপণ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

আধুনিকতা।

আজ প্রাচ্যের তরুণের দল যাহা কিছু আধুনিক বলিয়া কল্পনা করে তাহাতেই আকৃষ্ট হয়। এবং তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে পাশ্চাত্যজীবন আধুনিকতাময়। পশ্চিমের আচার-ব্যবহার ও মনোভাবের মধ্যে তরুণপ্রাচী আধুনিক হইয়া গড়িয়া উঠার মন্ত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের ধারণা এই যে যা'কে আধুনিকতা বলে, অপরিমিত বুদ্ধি ও মুক্তির তত্ত্ব তাহাতে নিহিত আছে; তাহাই যৌবন, তাহাই জীবন।

যদি আধুনিকতার সংজ্ঞা তাহাই হয় তবে জানিতে হইবে উহার অপরিহার্য্য অংশ কাল-বিশেষে নয়, সত্য বিশেষে ন্যস্ত থাকে—সে সত্যটুকু বর্জ্জিত হইলে যতই পালিশ করা আর হালফ্যাসনের হোক্ না—আধুনিক সেকেলে হইয়া যায় এবং তার নাশ অবশ্যম্ভাবী।

বহুজাতি এইরূপে নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে—যাহাদের অতি বিলম্বে চৈতন্য হইয়াছে যে কালের যে ভেলাকে তাহারা নূতন ভাবিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল সেটা কোন্ জন্মে পুরাণো হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমে যে আজ তাহাই হইতেছে না, তাহা কে বলিতে পারে? পশ্চিমের হাওয়ায় যে হোলপাড় আজ দৃশ্যমান, তা উহাদের বর্ত্তমান ইতিহাস, যেটা আর মোটেই আধুনিক নয়, এবং ভবিষ্যের দূত, যে তাহার রাজদাবী লইয়া আসিয়াছে, এ দু'য়ের সংঘর্ষ নয় তা' কে বলিতে পারে?

যদিও তাহারা পাশাপাশিই থাকে তবুও উষার পাণ্ডুর অন্ধকার আর প্রভাতের আলোর মাঝের সুদীর্ঘ ব্যবধান। কেই-বা জানে পশ্চিমের এই যে বর্ত্তমান ইতিহাস সে সেই আদ্যিকালের মতোই পুরাণো হইয়া গিয়াছে কি না?

যাহা কিছু গভীর মানবিকতাময় তাহা কখনই পুরাণো হয় না। তাহাতে চির নবীনতা থাকে। যে সঞ্চয় বিকাশের জন্য নয় শুধু জমানর জন্য যে চতুরতা ঠকাইয়া জেতে—তাহাই লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ। দাস ব্যবসা যতই নূতন ধরণের ও লাভজনক হউক না উহা অতি বৃদ্ধ। পুরাতন নরমাংস-ভোজন যতই নূতন ধরণের হউক স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, খৃষ্টান অথবা পৌত্তলিক নামে—যেমন করিয়াই হউক—উহা কস্মিনকালেই আধুনিক নয়—তার আরম্ভের দিনেও নয়, আজও নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিন্দুজ্যোতিষ সম্বন্ধে দু' একটী কথা।

বিফলান্যানি শাস্ত্রানি বিবাদস্তেষু কেবলং।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্রসাক্ষিনৌ॥

আজ বিংশশতাব্দীর ঐশ্বর্য্য ও চাকচিক্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের মনে হয় আমরা কতই সভ্য এবং পুরাকালের লোকেরা না জানি কতই অসভ্য; অন্ততঃ অধুনাতন ইউরোপীয়গণের ধারণা এইরূপ। ইহার মূলে অতি অল্প সত্যই নিহিত আছে। যদি ইউরোপীয়দিগকে বলা যায় "বলত, প্রাচীন-ভারতের লোকেরা কিরূপ সভ্য ছিল?" তাহা হইলে তাঁহারা স্ব স্ব জাতিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান ও এখনকার অসভ্যজাতিকে সর্ব্বনিম্ন স্থান প্রদান করিয়া পরে দেখিবেন প্রাচীন-ভারত ইহার মধ্যে কোন্ স্থান অধিকার করে; যে ইউরোপীয় সমাজের যত নিকটবর্ত্তী হইবে সে তত সভ্য। এই মানদণ্ড যে কিরূপ হাস্যাস্পদ তাহা একজন জাপানীর কথায় বেশ পরিস্ফুট হইবে; তিনি এক ইউরোপীয় শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন—"আমরা গত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করিয়া আসিয়াছি; আমরা তখন শিল্প প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত ছিলাম কিন্তু তখন তোমরা আমাদিগকে 'বর্ব্বর' বলিতে। আর যেদিন আমাদের হস্ত শত্রুরক্তে রঞ্জিত হইল, হাজার হাজার শত্রু আমাদের হস্তে নিহত হইল, সেইদিন আমরা হইলাম 'সভ্যজাতি'।" সুতরাং সভ্যতার এ মানদণ্ড ত্যাগ করিতে হইবে। আর বাস্তবিকই এ সভ্যতাদ্বারা যে পৃথিবীর বিশেষ কিছু উপকার হইতে পারে তাহা বোধ হয় না। কতিপয় ইউরোপীয় আফ্রিকার অধিবাসীগণকে সভ্য করিবার উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন; তাঁহারা কিরূপ সভ্য করিয়াছিলেন তাহা ডাঃ ওয়ালেসের কথায় বেশ বুঝা যায়:—"ইউরোপীয়গণ তথায় কেবল মদ্য ও বারুদ বিক্রয় করিয়াছেন। আফ্রিকাবাসীর ধন ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন। এবং ইহাতে যখন তাহারা বাধা দিত, তখন তাহাদের শোণিতপাত করিয়াছেন। নিজেদের ও সেখানকার অধিবাসীদের নৈতিক অবনতি ঘটাইয়াছেন। আর তাহাদিগকে একপ্রকার দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

সত্য বটে, আজকাল নব নব যন্ত্রের নির্ম্মাণ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে এবং ডাঃ হক্সলীও তাই উৎসাহভরে বলিয়াছেন "পূর্ণমানুষ হও" "মানুষের মত কাজ কর' grown man "play the man" ইত্যাদি; কিন্তু কথাটা হইতেছে এই যে ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতা ও তাহার আনুসঙ্গিক দোষাবলীও কি বহুপরিমাণে বাড়িয়া যায় নাই? আমরা কি অন্তরে অন্তরে প্রকৃতই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষা উন্নত হইয়াছি? আজকালকার মনস্তত্ত্ববিৎ, দার্শনিক ও নীতিকারগণ কি লোট্‌জা, বুদ্ধ, জোরোষ্টার ও খৃষ্ট অপেক্ষা বড়? প্রাচীন ভারতীয়

গণ যে পার্থিব সুখদুঃখ হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর থাকিতেন, —ইহা কি তাঁহাদের অনুন্নতির প্রমাণ? ইহা কি সংসার হইতে পলায়নরূপ ভীরুতার লক্ষণ? তাহা নহে। তাঁহারা আত্মজয়ী ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন, এবং অনিত্য সংসার অপেক্ষা নিত্য বস্তুতেই আত্মদান বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। সকল অন্ধকার ভেদ করিয়া, সকল তিমির নাশ করিয়া যে নিত্যসত্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, তাঁহারা তাহারই প্রতি ব্যাকুল হৃদয়ে ধাবিত হইতেন। তাই জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতিই তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পাশ্চাত্য জাতি "মানুষ হইতেছে" "মানুষের মত কাজ করিতেছে; কিন্তু এই প্রশ্নটী যে স্বতঃই উদিত হয়—তাহাদের লক্ষ্য কি? সকল বিষয়ে তাহাদের সংগ্রাম ও জয়ের লিপ্সা—ইহার অন্ত কোথায়? পাশ্চাত্য দেশের "পূর্ণমানুষের" এই যে যুদ্ধ ও জয়—যে জয়ে ভালবাসা করুণা বা আত্মত্যাগের কণামাত্র নাই, কেবল অসংখ্য দুর্ব্বল মানুষকে পদতলে পীড়ন করিতে হয়; যে জয়ে হৃদয়ের স্থৈর্য্য ধৈর্য্য বা শান্তিলাভ হয় না, কেবল কামনা লোভ ও বিবাদই বাড়িয়া যায় এ জয়ে লাভ কি?

তাই বলি, প্রাচীন-ভারত প্রাচীন হইলেও হেয় নহে। প্রাচীন-সভ্যতার মহিমা বুঝিতে গেলে মন হইতে এই ঘৃণার ভাব দূর করিতে হইবে, এবং এই ঘৃণার ভাব দূর করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা; আধুনিক, পাশ্চাত্য সভ্যতার নিন্দার জন্য নহে। এবং এই প্রবন্ধে হিন্দুজ্যোতিষ সম্বন্ধে দু'চারিটা কথা বলিবার ছলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই মন্তব্য দ্বারা প্রাচীন ভারতের উন্নত সভ্যতার বিষয় বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন সভ্যতা যে কতখানি উন্নত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল, জ্যোতিষ চর্চ্চাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। সকল দেশেই সভ্যতার আদিযুগে জ্যোতিষ যে একটী প্রধান স্থান অধিকার করে ইহা হইতেই আমরা প্রাচীন সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সংশয়-বিহীন হইতে পারি। কারণ জ্যোতিষের আলোচনা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে একান্ত সহায়ীভূত। আমাদের চক্ষে বিশাল বলিয়া প্রতীয়মান এই পৃথিবী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় একটী বিন্দুমাত্র এবং সেই বিন্দুরই কোন্ এক প্রান্তে আমরা পড়িয়া আছি—এই চিন্তা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মন হইতে আত্মশ্লাঘা ও অহমিকা সম্পূর্ণরূপে দূর করে। সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, বিপ্লবের ঘাত প্রতিঘাত যাহা পৃথিবীর হৃদয় আলোড়িত করিয়া ফেলে তাহা বিপুল বিশ্বের কার্য্য প্রণালীর লেশমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইতে সক্ষম হয়না—এই মহাসত্য তাঁহাদের বিস্ময় ও ভক্তি আপ্লুত প্রাণ এই প্রকাণ্ড সৃষ্টি কর্ত্তার দিকে সঞ্চালিত করিত। তাঁহারা জ্ঞানের অভিমানও ত্যাগ করিয়াছিলেন কারণ তাঁহারা বুঝিতেন যে মানবের জ্ঞান ভাণ্ডার কত ক্ষুদ্র; এতদ্ব্যতীত তাঁহারা সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া দেখিতে পাইতেন যে হয়তঃ কাল যাহা সত্যভ্রমে সমস্ত হৃদয় দিয়া আকড়িয়া ধরিয়াছিলেন আজ তাহা অসত্য প্রমাণ হইয়া গেল। "খাঁটী সত্য লইয়াই তাঁহাদের কারবার ছিল এবং এই সত্যগুলিকে আবিষ্কার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বৎসরের পর বৎসর

চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহতারার গতি দেখিতে হইত এবং অনেক হিসাবপত্র করিতে হইত। আজ কালকার পাঞ্জিতে তিথি নক্ষত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি যে কথাগুলি দেখিতে পাই, সেগুলি অর্থশূন্য নয়। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা যেসব তত্ত্ব বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ সব কথার মধ্যে লুকান আছে।"* যাহা হউক, এই আশ্চর্য্য সৃষ্টি তাঁহাদের গর্ব্বের মূলে কুঠারাঘাত করে তাঁহাদের ছিল "plain living and high thinking" এইরূপে আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রয়াসী তাঁহাদের মন জ্যোতিষে লিপ্ত হইয়াছিল—জাগতিক সুখ হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কিরূপে পারমার্থিক সুখলাভ করিবেন, কিরূপে আত্মাকে ভগবৎ চরণে লুটাইয়া দিবেন ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছিল। সকল কার্য্যের অন্তরালে, সকল বহিঃ প্রকৃতির অন্তরে কন্দরে, সকল মোহমায়ার উপর যে চিরসুন্দর অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার চিন্তাই তাঁহাদের স্মরণপথে নিরন্তর ঘুরিতে থাকিত।

এই জ্যোতিষ অতি পুরাতন ও মনোহর শাস্ত্র। Heine (জর্ম্মন কবি) বলিয়াছেন যে ইহা "the old, the ever young science" অতি পুরাকালে গণিত জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ একত্রই চর্চ্চা করা হইত। ফলিত জ্যোতিষীগণ গ্রহতারা সমন্বিত গগণমণ্ডল দ্বাদশটী সমভাগে বিভক্ত করেন - এক এক ভাগের নাম দেন রাশি। তাঁহারা কোন মানবের জন্মগ্রহণকালে কোন্ কোন্ গ্রহ কোন্ কোন্ রাশিতে অবস্থান করিতেছে এবং ঐ গ্রহগণ ঐ মানবের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা দেখিয়া ঐ মানবের জীবনের ফলাফল স্থির করিতেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা জন্তুর ও বৃক্ষেরও ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতেন। ৺পিতৃদেব (মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ) তাঁহার 'Romaka or City of Rome' নামক পুস্তকে ৫ম পৃষ্ঠায় লেখেন— "In the 16th Chapter of বৃহৎসংহিতা, a well known work on astrology, praised by the learned societies all over the world, the eminent author বরাহ মিহির divides the people of India and outside into various well-defined groups to each of which he assigns the influence of particular planets and stars. In ascertaining the alsobete or relative strength of a certain nation at a certain time, one has simply to examine the strength of the planet or star presiding over that nation at that time." এই জ্যোতিষীগণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রাজা সম্রাট ও সাধারণে ইঁহাদের নিকট স্ব স্ব জীবন ও কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

জ্যোতিষের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটী এই যে সূর্য্যমণ্ডল হইতে আবির্ভূত কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক এই শাস্ত্র প্রথম সূচিত হয়।† অনেকে বলেন

* ঋগ্বেদানন্দ দ্রষ্টব্য।

† ন মে তেজঃ সহঃ কশ্চিৎ অধ্যাত্মং নাস্তি মে কণঃ।
মদংশঃ পুরুষোহন্য স্তে নিঃশেষ কথয়িষ্যতি। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ১।৩)।

যে শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণগণই এই শাস্ত্র জগতে আনয়ন করেন, কেননা আমরা সাম্বপুরাণ ও ভবিষ্য পুরাণ হইতে দেখিতে পাই যে তাঁহাদের সূর্য্য হইতে উৎপত্তি হয়। পুরাকালে ভারতে পণ্ডিতগণ গণিত বলিতে কেবল জ্যোতিষই বুঝিতেন; তাঁহারা শুধু জ্যোতিষেরই চর্চ্চায় নিময় থাকিতেন। অমিশ্রগণিত পরোক্ষে প্রসারতা লাভ করে। তাঁহাদের সুদূরগামী কল্পনা তাঁহাদিগকে নিখিল বিশ্বের সমুদয় গ্রহতারা মণ্ডলীর দিকে আকর্ষণ করিত; তথাপি এই সকল বিষয়ের সমাধান করিতে গিয়া অমিশ্র গণিতের জন্ম হয়। অর্থাৎ, এই ভারতে অমিশ্র গণিত জ্যোতিষের দাস ছিল; কিন্তু এই দাস জীবন সত্ত্বেও উহা যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করে তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। কারণ যদিও মিশ্র গণিত(Mixed math.)সহজেই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে, তথাপি অমিশ্র গণিত (Pure math.) ব্যতিরেকে মিশ্রগণিত এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিষের আলোচনা করিতে গিয়া প্রয়োজনানুযায়ী অমিশ্রগণিত ভারতে উন্নতি লাভ করে এবং সমগ্র জগতের মধ্যে একটী বিস্ময়ের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। আধুনিক জ্যোতিষের প্রধান সহায় গোলক সম্বন্ধীয় ত্রিকোণমিতি (Spherical Trigonometry), তাহা তাঁহারা কিরূপ চমৎকার রূপে অবগত ছিলেন তাহা A. V. Braunmiiht তাঁহাতে Vorlesungen iiber Geschichte der Trigonometrie নামক গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় প্রশংসার সহিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পঞ্জিকা প্রনয়ন করিতে গিয়া প্রথম স্তরের অনির্দ্দিষ্ট সমীকরণের (Indeterminate Equation of the first degree) জন্ম হয়। এবং তাঁহারা এইরূপে বর্গীয় সমীকরণ (Quadrake Equation) প্রভৃতি অমিশ্র গণিতের বহু বিষয়ের আবিষ্কার করেন।

ভারতে ব্রাহ্মণগণ পুরাকালে এই গণিত চর্চ্চার একমাত্র অধিকারী ছিলেন বলিয়া জ্যোতিষ সাধারণের সামগ্রী হইতে পারে নাই। মিশরেও ইহা এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু গ্রীসে তাহা হয় নাই। তথায় গণিত শাস্ত্র কোনও একটী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; তথায় সকলেই ইহা সমভাবে অধ্যয়ন ও চর্চ্চা করিতে পারিত। যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছাও পারদর্শিতা ছিল সে মনে করিলেই সেই শাস্ত্র আলোচনা করিতে পারিত। যাহা হউক, একটী শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও ভারতে জ্যোতিষ গণিত যেরূপ স্ফুরণ হয় সেরূপ কোনো দেশে হয় নাই। আশ্চর্য্য হইলেও ইহা সত্য। তাঁহারা তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করেন। তাঁহারা একটী বিষয় লইয়া দিনের পর দিন তন্ময়ভাবে অবস্থান করিতেন এবং সেই জন্য অল্পকালের মধ্যেই সফলতা লাভ করিতেন। তাঁহাদের সফলতা কিরূপ হইয়াছিল তাহা এক কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় যে ভারতবর্ষই গণিতের জন্মস্থান—এমন কি আমরা যাহাকে arabic notation বলি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষেরই। শ্রেণী বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও জ্যোতিষের এরূপ উৎকর্ষ, জ্যোতিষের আজ্ঞাবহ হইয়াও গণিতের এরূপ সাফল্য বাস্তবিকই জগতের জ্ঞানক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে সভ্যতার আদিম যুগে

ধর্ম্মের জন্যই জ্ঞানানুশীলন হয়। ধর্ম্মই মানুষকে প্রথম জ্ঞানের পথে চালাইতে থাকে। ধরণীর আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদ ভারতে জ্যোতিষের উৎপত্তির ঐ কারণই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ নিখিল জগতকে ভগবানের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা সকল দ্রব্যের মধ্য দিয়া অসীমকে উপলব্ধি করিতেন এবং ভূমার বার্ত্তা গ্রহণ করিতেন। বিশ্বের যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু বিরাট, সকলই তাঁহাদের প্রাণে ভক্তির তারে আঘাত করিত। বহিঃ-প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দনে তাঁহাদের অন্তরের স্পন্দন অনুভূত হইত। তাঁহারা প্রকৃতির বিচিত্র ভাবকে ভগবানের লীলা মনে করিতেন এবং প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে ভগবানের এক এক প্রকার মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাই তাঁহারা গগনের গ্রহ সমূহকে পূজা করিতেন। তাঁহারা গ্রহ নক্ষত্রাদির পূজার জন্য বেদসংহিতা ও পরে ব্রহ্মণে লিপিবদ্ধ স্তোত্র ও মন্ত্র প্রনয়ন করেন। ঋক্ সংহিতার অনেক স্তোত্র এই সকল গ্রহ নক্ষত্রাদির দেবগণের গুণ কীর্ত্তনে লিখিত হয়। এইরূপে বৈদিক যুগে আর্য্যদের মধ্যে বিশ্বের গঠন, গ্রহনক্ষত্রের গতি, সময়ের পরিমাণ বিষয়ের আলোচনার সাড়া পড়িয়া যায়।

শুধু হিন্দু নহে, মুসলমান সভ্যতার প্রারম্ভে ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই জ্যোতিষের উৎপত্তি হয়। মুসলমান জগতের বিশালতার দরুণ তাঁহাদিগের বিভিন্ন স্থান হইতে মক্কার দিক নির্দ্দেশ করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রার্থনাকালে কোন্‌দিক মুখ করিয়া বসিলে মক্কা সম্মুখে পড়িবে ইহা স্থির করিবার দরকার হয়। তা ছাড়া দিবারাত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনা এবং বৎসরের নির্দ্দিষ্ট দিনে উপবাস ইস্‌লাম ধর্ম্মের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; সেই জন্য চন্দ্র সূর্য্যের গতিবিধি দেখিয়াই তাহাদিগের সময় ঠিক করিতে হইত। চন্দ্র সূর্য্যের চলাফেরা ঠিক করিবার জন্য নক্ষত্র চেনাও নক্ষত্রদের ভাগ করা দরকার হইয়া পড়ে। এই ভাবে অনেক বিষয়ে ধর্ম্মের দিক দিয়া জ্যোতিষের আগমন হয়; অবশ্য হিন্দু জ্যোতিষ তাঁহাদিগকে সাহায্য করে। ফলে এই ভাবে জ্যোতিষের উন্নতি হইল, জ্যোতিষের যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইল, মান মন্দির (observatory) প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে মুসলমান জগতে গণিত ও ফলিত উভয়বিধ জ্যোতিষেরই একটা আন্দোলন দেখা দিল।

হিন্দু জ্যোতিষের কাল মোটামুটি তিনটী প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—যথা বৈদিক কাল, বেদাঙ্গ কাল, ও সিদ্ধান্ত কাল। বৈদিক কালে জ্যোতিষ সম্বন্ধ ধারণা গুলি যে সবই বেশ সুস্পষ্ট ছিল তাহা নহে, তাহা হইতেও পারে না। কোন শাস্ত্রেরই সূচনা কাল হইতেই নিখুঁত ভাবে অবস্থান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইউরোপে তাহাই হইয়াছিল; পৃথিবীর কোন্ দেশে এরূপ হয় না? দৃষ্টান্তে প্রাচীন জ্যোতিষীগণ বলিতেন যে পৃথিবী স্থির ও সূর্য্য অস্থির; সূর্য্যই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিতেছেন ও যাইতেছেন। বেদাঙ্গকালে জ্যোতিষ সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্টতর হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহা একেবারে সুস্পষ্ট বলা যায় না। যথা, তখনকার জ্যোতিষীগণ বলিতেন যে গ্রহসমূহ পৃথিবীর চেপ্‌টা দিকের সমান্তরাল (parallel) বর্ত্মে মেরুপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছেন এবং সূর্য্যরশ্মি মেরুপর্ব্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রাত্রি

সৃজন করিতেছেন। Bently সাহেব বলেন যে ষড়বেদাঙ্গের এক বেদাঙ্গ জ্যোতিষ সেই যুগেই যে বলিয়াছিল সৌর বৎসর ৩৬৬ দিনে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সিদ্ধান্তকালে, জ্যোতিষ সম্বন্ধে ধারণা একেবারে সুস্পষ্ট হয়। G. R. Kaye তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত শিরোমণি, ও আর্য্য সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই সময়ের জ্যোতিষ জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব মহামূল্য রত্ন। সূর্য্যসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ময়ের নিকট ইহার প্রথম প্রকাশ হয়।

এই জ্যোতিষের সম্যক আলোচনা করিতে বসিলে এ প্রবন্ধে কুলাইবে না; আমরা এস্থলে মোটামুটী 'গ্র' একটা গ্রন্থ ও ব্যক্তির বিষয় বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে প্রকৃত জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা ও আধুনিক, পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সহিত তুলনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গার্গী-সংহিতা অতি প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থ। জ্যোতিষীগণ এই গ্রন্থের কথা প্রায়ই উল্লেখ করিয়া থাকেন; তাঁহারা ইহার প্রণেতাকে 'বৃদ্ধ গর্গ' বলিয়া অভিহিত করেন। পরাশরের নামও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য্যই পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের ন্যায় বিদ্বান্ ও প্রতিভাশালী পণ্ডিত জগতের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীর মধ্যে বিরল; ইহারা পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্যে সম্রাট ছিলেন। ইহাদের সাধনা ইহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যদি ভারত ধ্বংস হইয়া না যায়, যতদিন জগতে বিজ্ঞানের আদর থাকিবে ততদিন এই মহাপুরুষদিগের নাম স্বুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। যদি আমাদের গর্ব্ব করিবার আর কিছুও না থাকিত, তাহা হইলেও আমরা ইহাদিগকে লইয়াই সভ্যসমাজে অক্লেশে দাঁড়াইতে পারিতাম।

শুধু তাহাই নহে। সোনার ভারতে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরও অভাব ছিল না। ভারতের খনা, ভারতের লীলাবতী তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁহারা এতাদৃশী শিক্ষিতা ছিলেন যে তাঁহাদের লেখনী প্রসূত গ্রন্থ জ্যোতিষ ও গণিত জগতে বিশেষ সমাদরের বস্তু হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতই আশ্চর্য্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন ভারত অসভ্য বলে কে?

কিন্তু আর্য্যভট্টই গৌরবের অধিকাংশের অধিকারী। তিনি শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ ছিলেন। আলবেরুণী বলেন যে দুইজন আর্য্যভট্ট ছিলেন। কিন্তু Weber সাহেব গবেষণায় দেখাইয়াছেন যে এই আর্য্যভট্টই কুসুমপুরে বাস করিতেন এবং ইনিই জগদ্বিখ্যাত। ইহার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু ৪৭৬ খৃষ্টাব্দই ইহার জন্মসন ইহাই সর্ব্বাচীন বলিয়া মনে হয় *। Rapson সাহেব ইহাকে 'ভারতের নিউটন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পুণ্যনাম স্মরণ করিলে শ্রদ্ধায় মস্তক আপনিই অবনত হইয়াপড়ে। ইনি জগতের মধ্যে একজন মহাপুরুষ ছিলেন, কেননা ইনি যে কেবল বড় জ্যোতিষী ও গণিতজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে, ইনি অতীতের

---

* Dr. Kern Pxi, anb 'India Review' 1905.

ভুল ধারণা গুলি উল্টাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ সত্য মত প্রচার করিয়া যান। তাঁহার 'গীতিকা' নামক গ্রন্থে তিনি অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে শুধু যে গোঁড়াসম্প্রদায় তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন, তাহা নহে; অগ্রগামী প্রাচী, গুণী সম্প্রদায়ও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন। কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অশ্রান্ত যত্নে, অপ্রতিহত বেগে অম্লান মুখে, বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছিলেন; অপরের নিন্দাবিদ্রূপ তাঁহার বক্ষের বেগ খর্ব্ব করিতে পারে নাই। তিনি বহু কষ্টসাধ্য গণনার পর যাহা আবিষ্কার করিয়া ছিলেন, তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কারের এক এক অংশ পরে পশ্চিমে আবিষ্কার করিয়া পশ্চিমের এক এক বৈজ্ঞানিক অতুল যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নামে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই পাশ্চাত্য জ্যোতিষীদিগকে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না; কিন্তু শুধু ইহাই বলিতে চাই যে সেই পুরাকালে গঙ্গাতীরে সেই এক জ্যোতিষী যে সকল আবিষ্কার করিল তাহা কি তোমরা দেখিয়াও দেখিবে না? শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনিই প্রথমে বলেন যে পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা কমলালেবুর ন্যায় (oblate spheroid), এবং পৃথিবীই সূর্য্যের চারিপাশে ঘুরিতেছে এবং আপনার অক্ষরেখার চারিপাশে দৈনন্দিন ঘুরিতেছে (daily rotation of the earth on its axis) তিনি চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সম্বন্ধে লিখেন এবং বিষুবীয় ও অয়নান্ত বিন্দুর গতি (motion of solstitial and equinoctial points) লক্ষ্য করেন। আর্য্যভট্ট যে নিকটবর্ত্তী গ্রহের বর্ষের দৈর্ঘ্য ও অয়ন চলন (Procession of equinoxes) গণনা করেন সে কথা lassen সাহেব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল যুগান্তর আনয়ন কারী আবিষ্কারের ফলে তাঁহার কি লাভ হইয়াছিল? মাত্র অজ্ঞ মানব বৃন্দের বিদ্বেষ। ভাউদাজীর গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি যে মহাত্মা ব্রহ্ম-গুপ্তও আর্য্যভট্টকে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। ব্রহ্মগুপ্ত বলেন যে আর্য্যভট্টের গ্রহণ সম্বন্ধীয় মতামত বেদ এবং মনুলিখিত স্মৃতির ও গর্গলিখিত সংহিতার সহিত মিলে না, অতএব উহা গ্রাহ্য হইবে না (India' II, দ্রষ্টব্য)। এইরূপ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে; গ্যালিলিরও তাই হইয়াছিল। কিন্তু এত পরিশ্রমের এই ফলে কি আর্য্যভট্ট নিরাশ হইয়াছিলেন? তাহা নহে। বৈজ্ঞানিক সম্মানের আশায় বিজ্ঞান চর্চ্চা করে না। আর্য্যভট্ট জাগতিক সম্মান চাহেন নাই। তিনি সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই সুখী; আধ্যাত্মিক উন্নতিই তাঁহার জীবনের মোক্ষ বস্তু ছিল।

আমরা যদিও আর্য্যভট্টের জ্যোতিষ বিজ্ঞান ইত্যাদি ভুলিয়া যাই, তথাপি আমরা আর্য্য-ভট্ট মানুষটীকে ভুলিতে পারিব না। তিনি যে একজন উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন ইহা ভুলে কাহার সাধ্য? বিদ্যা হইতে কুসংস্কারের আবরণ উন্মোচন করা সভ্যজগতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি। সে যুগে মানুষ যে কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবান, অজেয় বলশালী ছিল আর্য্যভট্টই তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। তাঁহার মানসিক উন্নয় অটুট ছিল। তিনি প্রাচীন ভারতের সুযোগ্য সন্তান ছিলেন।

বহুপরবর্ত্তী লেখকগণ যেন আর্য্যভট্টের প্রতি দেবতা তুষ্ট হইয়া এই সব লিখাইয়াছেন, ইহাতে আর্য্যভট্টের কোনও হাত নাই। *

বরাহমিহির কিন্তু বলেন যে আর্য্যভট্টের আবিষ্কারগুলি প্রকৃতপক্ষে ভারতে ছিল; তিনি কেবল সুস্পষ্টরূপে ভাষা দিয়াছেন মাত্র। এই বরাহমিহির শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ। তিনি পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎ সংহিতা, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহ লিখেন। তখনকার গ্রন্থকারগণ আপন আপন গ্রন্থে নিজের জন্মগ্রহণ কালের উল্লেখ করেন। কিন্তু বরাহমিহির সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই। তিনি উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন; উজ্জয়িনী ব্রাহ্মণগণ বলেন যে তিনি ৪২৭ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; অমরাজ বলেন যে তিনি ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯২ বৎসর হইয়াছিল। (Journal of Asiatic Society of Bengal, 1912 July).

ব্রহ্মগুপ্ত প্রায় ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত লেখেন। ইহা একবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রহের গতি ও অবস্থানের বিষয় (computation of mean motions and true places of planets); তৃতীয় অধ্যায়ে, সময় ও দিঙ্মণ্ডল (horizon) সম্বন্ধে; ৪র্থ ও ৫ম, গ্রহণ বিষয়ক; ৬ষ্ঠ, গ্রহের উদয়াস্ত; ৭ম, চন্দ্রের চূড়া (cusp) সম্বন্ধীয়; ৮ম, ছায়া ঘড়ির (gnomon) বিষয়; ৯ম, দুই বা ততোধিক গ্রহের সমসূত্রপাতে অবস্থান (conjunction of planets); ১০ম গ্রহগণের নক্ষত্রের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান। একাদশ হইতে বিংশ পর্য্যন্ত, জটিল অঙ্কের সমাধান। একবিংশ, জ্যোতিষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পৃথুদকস্বামী এই গ্রন্থের টীকাকার।

ভাস্করাচার্য্য ১০০৬ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাশক্তিশালী জ্যোতিষী। ইহার সিদ্ধান্তশিরোমণি হইতে বেশ বুঝা যায় যে ইনিই মাধ্যাকর্ষণ (gravitation) আবিষ্কার করেন। ভাস্করাচার্য্য Differential Calculus আবিষ্কার করিয়া জ্যোতিষে প্রয়োগ করেন; কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে বহুপরে Newton ইহা বাহির করায় তাঁহার নামটাই এ বিষয়ে জগতে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা পরে ইউরোপীয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত তাহা যে পূর্ব্বেই ভারতে জ্ঞাত ছিল, ইহা হইতে কি প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না? ইহার পরও কি বলা সাজে যে প্রাচীন ভারত অসভ্য ছিল?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গণিতে অনেক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন বটে কিন্তু আবিষ্কারের প্রমাণগুলি রাখিয়া যান নাই। তাই সুযোগ বুঝিয়া বিদেশীয়েরা বলেন যে ভারত গ্রীকগণের নিকট হইতে উহা লইয়াছিল। কিন্তু মহামতি Thibant তাঁহার Indian Thought নামক গ্রন্থে এই মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

---

* Royal Asiatic Society Journal 1864, 392; Kern Br. samhita 57, Journ, Asiatique, 1878.

ভাস্করাচার্য্যের পর হইতে জ্যোতিষী ও গণিতজ্ঞগণ পূর্ব্বলেখকবৃন্দের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন। অবশ্য নবদ্বীপে মাঝে একটু জাগরণ দেখা দেয়, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও পুস্তক প্রণীত হয় নাই। আধুনিক জ্যোতিষ অর্থাৎ পাশ্চাত্য জ্যোতিষ অনেক বিষয়ে হিন্দু জ্যোতিষের নিকট ঋণী। নিম্নে তাহা দেখাইতেছি।

কারণ, সভ্যতার তৃতীয় যুগ রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়াই দেখা দেয়। অবশ্য রক্তপাত সভ্যতা নহে, বীরত্বও নহে। "যুদ্ধে হাজার হাজার লোককে জয় করা অপেক্ষা আপনাকে জয় করাই বীরের কাজ" বুদ্ধের এই বাণী শতাব্দীর প্রাচীর ভেদ করিয়া এখনও সমুদ্রগর্জ্জনবৎ কর্ণে প্রবেশ করে। ইহাই যুগে যুগে মহাপুরুষেরা উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছেন। শতশতাব্দীতে ভিক্টর হুগোও ইহা প্রচার করিয়াছেন। আর এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ, রমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি মনীষীগণ পুনঃ পুনঃ ইহাই বলিতেছেন যে আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত জগতের নিস্তার নাই।

যাহা বলিতেছিলাম :—Saracens গণ এই সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত হন। তাঁহারা তখনকার ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা সভ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ভারতের ও গ্রীসের সভ্যতালাভ করেন *। Gow সাহেব তাঁহার History of Greek mathematics নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে বলেন যে আরবীয়গণ হিন্দুদিগের গণিত লইয়া গিয়া চর্চ্চা করেন। Colebrooke বলেন যে Alfarazi এই হিন্দু গণিতের অনুবাদ করেন এবং এই অনুবাদের নাম দেন Sind Hind বা Hind Sind. woepeke সাহেব বলেন "L'identite du mot Sindhind abec siddhanta que Colebrooke a e'te" le Premier a soupconner, n'est plus, Je pense, re'voque'e en doute par personore" এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এক জন হিন্দু জ্যোতিষী বাগ্‌দাদে যান এবং ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তই উক্ত স্থানের জ্যোতিষের ভিত্তি।

মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়নের পর Semitic গণ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন। আরবদেশের বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র জাতিগুলি ধর্ম্মের বিষাণ নিনাদে একত্র সমাগত হইয়া একটী প্রকাণ্ড বলশালী জাতি গঠিত করে। তাঁহারা বহুদেশ জয় করেন এবং বিজিত দেশ সমূহে ভারতীয় সভ্যতা ব্যাপ্ত করেন—জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ প্রধানতঃ †। তাঁহারা স্পেন প্রভৃতি দেশে সভ্যতার আলোক বিকাশ করেন। এই ঘোরতর রক্তপাত ও দুর্দ্দিনের মধ্যেও বিদ্যা, বিজ্ঞান যে বিনষ্ট হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। স্পেন হইতেই প্রধানতঃ আধুনিক জ্যোতিষের সূচনা।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আদিমকাল হইতে জ্যোতিষ কিরূপ অগ্রসর হইয়াছে আসল জ্যোতিষের বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ভূমিকাতেই বলিয়াছি যে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দূর করাই এই

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ Dr. Young (তখনকার Hardinge Professor of mathematics) ১৯১৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"The tree of Knowledge of the Workings of Human mind is indigenous to India. The study of mathematics is a plant belonging to the same family, and its seeds have come to us from you. If you are true to yourselves and to the highest ideals of your greatest thinkers, India will add its own peculiar elements to our best civilisation and in learning and in particular in mathematical science we may expect from you contributions to our knowledge characteristic of your race and clime."

পাশ্চাত্যজাতি ধীরে ধীরে নিজেদের ভ্রম বুঝিতেছে। Prof. Holmes of Pennsylvania Univ. of U. S. A. এবারকার কংগ্রেসে বলিয়াছেন—"I ought to say that we people have been very far wrong in our western civilization, we have gone too far in the pursuit of wealth and power, It is a deep evil in our whole western civilization. Our longing in the west for power has brought on war after war and seems likely to plunge into a still further war until perhaps it destroys our civilization. So we gladly turn to you who have indicated another and better way. Therefore we look to the East to bring to the world the message of peace."

আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিন্দা করিতে বসি নাই। আমরাও তাঁহাদিগের গুণগুলি শিক্ষা করিব। কিন্তু অগ্রে নিজেদের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা চাই। তারপর পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন হইবে। নিজেদের অতীত গৌরব না হৃদয়ঙ্গম করিলে ভবিষ্যৎ উন্নতির ইচ্ছা হইবে না, কারণ যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহান ছিলেন তাঁহাদের মহান হইবার বাসনা হয়। আমরা চাই প্রকৃত উন্নতি; আমর যাহাতে "Americans believe that India is going to make rich and valuable contribution to the future civilization of the world *" এই কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। যে আধ্যাত্মিক ও মানসিক সভ্যতায় জগতের মঙ্গল হয়, আমরা সেইরূপ সভ্যতার জন্যই চেষ্টা করিব। শ্রীজগচ্চন্দ্র আচার্য্য।

---

* Dr. Charles E. Jefferson, Pastor of Broadway Tabernacle, New york. (Madras Dec, 28 1925),

রবীন্দ্র বারমাস্যা

মাঘ

বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছ-সলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জ্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে
স্নানে চলেছেন শত সখী সনে
কাশীর মহিষী করুণা॥

* * *

পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তা'রে এমন নতুন-করা?
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো॥

* *

নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাব্‌চ বুঝি?
ও সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দক্ষিণ হাওয়ার পর।

* * *

তোমায় বাঁধ্‌ব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দী শালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো॥

* *

হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগ্‌লা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি

* * *

শাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি ॥

* *

বসন্ত সে আসবে যে ফাল্গুনে
দখিন হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি,
তাহার লাগি রইলিনে দিন গুণে'
আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি।

* * *

শীত তুমি হেথা কেন এলে ?
উত্তরে তোমার দেশ আছে ;
পাখী সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষার মরুময়
সকলি আঁধার জনহীন।
সেথায় একেলা বসি বসি
জ্ঞানী গো কাটায়ো তব দিন ॥

* * *

তীব্র শীত পবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সঙ্কলিত।

———

মহর্ষি *

আজ যে আমি ভক্ত জনসমাজে পূজ্যপাদ মাতামহ দেবের সাম্বৎসরিক স্মৃতিবাসরে অন্যতম বক্তার পদবী স্বীকার করেছি, তা শুধু অকিঞ্চনেরও যথাসাধ্য সেবার স্পৃহায়! ব্রহ্মপ্রীতির যে জ্যোতিতে মহর্ষি জ্যোতিষ্মান্ ছিলেন তার একটি রশ্মি আমার অন্ধকার হৃদয়কোটরে যে আলো টুকু এনে তাকে আনন্দময় করেছে, সেই আলোকবর্ত্তিকা সকলের সামনে ধরবার প্রেরণায় এসেছি, যদি তাতে আমারই মত অন্ধকারগ্রস্ত, আর কারো মনে তা থেকে আলো ধরে ওঠে, আর কারো জীবনের আনন্দ-পথ ঈষদ্‌মুক্ত করে দেয়। কেননা তাঁর জীবনচরিত অনুশীলনে এই প্রধান শিক্ষা পেয়েছি যে যদি সত্যের আলো কিছু পাও তবে তা সকলকে দান কোরো, সত্যকে প্রচার কোরো। ভক্তপুরুষ মাত্রেরই এই উপদেশ, যীশুও বলেছিলেন—Hide not your light under a bushel"—সকলের কাজে লাগিও।

সেই সত্যের আলোক পেলে প্রধানতঃ কি লাভ হয়? এই সংসারে ভাবনাপীড়িত মানুষ নির্ভাবনা হয়। ঈশ্বরে যদি পরানুরক্তি হয়, বিষয়ীর বিষয়প্রেম যদি ব্রহ্মে অর্পণ করা যায়, আর কোন কিছু যদি তাঁকে আড়াল করে' না থাকে, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারে—"মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মেঽস্তি কিঞ্চন নষ্যতি।"

যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না, যা কোন চোরে চুরি করতে পারে না, যা কোনকালে ক্ষয় হয় না—'যং লব্ধা ন চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং"—সেই অভয় ব্রহ্মপদদাত্রী যার আছে, তার আর সব গেলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি? ক্রোড়পতির দুদশবিশ পঞ্চাশটা সিকি বা দুয়ানি হারাইলেই বা কি না হারালেই বা কি?

যে দিন বেলগাছিয়ার বাগানে জমকাল মজলিষ ছিল, রূপেগুণে পদে সৌন্দর্য্যে নৃত্যে মন্ত্রে আলোকে আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হয়ে ছিল, যে দিন পিতার নিমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা করা ও পরিতোষণ করা দেবেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল—সে দিন ঘটনাক্রমে তাঁদের তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশন পড়ে গিয়েছিল। সকলে মিলে সে দিন ঈশ্বর উপাসনা করবেন, তাঁদের নূতন রচিত স্তোত্র ভগবান্‌কে শুনাবেন—অতএব এই গুরুতর কর্ত্তব্য ছেড়ে তিনি বাগানের মজলিসে যেতে পারলেন না। পিতার শাসনে ও ভয়ে একবার তাড়াতাড়ি ঘুরে চলে এলেন। এতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের কথাই মনে পড়ে। যিনি বলেছিলেন—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু"॥

---

* ব্রাহ্মসম্মিলনী সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিবাসরে ভাষিত।

হে ভগবন্! অবিবেকী ব্যক্তিদের বিষয়ের প্রতি যেরূপ প্রীতি, তোমাকে অবিচ্ছেদে স্মৃতিপথে রেখে যেন তোমার প্রতি আমার সেইরূপ প্রীতি থাকে"।

এই অবিচ্ছেদে স্মৃতিপথে রাখাটিই সাধনার ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির মূল উপাদান। ধ্যান, ধারণা ও জপ এ সকলেরই লক্ষ্য তাঁর সম্বন্ধে অবিচ্ছেদ স্মৃতিপ্রবাহ প্রবাহিত করা। যে মানুষ মানুষের প্রিয়, যে বিষয় মানুষের প্রিয় তার সম্বন্ধে অবিচ্ছেদ স্মৃতিপ্রবাহের অনুভূতি মনুষ্য-মাত্রের আছে— কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই স্মৃতি প্রবাহ বহান যায় না যে, যদি তিনি স্বয়ং কৃপা না করেন, যদি নিজেই তাঁর প্রতি মতিগতি না দেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥

মেধার দ্বারা, আলোচনার দ্বারা, বেদাভ্যাসের দ্বারা কিছুতেই তিনি লভ্য নহেন—যাকে তিনি বরণ করেন কেবল সে-ই তাঁকে পায়।

যদি এ কথাই ধর্মজগতে শেষ কথা হয়, তবে ত অধিকাংশের অদৃষ্টে চিরদৈন্য লিখিত রয়েছে। কেননা কজন এমন যোগ্যতা রাখে যে তাঁর দ্বারা বরণীয় হতে পারে? সৌভাগ্য-বশতঃ ধর্মজগতে এটিই শেষ কথা নয়, এরও উপরে একটি কথা আছে, তা এই—যে তাঁকে চায়, সেই পায়—চাইলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

Every one who asks receives,
The seeker finds,
The door is opened to any one who knocks.

দেবেন্দ্রনাথও এই কথা বারবার বলেছেন—

"কখন্ আমি আমার উপাস্য দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব, কখন্ আমার হৃদয়ের ভক্তি-উপাসনা দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব, কখন্ তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন করিব, জলাভাবে পিপাসার ন্যায় আমার এই বলবতী স্পৃহা আমাকে কঠিন দুঃখ দিতেছিল—আমার সেই স্পৃহা পূর্ণ হইল, সব দুঃখ দূর হইল। এত দিন পরে করুণাময়ের এই করুণা আমি বুঝিলাম যে তিনি তাঁহার ভক্তকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। যে তাঁহাকে চায়, সে তাঁহাকে পায়। আমি দীন দরিদ্র ভাগ্যহীনের মত এই সংসারে যে বেড়াই, তাহা তিনি আর দেখিতে পারিলেন না। তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন।

• • • আমি তো এতটা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু তিনি তো এতটুকু দিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি আরও দিতে চাহেন—মাতার ন্যায় তিনি আরও দিতে চাহেন। যাহা আমি জানি নাই, যাহা আমি চাই নাই, তিনি তাহাও দিতে চাহেন।"

মহর্ষির কাছে আমরা শিখলাম ভক্তবৎসলকে চাইলেই পাওয়া যায়, ভক্তিভরে ডাকলেই

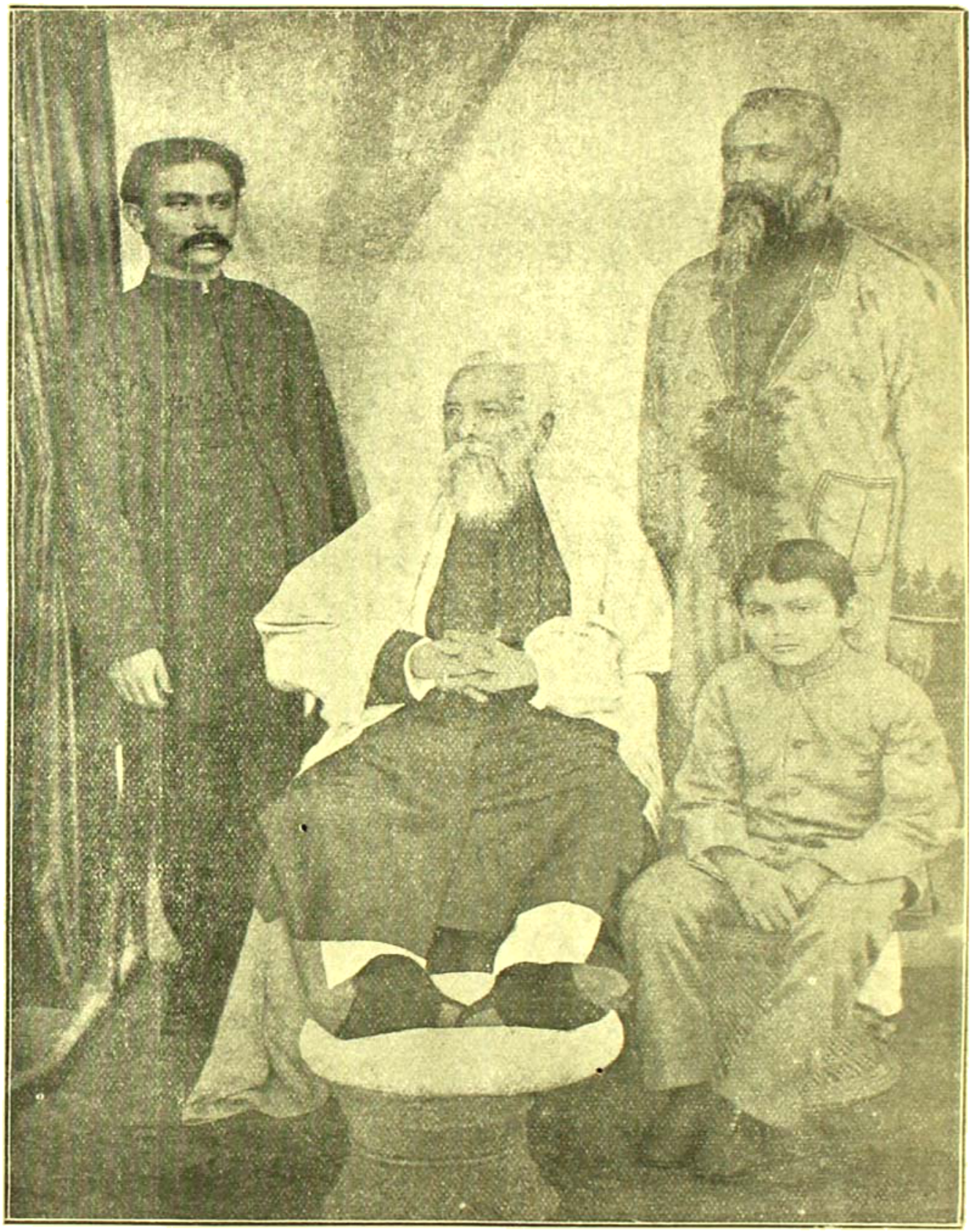

চার পুরুষ—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিনি ধরা দেন। কিন্তু এখনও সংশয় রয়ে গেল। এই চাওয়াটা আসে কেমন করে, তাঁকে চাইতেই যে স্পৃহা হয় না, তাঁর চেয়ে যে বিষমিশ্র বিষয়সুখ ঢের বেশী স্পৃহনীয় বোধ হয়, তার থেকে যে মনকে ছাড়ান যায় না। এইখানে বৈরাগ্যের হাত মানতে হবে। বৈরাগ্য ছাড়া উপায় নেই। যে জর্জ্জরিত হৃদয়ে সংসারহলাহল বৈরাগ্যের তীব্র শূল প্রোথিত করেনি, সে হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তির জমি চষা হয় নি, সে হৃদয়ে তার বীজ রোপণের সময় আসেনি এ কথা ঠিক। কিন্তু বৈরাগ্যও এসেছে অথচ ভক্তির চাষও হচ্ছেনা; এ যে করে সেই যথার্থ অবিবেকী।

কারো কারো বৈরাগ্য পূর্ব্বজন্মলব্ধ, কারো এ জন্মের দুঃখশোকনিরাশাজাত। যেমন করেই হোক্, যে দিনই হৃদয়ে বৈরাগ্যের প্রথম উন্মেষ হবে, সেই দিনই যদি সংসারাসক্তিকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ব্রহ্মাসক্তিতে উন্মুখ হওয়া যায় তবেই বিচক্ষণতা হবে। দেবেন্দ্রনাথের জীবনী অনুশীলনে আমরা এই তথ্যটি লাভ করি।

যে দিন অল্প বয়সে তাঁর মস্তকে দারুণ বিপদ পড়ল, আজ তাঁদের যে ঐশ্বর্য্য বিভব আছে, কাল আর তা থাকার সম্ভাবনা রইল না, যেদিন স্বেচ্ছাক্রমে ট্রষ্ট সম্পত্তির সঙ্গে সকল সম্পত্তি পাওনাদারদের দিতে প্রস্তুত হলেন—সে দিন তাঁর মনে কত আনন্দ, বিষাদের লেশমাত্র নেই। সে দিন তাঁর বোধ হল ব্রহ্মলাভের আর এক সোপানে আরোহণ করলেন।

"ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম, নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। হে ঈশ্বর অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।"

এটি দৈবাৎ ঘটে। বিভবশালীর বিভবহানির ভয়ে শুধু নির্ভাবনা নয়, বরঞ্চ আনন্দানুভব দুর্লভ দৃষ্টান্ত। তাই যীশু বলেছিলেন—উষ্ট্রের পক্ষে ছুচের ছিদ্র পথে বাহির হওয়া বরঞ্চ সম্ভব, কিন্তু ধনীর পক্ষে ব্রহ্মানন্দলাভ একেবারে অসম্ভব। এই অসম্ভব রাজর্ষি জনকের তুল্য যাঁতে সম্ভব হয়ে ছিল—সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে যে কেহ ব্রহ্মপথযাত্রী হতে চাই তাদের বারম্বার স্মরণীয়।

দেবেন্দ্রনাথ চিহ্নযুক্ত বহিঃসন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন, অন্তঃসন্ন্যাসই তাঁর বরণীয় ছিল। এবিষয়ে স্বভাবভেদে ও রুচিভেদে মতভেদ থাকলেও তিনি যা সত্য বলে অনুভব করেছিলেন তার প্রচার করে নিজের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করেছিলেন প্রত্যেক মানুষচিত্তে প্রতিফলিত সত্য পূর্ণসত্যের অংশ-বিশেষ, সুতরাং একটি খণ্ডসত্য; তা দেশে খণ্ড, কালে খণ্ড ও পাত্রে খণ্ড। একটি খণ্ডসত্যের সঙ্গে আর একটির বিরোধিভাবও থাকতে পারে। যেমন দেবেন্দ্র নাথ স্বয়ং ভিন্নদেশের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বলেছেন—"কারো উপাদেয় খাদ্য, কারো ঘ্রাণেরও অযোগ্য।" ভারতের সাকার নিরাকার উপাসনা তত্ত্ব সম্বন্ধেও সেইরূপ খণ্ডসত্যের হিসেবে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু যে কাল, যে দেশ ও যে পাত্রে তাঁর অনুভূত সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেকালে সে দেশে ও সে পাত্রে তার প্রয়ো-

জনীয়তা যে ছিল তা সর্ব্ববাদিসম্মত। আজ বাঙ্গলাদেশে ব্রহ্মের অবগুণ্ঠন যে খুলে গেছে, সত্যের আবরণ যে অপসৃত হয়েছে, রামমোহন রায়ের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি প্রীতি ও প্রচার-কার্য্যই তার একমাত্র কারণ। যিনি অর্থশালী, যিনি সাবধর, তাঁর মতি যদি ব্রহ্মপদে যায় তবে তিনি কতজনের মতি ফিরাতে পারেন, মানবসমাজের কত উপকার করতে পারেন তারও দৃষ্টান্ত দেবেন্দ্রনাথ। ঐশ্বর্য্য তাঁর ব্রহ্মোপাসনার বাধক ছিল না সাধক হয়েছিল। হিমালয় বাস মহর্ষির প্রিয় ছিল, সেখানকার শুভ্র নির্ম্মল হাওয়ায়, প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে ঈশ্বরকে অন্তরের অন্তরে অনুভব করতেন। কিন্তু ব্রহ্ম যে শুধুই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বা বিরলে ধ্যান ধারণার উপলভ্য নয়—ব্রহ্ম যে 'প্রতিবোধ বেদিতব্যং', জীবঘন ব্রহ্মের উপাসনা যে জীবসেবা ও জনসেবার দ্বারাই বিধেয়, তা একদিন পার্ব্বত্য নদী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল। দেখলেন সেখানে নদী কত নির্ম্মল ও শুভ্র। এ নদী যতই নীচে যাবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জনা তাকে মলিন ও কলুষিত করবে। তবুও আপনার জন্যে স্থির থাকার ক্ষমতা তার নেই। সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হয়েও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করবার জন্য ঔজ্জ্বল্য ভাব পরিত্যাগ করে তাকে নিম্নগামিনী হতে হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে নিজের হৃদয়ের অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশবাণী শুনলেন—তুমি ঔজ্জ্বল্যভাব পরিত্যাগ করে এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্যলাভ করলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করলে, যাও পৃথিবীতে গিয়ে তা প্রচার করো।—তাঁর হৃদয়ের সেই বাণী যেন আমাদের সকলেরই হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে সার্থকতার পথে নিয়ে যায়।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

পুষ্পাঞ্জলি

বড়দাদা

পরম পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ, আমাদের বড়দাদা, অমর লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তিনিই 'ভারতী'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি বার বার প্রণাম করিতেছি। তাঁহারা চারিটী ভাই, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কাব্যে, নানাভাবে, নানাছন্দে দেবেন্দ্র প্রাসাদ আলোকিত ও ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে তিনজন সরিয়া পড়িলেন, এখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ গোবর্দ্ধনধারীর ন্যায় অঙ্গুলি অগ্রে সেই প্রাসাদ-সম্পদ রক্ষা করিতেছেন। ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করুন।

বড়দাদা শুধু আমাদেরই বড়দাদা ছিলেন না। বয়োঃজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ও দেব-গৌরব এই অমর কবি সমগ্র বাংলা দেশের,—শুধু বাংলা দেশের কেন,—সমগ্র ভারতেরই বড়দাদা ছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, তাঁহার পরিচিত বিদেশীজনও তাঁহাকে বড়দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই মহাপুরুষকে ভ্রাতৃরূপে পাইয়া আমি ধন্য। আমাদের ভাই বোনের প্রীতি ভক্তি স্নেহভালবাসা কি গভীর কি সুমধুর ছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। সে কথা যখন মনে মনে আলোচনা করি, তখন হৃদয় সৌভাগ্য-আনন্দে উথলিয়া উঠে। বড়দাদার সঙ্গে আমার যে সদাসর্ব্বদা পত্রলেখালেখি চলিত, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাকে যখনই পত্র লিখিতাম তিনি কিরূপ স্নেহমাখা উত্তর দিতেন, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠক দেখিবেন যে পত্রখানি তাঁহার বহুদিনের লেখা নয়।

শান্তিনিকেতন
২৬ কার্ত্তিক ১৩৩০

স্নেহের বোন্‌টী আমার—

আমার হাতে এখনো কতকগুলি করনীয় কার্য্য অবশিষ্ট আছে। সেইগুলি শীঘ্র শীঘ্র চুকাইয়া ফেলিতে আমি নিতান্তই আগ্রহান্বিত। যমের দুয়ারে কাঁটা দিবার একণে তুমি বই আর আমার কেহই নাই; সুতরাং তোমার এবারকার ভাই ফোঁটা ঠিক্ আমার সময়োপযোগী, আর সেইজন্য তাহা আমি অতিশয় যত্ন সমাদরের সহিত ললাটে বরণ করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখুন ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। দিবাধামস্থিত

আমাদের প্রাণের ভাই সতুর বিরচিত একটী ব্রহ্মসঙ্গীত এক্ষণে আমার জপমালা হইয়াছে। সে গীতটি এই :—

কেহ নাহি আর আমার—সব তুমি। লয়েছি শরণ তব চরণে দীননাথ। যদি পাই তোমার চরণ ছায়া নাহি ডরি করাল কালে।

হায়! বিন্নু নাই—কে এটা গাইয়া আমাকে শুনাইবে।

তোমার নিয়ত শুভাকাঙ্খী

বড় দাদা—

পুনশ্চ :—এই সঙ্গে আর একটী ব্রহ্মসঙ্গীত আমার মনে পড়িতেছে। সেটা আমার স্বহস্ত বিরচিত। সে গীতটী এই :—

গভীর বেদনা
অস্থির প্রাণ।
করহে আমারে
শান্তি দান॥
মোচন করহে পাপ তাপ।
ঘুচাও রোদন বিলাপ॥
যে যায় যা'ক্—যে থাকে থা'ক্—
শুনে চলি তোমার ডাক॥
কেবলি তোমার আশ্রয়ে
তরিব সাগর নির্ভয়ে॥
তুমি বিনা কর্ণধার
কেহ নাহি আর আমার॥"

ইহারই কয়েক মাস পূর্ব্বে মেজদাদার মৃত্যু হইয়াছিল তাই মনে হয় তাঁহার শোকস্মৃতিতে তিনি এরূপ গভীর বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে এমনই প্রগাঢ় প্রেম বন্ধন ছিল যে উভয়ে যেন একাত্মস্বরূপ ছিলেন। অথচ সামাজিক সমস্যায় উভয়ের খুবই মতভেদ ছিল। বড়দা ছিলেন রক্ষণনীতিশীল, মেজদা ছিলেন পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ উন্নতি-পন্থী। এই বিষয় লইয়া দুইজনের মধ্যে রীতিমত তর্কাতর্কী চলিত। আর আমরা শ্রোতৃবর্গ সকৌতুকে তাহা শুনিয়া নিজ নিজ মত রচনা করিতাম। তবে অবশেষে সত্যের নিকট দ্বিজকে পরাস্ত মানিতে হইয়াছিল। কালচক্রের সহায়তায় ক্রমশঃ বড়দাদাকে মেজদাদা অনেকটাই আপনার দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন।

উক্ত চিঠিখানি তিনি আমাকে স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার হাতের লেখাটিও সুন্দর ছিল—প্রকৃতই তাহা মুক্তাক্ষর। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ক্ষীণদৃষ্টি হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহার মস্তিষ্কশক্তি অব্যাহত ছিল। শেষ পর্য্যন্ত তিনি ছড়া-সম্বলিত যে সকল পত্রাদি লিখিয়া

গিয়াছেন তাহা অতীব রসমধুর। তিনি আমাদিগকে যে ভালবাসিবেন, স্নেহ করিবেন, তাহা কিছু বেশী কথা নহে। আমরা তাঁহার আপনার জন। কিন্তু পরকেও তিনি পর করিতে জানিতেন না। যে কেহ তাঁহার নিকটে আসিত, তাহাকেই তিনি সরল হৃদ্যতায় প্রীতি-পাশে বদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহার শিষ্টাচার-সৌজন্যে কিছুমাত্র কপটতা ছিল না। কেবল মানুষ নহে, বনের পশু পক্ষী, জীব-জন্তুও তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহাকে আপন করিয়া লইত। তিনি বসিয়া থাকিতেন, আর কাক, শালিক, কাঠ-বেড়ালী প্রভৃতি, কেহবা মস্তকে, কেহ বা শরীরে, কেহ বা পদপ্রান্তে খেলা করিয়া বেড়াইত।

প্রকৃতই তিনি ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন। দেখিতে সৌম্য-সুন্দর, স্বভাবে সরল সহৃদয়, জ্ঞানে মনীষী পণ্ডিত এবং সাহিত্যে ভারতীর একটি বরপুত্র ছিলেন। দর্শন, গণিত, ও তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এরূপ রচনা বাংলা সাহিত্যে আর নাই ইহা বোধ হয় বিশ্ব-মণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইবেন, তবে তৎপ্রণীত উক্ত কঠোর তত্ত্ব সকল সর্ব্ব-সাধারণের মনোরঞ্জক পাঠ্য হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা দেশবিদিত। তাঁহার প্রতি কাব্যখানি এমন কি ক্ষুদ্র ছড়াগুলিও সাহিত্য-রসে ভরপুর। ছন্দ লালিত্য তাঁহার রচনার একটি প্রধান গুণ। ছন্দের উপর অপরিসীম প্রভুত্বে তিনি বাংলার আদি মৌলিক কবি।

ললিতকলালেতেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ একটা জ্ঞান ছিল। আমরা ছেলেবেলায় তাঁহাকে হারমোনিয়ম্ বাজাইতে দেখিয়াছি, বাঁশীও বাজাইতেন, কত প্রকারের বাঁশী আসিয়া তাঁহার ঘরে জমিত তাহার ঠিক্ নাই। পরে একটির পর একটি করিয়া দান-খয়রাতে পুরাণোগুলি চলিয়া যাইত এবং নূতন বাঁশীতে তাহার স্থান পূর্ণ হইত। কেহ কিছু প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাহাকে না বলিতে পারিতেন না। এইরূপ দানশীলতার জন্য তাঁহার মাসোহারা প্রায় চার পাঁচ শত টাকা যাহা পাইতেন, সমস্তই ব্যয় হইয়া যাইত। তখনকার দিনে তিনি ছবিও আঁকিতেন। মনে পড়ে, আমাকে বসাইয়া মধ্যে মধ্যে ছবি আঁকিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ চর্চ্চা বরাবর রাখেন নাই। বোধ হয় তত্ত্ববিদ্যার আগ্রহে পরে এ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কত আর লিখিব? তাঁহার গুণের কথা লিখিয়া ফুরাণ যায় না, তিনি বিশ্বে যে স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ গুণ কীর্ত্তন অন্যের মুখেই শুনিবার অভিলাষ করি। হে স্বর্গীয় ভ্রাত, তোমার গুণ, তোমার স্নেহ স্মরণ করিয়া আমি প্রীতিভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দানে তোমাকে বার বার প্রণাম করি। তুমি অমর লোক হইতেও স্নেহাশীষ প্রদান করিয়া আমাকে ধন্য কর।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

বড় জ্যাঠামশায়

ভাই সরলা

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ—
সাগর সীমায় যথা অস্ত যায় অস্ত তপন।
স্বপন রমণী—আইল অমনি—
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা—করে পদার্পণ!"

বড় জ্যেঠামশায়ের 'স্বপ্নপ্রয়াণের' এই কটি ছত্র কবিতা—নয় বৎসর বয়সে আমার কাছে যেমন মনোহারি ছিল আজ পঞ্চান্ন বৎসরেও ঠিক তেমনি রয়েছে। জীবনের প্রাতঃসন্ধ্যায় যে স্বপ্ন পুরে নিয়ে গিয়েছিল মনকে টেনে এই কবিতা, আজও সায়ং সন্ধ্যায় এই কবিতারই ছন্দ ধরে গিয়ে উপস্থিত হল মন সাগরতীরে স্বপ্ন-পুরের দরজায়। আমার আজ মনে পড়ছে জ্যেঠামশায়ের তেতালার ঘরের সামনের ছাদে দুপুর বেলার রোদ পড়েছে, আমরা ছোট ছোট সবাই ছেলে ছাদের পাঁচীল বেয়ে বাড়ির এমহল থেকে ও মহলে খাবার চুরি করতে চলেছি, সেই সময় জালনার ফাঁকে কোনদিন দেখা যেতো জ্যেঠামশায় বই লিখছেন, নয়তো—গান রচনা করছেন—কিম্বা কালো রংএর একটা বাঁশি বাজাচ্ছেন—তখন মনে হতো আমরাও কবে ওমনি বড় হবো বই লিখবো, গান গাইবো। সেদিন আবার যখন আমারো চুল পেকেছে, হাতের লেখা রঙ্গীন হয়ে ফুটেছে, সুরে বেসুরে বাঁশিও বেজে গেছে—সেই আর এক সন্ধ্যায় বোলপুরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখলেম জ্যেঠামশায় ঠিক সেইভাবে একলা চৌকিতে বসে লিখছেন আর আমাদেরই মতো গোটা কতক দুষ্ট ছেলে আর দুষ্ট পাখি কাঠবেড়ালী কাক তারা কেউ ঘরের দাওয়ায় কেউ খিড়কির বাগানে ঘুর ঘুর করছে! ছোটতে আর বড়তে শৈশবে আর বার্দ্ধক্যে এমন সুন্দর মিলন স্মৃতি বড় দুর্লভ, মালিকের মতো আমার বুকের কৌটাতে ধরে দিয়ে গেছেন আমার—জ্যেঠামশায়, সে কৌটা সবার সামনে খুলতে নেই, সব সময়েও খুলতে নেই! যাঁর লেখার মধ্যেদিয়ে আমি আমার নিজের ভাষা খুঁজে পেলেম তাঁকে স্বর্গ লোকের পরপারে দিয়েও মন আমার প্রণতি দিয়ে এল এইমাত্র।

তোমারি—
অবন দাদা—*

---

* দ্বিজেন্দ্রনাথের খুড়তুতো ভ্রাতুষ্পুত্র।

জ্যাঠামহাশয়।

শ্রদ্ধাভাজনের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশ্যে লেখাকে পুষ্পাঞ্জলি বলতে সঙ্কোচ হয়, কারণ ফুলের মত নিটোল সুন্দর কিছু গড়ে তোলা আমাদের মত অধিকাংশ লোকের সাধ্যায়ত্ত নয়; তবে অঞ্জলির মধ্যে যে শ্রদ্ধার ভাব আছে, আশা করি সেটি স্বতঃই প্রকাশ পাবে।

আত্মীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু লেখা বিশেষতঃ প্রকাশের জন্য লেখা, আত্মীয়ের পক্ষে একটু শক্ত। কারণ আত্মীয়সমাজ ও অনাত্মীয় সমাজের কাছে একই ব্যক্তির দুই বিপরীত দিক প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। অপর পক্ষে মৃত্যুর ব্যবধান যে দূরত্ব আনে তা'তে এইদুই জীবিত দল পরস্পরের অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে আসে, এবং সমদৃষ্টে দেখবার সুযোগ লাভ করে—বরং আত্মীয়রা তখন যেন আপন পরের সীমানায় এসে দাঁড়ায় বলে' দুই দিক একসঙ্গে সুতরাং সম্পূর্ণতর ভাবে দেখতে পায়। কিন্তু শুধু দেখার সুযোগ পেলেই হয় না,সেই সঙ্গে দেখবার মত মনশ্চক্ষু থাকা চাই। আমরা বেশির ভাগ লোকই পরস্পরকে শুধু চোখ দিয়েই দেখি, মন দিয়ে দেখি নে; এবং কোন ব্যক্তির সমগ্র জীবন আলোচনা করবার জন্য যে উদার অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দরকার তার ধার ধারিনে।

পূজনীয় ৺দ্বিজেন্দ্র নাথ ঈশ্বর কৃপায় যে দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন, তা'তে তাঁর সমসাময়িক লোক ছাড়া আর কারো পক্ষে তাঁর বাল্যকথা জানা সম্ভব নয়। আবার শেষ জীবন যেরূপ অন্তরালে অতিবাহিত হয়েছিল, তাও আমাদের অনেকের দৃষ্টিপথের বাইরে। অতএব ধরতে গেলে আমাদের পরিচয় তাঁর মধ্যজীবনেই সীমাবদ্ধ।

এক পরিবারে একসঙ্গে বা কাছাকাছি বাস করলে সে পরিচয় যেরকম ঘনিষ্ট হয় তারও অবকাশ আমাদের বড় ছিল না; কারণ ঘটনাচক্রে আমরা দূরে দূরেই মানুষ হয়েছি, দেশেই হোক, বিদেশেই হোক। এই কারণে তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ কিছু নতুন কথা বলতে পারব এমন স্মৃতিসম্বল আমার নেই; তবে মাঠের উপর একই পথ দিয়ে দশজনে চল্‌তে চলতে যেমন সেইটেই মেঠো রাস্তা হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি সাধারণে তাঁর বিষয় যা' জানে সেইটেই পুনরাবৃত্তি করতে করতে তাঁর একটা যথার্থ প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে।

তাঁর আশ্চর্য্য অধ্যবসায় অদম্য স্ফূর্ত্তি ও একাগ্র সাহিত্যানুরাগ বোধহয় পারিবারিক উত্তরাধিকারে লব্ধ; আর তাঁর বিষয়-বিরাগ, সর্ব্বভূতে অনুরাগ এবং হস্তনৈপুণ্য মনে হয় স্বোপার্জ্জিত। মনে আছে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন যে পিতার ইচ্ছানুকূল বিষয়কর্ম্ম তত্ত্বাবধানে তিনি যে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তা'তে মহর্ষিদেবের বোধ হয় আশাভঙ্গ হয়েছিল, এখন মনে হয় তাঁর মনে সে কষ্টটা না দেওয়াই উচিত ছিল। সম্পত্তি থাকার ফল যে ভোগবিলাস, তার অভাব তিনি বোধ হয় কখনোই অনুভব করেননি, অপরপক্ষে সম্পত্তি হাতে থাকার ও নাড়াচাড়া করবার যে একটা ক্ষমতার সুখ আছে, সেদিকে তাঁর কোনদিন স্পৃহা ছিল না;

এইখানেই তাঁর অসাধারণত্ব। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় তাঁকে গৃহী হিসেবে, পরিবারের কর্ত্তা হিসেবে কখনো দেখ্‌তে পাইনি, সর্ব্বদাই লেখাপড়া, হাস্যরস নিয়েই যেন ছিলেন। তাঁর সেই সদানন্দ উচ্চহাস্য এখনো কানে বাজছে। সংসারে থেকেও তিনি অসংসারী ছিলেন,—in the world but not of it, তাঁর এই ছবিটাই মনে জেগে আছে। সংসার তাই বলে' তাঁকে ছাড়েনি,—যখন গৃহী হয়েছিলেন ছাড়বেই বা কি করে? কিন্তু তার ঝালাঝালায় তিনি বিরক্তিই বোধ করতেন, কর্ণধার হয়ে কখনো চালাবার চেষ্টা করেন নি। বাতে যখন হাতের আঙুল বেঁকে গেছে, তখনো লিখ্‌ছেন, কেবলি লিখ্‌ছেন; কেবলি হাস্‌ছেন। সংসারকে যেন আমল দেননি। সংসার সাগরে ভাসমান দেহতরীকেও কখনো প্রশ্রয় দেননি; তার ইঙ্গিতে তিনি চলেননি, তাঁর হুকুমে সে চলেছে। এবং চলেছে কেমন,—"মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে"—এই ভাবে; শেষ পর্য্যন্ত কোন ঝড় ঝঞ্ঝায় টলেনি, কোন ধাক্কায় কাৎ হয়নি, একেবারে দুল্‌তে দুল্‌তে সাগরের মোহানায় পৌঁছে দিগন্তে মিশে গেছে। শীতকে শীত, গ্রীষ্মকে গ্রীষ্ম জ্ঞান করেন নি; রোগকে ভয় করেন নি; জরাকে ফাঁকি দিয়েছেন। জ্বরের উপর ভোরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করেছেন, অসুখের উপর যা' খুসি তাই খেয়েছেন,—এক কথায় ডাক্তারী শাস্ত্র অগ্রমাণ করে দিয়েছেন। কি শরীরই ভগবান দিয়েছিলেন। যৌবনকালে নিশ্চয়ই অতি বলিষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন। আমরাও যখন দেখেছি তখন তাঁর কাছে যুবারা হার মেনে যেত; তাদের পিছনে ফেলে রেখে তিনি রোদ্দুরে হন্ হন্ করে' পুরীর বালির উপর দিয়ে চলেছেন,—একদিনের এই দৃশ্য মনে পড়ে।

তাঁর পশুপক্ষী-প্রীতি সর্ব্বজনবিদিত। চড়াইকে খাওয়াবার জন্যে ছাতুর হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকা, কাঠবিড়ালীকে গায়ে মাথায় ঘুরে বেড়াতে দেওয়া প্রভৃতি কথা অনেকেই জানে। শুনেছি একবার একটা কাককে তাড়িয়ে দিয়ে অনুতপ্ত হয়ে আবার ডেকে আনতে বলেন; কিন্তু তাঁর পক্ষে সে হুকুম দেওয়া যত সহজ, চাকরদের পক্ষে তামিল করা তত সহজ হয়নি! ভোলা মহেশ্বরের মত অন্য বিষয়েও যেমন, তেমনি আশুতোষও তিনি ছিলেন,—ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট। একবার একটা চাকর রুটি খারাপ করার পর একদিন ভালরুটি তৈরি করেছিল বলে নাকি তার গোঁফের দুইদিক দুই হাতে ধরে' তালে তালে টানতে টানতে ছড়া কেটে বলেছিলেন :—

"রোজ রোজ এমন রুটি হয় না কেন, হয় না কেন" ইত্যাদি। তারপরে সে দুঃখিত হয়েছে মনে করে আবার তাকে ডেকে এনে বক্‌শিষ্ দিয়েছিলেন।

তাঁর বালসুলভ সরলতা ও রঙ্গরসপ্রিয়তার গল্প আরম্ভ করলে আর শেষ হবে না, তবে এইটুকু বলে রাখা দরকার যে এই সুরসিকতা তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে দীপ্যমান ও তাঁর মনোবৃত্তির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে ধর্ত্তব্য।

তাঁর লেখাক্ষর বর্ণমালা, বা বাঙ্গলা shorthand প্রথাও অনেকের নিকট পরিচিত, এবং বোধহয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত। তার উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে আমি অক্ষম,

কিন্তু তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছোট ছোট কবিতাগুলি সকলের মনোহরণ করবে সন্দেহ নেই। কাগজের নানারূপ বাক্স খাতা প্রভৃতি তৈরি করা তাঁর এক সখের মধ্যে ছিল। তাতে কত যে হিসাব ও দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তা যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। বোধ হয় এটা তাঁর জ্যামিতিজ্ঞানের বাহ্যপ্রকাশ। আমি একবার বলেছিলুম যে কাগজের মত ক্ষণস্থায়ী জিনিষে না গড়ে যদি আর একটু শক্ত উপাদানে তৈরি করা যায় ত এমন সুন্দর বাক্সগুলি কতরকম কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু খেয়ালীর কাছে স্থায়িত্বের এমন কিছু মূল্য নেই; তিনিও এ সাংসারিক পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর এ সহজ বিদ্যা আর কাউকে দান করে গেছেন কি না জানিনে। এটি ইস্কুলের ছেলেদের হাত-সাফাই শেখাবার পক্ষে খুব উপযুক্ত জিনিষ।

তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে হিতিশীল, ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধী-পন্থী ছিলেন। কিন্তু দেশের লোকের কাছে বোধ হয় তিনি কবি বলেই বেশি খ্যাত ছিলেন ও চিরকাল থাকবেন। 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র মত একখানি বইয়েতেই তিনি যে ভাষার লালিত্য, ছন্দের বৈচিত্র্য ও ভাবের মাধুর্য্য দেখিয়েছেন, তা' যে কোন দেশের সাহিত্যে দুর্লভ বলে' আমার বিশ্বাস। তাঁর প্রকাশিত "কাব্যমালা" ও "প্রবন্ধমালা"য় তাঁর গদ্যপদ্য দুয়েরই নমুনা কাব্যামোদী পাঠক দেখতে পাবেন; আর সংস্কৃত কথার সঙ্গে অতি চলতি বাঙ্গলা শব্দের যে অপূর্ব্ব মিশ্রণ তাঁর লিখনভঙ্গীর বিশেষত্ব ছিল, সেটি পাতায় পাতায় লক্ষ্য করতে পারবেন।

তাঁর মনের আর একদিকের প্রকাশ, যা' তাঁর দার্শনিক রচনায় দেখতে পাওয়া যায়, সে বিষয় আমি কিছু বলতে অপারগ, দার্শনিক পাঠকই তার সুবিচার করতে পারেন। এইটুকু মনে আছে যে তিনি বসে থাকতে থাকতে যখন-তখন চোখ বুজে ধ্যানস্থ হতেন। সে সময়ে কি দেখতেন, কি ভাবতেন, তা' মন্দমতি আমরা কি বুঝব? এই সেদিন শুনলুম যে শেষ সময়েও তিনি কি-এক আনন্দ পেয়েছেন, দর্শন পেয়েছেন; তাঁর নিকটস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে পরে সে বিষয় সবিশেষ শোনবার ইচ্ছে আছে। ও-পারের সবই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমরা কেবল এইমাত্র আশা করতে পারি যে দেহান্তে তিনি প্রিয়সমাগমে শান্তি লাভ করেছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।*

---

* ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা।

দাদামহাশয়।

নিভৃত কুটীর ঘেরি' চামেলি টগর
দেবতা আশিষসম আঙিনার' পর
ঝরিয়া পড়িছে শান্ত প্রভাতবেলায়।
ক্ষীণ আমলকশাখা পবন-দোলায়
নৃত্যে মাতি' নীলিমার সাথে কোলাকুলি
করিছে রজনীদিন, শ্রান্তি গেছে ভুলি।
স্তব্ধ রম্য তপোবন, নানা বিহঙ্গম।
নির্ভয়ে মানবসাথে ফিরে বন্ধুসম।
তারি মাঝে দ্বিজোত্তম সদা ধ্যানরত
ছিলে তুমি আত্মভোলা শঙ্করের মত।
প্রভুভৃত্যে সমভাব, সম আত্মপর,
সত্যেরে আঁকড়ি' তাহে একান্ত নির্ভর
ছিল তব ; আজি পুণ্য জীবনের জ্যোতি
লভিল নির্ব্বাণলোকে শান্তি সুমহতী।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

---

* ৺ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৺ দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।

বাবামহাশয়।

আমাদের বাবামহাশয় আমাদের কাছে দার্শনিক, কবি, জ্ঞানী পণ্ডিত নন, আমাদের কাছে তিনি দয়ার সাগর, সরল শিশুহৃদয় বাবামহাশয়। আমরা চিরদিন তাঁকে বাবামহাশয় বলেই জেনে এসেছি, বাবামহাশয় বলেই ডেকে এসেছি। বাবামহাশয় আছেন এইটা ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত, তিনি নাই এটা আমাদের কাছে যেন নিতান্তই অস্বাভাবিক। শিশুহৃদয় বাবামহাশয় নিজের বাবার কাছে চিরদিন শিশুর মত হয়েই ছিলেন, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসিত না হয়ে তিনি কোনদিন কোন কথা তাঁর বাবার সঙ্গে কয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। আমার কাছে তিনি বলেছিলেন, "জিজ্ঞাসিত না হয়ে কোন কথা কর্ত্তার সঙ্গে আমি বোধ হয় কখনো কই নাই, আর আজকালের ছেলেদের দুপাতা ইংরাজি পড়ে হল কি?" কথায় কথায় বাপ পিতামহকে তারা হুট করে দিচ্ছে যেন তাঁরা কিছুই না, আর নিজেরা প্রত্যেকে এক একটি ধুরন্ধর—মস্ত বাহাদুর"! একদিকে বাপের কাছে বালকের ন্যায় এইরূপ সঙ্কোচ সমীহভাব, অন্যদিকে ছেলের উপর বিষয়কর্ম্মের ভার চাপিয়ে নিজে তার থেকে সরে থাকতে পারলে বাঁচেন, এই ছিল তাঁর কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহাশূন্য আর এক ভাব। কর্ত্তৃত্ব করার ইচ্ছা বা ভাব তাঁর একেবারেই ছিল না। অবশ্য-প্রয়োজনীয় হিসাবে কোন কর্ত্তৃত্বভার যদি জোর করে কখনো তাঁর উপরে এসে পড়ত তবে তিনি প্রমাদ গণতেন। বাস্তবিক পক্ষে বিষয়কর্ম্ম তাঁর কাছে বাঘ ঠেকত। কোন কিছু সই করার সময়, কি বিষয় সই করবেন এটা ভাল করে বুঝতে হলে বা আগাগোড়া শুনতে হলে তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ত। শোনবার আগে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন, শোনা হয়ে গেলে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচতেন। কর্ত্তৃত্ব করা বাবামহাশয়ের ধাতে ছিল না। জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, পাণ্ডিত্য আছে অসামান্য প্রতিভা আছে অথচ কর্ত্তৃত্বের ভাব নাই একাধারে এমন শিশুবৃদ্ধ মানুষ আর কোথাও আছে কি না জানি না। সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্ক, হৃদয় চিন্তাধারার প্রস্রবণ, কিন্তু নিরহঙ্কারী বাবামহাশয় কোন কিছু একটা লিখে কেবলই বলতেন "লেখাটা আমার ঠিক হয়েছে কিনা, ভাবটি যথাযথ প্রকাশ হয়েছে কিনা, এবং ভাবটির ও তোমাদের অন্তরস্থ সত্যের ভাব বা ধারণার সঙ্গে মিল আছে কিনা ভাল করে পড়ে দেখে বুঝে আমাকে বল। তোমাদের সায় না পেলে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হ'বে না।" আমরা যদি বলতুম, "বাবামহাশয় আপনি লিখেছেন তার উপরে কি আবার আমাদের দেখতে হবে? আমাদের কতটুকু জ্ঞান, কতটুকু প্রাণ, কতটুকু বুদ্ধি, কতটুকু মস্তিষ্ক যে আমরা এর ভাল মন্দ বুঝতে বা বিচার করতে পারব।" উত্তরে তিনি বলে উঠতেন "আচ্ছা আচ্ছা অত মুর্খ সাজতে হবে না, ঢের হয়েছে, এখন যা বলছি তাই কর, লেখাটা পড়, ভাল করে ভেবে বোঝ, ও কি মনে হয় তাই বল।" কি করি, যা তিনি আজ্ঞা করবেন তাইত করতে হবে, পড়ে দেখে যা মনে হত বলতুম, তাতেই তিনি খুব

খুসী হতেন। অন্তের জ্ঞান ও অন্তের আত্মাগত অনুভূতির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস, আস্থা বা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যে একান্তভাবে অহঙ্কারশূন্য ছিলেন, অন্য আত্মার প্রতি এই ঐকান্তিক বিশ্বাসই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আত্মানুভূতির সঙ্গে অহঙ্কার জড়িত থাকলে অন্য আত্মার অনুভূতির উপরে এরূপ অটল বিশ্বাস জন্মায় না যেরূপ বিশ্বাস বাবামহাশয়ের ছিল। মূলে, ঈশ্বরবিশ্বাস বাবামহাশয়ের অন্তরে খুব সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকায় নিজের ও অন্যের জ্ঞানগত ভুলকে তিনি সর্ব্বনাশ বলে বোধ করতেন না, নিজের জ্ঞানের উপরে তিনি ভরসা রাখতেন না, জ্ঞানাতীত জ্ঞানের উপরেই (যাঁর আর এক নাম ভগবান) ষোল আনা ভরসা রাখতেন এবং এই বিশ্বাসবলেই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ভগবানের অভয়পদ হৃদয়ের মধ্যে লাভ করে মনুষ্যজন্ম সার্থক করে গেছেন। তাঁর জীবনচরিতে এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এখন তাঁর স্বভাবের আর কিছু পরিচয় দিই। নিজের বাবার মৃত্যুতে যখন তিনি বিষয়ের অধিকারী হলেন, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি যে আজ জমিদারী বাড়ীঘর বিষয়সম্পত্তির মালিক এ ভাব মুহূর্ত্তের জন্যে তাঁকে স্পর্শ করল না! পিতৃশ্রাদ্ধের পরদিনই তিনি বল্লেন, "আমি রায়পুরে রবিসিংহের বাড়ী যাব তার সব বন্দোবস্ত করে দাও।" সেইমত বন্দোবস্ত হল। পিতৃশ্রাদ্ধের দুইদিন পরে, বিষয় সম্পত্তির মালিক বাবামহাশয়, একমাত্র উমেশ চাকরকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্র-সিংহের রায়পুরের খড়ের ঘরে থাকার জন্য যাত্রা করলেন। পিতৃবিয়োগে বৈরাগ্যবশতঃ যে এই যাত্রা তা নয়, নিজের স্বভাবধর্ম্ম অনুসারেই তাঁর এ যাত্রা, তাঁর মন সেইখানে গিয়ে ছাড়া পায়, সেখানে তিনি মনের আনন্দে থাকেন, তাই চল্লেন, এই তাঁর প্রকৃত ভাব. এরূপ যাত্রার মধ্যে কোথাও যে কিছু অসাধারণত্ব আছে বা থাকতে পারে ক্ষণকালের জন্যে কল্পনাতেও এমন তাঁর মনে আসে নাই, কারণ এটা তাঁর পক্ষে নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। বাবামহাশয় রায়পুর গেলেন সঙ্গে একটি মাত্র চাকর, রাঁধবার লোক, রান্না খাওয়ার বাসনপত্র কিছুই সঙ্গে দেওয়া গেল না এত তাড়াতাড়ি তিনি চলে গেলেন। দু'তিন দিন পরে বাসন-কোসন চা মিছরি ডাব প্রভৃতি সঙ্গে দিয়ে পুঁটেকে তাঁর রাঁধার জন্যে আমরা রায়পুর পাঠিয়ে দিলুম। কয়েক মাস বাবামহাশয় রায়পুরে রইলেন, সেখানে সিংহিমশায়ের একান্ত যত্ন ও সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন তাঁর কাছে রামপ্রসাদী গান শোনার কথা বাবামশায় কখনো ভোলেন নাই। কর্ত্তাদাদা মহাশয়ের মৃত্যুর পরে বিষয়কার্য্যের ব্যবস্থাদি শেষ হওয়ার পর আমরা শান্তিনিকেতন চলে আসি ও রায়পুর থেকে বাবামহাশয়কে শান্তিনিকেতনে আমাদের কাছে আনিয়ে নেওয়া হয়। কিছুদিন শান্তিনিকেতনের কুঠিতে বাস করার পর নীচুবাংলায় তাঁর জন্যে ঘর তৈরী হয় ও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই ঘরটিতেই তিনি কাটিয়ে গেছেন। এই দীর্ঘ একুশ বাইশ বৎসরের মধ্যে তিনি একবার পুরী, দুবার ভাইদের কাছে রাঁচী ও নিউমোনিয়া হওয়ায় চিকিৎসার জন্য একবার কলিকাতা গিয়েছিলেন মাত্র। নীচুবাংলার এই ছোট ঘর ও ঘরের সঙ্গ বারণ্ডাটিতে এই সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর কাল তিনি একইভাবে কাটিয়ে গেলেন। ভোরে স্নান, সকালে বারণ্ডায় বসে চা খাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত শালিক পাখী, কাঠবিড়ালীদের ছাতু মেখে খাওয়ান তাঁর নিত্য

নিয়মিত কাজ। চাকর বাকর বা আমরা কেউ হঠাৎ গিয়ে পড়ায় পাখী উড়ে গেলে বা কাঠবিড়ালীরা দৌড়ে পালালে রক্ষা থাকত না, বকে ঝকে অস্থির হতেন; তাই সকালবেলাটা খুব ভয়ে ভয়ে সাবধানে আমাদের যেতে হত, পাখী না উড়ে, কাঠবিড়ালী না পালায়, এমন কি কাকে পাত থেকে খাবার উঠিয়ে নিয়ে গেলেও তাকে তাড়াবার যো নাই। ইবানিং তাই খাবার সময় কাক আসছে দূর থেকে দেখলে ঈসারাতে চাকরদের জানাতুম 'কাকটা তাড়া', তারা কৌশলে পিছন দিক থেকে হাত নেড়ে কাক তাড়িয়ে দিত; কথা কয়ে বা কোনরকম শব্দ করে কাক তাড়ান চলত না। বাবামহাশয় ঐ জীবগুলিকে সত্যি সত্যি খুব ভালবাসতেন, তাই তাদিগকে কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া সইতে পারতেন না। ছোট ছেলে, বাবামহাশয় খুব ভালবাসতেন। খেতে খেতে মুনীশ্বরের (তাঁর চাকর) ছেলেদের খাইয়ে দিতেন, মুনীশ্বর বাধা দিতে খুব চেষ্টা করত, কিন্তু তাতে কেবল বকুনি খেত, কোন ফল ফলত না। শিশুদের মত বাবামহাশয় অভিভাবকবিহীন হলে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে বোধ করতেন।

যে দুর্ঘটনায় আমি চিরদিনের মত অসহায় হয়েছি, সেই দুর্ঘটনায় বাবামহাশয় আমা অপেক্ষা কম অসহায় হন নাই। তাঁর বিষয়সম্পত্তি তাঁর নিজেরই রইল এছাড়া আর সর্ব্ববিষয়ে তিনি অবিকল আমারই ন্যায় অসহায় হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায়, প্রথম দর্শনেই, আমাকে বল্লেন "বৌমা আমার দুই হাত, দুই পা একই সঙ্গে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল; তাঁর অভাবে, জীবন থাকা সত্ত্বেও এখন আমি অচল অবশ।" সেই থেকে আমাকে কেবলই ভরসা দিয়ে এসেছেন "ভয় নাই, ভয় নাই, ভগবান আছেন।"

ভগবানে বিশ্বাস তাঁর অটল ছিল। কেবলই বলতেন, "ভগবানকে অন্তরে ধরে রাখার মত যথেষ্ট বল আমার নাই বৌমা সেই হয়েছে বিপদ, তবে আমি জানি যে তিনি আমার প্রতি দয়া করবেন, কারণ একবার একসময়ে তাঁকে আমি পেয়েছিলুম, যদিও সে পাওয়া খুব অল্পদিনের জন্যে ঘটেছিল তবুও তার স্বাদ আমার জানা আছে, সে ভোলবার নয়, তখন সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল, কারো প্রতি আমার বিরাগ বিদ্বেষ কিছু ছিল না। ভগবানের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিতে পেরে তখন এমন হাল্কা হয়ে গিয়েছিলুম যে সে অবস্থার ভাব বলে অন্যকে বোঝান যায় না, নিজে না পেলে।" আরো বলতেন "তবে এখন আর সে অবস্থা আমার মধ্যে নাই আমি সেটা হারিয়েছি বৌমা, আমি বড় অযোগ্য কিনা তাই পেয়ে হারালুম; বড় অপাত্রে ঈশ্বর সেটা দিয়েছিলেন—এ যেন পথ ভুলে আসার মত।" এ প্রসঙ্গ কতবার, কতরূপে বাবামহাশয় যে আমার কাছে আলোচনা করেছিলেন, সেসকল বিস্তারিত বলার স্থান এ নয়, কেবল এই বলে শেষ করি যে মৃত্যুর পূর্ব্বে পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করে তবে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন, এটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। যেদিন, যে মুহূর্ত্তে এইরূপ একটি আবির্ভাব তিনি অন্তরের মধ্যে লাভ করলেন তখুনি আমাকে ডেকে বল্লেন "বৌমা শীঘ্র পাঁজি নিয়ে এসে আজকের এই দণ্ড মুহূর্ত্ত পল ইত্যাদি এখুনি লিখে রাখ।" আমি পাঁজি দেখে লিখে রাখলুম ১৩৩২ সাল ২৯শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথি দিবা ৭।১৯।১৫ মধ্যে

পুনঃ ৮।১।৩৯ গতে ১১।৩৩।৩৮ মধ্যে—অমৃত যোগ। সেই দিনই বেলা ১১টার পর তিনি "দিনের দ্বিতীয়" কবিতাটি লেখেন। এটা তাঁর মৃত্যুর ৩৫ দিন পূর্ব্বের ঘটনা। নির্ম্মল অন্তঃকরণের লোক না হলে কেউ ঈশ্বরের দর্শন পায় না। আমাদের সরল শিশুহৃদয় বাবামহাশয় শিশুদের মত একান্ত নির্ম্মল অন্তঃকরণের মানুষ ছিলেন, তাই মর্ত্তদেহে বালকালে, শেষ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করে গেলেন। তিনি অন্তরে বাহিরে অসহায় শিশু ছিলেন।—ভগবান বিনা অন্তরে ও অভিভাবক বিনা বাহিরে তিনি একান্তপক্ষে অসহায়—এই তাঁর স্বভাব।

আমার জীবনে নিদারুণ দুঃখপাতের পরে পূজনীয় নতুন কাকা মহাশয় (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমাকে লেখেন, "বৌমা তোমার এই অবস্থায় তোমাকে আমাদের আছে আনবার আমার খুবই ইচ্ছা, কিন্তু অসহায় বড়দাদাকে ছেড়ে কিছুতেই তোমাকে আসতে বলতে পারি না —তুমি তাঁর কাছেই থাক।" এরূপ অসহায় অবস্থায় যখন বাবামহাশয় ও আমি নীচু বাংলায় বাস করছি সেই সময় একদিন বাবামহাশয়ের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি বল্লেন, "আমার ডাব চাই।" দোকান থেকে চাকর ফিরে এসে বল্লে "ডাব আজ পাওয়া গেল না, দুদিন পরে দিতে পারে ফলওয়ালা বল্ল।" বাবামহাশয় অস্থির হয়ে উঠলেন, বল্লেন "আমার কেউ নেই, কে আমাকে দেখে তার ঠিক নেই, তুমি বৌমা তাঁর (স্বর্গগত ছেলের নাম করে) মত আমাকে দেখতে পার না, তার মত ব্যবস্থা করতে পার না, আমি বড় নিরুপায় হয়ে পড়েছি তিনি গিয়ে ; তিনি থাকলে এতক্ষণ আমার কত ডাব এসে পড়ত, যেখান থেকে হোক তিনি আনিয়ে দিতেন, তুমি কিছু পার না।" আমি নিরুত্তর, এর উপর বলার কোন কথা আমার নাই। অনেকক্ষণ পরে বল্লুম, "বাবামহাশয়, তাঁর মত করে আপনাকে দেখবার, আপনার সব ব্যবস্থা করে দেবার সাধ্য কি আমার আছে ? আমি নিজেই যে এখন নিরুপায় ও একান্ত অসহায়।" আমার এই কথা শুনে নিজের ভুল বাবামহাশয় বুঝতে পারলেন ও বলে উঠলেন,—"ওঃ আমি বড্ড ভুল করেছি,তোমাকে তাঁর কথা বলে আমি বড্ড দুঃখ দিয়েছি, আর এরকম কথা বলব না, কিন্তু এটা জেনে রেখ বৌমা যে আমি তোমা অপেক্ষাও নিরুপায় ও অসহায়"। ইদানিং রথীন্দ্রনাথের উপর বাবামহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন , যখন যা দরকার তাঁকে জানালেই পেতেন বলে। ধানের কলের পচা গন্ধ আসছে, 'যাও রথীর কাছে, বল রথীকে এর প্রতীকার করতে', কম্বল নাই, 'যাও রথীর কাছে বল আমাকে কম্বল এনে দিতে', বসবার চৌকী ভেঙ্গে গেছে, 'যাও রথীর কাছে, বল আমার চৌকী নেই চৌকী আনিয়ে দিতে'। বলা মাত্র রথীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ এসবের ব্যবস্থা করে দিতেন। এতে তিনি অত্যন্ত খুসী হতেন ও ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করতেন। রথীন্দ্রনাথকে বলতেন, "ভাগ্যি রথী আমার কাছের গোড়াতে আছেন তা নইলে আমি কি বিপদেই পড়তুম, দরকারের সময় কোন কিছুই পেতুম না কি মুস্কিলই হত"। অসামান্য প্রতিভা থাকা সত্বেও এই অসহায় ভাবটাই হয়ত তাঁকে প্রতিভার উপযুক্ত গৌরবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দেয় নাই, কিন্তু এই অসহায় ভাব নিয়ে তিনি ভগবানের কাছে যেতে পেরেছিলেন বলেই চরমে ভগবানের অভয়পদ লাভ করে গেছেন এই আমার দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি বলতেন, "রবি আমার চেয়ে কত বড়, তিনি কত কাজের

লোক। মহাত্মা গান্ধি ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় আমার চেয়ে কত বড়, তাঁরা কত বড় ত্যাগী। মুনীশ্বর ও আমার অন্যান্য চাকররা আমার চেয়ে কত বড়, তারা পরের কাজ কেমন খুসীর সঙ্গে করে, আমি হলে তাদের মত ভাল করে পরের কাজ কখনই করতে পারতুম না, আমি কিছুই পারি না, আমি একেবারে কিচ্ছু না, তবে আমি অন্তরে বড়ই অসহায় তাই ভগবান আমার প্রতি দয়া করেন।" এই ছিল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক বুলি।

উপর্য্যুপরি কয়েকটি বিপদপাতে তাঁর মন ইদানিং ভগবানলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং এই উদ্দেশ্যে ইদানিং তিনি বিশেষভাবে ভগবৎসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন—নদীর উপর একখানি নৌকায় কর্ত্তা-দাদামহাশয় দাঁড়িয়ে আছেন ও মেজ কাকামহাশয় নৌকার মধ্যে বসে আছেন, বাবামহাশয়কে সেই নৌকায় তাঁরা তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিলেন। ভোরের সময় স্বপ্ন দেখেন, সকালে আমাকে ডেকে বল্লেন "দেখ বৌমা রাত্রে আমি কি রকম একটা স্বপ্ন দেখেছি, রবির জন্যে আমার বড় ভয় করছে, রবির শরীর এত খারাপ, তার উপর কারো কথা শুনবেন না, সাত দেশ কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন, একটা বিপদ ঘটাবেন দেখছি।" কাকামহাশয়ের (রবিবাবু) শরীর খারাপের বিষয় তাঁকে সবিশেষ জানান হত না, তবু তিনি থেকে থেকে কেবলই বলতেন, "রবির শরীর বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, মহাবিপদে পড়েছি বাপু তাঁর জন্যে"। নিজের বেঁচে থাকাটা বাবামহাশয়ের কাছে এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে স্বপ্নে কর্ত্তাদাদামহাশয়ের সঙ্গে নৌকাযাত্রাটা নিজের শেষযাত্রা বলে বুঝতে না পেরে কোন একটি প্রিয়বিয়োগের চিন্তায় আতঙ্কিত হয়েছিলেন। ছেলে মেয়েও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, উহাদের বিচ্ছেদে তিনি এতদূর মর্ম্মাহত হয়েছিলেন যে ইদানিং বিচ্ছেদের আশঙ্কাই তাঁর মনে প্রবল হয়ে জেগে থাকত। আর কোন বিচ্ছেদের আঘাত তাঁকে সইতে হল না, ভগবৎ প্রসাদে, ভগবৎসন্নিধানে পৌঁছে আজ তিনি সকল বিচ্ছেদবেদনার অতীত হয়েছেন।

আমাদের বাবামহাশয় নানাদিক থেকে অসাধারণ ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত অসাধারণ হয়েও কত সহজে যে তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষভাবে থাকতে পারতেন সেইটাই তাঁর জীবনে লক্ষ্য করবার বিষয়। এইটাই তাঁর সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব।

কত অসম্পূর্ণভাবে, কত অসংলগ্ন ভাষায়, কত অকৃতকার্য্যতার সঙ্গে তাঁর এই জীবনকাহিনী-টুকু আজ আমি লিপিবদ্ধ করলুম দিব্যধামে বসে বাবামহাশয় তা দেখছেন। তবে আমি নিশ্চয় জানি যে আমার এ সমস্ত ত্রুটি তিনি মার্জ্জনা করবেন।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।*

---

* ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী।

বড়ঠাকুর

আমি আটবছর বয়স থেকে এ বাড়ীতে এসেছি তখন থেকে আমার স্বামীর মুখে বড় ভাইয়ের কবিতা আবৃত্তি শুনতুম। বড় হয়ে বুঝতে পারলুম এ কবিটি অন্য কবিদের মত লোকের কাছে যশের আকাঙ্ক্ষী নন, তিনি নিজের ভাবেই ভোর। কবিতা লিখে ভাইদের শুনিয়ে ফেলে দিতেন, ছেঁড়া কাগজ বাতাসে উড়ে যেত। ভাইদের কবিতা শুনিয়ে তাঁদের সঙ্গে তাই নিয়ে হাসাহাসি আমোদ করেই তাঁর পূর্ণ তৃপ্তি হত, বাইরে প্রকাশের কথা মনেই আসত না। এই রকম বড়ঠাকুরের কত কবিতা ছেলেবেলা থেকে মুখে মুখে শুনে এসেছি। আমাদেরও শুনে আমোদ হত, বেশ লাগত। আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় তাঁর বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেদের জমিদারী দেখার কাজে নিযুক্ত করতে ইচ্ছে করতেন। প্রথমে বড় ছেলেকেই সেই কাজের ভার দেন। তাঁরই মুখে সেকালের কথা শুনেছি, তিনি কিছুতেই জমিদারী কাজে মন সংযোগ করতে পারতেন না। আমাকে বলেছিলেন—আমার মনে তখন সর্ব্বদাই এত কবিতা উথলে উঠছে যে থামি থামাতে পারতুম না—জমিদারীর দলিল দস্তাবেজের উপরই অনেক সময় কবিতা লিখে ফেলতুম। আমার এই অমনোযোগের কথা বাবামহাশয়ের কানে গেল। তিনি আমার মন বাঁধার জন্যে আমাকে পাঁচশ টাকা মাসকাবারীর লোভ দেখালেন—যাতে আমি ভাল করে জমিদারীর কাজ করি। তাতেও কোন ফল হল না। আমার মন কিছুতেই ওদিকে দিতে পারলুম না। পিতাকে সন্তুষ্ট করতে, তাঁর আজ্ঞা পালন করতে, সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি পারলুম না।"

তিনি আশুরোষ আশুতোষ ছিলেন। চাকরের উপর বা কোন স্বজনের উপর রাগ হলে খানিকটা চেঁচামেচি করতেন, ধমকাতেন, কিন্তু দু এক মিনিট পরেই তাঁর রাগের দরুণ পাছে তার মনোব্যথা হয়ে থাকে সেটা মুছে দেবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। খাবার ভাল হয় নি বলে চাকরকে হয়ত ধমকেছেন বা একটা চড় দিয়েছেন, তখুনি একটা কাগজ আনিয়ে সরকারদের হুকুম লিখিয়ে দিতেন, "একে পাঁচ টাকা পুরস্কার দেবে"। আত্মীয়দের সঙ্গেও সেই রকম ব্যবহার। যদি দৈবাৎ কোন কঠোর কথা বলে ফেলে থাকেন, তার ব্যথাটি মন থেকে দূর করে দেবার জন্যে চেষ্টার আর শেষ থাকত না।

সকলের সঙ্গেই তাঁর হাসি-আমোদের সম্পর্ক ছিল। স্নেহের পাত্রদের সকলেরই নতুন কিছু নামকরণ করতেন, আর দেখা হলেই পিঠ চাপড়িয়ে সেই নাম ধরে আদর করতেন। সে নামগুলি প্রায়ই হাস্যজনক হত—যেমন 'বাল্মীকিপ্রতিভা'তে সরস্বতীর ভূমিকা যে-কোন মেয়ে গ্রহণ করত তার নাম হত "সরস্বতী সাহেব"। নামকরণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়ের প্রতি ঝোঁক পড়ে যেত—কখনো সাহেবের জায়গায় 'রাম' শব্দ প্রত্যেকের নামের পরে জুড়ে দিতেন—সে বালকই হোক্ আর বালিকাই হোক্ প্রৌঢ়ই হোক্ আর বৃদ্ধাই হোক্

তাঁর নিজের রচনা আত্মীয়দের শোনাতে ত ভালবাস্‌তেনই -কিন্তু পুরোণ দাসী চাকরদেরও কখন কখন শোনাতেন, বলতেন—"সকলেরই মত নেওয়া ভাল, ওদেরই বা কেমন লাগে দেখা যাক্"। আমার স্বামীর পুরোণ দাইকে "স্বপ্ন প্রয়াণ"টা আগাগোড়া শোনালেন। সে মহাভারত রামায়ণ শোনবার মত ধৈর্য্য ধরে শুনে গেল। শেষকালটা গড় হয়ে প্রণাম করলে। বড়ঠাকুর ভারি খুসী।

তিনি যখন একবার রাঁচিতে আসেন তাঁর এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে অনেক বৎসর পরে দেখা হয়। বাল্যকালের পর আর কখন দেখা হয়নি। ভাইদের প্রতি যে এত ভালবাসা, বাল্যবন্ধু-প্রীতি কিন্তু তার চেয়ে কিছু কম নয় দেখা গেল। প্রতিদিন তিন ভাই একত্রে খেতেন, কিন্তু যেদিন বন্ধুটি আসতেন, সেদিন নিজের শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুধু তাঁ'র সঙ্গে খেতে বসতেন। সেই অবসরে বন্ধুর কাছে তার দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ত অবস্থার কথা শোনেন। বন্ধুর ঘরবাড়ী দেনায় বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল। বড়ঠাকুর এ কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে আসেন। কবিতায় মজা করে চিঠি লেখা তাঁর একটা স্বাভাবিক কাজ ছিল। দুই ভাইয়ের কাছে--৺সত্যেন্দ্রনাথ ও ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—হপ্তায় দুই একখানা ত আসতই। আমরা তিনজনে মিলে সেগুলি উপভোগ করতুম। শেষটা তাঁর মৃত্যুর দিনপনেরো পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমি একলাই তাঁর কবিতায় চিঠি পেয়েছি। এ সমস্ত কবিতা যুবার স্ফূর্ত্তি ও শিশুর সরলতায় পূর্ণ, বার্দ্ধক্যের কোন চিহ্নই তাতে থাকত না।

একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখলেন, "ভাই জ্যোতি আমার সরস্বতী গাউন পরেছেন।" —তার পরেই অনেকগুলি ইংরেজী কবিতা; দুঃখের বিষয় তার একটিও আমার কাছে নেই। জরার অক্ষমতা সত্বেও এবং নড়াচড়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর হলেও ভ্রাতৃস্নেহের আকর্ষণ তাঁকে তিন চারবার রাঁচিতে নিয়ে এসেছিল। তিনভাইয়ের মিলন-সুখ দেখাটা আমার একটি উপভোগ্য জিনিষ ছিল। আশা করি আজ ত্রিদিবে তিনভাই সেই বিশুদ্ধ মিলনানন্দ লাভ করছেন।

শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবী।

দাদামহাশয়

মানুষ যখন আপনার লোকের নিকট হতে চিরদিনের মত চলে যায় তখনই আমরা তার অভাবটা বেশী বুঝ্‌তে পারি। তখনই বুঝি যে আমরা কি জিনিষ হারিয়েছি, তাই আজ আমরা যাঁকে চিরদিনের জন্য হারালুম, তাঁরই কথা আজ মনের মধ্যে বারম্বার আঘাত করছে—শুধু যে তাঁকে আর দেখ্‌তে পাব না ব'লে' তা'নয়, এমন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করতে জীবনে আর সুযোগ ঘট্‌বে না, তাই আজ সব চাইতে সেইটেই বড় দুঃখ বলে' মনে হচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ধনীর পুত্র ছিলেন। কিন্তু ধনসম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কিভাবে মানুষ আপনাকে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারে তিনি সকলকে তাই দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি ভোগী ছিলেন না ত্যাগী ছিলেন, সংসারের কোনও প্রলোভন তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। তিনি কখনও নিজের যশের জন্যে উৎসুক হন্ নি। পিতার মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি ছোট কুটীরে নির্জ্জনে বাস করতে লাগলেন। এই কুটীরে থেকে তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। যখনই আমরা তাঁর কাছে যেতুম তখনই দেখতে পেতুম তিনি কি-এক আনন্দের মধ্যে বিভোর হয়ে আছেন। এই লোকে থেকেও তিনি যে ভগবানের প্রসাদ লাভ করেছেন তা তাঁকে দেখলে স্পষ্ট অনুভব হত।

আমি যখন বোলপুরে ছিলুম তখন প্রায়ই তাঁর খাওয়ার কাছে গিয়ে বস্‌তুম। সেই সময় দেখ্‌তুম, কত নানারঙ্গের পাখী গাছ থেকে উড়ে তাঁর কাছে খাবার খেতে আস্‌তো,—কোনটা কোলে কোনটা মাথায় এসে বস্‌ত, যেন তাঁকে তাদেরই একজন সঙ্গী বলে মনে কোরত, তাদের কোনই ভয় ছিল না, নির্ব্বিবাদে তাঁর খাবার থালা থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে খেত। পাখীদের উৎপাতে তাঁর কিছুই বিরক্তি ছিলনা, বরং তাদের মধ্যে যদি কেউ তাঁর খাওয়ার সময় উপস্থিত না থাকতো তিনি অস্থির হয়ে তাকে খুঁজে আন্‌বার জন্যে চারিদিকে লোক পাঠাতেন। পাখীদের আগে খেতে না দিয়ে তাঁর খাওয়া হোত না! এইসব পাখীর আবার নানারকম নাম রেখেছিলেন। যখন তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব দৃশ্য দেখ্‌তুম তখন সত্য সত্যই খুব আশ্চর্য্য বলে' আমার কাছে মনে হোত। বইয়েতে আগেকার ঋষিদের এইরকমই সব গল্প পড়ে এসেছি; কিন্তু আমাদের পিতামহকে দেখে সেইসব ঋষিদের কথা মনে জেগে উঠ্‌তো। শুধু যে পশুপক্ষীর উপর তাঁর এইরূপ ভালবাসা ছিল তা'নয়, মানুষের প্রতিও তাঁর ঠিক এইরূপ ভালবাসাই ছিল। তাঁর কাছে কোন ভেদাভেদ ছিল না, কি ধনী কি দরিদ্র সকলকে তিনি সমান চক্ষে দেখ্‌তেন; যে তাঁর কাছে এসেছে তাকেই তিনি সমান আদরে আহ্বান করেছেন। তাঁর হাসিটি সরল শিশুর মত ছিল। যখন তিনি হাসতেন তখন তাঁর হাসিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হতে থাক্‌তো। অমন প্রাণখোলা সরল হাসি হাসতে কাউকে দেখি নি। হাসি শুনে মনে হোত যে ঐ হাসির মধ্যে কোন দুঃখ লুকোন নেই, কেবল আনন্দে ভরা।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করবার সুযোগ যাঁর ঘটেছে তিনিই তাঁর চরিত্রের সরলতা সৌন্দর্য্য ও মহত্ব দেখেছেন।

পূজনীয় রবিদাদার গানে আছে—

আজ আসন তলে মাটীর পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
প্রসাদ লাগি কত লোকেই আসে ধেয়ে,
আমি কিছু চাইব না ত রইব চেয়ে ;
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব,
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন এই গানটার মধ্যে জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর জীবন তিনি এইভাবে ভগবানের চরণে ঢেলে দিয়েছিলেন। আজ যে দীপ জ্বলে' নিভে গেল, সেই দীপ আর জ্বলবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তিনি যে দীপ আমাদের সামনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, যে দীপের আলোতে আমাদের পরিবার ও দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই দীপের আলোর রশ্মি একটুও যেন আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে' আমাদের জীবনকে ধন্য করে।

শ্রীরমা দেবী।

---

* দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা।

বড় মামা

১

তাঁর শেষজীবনে শালিক চড়ুই কাঠবিড়ালী তাঁর কাছে যেমন নির্ভয়ে যাতায়াত করত, আমাদের ছেলেবেলায় ঠিক সেই রকম অবাধে আমরা তাঁর কাছে আনাগোনা করতুম। আমাদের পক্ষে বড়মামা আমাদের শৈশবসঙ্গী ছিলেন, আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি তাঁর সঙ্গে জড়িত। বড়মামা যে আমাদের আগে এ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন সেটা যেন একটা অবশ্যম্ভাব্য স্বাভাবিক ঘটনা নয়—তাঁর সঙ্গে বয়সের আকাশ পাতাল তফাৎটা মনে কখনই জাগরূক থাকত না। আমাদের ছেলেমানুষিতে তাঁর ছেলেমানুষি মিলে গিয়েছিল; আবার আমরা যত বড় হতে লাগলুম তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো না হয়ে ছোট হয়ে আমাদের সমানই যেন রয়ে গেলেন -তাঁকে নাগাল পেতে কোনোদিনই কষ্ট হয়নি। তাই তিনি চলে যাওয়ার মনে হচ্ছে যেন আমাদের একজন সমবয়সী হাস্যামোদের সাথীই সরে পড়লেন।

আমরা চার ভাই বোনে ছেলেবেলায় দাই ও দাসীর তত্ত্বাবধানে যোড়াসাঁকোর যে মহলে থাকতুম, তাকে বলত বাড়ীভিতরের তেতালা, বড়মামাও সেই মহলে থাকতেন। আমাদের ঘরের সামনে একটা ছাদ, তার একপাশ দিয়ে তাঁর ঘরে যাবার রাস্তা আমাদের ঘরের সামনে দিয়ে। তাই আমরা আর তিনি আমাদের ছেলেবেলায় সব চেয়ে নিকট প্রতিবেশী ছিলুম। সে সময়কার তাঁকে মনে করতে গেলেই প্রহ্লাদ চাকরকে মনে পড়ে। একালে যেমন মুণীশ্বর, সেকালে তেমনি ছিল প্রহ্লাদ। তার আর অশেষ গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম্ম ছিল গা-টেপা। সেই গা-টেপা কর্ম্মের একটি গুণ ছিল তা সশব্দ ও সতাল। তার একটা বাঁধা চক্র ছিল, আড়াঠেকায় সুরু হয়ে, চিমে তেতালা, ঝাঁপতাল, ধামার, কাওয়ালী ঠুংরি প্রকৃতির রোঁদ ফিরে আবার আরম্ভর চিমেতে ফিরে গিয়ে দু-একটা শেষ ঠোকা দিয়ে স্তব্ধ হয়ে যেত। আমাদের কাণ প্রহ্লাদের হাতের সেই তানমানলয়যুক্ত বড়মামার গা-টেপার সঙ্গীতের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকত, এমন মজা, তার তালে-তালে মন এমন আমোদে হাসিতে উঠ্‌ত পড়্‌ত। আর মনে পড়ে বড়মামার ছিদাম মেথরকে, সে রোজ উপরে আসত। আমরা যে বারান্দায় বসতুম, যেখানে দোলনায় দুলতুম সেইখান দিয়ে আনাগোনা করত। মেথর ব'লে তার প্রতি কোনো ঘৃণার ভাবে আমরা বর্দ্ধিত হইনি। তাকে সরল সহজ মানুষ বলেই দেখতুম। সেও বড়মামাকে ভক্তি করত, আমরাও বড়মামাকে ভক্তি করতুম, এই একটা বিশেষ মিলনসূত্র তার সঙ্গে আমাদের ছিল। অনেক সময় সে আমাদের কাছে বড় মামার গল্প করত, আমরা আগ্রহভরে শুনতুম, আর হাসতুম, কেননা বড়মামার গল্পে না-হাসার উপাদান থাকতেই পারে না।

বড়মামার ছেলেমেয়েদের আড্ডাও আমাদের ঘরেই ছিল, তাঁর ছোট মেয়ে উষাদিদি

ছিলেন আমার প্রাণের বন্ধু, সুধীদাদা দাদার বন্ধু, আর তাঁর চেয়ে বড় নিতুবাদা দিদির বন্ধু। আমরা সবাই যখন ছাদে খেলা করছি বা দোলনায় দুলছি—হঠাৎ এক এক সময় বড়মামার আবির্ভাব হত। আমরা তাঁকে সমীহ করতুম, কিন্তু ভয় মোটেই করতুম না। একদিন কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। কার কাছে একটা গানের দুটো লাইন শিখেছি—সেদিন আমরা সবাই মিলে ঐকতানে লক্ষ্ণৌঠুংরিতে ক্রমাগত সেই দুটো লাইন গাচ্ছি—বয়স আমাদের কারো বছর সাত, কারো বছর আট নয়; সেই অপরূপ গানটির আরম্ভ হচ্ছে—

"একে অবলা তাহে কুলবালা—"ইত্যাদি। বড়মামা এসে চীৎকার করে উঠলেন—"কি গাচ্ছ? কে শেখালে এ গান? থাম থাম, আর কক্ষনো এ গান গেও না।" সবাই দে-দৌড়, ধুপ্‌তুর্ করে সিঁড়ি দিয়ে পালিয়ে কে কোথায় লুকোল। সেই একদিন মাত্র একটুক্ষণের জন্যে তাঁর রুদ্র-মূর্ত্তি আমরা দেখেছিলুম—আবার যে-সেই। তাঁর ক্রোধের আগুন জ্বালাহীন বহ্নি ছিল। তিনি বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আজকালকার থিয়েটরের গান গাওয়া ত মোটেই পছন্দ করতেন না, রবিমামা-রচিত প্রেমের গান গাওয়াও ভালবাসতেন না।

আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে মাঝে মাঝে ভিজিট দিয়ে আসতুম। তাঁর মাটির বিছানায় তাঁর পাশে গিয়ে বসতুম, কোনো বাধা ছিল না, কোনো মানা ছিল না। তাঁর কাছে যাবার সঙ্কেত-ধ্বনি আসত তাঁর হাঁচিরোধে। সেই সময় দেখতে যেতুম কে এসেছে বড়মামার কাছে। তাঁর আগন্তুকদের মধ্যে কার সিহিরী চক্রবর্ত্তীকে একটু একটু মনে পড়ে। বড়মামা শালিক কাঠবিড়ালীর তুল্য আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবদেরও কৌতুকের বিষয় ছিলেন, সুতরাং তাঁর বন্ধুরাও আমাদের কৌতুক-পাত্র ছিলেন। আমরা ছোটরা ভারি মাতব্বর ছিলুম, বড়মামা আর তাঁর বন্ধুরা সবাই ভারি মজার লাগতেন আমাদের কাছে।

লোকজন না থাকলেও আমরা তাঁর কাছে যেতুম। তখন তিনি আমাদেরই শ্রোতা করে তাঁর "স্বপ্নপ্রয়াণ" কি আর-কিছু শোনাতেন, ভালো বুঝতে পারতুম না। তাতেই মজা লাগত, মুখচেপে হাসি টিপে-টিপে রাখতুম, বাইরে এসে হেসেই সারা। একদিন আমাদের সঙ্গে তারা-দাসীও শ্রোতৃবৃন্দের একজন ছিল। শুনতে শুনতে সে গড় হয়ে প্রণাম করলে। বড়মামা উচ্চহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—"ও কি? প্রণাম করছিস্ কাকে?"

সে বল্লে—"ঠাকুর দেবতার নাম শুনলে পেন্নাম কর্ত্তে হয় না?"

২

আমরা যখন কাশিয়াবাগানে গেলুম, সেখানকার শোভা সকলের মনোলোভা হ'ল। কলকাতার মধ্যেই এমন সুন্দর জায়গা, ছবির মত বাড়ীটি, তাতে ছবির মত পুকুর, চাঁদনি, বাগান, জঙ্গল, গ্রাম্য রাস্তা, পল্লী-মেয়েদের পুকুরে জল তুলতে খিড়কি দুয়োর দিয়ে আনাগোনা—বকুলের বীথী, গাড়ীর চাকার তলায় বকুলফুলের দলন ও গন্ধবিতরণ—ছেলে-বুড়ো সবাইকেই কাশিয়াবাগান মাতিয়ে তুল্‌লে। নীচে ছেলেদের দাপাদাপি, পুকুরে সাঁতার শেখা, নৌকা-

বারা, দোলনায় দোলা, মালা গাঁথা, ফল পাড়া—দোতালায় বড়দের সাহিত্য-চর্চ্চা, রবিমামার নূতন নূতন লেখা, গান ও নাটক শোনান—আর সব উপরে তেতালার ছোট্ট ঘরখানিতে বড়মামার অধিষ্ঠান। তাঁর সঙ্গে এখানে আমাদের আর বেশী কিছু যোগ ছিল না। তিনি আসতেন, উপরের ঘরটিতে একলা একলা থাকতেন, খাবার সময় নামতেন—কিছুদিন পরে চ'লে যেতেন—এই মনে পড়ে। তখন আমাদের নিজেদের দল ভারি, নীচের থেকে উপরে তাঁর কাছে যেতে আর সুবিধে হ'ত না, থেকে থেকে জানলার ধারে তাঁকে দেখতে পেতুম—হয়ত দাঁড়িয়ে আমাদের নৌকা-বয়া দেখছেন—কিম্বা সুদূর আকাশের কোন-এক প্রান্তে চক্ষু স্থির করে রয়েছেন। তিনি সেইসময় বেসনের ফুলুরি খেতে ভালবাসতেন এইটুকু মনে পড়ে। তখন আমি একটু একটু গৃহকার্য্য শিখছি—ভাঁড়ার দেবার ভারটা আমার উপর ছিল, যেদিন বড়মামা আসবেন বামুনঠাকুরকে ফুলুরি ভাজতে দিতেই হবে। এই রকম এক এক সময়ে এক একটা খাদ্য তাঁর বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠ্‌ত।

৩

যখন পূজ্যপাদ দাদামহাশয়ের সঙ্গে বড়মামা পার্ক ষ্ট্রীটে থাকতেন, সেই সময় দার্শনিক বড়মামার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আরম্ভ হ'ল। বিবেকানন্দ তখন আমার যোগদর্শনে রুচি জাগিয়ে দিয়েছেন। সেইসময় বড়মামার সাহায্যে "ভারতী"তে পাতঞ্জল সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখতে আরম্ভ করি। তখন বড়মামার দার্শনিক লেখার রসও পেতে লাগলুম—সেগুলি পড়তে তখন বেশ লাগে। সেই নিয়ে বড়মামার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা চলে। ছেলেবেলার সমীহ ভাবটা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তাঁর শিশুসুলভ প্রকৃতি আমাদের শৈশব-সাথীকে হারাতে দিলে না। আমি যে মোটে বছর উনিশেক এবং স্ত্রী-জাতি, সুতরাং তাঁর সঙ্গে গভীর দার্শনিক আলোচনার অনুপযুক্ত—কখনো ভুলেও সে কথা তাঁর মনে উদয় হ'ল না—যেন সমানে সমানের মত আগ্রহ করে আমাকে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বে দীক্ষিত করতে লাগলেন।

৪

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা মনে পড়ে শান্তিনিকেতনে ১৯২১ সনে। তখন নন্‌কো-অপারেশনের মহা ধুম—তিনি প্রচণ্ড গান্ধি-ভক্ত। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে ভারি ফূর্ত্তিতে খানিক কথাবার্ত্তার পর বল্লেন—"তোমার সঙ্গে কথা কয়ে একটু শান্তি পেলুম—আমাদের পরিবারে একমাত্র তুমিই আমার পার্টির লোক।"

তাঁর মত নিরীহ দলাদলিহীন বৃদ্ধের মুখে 'পার্টি' শব্দ শুনে আমার হাসি পেল। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি একবার বলেছিলুম—"আচ্ছা বড়মামা মহাত্মাজির এডুকেশন পলিসিটার সম্বন্ধে তোমার কি মত? যতদিন না ইংরেজরাজ্য ধ্বংস হয় ইস্কুল কলেজ সব উঠে যাক্? বিশ্বেচর্চ্চাটা

জ্ঞানচর্চ্চাটা বন্ধ থাকুক ? ইংরেজী ভাষাটা আমাদের শিখে কাজ নেই ?" তিনি মহা খাপ্পা হয়ে বল্লেন—"আহা কে বলেচে, এডুকেশনের বিষয়ে গান্ধির মত মান্‌তে হবে ? I dont call him an authority on educational matters—কিন্তু এতবড় সাহস কটালোক দেখাতে পেরেছে বল দিকিন। গান্ধি যেদিন বল্লেন—"I want to paralyse the Government—আমি ত অবাক্। এমন স্পষ্ট করে এর আগে কেউ কোনদিন মনের ভাব খুলে বলতে পেরেছে কি ? It is there where I admire the man", তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর শেষ যেসব বই ছাপান হ'য়েছে দেখিছি কিনা ? না, বলাতে মুনীশ্বরকে ডেকে 'হারামণির অন্বেষণ' ও 'গীতাপাঠ' তাঁর এই দুখানি দার্শনিক বই আমায় দিতে বল্লেন। বলে দিলেন পড়ে যেন আমার মতামত তাঁকে জানাই। বই দুখানি আমি বাড়ী নিয়ে এসে আগ্রহভরে পড়েছি এবং পড়তে পড়তে বারবার ভেবেছি—আশুবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বল্‌ব বড়মামার এ বইগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এর পাঠ্যপুস্তকে নিশ্চয়ই যেন স্থান দেন। মধুরেণ সমাপয়েৎ। তাই সব কথাবার্ত্তার শেষে বড়মামা তাঁর রেখাক্ষরের কবিতায় যে শেষ সংস্করণ লিখেছেন তাই শোনাতে বসে গেলেন। খানিকক্ষণ শোনার পর আমায় একটু অন্যমনস্ক দেখে বল্লেন—"তোমার বুঝি আজকাল আর এসকল তেমন ভাল লাগেনা ? পলিটিক্সে পড়ে গেছ ?"—বলেই হাহা করে হাসি।

তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েও স্বেচ্ছায় দরিদ্র ছিলেন। পিতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যেত, নিজে কিছুই রাখতেন না। দীপেন্দ্রনাথই পরিবারে তা যথাযথভাবে বণ্টন করতেন। তাঁর নিয়মিত আহার বস্ত্রের কখন অপ্রতুল হত না। কিন্তু একটি কামাবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করতেন—সেটি লেখার জন্য ও বাঙ্ময় তৈরির জন্য কাগজ। একদিন শুনি ঘোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতিমিনতির স্বরে বলছেন—দীপুকে গিয়ে বলিস্ আজ যদি আমায় একটা দোয়ানি দেন আমি একখানা খাতা আনাই।

একটি দোয়ানির ভিখারি লক্ষপতি! এই নির্লোভ নিস্পৃহ যোগীপুরুষের নিকাঙ্ক্ষতার, না তাঁর শিশুসুলভ নির্ব্বিষ সরস সহৃদয়তার বর প্রার্থনা করব জানি না। ভক্তিভরে প্রীতিভরে শুধু তাঁর উদ্দেশ্যে বারবার প্রণত হই।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

বাণী-বিতান

ভারতী বন্দনা

এলে যবে বঙ্গের পঙ্কজ কাননে
সে কি আভা সে কি শোভা সঙ্কোচ আননে।
তখনও রবির কর ভাল করে ফোটেনি,
ফুলকলি হাঁই তোলে ঘুম ভেঙ্গে ওঠেনি।
দেয়না ক শিষ শ্যামা ডাকে না ক পাপিয়া
ছোটেনা ক কুহুরব মধুবন ছাপিয়া!
মরালেরা মেলেনি ক দূরে দূরে সাতাঁরে
স্থলে জলে করে রব টিটিভে ও ছাতারে।

২

তখনো 'সোনার তরী' ভরা গাঙে আসেনি,
'কড়ি কোমলে'র সাড়া বাতাসেতে ভাসেনি।
আষাঢ়ের নব ঘন ফিরে যেত কাঁদিয়া,
রাখে তার দুরু দুরু ছন্দে কে বাঁধিয়া!
ভরসার এত বাণী বরষার ধারাতে
বরষে বরষে হত অযতনে হারাতে।
আশে পাশে ঝোপে ঝাড়ে ফুটেছিল কেতকী
ছিল তার বলিবার বাকি কথা এত কি?

৩

আলোকের অঞ্জলি শরতের সেফালি
করে যেত চুপে চুপে সোহাগের দীপালী।
বাঙলার মেঠো গীতি আধভোলা হারাণো,
সুদূরের কুহেলিকা মধুরিমা জড়ানো,

পথে ঘাটে পড়েছিল ঝরা মণি-কণিকা
কুচি কুচি পারিজাত ক্ষণিকের ক্ষণিকা।
কোথা ছিল এত লীলা এত শোভা ভাষাতে
ছিল তব পথ চেয়ে যেন কত আশাতে।

৪

তখনো অশোক বনে ফোটেনিক কলিকা,
আলতার গৌরব বোঝেনিক বালিকা।
নয়নে নয়নে ভাষা বোঝেনিক আতুরী,
ঘোমটার ঘামে ভেজা আলাপের মাধুরী।
'ডায়মন কাটা' মলে ওঠেনিক গুঞ্জন
সিঁদুরের ফোঁটা কই কাজলের অঞ্জন।
মলিন হাসির ছবি হয় নাই আঁকা গো,
অনাদরে পড়েছিল 'গুঁজি কাটি' শাঁখা গো।

৫

তুমি এলে ঝঙ্কারে দশ দিশি মোহিয়া
এলে নব পারিজাত পরিমল বহিয়া।
মহাসিন্ধুর বুক আন্দোলি পুলকে
কবিতার রাণী এলে সবিতার ভূলোকে।
তখনো তোমার বীণা শোনে নাই ভুবনে
কানাকানি জানাজানি চলেছিল গোপনে।
এলে তুমি চিন্ময়ী আরাধিতা নিঃস্বের
আজ তুমি মহিয়সী মহারাণী বিশ্বের।

৬

অনাদি সে মহাকাল মূক ছিল বসিয়া
ভাষা দিলে তার মুখে তুমি হেথা আসিয়া।
ছন্দেতে এনে দিলে নব নব হিল্লোল
পদতলে ছুটাইলে জোয়ারের কল্লোল।

ইতিহাসে দর্শনে দিলে নব বল যে,
তোমারি দেখানো পথে সারা দেশ চলছে।
বীণা ও বীণা হয় পড়ি তব হস্তে,
ভগবতি ভারতী দেবী নমস্তে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বাণী

উত্তরে বায় কাঁপন-ধরা দারুণ মাঘের শীতে
জনম যুগের জীর্ণ জরা টুটি'—
দিগন্তরের সরিয়ে দিয়ে কুজ্ঝটিকার মায়া—
কাহার আলোক উঠিচে আজ ফুটি।
অসময়ের অবুঝ সাথী উদাস আপন-ভোলা
আনন্দেরি উৎসবেতে বক্ষে দে' যায় দোলা—
ভুবন ভরে অথই সুখে পবন বাজায় বাঁশী
অশোকবনে ফুটচে ধীরে স্বপন-মদির হাসি;
শিমূল শাখে কুঁড়ির বুকে—আমের শিশু বোলে
কোন্ অজানার রুদ্ধ ভাষা খোলে।
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে ও-কার বীণাধ্বনি
কাঁকণ কাহার উঠচে রণরণি।
মা আসে আজ সোণার রথে—হংস-বাহন বাণী
—হিরণ বিভা নীলিম গগণ-কোণে
পেরিয়ে এলো হিম পারাবার সপ্ত সাগর নদী
মনের ফোটা কমল-দীঘির বনে।
উদাসী পিক দোয়েল বুলবুল লয়ে জমাট প্রীতি
শাখায় শাখায় আনন্দে গায় আবাহনের গীতি।
পাতার আড়ে ও-থলকমল সিক্ত চোখের জলে
ঠাঁয়ের লাগি লুটিয়ে পড়ে তোমার চরণতলে।

ঘনিয়ে আসে আরতি-ধূম সকাল-সাঁঝের মাঠে
আসন হতে কবির চিত্ত-নাটে।
বরষ পরে মোদের ঘরে আস্‌লে মা আজ তুমি
ভক্তিভরে চরণ তোমার চুমি।

বন্দে আলী।

— —

আঁখি

রয় না স্থির সুন্দরীর
দুই আঁখির তীর দু'টি,
ঘুম-বিভোর স্বপ্নে মোর
দৃষ্টি ওর রয় ফুটি'।
চোখের ঠার চমৎকার,
কোমল তার চাউনিটুক্,
এই মিলন শুভক্ষণ,
ঐ নয়ন স্বর্গসুখ।
কোন্ স্বপন হয় রচন
মেঘ-বরণ পক্ষ্মেতে!
কোন্ অতল অশ্রুজল
ঐ শ্যামল চক্ষেতে!
অপ্রকাশ হাস্যরাশ
হয় বিকাশ পল্লবে,
ছল্‌ছলায়—মূক ভাষায়
প্রেম জানায় বল্লভে।
উজল-রূপ যুগল-কূপ
দিয়েও ডুব শেষ না পাই,
রূপ-কারায় পথ হারাই,
ছুটির তাই গরজ নাই।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু।

—·——

তাজ

স্নিগ্ধ নদীর পুণ্যপুলিনে গড়িল তোমারে সে কোন্ শিল্পী,
যুগ যুগ ধরে র'য়েছে দাঁড়ায়ে হে মহাসৌধ মৌন-কল্পী।
বুকের শোণিতে পরতে পরতে যেজন তোমারে করিল সৃষ্টি,
স্বর্গ হইতে মুক্তপুরুষ তার শিরে করে পুষ্প-বৃষ্টি।
ধন্য আমরা নিরখি নয়নে, ধন্য তোমার মূরতি তাজ!
ধন্য ভারতে গণ্য করিছে নিখিল বিশ্বমানব আজ।

কোন্ সে অনাদি চিন্তার মাঝে তোমারে পাইয়া শাহজাহান,
কোন্ সে ব্যথার গোপন কথায় অচল পরাণ করিতে দান,
কোন্ ভাস্করে আনিল ডাকিয়া অমর সু-কর বুলায়ে দিতে,
মোহের আবেশে মত্ত যেন সে সত্য-প্রিয়ারে হেরিতে চিতে।
ধন্য আমরা নিরখি নয়নে, ধন্য তোমার মূরতি তাজ!
ধন্য ভারতে গণ্য করিছে নিখিল বিশ্বমানব আজ।

ধুইয়া তোমার পদরজোভার তটিনী যমুনা বহিয়া যায়,
শ্রান্ত জনেরে শান্তি বিতরে তোমার পরশে দখিনা বায়।
গোলাপ-কলিকা যূঁই শেফালিকা নবমল্লিকা কুঞ্জে তব,
দারুণ বিরহে নিতি নিতি বহে প্রেম-প্রীতিমাখা সুসৌরভ।
ধন্য আমরা নিরখি নয়নে, ধন্য তোমার মূরতি তাজ।
ধন্য ভারতে গণ্য করিছে, নিখিল বিশ্বমানব আজ।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন।

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ

মহাপ্রস্থান

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেক কথা অনেকেই জানেন, আবার এমনো অনেক কথা আছে যাহা অনেকেই জানেন না। এই সমস্ত কথার মধ্যে শুনিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে। আজ কেবল তাঁহার মহা প্রস্থানেরই কথা সংক্ষেপে বলিব। 'ভারতী' প্রতিষ্ঠা তাঁহারই হস্তে হইয়াছিল, তাই তাহার পাঠকবর্গের ইহা জানিবার ইচ্ছা স্বভাবতই হইতে পারে।

১৩২৩ সালে তাঁহার একবার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে তিনি বলিতেন, ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাথাও ধরে নাই, আর কোনো ঔষধও খাইতে হয় নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য এইরূপই ভাল ছিল। তবে বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে জরা ও দৌর্ব্বল্য ক্রমশই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। দৃষ্টিশক্তিও কমিয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার লেখাপড়ার অসুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাহইলেও কচিৎ কখনো সামান্য এক-আধটু সর্দ্দি বা জ্বর ছাড়া মৃত্যুর ১০।১২ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কোনো গুরুতর পীড়া লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার এইরূপ স্বাস্থ্যের একটি প্রধান কারণ, মনে হয়, তাঁহার আহারাদি সম্বন্ধে সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, যাহা তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল।

তিনি প্রতিদিন ভোর ৪॥০ টার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন, এবং শৌচাদি শেষ করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতেন। শেষদিন পর্য্যন্ত ইহার অন্যথা হয় নাই। ৩রা মাঘ, রবিবার। স্নান শেষ করিয়া তিনি নিজের ঘরের দক্ষিণদিকে বারাণ্ডায় বসিয়াছেন। উপাসনা হইয়া গিয়াছে। নিয়মমত জলযোগের দ্রব্য সম্মুখে দেওয়া হইয়াছে—কয়েকখানা আদার কুচি, চারিটি করিয়া থালায় ছয় জায়গায় সাজান চব্বিশটি ভিজান ছোলা, জল দিয়া মাখা একটু ছোলার ছাতু - ইহার কিয়দংশ লম্বা করিয়া ছুরিদিয়া একটু একটু দাগ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য এক-একটি দাগ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া তাঁহার নিত্য অতিথি পাখীগুলিকে দিবেন (কাঠবিড়ালীর জন্য খাদ্য অপর পাত্রে আসিত, তবে পাখীদের মধ্যে কাঠবিড়ালীরাও ঐ খাদ্যের ভাগ গ্রহণ করিত)। কয়েকটি সিদ্ধকরা পাকা খেজুর, কয়েক টুকরা মিছরী, একটু দুধ ও চা (উল্লিখিত কয়েকটি জিনিস প্রতিদিনই থাকিত)। প্রথমে পাখীগুলিকে খাবার-না দিয়া তিনি নিজে খাইতেন না। সেইদিনেও তাহার অন্যথা হইল না। জলযোগের পর তিনি একটু বেশী শীত অনুভব করিতে লাগিলেন। দুই একখানা মোটা কম্বল দিয়া তাঁহাকে বেশ ভাল করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার পরিহাস-প্রিয়তা প্রসিদ্ধ; আমরণ ইহা ছিল। বলিলেন, 'দেখ আমি ভাল্লুক, Polar Bear হইয়াছি। তাহার পরেই উচ্চ হাস্য।

এখানকার 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় তাঁহার একটা কবিতা ছাপা হইতেছে। এই কবিতাটি

তিনি তিন-চার দিন পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। ছাপাখানা হইতে প্রুফ আসিয়াছিল। তিনি তাহা তখন শোধন করিয়া দিলেন। ইহার পর তিনি একটি কবিতা লেখেন। শেষ অবস্থায় তিনি নিজে আর লিখিতে পারিতেন না, তিনি বলিতেন আর অনিলবাবু তাহা লিখিয়া রাখিতেন। এইসব কাজের জন্য অনিলবাবু তাঁহার নিকট রাতদিন থাকিতেন ঐ কবিতা দুইটির কথা পরে আবার উল্লেখ করিব।

সেদিন তিনি অন্য কিছু আহার না করিয়া কেবল ফল, দুধ ও চা খাইলেন। অন্যান্য দিন রাত্রি একটু বেশী হইলে তিনি ঘুমাইতেন, কিন্তু সেদিন ৭টার সময়েই বলিলেন যে, আজ একটু শীঘ্র শীঘ্র ঘুমান যাউক। এই বলিয়া তিনি বসিবার জায়গা হইতে উঠিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

রবিবার দিন-রাতের মধ্যে এমন কিছুই বোঝা গেল না যে, তাঁহার কোনোরূপ পীড়া হইয়াছে। সোমবার প্রত্যূষে স্নানাদি সমস্তই নিয়মমত হইল। বারাণ্ডায় বসিবার স্থান করিয়া দেওয়া হইল। আজ তিনি জলযোগের সময় কেবল দুধ ও চা পান করিলেন। শীতটা খুব বেশী বোধ হওয়ায় ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। তাহার পর তিনি একটি কবিতার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনিলবাবু কাছে ছিলেন, তিনি তাহা লিখিয়া লইলেন। তখনো তাঁহাকে অসুস্থ বলিয়া মনে হয় নাই। সেদিন তিনি দুধ ও ফলের রস * ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। শরীরটা ক্রমশঃ অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন খাটে শুইয়া পড়িলেন। বেলা তিনটা। দেখা গেল একটু জ্বর হইয়াছে। চারটার সময় ডাক্তার আসেন। ডাক্তারকে পরীক্ষা করিতে দেওয়া তাঁহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ডাক্তারী চিকিৎসাকে তিনি ভাল বাসিতেন না। তথাপি অনেকের অনুরোধে সম্মত হন, কিন্তু বলেন যে, তিনি কোন ঔষধ খাইবেন না। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া জানা গেল তাঁহার বামদিকের ফুস্‌ফুস্‌-দাহ (নিউমোনিয়া) হইয়াছে। একটা মালিসের ও একটা খাইবার ঔষধের ব্যবস্থা হইল। আমাদের আশ্রমের আরোগ্যশালায় (হাঁসপাতালে) একটা ঔষধ না থাকায়, তাহা আনিবার জন্য বোলপুরে লোক পাঠান হয়। তাহার আসিতে একটু বিলম্ব হয়। সন্ধ্যা হইয়া গেল। নিজেই তখন তিনি মালিসের ঔষধটা আসিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। যখন বলা হইল যে তখনো তাহা আসে নাই—শীঘ্রই আসিতেছে, তিনি তখন বলিলেন "তবেই রক্ষা!" তখনো কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, অত শীঘ্র তাঁহার শেষ হইবে। মাথায় একটু বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর একবার ভেদ হয়। কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নহে। মাঝে মাঝে এইরূপ হইত। এই সময় তাঁহার পিপাসা দেখা গেল। এবং ঘন-ঘন কমলা লেবুর রস চাহিয়া খাইতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে হাত পা টিপিয়া দিবার কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু কোন যন্ত্রণার কথা বলেন নাই। তিনি যন্ত্রণা পাইলেও কখনো তাহা প্রকাশ

* তিনি বহুদিন হইতেই গোটা ফল খাইতেন না, সমস্ত ফলেরই রস করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইত।

করিয়া বলিতেন না, এইরূপ তাঁহার তিতিক্ষা ছিল। রাত্রি ১২টার সময় একবার মাথা টিপিয়া দিতে বলেন। কিন্তু তখনো বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার পাশে ছিলেন তাঁহাদিগকে ঘুমাইতে বলিলেন, 'যাও তোমরা ঘুমাও, রাত জাগিলে ব্যামো হইবে।' রাত্রি দুইটার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইহার পরেও তিনি নিজে চাহিয়া ফলের রস পান করেন। কিন্তু তাহার পর আর কথা বলেন নাই, বা কোন উদ্বেগও প্রকাশ করেন নাই, শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি তিনটা। একটু শ্বাস দেখা গেল। ইহাতে বুঝা গেল তাঁহার অবস্থা খারাপ। কেহ বুঝিল, কেহ বা বুঝিতেই পারিল না। প্রায় ৪টার সময় তিনি অতি ধীর ও শান্তভাবে মহানিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি স্বাভাবিকভাবে ঘুমাইতেছেন, কোন বিকার নাই। মুখের জ্যোতি অম্লান। আশ্রমের কয়েকটি মাত্র লোক ছাড়া আর কেহই সেই রাত্রে এ সংবাদ জানিতেও পারিল না।

পরদিন সূর্যোদয় হইতে-না-হইতে আশ্রমের অধিবাসী আবালবৃদ্ধ সমস্ত নরনারী আমলকী-কুঞ্জে দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদতলে প্রণত হইল।

তাঁহার সুবৃহৎ পরিবারবর্গের অনেকেই এসময় উপস্থিত ছিলেন না। কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী হেমলতা দেবী, পৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কমলা দেবী—তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন। ইঁহারা আশ্রমেই বাস করেন। পরে সংবাদ পাইয়া তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নীদ্বয় প্রভৃতির সহিত কলিকাতা হইতে আগমন করেন। গুরুদেবও এখানে ছিলেন না। তিনি শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলেন।

বেলা আড়াইটার সময় তাঁহার শব বহন করিয়া সপ্তচ্ছদ বেদীর নিকট লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে সপ্তচ্ছদ ও আমলক তরুর ছায়ায় তাঁহার স্বরচিত অতি প্রিয় গানটি তিনবার গাওয়া হয়। সেই গানটি এই :—

কর তাঁর নাম গান। যতদিন রহে এই প্রাণ।
যাঁর মহিমা অনন্ত জ্যোতি জগত করেরে আলো।
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি সকল জীব-সুখকারী, হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অবসারি হে।
উচ্চে নীচে, দেশ-দেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন-নিকেতন, পরশ-রতন সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুখলেশ, হে॥

এগান সেদিন অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। অনেকেরই হৃদয় ইহাতে গলিয়া উঠিয়াছিল।

বেলা চারটার সময় এক বিশাল চিতার উপর তাঁহার শব স্থাপন করা হইল। সুধীন্দ্রনাথ কাঁপিতে-কাঁপিতে দুর্ব্বলহস্তে চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলেন। ক্রব্যাদ অগ্নি বিপুল ও চঞ্চল জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমস্ত কবলিত করিয়া ফেলিল! দেখিতে দেখিতেই পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল!

মৃত্যুর সময় অনেকে অনেক কথা বলিয়া যান। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুগণ, কারণ-সংযোগে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা অনিত্য, তোমরা সাবধান হইয়া চল। মহারাজা অনন্তযশ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন। মৃত্যুর সময় প্রজারা যখন তাঁহার এক অধীন ও প্রিয় রাজাকে সম্মুখে করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, "মহারাজ, লোকে যখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, মহারাজ অনন্তযশের সুভাষিত (ভাল কথা) কি? তখন আমরা কি উত্তর দিব?" তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "অনন্তযশের বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল, তিনি ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলেন। যখন যাহা উপভোগের ইচ্ছা হইয়াছিল, তখনই তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার কামনার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি অতৃপ্ত থাকিয়াই মৃত হইলেন। তোমরা বলিও, মহারাজ অনন্তযশের ইহাই সুভাষিত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ শেষ সময় কি বলিয়া গেলেন ইহা জানিবার ইচ্ছা অনেকেরই হইতে পারে। ঐ প্রশ্নের উত্তর, তিনি কিছুই বলিয়া যান নাই, তিনি অনেক বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি মৃত্যুর পূর্ব্বে সাধারণ আবশ্যক বিষয় সম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু ভিন্ন তিনি অপর কিছুই বলেন নাই। কিন্তু সেইদিন ও তাহার পূর্ব্বদিনে নিজের রচনা লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক ও শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয় গানটির উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের আশ্রমে প্রতি বৎসর ৭ই পৌষের উৎসবে এই গানটি শেষে গাওয়া হয়। এই কয়দিন আমাদের শিশু-বিভাগের ছেলেরা তাহাদের ইচ্ছানুসারে সন্ধ্যার পর প্রায় তাহা গাইতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বর বেণুকুঞ্জেও আসে।

তাঁহার জীবন যে সেই সুরে গাঁথা ছিল তাহা সুস্পষ্টভাবে আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় দীপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হইতে। তাঁহাকে বহু-বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, ভগবান্ যে, তাঁহাকে কত করুণা করিয়াছেন তাহা তিনি বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। যৌবনে তিনি একবার তাঁহার করুণার বিমলানন্দের উপলব্ধি করেন, পরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আবার তিনি তাহা লাভ করেন ইহা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি এমন এক শান্তি লাভ করিয়াছেন যাহার পরে আর কিছুই প্রার্থনীয় হইতে পারে না। কিছুদিন হইতে তাঁহাকে প্রধানত আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিতেন, কিন্তু তাহা খুব কম। পূর্ব্বে বলিয়াছি রবিবার দিন তিনি একটি কবিতার প্রুফ সংশোধন করেন। ইহা তিন-চার দিন পূর্ব্বের রচনা। মৃত্যুর নিকটের দিনে তিনি কি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে :—

দ্বিজের ত্রিজন্ম

কী দেখছি এ! কী করুণা! কী প্রেম! কী স্নেহ!
কারো প্রতি কারো এত করুণা দেখে নাই কভু কেহ।
যে যন্ত্রণা সহিনু আমি বাঁধা পড়ি গিয়া করমে।
ছাড়িব না চরণ প্রভু, ছাড়িব না কোন জনমে।
জ্বলিতেছিল হৃদে মোর তাপানল অনিবার।
নাহি ঠাঁই আজিকে সেথা আনন্দ রাখিবার॥
দেখা দিলে যেই নয়নে মোর বাঁধা পড়ি গেল দিঠি।
যতকিছু ছিল মনের সাধ নিমেষে গেল মিটি॥
পাষাণে অঙ্কুরে বীজ করুণাধারায় তব।
ত্রিজ হ'ল দ্বিজ এ দীন জনম লভিয়া নব।

ইহার পরেও আর কিছু কি শুনিবার থাকিতে পারে? রবিবারে তিনি আর একটি কবিতা রচনা করেন বলিয়াছি, ইহা মুণ্ডক উপনিষদের দুইটি শ্লোকের (৩, ১, ১-২) অনুবাদ:—

একবৃক্ষে দুই পক্ষী

সুন্দর দুটি পক্ষী থাকে সখ্যে মিলি এক বাসবৃক্ষে।
একটি খায় স্বাদু ফল না খাইয়া অন্যটি নিরিক্ষে॥
'দীন আমি' বলি' শোচে ভোক্তাটি, শোক তার ঘুচি যায়,
মহিমা আপন সখা পাখীটিতে দেখিবারে যবে পায়।

৪ঠা মাঘ সোমবার মৃত্যুর দিন। বলিয়াছি এ দিনেও তিনি একটি কবিতার কিছু পরিবর্তন করেন। সেই কবিতাটি এই:—

উথলে বিশ্ব তোমার অনুপম আনন্দ হইতে।
আনন্দে রহিবে নর-নারী সবে তোমার সহিতে—
ইহা চেয়ে মঙ্গল কি আছে আর এ ভব-সংসারে।
সাবাস মন্দ ভীম তপা, যে-আনন্দে বধি' মারে॥
ভীম কৈলা শরশয়ন না-জানি কী ফলের লোভে।
ভাবিয়া দেখিলে শকুনির মত পাপীকেই তাহা শোভে
মুখ শিটকান বিকট মূরতি দেখিলে উপজে ভয়।
তপস্যা ততটুকুই ভাল যতটুকু দেহে সয়॥
কাজ নাই তপস্যা আমার আনন্দ আমি চাই।
হেরিলে তোমার আনন্দরূপ কত-না সুখ পাই॥

তোমার আনন্দে করি ধ্রুবতারা ভাসাই তরণী।
দুর্দ্দিনে পাইলে ভয় তুমি হও দিনমণি॥
মাথায় করি লব যবে তুমি পাঠাইবে মরণ।
মরণে সে ডরে না কভু রহে যে ধরি চরণ॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি শান্তভাবে চলিয়া গিয়াছেন। কিরূপে তাঁহার সেই শান্তভাব সম্ভব হইয়াছিল তাহার কারণ এই কবিতাতেই রহিয়াছে :—

"মাথায় করি লব, যবে তুমি পাঠাইবে মরণ।
মরণে সে ডরে না কভু রহে যে ধরি চরণ॥

তাহাই বলিতেছিলাম, শেষদময়ে তিনি কিছুই বলিয়া যান নাই, তিনি অনেক বলিয়া গিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন
বেণুকুঞ্জ
১২ই মাঘ, ১৩৩২ সাল।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্র, দ্বিজের শ্রেষ্ঠ, ঋষি নির্ব্বিকার,
ভারত-জ্ঞানের খনি, সত্যের আধার,
পবিত্র মনীষা-দীপ্ত, কবি প্রজ্ঞাবান,
জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি তব খড়্গের সমান
করি' ভেদ যুগ-যুগ-সঞ্চিত জঞ্জাল
ভারতের গুহাহিত গুপ্ত জ্ঞানজাল
করিল পরশ আর করাল প্রকাশ।
গুপ্তসত্যদ্রষ্টা—তাই উল্লাস উচ্ছ্বাস
হেরিনিক কভু তব,—শান্ত সমাহিত
আত্মমাঝে স্তব্ধ তুমি নিত্য আনন্দিত।
জীবে তৃণে গ্রহে শূন্যে অখণ্ড অব্যয়
হে-আত্মা তাহারি সাথে তব পরিচয়
ঘটেছিল ক্ষণে ক্ষণে; আজি তারে মাঝে
চিত্ত তব আকাঙ্ক্ষিত শান্তিতে বিরাজে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ

আমার পিতা ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ১৮০৮ সালে ১৮ই ভাদ্র তারিখে পরলোকগমন করেন। তাহার পূর্ব্বে প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের ও ঠাকুর-পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতম যোগ। পিতার মৃত্যুর পর হইতে বিগত ৩৯ বৎসর ধরিয়া আমি আদি সমাজের যৎসামান্য সেবা করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আমার বয়স ৬৫ বৎসর। পিতার জীবদ্দশায় আমি প্রায়ই তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজে আসিতাম এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাবুদের বাটী যাইতাম। এই উপলক্ষে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর অনেক কার্য্য নিজচক্ষে সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

ইংরাজি ১৮৬৮ অব্দে প্রায় প্রতি রবিবার বৈকালে দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাদের বেহালার বাটী আসিতেন। তখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসরের কাছাকাছি। আমাদের সামান্য রকমের বাটী ছিল। বাহিরে খোলা বারণ্ডা ছিল। সেখানে সামান্য মাদুর পাতিয়া দেওয়া হইত। দ্বিজেন্দ্র বাবু সমস্ত অভিমান পরিহার করিয়া তাহাতেই বসিয়া নানাগল্পের ভিতর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতেন। সঙ্গে থাকিতেন ৺কাশীশ্বর মিত্রের জামাতা। তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি ইংরাজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। মনস্তত্ত্বে তাঁহার কতকটা অধিকার ছিল। তাঁহাকে অন্য সকলে philosopher দাদা বলিয়া ডাকিত। অনেকসময়ে তত্ত্ববিদ্যার পাণ্ডুলিপি তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাদের বাটীতে বসিয়া লিখিত হইত। আমি ও আমার মধ্যম ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথ অদূরে খেলাঘর প্রস্তুত করিয়া মালা-ভাঁড় লইয়া খেলা করিতাম। দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহা দেখিয়া আমাদের পরিহাস করিতেন। তিনি আমার মধ্যম ভ্রাতাকে পেন্থু বলিয়া ডাকিতেন। সে তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। সন্ধ্যামুখে সকলে বেহালা ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। বাবা উপাসনা করিতেন। তিনি ও philosopher দাদা বেদীর নিম্নে বসিয়া শুনিতেন।

মধ্যে মধ্যে যখন পিতার সহিত বুধবার আদি সমাজে যাইতাম, দেখিতাম দ্বিজেন্দ্রবাবু বাটীর ৩।৪ জনকে লইয়া এক ঘোড়ার গাড়ীতে সমাজে আসিতেন এবং নিজে হারমোনিয়ম বাজাইতেন। বিষ্ণু গান করিত। বেণী বেহালা বাজাইত। প্রসিদ্ধ বাদক দুর্গাচরণ ভড় (দুর্গো ভড়) পাখোয়াজ বাজাইত। আমার পিতা, বেদান্তবাগীশ এবং তৎপরে বিদ্যারত্ন বেদীর আসন গ্রহণ করিতেন। সে সময়কার অমায়িক বক্তৃতা ও সঙ্গীত আগন্তুকগণের হৃদয় অধিকার করিয়া লইত। আদি সমাজের সঙ্গীত বড়ই চিত্তাকর্ষক ছিল। আদি সমাজের প্রত্যেক বেঞ্চ উপাসকগণ কর্ত্তৃক ভরিয়া যাইত।

ঐ সময়ে ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি একখানিও ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বরলিপি বাহির করিবার প্রথম চেষ্টা পান। তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে যে স্বরলিপি বাহির হয় তাহা পুরাতন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে দ্রষ্টব্য। বালক আমরা, যখনই ঠাকুরবাটীতে যাইতাম, তখনই তথায় যে সমাদর পাইতাম তাহা আজও অন্তরে জাগরূপ রহিয়াছে।

আজকাল হৃদয় খুলিয়া কেহ কথা কহিতে চান না। স্বয়ংবাদিত্ব আজকালকার সভ্যতার লক্ষণ। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাণখুলিয়া কথা কহিতেন, তাঁহার অন্তঃস্থলের সরল ও সুশোভন ছবি নিরীক্ষণ করিবার সৌভাগ্য সকলেরই হইত। তাঁহার ভিতরে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, তিনি অপরকে নিজের করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার নিকট ধনী-দরিদ্রের বিচার ছিল না। আশ্রয় ও আশ্রিতের ব্যবধান সমস্তই তিনি ভুলিয়া গিয়া অন্তরঙ্গের ন্যায় সকলের সহিত মুক্তহৃদয়ে মিলিতেন।

এই সময়ে পূর্ব্ব হইতে কেশববাবুর আগ্রহে পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধে নিবিড়ভাবে মিলিবার একটা বিপুল চেষ্টা চলিতেছিল। বয়ঃজ্যেষ্ঠকে নাম না ধরিয়া দাদা বলিয়া ডাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই কারণে দ্বিজেন্দ্রবাবু সকলের 'বড়দাদা' হইয়া দাঁড়াইলেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্টযোগে মিলিত ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহাদের সকলেরই বড়দাদা। সকলেই তাঁহাকে বড়দাদা বলিয়া ডাকিত। এই যে সম্বন্ধস্থাপন ইহার অন্তরালে সত্য-সত্যই প্রাণের টান ছিল। ৫।৭ বৎসর হইল মহর্ষির স্মৃতিসভায় কেশববাবুর দলের অজ্ঞেয় উমানাথ গুপ্ত একবার আসিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আমি তাঁহার হাতে ধরিয়া মহর্ষির বাটীর উঠান হইতে তাঁহাকে বারাণ্ডায় বসাইয়াদিলাম। তাঁহার হাত ধরিবামাত্র তিনি বলিলেন, "কে বাবা তুমি," আমি আমার নিজের নাম বলিলাম। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "তুমি যে আমার ভাইপো, তুমি যে দৌড়িয়া আসিয়া আমার হাত ধরিবে ইহাতে বিচিত্র কি? তোমার বাবা আমাকে কাকা বলিয়া ডাকিতেন।" তাঁহার কথায় আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পাকড়াশী মহাশয়ের ঘনিষ্টতা ছিল। আর ছিল পাকড়াশীর দেহাবসানের পর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের। দ্বিজেন্দ্রবাবু বিদ্যারত্নের বাসায় প্রায় থাকিতেন। ঐখানে চন্দ্রনাথবাবু আসিয়া মিলিতেন। একদিন দ্বিজেন্দ্রবাবু গিয়াছেন, চন্দ্রনাথবাবু আসিয়া জোটেন নাই। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রনাথ তখন বালক। সে ঘটনাচক্রে বিদ্যা-রত্নের বাসায় উপস্থিত ছিল। অন্য কাহাকেও না পাইয়া আমার পুত্রকে অদূরে চন্দ্রনাথ বাবুর বাটীতে পাঠাইলেন এবং বলিয়াদিলেন, চন্দ্রনাথবাবুর বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমি বলিবে যে "নেড়া দাদা ও দেড়ে দাদা আপনাকে ডাকছেন।" বিদ্যা-রত্ন মণ্ডিতমস্তক ছিলেন বলিয়া তিনি "নেড়া দাদা", আর দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিজের দাড়ী থাকায় তিনি দেড়ে দাদা। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাদিগকে পুত্রসদৃশ দেখিতেন। সে হিসাবে আমার পুত্র তাঁহার পৌত্রস্থানীয়। এই স্নেহের সম্বন্ধ তিনি মুখে নহে—অন্তরের সহিত পোষণ করিতেন।

তাঁহার শেষ বয়সে চক্ষুর দৃষ্টি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। আমার তৃতীয় পুত্র কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়া চক্ষুরোগের ঔষধ সামান্য সংগ্রহ করিয়া আনেন। বোলপুর উৎসব-

উপলক্ষে গিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ঐ ঔষধের কথা বলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু ঐ ঔষধ ব্যবহার করিতে সম্মত হইলে আমার পুত্র দ্বিজেন্দ্র উহা তাঁহাকে পাঠাইয়া দেয়। উহাতে তাঁহার একটু উপকার হয়। পরে দ্বিজেন্দ্রকে ঔষধ পাইয়া যে পত্র লেখেন তাহার একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "প্রিয় ভ্রাতা, তোমার প্রেরিত ওষুধে আমি অনেকটা উপকার পাচ্চি। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে সর্ব্বথা কুশলে রক্ষা করুন। তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর"। এমনই মধুর সম্বন্ধে আমরা তিনপুরুষ ধরিয়া ঠাকুর-পরিবারের সহিত গ্রথিত। আজকাল আকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে নিরীক্ষণ করি; সে সহৃদয়তা আমাদিগকে আর তেমন স্পর্শদান করে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বিজেন্দ্রবাবুর সহিত বিদ্যারত্নের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তিনি কখন কখনও বেলা ৯।১০টার সময় বিদ্যারত্নের বাসায় যাইতেন। কথাবার্ত্তার পরে বলিতেন, আজ এখানেই আহার করিব। বিদ্যারত্ন বলিতেন, আমার মোটাচাল, আহারের সময় আপনার গলা চিরিয়া যাইবে। আপনার বাটীর চাউলের তুলনায় আমরা যে চাল ব্যবহার করি, তাহা কুলোকেতে মাপিবার আবশ্যক হয় না। চাল এক-একটি গুণিয়া লইয়া ভাত চড়াই। তাহা সত্ত্বেও প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র, দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গিয়া সেই মোটা চালের ভাত খাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত রাজনারায়ণ বাবুর বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয়েই জ্ঞানী উভয়েই চিন্তাশীলগণের অগ্রণী। নানাবিষয় লইয়া পরস্পরের আলাপ চলিত। আবার যখন রহস্য চলিত, উভয়েরই অট্টহাস্যে ছাদ উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। রাজনারায়ণ বাবুর শেষ জীবন দেওঘরে অতিবাহিত হয়। ঐখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। রাজনারায়ণ বাবুর সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রব্যবহার চলিত। পত্রের নিম্নদেশে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজের নাম অনেক সময়ে স্বাক্ষর না করিয়া নিজের মূর্ত্তিটি আঁকিয়া দিতেন। রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশেষ অনুরাগ পোষণ করিতেন। রাজনারায়ণ বাবুর শ্রাদ্ধের তিন দিন পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রবাবু দেওঘরে যান ও তথায় অবস্থান করেন। আমিও একদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত মিলিত হই এবং উভয়ে মিলিয়া রাজনারায়ণ বাবুর শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন করি। রাজনারায়ণ বাবুর শ্রাদ্ধবাসরে দ্বিজেন্দ্রবাবু যে উপদেশ পাঠ করেন, তাহার প্রতি পংক্তিতে প্রেতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর সহিত কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বিহারী-বাবুকে দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রবাবু রহস্যপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর একটি অন্ধকারময় কুঠুরীতে শাঁকচুন্নির উদয় হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিলেন, শাঁকচুন্নির সাধুভাষা "শঙ্খ চিরুণী"। তিনি বলিলেন, প্রতিদিন রাত্রে ঐ-ঘর হইতে "শঙ্খ চিরুণী"র আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ভয়ে সেই কুঠুরীর দিকে কেহ অগ্রসর হইত না।

সন্ধ্যার সময় আগন্তুক বন্ধুবান্ধব আত্মীয়গণকে ঐ ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিতেন। কেহই সাহস করিয়া অগ্রসর হইত না। এইরূপে দুই-চারি দিন যায়। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন, আজ আমিই সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিব। কিন্তু আপনারা আমার পশ্চাতে থাকিবেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ আলোক-হস্তে প্রবেশ করিতে উদ্যত। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, ভয় আবার কি, তোমরা না যাও আমি নিশ্চয় যাইব। তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া অপরে সভয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন একটি ছোট টেপাই-এর উপর একটি শঙ্খ ও একখানি চিরুণী বিরাজমান। দ্বিজেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই তাহার আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া অট্টহাস্য চলিতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন, আমি মিথ্যা বলি নাই। এই দেখ শঙ্খ চিরুণী এখানে বিরাজমান।

একদিকে যেমন বিদ্রূপ ও অট্টহাস্য চলিত অন্যদিকে তেমন তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা এতই বলবতী ছিল যে, তিনি প্রায় প্রতিদিন Public libraryতে যাইতেন। দার্শনিক ও অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া Eden gardenএ লইয়া যাইতেন। এবং তথায় বেঞ্চের উপর কখন-বা বসিয়া কখন-বা শুইয়া গ্রন্থখানি সমাপন করিতেন। বৃক্ষের পত্র ভেদ করিয়া যখন গাত্রে রৌদ্র লাগিত, তাহাতে তাঁহার দৃক্‌পাত ছিল না। কিন্তু আরদালী পার্শ্বে আসিয়া ছাতা খুলিয়া ধরিত। দর্শন, সাহিত্য ও কাব্যে তাঁহার কেহ গুরু ছিল না। নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন প্রভাবে তিনি নিজেই অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে কালীবর বেদান্তবাগীশকে তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিতে দেখিতাম। কি পাশ্চাত্য কি এদেশের দর্শন-শাস্ত্রের উপর দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল।

তাঁহার রচিত 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' বঙ্গভাষায় কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অনন্যসাধারণ। ইহার মৌলিকতা সত্য-সত্যই বিস্ময়কর। দ্বিজেন্দ্রনাথের অতুলন ভাষা, কল্পনার প্রাখর্য্য, ভাবপ্রকাশের আশ্চর্য্য কৌশল তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার রচিত তত্ত্ববিদ্যা যাহা ইংরাজিতে অনূদিত হইয়া ontlogy নাম ধারণ করিয়াছে তাহা এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত। এই তত্ত্ববিদ্যা বাঙ্গালা ভাষায় দর্শনগ্রন্থের প্রথম। তাঁহার সম্পাদিত 'ভারতী'তে তাঁহার রচিত মূল্যবান প্রবন্ধের ইয়ত্তা কে করিবে? অন্যদিকে জ্যামিতি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা যাহা পুরাতন 'ভারতী'তে প্রকাশিত, তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথের অত্যুচ্চ প্রতিভার পরিচায়ক।

একদিকে যেমন তিনি কবি, দার্শনিক, গণিত ও সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ্ এবং রহস্যপ্রিয়, অন্যদিকে তেমন অবসর-সময় কাগজের বাক্স নির্ম্মাণে ক্ষেপণ করিতেন। কাগজে ভাঁজ দিয়া সুতার বিন্দুমাত্র সাহায্য না লইয়া কেবল মাত্র কাঁচির সাহায্যে তিনি যে বাক্স নির্ম্মাণ করিতেন এবং তাহার ভিতরে ছোট বাক্স, তাহার মধ্যে আবার ছোটতর ও ছোটতম বাক্স গুছাইয়া দিতেন তাহাতে তাঁহার সামান্য প্রতিভার পরিচয় ছিল না। তিনি ঐরূপ অনুপম বাক্স আমাকে দিয়াছিলেন। আমি অনেকদিন তাহা রাখিয়াছিলাম। পরিশেষে উহা কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গেল, কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না।

অসময়ে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। আদি সমাজে একজন আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার নাম হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মধ্যে মধ্যে লোকাভাব হইলে তাঁহাকে আমার সঙ্গে আদি সমাজের বেদীতে বসিতে হইত। তিনি সহজে রাজি হইতেন না। বলিতেন, আদি সমাজের বেদী খুনে বেদী। ঐ বেদীতে বসিলে স্ত্রী বাঁচে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতেন যে, ঐ বেদীতে বসিয়া মহর্ষিদেবের স্ত্রী মারা গিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রবাবুর, রবিবাবুর, বেচারাম বাবুর ও চিন্তামণি বাবুর (অর্থাৎ আমার) স্ত্রী মারা গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিতাম বিশ্বারত্ন মহাশয়ের ত দুই স্ত্রী বিরাজমান। তাহার উত্তরে তিনি বলিতেন যে, দুই স্ত্রীর মধ্যে যেরূপ বিবাদ তাহাতে বিশ্বারত্ন অস্থির হইয়া দুইজনকেই বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। বিশ্বারত্নের স্ত্রী না থাকারই সামিল। আর ইহাও বলিতেন যে আপনার অনুরোধে মধ্যে মধ্যে বাধ্য হইয়া আদি সমাজের বেদীতে আমাকে বসিতে হয়, তাহার ফলে বাড়ীতে গিয়া দেখি আমার স্ত্রী খাবি খাইতেছেন। আমাকে বেদীতে আর বসিতে বলিবেন না, বৃদ্ধবয়সে স্ত্রীবিয়োগ সহ্য করিতে পারিব না।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ৫ পুত্র দীপেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ। কন্যা দুইটি সরোজা ও উষা। সরোজার সহিত বিখ্যাত এটর্ণি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের এবং উষার, সহিত তদীয় ভ্রাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। উষা অনেকদিন হইল মারা গিয়াছেন। সরোজার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। দীপেন্দ্রনাথও ৩।৪ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, নীতীন্দ্রনাথ প্রায় ১৫ বৎসর হইল পরলোকে। মাতৃহীন বালক নীতীন্দ্রনাথ একটু দুরন্ত ছিলেন, তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দুর্নীতি বলিতেন। মোহিনীবাবুর পিতার নাম ছিল ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। তিনি দ্বিজেন্দ্রবাবুর সহিত রহস্য করিয়া বলিতেন আমি "থালির ভিতর হাতি পোরা" যাহা অসম্ভব তাহা করিয়াছি। আমি দ্বিজেন্দ্রনাথের তুলনায় অর্থহীন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার দুই কন্যাকে আমার বাটীতে (পুত্রবধূরূপে) পুরিয়া রাখিয়াছি। এইরূপ রহস্যালাপ শুনিয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একসময়ে বাতরোগে কষ্ট পান। তজ্জন্য তাঁহার হাতের অঙ্গুলি বাঁকিয়া গিয়াছিল। তিনি বাতের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, জোড়াসাঁকোর বহির্বাটীর বারাণ্ডায় প্রতিদিন অনেকবার ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ইহা তাঁহার নিত্য অভ্যাস ছিল।' পাইচারির সংখ্যা গণনা করিবার জন্য দক্ষিণ হস্তের পাটি ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া রাখিতেন। সুদীর্ঘ বারাণ্ডায় একবার যাতায়াতের পর সে অঙ্গুলি চাপিয়া রাখিয়া আর একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করিতেন। এইরূপে পরে পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সমাপন করিয়া বাম হস্তের পাটি লইয়া এক একটি অঙ্গুলি উঠাইয়া বেড়াইতেন। দুই হস্তের অঙ্গুলি যখন শেষ হইয়া যাইত, তিনি ঠিক করিয়া লইতেন যে প্রায় এক মাইল ঘোরা হইল।

তিনি স্বাদেশীকতার পক্ষপাতী ছিলেন। বিলাতী হাবভাব প্রকাশের বিরোধী ছিলেন। তাই প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে "সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" এই সম্বন্ধে লিখিত বক্তৃতা দেন। তাহাতে অনেকের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। তিনি গান্ধী মহারাজের পক্ষপাতী ছিলেন। যখা-

সম্ভব খদ্দর ব্যবহার করিতেন। মহাত্মা গান্ধী ও মহামতি এণ্ড্রুস্ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে বড় দাদা বলিয়া ডাকিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একসময়ে সভাপতি ছিলেন।

আমি যখন আদি ব্রাহ্মসমাজে বেদীর কার্য্য আরম্ভ করি, তখন আমার বয়স দ্বিজেন্দ্রনাথের অর্দ্ধেক ছিল। একত্রে কতবার উপাসনা করিয়াছি। মাঘোৎসবের উপাসনায় তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছি। তিনি সুপণ্ডিত বলিয়া একদিনের জন্যও আমাকে নূতন যুবা বলিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নাই। বরাবরই উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্নেহ আমার জীবনকে ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার রচিত "আচার্য্যের উপদেশ" অমূল্য গ্রন্থ। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত অপূর্ব্ব ও হৃদয়োন্মাদকারী।

আজ দ্বিজেন্দ্রনাথের অভাবে আমরা একজন জ্ঞানযোগী অচল অটল বিশ্বাসী, সাহিত্য ও কাব্য-রাজ্যের এক মহারথীকে হারাইলাম। সারল্যের এমন একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি আমরা আর দেখিতে পাইব না। এমন একটি ঋষি-জীবন অন্তর্ধ্যান হইল, তাঁহার ঋষি-প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া অরণ্যের কাঠবিড়ালী তাঁহার গাত্রে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিত। চড়াই পাখী তাঁহার হস্ত হইতে তণ্ডুলকণা লইয়া খাইত। হায় এমন একটি সমুন্নত জীবনের অভাবে আমাদের সম্মুখে আর একটি জীবন্ত আদর্শ রহিল না। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন, ইহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

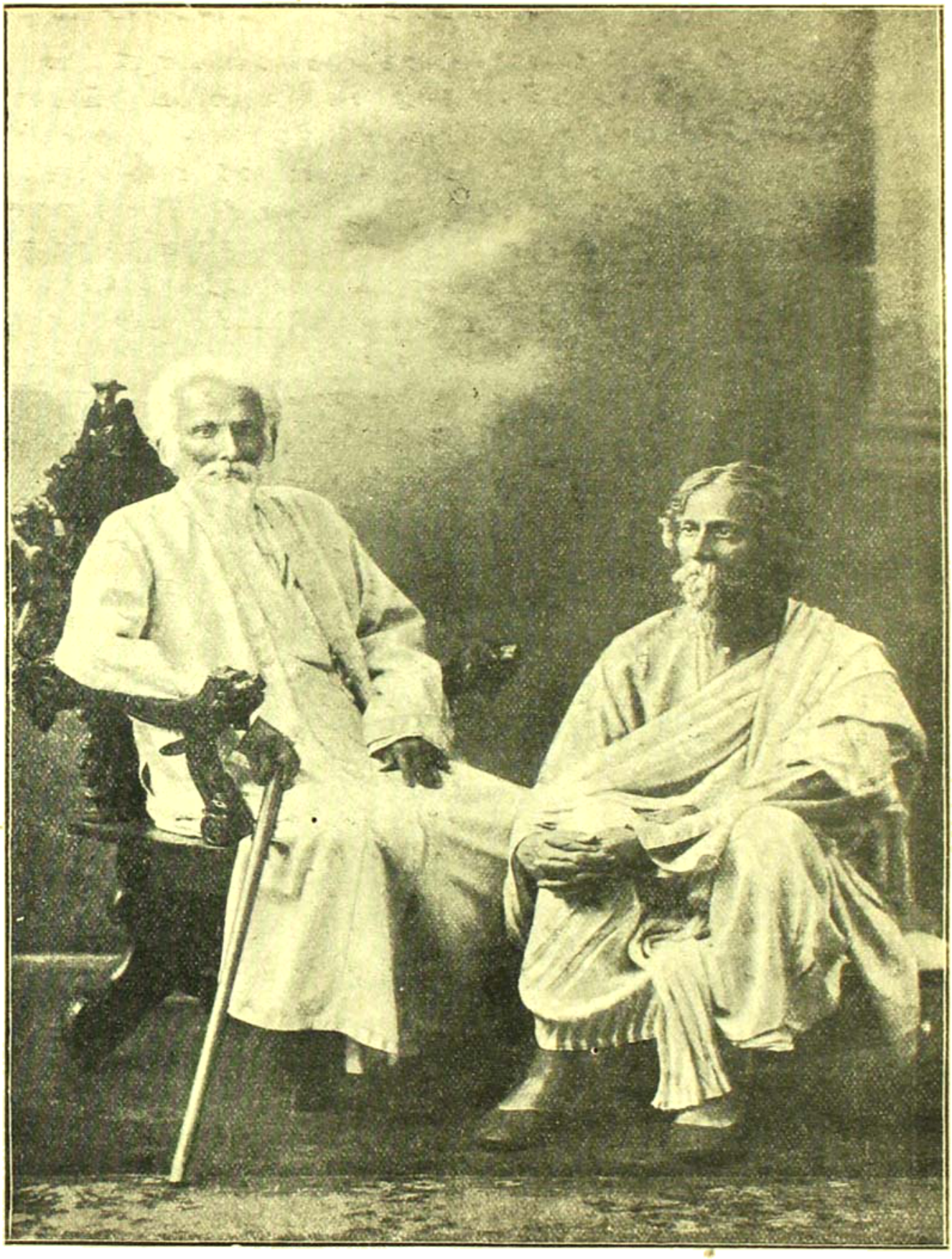

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।

পূজনীয় দ্বিজেন্দ্র নাথ

পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ঋষিতুল্য চরিত্র, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব সুন্দর ও মধুর কাব্য-রচনা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিতে পারিবেন ও বলিবেন, আমি তাঁহার মনের সরল মাধুর্য্যের একটি কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিব।

যখন হইতে তাঁহাকে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে জানিলাম সে আজ প্রায় ৪০ বৎসরের কথা, তখন আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ মাতুল অমিয়নাথ চৌধুরী নিতান্ত বালক। এই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (আমরা তাঁহাকে প্রথম পরিচয় কাল হইতেই "বড়দাদা" বলিয়া ডাকিতাম) প্রতিদিনই প্রত্যূষে আমাদের বাড়ী আসিতেন, হাতের কি-একটা কৌশলে বাঁশী বাজাইয়া আপন আগমন সংবাদ জানাইতেন। এদেশে তখন বাইসাইকেল পর্য্যন্ত তেমন চলে নাই, তিনি ট্রাইসাইকেল করিয়া আসা-যাওয়া করিতেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতেন, সেই সময়ের মধ্যে বালক অমিয় সেই ত্রিচক্রযানে অল্পদূরে অল্পক্ষণের জন্য একচক্র ঘুরিয়া আসিবার অনুমতি প্রায়ই পাইত। কেন না "বড়দাদা" তাঁহার উদার সমানুভাবকতায় বেশ বুঝিতেন তাহার শিশুমন, এই গাড়ীখানিতে চড়িয়া ঝড়ের মতন ঘুরিয়া আসিবার জন্য কত উৎসুক। সেদিন বড়দাদা, কি কারণে ঠিক স্মরণ নাই, গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিলেন, আর তাঁহার প্রিয় ত্রি-চক্র রথখানি আমাদের বাড়ীতে অমিয়নাথের জিম্মায় রাখিয়া গেলেন। অমিয়নাথের হাতে তাহা সমর্পণ করিয়াই, প্রথম তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, কাজটি সঙ্গত হইল কিনা, সহজেই বলিয়া ফেলিলেন, "এ যেন ডাইনের হাতে ছেলে সঁপা"—তাড়াতাড়ি দুচার পা গিয়াই ভাবিলেন, অমিয় বোধ হয় এ কথায় ব্যথিত হইল, অভিমান করিতে পারে; যেমন শীঘ্র গিয়াছিলেন, দ্বিগুণতর দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসিয়া, অমিয়নাথের গলায় হাত দিয়া, স্নেহের সুরে বলিলেন, "দেখো অমি তুমি দু' একবার চড়তে পার, তবে ভেঙে ফেলোনা যেন।" অমি তো মহাসুখী, আমরা খুব হাসিলাম, আর সেই সঙ্গে বড়দাদার মন-খোলা বিরাট অট্ট-হাস্যে চারিদিক প্রতিধ্বনিতে ভরিয়া গেল। তাঁহার এই হাসি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেহ কখনো ভুলিতে পারিবে না, এমন হাসি হাসিতে পারিতেন আর একজন, তিনি ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়।

আমি তাঁর রেখাক্ষরের ছাত্রী ছিলাম। তাঁর রেখাক্ষর পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার জন্য ফেয়ার করিয়া দিয়াছিলাম, আর ছোটখাট চিঠিপত্র রেখাক্ষরে লিখিতে পারিতাম। যদিও এখন সে রেখাক্ষর বিদ্যা মনের কোন্ অন্ধকার কোনে আত্মগোপন করিয়াছে তার ঠিক নাই কিন্তু সময়কালে বড়দাদার প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে ইহাতে ধন্য হইয়াছি।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

মৃত্যু *

আমাদের মনের উপর মৃত্যুর অবসাদ ছায়া নিক্ষেপ করেছে। আজ সেই দিনের কথা মনে পড়ছে যেদিন পিতৃদেবের দেহান্তর ঘটে। তাঁর দেহাবসানের অনতিকাল পরে, যে উৎসব তিনি আরম্ভ করেন, তার সাম্বৎসরিক উৎসবে আমরা সমবেত হয়েছিলুম। মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের যোগ সেদিন অনুভব করবার দিন এসেছিল, এবারও তাই এসেছে।

সংসারের ভিতর মৃত্যুকে ক্ষতি বলে জানি, দুঃখ বলে জানি। জীবনের বিরুদ্ধ, অস্তিত্বের বিরুদ্ধ, 'না', বলেই জানি। এই সঙ্কীর্ণ পরিধির আকর্ষণে অমৃতের মধ্যে মৃত্যুর যে প্রতিষ্ঠা তা দেখতেই পাইনে। কাছের দিকটাতে চেয়ে দেখি মৃত্যু আমাদের শঙ্কে প্রকাণ্ড অভাবের রূপ ধরে আসে, অথচ এই বিপুল বিশ্বসংসারের দিকে যখন তাকাই তখন দেখি তাঁর জ্যোতি কোথাও ম্লান নয়, আনন্দের সঙ্গীত, সূর্য্যের মহিমা আকাশে বিস্তৃত, কোনও জায়গায় বিষাদের কোনও চিহ্ন নেই।

ছন্দের মধ্যে যতি তার গতিকেই প্রকাশ করে। —সেই সমাপ্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখলে অবসানকেই দেখি, গতিকে দেখিনা; তখন সে কিছুই প্রকাশ করেনা। ছন্দের সমাপ্তির মধ্যে যতিকে দেখলে বুঝি, তার মধ্যেই প্রাণের লীলা। বিপুল বিশ্বসংসারে বিস্তৃত করে মৃত্যুকে দেখলে বুঝি সে অবসান নয়। বুঝি যে, সমাপ্তির তালে তালে করতাল বাজিয়ে চলেছে চিরন্তন। ঋষিরা বলেছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অগ্নি সূর্য্য বায়ু যা কিছু সৃষ্টিকে ঘটিয়ে তুলছে এরা সবাই বিশ্বের গতিলীলার প্রকাশ; তারি সঙ্গে মিলিয়ে বলা হয়েছে, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ—মৃত্যুও তাদেরই তালে তালে চলেছে; এই সংসারে প্রাণচাঞ্চল্যের যে পঞ্চায়েৎ বসেছে মৃত্যুও সেই পঞ্চায়েতের একজন। মৃত্যু তার বিরুদ্ধ নয়। সে যে সৃষ্টির চক্রকে অবরুদ্ধ করছে তা হতেই পারেনা, সে তাকে আরও অগ্রসর করে দিচ্ছে। মৃত্যু যাঁর ছায়া অমৃত যাঁর ছায়া সেই পরম আনন্দের মধ্যে যাঁরা মৃত্যুকে দেখেন তাঁদের ভয় থাকে না।

যদিদংকিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি।

সমস্ত বিশ্বকে তাঁরা অপরিসীম প্রাণের মধ্যে সমুদ্রে লীলায়িত তরঙ্গের মত দেখেছেন—তাঁরা দেখেছেন প্রাণের উৎস হতেই বিশ্বসৃষ্টি নিঃসৃত হচ্ছে।—তাঁরাই অমৃতকে জেনেছেন

* দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন মন্দিরে ১১ই মাঘে ভাষিত।

ও পেয়েছেন। তবে কেন "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ?—এর সঙ্গে ভয়ের কথা কেন ? 'ভয়' বলতে এখানে 'শঙ্কা' নয়, ভয় বলতে তাঁর নিয়ম। যা মৃত তার নিয়ম নেই, যা চলে তাকেই নিয়মের দ্বারা দৃঢ় করে রাখতে হয়, যাতে চলার মধ্যে বিকৃতি না ঘটে। সূর্য অগ্নি বায়ু জল এবং মৃত্যু সৃষ্টির বাধমান গতিশীল রূপ। যেখানে গতির অনন্ত বৈচিত্র্য সেইখানেতেই চাই মহানিয়মের অবিচলতা। সেই নিয়ম মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। অতএব ভয় নেই।

এই প্রাণময় সৃষ্টিতে মৃত্যুও ত "ভয়াদ্ধাবতি", প্রাণের নিয়মেই চলবে, ছন্দের নিয়মেই যতি। বিশ্বসত্তার মধ্যে কোনো "না" এসে এই প্রাণের প্রতিবাদ করবে না। সেই জন্যেই ত এত কড়া পাহারা, এত নিয়ম। আমাদের চারদিকে, ভিতরে বাইরে কি উদ্দাম প্রচণ্ড গতি, অথচ কি শান্তি। কেউ কারও ঘাড়ে পড়ে যে কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা আনছে না, সে এর প্রতি তাঁর একান্ত আনন্দ আছে বলেই। প্রাণের প্রকাশকে মহদ্ভয়, মহানিয়ম নিয়ত রক্ষা করছেন, এই জেনে-সাধক অমৃতকে শ্রদ্ধা করেন।

এই নিয়মের ভিতর কি আনন্দ কি প্রেম আজ যেন অন্তরে জানি, এবং যিনি সেই চিরন্তন সত্য, মৃত্যুতেও তাঁকে জেনে আজ যেন আমরা অভয়কে অমৃতকে লাভ করতে পারি। মৃত্যু কোনও সূত্রকে ছিন্ন করবার জন্য নয়, সূর্য বায়ু জল প্রভৃতি অন্যান্য শক্তির মত সেও সৃষ্টির বাহন। সৃষ্টিকে সে রূপ থেকে রূপান্তরে কাল থেকে কালান্তরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—না হলে অচল রূপের চাপে সব পিষ্ট হয়ে যেত। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে আজ আমরা স্বীকার করি, প্রণাম করি, তাঁর মধ্যে হৃদয়কে শান্ত করি যস্ত্রছায়ামৃতং যস্ত্রমৃত্যুঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলাহাবাদ
১২ই ফাল্গুন, ১৯১৪

উড়োপত্র *

জ্যোতি—

কি বলিব কি সুখে যমুনাতীরে
সেবিয়ে সুমধুর বায় স্নান করিয়ে যমুনায়
কাটাই কাল নীরোগ শরীরে
বাস্ করি একখানা ছোটখাটো কুটীরে ॥

কিবা বায়ু বহিতেছে ধীরে ধীরে
কিবা নড়িতেছে লতাপাতা মনে নাই আর কলিকাতা
আনন্দ জলে মনের মন্দিরে
দয়ার্দ্র নয়নে হেরি গৃহের বন্দিরে ॥

ছাড় হেম অট্টালিকা মোহময়
দিন কতক হেতায় আসি হও দেখি প্রয়াগবাসী
ঘুচিয়া যাবে সকল সংশয়
তিলেক না রহিবে আর পাপ তাপ ভয় ॥

কলিকাতা ছিছি কলির আলয়
সহরের মলিন পাকে শুদ্ধ জ্যোতি ডুবিয়া থাকে
দ্বিজের প্রাণে কেমনে ইহা সয়
শুদ্ধজ্যোতি বিনা কি দ্বিজত্ব কভু রয় ?

আশীষ করিছে এবে দ্বিজপতি
হেমের হোক চিরক্ষেম প্রবল হোক জ্ঞান প্রেম
শুভ কার্য্যে সদা হোক মতি
হেম অলঙ্কৃত কুল লক্ষ্মীর বসতি ॥

---

* ৺দ্বিজেন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লিখিত পত্র।

গুণ হোক্ চিরজীবি ধরাতলে
গুণ হউক বিশ্বজয়ী পৃথ্বী হোক্ গুণময়ী
গুণের গুণে পাষাণ সম গলে
গুণ গুণে বাঁধা থাক্ চরাচর সকলে ॥

জ্যোতিতে হউক কুল সমুজ্জ্বল
প্রশান্ত জ্যোতির আগে অমঙ্গল সকলি ভাগে
জ্যোতি বিনা কোথাও নাই মঙ্গল
কুশলে থাকিলে জ্যোতি জগতের কুশল ॥

Febry. 1873

———

First
বুধবার
Since I started for Allahabad

গুণু—

যমুনা নদীর তীরে একখানি বাঙ্গলাতে বসিয়া তোমাদিগকে মনে করিতেছি। নীল-কমল মিত্রের জিবা একটী হৃষ্টপুষ্ট জামাই কল্য রাত্রি হইতে আমাদের তত্ত্ববিধান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইহার নাম প্রবোধচন্দ্র বসু। আলাটিলা রকমের লোক। Jolly fellow after all this man of a Jamai. আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মাংস প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আমার ও জান, আমি হালি ছাড়িয়া দিয়া চৌকি ঠেস্ দিয়া দর্শক ভাব ধারণ করিলাম। জানকীর পেটের ব্যামো তিনিও তথৈব চ সুতরাং জামাইবাবুর ভাগে সমস্তই পড়িল। তিনি দুই প্লেট -পুরা দুই প্লেট mind you মুরগির ঠ্যাঙ্গের হাড় বাহির করিয়া ছাড়িলেন। The Jamai is after all a right Jolly fellow, he reminds me of Chaucer's Franklin.

সাঁতার দিয়া যমুনা নদীর এপার ওপার হইয়াছি। দেখিবার মধ্যে যমুনা নদীর

---

* দ্বিজেন্দ্রনাথের খুড়তুতো ভ্রাতা ৺ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের পিতা।

সাঁকো দেখিতেছি। এখনো এলাহাবাদ দেখিতে বাহির হই নাই। চারুবাবুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। মধ্যাহ্নভোজন করিয়াই সহর ঘুরিতে করিব মানস করিয়াছি। আজিকার দিনটা অল্প মেঘলা, পথের ধারে বাড়িগুলা সেকেলে fashion এর, which I like very much, that is this is better than Huge Rajendra Mullick's Sham Mullick's and Big fat generations Big fat আহ্নিক, full of ostentation.

রেলগাড়ীতে বসিয়া পাটনা প্রভৃতি স্থান সকল দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। বাঙ্গলা অপেক্ষা এ সকল অঞ্চলের পল্লীগ্রাম অধিক পরিষ্কার বোধ হইল। স্ত্রীলোকদিগের পরিধান-বস্ত্র দিব্য সুদৃশ্য অথচ পরিপাটী, পুরুষেরা অধিকাংশ সবল ও সুস্থশরীর। পাটনা অঞ্চলে ফলের গাছগুলি দিব্য ছায়া করিয়া রহিয়াছে। মন্দির গোরস্থান প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে নিভৃত স্থান দখল করিয়া আছে। সেকেলে ভাব বড় রমণীয়, পরিষ্কার ভূমি, গাছের ছায়া, মাঠে বালক বালিকা ইত্যাদি দেখিলে পূর্ব্বেকার স্বাধীনভাবের কতক আভাস পাওয়া যায়। আজ এই অবধি—Show this letter to Nealcamal Saroda etc and give them my' offering

Yours afftly
Bordad
February 1873

চিরজীবেষু—

প্রাণাধিক গুণু !

তোমার প্রেরিত কাগজ স্বাক্ষর করিয়া অদ্যসহ পাঠাই। তোমরা সকলে ভাল আছ শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। শরৎ আমাকে একখানা চিঠি লিখিয়াছে। তাহাতে বাড়ী-ভিতরের ব্যামো সংবাদ লিখিত আছে। তাহা আরোগ্য হইয়াছে কিনা জ্যোতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে লিখিও। এবার ঠিকানা লাল কুঠী Allahabad, জমিদারী কেমন চলিতেছে ? Mr. Sarowda I hear has gone to Kuttuck —you and Jotee are the only remnants of the once goolzar catcharee. How is it that Jotee hasn't written me a single letter perhaps there is a শীকৃতি of subject matter, I will arrange for him the heads to dilate upon.

Raj Narayan Baboo and the Adis.
Notgoblin and the N. A, T I. O. N. A. L. Bo T H E R I

3. Bishnoo Baboo and the little girls.

4. Sitanat Baboo and his Transactions of the Royal society of Calcutta.

5. And last though not the least B I L L I A R D S.

Yours Bordada the exile.

P. S.

I forgot to mention in the list one Hem & his E.

O. N.

Suder Catcharee
10 Septa /73.

My dear Goonoo.

Petition sent through B I A, Police has again enquired of the Sikh and Sobharm Zamadar answered as usual that he does not know name place of these fellows they were hired for the purpose of doing something which they had no occasion to do why this fuss about a simple thing. I am quite at a loss to imagine what news of yourselves. Dwarkas to from Kalgram sent to you for inspection, see that nothing happens in quarter. Nobin Baboo is the presiding genius of the deserted mansion. I ought to have said. "The sole genius "Because" his right there is none to dispute excepting of course.

Your Affectionate
Bordada

I am sure every thing will be clearcd of all rubbishes.

তোমরা এখানে আইলে আমি আমার element পাই poetry is all dried up তোমরা আইলে আমার Muse বলিবে এ মালঞ্চে (of poetry) নিত্তি আসি, সদা নয়ন-জলে ভাসি, আজ কেন পায় হাসি, ও সই রাশি রাশি ফুটেছে ফুল মালঞ্চে.....কিন্তু philosophy তেমনি দৌড়িয়া চলিয়াছে philosophy একটু ফুরসদ পাইয়া আমাকে বন্দি করিবার চেষ্টা করিতেছে। তোমরা আইলে তাকে গাঁ গাঁ করিয়া পালাইতে হইবে—I am trying to make the most of my philosophy now that you are at a safe distance from my Parnassus. I say জ্যোতি, poor স্বরূপ সর্দার is dead মা is pressing me to pay স্বরূপ সর্দার funeral ; his পরিবার has been here. I would advise you to pay 10 Rs only from the সরকারি, my paying the sum is too much for me in my present circumstances.

Yours Affly
Dijendra Nath Tagore.

Febry 1874

শুভাশিষাঃ রাশয় সন্তু

এখানকার বাজার বড় dull—chairs vacant—cues untouched—few and far between-your letters relieved us some what. The above is an epitomy of our Catchary. I hope things are more ostensibly managed in your quarter of the globe. How are you faring with dariynos ? are they gregarious ? are they solitary ? are they docile ? are they fond of your company ? are you fond of their Company ? are they practicable ? are their hands or which ? The doriyus are altogether clever fellows. They understand business very very well in spite of all this.

I dont think you will be satisfied with less than double the present *Munafa* as our celebroted Poet says.

"Cant you the income doublify ?
Why then pandooah troublify ?"

Is it possible that this poet borrowed his wits from such a poor versifier as Dryden ? Whom he has not the slightest recolection of ; The arguments which makes Mahabharat debtor to Homer has I see blinded your critical faculty.

Yours affly

My dear ভনু জ্যোতি—

যাবার Hill চমৎকার Scenery. Houses and gardens like fairy land sea just near the threshold. We are in a *princely* Palace such a one as is only to be dreamt of in dreams hilly place undulating hust enchanting by Sea extending to the Horizon. Is n't this beautiful O Goonoo O Jotee I wish both of you were here. Goonoo you would have been in ecstacy, what fairy gardens below—what a plaied sheet of water foaming only a little near the coast and making music, day and night, Goono my mind's eye is seeing you standing here in the high balcony and letting loose all sorts of strange fancies which how close could ever dream of in the highest flights of their imagination Jotee, I see you gazing silently twirlingly your mustaches and sending and gazing twirling and smilling & *Co.* & *Co.* and then bursting into a sudden laugh at my thursting some remarks purposely to make you disclose your mind. This is a place to dream of and to dream in, in fact a place fittiug exactly with স্বপ্ন-প্রয়াণ, Goonoo why don't you send a vibrating hope or to across the Indian territories, Jotee why don't you pen a sheet or two of lines and fling them here with a Billiardic aim.

———

Jubbulpore

ভনু O ভনু,—

Have pity on your poor Bardada.

No respite.

Pestered he is with progressive spite.

The progressives of this place intend to murder me with their unwelcome presence. Tell Jadu that I made a great mistake in enlarging upon Jollity and so forth Jolly I was at Allahabad in the congenial circle of the good Nilkamal Mitter. But here in this Jubbulpore I pass days and nights like a prisoner and who do you think is the Jailor? I will name him not, suffice it to say that he has a curvilinear beard the most repulsive to look at. This I that is this Jailor is to my consternation perfectly at home in this nest

of progressives, where as your poor Bardada is disgusted with the puritanical appearance, puritanical conversation, puritanical salutation and puritanical everything which surrounded him hunt him, pester him without remorse. O Goonoo O Jotee O Sarada O Jadoo, do you ever think of your Bardada, do you ever dream of the tortures he undergoes in this dungeon of a Jabbulpore, if you have a Jot of pity in your breast come at once to his rescue. This dull prosaic life is unbearable in the extreme. But you do not know yet how I changed to fall in this miserable state. I shall briefly tell it to you. No sooner we alight from railway carriage than my Jailor has some conversation with the station-master—a progressive looking fellow and we are immediately dragged into a কোটর where we see nothing but progressive faces, hear nothing but progressive humming of কীর্ত্তনসুর (They dare not sing aloud thinking that we are no less than Adi samaj men famous for music) and talk nothing but prosaic dull talk in which my Jailor delights. There was a time when Zemindary Catcharee was not so welcome as the Billiards and so forth. But now I have forgotten the difference between the one and the other and the Zemindary Catcharee appears to me as wellcome as the Billiards. This is mind you a discovery worthy of the philosopher who is giving birth to these lines. Science will rejoice to receive in its bosom this profound fact that as the difference between stars apparently diminish in proportion to their distance from the earth so the difference between good better and best apparently diministh when bad worse and worst make their appearauce in a closer degree. How are you all. No news from you for ages চালাও your pen and all will be right write to the care of Suttoo Tana in Bombay and I will get it Surely

Yours affly

বড়দাদা—

শান্তিনিকেতন
Never mind তারিখ, শুক্রবার।

শুণু আশিষাং রাশয়ঃ সন্তু
জ্যোতি তথৈবচ

এই চিঠিখানি জমিদারী বাক্সের মধ্যে থাকিলে ভাল হয় তাহা হইলে Hitting two birds with the same stone" এই প্রবাদটি ফলিত হয়। দুইবেলা বাঁধ মহাশয় টের পাইতেছেন, এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত জলক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছি—এক বেলা নয় দুই বেলা!! এই দুই জলক্রীড়ার মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুর প্রথম অংশ Meditation and Co পরে কোনদিন Geometry কোনদিন বেদান্ত ইত্যাদিতে কাটাই। ভাত খাইয়া ঘিপুর পাছে তন্দ্রা আসে এই হেতু কোনো কোনো দিন তাহার সহিত বাঘবন্দি খেলি, ঘিপু দুই দিন খেলিয়া প্রতিবার পরাজিত হওয়াতে আর আমার সহিত খেলিতে চাহে না, এইজন্য এখন তাহা রহিত করিয়াছি। কতক-গুলা ছেঁড়া-খোঁড়া লণ্ডন নিউস্ আছে, তাহার ছবি দেখি ও কাজে কাজে পড়ি (অর্থাৎ পাঠ করি বিছানায় পড়ি নহে) একখানা বই আনিয়াছি তাহা পুনঃ পুনঃ পড়িয়াছি আর তাহা পড়িতে ভাল লাগে না, এখানে একটা ভয়ানক মাথা ঘুরানিয়া বই পড়িয়া আছে তাহাও পড়িতে ভাল লাগে না। এই হেতু সময়বিশেষে হাঁসফাঁস্ করিতে হয়—কিন্তু Meditation রূপ অস্ত্র দ্বারা হাঁসফাঁসানিটাকে প্রতিদিন বধ করিয়া থাকি। কিন্তু যীশুখৃষ্টের ন্যায় আবার সে পুনরুত্থান করে (বমউইচ্ সাহেবের "পুনরুত্থান" স্মরণ হইল) সন্ধ্যার সময় আহারান্তেই শুইয়া পড়ি এক ঘুমের পর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় আর ঘুম হয় না—একি দায়!

২দফা। তোমাদের এখন্ খবর কি? When shall we three meet again। যদুর মেজাজ এখন কিরূপ? কার্দ্দানি ফলাইতেছেন? না মুরুব্বিয়ানা চাল ধরিয়াছেন? যদুকে এই মাঠে ছাড়িয়া দিয়া চারিদিকে অলঙ্ঘনীয় পাথরের খাড়া করিয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে দুইদিনে তাহার কার্দ্দানি তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু যদুর এমনি একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে যে দুইদিন যাইতে না যাইতে সেই পাথরে প্রাচীর ভেদ করিয়া বল্‌রামজি তাহার সমাপন্ন হইবে, সুতরাং কার্দ্দানিও আবার গা-ঝাড়া দিয়া উঠিবে।

৩ দফা। একটি কাজ করিবে? বিশ্বাসকে একটি ডি মার্কাওয়ালা বাঁশী পাঠাইতে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছি। তাহা বিশ্বাস এখন—পাঠায় নাই। তদ্বিরহে আমি অধীর হইয়াছি। বাঁশীটি যাহাতে—শীঘ্র পাই তাহা করিতে পার। তাহা করিলে আমাকে বাঁচাও—আর অধিক কি বলিব।

৪ দফা। বাটীর সংবাদ কিরূপ, মা কেমন আছেন? আর আর সকলে কেমন আছেন? ব্যাঘ্র হন্তারক্, উৎস—উৎসারক, সঙ্গীতাবস্থাবিশারদ টুনটুনির নারদ বাত রোগের গারদ—

এখন যে মহাত্মা তিনি কি অদ্যাপি আমার ঘরটির প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন? বোধ করি জ্যোতি তাঁহাকে বলিয়াছেন, বড়দাদা আসুন তিনি আপনার সঙ্গীতপুস্তক উদ্ধার করিবেন?" বরাহ অবতার রসাতলমগ্ন বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন ইহা সত্য কিন্তু তাঁহার অস্ত ছিল, অর্থাভাবে আমার বিধাতা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে—সুতরাং আমাকে কে উদ্ধার করে তাহাই আমার একমাত্র চিন্তা। তিনি বাটীতে যতদিন আছেন ততদিন আমি বাড়ি-মুখো হইতেছি না, ইহা নিশ্চিত জানিও।

৫ দফা। জমিদারির খবর কি? সারদার চিঠিতে—"have him up to the police" এবং "fill down the money" প্রভৃতি দেখা দিয়াছে কি না? মাজাদপুরের কিরূপ ভাব গতি?.....বিপু আরোগ্যলাভ করিয়াছে।—এইখানে "দফা" রফা করলাম।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ।

ভাই জ্যোতি—

তোমার একমেটে চিরকুটখানিকে আমি দোমেটে ক'রে দিলুম এইরূপ :—

একমেটে।	দো-মেটে।
তোমার কাঁঠুনি	কাঁঠুনি গীতের মরি কি বাঁধুনি
কথার বাঁধুনি	নাহি মেলে তার ছুঁড়ি।
নাহি মেলে ছুঁড়ি।	জ্ঞানে তুমি সিদ্ধ
জ্ঞানে তুমি সিদ্ধ	বয়সেতে বৃদ্ধ—
বয়সেতে বৃদ্ধ	(হ'লে কি হয়)
(মন তবু) ভায় হামাগুড়ি॥	মন ভায় হামাগুড়ি॥

ইহার উত্তরে জয়মিত্রের কথাটা তোমাকে স্মরণ করিতে বলি—বড্ড মনের খেদে তিনি বলিয়াছিলেন—

জয়মিত্র অনেকেই—ধরাপড়্তে ধরা প'ড়েছি কেবল আমি অ্যাকা।

ত্রিভুবনে নাই এমন জন
হামাগুড়ি ভায় না-মা'র মন।
(তার সাক্ষী) দেশের লোকের ছবি তোলা—
জ্যোতি ভা'য়ের বিনোদ-দোলা॥
রাঁচি মাতা॥ (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া)।
কণ্ঠ অন্নপ্রাশন দিয়াছিলে যাকে,
সে যদি অন্নপ্রাশন খায়,—

এলেই বা হেথা পূজার ফাঁকে ;
টাকা শো দু' এক করিয়া ব্যয়।
দীনদ্বিজ ॥ হাসি হাসি কেউ বলিছে "বড়দা"।
ঠুকিছে বা কেউ পিয়ানো-পদ্মবা ॥
তুলিছে বা ছবি মাজিয়া গদ্দ',
দেখিতে পাবে না আর গো রাঁচি !
সাঁচা সোনা নাই—আলোক নাই
তুমি আর রাঁচি—সে নাই রাঁচি !
কুঁড়ে থেকে তাই নড়িতে ডরাই,
ছেড়েদে মা মোরে কাঁদিয়া বাঁচি ॥

অস্তি-নাস্তি

ওহে খেদ্র বজ্রধর, সমরেন্দ্র শূলী !
অবনীন্দ্র ! রাজদণ্ড, ওযে তব, তুলী !
ত্রিপথগা নির্ঝরিণী গন্তপন্থময়ী,
বাঁটি ল'য়ে তিন বীরে হও বিশ্বজয়ী ॥
চাহ যদি উপদেশ অমল-মধুর,
প্রবন্ধমালায় তাহা পা'বে ভরপুর ॥
মধুর বাণীমধু'র হও যদি তোমরা।
সুরভি কাব্যমালায় পাবে তাহা তোমরা ॥
নানাচিন্তা ঢেউ দেখি কেন গো পলাও
মণিমুক্তা পা'বে, যদি ভিতরে তলাও ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শাঁসালো গন্ত রসালো পদ্য
মোহিনীমোহনে ভেটিনু অদ্য ॥
হাতে পেয়ে তিন স্নেহ-মাখা পুঁথি,
দহনে, মোহন, দিও না আহুতি।
নানা চিন্তা ঢেউ দেখি কেন গো পলাও।
মণিমুক্তা পা'বে, যদি ভিতরে তলাও।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজপত্রে রসোপহার

অবুঝ পল্লীর সাক্ষী ॥

সবুজ পত্র রহেনা সবুজ,
ঘড়ি ঘড়ি বদলি রঙ,
এড়ায় দৃষ্টি দরশকের
বহুরূপীর করি ঢঙ।
কভু রাঙা কভু জরদা রঙা,
কভু হয় শুকিয়ে কাঠ,

সবুজ গাঁয়ের বিচারপতি ॥

পাতার দোষ না ধাতার দোষ!
ভব এ ভূতের নাট,
ভূ কাঁপে ক ফাঁপে,
ভেসে যায় দেশ
খ বর্ষে অমঙ্গল
উড়ায় অনিল, পুড়ায় অনল,
কেহ কারো কম নয়
সবুজ পত্র সুন্দর অতি
দেখিলে হয় তাপ নাশ
অতএব ওকে হইল দেওয়া
বেকসুর খালাস।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
জ্যেঠামহাশয়।

অসবুজ পাতার প্রতিবাদ

সবুজ পাতায় উড়ালে নিশান বাঙালীর ছেলে কেহ।
বাঙালী ইনি না, ইংলিশম্যান হয় মোর সন্দেহ॥
পত্র নামাই নিত্য সবুজ সোনার এ ভারতে।
ইংভূমে বসন্তে সবুজ বর্ষা-রঙা শরতে॥
দেশের আইন দশের মত,
শোনাই শোন তার হু চারি পৎ।

যে নহে রাঙা সে নহে আলতা,
যে নহে অম্ল সে নহে চালতা,
যে নহে জর্দ্দা সে নহে বোল্‌তা,
যে নহে তিক্ত সে নহে পল্‌তা,
যে নহে সবুজ সে নহে পাতা,
ভারতের এটা পুরান গাথা।
কভু হয় বটে লাল্‌চে সবুজ, জর্দ্দা কভু সবুজ।
কে বলে তারা অসবুজ—যে বলে সে অবুঝ।
কাককে যিনি কাল কাক, চুলকে সাদা চুল,
নিমকে বলেন তিতো নিম, নুনকে নোন্‌তা নুন।
পাতাকে বলেন সবুজপাতা চিনিকে মিষ্টি চিনি,
বিদুষী বিদ্যামাতার বরপুত্র গো তিনি॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিজেন্দ্রার আশীর্ব্বাদ

হয়ে ডানা-ভাঙা জটায়ু পক্ষী,
টুকরা টাক্‌রা যা পাই ভক্ষি,
মনকে থামাই করি জপ্‌ তপ্‌
অনিল আইলে করি গপ্‌ সপ্‌।
অনিল আমার ডান বাঁ হস্ত,
সব কাজে পটু সুহৃৎ মস্ত,
এক দোষ তাঁর তিনি কায়স্থ,
এই দোষে মাটি গুণ সমস্ত।
টনটোনে তাঁর বিষয়-বুদ্ধি,
কিন্তু হয়নি চিত্ত-শুদ্ধি।
গেছেন দিল্লি আসেন নাই
কবে আসবেন ভাবছি তাই।

বৌমা থাকেন কাছের গোড়ায়
যতনে তাঁহার পরাণ জুড়ায়
সুখের সুখিনী দুখের দুখিনী
এখন আমার, তিনি একাকিনী।
কোথা কি হচ্ছে ধরণী-মাঝে
এ্যাওুক মোরে শোনান সাঁঝে।
একদিনও তাঁর নাহি কামাই,
তাঁর মত মোর বন্ধু নাই।
এসেছেন রবি হয়েছে আলো
এখানে আসিয়া আছেন ভালো।
আছ কেমন লিখি আজ আমার,
হর গিরি সব মনের তার।
ত্রিজগতপিতা প্রথে তোমায়
রাখুন নিয়ত চরণ-ছায়ায়।
যদিন জটায় থাকবে জাহ্নবী,
আশী রাশি দিতে হবে না ক্ষান্ত।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
জ্যেঠামহাশয়।

ওঁ

বিবি মা!

ছেলে বুড়ো'র গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধ্‌বার বড় বিলম্ব নেই। আমি তাই তোমাকে বলি—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং ক'রে তুমি একটু তফাতে স'রে দাঁড়িয়ে Safe corner থেকে এই অদ্ভুত রণরঙ্গ দর্শন ক'রে হাস্‌তে যদি চাও হাসো কাঁদ্‌তে যদি চাও কাঁদো। আমার ইংরিজি বুক্‌নি গুলোর মধ্যে যদি কোনো প্রকার Spelling ভুল—বৈয়াকরনিক ভুল—শব্দের অবৈধ প্রয়োগ বা আর কোনোপ্রকার গলদ্ দেখ্‌তে পাও তবে তাহা শুধ্‌রিয়া লইও।

তোমার স্নেহের
জ্যেঠামহাশয়।

প্রথম বাবাজি Seems to congratulate himself on his being a great lover of Truth, এ বিষয়ে আমি তাঁর ভ্রাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কেননা আমি pride myself ("pride myself" may be আমার বন গেঁয়ে ইংরিজি for aught I know) on my being the Great রাজা philosopher of বন গাঁ।

প্রথম বাবাজি অকস্মাৎ আমার বন গাঁ আক্রমণ কর্ত্তে উদ্যত হওয়াতে আমি তাঁহাকে challenge কচ্ছি নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে। পাছে প্রবণ বাবাজি সম্পাদকীয় chair হালান্ দিয়ে গট্ হ'য়ে ব'সে আমার পত্রের উত্তর প্রদান করিতে condesend না করেন এই আশঙ্কায় আমি তোমার addressএ এই challenge খানি পাঠাচ্ছি।

Gauntlet thrown by Old Saturn to সেখনা বজ্রধারী young jupiter seated on his সম্পাদকীয় chrir of state.

If you are সত্যসত্যই a lover of truth then why call a spade a spad instead of calling a spade a spade ?

Conversely, why call a cat a cate instead of calling a cat a cat ? why call চ্যাপ্‌টা চ্যাপ্‌টা instead of calling চাপ্‌টা চ্যাপ্‌টা ? If you ভাজো ঝিঙে why not বলো' ঝিঙে ? Why ভাজো ঝিঙে বলো পটোল ? I can not allow these anomalous things to cross the threshold of my বন গাঁ।

তোমার স্নেহের
জ্যেঠামহাশয়।

ওঁ

শান্তি-নিকেতন

ভাই সতু,

অনেকদিন পর আবার মনের মধ্যেকার বালি-চাপা পড়া সরস্বতী নদী বালির বাঁধ ভেঙ্গে করিয়া উপ্‌চিয়া পড়িয়াছে! অতএব—কাঁদুনী গীতটা তোমার জ্যোতির, মেজোবৌএর, এবং BB'-মাতার কীরূপ লাগে লিখিয়া জানাইলে বড়ই প্রীতিলাভ করিব। এ কাঁদুনী গীতটা তোমাদের ছাড়া অপর কাহারো হস্তে সঁপিতে আমার মন সরে না, "কেন মন সরে না" যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে নীচে দেখ :—

ইতর দুঃখ শতানি মদৃচ্ছয়া বিতর, তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মালিখ, মালিখ, মালিখ।
লেখ—চতুরানন, অগনন, দুঃখ ঘোর।
লিখ না—অরসিকে রসভেট, কপালে মোর॥

তোমার শুভানুধ্যায়ী
বড়দাদা।

কাণপ্রভ চক্ষুর কাঁদুনী গীত

শরীর বয় না!
যাতনা সয় না!
কী বলিছে শোনো খাঁচার ময়না॥
সঘনে করিয়া মন্ নিশ্বাস ত্যাগ,
বলিছে "এ পাপ আঁখি মানিছে না বাগ॥"
নেপথ্যে— "কী ফল কাঁদুনী গীতে
দুঃখ দূর হবে গীতে॥"

জীতা রহো তুমি বাবা নেপথ্য !
তোমার কথাটা নহে অসত্য ॥
আচ্ছা— "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"—
বলে বাবা আত্মারাম এ গীত কেমন ?
নেপথ্যে— "করো না গো অত জাঁক !
ফাঁকা নাদ ডাক হাঁক !"
দেবতা— রাঙালে চোক, মুখে সরিবে না বাক্ !!!
তোমার এ কথা, ওলো নেপথ্য,
বিরেতা'র ক্ষয়—অতি সুদক্ষ
সেরা গীত কিন্তু গীতার !
গীতার সেতার বাজে মনোরম !
তিন তার—হুতান ভকতি করম ॥
সে তিন তারের সে জানে মরম ।
ধন্য তাহার মানব জনম ॥
গুরুপদে করি দণ্ডবৎ ।
গা-ই গুণ' তার একটি গৎ ॥
"উদ্ধরেদ্ আত্মনা আনং নাত্মানং অবসাদয়েৎ"
আত্মাদিয়া আত্মাকে উঠাবে উচা ডালে ।
ডুবিতে দিবেনা তা'রে বিষাদের গাঙ্গে ॥
নেপথ্যে—হাঁ ! এইবার বুঝেছ সার —।
কোনো ভয় নাই আর তোমার ॥
ও গীত মাত্র হইলে সিদ্ধ
নব যৌবন লভসে বৃদ্ধ ॥
ও সুধা পড়িলে রোগীর পেটে ।
দল বিল কোল নেবোর হেটে ॥
উপসংহার—
আমিতো ছাড়িনু কাঙ্ক্ষনী গীতে—
মোরে সে যে নাহি ছাড়ে—
পরাণ করিছে হু হু হু হু—
ভূত চেপেছে ঘাড়ে ॥
হায় !
বিষির্ বিপাকে মোর মাথা হ'ল হেট ।
ঘুচাইতে নারিনু লো আত্মাপের ভেট ॥
ঝম্বরে পুরিনু ধীরে ভগ্ন মনতরী ।
পঙ্খীরে পাঠাবে ভেট পত্র-খালা ভরি ॥

শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৯শ বর্ষ | ১৩৩২ | ফাল্গুন।

হিরণ্ময়ী দেবী

এ বৎসর যে কয়েকটি মানবলীলার অবসান হইয়াছে তাহার মধ্যে হিরণ্ময়ী দেবীর জীবন 'ভারতী'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ত্রিশাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি মাতৃদেবীর সাহায্যার্থ তাঁহার অন্তরালে থাকিয়া 'ভারতী'র সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। মৌলিক প্রবন্ধ তিনি লিখিতেন না, কিন্তু প্রয়োজনীয় সাময়িক তথ্যের ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলা পাঠকদের সহজগ্রাহ্য করা তাঁহার কাজ ছিল। পাস্তুরের ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা বাঙ্গলা পত্রে তিনিই প্রথমে করিয়াছিলেন। সাহিত্য-বিষয়ক অনুবাদ-মূলক নানা প্রবন্ধও তিনি সে সময় লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মৌলিক রচনা ছিল তাঁর স্বলিখিত সনেট। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে সরল মাধুর্য্য ছিল, যেমন কারো কারো গানের গলা মিষ্টি ও করুণ অথচ সে বড় গাইয়ে নয়—তাঁর কবিতা সেইরূপ ছিল।

কিছুকাল পরে ভগ্নস্বাস্থ্য জননীর স্কন্ধ হইতে 'ভারতী'র গুরুভার তুলিয়া লইয়া তিনি প্রকাশ্যে তার ভারবাহক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন। তখন ছোট ভগ্নীর নাম সংযুক্ত করিয়া ভারতীর সম্পাদন কার্য্য প্রকৃতপক্ষে তিনিই করিতে লাগিলেন। আজ যে 'ভারতী' পঞ্চাশ বৎসরে পদক্ষেপ করিতে চলিয়াছে এ আয়ুষ্মত্তার প্রধান সহায় হিরণ্ময়ী দেবী। সে সময় তিনি সুচারুরূপে ভারতী সম্পাদন না করিলে বাঙ্গলার সাহিত্যজগতে 'ভারতী'র নাম আজ পর্য্যন্ত প্রবাহিত থাকিত না। সে সময় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ একটি ভারতী-সেবক-মণ্ডলী তিনি নিজ অমায়িকতাগুণে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি 'ভারতী'র একান্ত ঘরের লোক ছিলেন বলিয়া যে এই ঘরই হিরণ্ময়ী দেবীকে আত্মসাৎ করিয়াছিল, বাহিরের মানবসমাজে তিনি তাঁহার প্রীতি ও কীর্তির চিহ্ন রাখিয়া যান নাই, তাহা নহে। ছেলেবেলা হইতেই জনসেবার আগ্রহ ও আয়োজন তাঁর ছিল। এ সব বিষয়ে দিদিই তাঁহার ছোটবোনের পথদর্শী ছিলেন। আমাদের কালিদাবাগান গৃহে পল্লীর গৃহস্থ মেয়েদের জন্য করিয়া তিনি একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। তিনি প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, আমি হইলাম তাঁর সহকারিণী। তখন তাঁহার বয়স পনেরো, আমার বয়স এগার। আমরা নিজেরা তখন দিনেরবেলা বেথুন স্কুলে পড়ি, সকালে সন্ধ্যায় বাড়ীতে গৃহশিক্ষক পণ্ডিত ওস্তাদ ও মেমের কাছে ইস্কুলের পড়া ছাড়া, সংস্কৃত, গান, সেতার ও পিয়ানো শিখি, আর ইস্কুল হইতে ফিরিয়াই অপরাহ্ণ সাড়ে চারটা হইতে সাড়ে ছটা পর্যন্ত দুইঘণ্টা রীতিমত ইস্কুল চালাই। বাঙ্গলা, ইংরাজী, অঙ্ক ও সেলাই এই চারিটি বিষয়ই শেখান হইত। প্রায় ষাট কুড়িক মেয়ে আসিত, কেহ কুমারী, কেহবা বালবিধবা। চাঁদনির সিঁড়ির উপর ধাপে ধাপে বসিত। জায়গাটি ছিল সহরের কোলাহল হইতে বহুদূরে। খিড়কি দুয়ার দিয়া পাড়ার বৌ-ঝিরা মল ঝুমঝুম করিয়া পুকুরে জল তুলিতে নিত্য আনাগোনা করিত। তাই বোধ হয় হিরণ্ময়ীর মনে তাদের জন্য করিয়া পড়ানর কল্পনা উদয় হয়। ঘোড়াসাঁকোর আত্মীয়দের প্রতিদিন সমাগম হইত। আমরা তাঁহাদের কারো কারো দ্বারা মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণ করাইতাম, প্রাইজ দেওয়ার সমারম্ভেরও ত্রুটী হয় নাই। দিদির বিবাহের পর আমি একলা কিছুকাল সে স্কুল চালাইয়াছিলাম। যখন আমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার সময় ঘনীভূত হইল তখন স্কুল বন্ধ করিতে হইল।

বিবাহের পর হিরণ্ময়ীর মাতৃপিতৃভক্তি ও পারিবারিক প্রীতি বিশেষভাবে প্রকট হইল। সকল বিষয়ে মায়ের সহকারিণী হইলেন। থিয়সফির তখন খুব প্রচার, আমাদের বাড়ীতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা বসিত। নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনা ও মাতৃদেবীর সহিত সখিত্ব স্থাপিত হইল। মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অল্কট সর্বদা যাতায়াত করিতেন, মহিলা-দের উপদেশ দিতেন। মাদাম ব্লাভাটস্কির দলত্যাগের পর থিয়সফির প্রতি শ্রদ্ধার বন্ধন আল্গা পড়িয়া গেল 'সখিসমিতি' নাম দিয়া মাতৃদেবী একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিলেন। থিয়সফিতে দীক্ষিত হওয়ার সূত্রে যাঁহাদের সহিত পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল তাঁহাদের লইয়াই ইহা প্রথম আরম্ভ হইল। নামকরণ রবীন্দ্রনাথ-কৃত। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিধবা ও কুমারী মেয়েদের বৃত্তি দিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠান, শিল্পমেলা মহিলাদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতির আয়োজনে সখিসমিতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী দেবী এ সব কার্যে মাতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

উপর্যুপরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগে হিরণ্ময়ীর সন্তানবাৎসল্য-বুভুক্ষিত হৃদয় সখিসমিতির আশ্রিত কোন কোন অনাথা বা দুরবস্থাপন্ন বালিকাদের নিজের কাছে রাখিয়া পালনের জন্য উন্মুখ হইল। বরাহনগরের-শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষে

তাঁহার পরিচয় হয়। তাহার পর মাতৃপ্রতিষ্ঠিত হিরণ্ময় সখিসমিতি সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় নাম ও আকারের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া উহা বর্ত্তমান বিধবাশিল্পাশ্রমে পর্য্যবসিত হইল। এই শিল্পাশ্রমের অনতিপূর্ব্বে তিনি অন্তঃপুর মহিলাদের শিক্ষার জন্ত একটি কলাভবন খুলিয়াছিলেন। মূল সখিসমিতি ও কলাভবনের সংমিশ্রণজাত এই বিধবাশিল্পাশ্রম, হিরণ্ময়ী দেবীর নিজস্ব কীর্ত্তি। এইটিকে খাড়া করিতে তিনি দেহপাত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই শিল্পাশ্রমটি তাঁর যে অত্যন্ত উত্তম, বিপুল অধ্যবসায় ও বুকভরা প্রীতি দিয়া গঠিত হইয়াছে তার পরিচয় এই আশ্রমের আরম্ভ হইতে যে-কোন নরনারী ইহার সংস্রবে আসিয়াছে সেই পাইয়াছে। এখন একটি কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমটি পরিচালিত হইতেছে—সুচারু দেবী। কমিটীর প্রেসিডেন্ট পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। ভাইস প্রেসিডেন্ট মৌরভঞ্জের মহারাণী সেক্রেটরী পদস্থা হিরণ্ময়ী দেবীর কন্যা। দেশমাতা ও নারীর মাতা এই দুয়ের মধ্যে হিরণ্ময়ীর হৃদয় বিভক্ত ছিল—দুয়েরই সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁর দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হইতেই আসিয়াছিল, মাতার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ত সখিসমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবাশ্রমের জন্ম। কার্য্যকরী শক্তিও ব্যবস্থাশক্তিতে তিনি বিশেষ সম্পন্না ছিলেন। ব্যবস্থাকালীন বাধা অতিক্রম করিতে তাঁহাকে অনেক সময় কঠোর হইতে হইয়াছে—তাহা কার্য্যকুশলতার অপরিহার্য্য অঙ্গ। ব্যবস্থাশক্তিগুণে এবং সঙ্গীতরসগ্রাহিতায় সঙ্গীত পারদর্শিনী না হইলেও অনেক সময় অন্যের অভাবে তিনি স্বয়ংই কোন সমিতির উৎসব উপলক্ষ্যে বা কংগ্রেসের জন্ত সংগীতমণ্ডলী গঠনে নেতৃত্ব করিয়াছেন।

হৃদয় রস তাঁহার ভিতর অপরিমিত মাত্রায় ছিল। মাতা পিতা, ভাই বোন, স্বামী পুত্র কন্যা আত্মীয় সুহৃদ বন্ধু বান্ধব সকলের প্রতি উদ্বেল সহৃদয়তায় সর্ব্বদা ভরপুর। তাঁর স্নেহশীল প্রকৃতি মুগ্ধ, আমরা বিচলিত হৃদয়ে তাঁর উদ্দেশে এই স্মৃতি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

জন্ম ও মৃত্যু

জন্ম ও মৃত্যুকে যিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন তিনি সত্যকে দেখতেই পান নি। সঙ্গীতে তালবিনা সুর ব্যর্থ আর সুরছাড়া তাল মিথ্যা। জন্মমৃত্যুও সুরতালের মত পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ করবে। এই পৃথিবী অনন্ত আকাশে জ্যোতির আনন্দে যে ঘুরে ঘুরে সূর্য্যের চারিদিকে নৃত্য করে চলেছে—দিন হোলো তার পা ফেলা আর রাত হোলো তার পা তোলা। এই দুইয়ে মিলে তবে নৃত্য সুসম্পূর্ণ। এই দ্বৈতাদ্বৈতের যুক্ত যুগলের এক

পক্ষকেই যাঁরা বিচ্ছিন্ন করে আঁকড়ে পড়ে থাকেন তাঁরা অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণতাকে পান নি। দিবস আমাদের চারিদিককে উজ্জ্বল করে সমস্ত আকাশের অসীমের জাজ্বল্যমান রূপটি ঢেকে রাখে আর রাত্রি আমার চারদিককে অন্ধকার করে অসীমেররূপকে উদ্ভাসিত করে। জীবনের মধ্যে তেমনি আমরা চতুর্দ্দিককে স্পষ্ট দেখি আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের কার্য্যে অনন্তের উপলব্ধি আসে। যিনি যোগী তিনি যোগদৃষ্টিতে এই উভয়কে যুক্ত করে অসীম স্থান-কালের সত্তারূপ ও তার নিত্যলীলা ও নৃত্যলীলা দেখেন।

এই যোগ যিনি অন্তরে উপলব্ধি করতে পারেন নি "মৃত্যোঃস মৃত্যুম আপ্নোতি' তিনি মৃত্যু হতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হতে হতে বলেন, তাঁর সদাই "মহতী বিনষ্টিঃ" তখন সদাই দৈন্য সদাই শঙ্কা সদাই মৃত্যু। এই যোগতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েই মহাপুরুষেরা অমৃতের অধিকার আমাদের কাছে অবারিত করে দিয়ে যান। তাই আর্ষ্কণ ঋষি মৃত্যুভীত মানবকে অভয় দিবে বলছেন—

মৃত্যুঃরীশে দ্বিপদাং মৃত্যুরীশে চতুষ্পদাম্।
তস্মাৎ ত্বাং মৃত্যোর্গোপতে কৃণ্বরামি স মা বিভেঃ॥ অথর্ব্ব ৮, ২, ২৩।

"যারা চতুষ্পদ তারা মৃত্যুর শাসন-শাসিত যারা দ্বিপদপশু তারা মৃত্যুভয়ে ভীত ও মৃত্যুর দ্বারা বিচলিত, সেইসব পশুরা মৃত্যুকেই তাদের নিয়ন্তা অধিপতি বলে জানে। ভয় নেই, সেই মৃত্যুর হাত হতে তোমাকে উদ্ধার কোরতো। তুমি মানুষ, অমৃতের অধিকারী, যে মৃত্যুর ভয়ে পশুরা কম্পমান সে তোমায় কি করতে পারে?

সোমুরিষ্টৈন মরিষ্যসি ন মরিষ্যসি মা বিভেঃ। অ, ৮, ২, ২৪।

হে সর্ব্বজয়ী, ক্ষতিমৃত্যুজয়ী অমৃত মানব! ভয় নেই, মৃত্যু তোমার জন্য নয়, মৃত্যু তোমার কোথাও নেই।

য ত্রেদং ব্রহ্ম ক্রিয়তে পরিধি জীবনায় কম্॥ অ, ৮, ২, ২৫।

যদি এই ব্রহ্মকে জীবনের পরিধি করে থাক, যদি ব্রহ্মের দ্বারা জীবনকে বেষ্টিত করে থাক তবে তোমার কাছে জীবনের আর কোনো অভাব, কোনো টানাটানি কোনো অবসান নেই। তবে জীবনের দৈন্য কোথায়?

মহাত্মা কবীর বলেছেন,—

জনম মরণ তাঁহা পড়ী পড়ত হৈ, হোত আনন্দ তহঁ গগন গাজৈ
উঠত সেনকারে তহঁ নাদ অনহদ ঘুরৈ ত্রিলোক মহলকে প্রেম বাজি॥ ১১,৬৩

জন্মমৃত্যুর সুর ও তাল যেখানে চলেছে যেখানে আনন্দের মহোৎসব, অসীম গগন সেখানে সঙ্গীতে ভরপুর হয়ে উঠেছে সেখানে অসীমের ঝঙ্কার চলেছে সেই ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে অসীমের পূর্ণ সঙ্গীত বাজচে, ত্রিলোকধামের প্রেম সেখানে বাজচে।

জনম মরন বীচ দেখ অন্তর নহীঁ জহঁ ঔর ন্যারী এক আহী।
কহৈঁ কবীর যা সৈন গুংগা উঁদ যেহ কাযকী গমনাহী।

চেয়ে দেখ জীবন ও মরণের মাঝে কোনো প্রভেদই নেই, দক্ষিণ ও বাম সে তো একই কথা। মায়ের এ কোল আর ও কোল। কবীর বলেন, এ সন্ধান যিনি পেয়েছেন তিনি সে কথা প্রকাশ করে বলবার ভাষা পান :নি, বেদ কোরাণের অতীত এ সব গভীর তত্ত্ব।

সাঁচহী কহত ঔর সাঁচহী গহত হৈ বাঁচকুঁ ত্যাগ কর সাঁচ লাগা।
কহৈ কবীর যুঁ ভক্ত নির্ভয় হুআ জব ঔর মরণকা ভর্ম ভাগা।

সত্যকেই আমি বলছি আর সত্যকেই গ্রহণ করেছি, মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যের সঙ্গেই যোগে যুক্ত হয়েছে, কবীর বলেন, এমন করেই ভক্ত ভয়ের অতীত হন এমন করেই জীবন-মৃত্যুর ভেদ বুদ্ধি দূরে পালায়।

মহাত্মা দাদু বলেছেন,—

মরণ তেঁ তুঁ না ডরই মরনা অংত নিদান
রে মন মরণা সিরজা কহিলে কেবল প্রাণ॥ মুরারে ৩৪, ৪৭

মরণকে কিসের ভয়? মরণই তো জীবনের যথার্থ পরিণতি, পূর্ণতা। মৃত্যুর সৃষ্টি হয়েছে কেবল এই কথাটি প্রকাশ করবার জন্য যে "হে প্রাণ তুমিই সত্য।"

জন্মমৃত্যুর এই যোগের কথা মহাপুরুষেরা কেবল মুখেই প্রকাশ করে যাননি, জীবন দিয়ে এই যোগটি তাঁরা আরও ভালকরে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। মৃত্যু যে জীবনকে নষ্ট না না করে পরিপূর্ণই করে দেয় এই সত্যটি তাঁরা জীবন দিয়ে প্রকাশ করে যান। এই মহা সত্যে উদ্বোধনই যথার্থ উদ্বোধন। এই তত্ত্বে দীক্ষা যিনি পেয়েছেন তিনি পরিপূর্ণ জীবন নূতন জীবন পেয়েছেন তিনিই দ্বিজ। এই দীক্ষা যে জীবন থাকতে পেলো না, তার জীবন ব্যর্থ। জীবনের উৎসব সে সম্ভোগ করতে পারলো না, জীবন তার পক্ষে নিত্য দৈন্য, নিত্য লজ্জা, নিত্য ভয়ের ক্ষেত্র।

২১ বৎসর আগে মাঘমাসের এই উৎসবেরই মুখে যোগযুক্ত জীবনটীকে উৎসর্গ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি নিত্যকালের উদ্বোধন সাধনার্থীদের জন্যে রেখে গেছেন। অভ্যাসের জড়তায় চেতনার অভাবে সে মহাউদ্বোধনও ভুলে গিয়াছিলেন, তাই ২১ বছর পরে ঠিক তেমনি দিনে এই ব্রহ্মোৎসবের মুখে মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র আজীবন ব্রহ্মসমাহিত ধ্যানযোগী দ্বিজেন্দ্রনাথ গত শ্রীপঞ্চমীদিনের অবসান ব্রাহ্মমুহূর্তে শিরবসান ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন হয়ে আমাদের চিত্তকে আবার একটি মহা উদ্বোধনে উদ্বোধিত করে গেছেন। পরম শান্তিতে জীবনটিকে উৎসর্গ করে তিনি বলে গেলেন মৃত্যুতেই জীবনের পরিপূর্ণতা, দেহের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় যে জীবন, সে দীন জীবন—বৃক্ষলতা পশুপক্ষীর। মানুষের অধিকার অনেক গভীর, তার "বিরাট মৃত্যুও" তার মৃত্যু বিরাট। সে অমৃতের অধিকারী। জীবনে সে দেহ নিয়েই ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত। মৃত্যুতে সে দেহের ব্যবধানটুকুও ঘুচিয়ে ফেলে প্রবেশ করবে সেই পরব্রহ্ম-সাগরে, এই হোল জীবনযোগ। জীবনের প্রতিবিন্দু উৎসর্গ করে নিত্য

দীপটি জালিয়ে তুলতে হবে। অনাগতের যোগীন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাদের কাছে এমনই একটি মহা উদ্বোধন রেখে গেলেন। এবারকার উৎসবে তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করে সকলকে বঞ্চিত করে সরে যাননি, এবার তিনি উৎসবের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছেন। এবার আর আমাদের কোনো উদ্বোধনের প্রয়োজন নেই আমাদের হৃদয় মন আপনাকে অন্তকূল করে সেই সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষির উদ্বোধন বাণী শুনতে হবে।

তাঁর উদ্বোধনবাণী আজ এই উৎসব আকাশকে পূর্ণ করে ধ্বনিত হচ্ছে "এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে বদ্ধ হয়ে আপনাকে ব্যর্থ কোরোনা। হে মানব, অসীম তোমার অধিকার, মৃত্যুর সাধ্য কি তোমাকে শেষ করে দেয়? মৃত্যুর আবরণ শরীরে দিয়ে অমৃতের মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করতে হবে। এমন উদ্বোধনই তোমার উপযুক্ত উদ্বোধন। এমন দীক্ষাই তোমার যোগ্য দীক্ষা। নব জীবন লাভ কর, দ্বিজ হও, সম্পূর্ণ হও, জীবনকে উৎসব করে তোল।

অন্তরাত্মার মধ্যে যদি এই বাণী শুনতে পাই তবে কি আজ আর কোনো উদ্বোধন-বাণীর প্রয়োজন আছে? মহর্ষির সাধনার সিদ্ধপীঠ শান্তিনিকেতনে যিনি ৩০ বৎসর অটল যোগাসনে আসীন ছিলেন যাঁর প্রাণময়ী বাণী স্থান ও কালের সব বাধাকে অতিক্রম করতে সমর্থ। তাঁর বাণী কি আমাদের অভ্যাসের জড়তা ও অচেতনতার কাছে পরাজিত হবে? আজ তাঁর অশরীরী যোগসিদ্ধ মহাবাণীর কাছে আমাদের চিত্তের সব দৈন্য দারিদ্র্য অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস দূর হয়ে যাক্, কপটতা স্বার্থ বুদ্ধি নীচ অভিমান বন্ধ হয়ে যাক্।

আজ এই আকাশে কেবল যে দ্বিজেন্দ্রনাথের উদ্বোধন বাণী ভাসছে তা নয়, যদি স্থির হয়ে তবে শুনতে পাব তাঁর বাণীর পশ্চাতে কত কত সাধকের মহাবাণী ধ্বনিত হচ্ছে। অনাগত দীক্ষার মহা উদ্বোধনে কেবল তাঁর মন্ত্রই আজ ধ্বনিত হচ্ছে তা নয়। ভিতরে বাহিরে সমস্ত কোলাহলকে শান্ত করে ধ্যানস্থ হলে শুনতে পাব অগ্নিময়ী বাণী আসছে—

তু চৈতন্য স্বরূপ হৈ জড় বন্ধন ভ্রমরূপ।
সো তেরো অভ্যাস হৈ সাধি হো মনভূপ॥
মরণ মায়া হৈ মৃষা তমরূপী ভ্রমরূপ।
তু অনন্ত স্বরূপ হৈ অনহদ আনন্দ রূপ॥

তুমি চৈতন্যস্বরূপ, যেসব বন্ধন তোমাকে বাঁধিতেছে সে সবই জড়বন্ধন ও ভ্রমরূপ। শুধু অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ সেইসব বন্ধনকে অতিক্রম কত্তে পাচ্চোনা, সাধনার বলে বন্ধন অতিক্রম করে মনের অধিপতি হও। মরণ তো মায়া মিথ্যা, মরণ তমোরূপী ভ্রমরূপ। তুমি অনন্তস্বরূপ, অসীম তোমার আনন্দরূপ।

ভিতর বাহিরের সব কোলাহল দূর না হলে এই সব মহাবাণী প্রকৃতভাবে শুনতে পাবেনা। দিবসের পরিমিত অতি আলোতে আমরা আমাদের নিকটকেই অতি উজ্জ্বল করে দেখি, কিন্তু তাতে গ্রহ চন্দ্র তারাময় অসীমের অনন্তরূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। রাত্রির মত স্তব্ধ মৌনী ও গভীর হলে দেখতে পাবে অনন্ত আকাশ ভরে কতকত জীবন্ত সত্য জ্বল জ্বল করে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে।

নিরখত পরখত রহহু বহুত নহিঁ বোলহুরে
রজনী কিবা হীরহু শাস্তি কুপঞ্জীতেঁ খোল হুরে।
চমকত নির্মল রূপ ঝলকত জন্ম হীরা রে।
জগজীবন বহু মগন ভৈহিঁ তীরা রে॥

বেশী বাচালতা গোলমাল কোরো না, শুধু স্তব্ধ হয়ে চেয়ে দেখ। রাত্রির রুদ্ধ কপাটখানি শান্তির চাবী দিয়ে খুলে ফেল, তখন দেখতে পাবে কি নির্মলরূপ চমকাচ্ছে! অগণিত গ্রহ নক্ষত্র-তারায় বিশ্বজীবন হীরার মত ঝলমল করছে। জগজীবন বল্‌চেন গভীর যোগমগ্ন হয়ে প্রেমমাহুষে সেই অনন্ত জীবন-সমুদ্রের তীরে স্থির হয়ে বোসো।

বিধাতার সঙ্গে গভীর যোগে যুক্ত হতে হবে, তাঁর রসের রসিক হতে হবে, তাঁর হৃদয়ের দরদী হতে হবে, তবে এই বিশ্বের জীবন্তলীলা ও মহোৎসব আমাদের কাছে ধরা দেবে। যে তুলিতে বিধাতা এই বিশ্বছাব আঁকচেন তা প্রেমের জীবন্ত তুলি। অনন্ত শক্তি তাঁর আছে বটে, কিন্তু আমার প্রতি যে তাঁর প্রেম। সেই প্রেমের রস না পেলে, তাঁর সর্বশক্তিমত্তার শুকনো রংগুলি তিনি গুলবেন কিসে? শক্তি যদি রসে না গলে তবে সৃষ্টি হয় কেমন করে?

সুরকে কাগজ পর, মাণিক কলম লিয়ে,
অরূপ সেতী রূপ সারো ছারো নিকসি আয়ো হৈ।
যারী সো আদি ওঁকার, জাসো রহ সবো সংসার,
হৌ রস বর্ণক বীচ বিনা চিত্রন পায়ো হৈ॥

শূন্যের পটের উপর তিনি প্রেমমাণিকের তুলি নিলেন, আর অমনি অরূপের ভেতর থেকে কতশত বিচিত্র রঙের পর রূপ বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো! আদিতে সেই ওঁকার, যা হতে হলো এই সংসার, যারী বল্‌চেন তাঁর শুকনো বর্ণকের মধ্যে আমিই মিলিয়েছি রস। আমি ছাড়া এই বিশ্বচিত্রের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এই সৃষ্টিতে যদি আমার কোনো অধিকার না থাক্‌তো তবে এই বিশ্বের উৎসবে আমার কিসের আনন্দ?

এই উদ্বোধন যদি জীবনে সত্য হয় যদি অন্তরের দৃষ্টি সত্যি খুলে যায় তবে দেখবো এই বিশ্বজগৎ প্রেমের যোগে চলে চলেই একটি প্রেমের সমাজ সৃষ্টি করেচে। অণু-পরমাণুর নৃত্য থেকে সূর্যের পরে মহাসূর্যের প্রচণ্ড প্রচণ্ড গতি এক কেন্দ্রস্থ প্রেমযোগের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সবাই আপন আপন প্রেমের দীপটি জেলে প্রেমেরই পথে পরম পুরুষ জীবনস্বামী পরব্রহ্মকে জীবন-প্রদীপ দিয়ে বরণ করে নিতে যাত্রা করেচে। আমাকেও তারা নিরন্তর ডাকচে, যদি যোগযুক্ত হয়ে সে ডাক শুনতে পেতাম তবে সব চঞ্চলতা স্বার্থবুদ্ধি নীচতা কপটতা অভিমান দূর করে নিজের অন্তরকে ডেকে বলতাম—

মন তুম প্রেম পংথ চলন সমাজী।
অবিগতি গতি রহন বিরাজী॥

অচরজ দিয় না বরো মন্দির যে।
প্রেম জ্যোতি ছবি ছাজী॥
ধরণী আকাশ উঁহা নহি দীখত
সুন্দর পুরুষ ইক সাজী॥

হে মন, তুমি প্রেম পথে চলন-সমাজী। অভক্তির গতি ব্রহ্ম সেই প্রেম সমাজে বিরাজিত। এই বিশ্ব মন্দিরে প্রত্যেকের হাতে এক একটি আশ্চর্য্য প্রদীপ কি প্রেমজ্যোতির শোভাই উদ্ভাসিত হয়েছে! ধরণী আকাশ কিছুই সেখানে দেখা যাচ্চে না কেবল সুন্দর রূপম পুরুষ জীবনের স্বামী সেই প্রেম সমাজে আপনার শোভায় আপনি দীপ্যমান।

তখন আমিও সেই জীবনস্বামীকে বলি—"হে প্রিয়তম, আমার এই জীবনদীপখানি যদি না জ্বলে তবে তো এই মানব জীবনই ব্যর্থ, তা তার মত জ্ঞান যত ঐশ্বর্য্য যত শক্তিই থাক্ না। কবে আমি সার্থক—হয়ে বলতে পারবো যে—"তিনি তাঁর প্রেম পরশমনির আগুন দিয়ে আমার প্রাণকে প্রদীপ্ত করেছেন আমার উদ্বোধন হয়েছে আমি বিশ্বজগতের ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিতে পেরেছি?"

মহিতন কৈ জগদীপ কিয়োপ্রীতম বতিয়াপ গায়।
পাচতত্ত্ব কৈ তেল চুয়ায়ে ব্রহ্ম অগিন জগায়॥
প্রেম পিয়ালা পিয়ইকে হো পিয়া দিয়ো বৌরায়॥

প্রেমের শিখা লাগিয়ে এই তন্তুটিকেই বিশ্বদীপ করে তুলেছি। "ক্ষিতি অপ্, তেজ মরুদ্ ব্যোম" বিশ্বের এই পঞ্চভূতকে ভৌতিক বলে ঘৃণা তো করি নি। তা দেয়ই অন্তরের রসটুকু তেলের মত টেনে বের করে তাই দিয়েই এই জীবনে ব্রহ্মশিক্ষা টুকু জালিয়ে তুলেছি। এই শিখাটুকু জাল্‌তেই দেখি প্রিয়তম সামনে বসে আছেন। তিনি তখন প্রেমের পিয়ালা পান করিয়ে আমাকে মত্ত করে দিলেন।

জীবনের এই ব্রহ্মশিক্ষাটুকু জ্বলিয়ে তোলাই হোলো আসল উদ্বোধন, প্রেমের ব্যথা ছাড়া এই শিখা জ্বলে না। আঘাত ছাড়া যেমন আগুন জ্বলে না তেমনি দরদ ছাড়াও প্রেমের শিখা জ্বলে না।

আগুন জ্বালতে হলে তার উজ্জ্বল জ্বালার মূল্য দেওয়া চাই। দগ্ধ হ'তে স্বীকার না করলে দীপ তার উজ্জ্বল শিখাটি পেতো কোথায়? তা হলে তাকে জীবনের ব্যর্থ উপকরণের ভার বহন বারে বারে অনন্তকালে অন্ধকারেই কাটাতে হোতো। প্রিয়তমের মুখ যদি দেখ্‌তে চাই, তবে জীবনের প্রেমেরদীপ জ্বলতে হবে, দগ্ধ হতে হবে, জ্বলে মরতে হবে। জীবনের এই শিখাটি ধরিয়ে নেওয়ার নামই তোলো উদ্বোধন।

বিরহিণী, মন্দির দিয় না বার।
বিন বাতি বিন তেল দরদ সোঁ প্রেমদীপ উজিয়ার।
প্রাণপিয়া মেরে ঘর আয়ো, দ্বারী অপন কোবার॥

ওগো বিরহিণী, জীবন-মন্দিরের দীপটি আলোয় তোল। তেল ও সল্‌তে যদি না থাকে তবে নাই থাকুক, শুধু দরদে ব্যথাতেই প্রেমের দীপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠবে! আজ তো জ্বলে উঠতেই হবে, ভয় পেলে তো চল্‌বে না, প্রাণের প্রিয়তম আজ যে উৎসব করতে আমার মন্দিরে এসেছেন, হে নারী, আজ নিজেকে জ্বালিয়ে প্রদীপ করে তাঁর সম্মুখে ধর।

আজ এই পুণ্যতিথিতে যাঁরা এই উৎসবক্ষেত্রে একত্র হয়েছেন, তাঁরা কোনো বিশেষ সংকীর্ণ দলের লোক নন। নানাঘর নানামন্দির থেকে, আজ—এখানে যাঁরা একত্র হয়েছেন তাঁরা সব "প্রেমপংথ চলন সমাজী" সবাই মিলেছেন প্রিয়তমের ডাকে, তাঁরই উৎসবে।

রাত্রির কপাট খুলে গেছে "চমকত নির্মলরূপ ঝলকত অমুহীরা" "অযুত তারকা চমকে কাঞ্চন হার কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার"। আজ বসুন্ধরার কি শোভা! ধন্য মহেশ্বরের অপরূপ রচনা! "শুভ্রকে কালপর মানিক কলম নিয়ে" কি বিচিত্র রূপ বেরিয়ে এলো! কি উৎসবই তিনি আজ রচনা করেন। এযে তাঁর নিজের উৎসব! তাঁর প্রিয়দেরই তিনি আপন উৎসবে ডেকেছেন।

এই মন্দিরে প্রিয়তম আজ উৎসব করতে এসেছেন আজ যদি দগ্ধ হবার ভয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখি তবে এই অকৃতার্থতার আর প্রায়শ্চিত্ত কৈ? অতএব আজ আর ভয় করবার উপায় নেই আজ যদি নিজে না পারি তবে তাঁকেই বলবো তুমি আমাকে দেবালয়ের দীপ করে ধন্য কর, আমাকে তুমি সত্য উদ্বোধন দাও, এমন অমূল্য উৎসব ব্যর্থ হতে দিয়ো না।

হে স্বামী তোমাকে যদি না পাই তবে বিশ্বের কোনো ঐশ্বর্য্য কোনো সম্পদই আমাকে চরিতার্থ করতে পারবে না। এমন মানব জন্মের সার যে তোমার মিলন-মহোৎসব তা ব্যর্থ হতে দিয়ো না। এতে যদি দগ্ধ হতে হয় তবু ভাল, তবু তুমি স্বয়ং আমাকে তোমার ব্রহ্মশিখা দিয়ে উদ্বোধিত কর, প্রদীপ্ত কর, সার্থক কর। উৎসব সত্য হোক।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

---

* আদি সমাজে, ১১ই মাঘ, ১৩৩২ সাল, রাত্রির উৎসবের উদ্বোধন।

জীবন ও যন্ত্র

পশ্চিমের যে ক্ষুধিত আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রাচ্য জগতকে লুণ্ঠন ও অপমান করিয়াছে তাহা যে প্রমত্ত ক্ষমতার ভিতর অনন্ত জীবনের রহস্যকে আয়ত্ত করিয়াছে আমরা তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? প্রাজ্ঞদের সেই উপদেশে কি আর আমাদের শ্রদ্ধা নাই—যে, যে বাসনা অনন্তকে বিদ্রূপ করে এবং যাহা পারিপার্শ্বিকের সহিত অসমঞ্জস ভাবে অসংযত বৃহদায়তনে নিজেকে বৃদ্ধি করিয়া চলে তাহা কখন চিরন্তন হইতে পারে না।

সে যাইহোক এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, এই যুগের বিশেষত্ব হইতেছে সমস্ত জগতের উপর পশ্চিমের ভৌতিক আধিপত্য বিস্তারের এবং তার মনকেও জোর করিয়া অন্যান্য মহাদেশের দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করানর চেষ্টা। ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রাচ্য জগতের প্রায় সমস্ত দেশই কখনও না কখন কোনও বিদেশী আততায়ীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু সেইসব স্থলে বিজাতীয় অভিভবের বেগটা অপেক্ষাকৃত মোলায়েম ছিল কিম্বা তাহার অধিকৃত দেশের প্রথা ও সভ্যতার সহিত একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিয়াছিল বলিয়া যে সকল ঐক্যসূত্রে জাতির ব্যক্তিত্ব গাঁথা ছিল তাহা ছিন্ন হয় নাই।

আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে জগতের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আজ আর কোন একটি লোক -- বৃহৎ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ধূমকেতুর মত সহসা অন্য আর এক জাতির উপর তাহার সমস্ত বেতন-ভোগী সৈন্যের দল লইয়া আসিয়া পড়িয়া অবশেষে তাহাদেরই মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারে না; তাহার পরিবর্ত্তে আজ আসে একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি,—লুণ্ঠনে সিদ্ধহস্ত, অন্য জাতির সে অনাত্মীয় ভাই তার বিরাট কবলে সে সেইসব জাতির প্রাণের উৎস-ধারাকে চাপা দিতে কোনই দ্বিধা বোধ করে না।

যে ব্যক্তি কোনও সঙ্ঘের বা দলের প্রতিনিধি হইয়া আসে না, সে দল রাজনৈতিক কি ব্যবসা-সংক্রান্ত অথবা ধর্ম্মসংক্রান্তই হউক, তাহার মধ্যে অন্য লোক মানুষের সমান বৃত্তির ও অন্তরের স্পর্শ পায়।

তাহারা ভূতের মত মানুষের লোকালয়ে মানুষের পিছু পিছু ঘোরে অথচ মানুষের জগতের অধিবাসী নয়—তাহা নয়; কিংবা ভূতের মত শুধু তাহারা মানুষের জীবনকে মাঝে মাঝে ব্যাহত করে অথচ মানুষের জীবন যাপন করে না—তাহাও নয়। এই সমস্ত আসল মানুষই প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটা নিকট-আত্মীয়তার ব্যক্তিগতভাবে মিশিতে পারে—এবং ক্রমশঃ ইহাদেরই মধ্যে দিয়া মিলনের যোগসূত্রের জন্ম হয়। কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার সঙ্গে যে সম্বন্ধ

তাহাতে এই ব্যক্তিগত আত্মীয়তার সংস্পর্শ নাই। য়ুরোপের অবধা বর্দ্ধিত কলেবরের ভার চায় অন্য জাতির উপর ভর করিতে। সে বুদ্ধি ও শক্তির মধ্যে জীবনের সৃজনী শক্তির সংস্পর্শ নাই আছে একটা নিপুণ কলকব্জার কৌশল মাত্র।

পশ্চিম যে মূর্ত্তিতে আমাদের মধ্যে আসিয়াছে সে একজন পাকা এঞ্জিনিয়ারের মূর্ত্তি। সে তাহার যন্ত্র ও কলকব্জার সাহায্যে আমাদের সবুজ মাঠের আর বাগানের মাঝ দিয়া তাহার লুণ্ঠনের সুবিধার জন্য পাথর দিয়া পথ বাঁধাইয়া চলিয়াছে। যতই আশ্চর্য্য আর সুবিধাজনক এইসব পথ লাগুক্ না কেন এই সমস্ত কলকব্জার একান্ত নিয়ম আর নিপুণতার বাড়াবাড়ি জীবনের চারিদিকে এক বীভৎসতার সৃষ্টি করিতেছে। প্রায়ই এই সব জিনিষ আমাদের ভুলাইয়া দেয় যে জীবনের তুলনায় এইসব কল-কব্জা নিতান্ত সাধারণ ও সরল ব্যাপার, তাহার দৌড় আমাদের অতি প্রত্যক্ষ, তাহার ফলাফল অতি নির্দ্দিষ্টভাবে পরিমেয়, তাহার কেন্দ্রীভূত শক্তি আমাদের উপর উপর ভাগে স্পর্শ করে মাত্র গভীর অন্তস্থলে নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাগৃহি

সাগর বেলায় দাঁড়িয়েছিলাম আঁধার রাতে,
তারার মালা খেলছে যেথায় ঢেউয়ের সাথে।
নাই কি কোনও গোপন কথা তাদের বুকেতে
অতীতরাশি উদ্ধার করে বলবে দুখেতে,
সঞ্চিত যে গরীমাভরা ভারত-কাহিনী,
প্রাচীর-রাণী স্বাধীনতার মুকুট-রাহিনী!
উর্দ্ধে নীচে চাইনু আমি আকুল আবেশে,
চোখভরে যে অশ্রুএল হায়রে হুতাশে।
আর্ত্তরবে কইনু আমি গভীর গহনে,
তারার সাথে সিন্ধু যবে বিরাজে বিহনে ;—
"ওগো প্রভু। এ কি দেখি ক্রীতদাসীর বেশে,
তব প্রাচীন ভারত আজি শিকল-পরা শেষে!।"
শুনিবে কিগো, ওগো নবীন, ওগো তরুণদল,
দেশের ওগো বুকের মালিক আশার পরিমল
অতল গভীর বুক হতে যে আসছেরানী ভেসে,
সেই বাণী যে কণ্ঠে আমার বাজছে করুণ রেশে—
"জেগে উঠ। কতকাল ঘুমিয়ে রবে আর,
আরাম এবং খ্যাতির স্বপনে দেখবে কত ছার?
তাকিয়ে দেখ ত্যাগের ঠাকুর এগিয়ে শুধু চলে,
এখন শুধু কাজের পূজা তাহার চরণতলে।
উঠ, উঠ, জেগে উঠ, ঋষির দুলালগণ,
স্বাধীনতার দেউল ধীরে গাঁথ্‌রে অনুক্ষণ,
তৈরী কর এমনি করে অতীত-আত্ম-জ্ঞানে,
প্রতি পাষাণ মাতে যেন ত্যাগের-নব-গানে।।" (১)

শ্রীমতী নীহারিকা ঘোষ।

---

(১) সাধু, টি, এল, ভাসওয়ানির 'Awake' কবিতার অনুসরণে।

বিদ্যোত্তমা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্প-বিভূষিত বাসরশয্যায় বরকন্যা সুখাসীন, সুরুপট্ট মহাদেবী পুরবাসিনীগণ ও সখীগণ।

সুরুপট্ট মহাদেবী। আশীর্ব্বাদ করি উভয়ে চিরজীবী ও চিরজীবিনী হ'য়ে মনের সুখে কাল যাপন কর, (ধান্য দূর্ব্ব, মস্তকে প্রদান)

বিদ্যোত্তমা। প্রণাম পিতঃ! প্রণমি জননি! (প্রণত) কালিদাস। (স্বগতঃ) ওরা বলে দেছে বউ যাকে যাকে পেরণাম করে আমাকেও তাই করতে হ'বে। করি (প্রণাম) মন্দ হলোনা কিন্তু! এরা নিশ্চয় রাজা! এই মহিষীটা নিছক রাণী না হ'য়ে যায় না! আর আমার যে বউ হলো? ও-ও কোন্ দেশের না কোন্ দেশের রাজ্ঞী কি রাণী-টানি হবে! ওঃ ওরদিকে চাইলে কিন্তু আমার ভয় করে, আচ্ছা, ওরকম রাজারাণী বউ নিয়ে আমি রাখবো কোথা? সেই বামুনদের বাড়ীতে? হাঁ, তাহলে বামনী মাগী আমায় ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে না! তাহলে ওকে কোথায় থাকতে দোব? ওকি খাবে? সেই পণ্ডিতগুলোকে তো এই কথাটা জিজ্ঞেস করে নেওয়া হয়নি, ঘাঃ বড্ডতো ভুল হয়ে গেছে! কি হবে?

মহাদেবী। আসুন মহারাজ! আমরা এখন বিদায় লই, জামাতাকে বড়ই পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। (পৌরনারীদিগের প্রতি) তোমরাও বেশী বিলম্ব করো না। (উভয়ের প্রস্থান)

পুরনারী। (সখীগণের প্রতি তোরা একটা গান গেয়েনিয়ে চল সবাই যাই।

সখীগণের গীত।

বিদ্যোত্তমা। (স্বগতঃ) মূর্ত্তিটি বড় সুন্দর! সাধ হয় নির্নিমেষে চেয়ে থাকি, পুরুষমূর্ত্তি যে আবার এমন মনোগ্রাহী হয় তা ধারণা ছিলনা! আঃ একেই কি প্রেম বলে? এরই মধ্যে যেন মনে হচ্ছে ওই মুখ আমার শতজনমের চিরপরিচিত! যেন জন্মজন্মান্তর ধরে একেই প্রতীক্ষা করছিলেম, কিন্তু, একটা বিষয়ে বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে! ওই বিশাল পদ্মপলাশ নেত্র অমন নিষ্প্রভ কেন? আর ওই সরক্ত অধর ওষ্ঠ মৌন থাকলেও চোখের মধ্যে যে সকল ভাষা ভেসে উঠ্‌ছে, তাই বা কই? সুন্দর বটে, মোহন বটে, কিন্তু দীপ্তি কই? সূর্য্যালোককে তো কখনই কেহ রুদ্ধ রাখতে সমর্থ হয়না? কই আমার সঙ্গে তো কোন সম্ভাষণই করচেন না? এই বা কিরূপ ভদ্রতা? আচ্ছা আমিই করে দেখি—(প্রকাশ্যে) আপনার সুললিত

কবিতাবলী শ্রবণ মানসে আমার মানস-চকোর একান্ত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে রয়েছে, অনুগ্রহ করে একটি শোনাবেন কি ?

কালিদাস (চক্ষে হস্ত দিয়া নিদ্রার সঙ্কেত)

বিদ্যোত্তমা। তবে তাই হোক, পথশ্রমে, বিবাহশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছেন, এক্ষণে বিশ্রাম করুন, প্রাতে উঠে আপনার মুখেই এই নবজীবন প্রভাতে প্রভাতী শোনা যাবে। (সানুরাগ নেত্রে চাহিল এবং বিমূঢ় কালিদাসের হাত ধরিয়া শয়ন-পর্য্যঙ্কের নিকট লইয়া আসিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শয়নগৃহ। কাল উষা, কালিদাস ও বিদ্যোত্তমা শায়িত।

বিদ্যোত্তমা। (নিদ্রাভঙ্গে) এইবার নবজীবনের সুপ্রভাত! তরুণ তপন, এই নবীন দিনের শুভসূচনা তোমাকেই সর্ব্বপ্রথম প্রণাম করি!

প্রণমামি উষাদেবি! এইবার ওই মুদিত কমল কোরকতুল্য অধরোষ্ঠ বিমুক্ত পিযূষধারা পানে হৃদয় প্রবল পরিতৃপ্ত করে চিরজনমের সকল সাধনার সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারো! নাইবা হতে পারলেম কবি? কবি-প্রিয়া এই কি সামান্য সম্মানের আসন আমার! মাতালি প্রিয়তম আমাকেই কতছন্দে গানে গঠিত করে তুলে বিশ্বের কারা জগতে অমর করে রেখে যাবেন! সেটাতো আর আমার নিজের দ্বারায় ঘটতো না! কি মান কি গৌরব বল দেখি? কাকেই বা জানাই এ'কি সুখ! ভাগ্যে ওই রকম পণ করেছিলুম, নাহলেতো কোন কালে রাজা সম্রাট-দের পাল্লায় পড়ে রাণী মহারাণী হ'য়ে এই অমরত্ব লাভথেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে হতো, উঃ ভগবানের কি অসীম দয়া! কই এখনও কি ঘুম ভাঙেনি? ডাকবো না কি? আমার যেন আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না।

(নেপথ্যে উষ্ট্ররব)

কালিদাস (অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায়) উষ্ট ডাকচে তোর হ'ল নাকি, এখুনি কাট্ কাট্‌তে যেতে হ'বে যে।

বিদ্যোত্তমা (চমকিয়া) একি! এ'কার মুখে কোন্ ভাষা শুনলেম একি সত্য না স্বপ্ন! এ'কি হতে পারে! না, না, না,—(আত্ম সংবৃত হইয়া) আপনি কি ডাকতে বল্লেন?

কালিদাস (গা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) কেন উষ্ট্র ডাকচে। বউ! অ-বউ! একটু পা টিপে দিবি? গা গতরে বড় ব্যথা লেগেচে।

বিদ্যোত্তমা। একি প্রহেলিকা, একি বিভীষিকা, ভগবান! ভগবান! একি শুনালে! না না, এ সত্য নয়! কেমন করে এত বড় মিথ্যাও সত্য হয়ে দাঁড়াবে? নিশ্চয়ই এ মহত্তের ছলনা! ক্ষুদ্রাকে পরীক্ষা! (উঠিয়া) প্রভু! প্রিয়তম! কোন আর এ অধিনীর সহিত এমন নির্দ্দয় পরিহাস করছেন? ক্ষান্ত হোন নাথ! এতবল আমার অন্তরে নাই, যাতে এমন নিষ্ঠুর খেলা আমি সইতে পারি। (বরণ ধারণ(

কালিদাস। বউ! তুই কাঁদ্‌ছিস? কি বিড়বিড় করে বলছিস্ আমিত ওদের চিনিনে। হাঁস আমি দেখিছি, কিন্তু পরীতো কখন দেখিনি তা গল্পের পরীর মতনই তো তুমি সোন্দর!—

বিদ্যোত্তমা। (সবেগে উঠিয়া) কে তুমি?

কালিদাস। (সভয়ে) আজ্ঞে আমি কালিদাস!

বিদ্যোত্তমা। (কঠিন স্বরে) কে তোমায় এখানে এনেছে শীঘ্র বল।

কালিদাস। (কম্পিত হইয়া) আজ্ঞে ওই পণ্ডিত মশাইয়া আমায় বল্লে আমাদের সঙ্গে চ' মোণ্ডা খেতে পাবি, ভাল কাপড় পাবি পয়সা পাবি আমরা যেমন যেমন শিখিয়ে দেবো তাই করবি, আর তোকে গাছে বসে কাঠ কাটতে হবে না, বামুন মিন্‌ষের মার খেতে, বাম্‌নী মাগীর গাল খেতে হ'বে না তোর খুব সুখ হবে, তাই না আমি এসেছিনু।

বিদ্যোত্তমা। (সলাটে করাঘাত পূর্ব্বক) বুঝেছি! এ তাদের নির্ম্মম প্রতিশোধ! ওরে বিদ্যোমগর্ব্বিতা নারী! আজ মূর্খাধমের পদতলে তোর স্থান! ওঃ, নিষ্ঠুর; কি ভীষণ নির্ম্মমতা! না না এই বুঝি আমার অহমিকার যোগ্যদণ্ড!

কালিদাস। হাঁা গা বউ-রাজামশাই! তাহলে আমার কি তুমি শূলে দেবে? না শালে দেবে!

বিদ্যোত্তমা। (গভীর ঘৃণার সহিত) তোমার মত মূর্খাধমের উপর প্রতিশোধ নিতে যাওয়া লঘুতা—(পশ্চাৎ দ্বার মুক্ত করিয়া) যাও, পথের কুক্কুর! তোমার যোগ্যস্থানে গমন কর, আর কখন কেহ যেন এ রাজ্যের কোন প্রান্তে তোমার মুখ দেখিতে না পায়! অথবা পারো যদি ওই বিকৃত ছার জীবন বিনষ্ট করে ফেলে আমায় এ মহা লজ্জার কবল থেকে জন্মের মতন উদ্ধার কোরবো, যাও—শীঘ্র যাও—আমার আর সহ্য হচ্ছে না।—"

কালিদাস। (সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে) আগো এই যাই—(প্রস্থান)

বিদ্যোত্তমা। (দ্বাররুদ্ধ করিয়া আর্ত্তভাবে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল) বিশ্বদেব! শেষে এই লিখেছিলে ভাগ্যে?

"কিংনকরোতি বিধি যদি তুষ্ট, কিংনকরোতি সএবহিরুষ্ট!
উষ্ট্রে হস্পতি রম্ভা যদ্যা,
তস্যৈ দত্তা নিবিড় নিতম্বা।—
উষ্ট্র উচ্চারিতে যার ভুল হয় বারবার
র' ক' ব' করে,—
নবীন যৌবনা বালা দিল তারে বরমালা
এবিধি কাহার?
—সেই হয় বিধাতার?
সকলই সম্ভব থাকে বিধিরই সন্তোষে,
অঘটন ঘটে যায় বিধাতারই রোষে।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ।

"ভবঘুরে" আখ্যাটি সাধারণতঃ যে অর্থ নিয়ে সাহিত্যের ভেতরে চলাফেরা করে সেই অর্থটি আমার উপর সম্পূর্ণরকম প্রকাশ না পেলেও বছর যেতেই আমি যে বাংলার তথা ভারতের দু'একটা অংশে ঘুরে না বেড়াই তেমন কথা হলপ করে' বলতে পারি না।

ঐ ভ্রমণের নেশায় মসগুল হয়ে আমাকে একাধিক বার বোলপুর, শান্তিনিকেতনের 'আমলকী কাননে' আশ্রয় নিতে হ'য়েছে! শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যেখানে আছেন সেখানে আদর আপ্যায়নের ত্রুটি কিছুতেই হ'তে পারে না।

শুধু বেড়িয়ে ফিরে এলেইত আর চলেনা, তা'হলে যে 'ভব ঘুরে হওয়ার চেয়ে কিছু তফাৎই থাকে না। শান্তিনিকেতনের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, শান্তিনিকেতনে যাঁরা অফুরন্ত শান্তির হাওয়ায় দোলা খাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' স্বর্গীয় শান্তির খানিক আশা সংগ্রহ করে' না আন্‌তে পারলে দেশ বিদেশে ঘুরিয়ে বেড়ানর সার্থকতা রৈল কোথায়?

বিশ্ব-নিয়ন্তার বিধানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা হওয়ার পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হ'ল। কবিগুরুর মধুর সঞ্জীবনী সুধা সুবর্ণপাত্রে ঢেলে দেশ বিদেশে বিলিয়ে দিয়ে এসিয়ার কবি আজ বিশ্বকবি হয়েছেন, সাগরের ওপার থেকে এপারের সন্ধান আসছে; এত বড় পার্থিব সম্মান কবীন্দ্র রবীন্দ্র অর্জ্জন করেছেন, সাধারণের তিনি অতি উচ্চ গৌরবের নিশান তুলে দিয়ে সগৌরবে বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে আছেন।

দার্শনিকের চক্ষে—আমাদের মত অদর্শনিক অন্ধের চক্ষে নহে—ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ যে শুধু রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়োধর্ম্মেই শ্রেষ্ঠ তা নয়, এমন কথা আমরা অন্ধ হ'লেও মূক হ'লেও বলতে পারবে না। চর্ম্মচক্ষে যা দেখে এসেছি, পার্থিব কর্ণে যা শুনে এসেছি তাতে করে' মনে হয় রবীন্দ্রনাথ পার্থিব জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছেন—আর তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ অপার্থিব জগতে লোকাতীত ক্ষমতা লাভ করিয়া সরল শিশুটির মত চিরসুন্দরবেশে বিরাজ করিতেছেন। একের প্রভাব প্রভুত্বের ভিতর বেড়ে বেড়ে অসীমের পানে ছুটে চলেছে, অপরের স্বভাব স্বভাবের ভিতরে খেলে খেলে অনন্ত উদার উন্মুক্ত শাশ্বত আনন্দের ধারা পান করছে। সত্যং শিবং সুন্দরম্।

একদিন কি দেখলাম? দেখলাম, আমলকী-কাননে ঘেরা বিবিধ ফলপুষ্পসমৃদ্ধ বিতান-বল্লরীর ভিতর আপন আসনে বসিয়া দীর্ঘশ্মশ্রু বিমণ্ডিত মূর্ত্তি দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর সাধনায় রত। সে কিসের সাধনা আপনারা জানেন কি? বিদ্যার সাধনা, বিদ্যার আরাধনা। আশী বছর যাঁর বয়স তিনি যুবকের মত অদম্য শক্তি নিয়ে খস্ খস্ করে অনবরত পৃষ্ঠার

পর পৃষ্ঠা লিখে যাচ্ছেন পেন্সিলে। কখনো হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদের সমালোচনা, কখনো বা ক্যাণ্টের দুর্ভেদ্য দুর্গে সাংখ্য দর্শনকার কপিলের প্রবেশ, আবার কখনো বা ম্যাথ্‌মেটিক্যাল ক্যালকুলেশন ; কত কী ?

আমি ত দূর থেকে দেখে অবাক্। কাছে যেঁসিনি, কি-জানি বা যদি সমাধি ভঙ্গ হয়! আরো দেখলাম বনের পাখী শালিক, ময়না, চড়াই সব উড়ে উড়ে এসে ঋষির সম্মুখভাগে স্থাপিত চালের কণার পাত্রে বসে অবাধে খাচ্ছে, ঋষির কাঁধে মাথায়, পায়ে বসছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। হিংসার লেশমাত্র যেখানে আমল পায় না সে ঠাঁই অতি পবিত্র, শান্তিময় তপোবন। ঋষির আশ্রম আর কাকে বলে? শ্বেত প্রশান্তমূর্ত্তি, কাশগুচ্ছবৎ শুভ্রশ্মশ্রু ; জ্ঞানে, গুণে, বয়সে সর্ব্বপ্রকারে ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাঁর আত্মা সদ্‌গতি প্রাপ্ত হোক্!

ভৃত্যকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম—সুযোগ পেলেই খবর দিবে। সুযোগ আসল ঋষি আমাকে ডাক্‌লেন, আলাপে মুগ্ধ হলাম! আমাদের মত কূপমণ্ডুক তাঁর গভীর জ্ঞান-পারাবারের পরিমাপ করিবে—তা অসম্ভব। কত দার্শনিকের কত সাহিত্যিকের খবর তিনি দিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ভিতর ব্যাবধান যতটুকু তাও প্রকাশ করলেন।

জানিনা আমার সঙ্গে আলাপ করে বৃথা সময় নষ্ট করে' তিনি সুখী হলেন কিনা, কিন্তু খানিক আলাপের পরেই তিনি আগ্রহে ভৃত্যদ্বারা তাঁহার রচিত একখানা ছাপানো পুঁথি আনিয়ে আমায় সস্নেহে আদরে উপহার দিলেন। সেই উপহৃত বই পড়ে পড়ে আমাকে প্রশ্ন করতে বললেন। প্রশ্ন আমি কি করবো ছাই! আমি ভাব্‌ছিলাম—এঁরাই মানুষ, এঁরাই ঋষি। আমরা ত ক্ষুদ্রাদপি তুচ্ছ ; নগণ্য ঘৃণ্য!

জিজ্ঞেস করলেন, "দয়া করে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এতদূর চলে এসেছেন শান্তিনিকেতন দেখতে? কেমন লাগ্‌ছে আপনার? রবি যে এটি করেছে, সফল হবে ত?" আমি ভাবলাম—যে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে শান্তিনিকেতনে বাস করছেন শান্তির মূর্ত্তিমান অবতার দ্বিজেন্দ্রনাথ, যে-ঠাঁই বিশ্বভারতীর মধুর বীণা-নিক্কণে সতত মুখরিত সে-ঠাঁই সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন? তীর্থ ত ভারতে অনন্ত! বাগবাদিনীর অপার করুণায় এই শান্তিনিকেতনও আজ পবিত্র তীর্থে পরিণত হ'য়েছে। এই তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা-রবীন্দ্রনাথ, অধিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্র—দ্বিজশ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য—ব্রাহ্ম—বৃহৎ! ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

তাঁর উপহৃত পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় পড়্‌লাম "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" চৌদ্দ পৃষ্ঠায় পড়লাম "স্বাধীনতা যা, স্বরাজ্যও তা একই ; তার সাক্ষী স্বাধীন—স্ব+অধীন অর্থাৎ আপনি আপনার অধীন ; স্বরাজ—স্ব+রাজ অর্থাৎ আপনি আপনার রাজা ; দুয়ের ভাবার্থ অবিকল সমান।

বাংলার স্বরাজ্যদল সৃষ্টি হওয়ার কত আগেই যে শান্তিনিকেতনের ঋষি স্বরাজের ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন দেখুন। প্রথম স্বর্ত্তব্য—"ঈশ্বরের অধীনতার সোপান,.....ধর্ম্মবন্ধন মুক্তির সোপান।" দ্বিতীয় স্বর্ত্তব্য—"স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার বিপরীত পথ.....।" ২১ পৃষ্ঠায়—

অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ। অধর্ম্মদ্বারা সমস্ত ফরাসীস্ রাজ্য চকিতের মধ্যে বিপ্লবকর্ত্তাদিগের হস্তাগত হইল ইত্যাদি।"

কত লেখার ভিতর দিয়ে যে তিনি কত রকমের চিন্তারাশি বিবৃত করেছেন তার হিসাব কে দেবে? আজ ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথের তিরোধানে তাঁহার পিতা মহা—ঋষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির বিষয় মনে আসে। যেমন বংশ তেমন কীর্ত্তি; যেমন পিতা তেমন পুত্র।

আশে পাশে নজর করে' দেখলাম খুনকদার রেকাবীটা ঋষির প্রসারিত পা দুটির উপর রাখা —হয়েছে! নির্ভীক পাখীর দল নির্ভয়ে চালের গুড়ি কুড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে, উড়ছে বস্‌ছে। জিজ্ঞাসা করলাম 'এ বিধান কি আপনি স্বেচ্ছায় করেছেন? গৃহস্থদের নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম 'ভূত-বলির' অনুষ্ঠান বোধ হয়?"

তিনি বল্‌লেন "প্রকারান্তরে তাই। একদিন আমি লেখাপড়া কর্‌ছি, কোনো দিকে নজর নেই, এক ময়না পাখী উড়ে এসে আমার ডান চোখের ভিতরে ঠোঁট দিলে। পাখী বোধহয় ভেবেছিল পাকা ফল। কিন্তু এদিকে যে আমার পাকা বয়সে চোখের জ্বালা কাঁচা হয়ে রাড়িয়ে উঠ্‌ল। তারপর থেকে ব্যবস্থা করলুম পাখীর খাবার পাশে রাখতে হবে। তারপর নিজের কাজের কাজ করবো। সেই হ'তে এই বিধান।"

তখন ছিল শীতকাল। পৌষমাসের প্রথম ভাগ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব আশ্রমে দিন রাত সমাগ। দিনের বেলায় ছেলেদের খেলাধূলা, সন্ধ্যায় উপাসনা ও সঙ্গীত. রেতের বেলায় 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়, সাওতাল নাচ, বাজি পোড়ানো, হরেক রকমের উৎসব। ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথের পবিত্র আত্মা আজ চিরউৎসবময় ধামে, শান্তির অমর নিকেতনে সুখে শান্তিতে বিরাজ করুক। শান্তিঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

আমেরিকান সমাজ

(২)

আমেরিকান শ্বেতাঙ্গসমাজ সাধারণভাবে যে প্রকার শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে সমাজ-শরীরে চক্রের মধ্যে আবার চক্র আছে অর্থাৎ একটি সাধারণ অর্থনীতিক শ্রেণীর মধ্যে আবার বিভিন্ন ক্ষুদ্র সমাজ আছে। তাহার মানে যে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাজ, যাহা উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক ব্যবসায়ী ও বড় চাকরিজীবিদের দ্বারা সংগঠিত তাহার ভিতর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের যথা—শিল্পী (mechanic), কারখানার foreman, technical man, সামান্য দোকানদার ও ক্ষুদ্র চাকরিজীবির স্থান নেই! তবে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন লোক যদি ধনাঢ্য হয় তাহা হইলে তাহার সামাজিক পদোন্নতি হয়। তৎপরে থিয়েটারের লোকসমূহের ভদ্র সমাজে স্থান নেই। এ দলের লোক বেশীর ভাগ বোধ হয় গরীব ও ক্ষুদ্রমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত হয়, আর থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ভদ্র সমাজে সাধারণতঃ সম্মান নেই; কিন্তু কেহ যদি আন্তর্জাতিক বা স্বদেশে লোকমধ্যে যশোপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার প্রতি সমাজ সম্মান দেখায়। কিন্তু এ প্রকার সৌভাগ্য থিয়েটারের কম লোকেরই কপালে ঘটে! আবার সঙ্গীতবিদ মহিলা বা পুরুষ তাহার গুণানুসারে সমাজে আদৃত হন কারণ এ শ্রেণীর লোকেরা বেশীরভাগ ভদ্রবংশ-সম্ভূত ও ভদ্র আচার স্খলিত। তাহারা থিয়েটারে কাজ করে না, Concert Hall বা opera houseএ সঙ্গীত করে এবং ইহাদের মধ্যে বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আন্তর্জাতিক যশঃলাভ করিলে সমাজের দ্বার সম্মানের সহিত তাঁহার জন্য উন্মুক্ত হয়। এইসব থিয়েটারের লোকেরা, নাটক লেখকেরা নিজেদের এক সমাজ সৃষ্টি করে। তাহারা নিজেদের এক Bohemian দল গঠন করিয়া চলাফেরা করে। এইরূপে পেশা গুণ ও বৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন সামাজিক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। তৎপর আমেরিকা জাতি (race) হিসাবে এখনও একত্ব (homogeneity) প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বাঞ্চলে যে অ-ইংরেজভাষী ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের বংশধরেরা নিজেদের পিতৃপুরুষের মাতৃভাষা ও আচার ব্যবহারাদি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে ও ইংরেজি আচরণ tradition গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ যাহারা নিজেদের "anglosaxon" বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বংশধরদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু মধ্যপশ্চিমে যথায় বেশীরভাগ ঔপনিবেশিকেরা ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়াছে তাহাদের বংশধরেরা অনেক স্থলে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। এবং নিজেদের জাতীয় আচার ও ভাষা যথাসম্ভব

বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। যথা, মধ্যপশ্চিমের জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকরা নিজেদের জার্ম্মাণ আমেরিকান (German-american) ও সুইডরা নিজেদের (Swedish american) ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করে। ইহারা ইংরেজি ও পৈতৃক ভাষা উভয়ই শিক্ষা করে। এবং বিবাহাদি অনেক স্থলে নিজেদের মধ্যে করে।

এই বিশেষত্ব ধর্ম্মসম্বন্ধেও লক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিকেরা পুরাতন দেশের প্রথানুযায়ী ধর্ম্মমণ্ডলী (church) নূতন দেশে স্থাপন করে, এইপ্রকারে সুইডরা, জার্ম্মাণরা বা অন্যান্য জাতীয়েরা নিজেদের গির্জ্জার সভা হইয়া তথায় মাতৃভাষায় উপাসনা করে। অবশ্য যাহারা ইংরেজি জানে না তাহাদের জন্য ইহা প্রয়োজনীয়। কিন্তু যাহারা "নিজেদের "এ্যাঙ্গলো সাক্সন" রূপে রূপান্তরিত করিয়াছে তাহারা "আমেরিকান গির্জ্জায়" উপাসনা করে। এই বিষয় উপলক্ষ করিয়া নিউইয়র্ক ষ্টেটের একজন জার্ম্মাণ ধর্ম্মযাজক আমার সম্মুখে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের জার্ম্মাণ ধর্ম্মমণ্ডলীসমূহ প্রধানতঃ গরীব, তারপর নবাগত জার্ম্মাণেরা ইংরেজি শিক্ষা করিয়া আমেরিকান সাজেন, তাঁহারা পূর্ব্বের ধর্ম্মমণ্ডলীর সভ্য থাকিতে লজ্জা বোধ করেন, বলেন "আমি এখন আমেরিকান গির্জ্জার সভ্য।" কাজেই গরীব "জার্ম্মাণ গির্জ্জার" কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইবে ?"

এতক্ষণ যাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি তাহারা সাধারণতঃ ইউরোপের টিউটনভাষী। কিন্তু যাহারা ইউরোপের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছে তাহারা হঠাৎ আমেরিকান এক-জাতীয়ত্বের ভিতর মিশ্রিত (american melting pot) হইতে পারে না। তাহাদের বংশধরেরা "আমেরিকান" বটে এবং রাজনীতিক সমস্ত অধিকারের অধিকারী। কিন্তু আমেরিকান সমাজে তাহারা এখনও মিশ্রিত হয় নাই। আমেরিকানেরা ইহাদের স্বভাবতঃ ঘৃণা করে, বলে ইহারা তেমন প্রকারে সভ্য নয় এবং ইহাদের আচারাদি বিশ্রী! ইহারাও নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তবে যাহারা উচ্চশিক্ষিত হইয়া 'আমেরিকান' হইয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে ধনাঢ্য লোকেরা আমেরিকান সমাজে আদরে গৃহীত হয়। এই সব জাতির বিপক্ষে বর্ণবিদ্বেষ নাই, ইহাদের সহিত বিবাহ ও আহারাদি প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কোন বাধা নাই কিন্তু একটা সামাজিক ঘৃণা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার পশ্চাতে একটা অতি প্রাচীন জাতিবিদ্বেষ (racial dislike) লুকাইত আছে। ইউরোপে প্রাচীনকাল হইতে টিউটন ও ল্যাটিন, টিউটন ও স্লাভ জাতিদের মধ্যে রেশারেশি চলিতেছে। ইহাদের প্রত্যেক জাতিই নিজেকে উচ্চজাতি ও অপরকে হীন জাতি বলিয়া ধারণা করে। তাহার পর আমেরিকানদের বিশ্বাস তাহাদের "এ্যাঙ্গলো-সাক্সন" সভ্যতা বর্ত্তমানে জগতের শ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য তাহারা অন্যদের নীচ চক্ষে নিরীক্ষণ করে। ইহার পর টিউটন বংশীয় আমেরিকানদের চালচলনের সহিত স্লাভ ও ল্যাটিনদের মিল নাই এবং দক্ষিণ ইউরোপীয়েরা মলিন বর্ণের লোক। আর দক্ষিণ ইতালীয়দের (সিসিলি ও কালাব্রিয়ার লোকদের) বদনাম আছে যে তাহারা বড় ঠগ, গাঁটকাটা ও খুনে। আমেরিকার বেশীর ভাগ

খুন ডাকাতি ইহাদের, Mafia, Camorra, Blackhands প্রভৃতি গুপ্ত বদমাইসের দলের দ্বারা সংঘটিত হয়। ইহাদের Dago ও Guinea বলিয়া অভিহিত করা হয়। লোকে বলে যে একজন ডেগো দশ সেণ্টের (প্রায় ১৯ পয়সা) জন্য একজন লোকের গলায় অবাধে ছুরিকা প্রদান করিতে পারে। এই গিনির দল সাধারণতঃ মাটিকাটার কর্ম্ম করে এবং কেহ কেহ দোকানপাট ও দরজির কার্য্য করে। আর গ্রীকেরা জুতাবুরুষের কর্ম্ম করে ও যাহারা অবস্থাপন্ন তাহারা ফলবিক্রয় করে; এবং স্লাভেরা (পোল, বুলগার, সার্ভিয়ান প্রভৃতি) কুলির কর্ম্ম ও অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেরা কৃষিকর্ম্ম করে। এইসব জাতি আমেরিকায় এখনও নিজেদের প্রতিপত্তিশালী ও সর্ব্বজনসম্মানিত করিতে পারে নাই। এইসব কারণে তাহাদের প্রতি একটা অপরত্বভাবের উদ্ভব হইয়াছে। তবে এইসব জাতির উচ্চবংশের একজন ইউরোপ হইতে আমেরিকায় আসিলে তদ্দেশের সমাজে সাদরে গৃহীত হইবে! একজন গিনি কুলী বা দোকানদারের তৎসমাজে স্থান নাই, কিন্তু সেই জাতির একজন কাউণ্ট বা ডিউক আসিলে তাহার প্রতি অন্য ব্যবস্থা হইবে। তাহার মলিনবর্ণ (Brunette) সমাজে গ্রহণের অন্তরায় হয় না বরং এই জাতীয় একজন দেউলিয়া খেতাবওয়ালা ব্যক্তি অক্লেশে এক ধনাঢ্য আমেরিকান মেয়ে বিবাহ করিতে পারে! আমেরিকান সমাজ প্রথমে ইহাদের গ্রহণ করে নাই, তবে আজকাল ধনাঢ্য দক্ষিণ ইউরোপীয়ানের আমেরিকান "কুলীন" ঘরে বিবাহ সম্ভব হয় যদি সে-প্রকারের যোগাযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা পাত্রীর স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছায় পছন্দের (Free choice) মহাত্ম্যের উপর নির্ভর করে। একবার আমার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাজতত্ত্বিক ক্লাশে এই বিষয়ের আলোচনাকালে প্রশ্ন উঠে যে ইতালীয়দের সমাজে গ্রহণ করা হয় কি না। তাহার প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে "হালে আমরা ইতালীয়দের সহিত বিবাহ করিতেছি। কিন্তু আমি আমেরিকায় তাহা দেখি নাই বা শ্রবণ করি নাই, যদিও অনেক ইতালীয় bankrupt Baronদের আমেরিকান ধনীদের কন্যা বিবাহ করিতে শুনিয়াছি! নিউইয়র্কে আমি এক প্রকারের এক দেউলিয়া ব্যারণকে জানিতাম তাঁহার স্ত্রী আমেরিকান মহিলা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু এ বিবাহ ইউরোপেই সংঘটিত হয় এবং তাহাও স্বাধীন ইচ্ছার মাহাত্ম্য! কিন্তু এই ভদ্রলোক নিজেকে রোমান বলিয়া পরিচয় দিতেন অথচ তিনি বংশে দীন ইতালীয় বলিয়া প্রতীত হইতেন যদিচ গাত্রের বর্ণে তিনি মধ্য ইউরোপের লোকের ন্যায়। আমি যাঁহার গৃহে ইঁহার সহিত পরিচিত হই তাঁহার সঙ্গে এই কুহেলিকাপূর্ণ ভদ্রলোকের জাতির বিষয় আলোচনা কালে বলিয়াছিলাম যে কথাবার্ত্তায় আমি ধরিয়াছি ইনি দক্ষিণ ইতালীয় বংশীয়। আর গৃহস্বামিনী আমায় বলেন "তবে তুমি কি মনে কর যে count একখানা ছুরি টেঁকে গুঁজে' বেড়ায়? আমি ঐ জাতিকে বড়ই ভয় করি।" ইহার নাম হইতেছে "জাতিবিদ্বেষ, একজনের দোষে সমস্ত জাতিকে অভিশপ্ত করা হয়। আর একটি গ্রীক কারবারী যুবককে সিকাগোতে

আমেরিকান কন্যা বিবাহ করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু এবম্প্রকারের বিবাহ সমাজের আশে পাশে হয় তাহাতে সমাজে কোন ফল ফলে না বা কোন প্রকারের প্রতিক্রিয়ার উদয় হয় না। এবম্প্রকারের বিবাহ এসিয়াবাসীও তথায় করিতেছে এবং কেহ কেহ উত্তম ঘরেই বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু এইসব বিবাহের দ্বারা আমেরিকান সমাজের সংকীর্ণতাও ভগ্ন হয় না এবং উদারতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। অন্যদিকে আমেরিকায় বিবাহ সম্বন্ধে একটা অনুষ্ঠান ঘটিতেছে যাহা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এবম্প্রকার বিশদভাবে ঘটিতেছে না—তাহা sexual selection। জীবতত্ত্বীয় মতানুসারে নৃতত্ত্ব হিসাবে তাহা অতি সুফলপ্রদ। আমেরিকায় বিবাহের বেলায় পাত্র ও পাত্রীর পছন্দ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে বলিয়া ও তথায় নানা-জাতির সম্মিলন হয় বলিয়া বিবাহ অনুষ্ঠানটি sexual selection (উপযুক্ত পাত্রের নিজের উপযুক্ত পছন্দমত পাত্রীর অনুসন্ধান) দ্বারা সংঘটিত হয়। তথায় যুবক ও যুবতীদের পছন্দ করিয়া জীবনের সহযাত্রী অন্বেষণ করার সুযোগ অতি প্রশস্ত, সেইজন্য পরস্পরকে মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার ফলে একটি সুন্দরাকৃতি শ্বেতাঙ্গ জাতির উদ্ভব তথায় হইতেছে। এবম্প্রকারে নানাজাতির সুন্দরাকৃতি নরনারীর সম্মিলনের ফলে ইউরোপীয় হইতে আমেরিকান শ্বেতাঙ্গজাতি সুন্দরতর ও স্বাস্থ্যবান হইতেছে। কিন্তু এই sexual selection টাতে বোধহয় অজ্ঞাতসারে colour selection ও (রংপছন্দ) চলিতেছে। একজন উত্তর ইউরোপীয় জাতি প্রসূত (blond) নর বা নারী সচরাচর মলিন বর্ণের (brunette বা brown দক্ষিণ ইউরোপীয় নর বা নারীর সহিত বিবাহ করে না। যদি এবম্প্রকার হয় তাহা হইলে তাহার অজ্ঞাতসারে রং পছন্দ করিয়া তাহা করা হয় অর্থাৎ সেই দক্ষিণ ইউরোপীয় উত্তর ইউরোপীয়ের সহিত মিলিতে পারে এবম্প্রকারের অপেক্ষাকৃত ফরসা রং হওয়া চাই। তবে মলিনবর্ণের এসিয়াবাসীর সহিত দুই একটি যে বিবাহ হয় তাহা অসাধারণ ও অস্বাভাবিক, সমাজের বাহিরে তাহা হয়। সেজন্য তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

ইহাই হইল আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ সমাজ অঙ্গের বিশ্লেষণ। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে তথাকার আচার ব্যবহার কি প্রকার? পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমেরিকায় ইংরেজী চর্চ্চা ও সভ্যতার প্রাধান্য বিরাজমান। আমেরিকান সভ্যতা ইংরেজি সভ্যতার ছাপে অঙ্কিত। ইংরেজি প্রথা ও tradition আমেরিকান রীতি ও স্মৃতি। আমেরিকায় সর্ব্বপ্রকারের ঔপনিবেশিকেরা গিয়া ইংরেজি পড়িয়া "এ্যাংলোস্যাক্সন" হয়, কাযেই তাহারা নিজেদের নিজত্ব হারাইয়া ফেলে এবং গভর্ণমেণ্ট সকলকে খাঁটি আমেরিকানে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ইহাকে বলে "একশতভাগ আমেরিকানত্ব (100 p. c. American)। ইহার কম যিনি তিনি বিগত যুদ্ধের সময় হইতে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া গণ্য হন। এই আমেরিকানত্ব যতই নিজের বিশেষত্বে বিমণ্ডিত বলিয়া গর্ব্ব করুক, চর্চ্চা ও রীতি-নীতিতে সম্পূর্ণ ইংরেজিভাবের ছায়ায় দণ্ডায়মান আছে। পুরাতন ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বংশধরগণ এই "এ্যাঙ্গলো সাক্সনত্ব" সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছে! তৎপরে আমেরিকান ধনকুবেরদের ইংলণ্ডের সমাজে দহরম্ মহরম্ হওয়ায়

ইংলণ্ডের হাল ফ্যাসান আমেরিকার উচ্চ শ্রেণীতে অনুকৃত হয়। আহার বিহারাদিতে, চালচলনে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে খাঁটি ইংরাজি চাল বর্ত্তমান। যদিও সাধারণ মধ্যে উভয়ের কিছু পার্থক্য আছে! এবং ইহাই আদর্শ বলিয়া সর্ব্বত্র অনুকৃত হয়। পুরাতন আমেরিকানেরা বড় রূঢ় ও অচর্চ্চিত (rude and rough) ছিল এবং এখনও গ্রাম্য লোকেরা ও তদ্রূপ। তাহারা প্রাচীন সাদাসিধা ধরণের লোক, etiquetteএর ধার ধারে না, মোলায়েম কথা বলিতে জানে না, তাহারা hallo friend well met ধরণের লোক অর্থাৎ উচ্চচর্চ্চা জনিত polite mannerরূপ hypocrisy জানে না। এইজন্য ইউরোপে বলে আমেরিকানেরা বড় rude প্রকৃতির লোক। অর্থাৎ সাধারণতঃ আমেরিকানেরা স্বাধীন প্রকৃতির লোক বলিয়া "মুখে মিঠে কথার বুলি আর অন্তরে ছুরি" এ প্রকৃতির লোক নয় অর্থাৎ slave mentality হইলে যে প্রকারের চরিত্রের অবনতি হয় তাহা তাহাদের মধ্যে অভাব। চাটুকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথা ইত্যাদির দ্বারা স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করা "মুখে এক পেট আর" ক্ষমতাশালী লোকের খোসামোদ করা আর ক্ষমতাহীন লোকের প্রতি অত্যাচার করা প্রভৃতি দোষ প্রাচীন আমেরিকান বংশীয়দের মধ্যে সাধারণতঃ লক্ষিত-হয় না। তবে বিদেশীয়েরা বলে যে আমেরিকানেরা স্বভাবতঃ bluffer অর্থাৎ বড় লম্বা চওড়া কথা কহে! ধাপ্পা দিয়া কেনাইয়া ফাঁপাইয়া আসল বস্তুকে অতি বৃহদাকারে লোকের সম্মুখে উপস্থিত করা কোন কোন ব্যবসায়ীর প্রকৃতি হইতে পারে বটে, কিন্তু, শিক্ষিত সমাজে তাহা আমার নিকট লক্ষিত হয় নাই। আর রূঢ়তা দোষ চর্চ্চিত ভদ্র বংশেও লক্ষিত হয় না।

আসল কথা এই যে "আমেরিকান" ও "আমেরিকান জাতি" বলিলে সমাজ তাত্ত্বিক কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। একদল আমেরিকান আছে যাহারা পুরাতন বনিয়াদী বংশীয় লোক, ইহাদের চালচলন অতি দোরস্ত, আর একদল আছে যাহারা ইউরোপের সম্মার্জ্জনী ঝাড়া (riffraffs) ঔপনিবেশিকের দল ও তাহাদের তদনুরূপ সন্ততিগণ। এই দ্বিতীয় দলের লোকেদের স্বদেশে কোন চর্চ্চা ও সভ্যতা ছিল না, সমাজে স্থান ছিল না; তাহারা আমেরিকায় আসিয়া মুক্ত বাতাসে স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচার করে। ইহাদের চালচলন ঘৃণ্য; বিদেশী পর্য্যটকেরা ইহাদেরই রাস্তাঘাটে, ট্রামে, রাস্তার আমোদস্থলে যথেচ্ছাচার করিতে দেখিয়া তাহা আমেরিকানদের জাতীয় প্রকৃতি বলিয়া অনুযোগ করে! আর ইহারাই ইউরোপে আসিয়া নিজেদের "আমেরিকান" বলিয়া পরিচয় প্রদান করে ও নিজেদের দুর্নীতিকে "আমেরিকায় লোকে এইপ্রকার করে" বলিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা করে! এবং আমেরিকার বদনাম বেশীর ভাগ ইহাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়।

কোন নূতন দেশে আসিলে বিদেশী তথাকার ভালটি সহজে দেখিতে পায় না, সেদেশে কিছুদিন বসবাস করিয়া যদি তাঁহার ঐ ভাল চক্রের ভিতর প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য না হয় তাহা হইলে স্বভাবতঃই গণ্ডীর বাহিরে থাকিয়া মেকিকে আসল বলিয়া গ্রহণ করেন। তদ্রূপ এই ঔপনিবেশিকের দল বাহিরে থাকিয়া মন্দটাই আসল বলিয়া অনুকরণ করিয়া নিজেদের

"আমেরিকান হইয়াছি" বলিয়া বড়াই করে। তবে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ যদি অবস্থাপন্ন ও উচ্চশিক্ষিত হয় তাহাহইলে তাহারা নিজেদের প্রকৃতির উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই উন্নতি স্বভাব ও বাহ্যাবস্থার (character and surrounding) উপর নির্ভর করে। কেহ স্বভাব ও সুবিধার গুণে এক পুরুষে ভদ্রলোক হয় অনেকেই তাহা হইতে না পারিয়া "অভদ্র" ভদ্রলোক সাজিয়া বিভ্রাট আনয়ন করে!

আবার অন্যদিকে একদলের লোক আছে পূর্ব্বাঞ্চলে যাহাদের সমাজে বিশেষ সম্মান, তাহারা অতি বাছাবাছা লোকের সহিত মেশা-মেশি করে। ইহারা আমেরিকান ধনাঢ্য দল হইতে সংগঠিত। ইহাদের অহংকার যে ইহারা "move in very exclusive circle"? (অতিবাছা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে মেশামেশি করেন)! আমাদের দেশে যাহারা নৈষ্ঠিকতার দোহাই দিয়া "ছুৎছাতের" নামে "নেতিনেতি" করিয়া সকল হইতে পার্থক্য স্থাপনে প্রয়াসী হন তাহাদেরও যে উদ্দেশ্য (যদিও ভারতে ইহা ধর্ম্মের নামে করা হয়) আর এই সামাজিক ছুৎছাত ভীতিগ্রস্থ "exclusive circle"এ মেশার দলেরও সেই উদ্দেশ্য! উভয়েই নিজেকে বাহ্য হইতে অপসারিত করিয়া নিজের কুলীনত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস করে; উদ্দেশ্য নিজের দর বাড়ান, তাই "নেতি নতি" করে, তবে ভারতে এই স্বার্থ-সাধনটি ধর্ম্মের ভণ্ডামি করিয়া অসমর্থন করা হয় আর আমেরিকান সমাজে অর্থের গরমে তাহা করা হয়, এবং সাম্যবাদীর দেশে তাহার কোন পরিপোষকতা (justification) নাই, লোকে জানে শ্রেণীস্তরে বিভক্ত বুরজোয়া সমাজের ইহাই রীতি, ইহাই চরমাদর্শ!

আর শেষকথা এই শ্বেতাঙ্গ সমাজ যতপ্রকার স্তরে ও গণ্ডীতে বিভক্ত হউক না কেন তাহার সহিত অ-শ্বেতাঙ্গ লোকের সংস্পর্শে আসিবার কোন সুবিধা আছে কি না! পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে তথাকথিত রঙীন লোকের স্থান নাই তাহা তিনি এসিয়া জাতীয় হউন বা আফ্রিকা জাতীয় হউন। তবে অনেক society ladyদের ক্লাব আছে যথায় রঙীন লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া বক্তৃতা করান হয়। কোন কোন নিগ্রোনেতাকে এবম্প্রকার ক্লাবে আনয়ন করা হয়, শ্বেতাঙ্গ সমাজের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ এই পর্য্যন্ত! সমাজ তাঁহার মুখের সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু তথাকথিত রঙীন বর্ণের এসিয়াবাসীর সৌভাগ্য আরও বেশীদূর পর্য্যন্ত যায় অর্থাৎ তাঁহার বিশেষ আলাপি পরিচিতের শ্বেতাঙ্গের বাড়ী কালেভদ্রে আহারের নিমন্ত্রণ ঘটে! অবশ্য এ বিষয়ে কোন বাঁধাবাঁধি আইন নাই, একজন এসিয়াবাসীর ব্যক্তিগত পুরুষকার এ সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে। একদিকে একজন এসিয়াবাসী যথায় বরাবরই অপমানিত হইয়াছে তৎস্থানে আবার তাহার স্বদেশবাসী অতি সমাদরে গৃহীত হইতেছে! যে আমেরিকায় এসিয়াবাসীর দুর্দ্দশার সীমা নাই তথায় আবার ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি আমেরিকান সমাজের সম্মানপ্রদর্শনেরও সীমা নাই! দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন পূর্ব্বাঞ্চলের সমাজে চীনরাজ প্রতিনিধি Dr. wu Ting fangকে lionife. করিতেছিল তখন কালিফোর্ণিয়ার দিকে লোকে তাঁহারই চীনাস্বদেশবাসীদের প্রতি নির্য্যাতন করিতেছিল এবং

তথাকার সমাজ এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলে "একি একটা কুলীর জাতির লোককে লইয়া আবার এত বাড়াবাড়ি কেন? সেইপ্রকার যে ভারতবাসী শিখদের প্রতি পশ্চিমে নির্য্যাতন হইয়াছিল সেই দেশেরই একজন শিখ কর্পূরতলার মহারাজাকে আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট guest of the nation (দেশের অতিথি) বলিয়া সম্মানিত করে। আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য স্বাধীন হওয়ার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সাতজন বিদেশী guest of the nation বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন তন্মধ্যে চারিজন "হলদীপ" এসিয়াবাসী। (১) চীনের প্রধান রাজমন্ত্রী পরলোকগত Si Hung cnung, (২) শ্যামদেশের মৃতরাজা যিনি যুবরাজ অবস্থায় তথায় ভ্রমণে গিয়াছিলেন, (৩) কর্পূর-তলার মহারাজা, (৪) জাপানের Admiral Togo.।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

জোয়ার ভাঁটা

(উপন্যাস)

কিন্তু সকলের মধ্যে একজনের মুখখানা এখনও বড়ই অপ্রসন্ন। মুরলা এই ব্যাপারে কেমন যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। সে একবার প্রতিমার দিকে, একবার উন্মাদিনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার মনের সমস্যার কোন মীমাংসাই সে খুঁজিয়া পাইল না। সে বোধ হয় মনে করিতেছিল, ঐ স্বর্গের দেবী ঐ মর্ত্ত্যের দেবীর এতটা অপমান কেন সহিলেন? দেবীর চরণে যদি দেবীর অধিকার না থাকে, তবে কাহার আছে? মেয়ে-মহলে এই হুলস্থুল দেখিয়া পুরুষেরাও সেখানে অনেক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আর পুরুষদের মধ্যে কয়েকজন শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরও অভাব ছিল না। তাঁহারা এবার শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া উন্মাদিনীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন এই নজিরে প্রতিপন্ন হইল যে, এরূপ অশাস্ত্রীয় কাজে বড়বৌয়ের পূজার পুণ্য কমিবে বৈ বাড়িবে না, তখন বড়বৌ যেন একটু বাগ মানিলেন। কিন্তু কালীমোহনের স্ত্রীর নামটা তিনি জিহ্বাগ্রেও আনিলেন না। ভাদুড়ী-বৌয়ের উপরেই এই বরণের ভার অর্পণ করিলেন।

এবার ভাদুড়ী-বৌয়ের স্বর্ণ-ঘটিত বেনারসীতে প্রতিমার পুরোভাগ বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভক্তের চক্ষে দেবীর চেহারার প্রসন্নতা তখনই ধরা পড়িল। আবার সান্ধ্য রাগের শেষ কিরণে যখন বরণকারিণীর হাত-ভরা অলঙ্কারে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, তখন অনেকেই

যে মাঘের মুখে হাসির ছটা পর্য্যন্ত দেখিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! হায় পাগলী, তোমার ঐ মেটে ঘরের আর বোঁচা হাত এখনই যে এসব মাটি করিতে বসিয়াছিল!

আনন্দের উত্তেজনায় সকলেই অবশ্য এখন বেশ তাজা হইয়া উঠিল, কিন্তু ঘরের কোনটিতে মুরলা আরও যেন মুষড়াইয়া গিয়াছে। মুরলার মনের ভিতর এবার একেবারে যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ লাগিয়াছে। তাহার সেই নূতন ভাবোচ্ছ্বাসটা এতদিন তাহার হৃদয়রাজ্যে প্রায় অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু আজ এইসব অপ্রত্যাশিত ঘটনার ঘোলা স্রোতে যে অবসাদ-দানবটা আবির্ভূত হইয়া তাহার সেই উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে টানিয়া নামাইতেছে, তাহাকে আর রোধ করা বড় সহজ নয়।

আজকার পথের সামান্য ঘটনাটা না হয় সামান্য মেয়েলীকাণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর এই ব্যাপারটা? এটা ত আর সামান্য নয়, মেয়েমহল থেকে সুরু হইলেও, এটা যে একেবারে পণ্ডিতমণ্ডলে গিয়া তবে শেষ হইয়াছে। ঠাকুরবরণের এই ব্যবস্থা হয়ত মুরলার নিতান্ত অজানা ছিল না, কিন্তু এই অধিকারের প্রভেদটা এমন প্রখররূপে তাহার চোখে পড়ে নাই। তাহা ছাড়া তার জানা-অজানা এইপ্রকার সব বৈষম্যই আজ যেন তার নূতন মনে নূতন রকমে কাটিয়া বসিতেছিল। তাই শুধু মেয়েলী প্রথায় নয়, একেবারে আসল শাস্ত্রজ্ঞানের কথায় এই অধিকারের প্রভেদটা যখন প্রতিপন্ন হইয়া গেল, তখন যে নূতন ধারণার উপর সে এমন সগর্ব্বে দাঁড়াইয়াছিল, সেটা যেন ক্রমশঃ তার পা থেকে সরিতে লাগিল। মুরলা আর কিসের বলে সেটাকে টানিয়া রাখে? ন্যায়াকাশের সেই প্রকাণ্ড দার্শনিকের মতটা শুধুই একটা আকাশ-কুসুম, স্বপ্নের ঘোরে তার একটা কাল্পনিক গন্ধ পাওয়া যায় মাত্র, কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার অস্তিত্ব যে কোথাও মেলে না। অজ্ঞানদের মধ্যে ইহা মিলিবার তেমন কথা না থাক, সজ্ঞানদের কাছেই বা মেলে কৈ? এ সম্বন্ধে অজ্ঞান ও সজ্ঞান দুইয়েরই যে এক জ্ঞান!

জ্ঞানী না হইলেও বোসগিন্নী ত প্রকৃত জ্ঞানের কথাই বলিয়াছে। মঙ্গল-কার্য্যে বিধবার সম্ভ্রম বাস্তবিকই যে অমৃতে গরল তুল্য। মানবীয় ও দৈব উভয় মঙ্গলই যেন তাহার কলুষিত স্পর্শে বিশীর্ণ হইয়া যায়—দাদু দত্তের শুভ বিবাহের ও বড়বৌয়ের শুভ পূজার শুভত্ব স্ত্রী-পুরুষ পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই মতে একেবারেই মাটি হয়।

এইসব চিন্তার ধাক্কায় মুরলার দৃষ্টিটা এবার বড়বৌকে ছাড়িয়া ভাদুড়ী-বৌয়ের উপরেই একেবারে আটক পড়িল। নিজের বাড়ীতে নিজের কাজে এমন যার অধিকার নাই, তার দেবত্ব চুলোয় যাক, তাহাকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যায় কিনা সন্দেহ! যদি দেবত্বে কাহারও দাবি থাকে তবে ঐরূপ বধূটিরই। স্বয়ং গৃহস্বামিনী যে স্থানটি হইতে এমন নির্দ্দয়ভাবে বিতাড়িত হইলেন, সেই গৌরবের স্থানটি একজন অনাত্মীয় প্রতিবেশিনী মাত্র কেমন বিনা-আপত্তিতে দখল করিয়া বসিল। মুরলার নূতন আবেগের জোয়ারটাই শুধু হ্রাস পাইল না, তাহাতে ক্রমে ভাঁটা পড়িতেও সুরু করিল। তাহার ধারণার বেগটা

এখন যেন একেবারে উল্টা দিকে ফিরিল। মুরলার সম্মান ও শ্রদ্ধা নেড়া-বোঁচা বিধবা বড়বৌয়ের প্রতি বিমুখ হইয়া এখন ঐ রত্নাভরণা বরণকারিণীর দিকেই উন্মুখ হইয়া উঠিল। আবার একি! এ যে সেই শ্যামাকান্তেরই আভিনয়িক কণ্ঠ! বরণের শেষভাগে পাশের বৈঠকখানা হইতে সহসা সেইরূপ একটা আবৃত্তির হিল্লোল আসিয়া উদ্ভ্রান্ত মুরলার কর্ণে আঘাত করিল। কিন্তু এর সুর যে সম্পূর্ণ আলাহিদা, এর গতি একেবারেই বিপরীত। এটাও শ্যামাকান্তের মনগড়া—নিজের কথা নয়। সেই প্রকাণ্ড দার্শনিক বক্তারই সমাজতত্ত্বের অন্যতর ব্যাখ্যা। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় সমস্ত দেবত্ব সধবাদের ঘাড়েই চাপান হইয়াছে, বিধবাদের জন্য তাহার গুঁড়ো-গাড়াও রাখা হয় নাই,—এক্ষেত্রে বক্তার মতে বিধবারা একজাতীয় অভিশপ্ত নিকৃষ্ট প্রাণীমাত্র। সমাজের সেবা ও দাসীত্ব করাই তাহাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট কাজ। তবে এইরূপ পূজা-পার্ব্বণের ফলে তাহাদের অভিশাপের তীব্রতা ক্রমে কমিয়া আসে। জন্ম-জন্মান্তরের এইরূপ সুকৃতির ফলে তাহারা ক্রমে শাপমুক্তও হইতে পারে। বড়বৌয়ের এই পূজার মূলে শ্যামাকান্তের শাস্ত্রব্যাখ্যার ঐরূপ একটু প্রয়োচনাও নাকি ছিল।

মুরলার মনের গজকচ্ছপী যুদ্ধটা এবারে যেন একেবারে মিটিয়া গেল। গজটা তাকে আর শুঁড়ে তুলিল না, কচ্ছপটাও তাকে আর নীচে টানিল না। কোথা হইতে এক খগেশ্বর আসিয়া যেন দুইটাকে প্রখর নখে ফাড়িয়া ফেলিল। মুরলা দেখিল, ব্যাখ্যাতার নিপুণ তুলিকায় শাস্ত্র জিনিষটা ধরিতে পারে না, এমন হং নাই। উহার প্রসন্ন ও রুদ্র দুইটা রূপ হইতেই মুরলা এবার তাহার দৃষ্টিটাকে যেন একটানে ছাঁড়িয়া লইল। অন্যের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া এবার নিজেই সিদ্ধান্ত করিল, সে অবতীর্ণা দেবীও নয়, কিংবা অভিশপ্ত জীবও নয়, সে একজন মানুষ মাত্র। এখন এই মানুষটার গন্তব্য পথ কি?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুরলার চিত্তের গতি যখন এই প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন তাহার বাহুমূলে কাহার স্পর্শে সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে ফিরিয়া চাহিতেই তাহার চোখের সামনে সেই সন্ধ্যার মালিন্যের মধ্যে যেন খানিকটা জ্যোতি ঠিকরাইয়া উঠিল। মুরলা তাহার মনের মধ্যে যেন সেই জ্যোতির্ম্ময়ীকে তখনই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া বিস্ময়ে বলিয়া ফেলিল,—"তুমি কে গা?"

জ্যোতির্ম্ময়ী এবার তাহার সুবর্ণের জ্যোতির উপর যেন মুক্তার প্রতিবিম্ব ফেলিয়া সহাস্যে বলিল,—"বাবা আমার নাম রেখেছিলেন শেফালিকা, এখানকার লোকে বলে ভাদুড়ী-বৌ।"

মুরলা শ্যামাকান্তের কথায় এতটা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বয়ং বরণকারিণী ভাদুড়ী-বৌ তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এটা পর্য্যন্ত তাঁর খেয়ালে পৌঁছে নাই। ভাদুড়ী-বৌয়ের

সঙ্গে মুরলার তেমন ঘনিষ্ঠ আলাপ না থাকিলেও, তাহারা পরস্পরে নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। মুরলা একটু যেন লজ্জিত হইয়াও আমন্ত্রণকারিণীর মত সহাস্যেই কহিল,—

"আপনাকে না চেনা বড়ই বেয়াদবি, বিশেষতঃ আজকার দিনে।" মুচ্‌কি হাসির সঙ্গে উত্তর আসিল,—"তোমাদের পাঞ্জিপুথি দেখে লোক চিন্‌তে হয় নাকি?" প্রত্যুত্তর হইল,—"মঙ্গলবার খুঁজতেই হাতে পাঁজি দরকার হয়, কিন্তু মঙ্গল মূর্ত্তি চিন্‌তে নিজের চোখ দুটোই যথেষ্ট।"

মুরলার মনটা এখন একেবারে যেন খালি হইয়া পড়িয়াছিল, ছোট বড় কোনরকম প্রবৃত্তিই তখন সেখানে যেন বড় ভাল ছিল না। শেফালিকার এই প্রতিপত্তিতে তাহার মনে কোন হিংসা বা বিরাগ জন্মে নাই, আবার বিশেষ কোন ভক্তি বা অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহাও নয়। তবে সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, ব্যাবর্ত্তন অপেক্ষা ভাদুড়ী-বৌয়ের প্রতি একটা আবর্ত্তনের ভাবই যেন মুরলার হৃদয়ে অল্প চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। যাইহোক মুরলা কথাটা বেশ সরলভাবেই বলিল।

শেফালিকা এই সহজ কথাটার একটা সহজ ব্যঙ্গ করিয়া কহিল,—"এই মঙ্গলমূর্ত্তি দেখেই বুঝি এতটা তন্ময় হয়ে উঠেছিলে?" মুরলা বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দিল,—"না, শুধু দেখে নয়, তার ব্যাখ্যান শুনেও।"

"তা হলে চোখ আর কান দুটোকেই ঠকিয়েছ, দেখ্‌ছি।"

শেফালিকার এই নিরলঙ্কার আত্ম-অনাদরে তাহার প্রতি মুরলার টানে আরও একটু যেন জোর ধরিল। মুরলা এবার ভাদুড়ী-বৌয়ের বাহুমূল ধরিয়া একটু যেন গম্ভীরভাবে কহিল,—"না বৌদিদি, আমার চোখ ও কান কোনটাই এমন বেহুস নয়। চোখ যে ঠকেনি, তার প্রমাণ এই মুঠোর মধ্যেই। আর কান যে ঠকেনি, তার প্রমাণ তোমার কানও বোধ হয় কিছু পেয়েছে।"

"সোনা বলে যা মুঠো বেঁধেছ, আসলে সেটা যে একেবারেই পেতল। আর কানের প্রমাণ, ও ত হাওয়ার কাজ, ওটা বদলাতে আর কতক্ষণ।"

মুরলা এবার একটু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটা কি খুবই বদলায়, বৌদিদি?"

শেফালিকা সহজ ভাবেই উত্তর দিল,—"হরদম, হাওয়া আবার কখন স্থির থাকে?"

"না, ঠাট্টা নয়, ভাদুড়ীদাদার ঐসব কথাগুলো নিশ্চয় তোমার শুন্‌তে বাকি নেই। ওগুলো তোমার মনে কেমন লাগে বল ত?"

"আমার বোন ওসব দেবত্ব-দানবত্ব বোঝ্‌বার বিদ্যেও নেই, ইচ্ছেও নেই।"

"বিশ্বাসও নেই বোধ হয়?"

"ওসব বিশ্বাস করায় বিশেষ ফল ত দেখি নে।"

গ্রহর খানেক পূর্ব্বে শেফালিকার মুখে এই উত্তর শুনিলে, মুরলার মনটা এমন উত্তর-দায়িনীর প্রতি নিশ্চয়ই দারুণ অবজ্ঞায় ভরিয়া উঠিত। কারণ ঐরূপ একটা বিশ্বাসের উপরেই মুরলার জীবনটা তখন সগর্ব্বে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক দণ্ডের অভিজ্ঞতায় তাহার

বিশ্বাস ও গর্ব্ব দুইটাই একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে। সে নিজের মনের মধ্যে এখন শেফালিকার ঐ অবিশ্বাসের বেশ একটা সমর্থনেরই যেন সাড়া পাইল।

শেফালিকার অবিশ্বাসের যেন দৌড় দেখিবার জন্য মুরলা এবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা ঐ দেবব্রতদাদাকের কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু এই মঙ্গল-অমঙ্গলের ব্যাপারটা? যা নিয়ে এইমাত্র এমন একটা হুলস্থুল কাণ্ড হয়ে গেল।"

শেফালিকা একটু না ভাবিয়াই উত্তর দিল, "ওটাও ছাড়লে, ক্ষতি কি?"

শেফালিকার এই উত্তরে মুরলা যেন একটু বিস্মিত হইয়া বলিল,—"ওটাও ছাড়া মানে বুঝতে পারছ ত, বড়বৌয়ের হাতে বরণডালা ছেড়ে দেওয়া। এতটা করতে সাহস পাও?"

শেফালিকা মৃদুহাস্যে বলিল, "কেন, আমি ত এটাকে একটা-কিছু দুঃসাহস বলে মনে করিনে। বড়বৌয়ের বরণটা বাসন্তী দেবীর কাছে কেন যে অগ্রাহ্য, তার কারণ ত আমি খুঁজে পাই নে।"

বিধবার প্রতি শেফালিকার এই ঔদার্য্য ও সহানুভূতি দেখিয়া মুরলার মন এবার যেন বড়ই ভিজিয়া গেল। তবু সে একটু ঠাট্টা করিয়া কহিল,—"বৌদিদি, তোমার বাবা শুনেছি কল্‌কাতায় কাজ করতেন! তুমি ব্রাহ্ম ইস্কুলের ছাত্রী বুঝি?"

শেফালিকার মুখে হাসিটুকু ছাড়া নাই। সে নিজের বেশভূষা দেখাইয়া সহাস্যে কহিল,—"না বোন, অত বিদ্যা থাকলে, আর এই অবিদ্যার বোঝা বয়ে মরি।"

মুরলার মন শুধু শেফালিকার অন্তরের দিকেই নয়, তাহার বাহিরের ঔজ্জ্বল্যেও বেশ যেন একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল। মুরলা একটু প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—"না না, ওসব তোমার দেহে ত বোঝার মত দেখাচ্ছে না। বেশ সুন্দর মানিয়েছে।"

দেহের সৌন্দর্য্যে মুরলা শেফালিকার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। শেফালিকা উদার চক্ষে তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"তোমার দেহে যদি এ সব উঠ্‌তে পেত, তবে গুণগুলোর শোভা আরও অনেক গুণই যে বেড়ে যেত।"

মুরলা শেফালিকার এই কথার যেন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে কি-যেন একটা নিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফুলিয়া উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া গেল। অবশ্য এই নিশ্বাসের কোন নিদর্শন বাহিরে ধরা পড়িল না। তাহা হইলেও মুরলাকে একটু নীরব দেখিয়া শেফালিকার অমনই মনে হইল, আমোদের বশে সে বুঝি একটু বেফাঁস কথাই বলিয়া ফেলিয়াছে।

তাহারা উভয়ে উভয়ের ত্রুটিটুকু শোধরাইবার আগেই একটু দূর হইতে রায়বুড়ী গর্জ্জিয়া উঠিল,—"আর দেরি নয় গো, সন্ধ্যে ঘনাল।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বাহিরে সন্ধ্যা ত ঘনাইল, কিন্তু মুরলার অন্তরে যাহা এখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, সেটাও যে ঐ সন্ধ্যার মতই অনেকটা ঘোলাটে। তার জীবনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সত্যই তাহার সেই নূতন উন্মাদনা একটা বিদ্যুতের মত খেলিয়াই যে শেষ হইয়া গেল। তাহার মনের এখন যে অবস্থা দাঁড়াইল, সেটা ঐ বিদ্যুৎচমকের পূর্ব্বের অবস্থার চেয়েও যেন বেজায় গোলমেলে। মুরলা তখন পারুক আর নাই পারুক নিজের চিরাভ্যস্ত বৈরাগ্যের খোঁটাগুলি দিয়া তাহার সেই কাব্যালাপসমুত্থিত ঝটিকার মধ্যে নিজেকে সংরক্ষিত রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এই নূতন উচ্ছ্বাসটা সেই পুরাতন অভ্যাস-ভূমিকে ছাপাইয়া শেষে উচ্ছ্বাসিতাকে এমন আছড়াইয়া ফেলিয়া গেল, যাহাতে তাহার সেই পুরাতন খোঁটাগুলি পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িল।

এখন ঐ প্রতিমার দেবীত্বের মত মুরলার দেবীত্বেরও বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। প্রতিমার মত সেও যেন এখন কেবল খড় আর মাটি, দেবীত্বের দাবি তাহার আর মোটেই নাই। মুরলা নিজেকে যে বর্ণের বৈচিত্র্যে প্রতিমার মত ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এখন ঘটনার তীব্র স্রোতে ধুইয়া গিয়া তাহার আসল কাটাম যেন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সে আর কোটী কণ্ঠের স্তুতি শুনতে চাহে না, তাহার চারিদিকে শুধু গ্রীষ্ম ঋতুর তপ্ত বাতাসই বহিতেছে তাহাতে ধূপ-ধূণার সুরভির আর লেশমাত্রও নাই। তাহার কানের ভিতরে তাহার অবিরত ঘণ্টাধ্বনিটা বোস-গিন্নীর কঠোর হুঙ্কারে আর বড়বৌয়ের করুণ চীৎকারের মধ্যে যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছে।

এইরকমে মুরলা তাহার গৌরবমণ্ডিত মঞ্চ হইতে নামিয়া আবার মাটির উপরেই ভর দিয়া দাঁড়াইল। তার জীবনের সঙ্গীতটা একটা যেন আসমানের সুরের ভিতর একটু ঘুরপাক খাইয়া আবার সেই চিরাভ্যস্ত মর্ত্ত্যের সুরেই বাঁধা পড়িল। এই কয়দিন যেন আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া তার নজর ঘরকন্নার দিকে কম পড়িয়াছিল, মুরলা এখন আবার সাংসারিক কাজ-কর্ম্ম বেশ দস্তুর মতই সম্পাদিত করিতে লাগিল। সংসারের সঙ্গে সংসারের আশা-আকাঙ্ক্ষা হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ আবার সবই তাহার কাছে পূর্ব্বের মত আসিয়া জুটিল।

শ্যামাকান্তের সেই প্রকাণ্ড দার্শনিকের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটায় মুরলা বিশ্বাস হারাইলেও বাস্তবিক সে একটা নাস্তিক হইয়া উঠে নাই। সে এখনও সমস্তই যথাজ্ঞানে ও যথারীতি পালন করে। পূর্ব্বের মত পূজা-মানত ব্রত-উপবাস বিধি-ব্যবস্থার পালনে মুরলার তেমন কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। তবে এগুলো আগে যেমন এখনও তেমনই কলে-ফেলা রকমই রহিয়াছে। তাহাদের ভিতর কোন নূতন প্রাণের সঞ্চার ত হয়ই নাই বরং যেটুকু ছিল, তাহাও যেন কিছু কমিয়াছে। মুরলা যেমন একদিকে বাহিরের কোন বিধি-ব্যবস্থার অপালন করে না, অন্যদিকে তেমনই সে অন্তরের কোন প্রবৃত্তিকেও বড় অপালন করে না। একাদশীতে সে নিরম্বু উপবাসী থাকিয়াও সরোজের কাব্যালাপে আবার বেশ স্বচ্ছন্দেই যোগ দেয়। আলোচাল ও কাঁচা

কলার নিয়মিত বৈরাগ্যে কখন কোন ত্রুটি না ঘটুক কিন্তু তাহা হইলেও শেফালিকার ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি মুরলার মনে সর্ব্বদাই যেন একটু আকাঙ্ক্ষা আছে। সে হরির লুটের বাতাসা পয়লাটা যথারীতি কপালে ছোঁয়াইয়া তুলিয়া রাখে, আবার সেই সঙ্গে ভূতী বেদেনীর তুক-গুণকেও সে যে একেবারে অমান্য করে, তাহা নয়।

এখন মুরলার কাছে ভাল আর মন্দ দুইটাই যেন খুব তীব্র রকমে ভাল আর মন্দ নয়। ভালর প্রতি তাহার কোন তীব্র অনুরাগ নাই, মন্দের প্রতিও তাহার কোন তীব্র বিরাগ নাই। ভালকে মান্য করে বলিয়া মন্দকে অমান্য করিবার তাহার তেমন প্রবল চেষ্টা ত বড় লক্ষিত হয় না। সরোজের সংস্রবটা তাহার কাছে মন্দ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া সে নিজেকে সেই সংস্রব হইতে যথাসাধ্য দূরে রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু এখনও সেই সংস্রবটার প্রকৃতি একটুও বদলায় নাই, তথাপি তাহার প্রভাবের মধ্যে নিজেকে না ফেলিতে মুরলা ত তেমন আর বিশেষ যত্নবতী নয়। আগে তার এই মনের ঝোঁকটা মনের ভিতরেই বেশ সামলান ছিল, এখন যে সেটা তাহার লক্ষ্যের দিকে বেশ মুক্তভাবেই উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে, আর ইহার ফলে লক্ষ্যটাও যেন বড় অবিচল নাই, এ সব জানিয়াও মুরলার সংযমে তেমন রুচি কৈ?

মুরলার সেদিনকার সেই অপ্রত্যাশিত স্বচ্ছন্দতায় সরোজের মনে যে একটা খটকা লাগিয়াছিল সেটার তিরোভাব তাহার আবির্ভাবের মত একটুও আকস্মিক হয় নাই। সরোজের এই খটকার ভিতরে শুধু একটা কৌতূহল মাত্র থাকিলে এই খটকাটা সম্ভবতঃ তেমন স্থায়ী হইত না, আর কিছু স্থায়ী হইলেও ইহাতে কোন বিস্ফোট অবশ্যই ঘটিত না। কিন্তু ইহার ভিতরকার সেই করুণ ভাবটা ইহাকে যেমন স্থায়ী করিয়া তুলিল, তেমনই একটা বিষম গোলযোগ পাকাইয়া বসিল। মুরলা যে-কয়দিন তার নূতন ভাবের ঘোরে ছিল, সে-কয়দিন সরোজেরও খটকার ঘোর তেমন কাটে নাই। এই সময়ে মুরলা তাহার কাছে ছিল অনেকটা জটিল সমস্যার মতই। কিন্তু যখন মুরলার মনের উপর হইতে তার সেই নূতন উন্মাদনার ছাপ উঠিয়া গিয়া তাহার আসল মূর্ত্তি সরোজের সামনে ব্যক্ত হইয়া পড়িল, তখন সরোজ প্রথমটা বড়ই যেন হতভম্ব বনিয়া গেল।

তাহার সেই কাব্যচর্চ্চা যে শেষে এমন বিপর্য্যয় ঘটাইবে, এটা যদি সে জানিত, তবে নিশ্চয়ই সেই চর্চ্চার প্রতি তার প্রবল অনুরাগসত্ত্বেও সরোজ বেদান্তবাগীশের বাড়ী কখন মাড়াইত না। অবশ্য এটা হইল সুবুদ্ধির কথা, কিন্তু তাহার মনটা এখন যে জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেটা ত আর বুদ্ধির এলাকা নয়, সেটা যে একেবারেই ভাবের রাজ্য। মুরলার সেই অপ্রত্যাশিত আচরণে সরোজের চিত্তে শুধু একটা কৌতূহল মাত্র না জাগিয়া যে করুণা বলিয়া জিনিষটা দেখা দিয়াছিল, সেটা এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই কিছু সন্দেহজনক। এই জিনিষটা একটু গাঢ় হইবার সুযোগ পাইলে, অমনই সেটা একেবারে অনুরাগের কোটায় গিয়া পড়ে – সরোজের ভাগ্যে ঘটিলও তাহাই। মুরলার হৃদয়ের টান অনুভব করিয়া তাহার নিজের হৃদয়েও নীচ একটা যেন টান পড়িল। সরোজের এই টান ক্রমে মুরলার টানের চেয়েও বিশেষ প্রবল হইয়াই দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

রবীন্দ্র বারমাস্যা

ফাল্গুন

ও আমার চাঁদের আলো
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে ॥

কৃষ্ণচূড়া চূড়ার সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,
শিরীষ তোমার ভরবে সাজি
ফুটেছে সেই আশে।

কমল বনের মধুপরাজি
এসছে কমল-ভবনে।
কি সুধাগন্ধ এসেছে আজি
নব বসন্ত পবনে ॥

বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন,
কহিছে দুখিনী রাধা—
কঁহিরে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদি-বসন্ত সো সাধা ?

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বোলে
আগে পাগল করে।

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরুপরে
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে ॥

তুমি কি বসেছ আজি নব বরবেশে সাজি,
কুন্তলে কুসুমরাজি অঙ্গে ল'য়ে বাস ?
ভরিয়া আরতি-থালা জ্বালায়েছে দীপমালা
সাজায়েছ পুষ্পডালা নূতন নবীন,
আজি বসন্তের দিন ॥

৮। ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিণ বাতাস মরিছে বুকের পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা সারী,
দুয়ার সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী ॥

ফাগুন লেগেছে বনে বনে,—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।

১০। তখন ছিল দখিন হাওয়া আধ্ ঘুমো আধ্ জাগা,
তখন ছিল শর্ষে ক্ষেতে ফুলের আগুন লাগা ;
তখন আমি মালা গেঁথে পদ্ম পাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলেম রুদ্ধ কুটীর থেকে ॥

১১। শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।

বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা ; কেহ বা ভরিত ডালা,
করিত দক্ষিণ বায়ু অকূল আকুল ॥

দক্ষিণে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,
উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শুভ্র কেশ,
কোন্ পথে যাবে না পায় উদ্দেশ,
হয়ে যায় দিকভুল।

ক্লান্ত বালক হেসেই কুটিকুটি,
টল্‌মল করে রাঙা চরণ দুটি,
গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটি ছুটি
বনে লুটোপুটি যায়॥

গন্ধে উদাস হাওয়ার মত
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার দুরুদুরুর মঞ্জরী॥

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা,
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া আগুন-জ্বালা!

আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে॥

সবুজ নেশায় ভোর করেছিল ধরা,
রাতের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস্ আকুল-করা
আপন গলার বকুল মালাগাছা,
আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা!

ঝরঝর ঝরে' ঝরে' পড়ে ফুল
ছুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ধূতুর থালি হতে।

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জ-বীথিকায়,
এই যে আমার জীবন-সতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরণ হৃদয়-ব্যথার মত।

তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বসন্তের জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ
ওই খেয়াঘাট
ওই নীল নদী-রেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিস্তব্ধ জলের ধারে চখাচখী কাকলী-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি:
কতদিন দেখিয়াছে কবি।

আজি মলয় আকুল, বনে বনে একি গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী।

জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
নবীন বাসনা ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হ'ল জীবন্ত!

আয়লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত ল'য়ে,
লাবণ্য ফুটাবিলো তরুতলায়।

এস এস বসন্ত ধরাতলে।
আন কুহুতান, প্রেমগান,
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।

মধুর বসন্ত এসেচে মধুর মিলন ঘটাতে,
মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে।

২৭। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখী গায়,
সখীর হৃদয় কুসুম-কোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে' যায়!

কমল-বনের মধুপরাজি এসেছে কমল-ভবনে।
কি সুধাগন্ধ এসেছে আজি নব বসন্ত-পবনে॥

২৯। সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার।
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার॥

আজি বসন্ত নিশা আজি অনন্ত তৃষা,
আজি এ জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকোর সমান
গীত সুধার তরে ॥

বিধুর বিকল হয়ে ক্ষ্যাপা পবনে,
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে ।

৩২ । নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব ।
অতি মধুর, অতি মধুর গুঞ্জন কুঞ্জে,
অনিবার, অতি মর্ম্মর পল্লব-পুঞ্জে ।

বসন্ত-পরশে বন শিহরে,
কি জানি কোথা পরাণ-মন ধাইছে বসন্ত-সমীরণে ।

আজি বসন্ত-রাতে পূর্ণিমা-চন্দ্র-করে,
দক্ষিণ পবনে, প্রিয়ে,
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ।

৩৫ । হায় রে সেই ত বসন্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায় ।
সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে যায় ॥

৩৬ । নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে,
জগত-জন-হৃদয়ধন, চাহি তব পানে ।

৩৭ । আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে ।

৩৮ । একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে,
আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে ।

ফাল্গুনে যে বান ডেকেছে মাটির পাথারে,
তোমার সবুজ পালে লাগ্‌ল হাওয়া
ভেসে এলে আমারে ॥

বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে এল আমার বাতায়নে,
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গনে ॥

বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু'চারটি তার পাতা,
তবুও যে তার বাকি রইত কত ॥

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা।
বুকের পরে দোলেরে তার পরাণ-পুতলা ॥

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো, পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত যে রঙীন বেশে ধরায় সেদিন অবতীর্ণ ॥

কার হাতে এই মালা তোমায় পাঠালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।

গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে ॥

আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে
তোমার বসন্তবায় নাই কিগো তাই বলে ?

ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে,
গোলাব জবা পাকল পলাশ পারিজাতের বুকের পরে ॥

তব ফাল্গুন যেন আসে আজি মোর পরাণের পাশে,
দেয় সুধারস ধারে-ধারে মম অঞ্চল ভরি ভরি ॥

ফাল্গুনে সে পিয়াল-তলায় কে জানিত কোথায় পলায়,
দক্ষিণ হাওয়ার চঞ্চলতার সনে ॥

গাঁথিতে যে আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা,
তাহারি পরশন হরষণ-সুধা ঢালা
ফাগুন আজো ঘেরে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে।

ফাল্গুনের, সুরু হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত,
তারা আজ কেঁদে শুধায়
সেই ডালে ফুল ফুটল কিগো ?
ওগো কও ফুটল কত ?

গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে
আগে ফাগুন সমীরণে
শুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে।

ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে ?
বাণী তার বুঝিনারে ভরে মন বেদনাতে।

এক ফাগুনের গান সে আমার
আর ফাগুনের কুলে কুলে
কার খোঁজে আজ পথ হারাল
নতুন কালের ভুলে ভুলে ?

• •

এক ফাগুনের মনের কথা
আর ফাগুনের কানে কানে
শুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায়
"মোর ভাষা আজ কেউ কি জানে ?"

তোমার ফাগুন দিনের বকুল চাঁপা, শ্রাবণ দিনের কেয়া,
তাই দেখে ও শুনি তোমার কেমন যে তান দেয়া।

বসন্ত আওল রে।
মধুকর গুণগুণ, মুকুলা মঞ্জরী
কানন ছাওল রে !

তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি' উঠে।

ফুল-নিকুঞ্জ-মাঝ
এস আজি ঋতুরাজ,
ভেঙে দাও সব কাজ
প্রেমের মোহন মন্ত্রে।

নবীন ফাল্গুন-দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মুক্ত অধীর।

ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মূরছি পড়ে অবনী।

একদা ফাগুনে সন্ধ্যা-সময়ে সূর্য্য নিভেছে ছুটি,
পূর্ব্ব গগনে পূর্ণিমা চাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি।

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে
মত্ত কুতূহলী,
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণ দুয়ার
মর্ত্ত্যে এলে চলি।

ফাল্গুন মাসে ঘরের টানাটানি,
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর।

৬৩। ফাগুন মাসে ঘর দেখে'
যুবারা যাক্ বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্য-সাধন,
থাকুক্ রত কঠিন ব্রতে!

কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে।

ফাগুন মাসে অশোক-ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হতে বাতাসটুকু,
তেম্‌নি লাগে মিঠা।

৬৬। আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে, সেই
মনে জাগে।

৬৭। মোরা নব-নবীন ফাগুন রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি' অশোকবনে
শিখিপুচ্ছ শিরে।

৬৮। ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমাতে
যে নিয়মটা চলে,
রাগ কোরো না চৈত্র মাসে
সেটা ভঙ্গ হলে।

আঁধার কিছু নাইক আজিনাতে,
আজ্‌কে আকাশ ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আলোয় আলোময়।

বহুদিন হল কোন্ ফাগুনে
ছিনু আমি তব তরসায়।
এলে তুমি ঘন বরষায়।

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে'
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার!

ফাগুন মাসে দখিন হ'তে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।

ফাগুন রাতে কুঞ্জবিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে।

ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাইনা,
যাহা চাই তাহা ভুল করে' চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

কহিছে সে—হায় হায়,
বেলা যায় বেলা যায় গো
ফাগুনের বেলা যায়।

ফাল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হ'তে
মাঝে মাঝে রহি' রহি'
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হ'তে
অপূর্ব্ব আশা বহি'।

সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদ-বিহ্বল শোভাতে।

৭৮। কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে!

ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে হবে ফাঁকি
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।

বনে তোর লাগাস্ আগুন
তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তোর ভস্ম পরে মরিস্ যুঝে॥

তোমার বিশ্বে জড়িয়ে থাকে
আমার চাওয়া পাওয়া!
ভরিয়ে তোলে নিত্যকালের
ফাল্গুনেরি হাওয়া!

৮২। বিরহী তোমার লাগি'
আছি জাগি'
দক্ষিণ বাতাসে
ফাগুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

৮৩। একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চ হাস্য অগ্নিরসে ফাগুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি।

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জ-বীথিকায়
এই যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরণ হৃদয়-ব্যথার মত।

খুসি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ আভাসে।
খুসি, তোমার ফাগুন বনে আকুল হয়ে পড়ে
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।

আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগ কাগুন গুণ গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে।

বিধুর বিকল হয়ে ক্ষ্যাপা পবনে
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সঙ্কলিত।

চীন সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ত্ব

চীন দেশের লোকেরা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চুম্বকের ব্যবহার আবিষ্কার করেন ; ইহাতে তাঁহাদের সমুদ্রযাত্রার প্রসার খুব বাড়িয়া যায়। এমনও শুনা যায় যে তাঁহারা ৫০০ খৃষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রসারণের ফলে অনেকে বুদ্ধদেবের দেশ ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য তীর্থযাত্রায় আসেন। এইরূপ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অনেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অমূল্য বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াগিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে ফাহিয়ান (399—414) এবং হুয়েন সাঙ্ অথবা ইউয়ান্ চঙ্গের (629—45) নাম সর্ব্বজনবিদিত। ইঁহারা উভয়েই উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যটন করেন। ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং হুয়েন সাঙ্ আবার পাঞ্জাব হইতে মধ্য এশিয়ার পথে ফিরিয়া যান। ইঁহাদের বিবরণ অনেক হিসাবে অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য হইলেও এইসকল বিবরণ হইতে তথ্য সংগ্রহে অনেক অসুবিধাও আছে। প্রথমতঃ তাঁহারা 'যোজন' 'লি' হিসাবে স্থানের দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে 'যোজন' এবং 'লি'র পরিমাণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে। দিকনির্দ্দেশের সময় তাঁহারা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারিটি দিক মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। উত্তর-পূর্ব্ব, উত্তর-পশ্চিম ইত্যাদির উল্লেখ ফাহিয়ানের বিবরণে ত নাই-ই,ইউয়ান চোয়াঙের বিবরণেও কদাচিৎ দেখা যায়। দূরত্ব নির্দ্দেশে তাঁহারা 'যোজন' বা 'লি'র ভগ্নাংশ ব্যবহার করেন নাই, এইসকল কারণে তাঁহাদের বিবরণে কোন স্থলেই সূক্ষ্ম হিসাব পাওয়া যায় না।

ইৎসিঙ্ নামে এক পর্য্যটক আসিয়াছিলেন ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি তাম্রলিপ্তি বন্দরে অবতরণ করিয়া নালন্দা, গৃধ্রকূট, বুদ্ধগয়া, বৈশালী, কুশীনগর, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী ইত্যাদি স্থান পর্য্যটন করিয়া আবার তাম্রলিপ্তি বন্দর দিয়াই নির্গত হইয়াছেন। তাঁহার বিবরণ ইংরাজিতে অনূদিত হয় ডাক্তার টাকাকুসেনের দ্বারা ১৮৯৬ সালে, কাজেই কানিংহাম সাহেব তাঁহার Ancient Geography of India লিখিবার সময় এই গ্রন্থ দেখিতে পান নাই।

আরও তিনজন পর্য্যটকের নাম পাওয়া যায়,—সুঙ-ইয়ুন্ ৫০২খৃষ্টাব্দে, হুই-সেঙ্ ৬০০খৃষ্টাব্দে এবং ও কুঙ্ ৮০০ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ইঁহাদের বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত। পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং কাবুল উপত্যকার কিছু কিছু পরিচয় ইঁহাদের বিবরণে পাওয়া যায়।

চীনদেশে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম পরিচয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় হানবংশের প্রসিদ্ধ সম্রাট হুঙ্-তির রাজত্বকালে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এই সময় ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট ইয়ান-তু বা ইন্-তু অথবা শিন্-তু বা সিন্ধু বলিয়া পরিচিত ; পরে এই নাম তিয়ান-চুতে পরিবর্ত্তিত হয়।

সেই যুগে মধ্য এসিয়াই ছিল সমস্ত সভ্যতার মিলনভূমি। গ্রীক, রোমীয়, মিশরীয়, সীরিয়, ভারতীয় সকলেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আরও নানা প্রকার কর্ম্মকেন্দ্র হিসাবে বহুকাল হইতেই মধ্য এসিয়ায় আসিয়া মিলিত হইতেছিলেন। যে চীনারা এ পর্য্যন্ত নিজেদের গণ্ডীর বাহিরে আসেন নাই এই যুগে তাঁহারাও মধ্য এসিয়ার বিরাট কর্ম্মকেন্দ্রে আসিয়া দেখা দিলেন। সম্রাট হ্বুতির আমলেই প্রথম চীন-অভিযান মধ্য এসিয়ায় প্রেরিত হয়। সেকেন্দর সাহের অভিযানের ফলে ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের যে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয় তাহারই পরিণতিতে এই যুগে স্থলপথে এবং জলপথে রোমীয়দের সহিত ভারতবর্ষের কারবার চলিতেছিল। আর মধ্যএসিয়ার ভারতীয় ভাষা, লিপি, সাহিত্য, দর্শন শিল্পকলা, ধর্ম্ম, টোল সবই এতটা সুপ্রচলিত ছিল যে এই সময়কার মধ্য এসিয়াকে ভারতবর্ষের একটা প্রদেশমাত্রও বলা যাইতে পারে। হ্যান বংশেরই সম্রাট মিঙ-তি মধ্য এসিয়ায় এক অভিযান প্রেরণ করেন, সেই অভিযানেরই ফলে সংস্কৃত পুঁথি, বুদ্ধমূর্ত্তি এবং শাক্যসিংহের মত চীনে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় (খৃঃ—অঃ ৬৭)। হ্যান আমলেই চীন হইতে পশ্চিমে চসিয়ামাইনর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বাণিজ্য-পথ প্রসারিত হইয়াছিল। "পূর্ব্বচীন" বংশের (খৃঃ—অঃ ৩১৩—২১৯) আমলে প্রসিদ্ধ চীনপর্য্যটক ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আসেন। ভারতমণ্ডল হইতেও বহু প্রচারক চীনে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে কুমারজীবের নাম সর্ব্বপ্রসিদ্ধ।

(Lian) বংশ (৫০২—৫৭)

"এই আমলে ভারতবর্ষের সহিত চীনের আদান-প্রদান প্রচুর পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। এই বংশের প্রধান নরপতি হ্বুতি যৌবনে কন্‌ফিউশিয়াস-ভক্ত ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে ভারতীয় মহাত্মার শরণাপন্ন হন। তিনি গুপ্ত সম্রাটের নিকট লোক পাঠাইয়া স্বদেশে বৌদ্ধ সাহিত্যের আমদানি করেন। তাঁহার অভিযান জলপথে প্রেরিত হইয়াছিল।

সিংহল দ্বীপে তখন চীন ও ভারতের জলবাণিজ্যের প্রধান আড়ত ছিল। দক্ষিণাপথের রাজপুত্র বোধিধর্ম্ম এবং উজ্জয়িনীর পণ্ডিত পরমার্থ হ্বুতির রাজত্বকালে জলপথে চীনে উপস্থিত হন। দুইজনেই ক্যাণ্টন বন্দরের ষ্টেশনে জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন। বোধি-ধর্ম্ম চীনা বৌদ্ধ-মহলে প্রসিদ্ধ। তাঁহার ধ্যান-ধারণা এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। চীনা চিত্রকলায়ও বোধি-ধর্ম্মের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।*

সুই বংশ (Suy) (৫৮৯—৬১৯)

এই বংশের প্রবর্ত্তক হ্বুতি উপাধি গ্রহণ করেন। এই আমলে চীনে নাকি ভারতীয় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। একমাত্র এই তথ্য হইতেই হিন্দুপ্রভাবের পরিমাণ করা যায়।

তাঙ বংশ (৬১৮—৯০৫)

এই বংশের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ সম্রাটের নাম তাইচুঙ (৬২৭—৬৫০খৃঃ) এক হিসাবে

---

* চীনাসভ্যতার অ, আ, ক, খ,। শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

তাই-চুঙই সর্ব্বপ্রথম সম্রাট পদবাচ্য। এতকাল চীনসাম্রাজ্য বলিতে চীনমণ্ডলেরই ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্য সমূহের সমষ্টি বুঝাইত; বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য বলিতে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি লইয়া যে সমষ্টিগত রাজ্যের পরিচয় পাই তাই-চুঙের পূর্ব্বে তাহা কখনও ছিল না। চীনমণ্ডলের প্রথম ঐক্যসংস্থাপক যে সম্রাট শি-হোয়াংতি উপাধি গ্রহণ করিয়া (খৃঃ-পূঃ ২২১) দৃপ্ততেজে দেশময় নিজের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া প্রকৃত চীনরাজ্যের পত্তন করেন তিনিও খাঁটি চীনমণ্ডলটুকুর অধীশ্বর হইয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। তাই-চুঙই সর্ব্বপ্রথম বৃহত্তর চীনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার আমলেই চীনরাজ্য প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্য পদবাচ্য হইল। "এই তাই-চুঙই ভারতবর্ষ-পরিব্রাজক প্রসিদ্ধ য়ুয়ান-চোয়াঙ্-এর আশ্রয়দাতা এবং সংরক্ষক। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ মধ্য এসিয়ার পথে ভারতবর্ষে আসিয়া আবার সেই পথেই ফিরিয়া যান। মধ্য এসিয়া তখন বৃহত্তর চীনেরই অংশমাত্র—কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার হিসাবে মধ্য এসিয়া তখনও বৃহত্তর ভারতের অন্যতম কেন্দ্র।"

'চীনের তাঙ্ আমল ভারতীয় প্রভাবের আমল। কাজেই এই যুগের সকল চীনা গ্রন্থেই ভারতবর্ষকে পাইব—কোথাও মুখ্যভাবে কোথাও গৌণভাবে। ভারতবর্ষ চীনকে কেবল ধর্ম্মপ্রদান করে নাই—সমগ্র ভারতীয় সভ্যতারই নানা অঙ্গ প্রদান করিয়াছিল।" *

তাঙ্ আমলের সরকারী কাগজ-পত্রে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং মধ্য প্রদেশ। এই বিভাগের কথা ৪৭৭ সালের বিবরণেও পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে এইরূপ বিভাগের কথা না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন প্রদেশের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ কোনও সময়ে চীনাদের নিকট 'মগধ' নামে পরিচিত—খৃষ্ট অব্দের দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে যখন মগধের গুপ্ত সাম্রাজ্যই ভারতবর্ষে প্রধান ছিল; কখনও বা ভারতবর্ষ "ব্রাহ্মণের দেশ" বলিয়া পরিচিত।

চীনেরা ভারতবর্ষের পূর্ব্বকথিত ৫টি বিভাগের ধারণা পাইয়াছিল বোধ হয় হিন্দুদের নিকট হইতেই। হিন্দুদের কল্পনায় তাহাদের দেশের আকার ছিল একটি পদ্ম পুষ্পের ন্যায়—সমস্ত দেশ নয়টি বিভাগে বিভক্ত—একটি মধ্যস্থলে অবস্থিত আর অবশিষ্টগুলি অষ্ট দিক হিসাবে মধ্য প্রদেশের আটদিকে অবস্থিত। চীনারা এই অষ্ট দিকের সংক্ষেপ করিয়া চারিটি করিয়া—মোট ৫টি প্রদেশ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। † যথা—

---

* চীনা সভ্যতার ঋ, আ, ক, খ—শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

† মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভুবনকোষ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের পঞ্চ বিভাগের কথাও আছে। যথা, মধ্যদেশ, উদীচ্য, প্রাচ্য, দক্ষিণাপথ ও অপরান্ত। কাব্যমীমাংসাতে আছে—পূর্ব্বদেশ, দক্ষিণাপথ, পশ্চাদ্দেশ, উত্তরাপথ এবং অন্তর্ব্বেদী (মধ্য দেশ)।

(১) উত্তর ভারত—পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্যরাজ্যসমূহ, সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে আফগানিস্থানের পূর্ব্বভাগস্থ সমগ্র অংশ এবং সরস্বতীর পশ্চিমতীরস্থ রাজ্যসমূহ।

(২) পশ্চিম ভারত—সিন্ধুপ্রদেশ, পশ্চিম রাজপুতানা, কচ্ছপ্রদেশ, গুজরাট এবং নর্ম্মদানদীর তীরস্থ প্রদেশের অংশবিশেষ।

(৩) মধ্যভারত—গঙ্গানদীর উপত্যকা,—থানেশ্বর হইতে গঙ্গানদীর ব-দ্বীপের উপর পর্য্যন্ত এবং হিমালয় হইতে নর্ম্মদা-তীর পর্য্যন্ত।

(৪) পূর্ব্বভারত—আসাম এবং বঙ্গদেশ (গঙ্গানদীর ব-দ্বীপ প্রদেশ, উড়িষ্যা, গঞ্জাম এবং সম্বলপুর জেলা লইয়া)

(৫) দক্ষিণ ভারত—পশ্চিমে নাসিক জেলা হইতে পূর্ব্বে গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত। বেরার মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশুর সবই এই বিভাগের মধ্যে পড়িত।

য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণে পাওয়া যায় যে তাঁহার ভারতপর্য্যটনের সময় ভারতবর্ষ ৮০টি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ৮০টি রাজ্যের রাজা প্রত্যেকেই যে স্বাধীন ছিলেন এমন নয় বরং এইসকল ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকাংশই কোন-না-কোন বৃহৎ রাজ্যের অধীনে ছিল। উত্তর ভারতে কাবুল, জালালাবাদ পেশোয়ার, গজনী, বান্নু এই কয়েকটি বিভাগ ছিল, "কাপিশ"এর রাজার অধীনে। পাঞ্জাবের তক্ষশীলা, সিংহপুর, উরশ (Urasa) Punach রাজপুর বা রাজপুরী এইসকল পার্ব্বত্য প্রদেশ ছিল কাশ্মীরের রাজার অধীনে। পাঞ্জাবের সমতল ভূমি মূলতান হইতে শোরকোট পর্য্যন্ত লাহোরের নিকটস্থ টাকীর রাজার অধীনে। পশ্চিম ভারতের প্রদেশগুলি—সিন্ধু, বল্লভী এবং গুর্জ্জর-রাজের মধ্যে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্ব এবং মধ্য ভারত ব্যাপিয়া ছিল স্বনামধন্য হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব—থানেশ্বর হইতে গঞ্জার মোহনা পর্য্যন্ত এবং হিমালয় হইতে নর্ম্মদা এবং মহানদীর তীর পর্য্যন্ত। পাঞ্জাবের পূর্ব্বপ্রদেশস্থ জলন্ধর জেলা ও ইহার অধীনে ছিলই সম্ভবতঃ টাকীর রাজাও হর্ষবর্দ্ধনের অধীনই ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ৮০টি বিভাগের মধ্যে ৬০টি বিভাগের উপরে হর্ষবর্দ্ধন ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট। ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদশালী এবং উর্ব্বর প্রদেশসমূহ ত তাঁহার অংশে ছিলই, আয়তনেও তাঁহার রাজ্য ভারতবর্ষের প্রায় অর্দ্ধেক ব্যাপিয়া ছিল। দাক্ষিণাত্যের সমগ্র দেশটা—মহারাষ্ট্র, কোশল, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, কর্ণাট, ধনকটক, জোরিয় বা চোলীয় দ্রাবিড় এবং মালকুট বা মাল্যকুট (বর্ত্তমান মাদুরা) এই নয়টি প্রদেশের রাজার মধ্যে প্রায় সমভাগে বিভক্ত ছিল।

য়ুয়ান-চোয়াঙ্ও চীনদেশে প্রচলিত ভারতবর্ষের মূল ৫টি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষকে একটি অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন; যাহার ব্যাসার্দ্ধ হইল উত্তরের দিক এবং বৃত্তার্দ্ধ হইল দক্ষিণের দিক। এই হিসাবে ভারতবর্ষের আকৃতি অনেকটা টলেমীর

মানচিত্রের অনুরূপ। য়ুয়ান-চোয়াঙএর হিসাবে ভারতবর্ষের পরিধি ৯০,০০০ 'লি' কিন্তু চীনদেশের সরকারী কাগজপত্রে পাওয়া যায় ৩০,০০০ লি। চীনের তীর্থপর্য্যটকদের মত অনুসারে এক 'লি'র পরিমাণ ⅓ মাইল * ; সেই হিসাবে ৩০,০০০ 'লি'তে হয় মাত্র ৫০০০মাইল। অষ্টম শতাব্দীতে 'লি'র মূল্য ছিল ১০৭৯-১২ ফুট, সেই হিসাবে ৩০,০০০ 'লি'র মূল্য হয় ৬১৩০ মাইল। ষ্ট্রাবো, মেগাস্থেনীস ইত্যাদির হিসাব অনুসারে আছে ৬৮৯৪ মাইল।

দ্বাদশ শতাব্দীর চীনদেশের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর ১১৭৭ সালের দৈনিক লিপিতে দেখা যায় যে বৌদ্ধ সাহিত্য সংগ্রহের জন্য ৩০০ চীনা পুরোহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিযানের কথা এবং ভারত-পরিচয়ও এই গ্রন্থে আছে। এই ৩০০ পুরোহিত কোন্ কোন্ যুগের লোক তাহা জানা যায় না। এই শ্রেণীর দৈনিক লিপি বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত চীনা সাহিত্যে আরও আছে।

চীনের সাহিত্য এক বিপুল ব্যাপার—এতই বিশাল যে বুঝি ইহার সহিত আর কাহারও তুলনাই হয় না। ইহাদের ইতিহাস-সাহিত্যও অতি বিরাট। ইতিহাস-সাহিত্যের মধ্যে আবার নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। একশ্রেণীর নাম রাজবংশের ইতিহাস। সুপ্রাচীন কাল হইতে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৪ খানা রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই ২৪ খানার প্রত্যেক গ্রন্থে নানাপ্রকার ভাগ আছে—একটা ভাগের নাম 'বিবিধ প্রবন্ধ', এই বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে একটা বিভাগের নাম 'ভৌগোলিক তথ্য", এই ২৪খানা গ্রন্থেই আর একটা ভাগ আছে—"দেশের কথা" ; ইহার একটা বিভাগ "বিদেশ-প্রসঙ্গ", ২৪ খানা বিশাল ইতিহাস-গ্রন্থের এই "ভৌগোলিক তথ্য" এবং "বিদেশ-প্রসঙ্গ" হইতে ভারতবর্ষ-বিষয়ক তথ্য সঙ্কলন করা এখনও ভবিষ্যতের কথা।

ইতিহাস ছাড়া পৃথকভাবে ভৌগলিক সাহিত্যও ইহাদের দেশের এক বৃহৎ ব্যাপার। অবশ্য খাঁটি ভৌগোলিক সাহিত্যে ভারতবর্ষ বা বিদেশের কথা নাও থাকিতে পারে, কিন্তু ভৌগোলিক সাহিত্যেরই আর একটা দিক আছে—ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ; সেখানে অবশ্যই বিদেশের তথ্য যথেষ্টই পাওয়া যাইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে শুধু তীর্থযাত্রা হিসাবেই যে কত চীনাপণ্ডিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং কত ভারতীয় পণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন তাহার সীমা সংখ্যা হয় না। কত পর্য্যটনের ইতিহাস হয়ত এখনও অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে। এই সকল জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত পর্য্যটনের বিবরণ যতই উদ্ঘাটিত হইবে ততই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আমাদের জ্ঞানগোচর হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মধ্য এসিয়ার সহিত ভারতবর্ষের নানাপ্রকার সম্বন্ধ ছিল পরে চীনও আসিয়া এই মিলন-ক্ষেত্রে যোগদান করিল। ক্রমে মধ্য-এসিয়ায় বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের এবং সময়বিশেষে চীনের প্রভাব এতটা ছাইয়া পড়িল

---

* Cunningham ও ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

যে মধ্য-এসিয়াকে কখনও বা বৃহত্তর ভারতের কখনও-বা বৃহত্তর চীনের অংশ বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। এই মধ্য-এসিয়ার সূত্রেই আবার ভারতবর্ষের সহিত চীনের ঘনিষ্টতা স্থাপনেরও সূত্রপাত হয়; ক্রমে এই ঘনিষ্টতা এতটা পরিণতি লাভ করে যে স্থানের দূরত্ব এবং পথে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও এই দুই দেশের মধ্যে পাশাপাশি দুইটি প্রতিবেশী-রাজ্যের ন্যায় ঘনিষ্ট যোগ-সম্বন্ধ ক্রমেই গাঢ়তর হয়। প্রথমে ভারতবর্ষ বুদ্ধদেবের জন্মস্থান এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিক্ষেত্র বলিয়াই চীনাদের কৌতূহল উদ্দীপিত করে, কিন্তু ভারতবর্ষ চীনকে শুধু ধর্ম্ম প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সমগ্র ভারতীয় সভ্যতার নানা অঙ্গই উহাদিগকে প্রদান করিয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে চীনারা যে সঙ্গীত-বাদ্য কতকটা এবং বিশেষ করিয়া নাট্যকলা ভারতবর্ষ হইতেই লাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় উহাদের সাহিত্যেই গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

চীনের সাহিত্য যেমন বিপুল তেমনই উহার ব্যাপকতাও অসাধারণ। এমন বিষয়ই নাই যে বিষয়ে তাঁহারা সাহিত্য রচনা না করিয়াছেন, তা সে শিল্পশাস্ত্রই হউক, কি নাট্যকলাই হউক, রেশমশিল্পই হউক কি চা তৈয়ারী করিবার কথাই হউক। আবার এইরূপ বিষয়-বিশেষের সাহিত্যও যেমন-তেমন নয়। এইসকল বিভিন্ন বিভাগের সাহিত্যসংগ্রহও সেই সেই বিভাগের বিশ্বকোষের সামিল। ভিন্ন ভিন্ন যুগে যেসকল পরিব্রাজক ধর্ম্মতথ্যানুসন্ধানে ভারতবর্ষে অভিযান করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই দেশে ফিরিবার কালে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুঁথি ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন ক্রমে এইসকল পুঁথির চীনা অনুবাদ তৈয়ারী হয়। অনেক স্থলে এমন হইয়াছে যে চীনা-সাহিত্যে এমন অনেক ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ আছে যাহার মূল এখন আর ভারতবর্ষে বা আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে চীন-সাহিত্যের বিরাট প্রাসাদে, তাহার কক্ষে কক্ষে, প্রতি প্রাচীর-গাত্রে যে কত তথ্য স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে আমরা, তাহার অস্পষ্ট আভাস মাত্র পাইতেছি। যেদিন নবীন ভারত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণায় চীনের এই বিশাল জ্ঞানমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চীনের জ্ঞান-সম্পদ আহরণ করিয়া আনিবে সেদিন যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ভূগোল নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যই যে অশেষ পরিমাণে সমৃদ্ধ হইবে সে কথা ত সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে।

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

কালীপূজায় রুধিরদান

(পত্রাংশ)

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় আপনার "কালীপূজায় বলিদান" প্রবন্ধটিতে আপনি কালীর যথার্থ তত্ত্ব ধরিয়াছেন। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন—

"কালীপূজার প্রকৃত তত্ত্বের ভিতর বীভৎস বা গর্হিত এমন কিছু নাই যাহার জন্য আমরা লজ্জিত হইব।

আপনি যথার্থই বলিয়াছিলেন—"বলিদানের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মানুষের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার "যজ্ঞ কথা"য় এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। উপাস্য দেবতার সহিত উপাসকের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই বলি দিয়া যজ্ঞের প্রসাদ গ্রহণ করা উপাসকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"মানুষ নিজে যা-কিছু আয় বা উপভোগ করে তাই প্রথমে তাঁহাকে নিবেদন করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা করে।" ইহার কারণ যথার্থই উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে একটা ঘনিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার সেই প্রসাদগ্রহণের উৎসবে উপাসকদিগের মধ্যেও একটা অন্তরঙ্গ ভাবে জন্মে। বাড়ীর একতাবর্দ্ধনের হিসাবে ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক।

আপনার আর একটি কথাও অতি চমৎকার—"আমাদের শক্তির উদ্ভবস্থান দেবমন্দির।" আমার জাতীয় শিক্ষাতেও এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আপনি গ্রামে গ্রামে যে গ্রামদেবতার সার্ব্বজনীন পূজা প্রবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন,—বাস্তবিক এইরূপেই সমাজের জাতীয় একতার সম্ভব হইতে পারে। এখনও অনেক স্থানে বৎসরের কোন সময়ে বারোয়ারি কালীপূজা হয়। এই বারোয়ারি পূজায় যদি আপনার উদ্দিষ্ট যুবকবৃন্দ প্রাণের সহিত যোগদান করিতে পারেন তবে দেশের অনেক কাজ হইতে পারে। এখন গ্রামে বড় কেহ থাকিতে চায় না, যাহারা গ্রামে বেড়াইতে যায় তাহারাও দেশের লোকের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে না। আমার মতে যুবকগণ যদি গ্রামে গিয়া এই বাৎসরিক বারোয়ারি কালীপূজাকে একটা national festivalএ পরিণত করিতে পারেন, তবেই আপনার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কালীপূজার রাত্রিতে অনেক বাড়ীতে নিজ নিজ পূজা হয়, সুতরাং সেদিন এই বারোয়ারি হওয়ার সুবিধা হইবে না। স্কুল কলেজের ছেলেরা বড়দিনের বন্ধে অথবা গ্রীষ্মের ছুটীতে যখন বাড়ী যায়, তখন ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে। সেই সময়ে শারীর বল প্রদর্শনের জন্য ক্রীড়া কৌতুক—লাঠি-খেলা কুস্তি ফুটবল ম্যাচ প্রভৃতিও হইতে পারে।

ইহাদ্বারা সেই বারোয়ারিতে একটা জীবন্ত শক্তি সঞ্চার করা হইবে। আবার গ্রাম্যলোকের প্রীতিবিধানের জন্য যাত্রাগান প্রভৃতিও থাকিবে।

পূজার পদ্ধতি শাস্ত্রানুসারেই বিধান করিতে হইবে। যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া পূজার শেষে "রুধির দান" ও "রক্তটীকা" গ্রহণ বেশ চলিতে পারে, নব্যযুবকেরা এইভাবে কালীপূজা করিতে অগ্রসর হইবেন কি?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

জীবনধারা

আমারে বিলাও দাও জগতের মাঝ,
সব দুখে, সব সুখে, সব অশ্রুজলে,
সাধিবারে দাও মোরে জগতের কাজ,
সব প্রাণে, সব স্থানে, সর্ব্বত্র ভূতলে।
সব বুকে রেখে দাও আমার আশ্বাস,
মোর দৃষ্টি রেখে দাও সবার আঁখিতে,
সব প্রাণে মেলে দাও আমার বিশ্বাস,
মোর আশা সব মুখে দাও গো আঁকিতে।
সব শক্তি মোর প্রাণে কর গো নিবেশ,
মোর তৃপ্তি সব প্রাণে দাও বিলাইতে,
দয়াময়, কর তব দাসেরে আদেশ
সব প্রাণে সব মনে নিশ্বাস ফেলিতে।
সব আলিঙ্গনে দাও আমারে জড়ায়ে,
মোর প্রাণ সব প্রাণে দাও গো ছড়ায়ে।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

রবিরশ্মি

আর্টের স্বরূপ

মানব তাহার প্রাচুর্য্যের প্রভাবেই আপনাকে অভিব্যক্ত করে, যেটুকু নিজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সেটুকুতেই মানবের আত্মা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম সৃষ্টির ভিতরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন; অথচ সে সৃষ্টির আবশ্যকতা তাঁহার পক্ষে কিছুই নাই। সুতরাং এই সৃষ্টি তাঁহার প্রাচুর্য্যের প্রকট করিতেছে। মানুষও তেমনই সৃষ্টিতেই আনন্দ উপভোগ করে -এ সৃষ্টি তাহার আতিশয্য বা অমিতব্যয়িতারই প্রমাণ - কার্পণ্যের নহে—দৈন্যের নহে। মানব পূর্ণস্বরূপে আপনাকে মিলিত করিতে চায়, সেই মিলনে যে অপূর্ব্ব স্বাধীনতার আনন্দ আছে, সে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছে; আর্ট মানবের জীবনের সম্পদকেই অভিব্যক্ত করে। আর্টের এই যে সাধনা, এই সাধনা নিজেই ফলরূপা, এই সাধনার ভিতরই সিদ্ধির আনন্দ রহিয়াছে।

এই যে জগৎ, কোথা হইতে ইহার উদ্ভব? আমাদের উপনিষদে এ সম্বন্ধে দুইটি পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে। উপনিষদের এক স্থানে বলা হইয়াছে, -"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন যাতানি জীবন্তি।"

আনন্দ হইতেই এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। আবার অন্যত্র আছে—"ব্রহ্ম তপস্যায় নিরত হন; সেই তপস্যা হইতে যে তাপ সঞ্চার হয়, তাহার প্রভাবেই তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" স্বাধীনতার আনন্দ এবং তপস্যার সংযম, সৃষ্টির ভিতর দিয়া ব্রহ্মের আত্মাভিবিকাশের মূলে দুইটিই সত্য। এই জগৎ আর্টেরই মত সেই পরমপুরুষের লীলা বা খেলা, তাহারই বহুধা বিকাশ।

আপনারা বলিতে পারেন ইহা মায়া এবং মায়া বলিয়া তাহাকে অবিশ্বাসও করিতে যাইতে পারেন, কিন্তু মায়াবীর তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আর্টের মায়াই বটে, তাহা ছাড়া উহার অন্য কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। মানবের জীবন স্বাধীনতার পথে তাহার বিরামবিহীন অভিযান—স্বাধীনতাই মানবের বৃত্তি, তাহার উপজীবিকা। মৃত্যুকে আশ্রয় করিয়া সে এই উপজীবিকা নূতন করিয়া পাইতেছে. জীবনের নিদারুণ দুঃখ কষ্টকে সাধারণভাবে দেখিলে কখনই সুন্দর বলা যাইতে পারে না, কিন্তু আর্টের ভিতর দিয়া যখন সেগুলি ফুটিয়া উঠে, তখন সেইগুলিই বাস্তব স্বরূপে আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া থাকে। ইহা হইতে শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যেসব জিনিষ আমাদের মনের উপর তাহার সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত

করিতে পারে, তাহাই সুন্দর। সংস্কৃত ভাষায় তাহাকেই বলা হয়—মনোহর। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই দুইয়ের মধ্যে আছে আমাদের মন।

এই বিশ্বে অসংখ্য বিষয় রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে মাত্র কতকগুলি আমাদের আত্মার আলোকে পড়ে। আমাদের কাছে তত্ত্ববস্তুর আকার ধারণ করে, অপরোক্ষ জ্ঞানের আয়ত্ত হয় কেবল সেইগুলি, যেগুলি আমাদের মনে সৃষ্টির আনন্দ জাগাইতে সক্ষম হয়। আর্টের সৃষ্টি, আমাদের জীবনের যেগুলি সত্য হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সেইগুলিরই ভাবময় অভিব্যক্তি; কাজেই ফটোগ্রাফের ক্যামেরার উপর আলো ও ছায়া যেভাবে পড়ে, সে হুবহু তেমনভাবেই উহা গ্রহণ করে। আর্ট তেমন ফটোর ক্যামেরার মত নয়। বিজ্ঞান কোন পক্ষপাতিত্ব বুঝে না; অপরিসীম আগ্রহের সহিত যাহা সত্য তাহাই গ্রহণ করে—বাছাই করে না। শিল্পী কিন্তু বাছাই-ই বড় বুঝে। এই বাছাইয়ের বেলা তাহার অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্টে সঙ্গীতকে আমি কিরূপ স্থান প্রদান করি—এই প্রশ্নটি একবার আমাকে করা হইয়াছিল। বিজ্ঞানে গণিতের যে-স্থান, আর্টে সঙ্গীতেরও সেই স্থান, ইহা সম্পূর্ণ বস্তু-নিরপেক্ষ। অভিব্যক্তির যেটুকু খাঁটি সার, তাহাই সঙ্গীত। সঙ্গীতের যে ঝঙ্কার তাহা মুক্ত—অবাধ, বস্তু-বিচারের বাঁধন, চিন্তার বাঁধন সঙ্গীতকে বাঁধিতে পারে না। সঙ্গীত যেন আমাদিগকে সকল জিনিষের আত্মার ভিতরে লইয়া যায়। সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ-ধারা, সেই আনন্দের স্পর্শে আমাদিগকে নাচাইয়া তোলে। কয়েক শতাব্দী আগে বাংলায় এমন একদিন আসিয়াছিল, যেদিন মানবের আত্মায় ভগবৎ প্রেমের যে চিরন্তন লীলা নাট্য চলিতেছে, তাহা জীবন্তভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল—ভগবদুপলব্ধির আত্যন্তিক আনন্দধারা চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া। সমগ্র জাতির অন্তর সেদিন ভাবের একটা আবর্ত্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলায় সেই ভাবাবর্ত্ত হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল আমাদের বাংলার কীর্ত্তন গানের। আমাদের জাতির ইতিহাসে এমন সময় অনেকবার আসিয়াছে, যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার অনৈক্য উর্দ্ধে যে জিনিষ তেমন কোন জিনিষের অনুভূতিতে সমগ্র জাতির অন্তর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

বুদ্ধের বাণী যেদিন ভৌতিক এবং নৈতিক নানা বাধা উপেক্ষা করিয়া ভারতের উপকূল হইতে দূরদেশে পৌঁছিয়াছিল, সেই একদিন আসিয়াছিল তেমন দিন। মানব-জীবনের সেই সুমহতী অভিজ্ঞতার সম্পদ চিরন্তন করিবার জন্য মানুষ সেদিন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা পর্ব্বতকে কথা কহাইয়াছিল; পাথরকে দিয়া গান গাওয়াইয়াছিল। বিপুল আনন্দের ধ্বনি গুহাকে মুখর রাখিতে বাধ্য করিয়াছিল, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে উষর নির্জ্জন প্রদেশে এবং জনাকীর্ণ নগরীতে মানবের আশা অমর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সৃষ্টির সেই বিপুল প্রচেষ্টা পথের বাধা-বিঘ্নকে গ্রাহ্য করে নাই। সকল বাধা-বিঘ্নকে দলিত করিয়া আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিল, ভাবকে মূর্ত্তি দান

করিয়া। প্রাচ্য মহাদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া এই যে একটা শক্তির খেলা সেদিন দেখা গিয়াছিল, আর্ট কাহাকে বলে, এ প্রশ্নের উত্তর তাহা হইতেই পাওয়া যায়। যাহা সৎ, যাহা সুন্দর, তাহার ডাকে মানবের সৃষ্টি-পর-আত্মার যে সাড়া, তাহাকেই বলে আর্ট।

গান্ধার দেশে বুদ্ধের যেসব প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিতে আমরা গ্রীকশিল্পের প্রভাব দেখিতে পাই। তাঁহারা মূর্ত্তি কল্পনায় এনাটমির বৈজ্ঞানিক দিকটার উপরই জোর দিয়াছিলেন; কিন্তু খাঁটি ভারতীয় শিল্প বুদ্ধের আত্মাকে অভিব্যক্ত করিবার উপর,—তাঁহার অন্তরের ভাবের দ্যোতনার উপরই বেশী জোর দিয়াছে।

বিখ্যাত য়ুরোপীয় স্থপতি রোডিনের শিল্পের ভিতর আমরা কী দেখিতে পাই? অপূর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য অপূর্ণের সংগ্রাম; পক্ষান্তরে প্রাচী স্বভাবতঃই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ; পূর্ণতার দিক হইতেই তাহার প্রেরণা আসিয়াছে। ভারতের শিল্পীরা অপরের নিকট হইতে যতই ধার করুন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা নিজেদের ঐ বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়াছেন।

প্রতিভায় যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশিষ্ট লক্ষণ একটি হইল ধার লইবার তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা; এই ধার লইবার সময় দুনিয়ার সভ্যতার বাজারে তাঁহারা যে অপরিমিত সম্পদ ঋণ দিয়া রাখিয়াছেন, এ কথাও তাঁহারা জ্ঞাত থাকেন না। যাঁহারা মাঝারি গোছের, ধার করিতে লজ্জা বোধ করেন—ভয় পান শুধু তাঁহারাই; কারণ কিভাবে ধার শোধ দিতে হয়, তাঁহারা তাহা জানেন না। য়ুরোপের চিন্তা, য়ুরোপীয় সাহিত্যের ধারা যে আদরের সহিত বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে আনন্দেরই বিষয়। য়ুরোপীয় চিন্তা এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের ধারা আমাদের মনের সংস্পর্শে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে. কিন্তু আমাদের ভারতীয় আত্মাটি সেই বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়াও প্রবল প্রভাবে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

ভারতীয় আর্টের লেবেল যাহাতে জুড়িয়া দেওয়া যায়, জিনিষটি মাপিয়া-জুখিয়া দেখিয়া শুনিয়া এমনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে, এমন যে যুক্তি, আমাদের শিল্পীরা যেন তাহা মানিয়া লন না। আর্ট গ্রহণও করিতে পারে যেমন উদারতার সহিত দানও করিতে পারে তেমনই উদারতার সহিত। সকলেরই জন্য তাহার আতিথেয়তা উন্মুক্ত। কারণ যদিও মত তাহার পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু তাহার যে সম্পদ, সে সম্পদ কল্পলোকের; তাহা তাহার নিজস্ব—তাহা নিত্যই নূতন।

এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেই বিশ্বেশ্বর বাস করেন। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার নিজের বাসস্থান এ ভাবে তৈয়ারী করা উচিত, যাহা তাহার আত্মার পক্ষে যোগ্য হইতে পারে। শিল্পী যিনি, তাঁহাকে আজ এই কথা ঘোষণা করিতে হইবে যে, আমি অমরত্বে বিশ্বাস করি। তাঁহাকে আজ এই ঘোষণা করিতে হইবে যে আমি বিশ্বাস করি আদর্শে। একটি আদর্শ এই বিশ্বের উপর স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সেই আদর্শ পৃথিবীকে

স্নিগ্ধ ধারায় অনুসিক্ত করিতেছে, স্বর্গের সেই যে আদর্শ, তাহা কেবল কল্পনারই বিলাস নয়, খেয়াল নয়—তাহাই পরম সত্য, তাহাতেই এই বিশ্বের স্থিতি, তাহাই বিশ্বের জীবন। সেই আদর্শই আমাদের জীবন-বীণার ঝঙ্কার তুলে, আর সেই ঝঙ্কার—সেই সঙ্গীতের সুর ঢেউ তুলিয়া আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সীমার ভিতর হইতে অসীমে লইয়া যায়।

হিন্দুমুসলমান সমস্যা

যে দেশের মানুষ আমরা, সে দেশকে গভীরতর করে জানতে হলে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার মিলন-সূত্র আছে, সেইটিকে নূতন করে উপলব্ধি করতে হবে।

আমরা এক এক উপলক্ষ্যে সেই মিলন-সূত্রকে দৃঢ় করে তুলি এবং সেইটি হচ্ছে আজকের গৌরব। আমার মনের অহঙ্কার যে আমাকে তোমরা তোমাদের কবি বলে অনুভব করেছ, তাতে আমি ধন্য। আজ যে সমগ্র বঙ্গ একটি ঐক্য উপলব্ধি করেছে সে এক শুধু ভাষাদ্বারা। এক ভাষা দ্বারা উর্ব্বরা হয়ে ভাষার সূত্রে তরঙ্গপ্রবাহে নিয়ত যোগযুক্ত হচ্ছে - এই যোগাযোগ শুধু কবি সফল করেছে। আজকের এই আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে যে কবির অধিকার, সে কি কম আনন্দের কথা? এই বিশাল জনসকলের চিত্ত শতদল একটি আলোক-কিরণ-সম্পাতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই গৌরবের অধিকার আমি মাথা পেতে নেব। এ ত উপেক্ষার জিনিষ নয়। এই মাল্য জয়মাল্য, এই বরণমালা, ভাষা-সরস্বতীর উদ্দেশে যে ভাষাকে সজীব করে রেখেছে তাকে দেওয়া।

এই বঙ্গদেশের মাঝে গঙ্গা এসে সমুদ্রে মিশেছে। এই নদী সাগর-সঙ্গমের নিকটবর্ত্তিনী হয়ে পূর্ব্ব-পশ্চিম তীরকে সমান করে নদীর পূর্ণতা লাভ করেছে। সমস্ত দেশকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে শরীরের নাড়ীর মত এই নদী সমস্ত দেশে চৈতন্য ধারাকে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই নদী আমাদের বাংলা দেশে মহাসিন্ধির দিকে চলেছে।

এই নদীর কথা বলছি, তার আরও একটি কারণ আছে। আপনারা জানেন, অধিকাংশ বড় বড় সভ্যতা এক একটি নদীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। নীল নদীকে মিশরের—ইজিপ্টের সভ্যতা, ইউফ্রেটিশকে নিয়ে বেবিলনের সভ্যতা ইত্যাদি এইরকম এক একটি নদী, তীর হ'তে তীরে, দূর হ'তে দূরে ঐক্য সাধন করেছে।

মাটির পথ— তার ত গতি নেই— জলের গতি নিজের গতি দ্বারা মানুষকে গতিবান করে। বাংলা দেশে এই নদী এক মহাসিন্ধি সাধন করে সমুদ্রে গিয়েছে। এই নদী যে শুধু পলিমাটি বহন করে নিয়ে এসে দেশকে উর্ব্বর করচে কিংবা শুধু স্তন্যধারা দিয়ে সরস করচে তা নয়, এই নদী বহু দেশকে নিকটতর করেছে। অন্য কোথাও এটি এমনিভাবে সম্ভব হতে পারেনি। বাংলার বিধাতা মানুষে মানুষে যোগাযোগের পথ সহজ করে দিয়েছেন, তাই কতকাল ধরে এই নদী পরকে কাছে এনে দিয়েছে। নদীর ন্যায় পরস্পরের মিলনের আর একটি সূত্র হচ্ছে ভাষা। এর প্রভাব বাংলা দেশে যত, অন্য

কোথাও তেমন নয়। বাংলায় যত এক ভাষাভাষী, অন্য কোনও প্রদেশে এত নয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ এত বড়, কিন্তু সে সব দেশের ব্যবধান এত কঠিন যে, তা লোক সহজে অতিক্রম করতে পারেনি। তাই সেসব স্থানে এক প্রদেশেই বহু ভাষাভাষী জাতি।

কিন্তু বাংলাদেশের লোক জলপথ দিয়ে সহজেই অনেকের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে বলে এদেশের ভাষা এক এবং তাতেই সর্ব্বত্র এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। আজকের মিলনেতে আমাদের প্রধান সুযোগ আমরা সকলেই এক ভাষাভাষী—প্রত্যেকের হৃদয়ে একটি ভাব বহন কচ্ছে—সর্ব্বত্র এই সুযোগ ; একে মঙ্গলময় করে পরিপুষ্ট করতে হবে।

একদিন ছিল—এদেশে যখন জীবন-প্রণালী অন্যরকম ছিল—সকলের জীবন যখন স্বচ্ছল ও আনন্দময়, তখন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার ভাবটি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন অতিথি এলে তাড়ান যায় না—আত্মীয় স্বজনকে বিমুখ করা যায় না—ভুতুমুকে বলতে পারা যায় না—না তোমাকে দেব না। এই স্বচ্ছলতার আর একদিক হচ্ছে যে, উহা সমগ্র বঙ্গদেশের চৈতন্যকে—সাহিত্যকে বিকশিত করেছে। পশ্চিমে কঠিন অনুর্ব্বর প্রদেশগুলিতে তা সম্ভব হতে পারে নি। তাই সমগ্র বঙ্গের উপর এই নদীর প্রভাব অপরিসীম—সেই স্বচ্ছলতার দিনে সমস্ত পল্লীতে পল্লীতে অজস্র আনন্দের ধারায় দেশ পরিপূর্ণ ছিল।

কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমি বলতে চাই নে সে মাটির সরসতা কমে গিয়েছে, কিংবা নদীর জলধারা শুকিয়ে গিয়েছে—তা নয়। আজও নদী বইছে · দূরদূরান্তর হতে পলিমাটি বয়ে আনছে—এখনিতর প্রত্যেক বৎসরেই হচ্ছে, কিন্তু যে পরিবর্ত্তন এসেছে—তাহা যুগপরিবর্ত্তন—তার উপর মানুষের কোন হাত নেই। আজকে সমস্ত পৃথিবীর দাবী আমাদের সামনে এসেছে। দূরদূরান্তর হতে লোক এসেছে—তাদের ঠেকান যায় না। এ শুধু যে আমাদের দুর্ব্বলতার জন্য তা নয়—এ হচ্ছে যুগধর্ম্মের ফল—পৃথিবীর দাবী আমাদের মিটাতেই হবে। · তাই আজ শস্যের ভাগ বহুবিস্তৃত হয়ে পড়েছে। আমাদের সভ্যতা—আত্মীয়তার সভ্যতা—কিন্তু সেটির রস শুকিয়ে যাচ্ছে—তাই ক্রমশঃ আত্মীয়তায় বাধা পড়ছে। এখন আর আমরা তেমন করে সকলকে বলতে পারিনে—যে, এস এস তোমরা সবাই এস—তোমাদের সেবার জন্যই আসন পাতা হয়েছে। পূর্ব্বে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে কত অনাহূত লোক আসত—সকলের জন্যই সমানভাবে মুক্তদ্বার। তখন একটি বহুবিস্তৃত পরিবারের মত সকলেই একই সুখের একই ঐশ্বর্য্যের ভাগ পেত। আজ সে স্বচ্ছলতা না থাকলেও আমাদের হৃদয়জাত আত্মীয়তা-সেবার ঔৎসুক্য এখনও বর্ত্তমান। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। আমার নিজের অনুষ্ঠানটিতেই আমি তাহা উপলব্ধি করতে পারি। সেখানে ছেলেরা রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তাহা বাস্তবিক হৃদয়স্পর্শী। য়ুরোপে সেরূপ নয়—সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ছেলেদের প্রতি পুরাতন ছাত্রগণ নিষ্ঠুর অত্যাচার করে থাকে।

কিন্তু আমাদের ব্যবহার সেরূপ নয়—আমাদের ব্যবহার আত্মীয়তার সৃষ্টিস্বরূপ। আমার

নিজের অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্তই দিচ্ছি। আপনারা হয়ত ভাবেন যে আমি বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতনে শুধু কবিত্বই করি, তা নয়। যদি ভাবেন, সেখানে আমি শুধু বিলাস কচ্ছি, তাহলে আমার প্রতি অন্যায় করা হবে। সেই আত্মীয়তার শান্তিস্থাপনেই আবার দেশের সর্ব্বত্র জলাশয় জেগে উঠবে, ভাঙা দেউল গড়ে উঠবে, আবার সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠবে আনন্দে, কল্যাণে, সখ্যে।

হিন্দু-মুসলমানের আত্মীয়তায় এত বিরোধ কেন? শস্যের সমান ভাগ নিয়ে ঝর-ঝবাকবি—অন্নের ভাগ কমে গেছে—তাই মারামারি। যেদিন আবার গ্রামের প্রাণ জাগবে, সেদিন হিন্দু-মুসলমান উভয়ে সমান ভোগ করবে, তখন দরদ হবে, আনন্দ নিকেতনে তখন উভয়ের অমৃত উভয়ের পাতে পড়বে। যেদিন প্রাচুর্য্য হবে সেদিন বিরোধ ঘুচে যাবে। ভায়ে ভায়ে ভিন্ন হয় দেখেছি, কিন্তু পূজার দিনে আবার মিল হয়। সেদিন বিরোধ থাকে না, কেন থাকে না? সেদিন ঘরে অভাব নেই, 'প্রাচুর্য্য' আছে, অন্নের জন্য মারামারি নেই দানের ব্যগ্রতা আছে। তেমনি প্রাচুর্য্যের প্রভাবে আজ যেখানে বিরোধ, কাল সেখানে মিলন হবে। এ কখনও কৌশলে হবে না, ফাঁকি দিয়ে হবে না, চাকুরী কিংবা বিষয় দিয়ে হবে না! এরকম মিলন এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের হতে পারে, কিন্তু ভায়ে ভায়ে কি সেই বিষয়বুদ্ধির ক্ষেত্রে মিলতে পারি? Political alliance, France এবং England এ হতে পারে—কিন্তু সে সাময়িক—একজন বলে ভাই, অপরে বলে বন্ধু—কিন্তু একটু পরেই হয় ত সে বন্ধন ছিঁড়ে গেল। তাই আজ হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলনের ক্ষেত্র হচ্ছে রস উৎপাদন। আজন্ম একসঙ্গে মানুষ হয়েছি; যদি তাকে সুখে দুঃখে ভালবাসতে না পারি—দুঃখের দিনে তাকে ডেকে এনে তাকে বলতে না পারি—ভাই আমার দুঃখের ভাগ লও—তা হলে আমার মিলন কিছুতেই হবে না—ঘুষ দিয়ে মিলন হবে না—ঘুষ দিয়ে আত্মীয়তা করা চলে পুলিশের সঙ্গে কিংবা দস্যুর সঙ্গে। তাই বঙ্গবিচ্ছেদের সময় মিল হল না। যেই হিন্দু মুসলমানকে বল্লে, "ভাই"—অমনি তারা ভাবলে—এ সুরটি ত যেন কঠিন নয়, এখন গরজ তাই—দরকার নেই, পরের বিপদ ঘাড়ে এনে কেন নিজে বিপদে পড়ব? তাই মিল হল না।

এখন হয়ত আমাকে প্রশ্ন করবে যে, তা হলে আপনি কি করে এদের মেলাবেন? আমার উত্তর হচ্ছে, একত্র সৃষ্টি দ্বারা—দেশকে সৃষ্টি করতে হবে। এ ভগবানের সৃষ্টিতে আমরা আছি, কুকুর বিড়ালও আছে—কিন্তু তাতে মিল নেই। কিন্তু মানুষের নিজ সৃষ্টিতে দরদ আছে তাই দেশে হিন্দু-মুসলমান যখন একসঙ্গে সৃষ্টি করবে তখন তাদের একসঙ্গে মিল হবে সৃষ্টি রক্ষা করবার জন্য—তাতেই মিল হবে—ঘুষে নয়।

তাহলে আমাদিগকে পল্লীতে যেয়ে কাজ করতে হবে। এ আমি বলছি ভাবুকতায় নয়—অভিজ্ঞতায়। আমার যেখানে কর্ম্মক্ষেত্র, সেখানে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই আছে। যেসব ছেলেরা তাদের ভিতরে গিয়ে কাজ কচ্ছে, তাদের আমি ব্রতীবালক নাম দিয়েছি। তারা সবাই সমান কাজ করে। এই কেন্দ্র থেকে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সেবা

পাছে। আমাদের লোকেরাই তাদের সব বিরোধ মিটান। পূর্ব্বে কত মারামারি, মাথা কাটাকাটি হত, পুলিশ এসে শাসন করতে পারেনি, কিন্তু আজ তারা নিরস্ত হয়েছে কেন? কারণ আমি তাদের নিকট কোন স্বার্থের দাবী করিনি তাই। আমি শুধু তাদের বলেছি, আমি তোমার দেশের লোক, তোমাদের সেবা করবার অধিকার আমার আছে; সে অধিকার রুদ্ধ কোরোনা, হৃদয়ের দ্বার খোলো। তোমরা সবল হও, সুস্থ হও আমি কৃতার্থ হব। আমার আর কোন দাবী নেই আর কোন প্রয়োজন নেই, আমি আর কিছু চাইনে। তুমি বড় হও, ভাল হও, তবেই আমার কাজ শেষ হবে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এতে তেত্রিশকোটী ভারতবাসীর কি হবে? এতে কিছু হবে না। আমি বলি, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও আত্মশক্তি যদি সত্য হয়, তাতেই ভারতের সেবা হবে। প্রদীপের আলোটি ক্ষুদ্র হলেও তাতে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করবার ক্ষমতা বর্ত্তমান। অসত্য দ্বারা ভারতের কোন কাজই হবে না। গীতার উপদেশ—আমাদের শুধু কর্ম্মের অধিকার—আমরা শুধু কাজ করি, ফল পাই বা না পাই—ফলের ভার শুধু তাঁরই উপরে ন্যস্ত।

আমাদের দেশের যেখানে যে আছে, সকলের ভিতর শক্তি দিতে হবে। আমরা তা করতে পেরেছি? আমাদের দেশের নমঃশূদ্র জাতি সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেল। তাদের কেমন করে যেতে দিলুম? আত্মীয়তার বন্ধন নেই বলে আজ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বলছি, এস ভাই, তোমরা এস। এতে আত্মীয়তা হবে না। এতে দেশের শুধু ক্ষতিই হবে। আমাদের দেশে শুধু ত্যাগ আছে, গ্রহণ নেই—ব্যয় আছে আয় নেই। কিন্তু তাতে ত চলবে না। যারা নিকটে আছে, তাদের আরও নিকটতর—যারা আপন, সেবা দ্বারা তাদের আরও ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় করতে হবে। এই হচ্ছে আমার ব্রতীবালকদের কাজ।

মানুষের দুই দিক। ধর্ম্ম অর্থ, কাম মোক্ষ। অর্থ প্রয়োজন—ধর্ম্ম আদর্শ।

আদর্শ এবং প্রয়োজন উভয়কেই স্বীকার করতে হবে। অর্থের সংকীর্ণ বন্ধন, ধর্ম্মের বৃহৎ বন্ধন। ভারতের ধর্ম্ম এবং অর্থ উভয়ই দরকার। আমি অর্থকে উপেক্ষা করিনি—সেবাকে সত্যে পরিণত করতে গিয়ে তাকে উপেক্ষা করতে পারিনি। আপনারা আমার কাজ যদি চোখে দেখতেন, তা হলে আজ আর আমাকে বক্তৃতা করতে হত না। যুবকগণ দেশের প্রাণ ফিরাবার প্রতি দৃষ্টি করুন। গোড়ায় ফিরে আসুন, দেশের মাটিকে সার্থক করুন, দেশকে সফল করুন।

পল্লীর প্রাণ সজীব শুধু অন্নবস্ত্র দ্বারা হবে না—শিক্ষার আবশ্যক। পল্লীতে প্রাণ আছে, তাকে পুষ্ট করা চাই—তাকে সর্ব্বপ্রকারে পরিপুষ্ট করতে পারলে সমস্ত চেষ্টা সার্থক হবে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু তাতে দেশে যে চৈতন্য জাগল তাতে চিত্তকে উর্ব্বরা করে চারদিক ছাপিয়ে উঠল। তখন শুধু ধর্ম্মের নয়, চারদিক হতেই দেশ সজীব হতে পেরেছিল। তেমন কোন সত্যকে পেলে ভারত আবার শুধু আধ্যাত্মিকতায় নয়, সমস্ত রকমে প্রাণ পাবে। য়ুরোপে Christanity র সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্যতা ও সমৃদ্ধি

লাভ করেছিল। প্রদীপ শুধু একটি কাজ করে না। প্রদীপ একবার জ্বললে তাতে অনেক কাজই হয়।

তাই বলছি, পল্লীর বিপুল প্রাণে নব বসন্তের সমাগম হ'লে তাতে শুধু মধুকর-গুঞ্জন নয়, তাতে ফুল হবে, ফল হবে। তেমনই বাংলায় বসন্ত হউক। নব প্রাণের হিল্লোল একবার জেগে উঠুক, সেই আনন্দের ভিতর দিয়ে সর্ব্বকর্ম্মের জন্য দেশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠুক। আমার শান্তি-নিকেতনের জ্ঞান শিক্ষিতদের জন্য Reserved নয়, তাতে সকলদেশের সকল লোকের সমান অধিকার—সকলে তা লাভ করুক তাতে জেগে উঠুক এই আমার নিবেদন। এই আমার কাজের পরিচয়।

আমার পরমায়ু অত্যন্ত অল্প; কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে, যে যজ্ঞ-হুতাশন এখানে জ্বলেছে তাহা ভারতের সমস্ত যজ্ঞ-ভূমিতে জ্বলে উঠ্‌বে এবং আমি তা দেখে যেতে পারব। ভারতের সর্ব্বত্র বল্‌ছে, তোমাদের সাহিত্য-চিত্রকলা জেগেছে, আমরা তা চাই—এই হচ্ছে প্রকৃত মিলনের ক্ষেত্র এই সৃষ্টিকার্য্য। এই মিলন-ক্ষেত্র যেখানে, সেখানে ভারতের সমস্ত প্রদেশকে ডেকেছি তারাও এসেছে যেদিন তারা এসে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে সেদিন এই সৃষ্টিকার্য্য সার্থক হবে।

বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে উদ্যত হউক যেখানে সৃষ্টি করেছে—সেখানেই সে ধন্য হয়েছে। এতে সিদ্ধিলাভ বাক্যদ্বারা হবেনা, গ্রামের ভিতর গিয়ে কাজ করিতে হবে। নিজেদের কাজ নিজেদের করতে হবে। সব বাধা ভুলে গিয়ে কাজে লাগতে হবে। তা'হলে ২।১টা গ্রামেই যে আলো জ্বলে উঠ্‌বে—সমস্ত দেশের লোকই তাকে দেখতে পাবে। সত্য বালকবেশে আসে ভগবানের মত; অনেক বাহু রাক্ষসের, তাই রাবণের বিংশতি বাহু ছিল, কিন্তু আমাদের ভগবানের তা দরকার হয় না। তিনি ছোট হয়ে গোপালের বেশে আমাদের প্রাণে এসে যে বাঁশী বাজান, তাতেই প্রাণকে অধীর করে। তাঁতে বিশ্বাস থাকলে সবই আমরা সহজে বুঝব।

আর কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেবনা। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, দেশ স্বাধীন হবে কিসে? আমি বলব—আমি জানি না।

আমাদের সাধনাকে সত্য করতে হবে এই শুধু জানি তাতেই দেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠবে।

স্বাধীনতা

পশুর সহিত মানুষের পার্থক্য চাতুরী কিংবা তাহার শারীরিক শক্তির নহে মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ তাহার আত্মার শক্তিতে। মানুষ তাহার আপাত-আবশ্যকতার মধ্যে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ করিতে গিয়াই আপনাকে দরিদ্র করিয়া ফেলে; কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আত্যন্তিক প্রেরণা, মুক্তির অদম্য লালসা যখন তাহার ভিতর জাগে, সে তখন স্বার্থের

বাঁধন ছিন্ন করিয়া আপনার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য এবং জ্যোতিতে বিমণ্ডিত হইয়া বাহির হয়। প্রাচীন ভারত তাহার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে, মানবাত্মা বন্ধনমুক্ত হইয়া যে বিশ্বজনীন যোগ্যতালাভ করে সেই বার্ত্তাই প্রচার করিয়াছিল। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের উদার ভিত্তির উপরই পরিপূর্ণতা গড়িয়া উঠিতে পারে। যে ধ্রুব ভারত একদিন অন্তরে আদরের সহিত ধারণ করিয়াছিল এবং জগৎকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, তাহাকে আজ আবার উজ্জীবিত করিতে হইবে।

জ্ঞানাৎ পরতরং নহি

ছাত্রবৃন্দ, বাণীর সাধনায় তোমরা ব্রতী হইয়াছ। তোমাদের যিনি আরাধ্যা দেবী, তিনি তাঁহাদের প্রতিই প্রসন্না হইয়াথাকেন, যাঁহাদের নিষ্ঠা অনুদিন ত্যাগ এবং অধ্যবসায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয়। আমাদের ছেলেদের মধ্যে জ্ঞানের প্রবল পিপাসা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, একথা ভাবিয়া আমার দুঃখ হয়। যে শিক্ষাপদ্ধতিকে রক্ষা করিবার জন্য বিপুল অর্থ, সময় এবং উদ্যম ব্যয়িত হইতেছে, তাহা মোটেই ফলোপধায়ক হইতেছে না। এই পথে ব্যর্থ প্রয়াস পরিহার করিয়া আমাদিগকে আজ অদম্য এবং অকম্পিতচিত্তে সেই সাধনায় আপনাদিগকে বিনিয়োগ করিতে হইবে যে সাধনা হইতে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস প্রবাহিত হয়, অপার্থিব আনন্দে অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে। জ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যে দেশের লোকেরা স্থাপন করিতে পারে না, সেদেশে স্বদেশ-প্রেম স্থাপন করিতে পারে না, সেদেশে স্বদেশ-প্রেম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। জ্ঞান ছাড়া যে প্রেম তাহা দুর্ব্বল চিত্তেরই ভাবপ্রবণতা, দুঃখদুর্দ্দশার বায়ুবেগে তাহা ছিন্নাভ্রের মত খণ্ড খণ্ড হইয়া নষ্ট হয়। চিন্তার দৈন্য, মানসিকতার দৈন্যই দেশের সবচেয়ে বড় দৈন্য। কবি দেশের আশা ভরসার স্বরূপ যুবকদিগকে জ্ঞানসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে বলেন, যে সাধনায় স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে, দেশ উন্নত হইবে।

ভারতবর্ষীয় দার্শনিক-সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ

অন্তকার অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অধিকার করিবার ন্যায়-সঙ্গত দাবী আমার নাই। সুতরাং আপনাদের এই সম্মানটি সম্যক্ উপভোগ করিবার পথে অন্তরায় হইতেছে আমার সঙ্কোচ ও আতঙ্ক। আমার এই ক্ষণস্থায়ী পদোন্নতিতে আনন্দের কারণ ত আছেই, উপরন্তু ইহার দরুণ অনেকের বিরাগ বিদ্রূপ অর্জ্জন করারও সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ প্রতিগ্রহ করা সমীচীন কিনা তাহা ভাবিতেছিলাম। একবার মনে হইল, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করিয়া এ সঙ্কট উৎরাইয়াই যাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, এই দার্শনিক সমাগমে আমার পদবীর সব চেয়ে কায়েমী স্বত্ব হয়ত আমার দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত। এমন হইতে পারে যে, সভাপতি হিসাবে আপনারা তেমন লোকটিই চান যিনি নির্ব্বিকারভাবে উদাসীনপন্থী, যিনি অন্তত কোন বিশেষ মতবাদের বশ্যতা জ্ঞানতঃ স্বীকার করেন না, কারণ যাবৎ মতবাদ সম্বন্ধেই তিনি নিরপেক্ষভাবে অনভিজ্ঞ। এক্ষেত্রে আমার গুণাগুণ তুলনামূলক সমালোচনার বহির্ভূত; কারণ তাহা অস্তি নাস্তি দুই বাদেরই বাহিরে এবং হয়ত আমাকে এইস্থানে আনিবার পক্ষে সেটা মস্ত বড় সুবিধার কথা। এ অবস্থায় মনে হয় আমি যেন একটা বাতিদান; বাতির মত তার আলোকবিকীরণের শক্তি নাই বলিয়াই যেন দীপ্তিহীন নিষ্ক্রিয় গাম্ভীর্য্যে অবিচলিত থাকার পক্ষে সে বেশী উপযোগী।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আপনারা আমায় নীরব থাকিতে দিলেন না, যদিও আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞব্যক্তিদের উপদেশ অনুসারে আমার এ অবস্থায় নীরব থাকাই উচিত ছিল। এই দ্বিধা কাটাইয়া আমার পাণ্ডিত্যরিক্ত মনটিকে কথা বলাইতে সাহায্য করিয়াছে একটি জিনিষ। সেটি এই যে, আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা—দর্শন কাব্য যাহা হউক—একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। স্বাতন্ত্র্য-প্রসূত অসূয়ার বালাই তাহাদের নাই, সুতরাং পাশ্চাত্য-সুলভ দণ্ডবিধির সাহায্যে অনধিকার প্রবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় না।

দার্শনিকপ্রবর প্লেটো তাঁহার আদর্শ গণরাষ্ট্র হইতে কবিদের নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে। কারণ এখানে দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা—বিদগ্ধমণ্ডলীর কন্ধরার খাসকামরা আশ্রয় করা নহে। এইজন্যই বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের মত দার্শনিকের প্রতিও অনেক কবিতার আরোপ করিতে আমাদের জনশ্রুতি কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। অথচ এই শঙ্করাচার্য্যকে কোনও আতিথ্যদ্বেষী "ইমিগ্রেশন" আইনের সাহায্যেই প্লেটো তাঁহার

আদর্শ রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। হয়ত সেইসব কবিতা অধিকাংশই উচ্চ অঙ্গের কাব্য নহে, কিন্তু কবিতা সরবরাহ করাটা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে একটা অপরাধ বা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার বলিয়া কোন কাব্যামোদী দোষারোপ করেন না।

আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আমাদের মহাকাব্য মহাভারত ইহার সাক্ষী। বিশ্বসাহিত্যে ইহা অতুলনীয়। ছোট বড় কত রকমের মানবচরিত্র, কি অদ্ভুত বৈচিত্র্যে, কত বিভিন্ন স্তরের মনস্তত্ত্বে ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু শুধু তাহাই নহে; কত নীতি, রাষ্ট্রীয় ও অধ্যাত্ম তত্ত্বের কত বিচারবিন্যাস এই মহাভারতের উদার আয়তনে কেমন সহজে আশ্রয় পাইয়াছে! এই অমিতাচারী ঔদার্য্যের ফলে কাব্য তাহার নিজস্ব সীমা লঙ্ঘন করিবার বিপদ স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সম্ভব হইল ভারতবর্ষে; কারণ এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী এক বিরাট্ সাধারণতন্ত্র (Communism) বিধৃত। বস্তুত মহাভারত যেন একটি ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ; ইহার মধ্যে কত বিচিত্র মানস-সৃষ্টি, অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের মত জটিল-বিষম ছন্দে নৃত্য করিয়া ফিরিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছে। একজন বিশেষ কবির খামখেয়ালী ইহাতে নাই, সমগ্র জাতির সাধারণ মনোভাব এখানে দেখিতে পাই। আমাদের এই জাতিটি তর্কবিতর্কজটিল পন্থা আশ্রয় করিয়া সেই ভাবলোকে ভ্রমণ করিতে ক্লান্তি বোধ করে না যাহা অসংখ্য উপাখ্যানের উপগ্রহ-পরিবেষ্টিত একটি মহা আখ্যায়িকার সৌরমণ্ডল বলিলেই হয়।

মুসলমানযুগেও এই ভারতে যে-সব সাধুসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই গীতরসিক। তাঁহাদের গান ভাবের আগুনে দীপ্তিমান, তাঁহাদের ধর্ম্মবোধ তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্মস্থল হইতে উৎসারিত, মানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাঁহাদের কারবার। হয়ত ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই। কিন্তু যখন দেখি যে তাঁহাদের সেইসমস্ত বাণী, সমস্ত সঙ্গীত কেবলমাত্র শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য নহে, তাহা গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর নরনারীর আদরের ধন, তখন বুঝিতে পারি দর্শন বস্তুটি কি গভীরভাবে আমাদের সাধারণের মগ্নচৈতন্যলোকে প্রবেশ করিয়াছে এবং সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত করিয়াছে।

শৈশবে মনে পড়ে একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে কবীরের এই গানটি শুনি :—

"পানীমে মীন পিয়াসী রে
মুকো শুনত শুনত লাগে হাঁসী রে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে;
ক্যা মথুরা ক্যা কাশীরে।"

কবীরের এই উচ্চ হাস্য সেই হিন্দুগায়কের ধর্ম্মনিষ্ঠায় এতটুকুও আঘাত করে নাই।

বরং কবীরের সঙ্গে তিনি একাত্ম ; কারণ, তত্ত্বজ্ঞান যে তাঁহার মনকে মুক্তি দিয়াছে এবং তিনি বুঝিয়াছেন তীর্থ হিসাবে মথুরা বা কাশীর প্রতীকগত তাৎপর্য্য থাকিলেও চিরন্তন সত্য হিসাবে তাহাদের স্থান নাই। সুতরাং উক্ত স্থানদ্বয়ে তীর্থযাত্রা করিতে উন্মুক্ত হইলেও তিনি নিঃসংশয়ে জানেন যে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি যদি তাঁহার থাকিত তাহা হইলে কোন বিশেষ স্থানে যাইয়া ধর্ম্মবোধ জাগাইবার কোন প্রয়োজনই হইত না। তবে যে সমস্ত ধর্ম্মমন্দিরে কত যুগ ধরিয়া কত সাধকের ভজন পূজন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহার উদ্বোধিনী শক্তিটি তাঁহার মত সাধকের তেমনই প্রয়োজন বলিয়া তিনি স্বীকার করেন যেমন প্রয়োজন আমাদের আবহমানকাল প্রচলিত মন্ত্রের, যে মন্ত্র বহুযুগের ভক্তসাধকের কণ্ঠস্বরে প্রাণবান্ হইয়া আমাদের প্রাণকে সহজে উদ্বোধিত করিতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই—সেটি এই যে, ব্যক্তি-স্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন ;—

"মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন ;
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম ;
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয়।"

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে-পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

"রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে॥"

এই সব ভক্ত-সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা গ্রাম্য সাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জ্জিত বলিয়া উচ্চ সাহিত্য কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত। এইসব গ্রাম্য গায়কেরা তত্ত্ববিদ্যার কোন ধার ধারেন না, সেটা তাঁহারা বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন। এমনি একটি কবির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ব্যাখ্যান শুনিয়া তিনি এই গানটি রচনা করেন :—

"কূলের বনেতে ঢুকেছেরে সোণার হরিণ
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি।"

বাউল সম্প্রদায় আমাদের বাংলার সেই শ্রেণী হইতে আসিয়াছে যাহারা প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়। আমি তাহাদের গান কতকগুলি আমায় লিখিয়া দিতে অনুরোধ করায় দেখি তাহারা বেশ একটু বিব্রত হইয়াছিল ; শেষে যখন ভরসা করিয়া লিখিল, আমি তাহার পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া হতাশ হইলাম, তাহাদের বানান ও অক্ষরবিন্যাস

এমনই অপ্রত্যাশিত রকম অসনাতনী। কিন্তু এইসব কবি-বাউলদের সাধন-পদ্ধতি মানব-দেহতত্ত্বের যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জটিল ও দুরবগাহ। ইহারা পথে বিপথে তাহাদের গান গাহিয়া ফেরে; আমার পথের ধারের জানালা হইতে একটি গান বহুকাল পূর্ব্বে শুনি, কিন্তু এখনও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া আছে।

"খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তারি পায়।"

এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে একমত; আমাদের বাক্য ও মন ভূমাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবু সেই প্রাচীন ঋষিগণের মত এই গ্রাম্য কবি অসীমের অভিসার হইতে নিরস্ত নন; বরং এই দুঃসাহসিক ব্রতে সার্থক হইবার একটা পন্থা আছে তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহা শেলীর সেই কবিতাটির কথা স্মরণ করায় যাহাতে তিনি সুন্দরের অতীন্দ্রিয় আবেশের বন্দনা গাহিয়াছেন।

সেই অজানা দুরধিগম্য হইলেও যে সকল সত্যের মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরেজ কবি এবং এই অজ্ঞাতনামা বাঙালী বাউল উভয়েই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য তাহার গ্রাম্য সঙ্গীত সেই অজানা পাখীর ডানার ছন্দে মুখরিত। শুধু এই প্রভেদ যে শেলীর ভাষা জনকয়েক শিক্ষিত লোকের জন্য আর এই বাউল-গান গ্রামের চাষী ও সর্ব্বসাধারণের, যাহারা এই গানের অধ্যাত্মিক অতি-বাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে না।

একটি কারণে এসমস্ত সম্ভব হইয়াছে; লোকশিক্ষার যে আশ্চর্য্য প্রণালী বহুকাল ধরিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে তাহাই সমস্ত বিকাশের মূলে; কিন্তু তাহা আজ ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের প্রাক্তন বিদ্যায়তনগুলিতে দলে দলে ছাত্রগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও আচার্য্যগণের চারিদিকে সমবেত হইত। সেই শিক্ষাসত্রগুলি গভীর ও স্থিরসলিল হ্রদের মত; সেখানে আসিতে হইলে দুর্গম পথ অতিবাহন করিতে হয়। কিন্তু সেইসব জলাশয় হইতে প্রতিনিয়ত বাষ্পোদ্গম হইয়া যে-সব মেঘ জন্মিত, তাহা বায়ুস্তরে কত প্রান্তর পর্ব্বত উপত্যকার উপর দিয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইত। পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কত গীতিনাট্য, কথক-শিল্পীর মুখে কত বিচিত্র উপাখ্যান-কথা, ভিক্ষুক বাউল গায়কের মুখে লোক-সাহিত্যের কত অমূল্য গীতসম্পদ দেশে বিদেশে প্রচারিত হইত, এবং এই মেঘপুঞ্জই ত জন-সাধারণের চিত্তক্ষেত্রকে সুসিঞ্চিত ও উর্ব্বর করিয়া তুলিত এবং যে-সমস্ত তত্ত্ব মূলতঃ অতি কঠিন তাহা সাধারণগম্য করিত। সাংখ্যযোগ ও বেদান্ত দর্শনের গভীর মতবাদগুলি লোকসাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া প্রাণের ফসল ফলাইত এবং যে অগণ্য নরনারী শিক্ষা ও অবসরের অভাবে কোন দিনই সেই তত্ত্ববিদ্যার মূল উৎসে যাইতে পারিত না, তাহাদেরও গৃহদ্বারে সেই তত্ত্বগুলিকে উপস্থিত করিত।

সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা জটিল কর্ম্মভার বহিবার জন্য একদল লোককে বাস্তব অভাবাদি দূর করিবার ভার লইতে হয়। সে দায়িত্ব যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহা

এড়ান চলে না। সুতরাং এইসব মানুষদের পক্ষে মানসিক উন্নতিসাধন করার সুযোগ হয় না। এইভাবে বিরাট্ জনসঙ্ঘ শুধু পণ্য উৎপাদনের চাপে লুপ্তচৈতন্য যন্ত্রমাত্রে পর্যবসিত হয় বলিয়াই কয়েকজন মানুষ বড় ভাব ও অমর শিল্পরূপের স্ফুরণ করে এবং বিশ্বমানবকে অধ্যাত্মসাধনার উত্তুঙ্গ শিখরে লইয়া যায়।

সমাজের জন্য এই যে-সকল ব্যক্তি আত্মবলিদান দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভারত কোনদিন উপেক্ষা করে নাই; তাঁহাদের জীবনব্যাপী শ্রমের ভীষণ অন্ধকারের উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য তাঁহাদের উপযোগী করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে এবং সহজ কর্তব্য-বোধেই তাহা করিয়াছে। কোন বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই কাজটি হয় নাই; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক ব্যবস্থার ফলেই ইহা জীবদেহে রক্তপ্রবাহের মত সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। এইজন্যই তাহার মূল উদ্দেশ্যটি চাপা পড়িলেও কাজটি চলিতেছে।

একসময় আমি বাংলার একটি সামান্য গ্রামে যাই। সেখানে প্রধানত মুসলমান চাষীদের বাস। গ্রামবাসীরা আমার জন্য একটি যাত্রা-গানের পালা অভিনয় করে। সে নাট্যের আখ্যান-বস্তু একটি লুপ্তপ্রায় ধর্মপন্থীদের শাস্ত্র হইতে আহরিত, একদা সেই ধর্মের বিস্তৃত প্রভাব ছিল। সে ধর্ম আজ প্রাণহীন, তবু তাহার বিশেষ বাণী জনসাধারণের নিকট ইহার নিজস্ব তত্ত্বটি প্রচার করিতেছে এবং শিক্ষা ও সংস্কারে সেই লোকেরা ভিন্ন হইলেও সে বাণী শুনিতে তাহাদের বিতৃষ্ণা নাই। এই সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবাদ অনুসারে উক্ত গীতি-নাট্যটি মানবস্বরূপের বিভিন্ন উপাদান, তাহার দেহ, অহংবোধ ও আত্মা লইয়া বিচার করিয়া চলিল। পরে কথোপকথন ব্যপদেশে একটি মানুষের ইতিহাস বিবৃত হইল। মানুষটি রসকুঞ্জ বৃন্দাবনে যাইতে চায় কিন্তু এক প্রহরী পথরোধ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে চৌর্যাপরাধ উপস্থিত করিল। স্তম্ভিত হইয়া মানুষটি প্রশ্ন করায় প্রহরী তাহাকে অপরাধী প্রমাণ করিয়া দিল, যেহেতু যাত্রীটি তাহার গাত্রাবরণের মধ্যে অতি সঙ্গোপনে তাহার অহংটিকে অবৈধ পণ্য হিসাবে বৃন্দাবনে আমদানি করিতে উদ্যত; অহং বস্তুটি যে মালিকের, তাহার নিজের নয়, সেটা সে স্বীকার করে নাই। সেই কমালশুদ্ধ ধরা পড়ায় অপরাধীর নিকট তার কল্পলোকের পথ অবরুদ্ধ। বাঁশের উপর ছিন্ন সামিয়ানা খাটাইয়া, ধোঁয়াটে কেরোসিনের আলোয় গ্রামের লোক ভিড় করিয়া শুনিতেছে, মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্র হইতে শৃগালের পাল চীৎকার করিয়া রসভঙ্গ করিতেছে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসে, তবু শ্রোতাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নাই। তাহারা নাটকটির অভিনয় দেখিতেছে এবং আপাত-বিসদৃশ নৃত্যগীত ও হাস্যপরিহাসের আবেষ্টনে মানব-জীবনের অনেক চরম সমস্যা ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যান চলিতেছে।

এই উদাহরণগুলি হইতেই বুঝা যাইবে, ভারতে কাব্য ও দর্শন কেমন হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। জীবনে পূর্ণতা লাভের সহজ ও সম্ভব পথটি মানুষকে ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব দর্শন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই এটি ভারতে সম্ভব হইয়াছে। সে পূর্ণতার অর্থ কি? ইহার অর্থ

সত্যের মধ্যে মুক্তি, যাহার জন্য এই প্রার্থনা জাগিয়াছে—অসতো মা সদ্গময়—কারণ যাহা সত্য, তাহাই আনন্দ।

আমি ছন্দ-শিল্পী। কাব্য-কারবারের ভিতর দিয়া আমি সত্যের একটি আনন্দরূপ উপলব্ধি করিয়াছি। চিত্তের মুক্তিপথ দিয়া সত্যের আস্বাদ দান করাই আমাদের সমস্ত শিল্পের মূল প্রকৃতি। সেই সত্যটি মনে রাখিয়া যখন আমরা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের (aesthetics) কথা বলি, তখন সৌন্দর্য্যের সাধারণ সংজ্ঞা ছাড়িয়া তাহাতে কবিগণ যে গভীরতর তাৎপর্য্য দিয়াছেন সেই কথাই ভাবি ; "সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য।" চিত্র-শিল্পী একটি জরাজীর্ণ মানুষের ছবি আঁকিলেন, ইহা দেখিতে শোভন নয়, তথাপি তাঁর সেই ছবিখানি ছবি হিসাবে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে যখন আমরা তাহার মূর্ত্তি-মূর্ত্তিটি গভীরভাবে অনুভব করি। ব্রাউনিঙ্‌এর কবিতায় ঈর্ষা-উন্মত্ত যে নারীটি বিষ প্রস্তুত হইতে দেখিতেছে এবং সেই বিষ তাহার প্রেম-ঈর্ষার পাত্রীটিকে কি-ভাবে জর্জ্জর করিবে তাহা কল্পনায় উপভোগ করিতেছে—এ-হেন নারীর মনকে সুন্দর বলা যায় না। কিন্তু যখন এই নারীর ছবিটি পরিকল্পন ও রূপস্ফুরণের সুসঙ্গতিতে আমাদের চোখের সম্মুখে জীবন্ত সত্য হইয়া উঠে, তখন আমরা এই ছবিও উপভোগ করি। মহাভারতে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্রে মধ্যে মধ্যে যে নীচতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার দরুণ শিল্পসঙ্গতির আনন্দ ইহাতে আমরা যতটা পাই, কেবল মাত্র অবিমিশ্র ঔদার্য্যের আদর্শ চিত্র হইতে ততটা পাইতাম না। নৈতিক আদর্শের পূর্ণতাটি নানা হিংসাবাদী রসের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত চরিত্রটি আমাদের কাছে সত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই ইহা আমাদের আনন্দ দেয়, প্রীতিকর বলিয়া নহে, সৃষ্টির ছন্দে সুনির্দ্দিষ্ট বলিয়া।

জীবনে যাহা আমাদের মিলে না তাহা শিল্পের ভিতর দিয়া আমরা কতকটা উপভোগ করি বলিয়াই যে শিল্পের এত মূল্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। শিল্পের আসল মূল্য এইখানে যে তাহার বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া ইহা আমাদের সঙ্গে সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। সেই শিল্প-সৃষ্টিগুলি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইবার দরকার নাই, তাহারা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে সত্য হইয়া উঠিলেই আনন্দ দেয়। শিল্পের জগতে আমাদের চেতনা ও অনুভূতি স্বার্থবন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়াই আমরা ঐক্য ও সঙ্গতির একটি অপ্রতিহত স্বপ্নরূপ উপভোগ করি ; পূর্ণসত্যের মানসী প্রতিমা বলিয়াই তাহা চিরন্তন আনন্দের উৎস।

শিল্পীর জগতে যে নিয়ম, বিধাতার জগতেও তাই ; সৃষ্টির উৎস ও চরম লক্ষ্য যে নিঃস্বার্থ আনন্দ, তাহা লাভ করিতে হইলে অহমের কবল হইতে মুক্ত হওয়া চাই। সেই মুক্তির প্রতীক্ষায় আমাদের আত্মা উন্মুখ হইয়া আছে এবং তাহার যে তৃষিত আমিটা আপাত সত্যের মরুতৃষ্ণিকার পিছনে ছুটিয়া মরিতেছে, তাহাকে সত্যের ঐক্যালোকে মুক্তি দিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছে। এই মুক্তির আদর্শটি আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে ইহা ভারতের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে এবং আমাদের সমস্ত ভাবপ্রেরণা ও প্রার্থনাকে উৎসারিত করিয়া দিব্যলোকের পানে ছুটাইয়াছে ; কাব্য-পক্ষপুটে ভর করিয়া আমাদের আত্মা ঊর্দ্ধে উড়িয়া

যায়। সংজ্ঞবিশ্বাসী তুচ্ছশিক্ষিত কত লোক দেখি তাহাদের প্রার্থনা মুক্তিদায়িনী তারাকে নিবেদন করিয়া গাহিতেছে—

"তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল্।"

আমাদের দেশের এইসব সাধারণ মানুষ সত্যের জগৎ হইতে বিচ্যুত হইবার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত; বস্তু-জগতের ফেনপুঞ্জের মধ্যে একটানা ভাসিয়া যাওয়া, পুলক-বেদনার তরঙ্গভঙ্গে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়া, জীবনের কোন চরম লক্ষ্য খুঁজিয়া না পাওয়া, ইহার মত আতঙ্কের বিষয় তাহাদের আর কিছু নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ গাড়োয়ান হাটে গাড়ী হাঁকাইয়া যায়, কেহ বা জেলে মাছ ধরিয়া বেড়ায়। তাহারা যে-সকল গান গায় তাহার গভীর অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহারা খুব সম্ভব উপযুক্ত জবাব দিতে পারিবে না, কিন্তু তাহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটি বিষয়ে সেখানে কোন সন্দেহ নাই। সেটি এই যে, সমস্ত দুঃখের কারণ জীবনের আসবাব-পত্রের অভাব নয়, জীবনের সত্য তাৎপর্য্য সম্বন্ধে চেতনার অভাব। এইজন্যই দেখি যে "আমি ও আমার" এই ভাবটার উপর অযথা জোর দিলেই আমাদের দেশের লোক তাহার নিন্দা করিয়া থাকে, কারণ 'আমি ও আমার' উগ্রবোধটা সত্যের পরিপ্রেক্ষণকে অলীক করিয়া তোলে। তাহারা যে দেখিয়াছে, সংসারের সমস্ত সম্বল পিছনে ফেলিয়া দিয়া সত্যের অভিসারে বাহির হইয়াছে কত মানুষ, যাহাদের সামাজিক পদবী বা মানসিক বিকাশ সাধারণের উপরে যায় না।

এইসকল দুর্গমপথ-যাত্রীদের যে পার্থিব শক্তি-সম্পদ বাড়াইবার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহারা যে মুক্তির ভিখারী, সেকথা আমাদের দেশের লোক বোঝে। তাহারা হয় ত এমন মানুষকে দেখিয়াছে যে তাহাদেরই মত দরিদ্র এবং গ্রামে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসায়লিপ্ত। সে তাহার দৈনন্দিন কাজ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তবু তাহার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যে সে একজন মুক্তজীব—শাশ্বত পুরুষের হৃদয়ে সে আশ্রয় পাইয়াছে। এমন একটি মানুষ একবার আমার চোখে পড়িয়াছিল; সে একটি জেলে, সারাদিন গঙ্গায় মাছ ধরিয়া ফেরে আর তন্ময় হইয়া গান গাহিয়া যায়; একজন মাঝি তাহাকে ভক্তিভরে দেখাইয়া বলিল, উনি মুক্ত-পুরুষ। সমাজ মানুষের উপর যে মামুলী নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে, এ-লোকটি তাহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে; বাজার দর অনুসারে দোকানে সাজান পুতুলের মত মানুষকে সমাজ যেভাবে সাজায়, তার কোন-কোটায় এ লোকটি পড়ে না।

এই জেলেটির কথা যখন মনে পড়ে, তখন না ভাবিয়া থাকিতে পারি না যে, বন্ধন-মুক্ত আত্মার মহাকাব্য যাহারা জীবন দিয়া রচনা করিয়া যায় তাহাদের সংখ্যা হয় ত নিতান্ত কম নয়—যদিও ইতিহাসে তাহাদের নাম কখনও দেখিব না। এইসব অবিক্ষতআত্মা সামান্য চাষাভুষা জানে যে, সম্রাট তাহার সাম্রাজ্যের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হইলে বিচিত্রবেশী ক্রীতদাস মাত্র; লক্ষপতি তাহার কর্ম্মফলে সোনার খাঁচায় বন্দী, কিন্তু ঐ সামান্য জেলেটি জ্যোতির্লোকে মুক্তি পাইয়াছে।

যখন অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া ফিরিতেছি, তখন কোন একটি জিনিষে ঠোকর খাইয়া সেইটিকে আঁকড়াইয়া ধরি এবং তাহাকে আমাদের একমাত্র আশা ও নির্ভরস্থল মনে করি। কিন্তু যখন আলোকের প্রকাশ হয়, তখন ঐ সমস্ত টুক্‌রা টুক্‌রা বস্তুকে ছাড়িয়া দিই। কারণ দেখি যে তুমার সঙ্গে আমরা সকলে সম্বন্ধযুক্ত, বস্তুগুলি ত তার অংশমাত্র। গ্রামের সামান্য লোকেরা জানে মুক্তি কি জিনিষ—অহমের বিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্তি, যাহা হইতে আমাদের অত্যুগ্র অধিকার-বোধ জাগে সেই বস্তুর ভেদলিপ্সা হইতে মুক্তি। তাহারা জানে যে কেবল মাত্র বন্ধন অস্বীকার করিলেই মুক্তি আসে না, সম্পদের হ্রাস হইলেও নয়—মুক্তি আসে আস্তিক্যবোধের সাধনে, তাহার সিদ্ধি প্রাণে বিশুদ্ধ আনন্দের প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাই গান উঠে :—

"যে জন ডুব্‌ল সখী তার কি আছে বাকি গো।"

তাই ত ইহারা গাহিয়া থাকে :—

"মনরে আমার মনের সাথে মিল্‌বি যদি আয়
দুই মনেতে এক মন হয়ে আজব সহর চলে যাই।".

এক মন আমারে বাহিরে এই বৈচিত্র্যের রাজ্যে নানা বস্তু খুঁজিয়া ফেরে আর এক মন ভিতরে ঐক্যের স্বপ্নমূর্ত্তির সন্ধানে ছোটে—এই দুই মনের মধ্যে দ্বন্দ্বটি যখন মিটিয়া যায়, তখনই আমরা 'আজব'কে, অনির্ব্বচনীয়কে উপলব্ধি করি। কবীরও এই সত্যটির প্রচার করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম কেবল মাত্র অন্তরের অধ্যাত্মলোকে বাস করেন ইহা বলিলে বাহিরের এই বস্তুলোকের অপমান করা হয় এবং যখন তাঁহাকে কেবল মাত্র বাহিরে নির্দ্দেশ করি তখনও সত্য বলি না।

এই সব বাউল গায়কদের মতে সত্য ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মুক্তি ঐক্যের সাধনে। আমাদের দৈনিক আরাধনা ও মন্ত্রাদি মনকে সেই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে যাহাতে মনকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার যত ব্যবধান আছে সব জয় করিতে পারা যায় এবং তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় যিনি অদ্বৈতম্ বলিয়াই অনন্তম্। গভীর তত্ত্বজ্ঞান বাষ্পের মত ভারতের জনসাধারণের চিত্তে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি জাগাইয়াছে। এই জ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়া দিতেছে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বাহিরে চলিয়া যাইতে, কারণ এখানে তথ্য মাত্র তথ্য বলিয়া আমাদের কাছে বিদেশী সঙ্গীতের ধ্বনির মত অপরিচিত। কিন্তু স্বরগ্রামের সহিত পরিচয় হইলে যেমন আমরা তাহাদের ঐক্যটিকে সঙ্গীত-রূপে পাই, তেমনি অন্তহীন বহু যেখানে একত্বে প্রকাশ করে, সেই সর্ব্বভূতের অন্তরতম সত্যের মধ্যে মুক্তি লাভ করিবার পরামর্শ এই জ্ঞান হইতে আসে।

এই মুক্তি একমাত্র সত্যেই আছে, সত্যাভাসে নাই; সেইজন্য ফলপ্রাপ্তির লোভে তাড়াতাড়ি যে সার্থকতার পথ কাটিয়া বসে, তাহা ঠিক পথ নহে। একজন নগণ্য গ্রাম্য কবি যাহাকে বিশ্বের মান্যগণ্য লোকেরা কেহ জানে না, যাহার মনের উপর সরকারী শিক্ষাবিভাগ তাহার

ছাঁচে-ঢালা শিক্ষার নিগড় চাপায় নাই, সেই মানুষটি গানের ভিতর দিয়া ঐ পরম সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছে।

"নিঠুর গরজী,
তুই কি মানস মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।
দেখ্‌না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়া হুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড;
এর আছে কোন্ উপায়?
কর সে মদন, দিস্‌নে বেদন, শোন নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সংজ ধারা আপন-হারা তাঁর বাণী শোনে,
রে গরজী।"

কবি জানেন জোর করিয়া মুক্তিলাভের কোন বাহ্য উপায় নাই। অন্তরের সাধন-প্রক্রিয়ায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া হারাইতে পারিলেই তবে মুক্তির দিকে যাওয়া যায়। বন্ধন তার অসংখ্য রূপে আমাদের এই অহমের মধ্যেই কেল্লা গড়িয়া বসিয়াছে। তাহা বহির্জগতে নাই। বন্ধন রহিয়াছে আমাদের চৈতন্যের নিষ্প্রভতায়, আমাদের দৃষ্টি-রাজ্যের সঙ্কীর্ণতায় এবং সর্ব্বত্র আমাদের স্বার্থী মূল্য নির্দ্ধারণের ভ্রমে।

ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে; এই সভ্যতা এক নিরবচ্ছিন্ন অভাবের তাড়নায় চালিত; এই যে দুর্দ্দমনীয় গতিবেগের অন্ধশক্তি (inertia), যাহা কোথায় কেমন করিয়া থামিতে হয় তাহা জানে না—এই আপাতমুক্তিকেই সত্য মুক্তি বলিয়া মানুষ ভ্রম করিতেছে। কোন কোন বর্ব্বর জাতি মানুষের মাথার খুলির উপর একটা মনগড়া মূল্যের আরোপ করিয়া থাকে এবং সেই সম্বন্ধে তাহাদের গাণিতিক উন্মত্ততা এমনই বাড়িয়া যায় যে, তাহারা নরমুণ্ড সংগ্রহ করিয়া আর শ্রান্ত হয় না। নিষ্ঠুর নিয়তি যেন তাহাদিগকে একটা অন্তহীন বাড়াবাড়ির পথে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহারা কেবলই যোগের পর যোগ দিয়া ছুটিতে থাকে। এই বীভৎস সংগ্রহের পথে যে অবাধ স্বাধীনতা তাহা ঘৃণ্যতম বন্ধনেরই নামান্তর। ইহাদের এই নিষ্ঠুর দাবীর তাড়না কেবল বাড়িয়াই চলে, কারণ যে-বুদ্ধি তাহাদের লক্ষ্য ও কাম্য তাহা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া নাই। সেইরূপ এ কথাটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে কেবল মাত্র গতিবেগকে বাড়াইয়া, তামসিক ভোগের আড়ম্বর ও আস্‌বাব পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া, প্রাণহিংসার যাবতীয় উপাদান ও অস্ত্রশস্ত্রের বিভীষিকা বিপুল করিয়া তুলিয়া, যাহা ক্ষান্, যাহা বিরাট্ তাহার একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কদর্য্য পরিহাসোৎসব মাত্র

করিতেছি। বন্ধনের শৃঙ্খল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং একটা নিরর্থক নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দাবীর তাড়না সমস্ত পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বে দেখি যে, জন্মগত একটি শাস্তি হইতে নিস্তারলাভই মুক্তি। ভারতে মুক্তি হয় অবিদ্যার অজ্ঞানের অন্ধকার হইতে, যে অবিদ্যা অহমকেই চরম বলিয়া মোহ উৎপাদন করে। কিন্তু যে প্রজ্ঞা আমাদিগকে এই অবিদ্যা হইতে মুক্তি দিবে তাহা শূন্যগর্ভ নহে। শূন্যতায় মুক্তি নাই। যে অবাধ সুসঙ্গত গতিবিধির ভিতর দিয়া আমরা আমাদের এই আবেষ্টন —এই পার্থিব জীবনের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারি, তাহাই মুক্তি। শূন্য নিষ্ফল নিঃসঙ্গতা নহে, সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি—ইহাই ত উপনিষদের কথা—সর্ব্বভূতে যিনি নিজের আত্মাকে মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার কাছে সত্য আর অপ্রকাশ থাকেন না।

বাস্তব জগতেও মুক্তির সেই একই তাৎপর্য্য। শুধু তাহা তাহার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যতদিন আমাদের কাছে এক দুর্ব্বোধ্য যুক্তিহীন খামখেয়ালীর প্রকাশ মনে হইয়াছে, ততদিন আমরা যেন এক অজ্ঞেয় বিজাতীয় লোক বাস করিয়াছি। তাহার মধ্যে যে আমাদের স্বরাজের স্থান আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে এই জগতের চালচলনের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে মিলনের সেই সঙ্গতির মধ্যেই যে ঐক্য ও মুক্তি দেখা দিল। অবিদ্যাই আমাদের আবেষ্টনের সঙ্গে আমাদের অনৈক্য ঘটায়। এবং বিদ্যা যাহা বস্তুজগতের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশকে বুঝাইয়া দেয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যাই ত বাস্তবজগতের মর্ম্মস্থলের ঐক্যটিকে ধরাইয়া দেয়—অদ্বৈতমকে চিনাইয়া দেয়।

জগতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে যাহারা বাড়িয়াছে, যাহারা জানে না যে জ্ঞানের দাবীতে এই জগত তাহাদেরই সেইসব মানুষ কাপুরুষতায় কায়েমী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। যে-নিয়তি অনিবার্য্যভাবে আঘাত করিয়া চলিয়াছে—যাহার বিরুদ্ধে আপিল নাই—সেই নিয়তির উপরই আশাহতদের আস্থা। এমন-কি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইতেও যখন তাহারা বঞ্চিত হয় তখনও তাহারা বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করে। কারণ তাহারা ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে যেন তাহারা জন্ম হইতেই আইনের বাহিরে এবং এ জগৎ সর্ব্বদাই তাহাদের উপর দুর্ব্বোধ্য দুর্ঘটনার উপদ্রব চাপাইবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই পর-ভাব এবং অদ্বৈতবোধের অভাবই মুক্তির অন্তরায়। মিলনের গ্রন্থিগুলির উপর জবরদস্তি চলিতেছে বলিয়াই আমাদের বন্ধন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে যাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করা যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই মুক্তি; কারণ সম্বন্ধের অর্থই হইতেছে অপরের প্রতি দায়িত্ব বোধ। কিন্তু হেঁয়ালীর মত শুনাইলেও ইহা সত্য যে, জীবজগতে অন্যোন্যসম্বন্ধবোধটি পূর্ণ করিয়া সুসঙ্গত করিয়া পরস্পরের ভার গ্রহণেই মুক্তি। উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বশে কোন দায়িত্বই স্বীকার না করা কেবল মাত্র বর্ব্বরদের পক্ষেই সম্ভব এবং সেইজন্যই বর্ব্বরদের পূর্ণ আত্মবিকাশ-সম্ভব নয়। যে আগুন ভাল করিয়া জ্বলে নাই সুতরাং ধূমজালেই আচ্ছন্ন, সেই আগুনের মতই বর্ব্বরগণ চাপা

পড়িয়া থাকে, তাহারা তামস সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। এই নির্ব্বাপিতপ্রায় তমসাচ্ছন্ন জীবনের কারাবাস হইতে তাহারাই মুক্তি পায়, যাহারা পরস্পরের সঙ্গে যোঝাপড়া করিতে ও একজোটে কাজ করিতে সমর্থ। মানবের মুক্তির ইতিহাস মানবসহযোগের পূর্ণবিকাশেরই ইতিহাস।

এই সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ব্যক্তির বা দলের স্বার্থপরতা। বিশ্বমানবের পূর্ণ বিকাশে যতদূর সম্ভব সাহায্য করাই সভ্যতার চরম লক্ষ্য। কিন্তু নৈতিক আদর্শের স্থান অধিকার করিয়া যখন কোনরকম স্বার্থপরতা অবাধে সমাজের মূল উপাদানগুলি গ্রাস করিতে বসে, তখন সভ্যতার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ গ্রাস করিবার লোভ এবং সৃষ্টি করিবার জীবন্ত শক্তি পরস্পরবিরোধী। জড়ের জগতে প্রাণই প্রথম মুক্তির জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে; কারণ প্রাণ কেবল বাহ্যিক ঘটনা মাত্র নহে, ইহা অন্তর-জগতের প্রকাশ, ইহা বস্তুর সীমা ছাড়াইয়া যায়—উপাদানের ভারে আত্মাকে আটক করিতে দেয় না, অথচ নিজের সত্য সীমাটি মানিয়া চলে। প্রাণের প্রাচুর্য্যে তাহার বৃদ্ধি ও সঙ্গতি চাপা পড়ে না; ভিতর এবং বাহির, লক্ষ্য এবং উপায় বর্ত্তমান এবং অনাগত এক সমন্বয়ে ঐক্য লাভ করে।

জীবন কেবলমাত্র সঞ্চয় করে না, পরিপাক করে। ইহার বস্তু এবং শক্তি, কর্ম্ম এবং সত্তা নিগূঢ়ভাবে একীভূত। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের জড় উপাদন যখন ওজন ছাড়াইয়া ভারবহ হইয়া উঠে, যখন তাহারা যন্ত্র এবং সঞ্চয়ের স্তূপ মাত্র, তখন আমাদের জীবন ও আমাদের জগতের মধ্যে সংগ্রামে জীবনই পরাস্ত হয়। প্রাণ-নদীর স্রোতটি ক্ষীণ হইয়া হটিয়া যাওয়ায় যে খাদ বাহির হইয়া পড়ে, তাহা অবিশ্রাম ধন বর্ষণে পূর্ণ করিতে আমরা চেষ্টা করি কিন্তু দেখি যে ধন ভরাট করিতে পারিলেও যোগ স্থাপন করিতে পারে না। সেজন্য বস্তুস্তূপের চোরাবালির চাকচিক্য বিপজ্জনক ফাটলগুলিকে শুধু লুকাইয়া রাখে। কিন্তু একদিন যখন আমরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন পুঞ্জীভূত বস্তুর ভারে হঠাৎ সব তলাইয়া যায়।

কিন্তু আসল দুর্দৈব মনুষ্যত্বের পরাভবে, বৈষয়িক অনুযোগের বিনাশে নহে। মানুষ তাহার আত্মেতনকে তাহার প্রাণে ও প্রেমে সজীব করিয়া সৃষ্টিধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহার সুযোগধর্ম্মী দুরাকাঙ্ক্ষার বশে সেই মানুষই আবার নির্ম্মম লোভের দাস হইয়া সমস্ত জগৎকে বিকৃত ও কদর্য্য করিয়া তুলিতেছে। মানুষের সৃষ্ট এই যন্ত্রজগতের বেসুরো আর্ত্তনাদ শুষ্কলের মতন নড়াচড়া মানুষের প্রকৃতির উপর বিষম প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সর্ব্বদা এমন একটি বিশ্ব-সংস্থানের স্তোতনা করিতেছে যাহা সম্বন্ধহীন ও নিরপেক্ষ। এহেন জগতে মুক্তির অবকাশ নাই; কারণ বিচ্ছিন্ন তথ্যের চাপে তাহা নিরেট হইয়া গিয়েছে। শুধু খাঁচাটাই সর্ব্বস্ব, তাহার বাহিরে আকাশ নাই। তাই জগৎটা সর্ব্বতোভাবে একটা বদ্ধ জগৎ; কঠিন খোলার ভিতর বীজের মত বন্দী। কিন্তু বীজের মর্ম্মস্থলে তখনও প্রাণ কাঁদিতেছে মুক্তির জন্য তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্তও যখন মৌন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মুক্তির জন্য এই জীবন্ত পিপাসাকে যখন কোন একটা বিরাট লোভ পদদলিত করিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়, তখন স্ফুরণশক্তিহীন বীজের মত মানব সভ্যতা মরিয়া যায়।

ভারতের মুক্তির আদর্শ নিষ্ক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা পূর্ণভাবে সত্য নহে। ঈশোপনিষৎ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের কর্ত্তব্য শতায়ু হইয়া কর্ম্ম করা। কারণ ইহার মতে পূর্ণতার নিষ্ক্রিয় আদর্শ এবং তাহার বিকাশের সক্রিয় পদ্ধতির মিলন করা চাই, অসীম ও সসীমের সমন্বয়সাধন চাই; ইহাতেই পূর্ণ সত্য। সুতরাং শুধু অসীমকেই চরম সত্য বলিয়া যাহারা অনুসরণ করে, তাহারা গভীরতর অন্ধকারে পতিত হয়; তাহাদের তুলনায় সসীমবাদীদের অধঃপতন কম গুরুতর। পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি স্বরের সমষ্টিতেই অপরিবর্ত্তনীয় সঙ্গীতের চরম তাৎপর্য্য বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয় নির্ব্বোধ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবে সঙ্গীতে স্বরের কোন বালাই নাই, তাহার নির্বুদ্ধিতা ততোধিক। কিন্তু সমন্বয় কোথায়? তুরীয়ধর্ম্ম (Transcendental) সঙ্গীত কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন স্বরগ্রামকে তাহার আত্মপ্রকাশের বাহন করিয়া লয়? ইহার সৃষ্টির পর্ব্বে পর্ব্বে যে ছন্দ, যে সীমা দেখা দেয় তাহার দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। সসীমের পন্থা অতিক্রম করিয়াই আমরা অসীমকে লাভ করি। এই কথাই ঈশোপনিষৎ ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ—
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।"

সীমার ছন্দেই আমাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং তাহার বিধিনিষেধের ভিতর দিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করি। অমৃতত্ব মাত্র এই বাহ্য জীবনের প্রসারমাত্র নহে—ইহা পূর্ণতার সিদ্ধি, ইহা জীবনের সুসঙ্গত সুন্দর সীমানির্দ্দেশ; প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমাকে প্রকাশ করে। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই উপদেশ আছে, মা গৃধঃ; লোভ করিয়ো না। কিন্তু কেন করিব না? কারণ লোভ সীমার মর্য্যাদা রক্ষা করে না বলিয়া জীবনের ছন্দকে বিনষ্ট করে; সেই ছন্দের ভিতর দিয়াই যে অসীম আত্মপ্রকাশ করেন।

আধুনিক সভ্যতায় দেখি আত্মহননকারীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহারা আধ্যাত্মিক আত্মঘাতক। এই সভ্যতায় অনিয়ন্ত্রিত বাসনা ও 'অহম্'কে অতি স্ফীত করিয়া তুলিবার অন্তহীন প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছে। জীবনের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা জীবনের সৌন্দর্য্য সম্ভোগও হারাইতেছি। অলীক কবির মত আমরা বাকচাতুর্য্যকেই শক্তি বলিয়া, বাস্তববাদকে সত্যবস্তু বলিয়া, ভ্রম করিতেছি। মধ্যযুগে যখন য়ুরোপ স্বর্গরাজ্যে আস্থাবান্ ছিল, তখন জীবনের বিচিত্র শক্তিকে ছন্দোবদ্ধ করিতে এবং সেই আদর্শের সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে; প্রবৃত্তির রুদ্রসংঘাতের মধ্যে সেই আদর্শ জীবন ডাক দিয়াছে এবং য়ুরোপের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই প্রয়াসের মূলে ছিল একটি সৃষ্টির প্রেরণা—একটি গভীর আস্তিক্যবোধ যাহা আদেশ করিয়া বলিত—লোভ করিয়ো না, আপন সীমাটি চিনিয়া লও। সুসঙ্গত সৌধের স্থান জুড়িয়া আজ অসংখ্য ইটের পাঁজা গড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিয়াছে এবং চূর্ণ ইটের গুঁড়ায় দক্ষ স্থপতির আদর্শটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে বিদ্যার সহিত অবিদ্যার বিচ্ছেদ সূচিত হইতেছে। সেইজন্যই এক ছন্দহীন শক্তি সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া এক প্রচ্ছন্ন অগ্নিদাহের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে দীপ্তি নাই, শুধু তাপ আছে।

ছন্দেই সৃষ্টি ; ছন্দেই বিদ্যা ও অবিদ্যার, সীমা ও অসীমের মিলনভূমি। অরূপের বক্ষ হইতে শতদলটি কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিল জানি না। অস্পষ্টতার গর্ভে যতদিন ইহা লুকাইয়াছিল ততদিন আমাদের কাছে ইহার কোন তাৎপর্য্যই ছিল না, তবু কোথাও সেই সম্পুট ছিল ত। কোন দুরবগাহের তলদেশ হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া অপূর্ব্ব ছন্দসীমায় ইহা ধরা দিল, আমাদের চেতনায় একটি নূতন আবর্ত্ত জাগাইল। অসীমের স্পর্শে যে আনন্দ চিনিলাম তাহা যে সীমারই দান। সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজই যে সীমানির্দ্দেশ করা ; তিনি যে বন্ধনের মধ্য দিয়াই মুক্তি পান, সীমার ভিতর দিয়াই অসীমকে পান। জড় বস্তুর উপাসনায় অসীম অতৃপ্ত। তাহা ক্রমবর্দ্ধমান আতিশয্যের পথে শুধু ছুটায়, কিছু প্রকাশ করে না ; তাহার কোন রূপ নাই। এই লোক চিরঅন্ধকারে আবৃত, অন্ধের তমসাবৃতা ; এখানে আছে শুধু মূক বস্তুপিণ্ডের বোঝা। মানুষের সত্য প্রার্থনা বৃহৎকে চায় না ; সত্যকে চায়, আলোককে চায়। তাহা অগ্নিকাও নয়, জ্যোতিরন্নের ; মানুষ অমৃতকে চায়, কালের ব্যাপ্তিতে নয়, পূর্ণের শাশ্বত গৌরবে।

মুক্তির অন্তর্লোকের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের নিকট বহির্জগতের দাবী এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সে-লোকে বস্তু আছে কিন্তু তাহার অর্থ-সিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ। সে লোকে বাঁচিয়া থাকা দাসত্ব। জীবনের সত্য যাহাতে নিহিত, অন্ধতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মানুষের পক্ষে জীবনকে পাপ বলা সম্ভব হইয়াছে। একটি পাখায় ভর করিয়া পাখী আকাশে উড়িতে গিয়া বাতাসের উপরেই ক্রোধ প্রকাশ করে—কেন সে তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল। খণ্ড সত্যমাত্রই পাপ। খণ্ড সত্য মানুষকে পীড়া দেয় ; কারণ তাহা যাহা দিতে পারেনা আভাসে তাহারই কথা মনে জাগায়। মৃত্যু আমাদের পীড়া দেয় না, কিন্তু রোগযন্ত্রণা দেয়, কারণ রোগ কেবলই স্বাস্থ্যকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকেই কাড়িয়া রাখে। অসম্পূর্ণ জগতে জীবনও পাপ ; কারণ যেখানে জীবনের অসম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ, সেখানেও তাহা পূর্ণতার ভাণ করে, শুধু পানপাত্রটি মুখের কাছে ধরে কিন্তু প্রাণ-রস হইতে আমাদের বঞ্চিত রাখে। সত্য খণ্ডিত থাকিয়া যায় বলিয়া, তাহার বিকাশ-যন্ত্রটির পূর্ণাবর্ত্তন হয় না বলিয়াই সৃষ্টির মধ্যে এত দুঃখ।

শত বৎসরের পুরাতন একটি বাউলের গান শুনাইয়া আমি আজিকার বক্তব্য শেষ করিব। এই গানে কবি অনন্তের সহিত শান্ত জীবাত্মার চিরন্তন মিলন বন্ধনের কথা গাহিয়াছেন ; এ বন্ধন হইতে মুক্তি নাই, কারণ এই পরস্পর-সম্বন্ধেই সত্য সম্পূর্ণ হয়, কারণ প্রেমই পরমতত্ত্ব, নিরপেক্ষ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বন্ধ্যতা ও শূন্যতামাত্র। অবিমিশ্র বিদ্যাতেও সত্য নাই, অবিদ্যাতেও নাই, দুইয়ের মিলনেই সত্যের প্রকাশ—উপনিষদের এই কথায় যাহা পাই, এই গানটিতেও আমরা সেই ভাবটি উপলব্ধি করি।—

"হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কী করি।

ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ,
এই কমলের যে-এক মধু রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারে না যে তাই।
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
মুক্তি কোথাও নাই।" *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিসির আদর

(জুভেনাইল কোর্টের কাহিনী)

মৃত্যুঞ্জয় মিত্র কলিকাতায় এক প্রসিদ্ধ বাজারের দারোগা। দেশ হুগলি জিলায়। ম্যালেরিয়ার ভয়ে অনেক বৎসর দেশে যান নাই। সপরিবারে কলিকাতায় কাটাইতেছেন। মিত্র মহাশয়ের সংসারে তিনটি প্রাণী। নিজে, নিঃসন্তান বিধবা ভগিনী চণ্ডীমণি, আর দেড়বৎসর বয়স্ক পুত্র হরকান্ত। প্রায় জন্মাবধি হরকান্ত মাতৃহীন। পুত্র-প্রসবান্তে মিত্রজায়া কয়েক মাস রোগে ভুগিয়া শরীর ত্যাগ করেন। চণ্ডীমণি স্বামীত্যক্ত বিষয়ের একমাত্র অধিকারিণী। মৃত্যুঞ্জয় ভগিনীর বৈধব্যাবধি তাঁহার বিষয়াদি দেখেন; আর কোন-না-কোন প্রকারে তাহার সমুদয় আয় ভোগ করেন। চণ্ডীমণি একে বয়সে অনেক বড় উপরন্তু টাকার গাছ; কাজেই মিত্র-সংসারের স্বেচ্ছাময়ী সুলতানী। এটা তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতির কথা যে, তাঁহার অবাধ স্বেচ্ছা মিত্র-পরিবারের হিতের অনুগামী। স্বামীকুলে বিশেষ নিকটবর্তী কোন স্ব-সম্পর্ক আত্মীয় ছিল না। থাকিবার মধ্যে ছিল এক শ্বশুরের ভাগিনেয়-বধূ তারিণী, তারিণীর শ্বশুরবাড়ী পল্লীগ্রামে। তিনি একটি শিশুকন্যা লইয়া বিধবা হন। অবস্থা তত ভাল নয়। কোনপ্রকারে খাওয়া-পরা চলে। একটা-না-একটা সুযোগ খুঁজিয়া অনেক সময় তারিণী মিত্র-সংসারে কন্যা সহিত আসিয়া বাস করিতেন। কখনও তাঁহার আদর-যত্নের ত্রুটি হয় নাই। মিত্রজায়া বলিতেন ননদের ননদ পর, অথচ আত্মীয়—এজন্য অধিক মাত্রায় সম্ভ্রম-সৌজন্যের অধিকারিণী। তারিণীর মেয়ে যোগমায়া চণ্ডীমণির বিশেষ স্নেহের পাত্রী। আর যতদিন হরকান্ত জন্মায় নাই ততদিন মিত্রজায়া তাহাকে নিজের মেয়ের মত দেখিতেন। একত্রে খাওয়া-শোয়া ছিল।

---

* এই অভিভাষণটি মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।

কাপড় জামা চিরুণী চুল বাঁধিবার জরীর ফিতা দিয়া মিত্রজায়া সর্ব্বদা যোগমায়াকে খুসীতে রাখিতেন। কতপ্রকার নূতন নূতন পল্লীগ্রামের দুর্লভতর তরকারী রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। তারিণীর স্বামী সুদূর সম্পর্কে মিত্রজায়ার ভাই ছিলেন। সেই সম্পর্ক ধরিয়া যোগমায়া মৃত্যুঞ্জয়কে পিসে মহাশয় বলিয়া ডাকিত। মৃত্যুঞ্জয়ও তাহার সঙ্গে নানাপ্রকার ছেলেখেলা করিয়া কোলেপিঠে তুলিতেন। যখন মিত্রজা বিপত্নীক হন তখন যোগমায়ার বয়স দশ হইতে এগার বৎসরের বেশী ছিল না। যে সময়ের কথা—তখন যোগমায়া পনেরো পার হইয়া ষোলোয় পড়িয়াছিল। অর্থাভাবে অবিবাহিতা। তেমন সুন্দরী নয় যে বিপত্নীক বর লুফিয়া লইবে। তারিণী আসিয়া অরক্ষণীয়া কন্যার উল্লেখ করিয়া চণ্ডীমণির নিকট কাঁদিতে লাগিল। ক্রন্দনের অন্তরালে ঢোঁক গিলিতে গিলিতে ভাঙ্গাগলায় তারিণী বলিল,—

"মৃত্যুঞ্জয় কি আমার জাতরক্ষা করবে? মুখের কালি মুছাবে? তারও বয়স এমন কি? আট গণ্ডার বেশীত হবে না। এখন তুমি আছ তাই সোজা পথে আছে। তা নইলে কি হ'ত তা দেবতাই জানে। ও তোমাকে মায়ের মতন দেখে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে, কিন্তু যোগমায়াকে বিয়ে করতে বল্লে কখনও শুনবে না।"

চণ্ডীমণি ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু কপালে উঠাইয়া বলিল, "কি—ই-ই! শুনবে না? তার ঘাড় শুনবে। তা নইলে আমি এক বাপের মেয়ে নই। তুমি সব ঠিক-ঠাক কর এই অগ্রহায়ণ মাসেই বিয়ে হবে। এই মাসে তো আর হবে না।"

তারিণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চণ্ডীমণির পায়ের ধূলি লইয়া বলিল,—

"তুমি বড় ভাজ বটে, কিন্তু গর্ভধারিণী মায়ের চাইতে বেশী। এত আত্মীয় কুটুম্ব আছে সবার কাছে দুঃখ জানিয়েছি। তুমি যা করলে কারো দ্বারা তা হয়নি। ধন্যি মেয়ে তুমি। যখন তুমি হাঁ বলেছ তখন না বলবার আর সাধ্যি কার?"

"মৃত্যুঞ্জয় ছেলে ভাল। আমি বড় বোন কিন্তু মায়ের চাইতেও আমাকে ভক্তি করে, কখনও কোনও কথার দ্বিরুক্তি করে না। যা যখন বলি ঘাড়পেতে শোনে। কখন কথার উপর কথা কয় না। এমন ভাই কারো হয় না। যেমন রামের ভাই লক্ষ্মণ তেমনই আমার মৃত্যুঞ্জয়।" সেই দিন এই পর্য্যন্ত।

মৃত্যুঞ্জয় ভোজনে উপবিষ্ট। সম্মুখে দিদি চণ্ডীমণি বসিয়া সুপারি কাটিতেছেন। খাওয়া অর্দ্ধেক শেষ হইতে না হইতেই চণ্ডীমণি বলিলেন,—

"মিতু, তোমার একটা কাজ করতে হবে। এতে না বলবার যো নেই।" মৃত্যুঞ্জয়ের হাতের গ্রাস হাতে রহিল। দিদির মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথার বাকীটা শুনিবার প্রতীক্ষায় রহিলেন। চণ্ডীমণি বলিলেন, "এমন কিছু ভারি কথা নয়। তোমাকে যদ্যেও হয়, না বল্লেও হয়। আর কিছু নয়—এই যে, আসছে অঘ্রান মাসে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। কার সঙ্গে জান? আমার পিসতুত দেওরের মেয়ে যোগমায়ার সঙ্গে। তুমি তাকে দেখবার দেখেছ। মেয়েটি

দেখতে তেমন আহা-মরিও নয়—তেমন দূর-ছাইও নয়—মাঝা-মাঝি।" "কি বলছ দিদি? এত বছর তোমারই কথামত বিয়ে করিনি। তার পর কত লোকে কত বলেছে আমি তাতে কানই দি নি। হরকান্ত মা-মরা ছেলে। তুমিই তার মা-বাপ হয়ে মানুষ করেছ আর করছ। আমি এতখানি বয়স একরকম সুখে দুঃখে কাটাচ্ছি। আর দু'দিন পরে তুমিত হরকান্তের বিয়ে দেবে। আমার আবার বিয়ের কথা এল কোথা থেকে? একে আমার বয়স হয়ে মাথার চুল পেকে উঠল, তার পর এখন আর 'ও' নেই যে দুটো সংসার করি। তার উপর সব কথার পর এই কথা যে ঝনে দেখেছ, তাকে ত এই বাড়ীতে মানুষ করেছ—সে এই বাড়ীর মেয়ে বল্লেই হয়। হাঁ—তার সঙ্গে আবার বিয়ে। তুমিত কখনও ঠাট্টা করো না। আজ আবার নতুন ছল?"

"তুই আমার ছোট ভাই, ছেলের মতন। তোর সঙ্গে আমি ঠাট্টা করব! কোন মুখে বল্লি এ কথা? তোর হুঁশ-দীগ্‌গি কোন জ্ঞান নেই—জায়-বেজায় যা-হোক একটা বল্লেই হল! মুখ সামলে কথা ক। তা না হলে উপসী এক কাপড়ে তোর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব আর দেশ-শুদ্ধ লোকের কাছে বোলবো যে তোর কি রকম ব্যাভার। হাড়ী বাগদী এর চেয়ে ভাল। যার খাই যার পরি তারি গলায় ছুরি মারি। বিয়ে করবি তো কর আর না হয়, এই আমি বের হই। বাবা! এমন মানুষ ত আমি দেখি নি! মায়ের বয়সী বড় বোন আর তাকে ছুতো হাঁড়ীর মতন নর্দ্দামায় ফেলা!"

মৃত্যুঞ্জয়ের খাওয়া ত কথার চোটে শেষ হল। দিদির রাগ দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। "আচ্ছা দিদি, আমি কি বলেছি যে তার জন্যে এত ব্যথা। তুমি বুঝেই দেখা না, আমি আধা-বয়সী হয়ে গেছি। এখন কি আর আমার বিয়ে করা সাজবে? যদি তোমার বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল তো এতদিন দিলে না কেন? কেউ যদি বিয়ের কথা পাড়ত তুমিত তখনি বলতে যে, হরকান্তের সৎ-মা হবার চাইতে মরণ হওয়া ভাল। মনে করে দেখ—তুমি বলতে না যে, একদিক দিয়ে বর-কনে বাড়ী ঢুকবে আর একদিক দিয়ে হরকান্তের হাত ধরে আমি বের হয়ে যাব?" চণ্ডীমণির ক্রোধাগ্নি সত্য কথার হবিঃসংযোগে অধিকতর জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন,—"বেশ ত দিব্যি দিচ্ছি। যত পুরণ কামনা আছে ঝাড়ো। তোর জ্বালায় পুড়ে খাক হয়েছি। আর ঘণ্টে মাচ্ছিস কেন? বিয়ে করবি ত কর, না হয় মাথায় এই জাঁতি মেরে রক্তগঙ্গা করে মরব।" কথাও যাহা কাজও তাহা। চণ্ডীমণি জাঁতির আঘাতে কপাল হইতে রক্তপাত ঘটাইল। মৃত্যুঞ্জয় তাড়াতাড়ি উচ্ছিষ্ট দক্ষিণ হস্তে দিদির হাত হইতে জাঁতি কাড়িয়া লইয়া বলিল,—

"থাম, থাম। যা বলবে তাই করব। এখন রক্ষা কর। ঠাণ্ডা হও, নইলে এখনি থানা পুলিশ হবে আমার হাতে হাতকড়ি পড়বে।" চণ্ডীমণি ভ্রাতার নির্ম্মম অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয় সকড়ীর ভয় দেখাইলে চণ্ডীমণি উঠিয়া স্নান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

( )

যোগমায়া এখন চণ্ডীমণির ভ্রাতৃজায়া—নূতন সম্পর্কের সহিত চণ্ডীমণির নিকট যোগমায়ার আদর শতগুণ বাড়িয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইলে চণ্ডীমণির হাতে তাঁহার আর পরিত্রাণ ছিল না। চোরের লাঞ্ছনা সহিতে হইত। যোগমায়ার জন্য চণ্ডীমণি সর্ব্বদাই ভাল কাপড় ও গহনার দাবী মৃত্যুঞ্জয়ের স্কন্ধে চাপাইতেন। ব্যয়াধিক্যের আপত্তি শুনিলেই চণ্ডীমণির আপন বিষয়ের আগাগোড়া হিসাব করিতেন। আর তাঁহার স্বামীর আমলের আমলাদের নিকট নিকাশ দিতে বলিতেন। নির্ব্বাক্ মৃত্যুঞ্জয় অবনতমস্তকে আ।পালনে বাধ্য। বৎসরান্তে যোগমায়া পুত্রমুখ দেখিলেন। এখন হরকান্ত স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। পড়াশুনার জন্য পিতৃতাড়না অসম্ভব। টুঁ শব্দ শুনিলেই চণ্ডীমণি লঙ্কাকাণ্ড ঘটান। কথা ঐ একই ছিল যে, মৃত্যুঞ্জয় স্ত্রীর কেনা গোলাম বলিয়া মাতৃহীন হরকান্ত তাঁহার চক্ষের বিষ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। হরকান্ত পিসীর আদর পাইয়া ও বাপের শাসন-অভাবে চূড়ান্ত বেয়াড়া। একদিন সে নিম্ন শ্রেণীর কোন ছাত্রের একখানা ছবির বই চুরি করিয়া আনে। মৃত্যুঞ্জয় জানিতে পারিয়া পুত্রকে প্রহরান্তে যাহার বই তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। চণ্ডীমণি দুইদিন অনাহারে রহিলেন। হরকান্ত অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হইল। চণ্ডীমণির বিশ্বাস যে বইখানা—পুত্রকে কষ্ট দিবার ইচ্ছায় মৃত্যুঞ্জয়ের ষড়যন্ত্রের ফল।

হরকান্ত একদিন গোপনে পিতার নৈশ ভোজ্য, উদরস্থ করে। মৃত্যুঞ্জয় অর্দ্ধ-উপবাসে রাত্রি যাপন করিলেন। চণ্ডীমণি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোষণা করিলেন যে, সৎ-মার অত্যাচারে হরকান্ত অনশনব্রতী হইতে বাধ্য হইয়াছে। সমস্ত ঘটনা পত্রস্থ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রদর্শিত নমুনাই যথেষ্ট।

(৩)

তের বৎসর বয়সে হরকান্ত ছাতা-চুরির অপরাধে পুলিশে ধরা পড়ে। বৈঠকখানার হাটের দিন একটি ছাতা পেরেকে ঝুলান ছিল। সেই ছাতাটা পেরেক হইতে টানিয়া লইবার সময় যাহার ছাতা তাঁহার হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ তাহাকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে আসিল। দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের মাথা হেঁট ও চোখে জল। চণ্ডীমণি ভ্রাতাকে উচ্চৈঃস্বরে ধিক্কার দিল যে টাকার মায়ায় পুত্রকে বর্ষায় ছাতা না দেওয়ার তাহার এই দুর্দ্দশা। ছেলে মানুষ স্কুলে যায়। ছাতার অভাবে এইরূপ উপায়ে ছাতা সংগ্রহ না করিয়া করে কি? ছেলেকে ছাড়িয়া বাপকে ধরিবার জন্য চণ্ডীমণি পুলিশকে বারম্বার বার্থ অনুরোধ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিলেন যে ছেলে ফেরত না আনিলে তিনি ভ্রাতার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিবেন। মৃত্যুঞ্জয় কাতরভাবে চণ্ডীমণিকে ছাতা দেখাইলেন। সে ছাতা তিনি বর্ষারম্ভে পুত্রকে কিনিয়া দিয়াছিলেন। চণ্ডীমণির রাগ বাড়িল। ছাতা যখন ছেলের পছন্দ হয় নাই তখন না কিনিবারই সমান। পিতার দোষেই পুত্র বিপন্ন। যথাসময়ে হাকিমের নিকট ১০০৲ টাকার মোছলেখা সই করিয়া পুত্রের একবৎসর সশ্রম

বহারের জন্য দায় স্বীকার করিলেন। পুত্রের সেবারকার মত অব্যাহতি হইল। এ সংবাদ গোপন রহিল না। কাজেই হরকান্তকে স্কুল ছাড়িতে হইল। চণ্ডীমণির আনন্দ যে ছেলে দিন রাত বাড়ী থাকিতে পাইবে। তাঁহার চক্ষের উপরে থাকিয়া হরকান্ত যে মানুষ হইতে পারিবে তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহ। বাড়ীতে মাষ্টারের নিকট দুই বেলা পড়িবে। অবশিষ্ট সময় অসৎসঙ্গের ষোল আনা সুবিধা। হরকান্ত যে সে সুবিধা ছাড়ে নাই তাহা যথাকালে প্রকাশ পাইবে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাটীর অনতিদূরে বিশ্বেশ্বর সিং নামে একজন হিন্দুস্থানী বাবুর বাস। তাঁহার বিষয়কার্য্যের পরিচয় সাধারণে অপরিজ্ঞাত। খোট্টা বাবুটি অবস্থাপন্ন। বসতবাড়ী নিজস্ব; তেজিয়ান ঘোড়ার জুড়ী-গাড়ী, নিত্য নির্ম্মল পোষাক দামী আতর-গন্ধে সুবাসিত। বাবুর বাংলা বলিতে বাধে না। তবে উচ্চারণ একটু বাঁকা। দানে বাবু মুক্তহস্ত। অধিকন্তু বহির্বাটীতে অনাথ বালকদিগের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমবাসী বালকগণ সকলেই পশ্চিম দেশীয়। তাহারা ভোরের অন্ধকার থাকিতে অন্যত্র যাইত। সন্ধ্যার পরে আশ্রমে আসিয়া আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাইত। কখন কখন সম্ভবতঃ আশ্রমের নিয়মভঙ্গের জন্য দণ্ডিত বালকদিগের আর্ত্তনাদ প্রতিবেশীর কর্ণগোচর হইত। আশ্রমে দিবালোকে অনুপস্থিতির জন্য বালকগণ বাস-পল্লীতে অপরিচিত।

খোট্টা বাবুর সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের ক্রমে পরিচয় হইল। বাবু হরকান্তের উপর বিশেষ সদয়। আদর করিয়া কখন জামা, কখন জুতা কিনিয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর হরকান্ত প্রায়ই খোট্টা বাবুর বাটী যাইত। নিঃসন্তান বলিয়া খোট্টা গৃহিণী হরকান্তকে পুত্রনির্ব্বিশেষে দেখেন, এই কথা চণ্ডীমণির মুখের বুলি হইয়াছিল।

(৪)

লাল সিং নামে একটি চৌদ্দ বৎসর বয়সের পশ্চিমে বালক বিচারের জন্য ছোকরা-আদালতে উপস্থিত। চুরির মোকর্দ্দমা। ফরিয়াদী বাঙ্গালী বাবু। তাঁহার উক্তি এই যে, লাল সিং সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়ী ঢুকিয়া একটি জ্যাকেট আর একখানি সাড়ী লইয়া বাহির হইবার সময় বামাল-শুদ্ধ ধরা পড়ে। ছেলেটার চেহারা দেখিয়া হাকিমের সন্দেহ হয় যে সে পাগল। এজন্য তাহাকে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে পাঠাইবার হুকুম হয়। পরীক্ষাতে ডাক্তার মত প্রকাশ করেন যে ছেলেটা পাগল নয়; কোকেন খোর। কাজেই বিচারের প্রয়োজন। সাক্ষীর মুখে অপরাধ আপাততঃ সপ্রমাণ। তখন হাকিমের জিজ্ঞাসায় আসামী লাল সিং দোষী বলিয়া স্বীকৃত হইল। কাঁচা বয়সের চোরের কি বিহিত তাহার নির্ণয়ার্থে হাকিম তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতে চাহিলেন। লাল সিং নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিল যে সে আরা জিলার এক অবস্থাপন্ন ছত্রীর পুত্র। চাষবাস আছে। হরমুখ দাস নামে তাহাদের এক প্রতিবাসী কলিকাতায় কাজ-কর্ম্ম করিয়া বেশ দু'পয়সা করিয়াছিল। যখন সে দেশে যাইত তখন

তাহার চাল-চলন উদ্ধবের বলিয়া সকলেরই লক্ষ্য পড়িত। লাল সিং তাহার বিশেষ আদরের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েকদিন সে লাল সিংকে একান্তে বুঝাইয়াছিল যে, কলিকাতায় গিয়া সে গাড়ী-ঘুড়ী চড়িয়া বিশেষ সৌভাগ্যবান হইতে পারিবে। কিন্তু তাহার বাপ মা তাহাকে কিছুতেই বিদেশে যাইতে ছাড়িয়া দিবে না। লাল সিং যদি সেই সৌভাগ্যের প্রত্যাশী হয় তাহাকে গোপনে বাপ মা ছাড়িয়া কলিকাতা যাইতে হইবে। ছেলেমানুষের মন উর্ব্বরা জমী। অচিরে হরসুখ দাসের উপদেশের বীজ ফলিয়া উঠিল। হরসুখের নিকট রেলের টিকিট ও পাথেয় লইয়া লাল সিং কলিকাতা যাত্রা করিল। কথা ছিল যে অব্যবহিত পরের মেলট্রেণে হরসুখ ছাড়িবে। লাল সিং হাবড়া পৌছিবার পূর্ব্বেই সে পৌছিয়া ষ্টেশনে তাহার জন্ত অপেক্ষা করিবে। কার্য্যেও তাহাই হইল। হরসুখ লাল সিংকে লইয়া বিশেশ্বরের বাড়ীতে রাখিয়া যায়। সেখানে ছেলে ভুলাইবার জন্ত তাহার আমোদের যথেষ্ট আয়োজন ছিল। পুরাতন ছেলেরা সকলে আহারান্তে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদের কেহই বাড়ী ফিরিত না। খিড়কীর দরজা দিয়া একে একে বাড়ী ঢুকিত। আর তৎসংসর মাল-খানায় জিনিস-পত্র রাখিয়া বাহিরের বাড়ীতে নিজস্থানে আশ্রয় পাইত। লাল সিংএর কথায় প্রকাশ পায় যে, সেখানে দুই চারিজন ছাড়া সকলেরই এক বা ততোধিক পুরিয়া কোকেন পাইবার ব্যবস্থা ছিল। কর্ত্তার মনোমত কার্য্য না করিবার শাস্তিস্বরূপ ছিল অল্প মাত্র কোকেনপ্রাপ্তি, লাল সিং প্রথমতঃ কৌতূহল বশতঃ অল্প অল্প করিয়া কোকেন খাইতে আরম্ভ করে। ক্রমে সেটা অপরিত্যাজ্য অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায়। তখন কর্ত্তার হুকুম যে, অন্ত ছেলেদের মত লাল সিং প্রতিদিন কোন-কিছু রোজগার করিয়া না আনিতে পারিলে আর কোকেন পাইবে না। কয়েকদিন সে শুধু হাতে ফিরিয়া আসিত আর কোকেন সম্পূর্ণ মাত্রায় না পাইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিত। অধীর হইয়া সঙ্গীদিগকে দুঃখ জানাইলে তাহারা নির্ব্বুদ্ধির জন্ত লাল সিংকে ধিক্কার দিয়া চুরি করিবার পরামর্শ দেয়। বলে যে, তাহারা সকলেই চুরি করে আর সেই চোরাই মাল জমা দিলেই পূর্ণমাত্রায় কোকেনলাভে কৃতার্থ হয়। লাল সিংএর বেলাও শোনা কাজও হইল সেইরূপ। এতদিন সে ধরা পড়ে নাই। যেদিন ধরা পড়ে সেদিন ব্যবহারের একটুকু উলটা-পালটা হইয়াছিল। পূর্ব্বে কখনই সে দিনের বেলায় কোকেন খায় নি। কার্য্য সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিয়া তবে কোকেন খাইত। সেদিন পূর্ব্বাবধি কাপড়ের ভিতর লুকান দুই পুরিয়া কোকেন খাইয়া পরে চুরি করিতে যায়। সেই জড়বৎ অবস্থায় ধরা পড়িয়া এখন সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

হাকিমের আদেশ মত লাল সিং হাজতে রহিল। এ-দিকে তাহার পিতাকে পুত্রের সবিশেষ খবর দিয়া পত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসা করা হইল যে তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ হিতের জন্ত কোন সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ কিনা।— পত্রের উত্তর না পাইয়া হাকিম লাল সিংকে হাজারিবাগে

বালক-অপরাধীর সংশোধনের জন্য যে স্কুল আছে সেই স্কুলে চারি বৎসরের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

(৩)

লাল সিং তখনও আসামীর কাঠগড়ায়, এমন সময় পাহারাওয়ালা হরকান্তকে গ্রেপ্তার অবস্থায় বিচারের জন্য হাজির করিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র লাল সিং বলিয়া উঠিল ;—

"রাম রাম, বাবুজি আপভী হিঁয়া আয়া।" 'চুপ চুপ' বলিয়া চীৎকারশীল পাহারাওয়ালা লাল সিংকে ধরিয়া বাহির করিবার সময় সে হরকান্তের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। হরকান্ত আর সে হরকান্ত নাই। মুখ শুকান, ছাইএর বর্ণ চোখ জ্যোতিহীন লক্ষ্য শূন্য, ঠোঁট কালি-মাখা, গাল চড়ান, গমন শিথিল।

হরকান্তের নামে নালিশ এই যে, সে একটি ছোট মেয়ের হাত হইতে সোনার বালা চুরি করিয়াছে, মেয়েটির বয়স একবৎসর পূর্ণ হয় নাই। তাহাকে কোলে করিয়া তাহার কাকা হেদুয়াতে বেড়াইতেছিল, এমন সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়া সকলে সত্বর বাহির হইয়া যাইতে সযত্ন। সেজন্য বাহির হইবার পথে ভিড়। হরকান্ত সেই ভিড়ের ভিতর হইতে মেয়েটির হাতের বালা টানিয়া লইতে গিয়া ধরা পড়ে। যথাকালে জিজ্ঞাসিত হইয়া হরকান্ত অপরাধ স্বীকার করিল। কি করিলে ছেলের হিত হয় তাহার বিচারের জন্য হাকিম মৃত্যুঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনি ভদ্রলোক জানেন ত একটা কুকুর যদি পোষেন ত তার জন্য অন্ততঃ একটা শিকলী রাখতে হয়; আর নিজের ছেলের সম্বন্ধে কোন শৃঙ্খলা নাই। এ কি-রকম ব্যাভার ?"

চক্ষের জলের সহিত মিশাইয়া মৃত্যুঞ্জয় পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনাগুলি বিবৃত করিলেন। তাহার ফলে হরকান্ত হাজারিবাগের স্কুলে গেল, আর মৃত্যুঞ্জয় স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিকল্পে একশত টাকা দান করিয়া মোছলেখারি দায়ে মুক্ত হইলেন। চণ্ডীমণির পরবর্ত্তী ইতিহাস অপরিজ্ঞাত।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সত্যসন্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ

মনুষ্যকে একদিন না-একদিন নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতেই হয়। জগতের এ মহা নিয়মের প্রতিরোধ করে এমন মহাবলী কে আছে? জগদীশ্বরের রাজ্যে প্রত্যেকটি নিয়মের মধ্যে অন্তর্নিহিতরূপে পরম কল্যাণ বিরাজিত, একথা যদি মিথ্যা না হয় তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে জগতের মঙ্গল হইয়াছে ইহাই মনে করিতে পারি। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের স্থূল দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যে হিমাদ্রি-শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহার অভাব পূরণের দ্বিতীয় পাত্র না দেখিয়া স্বতঃই কিন্তু অবসাদ ও দুঃখের মেঘে হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হইতেছে। আমাদের এই অকালমৃত্যু-প্রবণ বাঙ্গালী-সমাজে দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধু চারিত্রিক সংযম এবং অন্তর-বাহিরের প্রকৃত পবিত্রতার বলেই সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন ইহা ভুলিলে চলিবে না। দ্বিতীয় কথা, আমাদের উপন্যাস-বহুল সাহিত্যরাজ্যের যাঁহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রষ্টা, তাঁহাদের পক্ষে যদি এই দুর্গম ধর্মনারণ্যের পথিকটির জীবনচরিতের সহিত কিছু পরিচয় হয়, তাহাও মঙ্গলপ্রসূ হইবে।

এ জগতে সত্যের পথ সর্ব্বত্রই যে কণ্টকাবৃত এ কথার মিথ্যাত্ব দুই একটি সাধকের চরিত্রালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয়। কচিৎ এক আধটি শুদ্ধাত্মার ঐকান্তিকী নিষ্ঠার ফলে জ্যোতিঃযুক্ত সত্যদেব ধ্রুবতারার ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকেন,—অণিমা, লঘিমাদি যোগ সম্পৎ তাঁহাদের প্রয়োজনই হয় না। সত্যসন্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ সহজ বিশ্বাসে ও সরল নিষ্ঠার দ্বারা ব্যথা-ভয়-হারী সেই অনন্তকে যেন অপরোক্ষরূপে দেখিতে পাইতেন;—জ্ঞানারণ্যে নিত্য শ্রামামাণ এই আরণ্যক ঋষি উপাস্য ব্রহ্মণ্যদেবকে একান্ত সরলতার সাহায্যেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু যদি ভারতবর্ষের মাপকাঠিতে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি তবে দেখিব "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য" এই কথা তাঁহার জীবনে সুন্দররূপে খাটিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথকে আমি একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া আঁকিতে চাই না, কেননা যেখানে আঁধার থাকে না সেখানে আলোকের বর্ণনার দ্বারা আলোকসৃষ্টির নগণ্য চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন—বস্তুতঃ শক্তি-বুদ্ধিহীন অপদার্থ ব্যক্তিকেই অতিরঞ্জিত করিয়া আঁকিবার ভ্রমাত্মক পন্থা ক্ষেত্রবিশেষে অনেকে অবলম্বন করিয়া থাকেন;—যোগ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে সে পন্থা কুপথ বটে। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য" এই কথাটি বড় মূল্যবান। আত্মা স্বতঃই যাহার মধ্যে স্ফুরিত হন কেবল তাঁহার পক্ষেই আত্মোপলব্ধি সহজ হয়। পরন্তু বহুশাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না, হইতেই পারে না। তাই আত্মসমর্পণের কথা উঠে, দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্য দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন,—এ পথে ধনসম্পত্তি বা আত্মীয় পরিজনের নিকট হইতে কোন বাধা কার্য্যকরী হয় নাই। ভোগস্পৃহাকে সংযত করিবার মত মনোবল

যাহার আছে তাহার পক্ষে ভোগ্য বস্তুর প্রলোভন অকর্ম্মণ্য-তো হইবেই। যে মহাপুরুষ দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া যাবজ্জীবন কঠিনতম আয়াসসাধ্য দুর্ব্বোধ্য দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিশ্বদেবতা পর্য্যন্ত স্বয়মাগত,—যুগ-পূজ্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ এরূপস্থলে সংঘটিত না হইয়াই যে পারে না।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিত্রালোচনায় আমাদিগকে অতীত এবং বর্ত্তমানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। দীর্ঘজীবী দ্বিজেন্দ্রনাথের কিশোর-যৌবনে সমাজের যাহা অবস্থা ছিল তাহা এখন আর নাই। কিন্তু তিনি পূর্ব্বতন যুগে যাহা দেখিয়াছেন বর্ত্তমান যুগে সামাজিক অবস্থা তদপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইলেও একটি বিষয়ে তাঁহার মনে একটা আত্যন্তিক দুঃখ ছিল এই যে,—বর্ত্তমানের মানুষগুলি জ্ঞানরাজ্যের দিকে বড় অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। অনেক কুসংস্কার নষ্ট হইয়াছে, অনেক অন্ধতা অপসারিত হইয়াছে, কিন্তু একনিষ্ঠভাবে বিদ্যাচর্চ্চার প্রবল প্রয়াস অত্যল্প ব্যক্তিই করিতেছে। ইহাই তাঁহার দুঃখকে জাগ্রত করিত। এ কথাও অবশ্য তিনি ভুলেন নাই যে, "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ", তথাচ যে পথের তিনি পথিক ছিলেন, এ পথে তাঁহার সহযাত্রীর সংখ্যাল্পতা তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিষণ্ণ করিয়া তুলিত। তিনি দর্শন-রসিক হইলেও তদীয় সারস্যপ্রহৃত রহস্য-রঙ্গ বিবুধবৃন্দের চিত্তকে নন্দিত করিত। তাঁহার চরিত্র হইতে আমরা শিখিয়াছি —একান্ত অভিনিবেশ থাকিলে দুর্ব্বোধ্য বিষয় সকলও কেমন সহজ হইয়া আইসে। দর্শনশাস্ত্র লইয়া তিনি যেন খেলা করিতেন এবং ঐ জিনিসটি তাঁর অত্যন্ত অধিগত ছিল বলিয়াই উহা এক চিত্তাকর্ষক অভিনব প্রণালীতে প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইতে পারিতেন। অমন সরল পন্থায় দর্শনশাস্ত্র বুঝাইবার মতো লোক এ দেশ হইতে একরূপ তিরোহিত হইল বলিয়াই মনে হয়। মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—আরও কত কত প্রতীচ্য মনীষিগণ দ্বিজেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিতেন তাহার সংখ্যা নাই;—গ্রুস, পিয়ার্সন, সিলভাঁ লেভি প্রভৃতি বৈদেশিক পণ্ডিতবৃন্দ দ্বিজেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন,—শ্রদ্ধার যোগ্য জ্ঞান-বুদ্ধির প্রগাঢ়তা তাঁহাতে ছিল। এককালে (১৩২৬ সালে) আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনার স্কুল-কলেজের অর্জ্জিত বিদ্যা কতদূর?" তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন;—"আপনি আমার জীবনী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বাপেক্ষা আমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—চক্ষুও কতকটা নিস্তেজ হইয়াছে—আমার এইরূপ অবস্থাকেই আমি রূপকচ্ছলে বলিয়াছিলাম ভগ্নপক্ষ জটায়ুবৎ। আমার পঠদ্দশায় স্কুল-কলেজের প্রতি আমার নিতান্ত বিতৃষ্ণা ছিল। যাহা কিছু সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছি সমস্তই আমাদের বাড়ীর মাষ্টার পণ্ডিত ও আমাদের আলাপী দেশহিতৈষী সজ্জনগণের সঙ্গ এবং শিক্ষার প্রসাদাৎ।" বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখককে পত্র লিখিবার সময় তিনি লিখিতেন, "আপনার ব্যথার ব্যথী দ্বিজেন্দ্রনাথ।" এই আত্মীয়তা-বোধ সর্ব্বত্র প্রসারিত

হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই বোলপুরের আমলকী-কুঞ্জের পক্ষিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজেদের ব্যথার ব্যথী আত্মীয় মনে করিয়া কাছে ঘনাইয়া বসিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বারা অনূদিত "মেঘদূত" এবং তাঁহার মৌলিক কাব্য "স্বপ্নপ্রয়াণ" ও অপরাপর প্রবন্ধনিচয় একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি অনেক লিখিয়াছেন, সেগুলি যেন ভারত-ভারতীর ভাণ্ডারে সযত্নে পরিরক্ষিত হয়, ইহাই ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র সুধীন্দ্র, অরুণেন্দ্র, কৃতীন্দ্র প্রমুখ সুধীবৃন্দের নিকট নিবেদন করিয়া রাখিলাম।

গ্লাডষ্টোন অতি বৃদ্ধ বয়সে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশোচিত কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর ভারতবর্ষের এই সু-প্রাচীন জ্ঞান-বৃদ্ধ পুরুষের আটকোশের মৃত্যুকাল-ব্যাপী তত্ত্ববিস্তালোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে এ-দেশেও ঐরূপ আদর্শের অভাব নাই। এ-দেশেও এক বৃদ্ধতম বিরাট পুরুষের মধ্যে তেজস্বিনী চিন্তাশক্তি পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করিতেছিল। সত্যসন্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যই একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন।

শ্রীনারায়ণ ভারতী।

উড়োপত্র *

ওঁ

মোহিনীমোহন,

আর দুই আছে কন্যা
শান্তি আর ভ্রান্তি,
হাসি কান্না ছাড়ে যেই
লভে সেই শান্তি।
হাসি কান্না দু' সতীনে
দোঙে যারে মারে,
তেসরা সতীন ভ্রান্তি
পেয়ে বসে তারে।
তা'হ'লে গৃহপতির
রক্ষা নাহি আর,
শ্মশান হইয়া যায়
সোনার সংসার।

---

* দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত।

অ্যাকে করি কর্ণধার
　ভবের দুর্দ্দিনে।
ভাল করিয়াছ তুমি
　ছাড়ি দু' সতীনে।
দিব্যধামের নব অধিবাসী
প্রাণাধিক সতুর বিরচিত।
সম্পদ বিষময় তোমা-বিহীনে,
জীবন মৃত্যু-সমান।
বিপদ সম্পদ তব পদ লাভে,
মৃত্যু সে অমৃত-সোপান॥
　　মৃতামৃত ব্যাঙমা
　　ওর্ফে
　　অর্দ্ধমৃত জটায়ু।

মোহিনীমোহন,

বিগত পত্রে—Phoenix এর বাংলা নাম দিয়াছি ব্যাঙমা। এ নামটি নিতান্ত অসঙ্গত নয় যেহেতু উভয়েই ছেলেভুলানিয়া উপন্যাস মুলুকের পক্ষী।

প্রতিবাদী॥ ব্যাঙমা শব্দ বিহঙ্গমের অপভ্রংশ। পক্ষীনামাই বিহঙ্গম, সুতরাং তোমার বাংলা অনুবাদটা অতিব্যাপ্তি দোষে দুষিত।

ব্যাঙমা বাদী॥ বৈষ্ণব গ্রন্থে যেখানে গৌরাঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে সেখানে গৌরাঙ্গ শব্দে চৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়া আর কোন গৌরাঙ্গ পুরুষ বুঝায় কি?

প্রতিবাদী॥ না, বৈষ্ণব গ্রন্থে গৌরাঙ্গ শব্দে চৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না।

ব্যাঙমাবাদী॥ তেমনি বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ব্যাঙমা শব্দে Phoenix ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না।

বৃদ্ধ জটায়ু।

মোহিনীমোহন,

পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেম ধনং
কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছং সকলং।
যাতি মোহান্ধ তমঃ প্রেম রবেরভ্যুদয়ে
ভাতিতত্ত্বং বিমলং॥

ভগবৎ প্রেম (in disguise)

প্রেয়সী ॥ এলে তুমি কাঁপায়ে মহী, রথের যেন তুরগ।
বিদেশ হইতে আগত প্রাণস্বামী ॥
মহী কোথায় জানি না আমি, স্বরগ এ স্বরগ।
অশ্রুরাশিতে গলিয়া গেল, বিন্ধ্য হিমাচল,
নিভিয়া গেল যুগান্তের দুঃখ দাবানল।

প্রেয়সী ॥ কী এনেছ সে-দেশ থেকে দেখিতে গিয়াছে সাধ।

প্রাণস্বামী। এনেছি উপবাসী হিয়া, ক্ষমহ অপরাধ ॥
অগস্ত্য মুনি এক দেথা করিয়াছে বাসা।
গ্রাসিয়া সুখ-পারাবার মিটিছে না পিপাসা ॥

কেমন লাগ্‌লো আমাকে লিখে জানালে সুখী হব।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মোহিনী,

হোম করি ওঁ ঋপি প্রত্যহ,
ধরি সাবিত্রী আলো।
সর্ব্বে নমি পূর্ণভাবে
আছি এতে আমি ভালো ॥
গৌরাঙ্গ সনে কভু কভু,
করি পুতুল খেলা।
আসিছে ওই পৌষ,
জমবে খুব মেলা ॥
চক্ষে দেখা দিবে কি
না থাকিবে আড়ালে ?
বিধাতা জানেন, মোর
কি আছে কপালে ?
আসিবে কি আসিবে না—
বিষম সমস্যা।
এলে হবে পূর্ণিমা,
না এলে অমাবস্যা।

এস যদি কটি বাঁধি
জটায়ুর নীড়ে,
ছাদিব গরম প্রেমে
ভয় নাই ভীড়ে।

বৃদ্ধ জটায়ু।

শান্তিনিকেতন
মঙ্গলবার

মোহিনীমোহন,

বিগত পত্রের নাম-বাক্যে আমার অবস্থার কথাটা কথঞ্চিৎপ্রকারে আমি বলিয়া খালাস হইয়াছি। এখন তোমার অবস্থার কথাটা থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে হইতেছে, এবং যদিও তাহা বলিতে বাধ বাধ ঠেকিতেছে কিন্তু তোমার ন্যায় ব্যথার-ব্যথিকে বলিতে হানিই বা কি? অতএব বুক ঠুকিয়া বলিয়া ফেলি ;—

মোহিনী-সুখ-নিদ্রাভঙ্গে তুমি এখন ফাঁকা-মোহন হইয়া সবদিক ফাঁকা দেখিতেছ তাই তোমার কানে আমার এ পত্রটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে এটা আমি বেশ বুঝি তথাপি আমার লেখা বাতিক আমি সামলাইতে পারিতেছি না।

যে এক (আত্মশক্তি) সিংহবাহিনী মহাদেবী ;—
যস্মিন দেবে পরাভক্তি ;
যথা দেবে তথা গুরৌ।

এই উপনিষদ-উক্ত বচনটির উপলক্ষিত পরাভক্তি তোমার হৃদয়ে আপনার অটল মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই মহাদেবীকে সহায় করিয়া তুমি কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভয়াবহ সংসারে জাহাজ চালাইতে পিছপাও হইতেছ না একটুও—ধন্য তুমি, ধন্য তোমার গুরু, ধন্য জগদীশ্বর!

সাবাস মদ্দ, জীতা রহো বাবা—

Phoenix
ওর্ফে জটায়ু।

মোহিনীমোহন,

তোমার আন্তি-দস্তরিত শেষ পত্রের উত্তরে তোমাকে আমি নিম্নলিখিত গুণ-পরিচায়ক প্রতিষ্ঠা-পত্রখানি লিখিয়া দিলাম। গদ্যে হোক—পদ্যে হোক—প্রাপ্তিসংবাদ দিতে কাতর হইও না।

চাণ্ গো ঝাহু পণ্ডিত—দিলা উপদেশ।
সেনা-রিপুসেনার রাখিতে নাই শেষ॥
না যাবৎ লেখা মোর পৌঁছায় কূলে।
চালাই লেখনী তাই ত্রিজগত ভুলে॥
বিধির লেখনী-দণ্ড বিধির বাহির।
এবার তোমার জিত আমার হাইর॥
বুড়া সিংহ ভীমরথী একা বধে শ'শো।
বালাভিমন্যুর কাছে বনি গেল শশ॥
শিবে পাওয়া শিব তুমি—মুক্তি-পথে ফিরো।
বিষে তোমার কি করিবে? বেঁচে থাক চির!
এ জন্মের শিব-সহব্যথী
দক্ষ দ্বিজপতি।

রিক্তদেহ

"চিত্তের" দেহ মৃত্যু নিয়েছে, চিত্ত নিয়েছে দেশ।
রিক্ত করে' সে সকল বিত্ত রাখেনি কিছুর লেশ।
আপন পরাণ দেছে সে উজাড়ি', দেছে সে আপন গেহ।
অবশেষ যাহা, মৃত্যু নিয়েছে— তাহার রিক্ত দেহ!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

নাটোরের মহারাজা

মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সম্বন্ধে কিছু লেখবার জন্য অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছেন। অনুরোধের কারণ স্পষ্ট। আমি একজন লেখক উপরন্তু আমি ছিলুম

মহারাজার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং অনেকেই মনে করেন যে আমি তাঁর দেহমুক্ত আত্মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করবার একজন উপযুক্ত পাত্র।

কিন্তু এই দুই কারণেই এ বিষয়ে আমার পক্ষে আপাততঃ নীরব থাকাই স্বাভাবিক। বন্ধু বিয়োগে যে-সকল স্মৃতি যে-সব কথা বন্ধুর মনকে আকুল করে, সে-সব কথা সর্ব্বজন-সমক্ষে চেঁচিয়ে বলবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়তঃ সে-সব কথা বলবার আর্টও আমার কলমের মুখে নেই। আমি হচ্ছি সেই দলের লেখক যারা আইডিয়া নিয়ে কারবার করে, মানুষ নিয়ে নয়।

তবে আপনি যখন আমাকে বঙ্গসাহিত্যের দিক থেকে মহারাজার সম্বন্ধে আমার কি বলবার আছে সুধু সেই কথা বলতে অনুরোধ করেছেন, তখন এ-বিষয়ে আমার ধারণা আমি প্রকাশ করছি।

মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ, বাঙলার সেই দলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন—যাঁদের বাঙলা-ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক ও ঐকান্তিক প্রীতি ছিল। মনে রাখবেন এ প্রীতি আমাদের সমাজে অতি দুর্লভ। আমরা অনেকেই লিখি কিন্তু আমরা সকলেই সাহিত্যের প্রতি সমান অনুরক্ত নই। মানুষে লেখে নানা উদ্দেশ্যে। কারুর বা লেখার মূলে আছে স্বদেশ-প্রেম, কারুর বা পলিটিক্যাল মনোভাব, কারুর বা ধর্ম্মবুদ্ধি। এ সকল মনোভাবের কোনটিই সাহিত্যের অ-বিষয় নয়। কিন্তু যে-গুণে লেখা সাহিত্য পদবাচ্য হয় সে-গুণ হচ্ছে সকলপ্রকার উদ্দেশ্য-মূলক বস্তুর অতিরিক্ত। কাব্যরসের প্রতি অনুরাগই যথার্থ সাহিত্য-অনুরাগ। মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ, কাব্যরসের একজন খাঁটি রসিক ছিলেন।

পৃথিবীর সকল যুগে সকল দেশেই তাঁরাই হচ্ছেন সাহিত্যের পরম বন্ধু, যাঁরা সাহিত্য-রসের মর্ম্ম জানেন, আর যাঁদের কাছে সাহিত্য যথার্থই অতি প্রিয় সামগ্রী। প্রধানত এই হিসাবেই জগদীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙলার সাহিত্যিক মাত্রেরই একজন অকপট বন্ধু।

(২)

বাঙলাদেশে প্রায় সকলেই জানে যে সঙ্গীত ছিল তাঁর অন্যতম আরাধ্য বস্তু। সঙ্গীতের ভাষায় যাদের বলে সমজদার—মহারাজ ছিলেন তাঁদের ভিতর একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। অপরপক্ষে তিনি সঙ্গীত-কলার একজন বিশেষজ্ঞ গুণীও ছিলেন। আমাদের সমাজে যাঁরা সখ করে সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন তাঁদের ভিতর ৺জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যেমন ছিলেন সুরবাহার-সিদ্ধ, তেমনি মহারাজ ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গী।

সঙ্গীতের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন যুগপৎ ভোক্তা ও কর্ত্তা।

জগদীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার যে স্পষ্টই বিশেষত্ব ছিল তা বাঙলার লেখক ও পাঠক মাত্রেই জানেন। আমি অবশ্য গদ্য রচনায় ও-পথের পথিক নই। তবুও—ওরূপ রচনা-রীতি যে মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাণীর সঙ্গে ধ্বনির যোগ যে অতি ঘনিষ্ট, সঙ্গীত-প্রাণ জগদীন্দ্রনাথের কাছে এ সত্যটা অতি সুস্পষ্টই ছিল। উপযুক্ত সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ও তাঁর আমাদের পাঁচজনের অপেক্ষা ছিল

ঢের বেশি ঘনিষ্ট। সংস্কৃত কাব্যের গৌরব যে তার ধ্বনির ঐশ্বর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কালিদাসাদি কবির হাতে বাণীর ও ধ্বনির পূর্ণ মিলন সাধিত হয়েছে। মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ বাঙলা গদ্যে সেই যুগল-মিলনের প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা অনেকে বাঙলা ভাষার স্বচ্ছতার পক্ষপাতী। তাঁর প্রিয়বস্তু ছিল তার বর্ণাঢ্যতা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রূপকথা

নীল সাগরের অতল তলে সাগররাজের সাগরদেশ। সাগরজল যেখানে বাতাসকে স্পর্শ করেছে, তার অনেক নীচে সাগরপুরী। ডুবুরির দল সেখানে কোনদিন পৌঁছুতে পারে নি। সাগরজলের সেই অতল তলে সাগরদেশের অধিবাসীরা বাস করে।

সাগরদেশেও গাছপালা আছে, জলের স্রোতের ছন্দে হেলে-দুলে তারা নেচে ওঠে। সে-দেশের গাছপালার পাতার মধ্য দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের দল সাঁৎরিয়ে চলে। সে-দেশের গাছে গাছে বিচিত্র সব ফুলের হাসি বিচিত্র শোভায় জেগে ওঠে। সে-দেশের গাছে গাছে ফলের সম্ভার সাগরবাসীদের প্রাণে আনন্দ জাগিয়ে দেয়। কিন্তু সে-দেশের জনপ্রাণী কথা বলে না—সে-দেশের ফুল সৌরভ বিতরণ করে না। শব্দহীন গন্ধহীন বিচিত্র সে সাগরদেশ।

সাগরদেশের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে সাগররাজের বিচিত্র রাজপ্রাসাদ! সাগর-ছেঁচা মাণিকে সাজান ঝিনুকের সুদৃশ্য দেয়াল। মহার্ঘ্য স্ফটিকে রচিত তার বাতায়ন।

এই অপূর্ব্ব প্রাসাদে থাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকন্যা! চারধারে আনন্দের ঢেউ। কিন্তু সেই ঢেউয়ের সীমানা পেরিয়ে দিগন্তহারা কল্পনা সাগররাজার মেয়ের বুকে বেদনা জাগিয়ে তুলেছে; রাজকন্যার মনে সুখ নেই! সে শুধু বসে বসে ভাবে, সাগরের ওপারে যে মানুষের দেশ আছে, সেই অজানা দেশের অজানা কাহিনী! স্ফটিকের জানলা খুললে চোখে পড়ে সাগরের স্নিগ্ধ নীলের ওপর যে আলোক-রশ্মি, তারই আভাষ! মাঝে মাঝে সেই স্নিগ্ধনীলে আঁধার ছাপ ফেলে মেঘের মত মন্থরগতিতে যে জাহাজ চলে যায়, চিরস্তব্ধ সেই সাগরদেশে মানবদেশের সাড়া নিয়ে আসে জাহাজের সেই শব্দ! রাজকন্যার

প্রাণে সুরের শঙ্কাহীন মানবজগতের এই ক্ষীণ সাড়া অশান্তির দোলা দুলিয়ে দেয়! চিরশান্তিময় দেশের রাজদুহিতার বুকের অশান্তির সাড়া সখীরা অনুভব করে! কিন্তু কথা বলে' যে প্রাণের ভার লাঘব করবে, সে শক্তি ত তাদের নেই।

আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই—অশান্তির দোলা পেয়ে আকাঙ্ক্ষা বেড়েই চলে!

ভেসে কতদিন সে ওপরে উঠে আসে! কিন্তু জলের ওপরে মাথা তোলবার শক্তি যে নেই! জল যে তাদের প্রাণ—জীবনের প্রথম জাগরণ-মুহূর্ত থেকে দেহের প্রতিটি বিন্দু জলে গড়ে উঠেছে! যদি সে দেহের লোমকূপ বাতাসের স্পর্শ পায়, বাতাসের স্পর্শে সাগরদেশের অধিবাসী সাগরবাসের অধিকার হারায়! এ নিয়ম কেউ জানিয়ে দেয় না—শিশুকাল থেকে তারা এ কথা জানে!

সাগরদেশের রাজকন্যা তাই জলের ওপরে উঠ্‌তে পারে না। মানুষের নববিচিত্র দেশের বিচিত্র অধিবাসীর মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু শুধু এই প্রাণহীন ইচ্ছা পুরাতনকে একেবারে ত্যাগ করবার মত শক্তিমান নয়।

জলের তল থেকে সে মানুষের দেশের দিকে চেয়ে চেয়ে কত বিনিদ্র নিশা কাটিয়ে দেয়! মাঝে মাঝে সে দেখে চাঁদের শুভ্র হাসিতে সমস্ত জগৎ প্লাবিত হয়ে গিয়েছে! আবার মাঝে মাঝে অমাবস্যার কালী যখন পৃথিবীকে ঘিরে রাখে, মুক্ত আকাশে তখন অযুত নক্ষত্রবালা ঘোমটা খুলে মৃদুহাসি হেসে ওঠে! মানব-নগরে ঘরে ঘরে মঙ্গল-প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো সাগরকূলে দীপালি উৎসব জাগিয়ে তোলে। শুব্ধ দেশের মূক বালার অধীর অন্তঃকরণে মানুষের ওই পিদীমের সারের মাঝখানে আপনাকে লুটিয়ে দেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

এমনি করে দিন কাটে! তাই এক ঝড়ের সাঁঝে যখন এক নতুন স্পর্শ পেয়ে সে শিউরে উঠ্‌ল, দেখ্‌তে পেল ঝড়ের দাপটে জাহাজের আশ্রয়চ্যুত একটি মানুষ-দেশের ছেলে ঢেউয়ের স্রোতে তারই পাশ দিয়ে সাগরতলের অজানা দেশে যাত্রা করেছে!

মানুষের স্পর্শে তার সারা অঙ্গে এক অপূর্ব্ব শিহরণ জেগে উঠেছিল! মানুষ! মানুষ তার এত কাছে? মানুষ এত অসহায়? অসহায় মানুষের প্রতি করুণায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল! তার কোমল বাহুবল্লরী মানুষের দেশের সেই তরুণকে আশ্রয় দান করল! মানুষের বিচিত্র দেশের আকর্ষণের সঙ্গে মানব-তরুণের প্রতি করুণার আকর্ষণ তাকে ভুলিয়ে দিল যে বাতাসের স্পর্শ তাকে সাগরবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে! স্বার্থের চিন্তা করবার ফুরসুৎ তার রইল না!

সাগরদেশের রাজকন্যা মানুষের প্রেমের আকর্ষণে নিজেকে বাতাসের রাজত্বে সমাহিত করল। জলের ঢেউ তাদের দুজনকে নিয়ে হাজির হ'ল মানুষের দেশের সাগরকূলে।

* * * *

সাগরকূলের ঝড়ের হাঁকডাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আকাশে তারার দিক ঠোখ ফুটে

উঠেছে! পৃথিবীর স্নিগ্ধ বাতাস সাগরবালার চুলের ঢেউয়ে শিহরণ জাগিয়ে তুলেছে! বাতাসের স্রোত বালুর ওপরে মৃদু-মধুর শব্দ জাগিয়ে তুলছে! অদূরে মানুষের বাড়ীর এক-আধটি দীপশিখা দেখা যাচ্ছে! সন্ধ্যার সে দীপালি উৎসব নিভে গিয়েছে! শুধু এক-আধটি ঘরের মৃদু-মঙ্গল-দীপশিখা স্তিমিতনেত্রে সন্ধ্যার উৎসবের সাক্ষ্যস্বরূপ জেগে রয়েছে।

সাগরদেশের মেয়ে মানব-তরুণের সুন্দর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। তার বুকে যে সাগরের ঢেউ আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে, তার সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না!

ধীরে ধীরে মানব-তরুণের চেতনা ফিরে আসছে! কি অপূর্ব্ব সে জাগরণের সাড়া! শূন্য চিত্রপটের মত যা পড়েছিল, তাতে তুলিকার রেখাপাত হোল! সামান্য একটুখানি স্পন্দন, তার পরেই বরফের মত জমাট চোখদুটোতে স্বচ্ছ আলো ফিরে এলো। নিশার স্নিগ্ধ অন্ধকারে তার চোখদুটো শিশুর মত অর্দ্ধচেতনভাবে একবার খুলে গেল—পরক্ষণেই সে তার নিজের পৃথিবীকে, তার আকাশ, তার তারা, তার বাতাসের স্পর্শ সকলকে চিনে নিল! কিন্তু যে তার জন্যে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছে তরুণ-মানুষ তাকে চিনতে পারল না!

ভিন্ন জগতের প্রাণী তার চোখে দেখা যায় না! তাই সাগরবালাকে সে দেখতে পেল না! দূরের মানবজগতের দীপরশ্মি তাকে আহ্বান করল! ধীরে ধীরে দুর্ব্বল দেহ বহন করে সে চলে গেল!

সাগরদেশের অভাগিনী মেয়ে সাগর-কূলে আছড়িয়ে পড়ল!

সাগর-কূলের বাতাসের প্রতিটি কণায় আজও সাগরবালার ব্যর্থতার কাঁদন আকুল দীর্ঘ নিশ্বাসের মত ঘুরে বেড়ায়!

শ্রীসোমনাথ সাহা।

রূপধারা ও রূপমান*

মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে তখন আমরা দেখতে পাই মানুষ কতকগুলি অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে সুরু করেছে। চারিদিকের দুর্বোধ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য ভীষণতা তাকে নির্ব্বাক্ করে তোলে। বিদ্যুৎপাত, দিনরাত্রির অশ্রান্ত গতি, গ্রহ-তারকার অস্পষ্ট ইঙ্গিতের ভিতর সে ভয়ে ও বিস্ময়ে বাস করে। যারা প্রথম আগুন আবিষ্কার করলে বা যারা ফলমূল হতে আরও একটু উচ্চতর ও সভ্যতর খাদ্যের সৃষ্টি করলে তারা নেহাৎ শরীর রক্ষার খাতির অতিক্রম করবার উৎসাহে করেছে। কিন্তু শুধু আহার ও নিদ্রার অভাব ঘুচিয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। চারিদিকের দৃষ্টান্তের বিভীষিকা তাদের জীবনের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছিল, ও-রকম অবস্থায় তাদের বাঁচাই ছিল মুস্কিল। মানুষের সঙ্গে মানুষেতর প্রাণীর তফাৎ বিশিষ্টভাবে এখানে যে মানুষ শুধু অদৃশ্য শক্তির ক্রীড়নক নয়—মানুষ শুধু responsive যন্ত্র নয়—সে স্রষ্টা। সে একটা বিশ্বজগৎ চোখে দেখ্‌ছে দশটা জগৎ নিজের মনের রাজ্যে তৈরী কচ্ছে। এই সৃষ্টিমূলক প্রবৃত্তি মানুষের আছে বলেই জান্তব ও প্রাকৃতিক জগতে সে লয়প্রাপ্ত হয় নি। সে ছোট কিছু দেখে বড়কে খুঁজেছে, এবার বড়কে দেখে ছোটর সম্পর্কে তার স্থান কোথা তা দেখেছে।

এজন্য বৃক্ষ-জগতের ভিতর প্রথম কয়েকটি লক্ষণ দেখে' যখন সে কোন জিনিষের প্রথম নামকরণ করলে—"গাছ"—তখন তার পক্ষে যে কতটা অস্পষ্টতা, অক্ষমতা ও রহস্য দূর হয়ে' গেল—এবং কত বড় একটা জগৎ আবিষ্কৃত হ'ল তা একালে নাম-জগতের ক্রোড়ে লালিত পালিত আমাদের পক্ষে বোঝাই কষ্টকর হবে। সৃষ্টির সমস্ত বিপুলতার মাঝে একটা আলোক-রেখার মত পথ কেটে গেলে যখন নামকরণ হ'ল ওটা 'জল'—ওটা 'সূর্য্য'। ওটা 'জল' বললে জলকে যে বেশী বোঝা গেল তা' নয়, এমন-কি H$_2$O বললেও যে জলকে আমরা বেশী বুঝলুম তা নয়—তবে তা'তে করে জিনিষটি বিভক্ত হোল—তাকে analyse করা গেল—বহুর মধ্যে তা'র স্থান হ'ল—তাকে মানুষ তাতে করেই প্রথম চিন্‌ল—এক কথায় এই নামকরণেই জিনিষটা আবিষ্কৃত হ'ল—এমন-কি সৃষ্টি হ'ল বলা চলে। এমনিভাবে ক্রমশঃ মানুষ জল স্থল প্রভৃতি নানা আবেষ্টনের মধ্যে আবিষ্কার ও নামকরণ করে তাদের একটা পরিস্ফুট অস্তিত্ব উপস্থাপিত করলে। এ কে করলে? যে করলে সে বৈজ্ঞানিক নয়—তখন

* জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে 'আর্টের ভিত্তি' শীর্ষক ধারাবাহিক বক্তৃতার অন্যতম।

বিজ্ঞানবাদ সুরু হয় নি—সে তর্কশাস্ত্রজ্ঞ তাত্ত্বিক নয় —সে হচ্ছে আদি কবি—আদি ভাবুক—আদি কাল্পনিক।

বহুর ভিতর ঐক্য দেখা একটা মানসিক সৃষ্টি। সংসারের সমস্তই বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও বহু—এমন-কি যে 'গাছ'কে মানুষ প্রথম 'গাছ' বলে নামকরণ করলে তাও একটি আর একটির মত নয়। তাদের প্রত্যেকটির আকারই বিভিন্ন। যে বিদ্যুৎ-শিখাকে মানুষ Electricity নাম দিয়েছে একালে তা'ও নানা আড়ালে ও নানা উপলক্ষ্যের ভিতর দেদীপ্যমান হচ্ছে—কিন্তু মানুষ তার ভিতর ঐক্য দেখে একটা নামের নাগপাশে সে সম্বন্ধে সমস্ত ধারণাটিকে বেঁধেছে। এমন বলতে গেলে সমস্ত প্রাতিভাসিক জগৎ মানুষের মনের সৃষ্টি—ভুবনের রূপ-বৈচিত্র্যের প্রত্যেক সুরই মানুষের নিজের দেওয়া—মানুষের অস্পৃষ্ট, অভুক্ত, অগ্রহীত একটি কণিকাও কেউ কোথাও খুঁজে পাবে না!

আদিম মানুষের ভিতর যারা ভাবুক ছিল, তারাই হ'ল প্রথম আর্টিষ্ট। জগৎকে জয় করা, জগৎকে সহজ করা organise করা, নিয়মের ভিতর ফেলা এবং schematise করা হ'ল এই সমস্ত ভাবুকের কাজ। এবং যাঁরা আদিম কালে এ কাজ করেছেন,—তাঁরাই মহাপুরুষ ও ঋষি নামে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। এজন্য কোন লেখক বলেছেন—"Naming, adjusting, classifying, qualifying, valueing, putting a name into thing, and above all simplifying—all these functions acquired a sacred character and he who performed them to the glory of his fellow became sacrosanch.

যতক্ষণ আদিম জগতের ভিতর এরকমের একটা দুর্বোধ্যতা ছিল ততক্ষণ তা' ছিল দুঃখ ও ugly! জগৎকে মানুষ যখন বিশিষ্ট ভাবগোত্রে অঙ্গের মধ্যে গ্রহণ করল তখন তা'র দুঃসহতা দূর হল। এজন্য নানা শাস্ত্রে সৃষ্টির স্থানেই হচ্ছে নামকরণ। Mr. Flinders Petric দেখিয়েছেন মিশর ধর্মে ঈশ্বরের নামকরণকেই ঈশ্বরের সৃষ্টিকরণ বলা হয়েছে। In one of the oldest religions on Earth the religion of Egypt God was imagined as a Being who created things by naming them, while in the sudaic notion of the creation of the world, which was probably derived from the Egyptians themselvs, shevarel is also said to behave brought things into existence merely by pronouncing their names প্রফেসর মোক্ষমূলর তাঁর Introduction to the science of religionএ বলেন :—That those who successfully determind value even in comparatively recent times should have been vegaoded about universaly as engaging same closer intuinacy with the duty than ordinary mortals press had very God-like and saved the establishment of order was thought to live.

এমনিভাবে মানুষের সমস্তই মানসী সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের শতপথ ব্রাহ্মণেরও অনেকটা এই রকমই কল্পনা। তাতে আছে;—"The universe is so much as is co-extensive with name and form. These are the two great magnetaties of Brahma"

ব্রহ্মার সৃষ্টিই হচ্ছে নাম ও রূপ দান—এক বহু হলেন এই নাম ও রূপের ভিতর দিয়ে—অব্যক্ত ব্যক্ত হলেন এই উপায়ে—এই দুটিই আর্টের কাজ। Language হচ্ছে প্রতীকাত্মক প্রকাশ, Form হল রূপাত্মক প্রকাশ। এ দুটির মধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণের মতে Form বা রূপগত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ; কারণ নামটাও রূপের একটা অঙ্গ বই আর কিছুই নয়।

প্রথম আর্টিষ্টরা এমনিভাবে দৃশ্য জগতকে নামকরণ বা রূপ-করণ করে তৃপ্ত হয় নি—কারণ পৃথিবী static ব্যাপার নয়—সৃষ্টি চিত্রার্পিত ফলকের মত স্থির নয়—তা' প্রতি মুহূর্ত্তে বিবর্ত্তিত, আবর্ত্তিত ও আলোচিত হচ্ছে, এজন্য অশরীরী শক্তিগুলিকেও রূপ পেতে হ'ল। দেবতা কল্পিত হল—বনদেবতা, অগ্নিদেবতা, সূর্য্যদেবতা, শুক্রদেবতা,—দেবতাদের জগৎ কল্পিত হ'ল, mythology জমাট হ'ল নানা দেশে নানা অবস্থায় এবং তাতে করে কল্পনার সুবর্ণসূত্রে, মানুষ সৃষ্টি ও দেবতা একটা ঘন ও গভীর সামাজিকতায় আবদ্ধ হয়ে গেল।

আদিম মনুষ্যত্বের পক্ষে সে কি কম আনন্দের বিষয় ছিল—কম গর্ব্বের বিষয় ছিল? সমস্ত জগতের রহস্য এ সমস্ত দেবলীলায় যেন উন্মাদ হয়ে গেল। ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এরা মানুষের অন্তরতম সমুদয় আসন গ্রহণ করলে। প্রথম মেওড়ী আর্টিষ্ট যখন মেওড়ী জাতিকে বল্‌লে তাদের বনদেবতা Zane Miabuta প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখার সাহায্যে পৃথিবীর বক্ষ হ'তে ছিঁড়ে আকাশের নীল পাথরকে দূরে রেখেছে—যা এতকাল পৃথিবীর বুকের ছাদের চেপে মেরে ফেলত—তখন মেওড়ী জাতির কত-না আনন্দ হয়েছিল। বিদ্যুৎকে যখন Jehovaর ক্রোধাগ্নি এবং রামধনুকে যখন Jehovaর covenant বলে—আবার জলপ্লাবন হবে না সেই প্রতিজ্ঞতির স্মারক-চিহ্ন বলে একশ্রেণীর লোক বিশ্বাস করত, তখন তা কত ভীতি বা আনন্দের চিহ্ন বলেই সেকালে মনে করেছে। এদেশের সব আর্য্যযুগের দেব-দেবতারা এমনিভাবে মানুষের আনন্দে ও বিষাদে কি আশ্চর্য্যভাবেই যুক্ত হয়েছিল।

কল্পনা-জগৎ বাস্তব-জগৎ অবলম্বন করে' এমনিভাবে সৃষ্টি হ'ল। চারিদিকে দেববাদ আপনা-আপনি সৃষ্ট হ'ল। এসব সৃষ্টি বাস্তবিক সৃষ্টি—এসব সত্যই মনেরই একটা impression। এরকমে চারিদিকের স্থিতি ও গতির মধ্যে একটা সমানসূত্র স্থাপিত হল। এবং পরিশেষে এই বিচিত্র ও বহু মানব-সৃষ্টির অন্তরালে একটা ঐক্যও কল্পিত হ'ল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

শ্রমিক

(১)

ছাপাখানার শ্রমিক*

আজ এই শত সহস্র কম্পোজিটরদের সমবেত দেখে,তাঁদের সভায় সভানেত্রী-রূপে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে আমি লজ্জা অনুভব করছি। আজ আমি অনুভব করছি যেন, যে-ঘরের আমি মাতা সেই ঘরের সন্তানদের সুখ-দুঃখ আমি এতদিন উদাসীন ছিলুম। সংসারযাত্রা শ্রমের উপর চলছে। কেউ মাথার শ্রম করেন, কেউ হাতের শ্রম করেন। হাতে আর মাথায় যোগ না থাকলে সংসার এক পা এগোতে পারে না। যিনি মাথার শ্রম করেন তাঁর নাম হয় ভাবুক, চিন্তক বা উদ্ভাবক—আর যাঁরা হাতের শ্রম করেন তাঁদেরই বলা হয় শ্রমিক। শ্রমিক নানা শ্রেণীর আছে; কেউ বা কৃষি শ্রমিক, কেউ কারখানার, কেউ জাহাজের, কেউ রেলের, কেউ আপিসের, কেউ বা ছাপাখানার শ্রমিক। এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের শ্রমের ফলেই জনসাধারণ উপকৃত। মানুষমাত্রেই প্রাণধারণের জন্য কৃষিশ্রমিকের কাছে ঋণী। তার উপরও প্রত্যেক মানুষই কোন এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। ভূস্বামীরা কৃষি-শ্রমিকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, ব্যবসায়ীরা কারখানার, জাহাজের, রেলের এবং আপিসের শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ। আর কবিরা, লেখকেরা, ভাবুকেরা, পুস্তক-প্রণেতারা ছাপাখানার শ্রমিকের সঙ্গে অপরোক্ষযোগে যুক্ত। যতদিন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার হয় নি মানুষের চিন্তা এমন দ্রুতভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে দেশ বিদেশে ছড়াতে

---

* গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ট্রেড ইউনিয়ন কেডারেশন হলে প্রেস-কর্ম্মচারী-সমিতির অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

পারে নি। প্রায় মনোবেগেই দেশকালের দূরত্বকে লোপ করে ছড়িয়ে পড়ছে।

আজ সন্ধ্যায় এখানে একটি কথা কেউ বলেন—কাল সকালের মধ্যে খবরের কাগজের সাহায্যে তা সহস্র সহস্র ঘরে পৌঁছিয়ে যাবে, সহস্র সহস্র মাথার টনক নড়বে। কাদের কৃপায়? ছাপাখানার শ্রমিকদের। আজ ভারতের এক কোণে বসে কবি একটি কাব্য রচনা করলেন, মাস পেরোতে না পেরোতে সে কাব্য ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে নানা মহাদেশে নানা জাতিকে রসসিঞ্চিত করলে। কাদের কৃপায়? ছাপাখানার শ্রমিকদের। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, দর্শনবিজ্ঞান যে-কোনো তথ্য মানুষ বিদিত করতে চায় অতি সহজেই তাতে সিদ্ধকাম হয়। কাদের কৃপায়? ছাপাখানার শ্রমিকদের। দিন কাটে না, কি করি কিছু ভেবে পাই না,—এই সময় একখানা বই হাতে করে পাতা উল্টতে উল্টতে মন আটকে গেল —পড়তে পড়তে সব ভুলে গেলুম, অস্থির মন সুস্থির হল—কাদের কৃপায়? ছাপাখানার শ্রমিকদের। সমাজ পদে পদে ছাপাখানার শ্রমিকদের কাছে ঋণী। দেহের অন্ন যোগায় কৃষকেরা, আর মনের অন্ন যোগায় কম্পোজিটরেরা। এ দুয়েরই কৃত উপকার আমরা যথাযথভাবে অনুভব করি না—প্রত্যুপকার করা ত দূরের কথা। সমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা প্রায়ই একটি মাথার রোগে আক্রান্ত থাকেন—মাথা ব্যতীত আর সব অঙ্গকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন—ঐ খানটিতেই তাঁদের মাথা ঠিক থাকে না। মাথা যতই হাত পায়ের সঙ্গে নিজের অবিচ্ছেদ্য যোগটা তারকম করে উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাঁদের উপকারের প্রত্যুপকার উন্মুখী হবে ততই সমাজের অঙ্গের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হবে।

আমি একজন মাথার শ্রমিক—ছাপাখানার শ্রমিকের সঙ্গে ভাই আমার ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। আমরা এক ঘরের লোক, তোমরা আমার, আমি তোমাদের। তোমাদের অভাব অভিযোগ আলোচনা করার জন্যে আমায় যে আহ্বান করেছ, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য মোচনের জন্য যে আমার কথঞ্চিৎ সাহায্য চেয়েছ—তাতে আমার কর্ত্তব্যের প্রতিই আমার চৈতন্য জাগ্রত করে দিয়েছ বলে অনুভব করছি। তোমাদের এই ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু সেজন্যে আমার ধন্যবাদভাজন।

তোমাদের অনেক অভিযোগ গবর্ণমেণ্ট প্রেসের কর্ম্মচ্যুতি। গবর্ণমেণ্ট প্রেস রসাত্মক সাহিত্য প্রচারযন্ত্র নয়—ওটা রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কেজো বিষয় লিপিবদ্ধ করার একটা অনুষ্ঠান। সেখানকার কম্পোজিটররা রাজ্যপরিচালনার অঙ্গ। মুদ্রাযন্ত্র যদি সংসারকে উন্নতির পথে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহেরও যথেষ্ট অনুকূলতা করেছে। মন্ত্রণা-পরিষদের রাজমন্ত্রী যেমন রাজ্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ, রাজমুদ্রাযন্ত্রের কম্পোজিটরও তেমনি। অথচ মন্ত্রীবর সর্ব্বজনমান্য, আর কম্পোজিটর ছাপাখানার ভূত বলে নগণ্য। এই ভূতদের পাঞ্চভৌতিক দেহে যে দেহী বিরাজ করছে তারও অনুভূতি কিন্তু ঠিক মন্ত্রীদেহের দেহীর অনুভূতির মত। যে মুদ্রণকার্য্যের কথা যে, সেই যন্ত্রের মত সে বেদনাহীন নয়। তার সঙ্গে কাজের দরের

চুক্তিতে তার দেহের ভিতর কায়ক্লেশে প্রাণটুকু বজায় রেখে কাজ আদায়ের চেষ্টা, তাকে যন্ত্রবৎ দেখা, মানুষ বলে জ্ঞান না করা, মানুষের সব রকম উপকরণের তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অন্ধ ও বধির থাকা; তারও যে স্ত্রীপুত্র, ভাইবোন, মাতাপিতা আছে—তারই উপার্জ্জনের উপর যে তাদের অনেকের খাওয়াপরা, পড়াশোনা, বিয়ে খাওয়া, রোগে চিকিৎসা, দুর্য্যোগে ভরসা নির্ভর করে; বাজে খরচও তাদের হয়ে পড়ে, কতক পরিমাণে ভোগের অধিকারী যে সেও, শরীর ও মনের পুষ্টির জন্যে যথোপযুক্ত অবসর যে তাদেরও দরকার, মানুষের সবরকম উন্নতির দাবী হাতে খেটে যে খায় সেও রাখে—শুধু যারা মাথা খাটায় তারাই নয়—একথা মাথারা ভুলে যান।

মাথার ও হাতের যে জাতিভেদ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান—তাত এস্থলে রয়েছেই। তারও উপর আছে ধনিক ও শ্রমিকের ঝগড়া এবং সর্ব্বোপরি রয়েছে এখানে রাজা ও প্রজার বর্ণান্তর বিভেদ। কিন্তু সেখানেও অংশত দোষী কারা? যে বেকার ও কম্পিউটার তোমাদের ক্রমাগত উৎপীড়িত করছে—৪৫ মিনিটে কৃত কাজ ১৫ মিনিটে করণীয় ছিল বলে দাম কেটে কেটে তোমাদের রক্ত শুষছে সে কারা? আমাদেরই স্বজাতীয় মধ্যবর্ত্তী রাজকর্ম্মচারীরা। যেমন বাজলার বস্ত্রশিল্পীদের কোণঠেসা করে বাজারদরের চেয়েও কম হারের চুক্তিতে জবরদস্তি আবদ্ধ করে, ধনে প্রাণে মারবার অবাস্তর কারণ ছিল ইংরেজ সওদাগরের বাঙ্গালী গোমস্তা ও দালালেরা; তেমনি রাজ্যবিভাগেও মধ্যবর্ত্তী উর্দ্ধতন বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীরাই অবতন রাজ-কর্ম্মচারীদের প্রতি স্বার্থহীন নির্দয় ব্যবহারের জন্য দায়ী। কোন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করবার আগে নিজেদের দোষ কতটা তা বিচার করতে হবে, নিজেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে, নিজেদের দোষ সংশোধন করতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের দয়ার অভাব আমাদের দেশে যত প্রত্যক্ষ এমন আর কোন দেশে আছে কি না জানিনে। শুধু মানুষ কেন? জীব মাত্রের প্রতি আমরা দয়াশূন্য। এই সেদিন দেখলুম দু'খানা গোরুর গাড়ীর খরচ বাঁচাবার জন্যে একখানা গাড়ীতে এত মাল বোঝাই করে পাঠাচ্ছে ব্যবসাদার গৃহস্থ হিন্দু,—যে তার ভারে গোরু নয় দুটো প্রকাণ্ড মহিষ পদে পদে পদস্খলিত হচ্ছে। একবার আর শত চেষ্টায়ও কিছুতেই টানতে পারলে না। এদিকে দু' মিনিটের মধ্যে কলকাতা সহরে সেই অচল মোষের গাড়ীর পিছনে খান পঞ্চাশেক মোটর, ট্যাক্সি ও ঘোড়ার গাড়ীর সার বেঁধে গেল। সামনের মহিষজোড়া নড়তে না পারায় সবাই অচল, সকলেরই লক্ষ্যস্থানে পৌছনর কালবিলম্ব হতে লাগল। যে জাত গোরু খায়—ইংরেজ—সে জাত আমাদের চেয়ে জীবন্ত জীবের ক্লেশে বেশী দয়াপন্ন। এই নির্দ্দয়তা রাজব্যাপারে প্রতিদিনই রাজার জাতের চেয়ে আমরা প্রজার জাতিরাই বেশী দেখাই। রাজশক্তি বশমুখী করতে হলে প্রজাশক্তিকে ঠেলে উঠতে হবে—এই মানুষে দয়াহীন প্রেমহীন নিজেদেরই এক অংশের চাপকে অতিক্রম করে।

সংঘবদ্ধ না হলে কিছুই সুসিদ্ধ হবে না। সংঘবদ্ধ হলে শক্তি ঘনীভূত হবে। ঘনীভূত শক্তি বলে অসাধ্য সাধন হবে। ভীড় জমা হয়ে যাত্রীসহ রেলগাড়ী ঠেলছে, বিদ্যুতের তার

জমা হয়ে ট্রাম চালাচ্ছে, পাখা ঘোরাচ্ছে—মানুষের আবেগের ও ইচ্ছার ষ্টীম জমা হলে কত কিছু চালাতে পারবে, নড়াতে পারবে, ঘোরাতে পারবে।

এই প্রেসকর্ম্মচারী সমিতির একটি উদ্দেশ্য দেখছি কর্ম্মস্থানে তোমাদের সম্মান রক্ষা করান। এবিষয়ে আমার একটু বক্তব্য আছে। মানুষের নিজের কাছে নিজের সম্মান না থাকলে সভাসমিতির দ্বারা তার সম্মান রক্ষা হতে পারে একথা আমি বিশ্বাস করিনে। প্রথম চাই আত্মসম্মানবোধ, সমিতি সেইটে জাগরণের উপায় করে দিতে পারে মাত্র। জাগতে হবে নিজের, বোধটি হওয়া চাই নিজের। যে নিজের মনুষ্যত্বের সম্মানের কাছে আর সব কিছু তুচ্ছ বোধ করে না, যে প্রতিদিনের প্রয়োজনের কাছে সম্মানকে বলি দেয়, তাকে পদে পদে অপমান হতে হয় এবং তার প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না। নিজে মানুষ হতে হবে, মনুষ্যত্বের দাবী রাখতে হবে, মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করতে হবে—শুধু দিন-আনা দিন-খাওয়ার একটা জড় যন্ত্র হয়ে থাকলে চলবে না।

শুনেছি নাকি ৬০,০০০ হাজার কম্পোজিটর আছে এই কলকাতা সহরে। ষাট হাজার কম্পোজিটর যদি সঙ্ঘবদ্ধ হও, কি না করতে পার তোমরা? তাহলে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার তোমাদের আর আবশ্যকই থাকে না—নানাদিকে নিজের উন্নতিবিধান নিজেরাই করতে পার। তোমরা শুধু চিনির বলদ হয়ে আছ, শুধু সাহিত্য প্রচার করছ, সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করে মানুষ হচ্ছ না। এই সমিতি থেকে তোমরা অবসর সময়ে সাহিত্যচর্চ্চার ক্লাব খুলে আত্মোন্নতি যদি কর তবে আত্মসম্মান রক্ষার পথে অগ্রসর হবে। বিলেতের ট্রেড ইউনিয়নিষ্টরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কতদিকে নিজেদের মনুষ্যোচিত অধিকার বাড়িয়েছে।

তোমরা বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'কতবার কম্পোজ করেছ, তার 'বন্দেমাতরম' গানের এই ক'টি লাইন কতবার টাইপে তুলেছ ;—

'সপ্তকোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে' এই সপ্তকোটীর জায়গায় তোমরা ষাট সহস্র কণ্ঠ কলকল নিনাদ করাল হয়ে ওঠ, দেখ কি ফল হয়। ১৯১৯ সনের ডিসেম্বরে তিনটি কম্পোজিটর মেম্বর করে এই সমিতি খোলা হয়। এরই মধ্যে পাঁচসাত হাজার মেম্বর নিয়ে সঙ্ঘ বাঁধ্‌তে না-বাঁধ্‌তে তোমরা হাতে হাতে কত ফল পেয়েছ দেখ।

১। গবর্ণমেণ্টপ্রেসে—যেখানে একদিনও ছুটী পেতে না সেখানে বছরে ১৬ দিনের ছুটী মঞ্জুর হয়েছে।

২। প্রাইভেট প্রেসে সর্ব্বত্র মাইনে বেড়েছে।

৩। অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর জায়গায় বসে কাজ করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

৪। গবর্ণমেণ্টপ্রেসে কোন কোন স্থলে অন্যায়ভাবে কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারী তার কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছে।

৫। গবর্ণমেণ্ট এ ইউনিয়নকে স্বীকার করেছেন।

৬। বেঙ্গল কৌন্সিল, কৌন্সিল অব ষ্টেট, এসেম্‌ব্লি ও পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত তোমাদের এই সঙ্ঘের কথা উঠেছে—সঙ্ঘবদ্ধ তোমাদের জন্যে লড়াই চলেছে।

৭। তোমাদের অভিযোগের তদ্বির করার জন্যে বেঙ্গল কৌন্সিল এক কমিটি করেছেন।

এখন তোমাদের আভ্যন্তরীন উন্নতি তোমাদের নিজেদের হাতে। এই সঙ্ঘের অর্থসাহায্যে তোমরা নিজেদের জন্যে ব্যায়ামশালা খুলতে পার, পাঠাগার খুলতে পার, লাইব্রেরী খুলতে পার, এসব হল স্বায়ত্ত-উন্নতি। বেতনবৃদ্ধি, কাজের নির্দ্দিষ্ট ঘন্টা প্রভৃতি যে পরায়ত্ত উন্নতি তাও সঙ্ঘের শক্তির দ্বারাই লাভ হবেই সন্দেহ নেই। স্বায়ত্ত-উন্নতিতে যত সিদ্ধ হবে পরায়ত্ত উন্নতি আদায়ে তত সহায়তা বৃদ্ধি পাবে।

নেতাদের উপর তোমাদের উন্নতিভার ন্যস্ত করে চুপ করে বসে থেকো না। স্বয়ং উদ্যমী হও, ঘাট হাজার মানুষ এক হও, এবং সেই একের প্রতি একক, দশক ও সহস্রক উৎসাহ ও উদ্যমের বৈদ্যুতীতে ভর। এ যদি হতে পার তবে তোমাদের আরাম উন্নতি সুখ মনুষ্য ও এ সবই করতলগত আমলকীবৎ জেনো। নতুবা তোমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

অধিবেশনের পর

নিম্নলিখিত পত্রখানি সভানেত্রীর হস্তগত হয়।

পূজনীয়া, সভানেত্রী মহোদয়া সমীপেষু

আজিকার সভায় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় প্রেস-কর্ম্মচারীদের উপর প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়া থাকেন তাহার বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কলিকাতা সহরের খ্যাতনামা প্রেস-স্বত্বাধিকারী প্রেস-কর্ম্মচারীদের প্রতি যে জুলুম করেন তাহার বর্ণনা করিলেন। উক্ত প্রেস-কর্ম্মচারীদিগকে প্রেস-কর্ম্মচারী-সমিতিতে যোগদানে নিষেধ করা হইয়াছে; তাহাদিগকে অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসিয়া কাজ করিতে হয় ইত্যাদি নানাপ্রকার অভিযোগ তিনি আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা সাধারণের অজ্ঞাত। এই অভিযোগের সত্যমিথ্যা নিরূপণ করিবার জন্য আপনি উক্ত প্রেস-স্বত্বাধিকারীর সহিত এবিষয়ে প্রথমতঃ অপ্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিয়া সাধারণে জ্ঞাপন করিলে প্রকৃত মাতৃর কাজ করিবেন। ইহাতে আমাদের বাকী সকল প্রেস-কর্ম্মচারীর বহু উপকার হইবে। আপনি আমাদের জন্য এই কষ্ট স্বীকার করিবেন না? ইতি

শ্রীযামিনী বোস।

উত্তর

এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের আবশ্যক আছে বিবেচনা করিলে সে বিষয়ে যত্ন করিব।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

— —

কবিগুরু

কবির গুরু কবির গুরু তোমায় করি নমস্কার.
পূত পদের পুণ্য ধূলি, তাইতো দীনের পুরস্কার !
ভক্ত যখন রিক্ত হাতে তোমার দ্বারে দাঁড়িয়ে,
সুবাস ভরা "গীতাঞ্জলি" দিলে দু'হাত ভরিয়ে !
তোতা পাখীর মত তাহাই কণ্ঠে কেবল গুঞ্জরে,
তাহাই দিয়ে ধ্যান করেছি মানস ধাতার অন্তরে,
বাঙ্‌লা মায়ের মনের মাণিক্ বুক-জুড়ান ধন,
কাজল আঁখির অশ্রু-আঁকা সোনার "বিসর্জ্জন" !
"গোরা" তোমার ঘরে ঘরে লক্ষ গোরা কর্ব্বে না ?
"চোখের বালি" কুড় কুড়িয়ে হিংসুকেরা মর্ব্বে না ?

কবির গুরু, কবির গুরু তোমায় করি নমস্কার,
পূত পদের পুণ্য ধূলি তাইতো দীনের পুরস্কার !
বাঙ্‌লা মায়ের লক্ষ ছেলে, এই তো কথা সত্যি গো,
সবাই দেখায় আপন আপন প্রাণের যেমন ভক্তি গো !
কে শুনেছে "মুক্তধারা" মায়ের এমন মিষ্টি বুলি ?
সোনা বলে মাতৃ পদের মাথায় তুলে পুণ্য ধূলি।
দেশ-বিদেশে করলে প্রচার মায়ের গানের রাগ-রাগিণী,
স্তব্ধ হয়ে শুন্‌ছে বলে পাতাল দেশের নাগ্-নাগিনী।
চীন জাপানে মগের দেশে এইতো মোটে দিন কত ?
বিলিয়ে এলে মায়ের মুখের পারিজাতের বাস যত।

কবির গুরু, কবির গুরু তোমায় করি নমস্কার,
পূত পদের পুণ্য ধূলি তাইতো দীনের পুরস্কার !
বিধির সৃষ্টি ন্যায়বিধান, অবাক এ যে করলে জয়,
পাঁচটা ঋতুই উল্টে গিয়ে ফাগুন নিয়ে বর্ষ ক্ষয় !
তোমার বনের "লাল করবী" স্বর্ণ চাঁপার চোখ্ ঠারে,
"বাইরে ঘরে" বাজছে কী সুর 'বৈতালিকে'র একতারে ?

দোয়েল কোয়েল গাইছে কেবল হর্ষে কানন প্রান্তরে,
শুষ্ক ডালে ফুলের ডালি তোমার গানের মন্তরে !
ওগো গুণিন্, কে তুমি গো, কোথায় তোমার ঘর,
স্বর্গ হ'তে দেপ্‌তে এলে মর্ত্য কেমনতর ?
তোমার পূত পায়ের ছোঁয়ায় মর্ত্যও যে স্বর্গ গো,
বিমল গানের নির্ঝর ধারায় অলক নদী বইছে গো !

গুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

———

রাজায়-প্রজায়

হাউস অব-কমন্সে স্থির হইয়াছে পার্লামেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থীরা পূর্ব্ব হইতে পলিসি জাহির করিয়া ভোটারদের কাছে যাহাতে নিজেদের আর বিজ্ঞাপিত করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে একটি বিল আনয়ন করা হইবে। প্রধান মন্ত্রী বল্ড্‌ইন স্বয়ং এই বিল পাশ করার জন্য সচেষ্ট হইবেন এইরূপ আভাস দিয়াছেন। এটি পাশ হইলে ফলে পার্টি-পলিটিক্স ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং মন্ত্রীদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

• • • •

পার্টি-পলিটিক্সের অর্থ এই—দেশে ভিন্ন ভিন্ন মতধারী ভিন্ন ভিন্ন পার্টি বা দল আছে। যে দল যে পলিসি পছন্দ করে, সেই পলিসি অনুসারে যারা কাজ করিতে চায় তাদেরই সেই দলের লোকেরা ভোট দেয়। কোন বিল উপস্থিত হইলে নিজেদের ভোটারদের সংখ্যা অনুসারে নিজেদের শক্তির আন্দাজ করিয়া বিলের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ দল বুঝিতে পারে তাহাদের জয় হইবে না পরাজয়। নূতন বিল পাশ হইলে দল গড়া হইবে না, লোকে কাহাকে ভোট দেবে না দেবে বিচার করিতে পারিবে না, পার্লামেণ্টে তাহাদের মনোনীত প্রতিনিধি কোন্ পলিসি অনুসারে চলিবে তাহা বুঝিতে পারিবে না।

• •

ভারতবর্ষে বিলাতের দেখা-দেখি পার্টি-পলিটিক্স সবে আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতের দেখা-দেখি ভারত-শাসনকর্ত্তারাও সেটা ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন কিনা কে বলিতে পারে।

• • • •

পার্টি পলিটিক্সে দল বাঁধায় একটা জোর আসে, সেই জোরের তোড়ে অনেক কাজ হয়। দল বাঁধার নেশায় কুকাজও যে হয় না তাহা নহে। দল ভারি করার জন্য দলের স্বার্থে অতিমাত্র লক্ষ্য থাকায় দলের লোকের দোষের সমর্থন করা বা দোষ ঢাকা হয় এবং দলের বাহিরের লোকসাধারণের প্রতি ঔদাস্য বা দ্বেষপূর্ণ ব্যবহার আচরিত হয়। ইহাতে পরাধীন দেশে দ্বন্দ্ব ও কলহ বাড়িয়া গিয়া হিতে বিপরীত হয়।

• • • •

বেঙ্গল কৌন্সিলে প্রেসিডেণ্ট রাজা শিবশেখরেশ্বর এবং স্বরাজীদের দ্বন্দ্ব এই পার্টি-পলিটিক্সের কুফলের দৃষ্টান্ত। প্রেসিডেণ্ট যিনি তিনি নিরপেক্ষ—পক্ষপাতশূন্য হইবেন এবং তদনুসারে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাসম্পন্ন হইবেন। কিন্তু ভিন্ন পার্টিভুক্ত হওয়ায় রাজা শিবশেখরেশ্বরের স্বরাজীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন কোপ সম্বৃত থাকে নাই। এবং স্বরাজীরাও তাঁর সম্মান রক্ষা করেন নাই। শরীরের এক অংশের সহিত আর এক অংশের বিবাদের এই কুদৃশ্যপটখানি লোকের মন হইতে অপসৃত করার জন্য নদীয়ার মহারাজা চেষ্টা করিয়াছিলেন শুনিতে পাই। উভয় পক্ষই শরিতাপ প্রকাশ করিয়া পরস্পরের প্রতি বিনয় বাক্য ও নম্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু শাসনকর্ত্তারা তাহা হইতে দিলেন না—এইরূপ জনশ্রুতি।

• • • •

মান্দালায় রাজনৈতিক বন্দীগণ দোল-দুর্গোৎসব করিয়া তাঁহাদের হিন্দুত্বের অধিকার প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। পূজা করিলেই তাহাতে খরচ হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের পূজার খরচ রাজকোষ হইতে আসা উচিত এই তাঁহারা বলেন, কারণ খ্রীষ্টীয় বন্দীগণের উপাসনার সমস্ত খরচ রাজকোষ হইতেই নির্ব্বাহ হয়।

• • • •

হিন্দু বন্দীদের দাবী না মানায় তাঁহারা প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ দিবসের পর মৌলানা সৌকতালি ও অন্যান্য নেতাদের অনুরোধে তাঁহারা উপবাস-ব্রত ভঙ্গ করেন। এই উপবাসটি অনেকের মতে একটি ছেলেমানুষী কাণ্ড হইলেও ইহার ভিতর একটি গভীর তথ্য নিহিত আছে। অনেকে মনে করিতেন আজকালকার শিক্ষিত ছেলেরা পূজা আর্চ্চায় বিশ্বাস করে না। ইহারা দেখাইয়াছেন সে কথা সত্য নয়।

• • • •

মিষ্টার ডনোভান বেঙ্গল লাটের নির্ব্বাচিত বড়লাটের মন্ত্রী-সভার সদস্য। তিনি তাঁর প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিয়া বেঙ্গল অর্ডিনান্সকে বাহাল রাখার যুক্তির মধ্যে একটি যুক্তি এই দিয়াছেন যে—"কৈ এতদিন ধরিয়া আমি গ্রামে রায়ৎদের মধ্যে ছিলাম—তারা ত কেউ

এর বিরুদ্ধে আমার কাছে অভিযোগ করে নাই! ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের নালিশ তারা করিয়াছে কিন্তু এ আইনের বিরুদ্ধে একটি কথা বলে নাই।" বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গরীব রায়ৎদের ধর-পাকড় এ পর্য্যন্ত হয় নাই—ভূতপর্ব্ব পাঞ্জাব-লাটের মার্শাল-ল যেমন পাঞ্জাবের আপামর সর্ব্বসাধারণকে ঘায়েল করিয়াছিল, বেঙ্গল অর্ডিনান্সের দংশন এখনও তত গভীরে নামে নাই, ম্যালেরিয়া-পীড়িত গ্রামবাসী চাষাভুষা এখনও তার ভুক্তভোগী হয় নাই—তাই তাদের মুখে অভিযোগ বাহির হয় নাই। কিন্তু যারা এর দংশনে কাতর তাদের কাৎরাণি ডনোভান সাহেবের কর্ণগোচর হয় নাই কি?

• • • • • •

ভারতে নৌ-সেনা স্থাপিত হইবার কথা উঠিতেই মর্ণিং পোষ্ট বলিতেছেন—নৌকা চালনা ও যুদ্ধ এক নয়। ভারতবাসীরা নৌকা চালাইতে পারে, কিন্তু নৌকাতে যুদ্ধ করিতে পারে না। নব্য নৌযুদ্ধ ভারতবাসী জানেনা এ কথা সত্য, কিন্তু সুযোগ ও শিক্ষাটি দিলেই জানিবে। তাহাই ত চাওয়া যাইতেছে। যখন সমর-বিভাগে অফিসারের পদের জন্য ভারতবাসীরা দাবী করিল তখনও প্রথম প্রথম তাদের বলা হইত অফিসারীর উপযুক্ত তারা নয়, তারা শুধু হুকুম তামিলের অধিকারী। অনেক কষ্টে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এখন স্যাণ্ডাপে ভারতবাসীদের স্থান দেওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকারের জন্য আমাদের এইরূপ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

———

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত

ভারতীর জুবিলি বৎসর

১৩৩৩

সাহিত্যিক জীবনে বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু

ভারতী

সাহিত্যিক কাননে বাঙ্গালীর পুষ্পবাটিকা

ভারতী

সাহিত্যিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর উপাদেয় ফসল

ভারতী

সেই ভারতীর ৮৮ ও ৪৯ বর্ষের সান্নিপাতিক অবস্থার মৃত্যু-সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে **পঞ্চাশ বৎসরের জুবিলি মুকুট** পরাইতেছেন—**বাঙ্গালীর গৌরব, দেশপ্রাণা—ভারতীর একনিষ্ঠ সেবিকা—**

শ্রীমতী সরলা দেবী।

ভারতীর এই জুবিলি বাঙ্গালীর জাতীয় জুবিলি, এই জাতীয় জুবিলির দিনে, বাঙ্গালীর পঞ্চাশ বছরের একটানা সাহিত্য-সাধনার এই আশ্রম-কাননের উৎসব দিনে আমাদের আশা যে, এই আনন্দ বাংলার ঘরে ঘরে বণ্টন করিয়া দিই এবং সেই উদ্দেশ্যে ভারতীর পাঠক মাত্রের নিকট আমাদের প্রার্থনা তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদের এই আনন্দ বণ্টনে সহায়তা করেন।

গ্রাহকেচ্ছুক—নিম্নলিখিতরূপ পত্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

মহাশয়,

আমি **ভারতীর জুবিলি** বৎসর হইতে একজন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি। অতএব উহার প্রথম সংখ্যা আমাকে ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইয়া ভারতীর বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া লইবেন।

নাম _____

ঠিকানা _____

_____

ম্যানেজার—**ভারতী,**

২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

কলিকাতা ১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট মেটকাফ প্রেসে শ্রীজগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৯শ বর্ষ | ১৩৩২ | চৈত্র

নববধূ

বসন্তের দূতী তুমি, ফাল্গুনের কুসুম উৎসবে
আনন্দের দান তব পরিপূর্ণ করি দিবে কবে ?
বকুল-বীথিকা-তলে
বিহরিবে লীলাচ্ছলে,
আকুল কুন্তল-গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে ॥

তৃণ-হিল্লোলিত পথে মঞ্জীরের কল্লোল-গুঞ্জন
ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিবে নিকুঞ্জের নিভৃত স্বপন।
আকাশে তোমার আঁখি
কে ভুলায়ে ল'বে ডাকি',
ধেয়ানে দেখিতে পাবে দিকে দিকে হৃদয়-বল্লভে ॥

২১শে ফাল্গুন,
১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষা

[মেদিনীপুর-শাখা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ও সাহিত্যসম্মিলনের ১৩শ উৎসবে সভানেত্রীর অভিভাষণ]

আজ আপনাদের প্রদত্ত গৌরবাসন গ্রহণে কৃতার্থম্মন্য হইলেও অমিশ্র আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না ইহা স্বীকার করিব। কারণ গোলাপ যেমন কণ্টকাকীর্ণ, এ আনন্দ তেমনি দায়িত্বপূর্ণ। বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন আপনাদের উদ্দেশ্য, তজ্জন্য বঙ্গদেশের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধান ও প্রাচীন কাব্যাদির সংগ্রহের দ্বারা দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য ভূগোল প্রভৃতির আলোচনা আপনাদের লক্ষ্য। আমি সে লক্ষ্য হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে বঙ্গভাষা আমার আত্মবিকাশের অবলম্বন, যে ভাষা আমার আত্মপ্রকাশের সহজ সরল পথ, প্রবাসে সে ভাষা আমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াছিল। যেখানে যে জাতি নাই, সেখানে সে জাতির ভাষা কোথায়? ভাষা যদি না থাকিল, জীবনের স্পর্শ কোথায়? পঞ্চনদের উপকূলে কোথায় বাঙ্গালী জনসঙ্গম? কোথায় তাহাদের উত্থান-পতনের, মান-অপমানের, আমোদ-ক্রন্দনের, উন্নতি-অবনতির, চেষ্টা ও নিশ্চেষ্টতার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ প্রাণসমুদ্র? অর্দ্ধসহস্র ক্রোশব্যবহিত সে সমুদ্রে যখন জোয়ার আসে সে জোয়ারে আমাকে নাচায় না, তাহাতে যখন ভাঁটা পড়ে সে ভাঁটায় আমাকে অবসন্ন করে না। কচিদ্বীত ছাপার খবরে বাঙ্গলার জীবনকাটি মরণকাটিতে আমি মরি বাঁচি না। এই নিঃসাড় অবস্থা হইতে—যে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় অশৈশব দীক্ষালাভ করিয়াছিলাম, যাহার সহিত আমার নাড়ীর যোগ ছিল, তাহারই সেবা আবার আমায় বাঙ্গলার প্রাণের দোলার মাঝে আনিয়া ফেলিয়াছে। একেবারে মাঝদরিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছি। বাঙ্গলার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল ঊর্ম্মিদলই চারিদিক হইতে উঠিয়া আবর্ত্ত বাঁধিয়া আবার আমার সত্তাকে ঘিরিয়াছে। তারই একটি প্রতিঘাতে আজ আপনাদের মধ্যে আসিয়াছি।

মেদিনীপুরে আমি ইতিপূর্ব্বে আর একবার আসিয়াছিলাম, সেবার বাঙ্গলার মেয়ে বলিয়া আসি নাই—ভারত-ললনা হইয়া আসিয়াছিলাম। নিখিল ভারতীয় রাজনীতির একটি তরঙ্গারূঢ়া হইয়া তদানীন্তন ভাবোর্ম্মি প্রক্ষেপে ভারতবাসীকে কর্ম্মপ্রবুদ্ধ করিতে করিতে ভারতের একদেশে উপনীত হইয়াছিলাম। আজ ঘরের মেয়ে ঘরের আঙ্গিনায় আসিয়াছি। ঘরের লোকদের সঙ্গে ঘরের কথা কহিব। রাজনীতিতে একচ্ছত্র রাজার ভারত-জোড়া প্রজার

সহিত সম্বন্ধ-ঘটিত ব্যাপারে সেদিন ব্যাপৃত ছিলাম। কেবল বাঙ্গালীর ইষ্টানিষ্টের প্রসঙ্গে আজ মগ্ন হইব।

• • • •

কেবা সে বাঙ্গালী। বহুদূর হইতে, বহুদেশ মাড়াইয়া বহুজাতি দেখিতে দেখিতে আজ স্বজনদের প্রতি যখন দৃষ্টি পড়িতেছে, তখন এক অভিনব ব্যাপার উপলব্ধি করিতেছি। বেশের ঐক্য না থাকিলে শুধু মুখ দেখিয়া চেনা যায় না কোন্‌টি বাঙ্গালী। কারো বা রঙ শুভ্র গৌর—যেন সদ্য কাশ্মীর হইতে অবতীর্ণ কনিষ্ক ও ললিতাদিত্যের বংশধর, কারো বা মসীকৃষ্ণ—যেন দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বংশজ, এবং ঘোর সাদা ও ঘোর কালো এই দুই চরমের মধ্যবর্তী যতরকম হাল্‌কা বা গাঢ় মিশ্রণের রঙ হইতে পারে সবরকম রঙের নমুনাই বাঙ্গালীর চর্ম্মে পরিদৃশ্যমান। বাঙ্গালীর বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কর-জাতিত্ব তাহাদের অঙ্গবর্ণেই লিখিত। দীর্ঘপ্রস্থতা বা বলিষ্ঠমস্তকতা সম্বন্ধেও অনেক ফেরফার। কেহ কেহ দেখিতে এত ক্ষীণ—যেন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইবে, কিন্তু পাঞ্জাবী পালোয়ানের কটিদেশ মুঠার ভিতর ধরিতে পারে এমনও শত শত চেহারা বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে রহিয়াছে, পোষাক বদল করাইলেই তাদের ভোজপুরী বলিয়া চালান যাইতে পারে। নাক্ মুখ চোখেরও নানা বৈষম্য বা বৈচিত্র্য। সুতরাং যদিও রিজলী সাহেব জাতিতত্ত্বে অন্যান্য দেশস্থ গৌড়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাথার সহিত একবিধতায় বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের একটা বিশেষ কোটায় ফেলিতে চাহিয়াছেন, তথাপি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর মাথায় অনেকস্থলে কোন ভিন্নতা নাই। আবার ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণেও কখন কখন মস্তিষ্কের আকৃতি ও মাপজোকগত বিলক্ষণ পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং প্রায় একবর্ণ পাঞ্জাবী, প্রায়-একমাথা গুজরাতী, প্রায়-এক-চোয়াল মারাঠী বা তৈলঙ্গীর মত বাঙ্গালী এক অবিকৃত জাতির ছাপ মনে বসায় না। বহুবর্ণের বহু জাতি-বীজের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালীর শরীরলিপিই বাঙ্গলার জাতিতত্ত্বের ইতিহাস প্রখ্যাত করিতেছে। আজ যে সমগ্র ভূখণ্ডকে আমরা বঙ্গদেশ বলিয়া অভিহিত করিতেছি—যার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ভাগীরথী, তাহা পুরাকাল হইতেই এক অখণ্ড রাজ্য ছিল না, তাহা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমাবেশ ছিল, তাহাদের অন্যতমের মাত্র নাম ছিল বঙ্গ। আজকাল যে সকল ভিন্ন ভিন্ন জেলার সমষ্টি বঙ্গদেশ, সেই জেলাগুলি তখন এক-একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভীমের পূর্ব্বদিক বিজয়োপলক্ষ্যে যে-সকল রাজ্যের উল্লেখ আছে—দেখা যাইবে তাহারা বঙ্গদেশের বিভিন্নাংশ।

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্র পরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ-বঙ্গরাজ মুপাদ্রবৎ

সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্ ।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ।
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব ন যে সাগরবাসিনঃ
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ । (সভাপর্ব্ব —৩০অ)

ভৌগোলিকেরা নির্ণয় করিয়াছেন, কৌশিকীকচ্ছ বর্ত্তমান হুগলী জেলা, বঙ্গ বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ, তাম্রলিপ্ত বর্ত্তমান তমলুক বা মেদিনীপুর জেলা, সুহ্ম রাঢ়দেশ এবং কর্ব্বট মানভূম প্রদেশ।

তাম্রলিপ্ত, কোটিবর্ষ (দিনাজপুর অঞ্চল) পুণ্ড্র বর্দ্ধন ও কর্ব্বট জৈনধর্ম্মগ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। কোন এক সময়ে গৌড় শব্দ পুণ্ড্রর স্থান অধিকার করিয়াছিল। দৈবাৎ কখনও গৌড়, কখনও বঙ্গ বিখ্যাত হইয়াছে। যে কেহ গৌড় বিজয় করিয়া বঙ্গ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, বা যে কেহ বঙ্গ বিজয় করিয়া গৌড় পর্য্যন্ত স্বাধিকার ব্যাপ্ত করিয়াছে, সেই সমগ্র বঙ্গের রাজা হইয়াছে —তাই ঐ দুই দেশকে অনেক সময় একত্রে গৌড়-বঙ্গ নামেই অভিহিত করা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেমন পুণ্ড্র আর বঙ্গ এই দুই বিখ্যাত দেশ ছিল, এখন হইল তদ্রূপ গৌড় ও বঙ্গ। পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন বা পুণ্ড্র, এই সময় গৌড়াধিপের রাজধানী নগর মাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

শক্তিসঙ্গম নামক তান্ত্রিকগ্রন্থে গৌড়ের সীমানির্দ্দেশ এইরূপ পাওয়া যায় :—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।

এই গৌড়ের অন্তর্গত বর্দ্ধমান বা রাঢ়দেশ। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণিত আছে—"গৌড়ং রাষ্ট্রং মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।" ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি আধুনিক বাঙ্গলার পশ্চিম প্রদেশ গৌড় বা পুণ্ড্ররাজ্য ছিল। পুণ্ড্র সম্বন্ধে বেদে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে কথিত হইয়াছে পৌণ্ড্রকেরা বিশ্বামিত্রের দস্যুপ্রকৃতি সন্তান। বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায় যযাতির উত্তরপুরুষ বলিরাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমাগুহির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামক পঞ্চপুত্র পূর্ব্বপ্রদেশে অভিযান করিয়া পাঁচটি রাজ্য স্ব স্ব নামাঙ্কিত করেন। অনুমান হয় বৈদিক কালে আর্য্যগণ দিগ্বিজয়ে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বঙ্গ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিজিত প্রদেশে অবস্থান করেন নাই—শুধু স্বনামাঙ্কিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ আদিম অনার্য্য বাঙ্গালীরাই এখানকার প্রকৃত রাজা ছিলেন, তাঁহাদের নিজের দেশাচার লোকাচার প্রবল ছিল, আর্য্যবিধির নিকট তাঁহারা ঘাড় নোয়ান নাই। তাই মনুস্মৃতি ও বৌধায়নসূত্রে বলা হইয়াছে, এদেশ হইতে আর্য্যনিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়—অর্থাৎ কিছুকাল বাসনিবন্ধন এ দেশীয় আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলে—সে অভ্যাস ও তাহার স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া ফেলা আবশ্যক। যেমন আজকাল বিলাত-ফেরতদের জন্যও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে যে, তৎকালীন বঙ্গ বা রাঢ়বাসীরা অসভ্য ছিলেন। যে নিষাদরাজপুত্র একলব্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিখিতে গিয়া

প্রত্যাখ্যাত হন, যিনি গুরুভক্তি, একাগ্রতা, উদারতা ও বীর্য্যের চরম আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহার সমতুল্য অন্যান্য অনার্য্য জাতিরা সভ্যতা ও সদাচারশূন্য ছিলেন এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? একলব্যের ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপতির মিত্র পৌণ্ড্রক রাজা বাসুদেব কৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রজাগণ ও সামন্ত রাজাগণও কৃষ্ণবিরোধী হইয়াছিলেন। এই বঙ্গবীরকে পদানত করা কৃষ্ণের পক্ষে ও ভীমের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। একলব্য অনার্য্য রাজপুত্র বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি অনার্য্য রাজা ইহা স্বীকার্য্য—আর পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর অনার্য্যরক্তের গৌরব হরণ করিয়া তাঁকে আর্য্যমধ্যে পরিগণিত করা কষ্টকল্পনা নয় কি? দেখা যাইতেছে সেই অতি পুরাকালেও বাঙ্গালীর আত্মসম্মান অন্যের নিকট সহজে শির নোয়াইতে চাহে নাই। এ বাঙ্গলা মাটিরই গুণ সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ভারতে প্রসেলিইটিজম্ ছিল না। ইহা মহাভুল। বৈদিক ধর্ম্মের তুল্য অমতে-দমন ধর্ম্ম খুব অল্পই ছিল। যে অনার্য্যেরা বৈদিক ধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মীয় রীতিনীতি আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা চিরম্লেচ্ছ থাকিয়া গিয়াছেন, আর যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম ও আর্য্য রীতিনীতি স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা বিনাবাক্যে বা ব্রাত্যস্তোমের দ্বারা আর্য্যজাতি-মধ্যে লীন হইয়াছেন।

বাঙ্গলার ইতিহাসে আমরা পাই কখন পাল, কখন গুপ্ত, কখন সেন, কখন চোল, কখন শক, কখন মৌর্য্যবংশীয় অধিপতিরা এখানে আধিপত্য করিয়াছেন। কাহার উপর—সে কথাটা ভাবিতে ভুলিয়া যাই। বাঙ্গলার প্রজা কাহারা ছিল? কোন্ জাতীয়? কোন্ বর্ণ? বিজেতারা কয়েকশত বা সহস্র সৈন্য সঙ্গে করিয়া আনিতেন মাত্র,—বিজিত দেশ আবাদ করিবার জন্য প্রজাবৃন্দ সঙ্গে বহিয়া আনিতেন না।

আর্য্য-অধিকৃত রাজ্যসকল আচারে ব্যবহারে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আর্য্যায়িত হইয়া যাইত বটে—কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে আর্য্যগণ আসিয়া মূল বাসিন্দাদিগকে নির্ম্মূল করিয়া সেখানে স্বজাতির উপনিবেশ স্থাপন করিতেন। আদিম বাসিন্দা প্রজারা বিজেতৃ-জাতির সভ্যতা গ্রহণ করিত—ইহাই ছিল আর্য্যভবন প্রক্রিয়া। বিজিতদের রক্তের সহিত বিজেতার রক্তের সংমিশ্রণও হইত। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বানুসরণ করিয়া যেখানে যেখানে পাণ্ডবেরা গিয়াছিলেন সেইখানেই প্রায় সেই সেই দেশস্থ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন। রাজ্যসংস্থাপকের অনুচরেরাও তত্তৎদেশে দারপরিগ্রহে পশ্চাৎপদ থাকেন নাই ইহাই অনুমেয়। শুধু ক্ষত্রিয়েরা নহে, সে কালের ব্রাহ্মণ জ্ঞানী মুনি ঋষিগণও যেমন ক্ষত্রিয়-কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতেন, তেমনি অনার্য্যা ভার্য্যাদ্বারাও আর্য্যবংশবৃদ্ধি করিতেন—যেমন মৎস্যজীবী-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর-পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম হয়, এবং সেই বেদবেদাঙ্গ-পারগ মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাস হইতেই ভারতের তাবৎ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছে। কৈবর্ত্তরক্ত উচ্চ হইতে উচ্চতর বর্ণের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে আর্য্য-অনার্য্য রক্তের প্রভূত সংমিশ্রণেই বঙ্গদেশ

ক্রমে মনুর নিষেধাত্মক বাক্যের অতীত হইয়া উঠিল, গমনে ও বসবাসে ইহা প্রায়শ্চিত্তকারক দেশ আর রহিল না।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ কোনদিনই ছিল না, শুধু বৃত্তিভেদ ছিল। কেহ-বা বেশী পাণ্ডিত্য অনুরাগী তিনি ব্রাহ্মণ, কেহ-বা শস্ত্রপ্রিয় তিনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণে পদোন্নতিও সে-সময় সাধারণ ঘটনা ছিল, শস্ত্র ছাড়িয়া, রাজসিক বৃত্তি ছাড়িয়া ধ্যানধারণাযোগ অহিংসা প্রভৃতি সাত্ত্বিক বৃত্তির অনুসারী হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যাইত—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেও ইহাই হইয়াছে, সে বিষয়ে পুরাণে উল্লেখ আছে।

বুদ্ধজন্মের পর বঙ্গদেশ বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্মের সংঘর্ষস্থল হইল। কোন রাজার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইল, কোন রাজার রাজ্যকালে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভ করিল। এই দুই ধর্ম্মের ভেদ কর্ম্মকাণ্ড-ঘটিত—জ্ঞানমার্গে ইহারা এক পন্থী।

বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায় জন্মেজয় রাজার একাদশ পুরুষ অধস্তন শতানীক রাজাকে তাঁহার শুঙ্গ মন্ত্রী হত্যা করিলে, রাজন্য ব্রাহ্মণগণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের কলাপনগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রভুঘাতক নূতন রাজা নিজপ্রতাপে অন্য ব্রাহ্মণদের হস্তগত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা মিথ্যা শাস্ত্র রচনা করাইলেন। এই লোভী ব্রাহ্মণেরা নূতন রাজবংশে ভক্তি অটুট রাখার জন্য অনেকগুলি কাম্যযজ্ঞের সৃষ্টি করিলেন এবং নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ইহাও প্রচার করিলেন যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও যজ্ঞ করাইবার অধিকার নাই। পূর্ব্বে গৃহস্থেরা গার্হস্থ্য যজ্ঞাদি স্বয়ংই করিতেন—এখন হইতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্য অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে বিশেষ করিয়া বর্ণবিভাগ আধুনিক আকার ধারণ করিতে থাকিল, অন্তর হইল—গুণকর্ম্মগত রহিল না। এই প্রক্রিয়া পরশুরামের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন আরও সুদৃঢ় হইল। রাজার অশ্বমেধাদি কাম্য যজ্ঞের বহুলতায় যজ্ঞীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতে করিতে প্রজাগণ বিপন্ন হইল। এইরূপ বহুবর্ষ যাবৎ যাজ্ঞিক রাজা ও ব্রাহ্মণের উৎপীড়ন যখন প্রজাসাধারণের দুঃসহ হইয়া উঠিল, সেইসময় বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ে ও কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধিতায় বৌদ্ধধর্ম্ম লোকপ্রিয় লোকায়ত ধর্ম্ম হইল।

আমরা বাঙ্গালীরা এখন বৌদ্ধধর্ম্মকে পরধর্ম্ম মনে করি, কিন্তু আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম ইহা ছিল, আজকালকার শাক্ত ও বৈষ্ণবের ন্যায় এককালে বঙ্গদেশ বৌদ্ধে ও জৈনে ভরপুর ছিল। সেদিনকার বৌদ্ধ বাঙ্গালীর জীবনে কত উৎসাহ, কত প্রাণবত্তা! আবার এক পত্তন নূতন জাতির সহিত নূতন রক্তের মিশ্রণও সেই যুগে আরম্ভ হইল। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীককন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্র বিশ্ববিখ্যাত প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের ধমনীতে গ্রীকরক্ত প্রবাহিত। প্রজাসাধারণের সঙ্গেও মগধাগত গ্রীকদের কন্যা ব্যবহার হইয়া থাকিবে। কেবল অশিক্ষিত লোকে নহে, সুধী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণও দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধেরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের সামাজিক অনুশাসন ছিন্ন করিলেন, জাতপাতের বিচার রহিল না। শক কনিষ্ক প্রভৃতি কাশ্মীররাজগণও এই যুগে বঙ্গে অভিযান করেন। কণিষ্ক বুদ্ধের

প্রায় পাঁচশত বর্ষে রাজ্যারূঢ় হন। এই সময় ভারতের বৌদ্ধ মিশনরিগণ মধ্য-এসিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইলেন। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধধর্মে বৈসদৃশ্য দেখা দিল। শকরাজ কনিষ্ক ভারতের শূন্যবাদ অনিত্যবাদ প্রভৃতি দ্যোতক বৌদ্ধধর্মকে নিষ্প্রভ দিয়া মধ্য-এসিয়ার দেবদেবীর মূর্ত্তি-পূজাত্মক বৌদ্ধধর্মকে উচ্চপদ দান করিলেন। চীনাচার-অনুগামী বৌদ্ধধর্মকে মহাযান ও ভারতীয় আচার-অনুগামী বৌদ্ধধর্মকে হীনযান আখ্যা দিলেন। মহাযান রাজধর্ম হওয়ায় চৈনিক আচার ভারতে প্রবেশ করিল। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের স্থলে চৈনিক কর্ম্মকাণ্ড ভারতে স্থান পাইল। যোগের ও ভোগের মিলন হইল। ইহারই নাম হইল তান্ত্রিক ধর্ম্ম। নেপালীরা এখনও বলেন ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, নেপাল ভোগভূমি। তন্ত্রে ভোগবিলাসের পথ উন্মুক্ত থাকায় স্বভাবতঃই লোকের ইহাতে বেশী প্রবৃত্তি হইল। তবে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিরোধে তন্ত্রের আচার শুদ্ধাচার রহিল।

যে তন্ত্রের উৎপত্তিস্থান কৈলাস, যাহার আখ্যাতা শিব, হিমালয়-কন্যা যাহার শ্রোতা, সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মে দুইটি তথ্য প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ ভারতের দেশের লৌকিক আচার-ব্যবহার অবিকৃত রাখিয়া, তাহারই মধ্য দিয়া উক্ত দেশবাসীগণকে নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ ভারতবহির্ভূত পূজা-পদ্ধতি সংস্কৃতে গ্রথিত করিয়া তাহাকে রূপান্তর দেওয়া, বিদেশীয় ধর্ম্ম ও আচারকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করা। যেগুলি নিতান্ত গর্হিত বা বীভৎস বোধে ভারতীয় সভ্যতায় কিছুতেই স্থান দিতে পারা গেল না, তন্ত্রে তাহাদের স্পষ্টরূপে 'চীনাচার' বলিয়া স্বতন্ত্র রাখা হইল। হিন্দুরা আজকাল যেসকল দেবদেবীর পূজা করেন তন্ত্রোপাসকেরা তাহার মধ্যে কতকগুলি পৌরাণিক আর কতকগুলি তান্ত্রিক বলিয়া বর্ণনা করেন। তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা চীন তীব্বতেও আছে, পৌরাণিকের নাই। বৌদ্ধযুগে চীন তিব্বতে যাওয়ার দুইটি রাস্তা ছিল। এক ব্রহ্মপুত্র দিয়া, আর এক কাশ্মীর দিয়া। এই উভয় প্রদেশেই তন্ত্রের প্রভাব অত্যধিক। তান্ত্রিক ধর্ম্ম এখন ভারতধর্ম্ম, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্ম। বাঙ্গালীর প্রতি শিরায় শিরায় বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার ও সভ্যতা কিরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তান্ত্রিক ধর্ম্মই তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালী মস্তিষ্ক গ্রহণশক্তিতে,—পর-চিন্তা, পর-আচার, ও পর-সভ্যতাকে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব করিতে চিরকালই পটু। ইংরেজীযুগেও বাঙ্গালী তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। ভারতের আর কোন জাতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আচার-ব্যবহারকে এতটা স্বকীয় করিয়া লয় নাই। বাঙ্গালী কেবলই অনুকরণ করে না, অনাত্মকে আত্মোপযোগী করিয়া লয়। উত্তর ভারতীয় প্রভাব ব্যতীত দাক্ষিণাত্য-প্রভাবও বাঙ্গালীধমনীতে চিহ্ন রাখিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের চোল রাজবংশ এক সময় বাঙ্গলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড-বিস্মৃত আদিশূরের সময়কার বাঙ্গলার সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নবাগত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর দাক্ষিণাত্য হইতে আর একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আসিলেন যাঁহাদের সন্তানগণ এখন বাঙ্গলার দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। এইরূপে নানা

দিগ্‌দেশাগত ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলায় বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ মাত্র হইলেন। সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যুগে যুগে ব্রাহ্মণদের সঙ্কোচনীতি নবাগত দলের সংস্পর্শে নবভাবের বিপ্লবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়েও তাহাই হইল। তন্ত্রশাস্ত্রে পরকীয়া স্ত্রীতে ব্রাহ্মণের সন্তানোৎপত্তির বিধান রহিল, শৈববিবাহ ধর্ম্মসম্মত হইল। জেলে মালাকার নাপিতানী প্রভৃতি নবশক্তিতে মিশ্রজাতির উৎপত্তিক্রম জারি রহিল। ইতর শ্রেণীর ব্রাহ্মণী-ভার্য্যা গ্রহণ পর্য্যন্ত তন্ত্রশাস্ত্রে অনুমোদিত হইল। কিন্তু এইখানে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের শাস্ত্রজ্ঞানে ও ব্যবহারিক অভিমানে ঘাতপ্রতিঘাত হইল। ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত শূদ্রসন্তানকে তাঁহারা নমঃশূদ্র প্রভৃতি আখ্যা দিয়া অস্পৃশ্য করিয়া রাখিলেন। যাহাই হউক সমাজে উলট পালট চলিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি নানানামে প্রকটভাবে এবং বহুশঃ অপ্রকটভাবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সংমিশ্রণ চলিয়াছিল, পরেও চলিতে থাকিল—এবং আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে।

এতক্ষণ ধরিয়া যে আলোচনা করিলাম তাহাতে পাইলাম বাঙ্গালী নানাজাতির মিশ্রণে গঠিতদেহ, শানিতমস্তিষ্ক, ও নানাভাবের সংঘাতে, নানা সভ্যতার সংস্পর্শে পুষ্টাত্মা। এই বাঙ্গালী শৌর্য্যে-বীর্য্যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ত্যাগে-বরণে চিরবিখ্যাত। পাঁচ হাজার বর্ষেরও পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালী স্বনামধন্য।

এখন আর একটি বিষয় ভাবিবার আছে। এই পাঁচ হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বতন কাল হইতে লক্ষসমাচার বাঙ্গালী ভাবিত, কথিত, লিখিত কোন্ ভাষায়? নিশ্চয়ই বঙ্গভাষায়। সেই বঙ্গভাষা আধুনিক বঙ্গভাষার অবিকৃতরূপ না হউক ইহার সহিত নিশ্চয়ই সৌসাদৃশ্যযুক্ত—যেমন ওল্ড্ ইংলিশের সহিত আধুনিক ইংরেজীর অনেক ভেদ থাকিলেও মূলতঃ দুই একই ভাষা। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত-জাত প্রাকৃতভাষা নহে, ইহা অপভ্রংশ ভাষা। অর্থাৎ ইহার প্রাকৃতের সঙ্গে মিল থাকিলেও প্রাকৃতাতিরিক্ত অন্য কোন আদিম ভাষার সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা ছিল, এমন-কি যে পৈশাচী ভাষার উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়, বাঙ্গালা ভাষার জননী সেই লৌকিক ভাষা। পৈশাচী, বঙ্গভাষার জননী কিনা সে-বিষয় আজ কাল বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। কিন্তু উহা জননী সাব্যস্ত হইলে প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সমক্ষে এ-সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব তুলিয়া দেখিবার আছে। বৃহৎকথার ভূমিকায় আছে শাতবাহন রাজার মন্ত্রী গুণাঢ্যকে কাণভূতি নামে এক পিশাচ শোণিতে লিখিত সপ্তভাগে বিভক্ত কথাময় গ্রন্থ প্রদান করেন। গুণগ্রাহী গুণাঢ্য মন্ত্রী তাহা রাজার নিকট লইয়া গেলেন, কিন্তু রাজা তাহা গ্রহণ করিলেন না। রাজা এই রাঢ়বাসী আমাদেরই একদলের মত ছিলেন বোধ হয়, যাহারা শৈশবে বলিতে শিখিয়াছিলাম—"বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু, লাফ দিয়ে গাছে উঠে, ল্যাজ নাই কিন্তু।" পিশাচ—অর্থাৎ কিনা অনার্য্য! অনার্য্য-লিখিত পুস্তক, তা আবার শোণিতাক্ষরে লেখা, কি বর্ব্বরতা! আর্য্যেরা যে মসী প্রস্তুত করেন, তা কালো

রঙের হয়, এ আবার কি রক্ত? ঠিক যেন রক্ত! রাম রাম! পিশাচ বাঙ্গালি কি মনুষ্য? তার লেখা পুঁথি কখন পাঠযোগ্য হইতে পারে? সুতরাং রাজা তাহা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। গুণাঢ্য মন্ত্রী ক্ষোভে তার ছয় অংশ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এক অংশ বাঁচিয়া গেল, গুণাঢ্যের ছাত্রেরা তাহা রক্ষা করিল, পৈশাচীভাষা হইতে তাহা সংস্কৃতে অনূদিত হইল, তাহার খ্যাতি প্রচার হইল, তখন রাজাও উহা দেখিতে চাহিলেন—সেই সপ্তাংশের নাম—কথাসরিৎসাগর, কাব্যরসামোদী দণ্ডী যাহার সম্বন্ধে কাব্যাদর্শে লিখিয়াছেন—

ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎ কথাম্

এই ভূতভাষা অর্থাৎ পিশাচ ভাষাময়ী বৃহৎকথা বাঙ্গালীর আদিম বঙ্গভাষায় লিখিত সর্ব্ব-প্রথম ধরাছোঁয়া-যাওয়া গ্রন্থ কিনা একটু তলাইয়া দেখিয়া সকলে বিচার করিবেন। আমার বিবেচনায় এই বৃহৎকথা, যাহার সপ্তাংশের একাংশ মাত্র কথাসরিৎসাগর—বাঙ্গালীর সাহিত্যিক প্রতিভার একটি সুবৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ। তখনও বঙ্গভাষা প্রাকৃত পৈশাচী ভাষা বলিয়া উচ্চতন সমাজে অনাদৃত—তৎসত্ত্বেও বাঙ্গলার প্রাকৃত লোকেরা ইহাতে সাহিত্য রচনা করিতেছে, আর সে যেমন তেমন সাহিত্য নয়, যার সম্বন্ধে দণ্ডী স্বয়ং বলিতেছেন—"অদ্ভুতার্থাং"। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই গ্রন্থের পরিচয় কেবল ভাষান্তর সংস্কৃতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহা হইতেই মূলের আন্দাজ করা যায়, আর ইহাও বোঝা যায়, ভাষায় এমন কত অপূর্ব্ব সাহিত্যই সে সময়ে রচিত হইত যাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। বৌদ্ধযুগে লোকসাধারণের প্রতি দৃষ্টিপাতবশতঃ লোকভাষা ও লোকসাহিত্যও পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। একদিকে তাহাতে সুফল হইল, আর এক দিকে কুফলও হইল। সংস্কৃতভাষা লোকভাষার উত্তম সাহিত্যগুলিকে আত্মসাৎ করিল। শুনা যায় তামিলভাষায় বহু প্রাচীন সাহিত্য পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বৌদ্ধ অভিভব না হওয়ায় সেগুলি টিঁকিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গলায় বৌদ্ধযুগে পালি ও সংস্কৃত এই দুই ভাষার প্রধান্য হওয়ায় প্রাচীন বঙ্গভাষার সাহিত্য—হয় সংস্কৃতান্তরিত হইয়াছে—কিম্বা অনাদরে লোপ পাইয়াছে।

যখন জীবনে নানাদিক হইতে ভাবের প্রাচুর্য্য আসে, এবং সে প্রাচুর্য্যকে ব্যক্ত করিবার অবসর থাকে তখনই সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যের বিকাশ হয়। বৌদ্ধ আমলে তাহাই হইয়াছিল। মুসলমান আমলে নূতন সভ্যতা বা বর্ব্বরতার যে স্পর্শ আসিল তাহা অভিঘাতরূপে আসিল, নিজেদের ঘর সামলাইতেই তখন প্রাণী ব্যস্ত—লেখনী ধরাটা সহজ নয়। সাহিত্য, জীবনের মুকুর। জাতীয় জীবনের যে-দিকটা সত্য হইয়া উঠিবে অর্থাৎ যে-কথাটা বা ভাবটা জাতিকে পাইয়া বসিবে তাহাই সাহিত্যরূপ ধারণ করিবে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বাঙ্গলার প্রাক্তন ধর্ম্মে মর্ম্মান্তিক ভেদ ছিল না, সুতরাং ধর্ম্মটাই তখনকার বাঙ্গালীর জীবনের একান্তভাবে অনুভূত বিষয় ছিল না, কিন্তু মুসলমানরা আসার পর ধর্ম্ম লইয়া এত টানা-হেঁচড়া চলিতে লাগিল, তাহাদের আচার ব্যবহার খাদ্যাখাদ্যে এত ভেদ দৃষ্ট হইল যে তখন সেই ভেদ-দৃষ্টিতে স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিই তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, তাই সে-সময়কার যত-কিছু বাঙ্গলা সাহিত্য পাওয়া যাইতেছে প্রধানতঃ ধার্ম্মিক। ধীরে

সুখে বসিয়া নানা চিত্রে ও রসে পূর্ণ কথাসরিৎসাগরের মত সাহিত্যরচনার তখন আর সময় নাই। সে সময় আবার আসিয়াছে ইংরেজ যুগে। এখন দেশ অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ হওয়ার দরুণ যেমন নূতন করিয়া অবসর আসিয়াছে, তেমনি পশ্চিম হইতে নানাভাবের প্লাবনও আসিয়াছে। রাজনীতি তার একটী ধারা। রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাঙ্গালীর সাহিত্যে ও কাব্যে রাজনৈতিক জ্ঞান ও আত্ম রক্ষা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। দণ্ডীর ন্যায় পণ্ডিতগণ বাঙ্গলার পৈশাচী-ভাষাকে দাবাইয়া সংস্কৃতের প্রচার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন—কথিত বাঙ্গলা এই উপলক্ষ্যে বেশী করিয়া সংস্কৃতের শাসনাধিকারভুক্ত হইল, ইহার কাঠামটি বাঙ্গলা রহিল, কিন্তু ইহার শরীর হইতে অনার্য্যশব্দ একে একে লোপ পাইতে লাগিল। সংস্কৃতাভিধানের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। বঙ্গভাষার শরীরকে আপন করার শক্তি পরেও প্রকট হইয়াছে, মুসলমান আমলে ভূরি ভূরি পার্শী আরবী শব্দও ইহা আত্মদেহলীন করিয়াছে। ইংরেজ-যুগেও এই গ্রহণ ও পরিপাকের ক্ষমতা ভারি রহিল।

বাঙ্গলার ভূতত্ত্বে যেমন পাওয়া যায় একদিকে হিমালয়ের পাদতল হইতে, একদিকে গঙ্গা বাহিয়া, আর একদিকে সাগর হইতে মৃত্তিকা জমিয়া জমিয়া বঙ্গদেশ প্রতিদিনই নূতন রূপে বিরচিত হইতেছে, তেমনি বঙ্গজাতিও উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দক্ষিণ হইতে সমাগত মনুষ্যের মিলনে প্রতিদিন নবভাবে গঠিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। বাঙ্গালী এক মিশ্রজাতি। একালের বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রহ্মণ প্রভৃতি বর্ণবিভাগ বৈদিক কালেরই মত বৃত্তির বিভাগ ব্যক্ত করে মাত্র, রক্তের পার্থক্য নয়। ভিন্ন ভিন্ন জেলার দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে সে কথাটা আরও দৃঢ় হয়। বাঙ্গালী মিশ্রজাতি, মিশ্রধর্ম্মী। মিশ্রতাতেই বাঙ্গালীর ঐক্য—আর ঐক্য বাঙ্গালীর ভাষায় ও সাহিত্যে। এক দেশের আমরা বাসিন্দা, এক ভাষামাতৃকার আমরা সন্তান, এক সাহিত্যের আমরা সংগঠয়িতা—এই আমাদের মূল কথা। কথিত প্রাদেশিক ভাষায় সামান্য ভেদ থাকিলেও লিখিত ভাষাই বাঙ্গালীর ঐক্যবন্ধন-সূত্র। যে বঙ্গবাসী মুসলমান বঙ্গভাষী হইবেন, যে বঙ্গজ মাড়োয়ারী বঙ্গভাষাকে নিজের জীবনে স্থান দিবেন, যে বঙ্গোপনিবেশী বিদেশী বাঙ্গলা সাহিত্যচর্চ্চার অনুরাগী হইবেন তিনিই নিজেকে বাঙ্গালী বলিবার দাবী রাখিবেন, যেমন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা সখারাম গণেশ দেউস্কর।

বাঙ্গলা ভাষার উৎস প্রাকৃত পৈশাচী হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি এখন সংস্কৃতে অবস্থিত। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য আমাদের সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইবে। মুসলমান সাহিত্যিকগণকেও সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। অন্যান্য ভাষার শব্দভাণ্ডার হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলাকে আমরা সমৃদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু ইহার অবয়বে প্রাণ, বল ও শ্রীসঞ্চারী হৃৎকেন্দ্র যে সংস্কৃত তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সাহিত্যের বিষয়ানুসারে শব্দবিন্যাসে ভেদ হইতে পারে, উর্দ্দু আরবী পার্শী বা ইংরাজী শব্দের বহুল-প্রয়োগ অবতারণা-বিশেষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইতে পারে—কিন্তু সর্ব্বত্র নহে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের কেন্দ্র স্থির রাখিয়া পরিধি বাড়াইতে হইবে। জীবনের সর্ব্বাংশেই সেই

কথা প্রযুজ্য। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের কেন্দ্র ঠিক রাখিয়া মনুষ্যত্বের পরিধি বাড়াইতে হইবে।

রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণ স্বাধীনতা যে বাঙ্গালীর লক্ষ্য হইবে তাহা বিচিত্র নহে, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা নূতন কথা নহে। পাঁচ হাজার বর্ষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালী স্বাধীনতার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-সারথি পাণ্ডবদের সহিত বিপুল যুদ্ধ করিয়াছিল। মোগলবাহিনী যখন ভারত উপপ্লবে নিষ্ক্রান্ত হইল তখনও বাঙ্গালী অষ্টাদশ বার তার প্রতিরোধ করিয়াছিল, এখনও বাঙ্গালীই স্বাধীনতামন্ত্রের গুরু। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শুধু ধর্মসংস্কারক মনীষী নহেন, তিনি স্বাধীনতার প্রচণ্ড পুরোহিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহেন, তিনি স্বাধীনতার বিপুল পিপাসী। তিনি আত্মজীবন চরিতে বলিয়াছেন—ধর্ম্মের দ্বারা, এক ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা সমস্ত ভারতকে মিলিত করিতে পারিলে একদিন ভারত স্বাধীন হইবে—এই আশা তাঁহার হৃদয়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রেরণা দান করিল।

এইখানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাহিত্যপরিষদ্ রাজনৈতিক পরিষদ্ নহে, সাহিত্যপরিষদের সদস্যগণ রাজনীতিক্ষেত্রের কর্ম্মী নহেন। কিন্তু রাজনীতিবিষয়ক কাব্য বা সাহিত্যের আলোচনা সাহিত্যপরিষদের অঙ্গীভূত, রাজনৈতিক জীবনের ফটো সাহিত্য-পরিষদের মিউজিয়মে অবশ্য রক্ষণীয়। সাহিত্যপরিষৎ মাসিমদলার সংগ্রাহক মাত্র, সে মাসমদলা ব্যবহারের ক্ষেত্র ইহা নহে। যেমন সাহিত্যিকের কাজ সাহিত্য রচনা করা, কিন্তু বৈয়াকরণের কাজ শুধু রচিত সাহিত্য হইতে ব্যাকরণের সূত্র উদ্ধার করা—তেমনি রাজনৈতিকের কাজ রাজনৈতিক কর্ম্ম করা; আর সাহিত্যিকের কাজ উহাদের কর্ম্মে ভাবের প্রেরণা দান করা ও কৃতকর্ম্ম হইতে তত্ত্ব নিষ্কাশ করা।

পরিষদের ক্ষেত্রের বাহিরে কিন্তু যিনি পরিষদের সদস্যতা ছাড়িয়া মানুষের বিশাল এলাকা-ভুক্ত না হইবেন তিনি অমানুষ থাকিয়া যাইবেন। শুধু খোপে খোপে প্রাচীন বা নবীন তত্ত্ব ও তথ্য সাজাইয়া রাখিয়াই যাঁর তৃপ্তি—জীবনের জলে নামিয়া সাঁতার কাটিতে বা বিরুদ্ধ শক্তিকে বশে আনিতে যাঁর রক্তে নাচন আসে না—তিনি জীবন থাকিতেও মৃতবৎ, সুতরাং সাহিত্যিককেও সাহিত্যপরিষদের বাহিরে সকল কর্ম্মে কর্ম্মী হইয়া জীবনের পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার তিনি পূর্ণভাবে ভোগে আনিবেন।

আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগেরও এ কথা ভাবা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যদি কেবলই কর্ম্মের স্রোতে হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করেন, সাহিত্যের অর্থাৎ দেশের উচ্চ ভাব ও উচ্চ আদর্শের সহিত সংস্পর্শ না রাখেন, তার হাওয়া অঙ্গে লাগিতে না দেন—তবে কেবল কর্ম্মের বন্ধ্যা নিমগ্ন হইয়া দেশকেও রসাতলে টানিবেন, মহাভারতের মুষলপর্ব্বের অবতারণার সম্ভাবনা হইবে, পরস্পরের আঘাতে পরস্পরে নির্ব্বংশ হইবেন। রাজনৈতিক জীবনে উন্নতি লাভ করিবার

অন্ত সে ক্ষেত্রে নূতন আদর্শ দেওয়া নূতন সাহিত্যের উপাদান সৃষ্টি করা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য। কেবল দ্বন্দ্ব কলহে নিমগ্ন থাকিলে তাঁহারা মনুষ্যত্বচ্যুত হইয়া পড়িবেন।

বিশ্বাত্মবোধ বা Universalism ভারতে শিরোমুখে বাঙ্গালীরই প্রচার। শঙ্করের গুরু ছিলেন গৌড় পাদাচার্য্য, নামেতেই প্রকাশ তিনি বাঙ্গালী। তাঁহারই শিক্ষা দীক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহারই বার্ত্তাবহ হইয়া শঙ্কর দিগ্বিজয় করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের শাসন ও অভিমান সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বৌদ্ধধর্ম্ম ও তান্ত্রিকধর্ম্ম গ্রহণের কারণও বিশ্বাত্মবোধেরই প্রেরণা।

জাতীয় উদ্বোধনের নেতা হইয়াও কবি রবীন্দ্র যে বিশ্বকে আলিঙ্গন দান করিতেছেন—এ সেই সনাতন বাঙ্গালীর আত্মাই তাঁহার ভিতর কার্য্য করিতেছে। বাঙ্গালী এক মহাজাতি, বাঙ্গালীর মহৎপ্রাণ, ব্যাপক বুদ্ধি। বাঙ্গালী ভগবৎ-প্রেরিত, তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশবিশেষ সাধনার পথে চলিয়াছে। কিন্তু ফাঁকির পথে নয়—সত্যের পথে চলিলেই সে সাধনা পূর্ণ হইবে। সত্যস্বরূপ ভগবান্ এই জাতির প্রতি কৃপা রাখুন, তাহাদের মার্গদর্শী হউন।

তেজোসি তেজো ময়ি ধেহি।
হে তেজ আমাদের ভিতর তেজের আধান কর।
সত্যমসি সত্যং ময়ি ধেহি।
হে সত্য আমাদের মধ্যে সত্যের আধান কর।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

———

সেকালের কথা

দ্বিজেন্দ্রনাথ চলে' গেলেন।

উত্তরায়ণে আরম্ভে সৌরমকরে শুভ মাঘমাসের চতুর্থ দিনে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বর্ষীয়ান, বিদ্বাবান্, পুণ্যপূর্ণপ্রাণ, সংযমশ্রেষ্ঠ বঙ্গদেশের সত্যব্রত ভীষ্মসম দ্বিজেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করেছেন।

ভীষ্মের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু বলে' অনুমান হয়; নইলে সরস্বতী পূজার দিনে এ ঘটনা ঘটবে কেন? যিনি আজীবন সরস্বতীর সেবা করেছেন, ষষ্ঠাধিক অশীতি মাঘ যাঁর শিরে অনুরাগে বাণী-চরণ-চুম্বিত আশীর্ব্বাদী কুসুম বর্ষণ করেছে, সেই সারস্বত-ব্রত-ধারী মহাপুরুষের জন্য সারস্বতোৎসবের দিন ভিন্ন বিষ্ণুলোক হ'তে পুষ্পরথ আর কোন দিন আসবে!

পার্ব্বণপ্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ গেছেন পৌষে, সর্ব্বসুন্দর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গেছেন ফাল্গুনে, আর বাক্‌যাজ্ঞিক দ্বিজেন্দ্রনাথ গেলেন মাঘে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কৌলিক উপাধি ঠাকুর। এই ঠাকুরবংশে ধনে মানে দানে পুণ্যে পাণ্ডিত্যে মহত্বে কবিত্বে কলানৈপুণ্যে অনেক বরেণ্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন, আমরা যাকে ঠাকুর বলি, ঠাকুরঘরের সেই ঠাকুরটি। শান্তোজ্জ্বল শ্যাম অচল শিলাখণ্ড, কিন্তু চক্রে চক্রে তেজ, চক্রে চক্রে শক্তি, চক্রে চক্রে মঙ্গলের দীপ্তি।

গত শতাধিক বর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে যত শুভানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে তার অনেকগুলির সূত্রপাত বা সাহায্যপ্রাপ্তি হ'য়েছে জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্র-ভবন হ'তে।

বৃটিশ-বঙ্গে রামমোহন রায় যে মঙ্গল-প্রদীপ জেলেছিলেন, সেই প্রদীপ স্নেহদানে প্রোজ্জ্বল করেছিলেন প্রধানতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বংশধরগণ।

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্মকে মন্দির গড়ে এই কলিকাতা নগরীতে প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁরই আগ্রহ উদ্যোগ ও যত্নে সমাজে পূজামন্ত্র, উপাসনা-প্রণালী ও সঙ্গীতাদির অভিব্যক্তি হয়। তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা কেবল ধর্ম্মপ্রচার করে ক্ষান্ত হয় নি, পরন্তু সংস্কৃতের রত্নাগার হ'তে হাল্কা হাল্কা মানানসই গহনা বেছে নিয়ে বাঙ্‌লা ভাষাকে প্রথম ক'নে দেখার সাজে সাজিয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। অধিক-কি বাঙ্‌লার গদ্য-জনকদের মধ্যে যিনি মাতৃভাষার জীবনে একটা উদ্দীপনা প্রথমে দিয়ে গেছেন সেই চিরপূজ্য অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে তৈরী ঐ তত্ত্ববোধিনীতে।

আজ জাতীয়তার সঙ্গে মৌখিক আত্মীয়তা নেই এমন ছেলে মেয়ে এদেশে দেখাই যায় না; কিন্তু একদিন দেশানুরাগ-বৃত্তির ঐ শুভনামকরণ-সংস্কার প্রথমে সম্পন্ন হয় পবিত্র দেবেন্দ্র-ভবনে। আজ দেশের রাজনৈতিক গগনে বড় বড় সূর্য্যপ্রকাশেই অনেক নক্ষত্রের-ই দীপ্তি লুপ্ত হ'য়েছে। সেই লুপ্ত-দীপ্তি নক্ষত্ররাজির মধ্যে আত্মহারা তারা নবগোপাল মিত্র বোধ হয় ১৮৬৮ অব্দে দুটি ভাব বুকের ভেতর নিয়ে, আর একখানি কাগজ হাতে করে মহর্ষির চরণতলে উপস্থিত হন। কাগজখানির নাম 'ন্যাশানাল পেপার' আর ভাবদুটির আখ্যা বাহুবল ও মিলন—একতা।

তখনকার ছোকরারা লাঙট পরে মাটি মেখে পালোয়ানী কুস্তি কর্ত্তে বড় প্রস্তুত নয় তাই যুবকদের ব্যায়ামচর্চ্চার জন্য নবগোপালের উদ্যোগে জিম্‌ন্যাষ্টিক বন্দোবস্ত হ'ল, আর মিলনের বর্ণপরিচয় শিক্ষার পাঠশালাস্বরূপ জাতীয় মেলা বা চৈত্রমেলা বলে' একটি বার্ষিক প্রদর্শনী খোলা হয়। বাঙালীর বারোমাসে তের পার্ব্বণের ভেতর ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় চড়কের বাণফোঁড়া সন্ন্যাস উঠে গিয়ে চৈত্র-সংক্রান্তিটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, সেইজন্য ঐ দিনটি বেছে নবগোপাল মিত্র একটি নূতন পার্ব্বণ প্রতিষ্ঠা কর্ব্বার চেষ্টা করেন। ঐ মেলা প্রথমে বসেছে ডন্‌কিন্ সাহেবের বাগানে হয়। ছোট বড় সকলেরই প্রবেশ-অধিকার, প্রবেশদ্বারে কিছু দিতেও হ'ত না। হায়, আজ বলতে লজ্জা হয়, শেষাশেষি ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম হিন্দুমেলা দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ খরচের সাহায্যের জন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা যখন দ্বার-প্রবেশের জন্য একআনা টিকিট ধার্য্য করেন, তখন অনেক সেয়ানা ভদ্রলোক চটে' গেলেন—বাজে খরচের কথা শুনে, মেলাটি বন্ধ হ'য়ে গেল। আর আজ 'কিং কার্ণিভ্যাল' দেখ্‌তে বাবু, বিবি, বাবালোকের কি ভিড়! ঐ মেলাতে কিছু কিছু কৃষিপ্রদর্শনী থাকতো, মহিলাশিল্পের অনেক বিচিত্র নমুনা প্রদর্শিত হ'ত; আমাদের স্কুলে যুবকেরা জিম্‌ন্যাষ্টিক্ ও এ্যক্রোব্যাটিক কৌশল দেখাতো, আর বর্দ্ধমান অঞ্চল থেকে রায়বেঁশে নামক বাঙালী কসরৎ খেলোয়াড়ের দল ঢাক ঢোল বাজিয়ে এসে যে শরীরের বল ও ক্রীড়া-কৌশল দেখাতো তা আজ পর্য্যন্ত কোন য়ুরোপীয় সার্কাসের দলে দেখিনি।

উদ্যোগ ছিল নবগোপাল ও তাঁর সহকারীগণের, কিন্তু শক্তির সঞ্চার কর্ত্তেন প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি জোড়াসাঁকোর জ্যোতিষ্কগণ।

"মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান, মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান;—"

ভারত-মাতার এই আদি বন্দনা-কবিতায় উদ্দীপনাপূর্ণ কণ্ঠ আবৃত্তি ঐ মেলাতেই প্রথমে আমরা সুপাঠক স্বর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের মুখে শুনি।

এদেশে নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়কলার ঠিক প্রবর্ত্তক না হ'লেও, শোনা গেছে বহুদিন পূর্ব্ব হ'তেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পারিবারিক প্রমোদচ্ছলে সামাজিক ব্যঙ্গ-লীলাদি রচিত ও অভিনীত হ'ত। পরে—সেও বোধ হয় ১৮৬৮ অব্দে ঐ স্থানে 'নবনাটক' নামে একখানি

সমসাময়িক চরিত্রাবলী-সংযুক্ত সামাজিক নাটক অতি উৎকৃষ্টভাবে অভিনীত হ'য়েছিল। ঐ নাটকে নট-নটী ছিল এবং নটী সেজেছিলেন স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। আহা কি রূপ! কি রূপ! বঙ্গদেশের রঙ্গমঞ্চের এমন সৌভাগ্য কবে হবে যে সেই সৌন্দর্য্যের রাশি বিকশিত করে' কোনো রমণী দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন কর্ব্বে। আর কণ্ঠ—গানটি "জয়দেবী" সংস্কৃতে রচিত, আর বীণার ঝঙ্কারে গীত। যাঁর সঙ্গে একমঞ্চে অভিনয় করে' একদিন গৌরবান্বিত হ'য়েছি, সেই প্রবীণ নট ৺অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেজেছিলেন কর্ত্তা—গবেশ বাবু; স্বিয়ংবুদ্ধ অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী বরাবর বলতো যে অক্ষয়বাবুর ঐ অভিনয় দেখেই সে তার নিজের অননুকরণীয় বৃদ্ধ কর্ত্তার ভূমিকা-অভিনয়-প্রণালী সৃষ্টি করে।

পূজ্যপাদ নাট্যকারগুরু স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় ঐ নাটকখানি লিখে ঠাকুর-বাড়ী থেকে একখানি রূপার থালায় সাজানো পাঁচশোটি টাকা মর্য্যাদাস্বরূপ প্রাপ্ত হন। আজ তর্করত্ন মহাশয় ঐরূপ নাটক লিখলে অন্ততঃ দুই সহস্র মুদ্রা লাভ কর্ত্তে পার্ত্তেন; তবে এখন দাঁড়ায় সেটা বেহদ্দ, তখন ছিল সেটা মর্য্যাদা। *

প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত, আজকাল এদেশে অভিনয়ের যে এত শ্রীবৃদ্ধি এত আদর আর সঙ্গীতবিদ্যার যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, তার মূলেও ঐ মহান্ ঠাকুর-মহীরুহের অন্যতম শোভাময় শাখা—মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁর অনুজ স্যার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

যখন দেশের সৌন্দর্য্যবোধ-বুদ্ধি বিকৃত হ'য়ে রূপের পরিচয় 'দিব্য ছেলেটি, যেন নাদুস্-নুদুস্ গণেশটি', 'আহা মেয়েটি নয় যেন আহ্লাদী পুতুলটি' দাঁড়াচ্ছিল; যখন কলসীর কাণা বাউটি আর কাণভরা মাকড়ির সার রূপের লহরে প্রলয়ের তুফান তুলছিল তখন জোড়াসাঁকোই সামগ্রিক শিক্ষিত অধিবাসীগণের মধ্যে অঙ্গসৌষ্ঠবের ও পরিচ্ছদের একটা আদর্শ ধরে' দেয়। দেবেন্দ্র-মন্দিরে সৌন্দর্য্য পূজার পারিপাট্যের এ দেশে এত প্রসিদ্ধি যে আজ যদি রবীন্দ্রনাথ কবিকুলেন্দ্র বলে' সম্মানিত হবার শক্তিলাভ না কর্ত্তেন তবে তাঁর নামে অনায়াসে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করা চলতো।

মহর্ষির পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে এক-একজন এক-একটি রত্ন। লেখক মনে দীন, রত্ন কথাটি কাণে শুনেছে, অক্ষরে দেখেছে, প্রত্যক্ষ বস্তুপরিচয় কখনও হয় নি, সুতরাং সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, হীরে, পান্না, চুণী প্রভৃতি কিসের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের তুলনা দেবে তা' ঠিক কর্ত্তে পার্চ্ছে না। তবে রত্ন বল্লেই যে একটি জ্যোতিঃপূর্ণ স্বচ্ছোজ্জ্বল, বিমল,—রাজরাজেন্দ্র-

---

* সাহিত্য-জগতে অপরিচিত গিরীশচন্দ্রের নাট্যরচনা-প্রণালীর প্রশংসা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত 'ভারতী'তেই প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিবরের 'মায়াতরু'র কল্পনা ও গীত, সাগরবালা, স্বপ্নসঙ্গিনী প্রভৃতি অপরূপা চিত্রের সৃষ্টি ও তাঁহার নাট্যছন্দের সুখ্যাতি প্রথমে ঐ 'ভারতী' মুক্তকণ্ঠে করে।

শিরোভূষণোপযোগী অমূল্য পদার্থের ছবি চক্ষের সামনে ফুটে ওঠে, দ্বিজেন্দ্রনাথের নামেও তেম্‌নি একটি মানবপ্রকৃতির প্রতিভার শান্ত সৌন্দর্য্যের, অতুল ঐশ্বর্য্যের আভা যেন নয়ন-পথে প্রদীপ্ত হয়।

আমাদের ইংরাজীশিক্ষিত পণ্ডিতগণ ইদানীং ফিলজফারের অনুবাদে দার্শনিক বলে' একটা কথা সৃষ্টি করেছেন, সেজন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক নামে অভিহিত হ'তেন। কিন্তু প্রাচীন যুগে দর্শন শব্দ আত্মদর্শন অর্থে প্রযোজিত হ'ত, আর সেই শক্তির অধিকারীকে জ্ঞানচক্ষু-উদ্ভাসিত ঋষি বলে' সম্মান কর্ত্তো। ক্রিশ্চান ধর্ম্মগ্রন্থে ঐরূপ মনীষীকেই বোধ হয় Wise man of the East বলে' উল্লেখ করে। সংস্কৃত, বাঙ্‌লা, ইংরেজী, পারস্য প্রভৃতি ভাষায় দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বৈয়াকরণিক, দার্শনিক, ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ ও কবি ছিলেন। কিন্তু আত্মদর্শন-শক্তির গভীরতায় তাঁকে যুগপ্রভাবের তুলনায় ঋষি বল্লে অত্যুক্তি হয় না।

প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করেও তিনি এক প্রকার সর্ব্বত্যাগী ছিলেন। পারিবারিক ইতিহাসের উজ্জ্বল পবিত্র পৃষ্ঠায় তাঁর ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেবার্চ্চনা-পূত চন্দনের অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

অনুমান ছিয়াশী বৎসর বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করেছেন। যে প্রতিভাবান্ পুরুষের জীবন-প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে, তাঁর মস্তিষ্কে অন্ততঃ একশত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে অঙ্কিত থাকা সম্ভব।

প্রায় দেড়শত বৎসরের আখ্যায়িকার লিপিপূর্ণ এই জীবন্ত গ্রন্থখানি এতদিন পরে কালের সঞ্চয়শালায় চলে' গেল! পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি লোকলোচন হ'তে অন্তর্হিত হ'ল! জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত হ'ল!

ঠাকুরবাড়ীতে রবির আলো, বহু বিজলীর দীপ্তি, স্বর্ণ প্রদীপের শান্ত শোভা, সবই রইল বটে, কিন্তু ঠাকুরঘরের ঘৃতসিক্ত মঙ্গলদীপটি নিবে গেল।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

জোয়ার-ভাঁটা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কেন? অবশ্য এরূপ অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ প্রশ্নের হয়ত কোন সার্থকতা নাই, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রশ্নের তেমন কোন কাটা-ছাঁটা উত্তর মেলা প্রায় অসম্ভব। একের মনোভাবের চেয়ে অপরের মনোভাবের প্রাবল্য ঘটিবার এত সব অবস্থাগত ও মজ্জাগত হেতু থাকিতে পারে যে, তাহাদের দরুণ করিয়া একটা কোন রীতিমত হিসাব খাড়া করা খুব নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের পক্ষেও বেজায় শক্ত। তবে এ-ক্ষেত্রে এই দুইটি মনোভাবের বিভিন্নতার একটা বিশেষ কারণ সংঘটিত হইয়াছিল।

মুরলার ভাব নদীতে যখন নূতন অবসাদক টানে আগের উত্তেজক উচ্ছ্বাসকে এমন দাবাইয়া গেল, তখন হইতে যেন ঘটনার দু-মুখো খাতে সেই নদীর স্রোত দুইটা বিভিন্ন পথ ধরিল। কাজেই সমস্ত স্রোতের বেগ এইরকমে ভাগাভাগি হইয়া পড়িবে বৈ কি। আবার এই ভাগের পরিমাণও যেন সমান সমান নয়। পুরাতন প্রেম অপেক্ষা নূতন বিলাসের দিকেই ইহার ঝোঁক এখন একটু বেশী পড়িয়াছে। এই নূতন দিকটা সংকীর্ণ হইলেও অবশ্য নীচু। উত্তেজক ও অবসাদক দুইটা বিপরীত ধারণার সংঘর্ষে মুরলার ভাব-নদীর এই সংকীর্ণ ও নীচু মোহনাই যেন বড় বেশী ফলাও হইয়া খুলিয়া গিয়াছিল।

বেদান্তবাগীশের শাসনের চপেটায় মুরলার হৃদয় থেকে সেই রঙীণ কাপড়ের নেশা ত ছোটে নাই। বিধবার সাত বৎসর বয়স হইতে ভোলানাথ তার যে লোভটাকে এমন করিয়া নির্দ্দয়ভাবে গলা টিপিয়া রাখিলেন, কি আশ্চর্য্য, এত টিপুনীতেও সেটা মরা দূরে থাক—একটু কমজোরীই বা হইয়া পড়িল কৈ! বড়া শাসন-বিধির ফল এইরকমই হয় নাকি? যেটাকে শুধু গা-জুরি রকমে চাপিয়া রাখা যায়, সেটা একদিন বুঝি প্রতিকূল ঘটনার ঠেলায় এমনই করিয়া হঠাৎ আবার লাফাইয়া উঠে। নহিলে মুরলার এমন আবাল্যশাসিত মনে শেফালিকার ঐ ঝুমকো-ঝাপটা পাশী-বেয়ানসী আজ এতটা প্রভাব কিরূপে বিস্তার করিয়া বসিল!

সেই বিজয়ার আলাপের পর হইতে ভাদুড়ী-বৌ মুরলার যেন খুব আপন হইয়া গিয়াছে। শেফালিকাও মুরলার সঙ্গ ছাড়া যেন বড় থাকিতে পারে না, সে প্রায়ই নিজের দাসীর দ্বারা মুরলাকে এখন বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যায়। কিন্তু উভয়ের এই নূতন মিলনের স্রোতটা খুব

খর হইলেও তেমন গভীর নয়। গভীর হইলে ইহার এত খরস্রোতটাই বুঝি একটু কমিয়া যাইত। শেফালিকার মনে ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু তেমন যেন গভীরতা নাই। সে অন্তরের কোন ভাবের মধ্যেই তেমন যেন ডুবিতে পারে না, ডুবিতে চাহেও না। ডুবিতে পারে নাই বলিয়াই যেন ডুবিতে চাহে না।

সংসারের সকল সম্বন্ধের তুলনায় শ্যামাকান্তের সম্বন্ধ অপেক্ষা তাহার কাছে কোনটাই ত আর বেশী ঘনিষ্ঠ নয়। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে সে বড় বেশী ডুবিতে সুযোগ পায় নাই বলিয়া কি সুখের, কি দুঃখের সকল ব্যাপারেই শেফালিকার যেন একটু ভাসিয়া থাকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। শ্যামাকান্ত ভাদুড়ীর এমন সদাই-হাসি-মুখ পত্নীটির যে কোন দুঃখ থাকিতে পারে, এটা হয়ত মুরলার ধারণার অতীত, কিন্তু তাহা হইলেও শেফালিকার জীবনের খাতায় সুখের জমার চেয়ে দুঃখের খরচটা বড় কম ছিল না। তবে এই খরচের ভারে সে তার মনটাকে যেন ভারী হইতে দিত না। অন্ততঃ তার মনের উপর এই ভার চাপিলেও, তার বাহিরে সেটা কখন মালুম হইত না। তাহার এই নূতন সঙ্গিনীর কাছে তাহার সুখ যতই খুলুক, শেফালিকার অন্তর বড় বেশী খোলে নাই। শেফালিকা তার এই সঙ্গিনীর সঙ্গে শুধু বেদম কথা কহিতেই ভালবাসিত, তার নীরব ব্যথাটুকু কখন আভাসেও মুরলার কাছে ধরা পড়ে নাই। এমন করিয়া মুরলার কাছে নিজেকে ঢাকিয়া রাখা শেফালিকার পক্ষে কি নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে? শেফালিকা বাহিরে যতটা খোলা ভাব দেখাক, আসলে সে কি বড়ই চাপা লোক? বাস্তবিক এরূপ কোন অসঙ্গতির দোষ শেফালিকার উপরে চাপান বোধ হয় খুব সঙ্গত নয়। শেফালিকা নিজের হৃদয়ের দ্বারে যদি তাহার সঙ্গিনীর তেমন কোন দরদের স্পর্শ অনুভব করিত, তবে সে তাহা না খুলিয়াই থাকিতে পারিত না। কিন্তু মুরলার মন যে ভাদুড়ী-বৌয়ের রঙীন বাহিরটাতেই বেজায় আটক পড়িয়া গিয়াছে, শেফালিকার অন্তরের কোন লুকান ব্যথা জানিবার তার সে আগ্রহ কৈ? শেফালিকার উপর মুরলার যে কোন সুনজর বা ভালবাসা নাই, তাহা নয়। কিন্তু তার এই ভালবাসা যে রত্নাভরণা হাস্যোজ্জ্বলা শেফালিকাই সবটা দখল করিয়া বসিয়াছে, ভিতরকার নিরাভরণা দীনা শেফালিকার ভাগে তাহার ছিটা-ফোঁটাও যে পড়ে নাই! তাই শেফালিকার একটা দিক তার খুবই জানা, আর একটা দিক তার খুবই অচেনা।

ভাদুড়ী-বৌয়ের এই জানা দিকটা দিয়াই এখন ভাদুড়ীবাবুকে মানার দিকটাও যেন মুরলার মনে দিন দিন কেমন ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে। শ্যামাকান্তের সেই প্রথম শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় মুরলার মনে যে তাহার প্রতি ভক্তি উদ্রিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অবশ্য সেই বিজয়ার দিনে তাহার হৃদয় হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াই গিয়াছে। এখন মুরলার মনোরাজ্যে শাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্যামাকান্তের স্থলটায় ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত ভাদুড়ীবাবুরই যেন বেশী অধিকার। আর ভাদুড়ীবাবুর এই বিলাস-বিভবের আধিপত্যে মুরলার হৃদয়ে সরোজের প্রভাবও এখন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইহাই কি ঐ পোড়ার কেনর একটা বিশেষ উত্তর নয়?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সরোজের কাব্য-চর্চ্চা অবশ্য এখনও চলিতেছে। এই চর্চ্চার প্রতি তার অন্তরের আগ্রহ যেন এখন কিছু হটিলেও, ইহার প্রতি তার বাহ্য আগ্রহ একটুও ঘাটে নাই বরং বিলক্ষণই বাড়িয়াছে। তার মনের ভিতর এখন ভবভূতির মুরলা অপেক্ষা ভোলানাথের মুরলার আকর্ষণই অবশ্য বেশী প্রবল। সরোজকে তবু যেন দায়ে পড়িয়াই তার কাব্য-চর্চ্চার উত্তেজনাকে আরও বেশী উত্তেজিত করিতে হইয়াছে। আগে অনেক বাদ পড়িত, এখন একটি দিনও এই চর্চ্চায় ফাঁক পড়ে না।

কিন্তু যাহার জন্য সরোজের এই কাব্য-চর্চ্চার আগ্রহের এমন অনাবশ্যক অথচ অনিবার্য্য উপচয়, তাহার সেই আগ্রহের অপচয়ই যে ওদিকে নিতান্ত আবশ্যক ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কাব্য-চর্চ্চার মধ্যে সরোজের দৃষ্টি কতদিন অনেকবার এ-ধার ও-ধার ঘুরিয়াও তার লক্ষ্যটিকে এখন কোথাও খুঁজিয়া পায় না। তাঁহার কান সদাই খাড়া থাকিলেও, অভীষ্ট কণ্ঠস্বরটি তার হৃদয়কে যে এখন কতদিনই কোন নাড়া দেয় না। মুরলা কি তবে এখন সরোজের এই দৃষ্টি হইতে নিজেকে তফাতে রাখিতে বিশেষ অবহিত? না সে নিজের কণ্ঠস্বরে পর্য্যন্ত সরোজের অন্তরাত্মাকে আর স্পর্শ করিতে একান্ত নারাজ? অবশ্য এ-রকম কিছুই নয়—তাহাদের উভয়ের মনের ঘাত-প্রতিঘাত এখনও ত বেশী স্পষ্ট ও বাধাহীন। তবে যে মুরলার আচরণে এ-সম্বন্ধে এখন অনেক বিরতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটা ত তার মনের স্থিতির জন্য একটুও নয়, সেটা তার মনের অন্যদিকে গতির জন্যই। মুরলা এখন যেদিন সরোজের সংস্রবে আসে, সে ত বেশ নিরুদ্বেগেই আসে। কিন্তু তাহার এই আসাটায় যে অন্যরকম আটক পড়িয়াছে। এখন যে সে অনেকদিন সরোজের কাব্য-চর্চ্চার সময়টা পর্য্যন্ত জামাকাপড়ের বাড়ীতে কাটায় এবং বেশ নিরুদ্বেগেই কাটায়। তার বৈরাগ্যের ক্ষতির হিসাবে সরোজের সংস্রব বাড়িলেও, তার উদ্বেগ নাই, তার প্রেম-চর্চ্চার ক্ষতির হিসাবে সরোজের সংস্রব কমিলেও, তার উদ্বেগ নাই।

আজ বেদান্তবাগীশ গ্রামান্তরে একটা কাজে গিয়াছেন, তাঁহার ফিরিতে অনেক দেরী হইবে। আজকার অনধ্যায়ের কথা সরোজ আগে হইতেই জানিত, তবু অভ্যাসগত ঝোঁকের বশে সে একবার মুরলাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া গেল। তাহার উৎসুক মনের উপরে যেমন এই কাব্য-চর্চ্চার বন্ধটা কঠোর লাগিয়াছিল, তাহার উৎসুক চক্ষের উপরও ঐ বন্ধ বাড়ীটা তেমনই আঘাত করিল। কাব্য-চর্চ্চার বিরতি অপেক্ষাও এখন এই বাড়ীর নীরবতা যেন তাহার প্রাণে একটা বরফের বোঝার মত চাপিয়া বসিল।

মুরলা কিন্তু তখন বেশ একাগ্রমনেই ভাদুড়ী-বৌয়ের সুখৈশ্বর্য্য পরীক্ষা করিতেছিল। সে জানে এ পরীক্ষায় তাহার কোন লাভ নাই, তবু তাহার মনটা যে কিছুতেই বাগ মানে

না। শেফালিকার সোনা-দানা চিরদিন শেফালিকার বাক্সেই থাকিবে, তবু সেগুলা চোখে দেখিতেই মুরলার কেমন একটা সুখবোধ হয়। মুরলার আজ এই সুখটা উপভোগ করিবার খুব সুযোগ ঘটিয়াছে। শেফালিকা আজ তার বসন-ভূষণগুলা একটু ঝাড়পোঁচ করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল। মুরলা কাছে বসিয়া বিস্ফারিতনেত্রে সেইদিকে চাহিয়া আছে। মাঝে মাঝে দুই একটা প্রশংসার ধ্বনি যেন আপনিই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

এইসকল বেশ-ভূষার প্রতি শেফালিকার যে খুব একটা বেশীর আসক্তি ছিল, তাহা নয়। লোককে এগুলা বিশেষ করিয়া দেখানর ভাবও তাহার মনে বড় ছিল না। সে শুধু তাহার নিজের ইচ্ছায় সাজিলে, তাহার সেদিনকার সেই পূজা-বাড়ীর সাজটার অন্ত অমকাল আধিক্য অনেক কমিয়া যাইত। তাহার এইসকল সামাজিক নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের সাজ-সজ্জার বেশী অংশটা শ্যামাকান্তের আভিনন্দিক রুচি দ্বারা সম্পাদিত হইত। তাহাকে লইয়া শ্যামাকান্তের এরূপ পুতুলখেলায় শেফালিকা অবশ্যই কোন আপত্তি করিত না—এরূপ সাজ-গোজের প্রতি তাহার বিশেষ আসক্তি না থাকিলেও, বিশেষ বিরক্তিই বা কেন থাকিবে?

ঐসব নৈমিত্তিক সাজগুলার মত শেফালিকার নিত্যকার সাজ-সজ্জায় শ্যামাকান্তের তত নজর না পড়িলেই কথা। তাহা বলিয়া শেফালিকা এই ব্যাপারটায় নিতান্ত বৈরাগিনী অবশ্যই নয়। তবু এ-বিষয়ে তাহার যে ত্রুটি ঘটিত, তাহা এখন শোধরাইবায় শেফালিকার ভাগ্যে দুইটি বেশ আগ্রহান্বিত হাত জুটিয়াছে। মুরলার সংগ্রহ যত্নে শেফালিকার নিত্যকার প্রসাধন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। নৈমিত্তিক সজ্জায় শ্যামাকান্তের চোখের ইঙ্গিতের মত আটপৌরে বেশ-ভূষায় মুরলার হাতের টান-টোনকে শেফালিকা অবশ্য একটুও অমান্য করে না।

আজ কিন্তু মুরলা যখন প্রশংসার চক্ষে দুই-একখানা গহনা বাছিয়া তাহার সখীর অঙ্গে পরাইতে লাগিল, শেফালিকা হঠাৎ তার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল। অবস্থার গতিকে শেফালিকার ভাগ্যে আন্তরিক দুঃখভোগ থাকিলেও, বাস্তবিক তাহার প্রকৃতিটা ছিল বড়ই আমোদপ্রবণ। উত্তেজনার বশে তাহার সেই আমোদপ্রিয়তা যেন সংযম ও সঙ্গতির সীমাও লঙ্ঘন করিয়া ফেলিত। শেফালিকা আজ এইরূপ একটা আমোদের উৎসাহে বলিয়া বসিল,—

"না সই, আজকার ব্যাপারটা হবে ঠিক উল্টো।"

মুরলা অবশ্য কিছু বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রকম?"

"একটু আঁচই কর না।"

"আজ নতুন কিছু না পরে' যা পরে' আছ তাই কিছু খুলে ফেলবে বুঝি?"

আসল উত্তরটা শেফালিকার জিবের ডগায় আসিয়াও যেন বাহির হইতে চাহে না।

শেফালিকা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল,—"না, তোমার আঁচটা ঠিক ব্যাপারটাকে ডিঙিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।"

মুরলা এবার নিজের হাত টানিয়া কহিল,—"আচ্ছা ও-সব আঁচা-আঁচির কাজ এখন তবে তোলা থাক। এখন যে কাজে লেগেছি, সেইটাই সারতে দাও।"

শেফালিকা তবু মুরলার হাত ছাড়িল না। একটা যেন ঢোক গিলিয়া বলিল,—"ও-কাজ তুমি ত রোজই কর। আমি কেন ও-কাজটা আজ একটু করতে শিখি না?"

মুরলা এবার যেন মুখ ভার করিয়া কহিল,—"ও, তাই বল আমার দাদান বুঝি তোমার পছন্দ হচ্ছে না।"

শেফালিকা অমনই মুরলার চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে বলিল,—"না লো, নিজেকে সাজিয়ে কি আর পরকে সাজান শেখা হয়?"

শেফালিকা কেবল আপনার সাজে তুষ্ট না থাকিয়া পরকে সাজাইতেও ভালবাসিত। সময়মত পাড়ার বৌ-ঝিদের হাতের জোড়ায় পাইলেই শেফালিকা তাহাদের খোঁপা বাঁধিতে বসিত। এ কাজে তাহার বিশেষ নৈপুণ্যও ছিল। মুরলা ঐরূপ কোন অভ্যাগতের আগমনে তাহার ব্যস্তার সেইসব বেশভূষার দর্শনজনিত নিজের তৃপ্তিটুকুর ব্যাঘাত আশঙ্কা করিয়া বলিল,—"এখনই কেউ আসবে নাকি?"

শেফালিকা সহাস্যে কহিল,—"কেন, যে এখানে আছে, তাকেই একবার সাজিয়ে দেখি না।" সেকি! শেফালিকার মুখ দিয়া কখন ত এরূপ নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বাহির হয় নাই। মুরলা যেন একটু স্তম্ভিতভাবে ঘাড় হেঁট করিল।

কিন্তু শেফালিকা মুরলার নিকটে একটা যেমনতর হোক প্রতিবাদই আশা করিয়াছিল। এক্ষণে সখীর এই নীরবতাটুকুর অন্যরকম মানে করিয়া উৎসাহের সহিত বলিল,—"তবে অনুমতি পেয়েছি ত?"

এই বলিয়াই শেফালিকা মুরলার চুলের গোছা ধরিয়া চিরুণী হাতে লইল। মুরলার মুখখানার অন্ধকার যেন কাটিয়া গেল—তবে শেফালিকার কথাটা বিধবার প্রতি একটা মিথ্যা ঠাট্টা নয়। মুরলা প্রসন্নভাবেই শেফালিকাকে বাধা দিয়া কহিল,—"এগুলো এত ভাল করে বাঁধলে মাথাটা দেহের সঙ্গে খাপ খাবে কেন?"

শেফালিকা মুরলার বাধা না মানিয়া কহিল,—"দেহটাকেই ছাড়্‌ব নাকি, এই চারিদিকে যা-কিছু ছড়ান আছে, সবগুলো একবার তোমার উপর চাপাব।"

মুরলা চকিতে একবার চারিদিকে চাহিল। তার চোখদুটো যেন দুগ্ধলোলুপ বিড়ালের মত বড় হইয়া উঠিল। তবে মুখে অবশ্য সে প্রতিবাদই করিল। বলিল,—"একি পাগলামি, বউদিদি।"

"এমন পাগলামি ঘণ্টাখানেক করলামই বা। তাতে ত মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।"

"মহাভারত অশুদ্ধ না হোক, অন্য কারও সামনে পড়লে, এ কাণ্ডটা যে বিশুদ্ধ থাকবে না।"

তাহারা দ্বিতলের একটি নিভৃতরকম কক্ষে বসিয়াছিল। শেফালিকা বলিল,—"সেভয় নেই, এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।"

মুরলা এবার একটু কৌতুক করিয়া বলিল,—"কিন্তু অসাধারণ কোন নিষেধের বিধি নেই?"

শেফালিকা এবার উঠিয়া সমুখের দরজাটায় খিল দিয়া বলিল,—"কেমন, তোমার অসাধারণের জন্যে খুব কড়ারকম নিষেধেরই স্থাপনা হ'ল ত?"

"বিধি ঠেলা যায়, কিন্তু কপাট সহজে ভাঙা যায় না।"

এই বলিয়াই শেফালিকা তাঁর ঐ ঘণ্টাখানেকের পাগলামির কাজে লাগিয়া গেল। মুরলা আর তেমন-কিছু আপত্তি করিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শেফালিকার আমোদচঞ্চল হস্তে এই বেশবিন্যাসের ব্যাপারটায় সত্যই বড় কিছু বাদ পড়িল না। অলক্তক ও সিন্দুর ছাড়া মুরলার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নীঘ্রই বিচিত্র বেশভূষার আভায় ঝকমক করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই-একটা প্রতিবাদ মুরলার মুখ থেকে বাহির হইল বটে, কিন্তু সে এত মৃদু যে নেপথ্যকারিণীর সামান্য একটু আগ্রহের হুৎকারেই কোথায় উড়িয়া গেল। তবে রঙীন পাতলি মাঝে কুঁড়িটির মত মুরলা অবশ্য একটু ব্রীড়াভরে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। প্রসাধনের শেষে শেফালিকা যখন তাহার ছোট মুখখানা ঈষন্নমিত করিয়া ধরিল, জড়িমা জড়িত নব বধূটির মত মৃদু হাসিটুকুও মুরলার অধরে একটু খেলিতে ছাড়িল না। যাই হৌক তাহাদের এ রঙ্গরস বিশেষ জমাট না বাঁধিতেই হঠাৎ একটা বাধা ঘটিল। কোন প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনীর চড়া কণ্ঠস্বর এইসময়ে হঠাৎ বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের নিভৃত কক্ষটিতে আসিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পাছে স্বরের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশিনীর পাদুখানিও আসিয়া হাজির হয়, এই আশঙ্কায় শেফালিকা ত্বরিতে নীচের তলায় নামিয়া গেল। নীরব নিস্পন্দ কক্ষটিতে এখন একা মুরলা। বাহিরে দিনের আলো পশ্চিম গগনের ভালে শেষ রং ফলাইয়া বিদায় লইতেছে। বায়ুকোণে একখানা কালো মেঘ প্রকাণ্ড দানবের মত মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে যেন একটা থম-থমে ভাব—ঐ দানবটার মাথা ফাটিয়া এখনই বুঝি ঊনপঞ্চাশ পবন রুদ্র-তাণ্ডবে দিক-

বিদিকে ছুটিবে। মুরলার কিন্তু বাহিরের কোন কথাই ভাবিবার মত যেন অবস্থা নয়। তাহার দেহের রূপান্তর দেখিয়া তাহার মনটাও রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। সংসার ও সমাজ হইতে সে যেন কোন কল্পরাজ্যের দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। সে যেন এক রূপ-কথার রাজকন্যা, সোনার কাঠির স্পর্শে নূতন চেতনায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

ঘরে বিচিত্র আসবাব, বিচিত্র ছবি, বিচিত্র পালঙ্কে বিচিত্র কুসুম-পেলব শয্যা। একখানা প্রকাণ্ড আয়নায় সন্ধ্যার রক্তরাগ পড়িয়া চারিপাশ রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। মুরলা ধীরে ধীরে উঠিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। নিজেকে সে যেন আর চিনিতে পারে না। এ কি সেই ভোলানাথ বেদান্তবাগীশের কন্যা, যার পরিণয় ও বৈধব্য ছয় বৎসর বয়সের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে! মুরলার বিভূষিত কর্ণ, কণ্ঠ, বক্ষ, বাহু সর্ব্বাঙ্গ যেন তার এতদিনের পুরাণ পরিচয়টাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মণিমুক্তা সোনা-দানার তীব্র আলোকে তাহার চক্ষে বুঝি ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল। মুরলা বিভোর হইয়া দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিল। উহাকে সে হিংসা করিবে, না ভাল বাসিবে, এটা বুঝি সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিছুক্ষণের জন্য তাহার এই ভাস্বর রূপান্তরের যেন এক অব্যক্ত মন্ত্রমুগ্ধ মোহজাল তাহার চিন্তাশক্তিকে বেড়িয়া জড়াইয়া রহিল।

শেফালিকা অর্গল খুলিয়া চলিয়া যাইবার পর দরজা কেবল ভেজানই ছিল। এই সময় একটি মনুষ্য মূর্ত্তি আসিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। এতক্ষণে মুরলার মোহ অনেকটা কাটিলেও তাহার রূপান্তরের মাদকতা এখনও একেবারে ছোটে নাই। বেশভূষার প্রতি আকর্ষণটা এখনও তাহার চিত্তকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই যে তাহাকে আবার ভোলানাথের নেড়াবোচা বিধবা কন্যা সাজিতে হইবে, এই চিন্তাটা এখনও তাহার মনের সঙ্গে যেন তেমন খাপ খাইতেছে না। সে মুরলা না হইয়া কেন শেফালিকা হইল না, এইরূপ একটু আক্ষেপও তাহার মনে উঁকি দিতেছিল। ঐ নবাগত মূর্ত্তিটি অবশ্য আর কেহ নয়, ইনি শেফালিকার সেই অসাধারণ ব্যক্তি, যার এ-গৃহের সর্ব্বত্রই প্রবেশের অবাধ অধিকার। শেফালিকার এই আমোদ-লীলার প্রারম্ভে শ্যামাকান্ত বাড়ী ছিল না বটে, কিন্তু দুই সখীতে যখন আলাপ-প্রলাপে বাদ-প্রতিবাদে খুব ব্যস্ত, তখন শ্যামাকান্ত যে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে আসিয়া অন্য একটি কক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল এটা তাহাদের কাহারও খেয়ালে আসে নাই। এরূপ নিঃশব্দে সঞ্চরণ করা তার আভিনয়িক অভ্যাসের কোন ফল কি না তাহা ঠিক জানি না। তবে মুরলা যে একা এ-ঘরে আছে, এটা অবশ্যই শ্যামাকান্ত জানিত না, বরং দরজা খোলা ও সিঁড়িতে নামার শব্দটা মুরলার বিদায়েরই সূচনা বলিয়া সে মনে করিয়াছিল। এখন সেই শয়ন-কক্ষে এমন সুসজ্জিত নারীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে শেফালিকা ভাবিয়াই শ্যামাকান্ত বলিল—"আজ এমন ভুবন-মোহন বেশ কেন গো?"

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মুরলা যে লজ্জায় একান্ত জড়সড় হইবে, ইহাতে আর কথা কি, কিন্তু শ্যামাকান্তের এই ভ্রান্তিটায় তাহার যতটা বিরক্ত বা বিব্রত হওয়া উচিত ছিল, তাহা যেন সে হইল না। সে শুধু একধারে গিয়া হেঁটমুখে দাঁড়াইল। শ্যামাকান্ত আবার ভ্রমের বশেই কহিল,

'তাইত একেবারে যে বাসর ঘরের কনে বউটি। বাসরের অভিনয় যত ইচ্ছে কর্‌তে পার, কিন্তু বরের কানমলাটুকু বাদ। সে বন্দোবস্তেরও কোন লোক জোগাড় হয়েছে নাকি?"

মুরলার অবস্থার এখনও যেন কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। শ্যামাকান্ত দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, "লজ্জা রোগটার আজ বড়ই যে বাড়াবাড়ি। মুখের সঙ্গে যোমটার একটু ছাড়াছাড়ি না করলে দেখছি এ ব্যাধি কাটছে না।"

এই বলিয়াই শ্যামাকান্ত মুরলার মাথা থেকে কাপড় টানিয়া ফেলিতেই আসল ব্যাপারটা এবার অবশ্যই তাহার চক্ষু এড়াইল না একটা প্রবল বিস্ময় ও আমোদের হিল্লোল শ্যামাকান্তের মনের উপর দিয়া খেলিয়া গেল।

সেই সঙ্গে তাহার দৃষ্টির ভিতরে একটা লোলুপতাও ফুটিয়া উঠিল।

শ্যামাকান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"সুন্দর মানিয়েছে তোমায় মুরলা।"

মুরলা এখনও নিস্পন্দ ও নিরুত্তর। শ্যামাকান্ত আরও যেন সাহস পাইয়া কহিল, "বাস্তবিক এই সোনাগুলোর গয়না-জন্ম সার্থক হয়েছে। এমন রূপের স্পর্শটা কি ওদের কম সৌভাগ্যের কথা!"

মুরলা এবার খুলিবার জন্য হাতের একটা আভরণ ধরিয়া টানিতে লাগিল। কোমল কণ্ঠে বাধা দিয়া শ্যামাকান্ত বলিল,—"যে সৌভাগ্য ওরা লাভ করেছে, তা থেকে কেন ওদের বঞ্চিত করবে? মুরলা ও-গুলো তোমার দেহ আশ্রয় করে চিরদিনই শোভা পাক না।"

একি, মুরলার টানের জোর যে অনেক কমিয়া আসিল! শ্যামাকান্ত তাহা লক্ষ্য করিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক সেইসময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হওয়াতে শ্যামাকান্ত কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে সরিয়া পড়িল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পরক্ষণে ঘরের মধ্যে শেফালিকার আবির্ভাবটা মুরলার কাছে ঠিক যেন তড়িৎ-বিকাশের মতই ঠেকিল। শেফালিকা যেন মুরলার মোহমেঘে আচ্ছন্ন মনের আকাশটাকে চিরিয়া তার আসল রূপ বাহির করিয়া ধরিল। শেফালিকার দর্শনে মুরলার বিভ্রান্ত চিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে

তার বাস্তব আবেষ্টনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। এ-ছাড়া এই তাড়িত-দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন তার দাহনেরও ক্রিয়া তীব্রভাবে দেখা দিতে ছাড়িল না। কিন্তু মুরলার এই দাহনের মধ্যে কেবল যে অনুতাপই ছিল, তাহা নয়। কড়ি ও কোমল নানা প্রবৃত্তি একসঙ্গে জড়াইয়া তাহাতে বিপুল ইন্ধন যোগাইল। রাগ, দুঃখ, মান, অভিমান, আরও কত রকমের কত ভাব, কোনটা স্পষ্ট, কোনটা অস্পষ্ট; সকলে মিলিয়া মুরলার হৃদয়ে প্রলয় কাণ্ড বাধাইয়া দিল।

মুরলা রুদ্ধ-চীৎকারে বলিল, "শীগ্‌গির, শীগ্‌গির, ওগো শীগ্‌গির এ-সব খুলে নাও।"

বয়স্যার উদ্দাম ব্যস্ততা দেখিয়া শেফালিকা একটু যেন বিব্রত হইল। কহিল,—"এত উতলা হচ্ছ কেন? ঝি-টা যে এখনও বাজার থেকে ফিরে আসে নি।"

"ঝিয়ের দরকার নেই, আমি একাই যাব।"

শেফালিকা একটু ভীতস্বরে উত্তর দিল,—"একা! বল কি, বাইরের ব্যাপারটা ত দেখনি?"

মুরলা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিল, "কেন, একটু গা-ঢাকা হয়েছে বলে?"

শেফালিকা প্রতিবাদের স্বরে বলিল, "শুধু একটু-আধটু নয়। আকাশ মেঘে ঘেরায় সন্ধ্যা যেন একেবারে গাঢ় রাত্তির হয়ে উঠেছে।"

মুরলা তবুও না-ছোড়-বান্দা। বলিল, "তা উঠুক। এ-পথে হাঁটা এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে চোখ বুজেও আমি যেতে পারি।"

শেফালিকা এবার একটু যেন অভিমানের সুরে কহিল, "তোমার ঐ কেমন এক-গুঁয়েমো। জলেও আর পড়নি।"

মুরলা এবার নিজেকে একটু সংযত করিয়া বলিল,—"জান ত বাড়ী বন্ধ করে এসেছি।"

শেফালিকা বয়স্যার উত্তর ছাড়া এবার উৎকর্ণ হইয়া কি-যেন শুনিতেছিল। মুরলার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঐ শুনতে পাচ্ছ দূরে কিসের শব্দ। এই ঝড়ের মুখে তোমাকে কি-করে ছেড়ে দিই বল ত!"

মুরলা কাতর অনুনয়ে বলিল, "না সই, আমি আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করতে পারিনে। তোমার কাজ শেষ করে ফেল।"

পরার চেয়ে খোলার কাজ অবশ্য খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হইল। কিন্তু শেফালিকা মুরলাকে বাধা দিয়া বলিল,—"তোমার বাবা ত এখনও ফেরেন নি। পাগলামি রাখ। একটু অপেক্ষা করে যাও। দুর্য্যোগটা বড় সামান্য হবে না।"

মুরলা নিজের অধীরতা চাপিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—"তোমার ঝড়ের চেয়ে কি আমি কম বলবান? এই দেখ না তাকে ঠেলে রেখে আমি বাড়ী পৌঁছে যাচ্ছি।"

এই বলিয়াই মুরলা হুড়-দাড় শব্দে নামিয়া একেবারে পথে গিয়া হাজির হইল। মুরলার মনটা অবশ্য তখন ঝড়েরই সমকক্ষ—তেমনই এলোমেলো তেমনি তোলপাড়, তেমনি লক্ষ্যহারা

কিন্তু মনের বলে ত আর বাহিরের প্রকৃতিকে সব সময় হঠান যায় না। মুরলা কিছুপথ গিয়াই বুঝিতে পারিল, তার মনটা ঝড়ের সমান হইলেও, তার দেহটা নিতান্তই অশক্ত। বায়ুরাজের সেদিনকার তাণ্ডব একটা সাধারণ খেয়ালের মত নয়, তাহাতে অনেকটা প্রলয়ের নিশ্বাস আসিয়া মিশিয়াছিল। তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান মুরলার সাধ্যে বড় কুলাইল না। তবু সে ভাদুড়ী-দের গৃহের দিকে ফিরিল না, সেই নির্ম্মম প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই যতটা পারে, গন্তব্যের দিকে চলিল। মহাকবি-বর্ণিত রাজা লিয়রের মতই তখন যেন অনেকটা তার অবস্থা।

পথে জনমানব নাই। এমন-কি গ্রামের কুকুরগুলো পর্য্যন্ত কোন-না-কোন আড্ডা লইয়াছে। মুরলার মাথার উপর যেন অসংখ্য দৈত্য বিকট হুঙ্কারে ছুটিতেছে। তাদের বিপুল পায়ের চাপে চারিদিকে গাছপালা হইতে যে শব্দ উঠিতেছে, তাহাতে হস্তীযূথের গর্জ্জনও কোথায় ডুবিয়া যায়। এরি মধ্যে রাত্রি এতটা ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে যে তার সঙ্গে মুরলার কেশদামের তুলনা করিলে বড় বেশী অত্যুক্তি হয় না। খুব পরিচিত পথ বলিয়া শুধু ধারণার বশেই মুরলা দুই-একপা অগ্রসর হইতেছে। চক্ষু চাহিবারও ততটা জো নাই, কারণ উৎক্ষিপ্ত ধূলা কাঁকর, ছিন্ন পত্রপল্লব ঠিক যেন সূচের মত মুরলার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া বিঁধিতেছিল।

ক্রমে পথের খাইও হারাইয়া গেল। ঝড়ের তীব্রতা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। পবনের সঙ্গে ইন্দ্রও আসিয়া কিছু যোগ দিলেন। বড় বড় জলের ফোঁটা বাতাসের কাঁধে চড়িয়া তীরবেগে ছুটাছুটি সুরু করিল। মুরলাকে ইহার মধ্যে অনেকবার আছাড় খাইতে হইয়াছে। সোজা হইয়া চলা ত আর যায়ই না, বাঁকিয়া ঝুঁকিয়া কোনরকমে এগোনও ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ইহা ছাড়া ঝড়ের বেগে দম আটকাইবার জোগাড় হইল।

এইরূপ ভিতর-বাহিরের আঘাতে ও অবসাদে মুরলার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে পথের মধ্যে কোন স্থলে আশ্রয় লইবে না সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু আসন্নমৃত্যুর বিভীষিকায় তাহাকে এ-সঙ্কল্প ভাঙিতে হইল। মুরলা এইসময়ে পাশে একটা বাড়ী দেখিয়া কোনরকমে টলিতে টলিতে তার বাহিরের রোয়াকে গিয়া উঠিল। কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিল না, সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভিতরে একটা আলো জ্বলিতেছিল। মেজের উপর মাদুরে বসিয়া একজন লোক কি-যেন একটা লেখাপড়া সারিতেছিল। তবে ঝড়ের জন্যই হোক আর অপর কোন কারণেই হোক, তাহার কাজ অপেক্ষা চিন্তাটাই যেন বেশী সময় জুড়িয়া বসিতেছিল। বাহিরে মুরলার পায়ের ও পতনের শব্দ তাহার কানে যাইতেই, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। চারিপাশে ঘরজা জানালা অবশ্য ভালরূপই মোড়া ছিল। নহিলে এই প্রবল বন্যার ভিতরেও যে তিষ্ঠান দায়।

এবার লোকটিমু অর্গল খুলিয়া বাহিরে খ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে

বড় কিছু মালুম করিতে পারিল না। ঘরের আলোটা একটু বাহিরের দিকে ধরিতে চেষ্টা করিল, ঝড়ের মুখে তাহা নিভিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন সে আলোক আবার নিরাপদ স্থানে রাখিয়া প্রকৃতির অঙ্গে মাঝে মাঝে যে দীপ্তি চমকাইতেছিল, তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই একটা শায়িত মনুষ্যমূর্ত্তি তাহার চক্ষে পড়িল। সে হাতড়াইয়া মূর্ত্তির মাথায় হাত দিয়া বুঝিল, স্ত্রীলোক। লোকটা এবার একটু যেন ফাঁপরে পড়ার মত হইয়া গেল, কারণ সে-বাড়ীতে সে ভিন্ন স্ত্রী কি পুরুষ কেহই আর ছিল না। কিন্তু এমন বিপদে আর বড় বেশী বিধা করা চলে না, তাই সে মুরলাকে ধরিয়া ঘরের ভিতর আনিতে বাধ্য হইল। যেরূপ সহজে সে একা এ-কাজটা করিল, তাহাতে বোঝা গেল, তাহার শক্তি বড় কম নয়।

লোকটা মুরলাকে মাদুরের এক প্রান্তে শোয়াইয়া তার গায়ের উপর একটা চাদর বিছাইয়া দিল। দরজা খুলিয়া রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও, তাহা ঘটিল না, কারণ ঝড়বৃষ্টি ঘরের মধ্যেও চড়াও হইয়া আসিতেছিল। এতক্ষণ সবকাজ সে বেশ ক্ষিপ্র ও সমর্থহস্তেই সমাধা করিল, কিন্তু এইবার যখন সে আলোটা লইয়া সংজ্ঞাহীনার ঠিক মুখের উপর ধরিল, অমনই তাহার অমন জোয়ান দেহ যেন কি-একটা দুর্দ্দমনীয় বেদনার তাড়নায় ভাঙিয়া পড়িল। তাহার হাত কাঁপিয়া আলোটা পড়িবার মত হইল, তার সমস্ত শিরা-উপশিরা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। তার মুখখানা যেন মড়ার মত পেঙাস হইয়া গেল! সে ক্ষণকাল যেরূপ মাথায় হাত দিয়া বসিল, তাহাতে বোধ হইল, তাহারও বুঝি ঐ শায়িতার মতই দশা ঘটে।

কিন্তু এই দৌর্ব্বল্যটুকু লোকটি শীঘ্রই ঝাড়িয়া ফেলিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল! মুরলার নাসিকার কাছে হাত রাখিতে লোকটির পাংশুবর্ণ মুখ আবার যেন একটু আরক্ত হইল। সে কুঁজার ঠাণ্ডা জলে নিজের কাপড় ভিজাইয়া চেতনাহীনার মুখ ও কপাল মুছাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পাখাও চলিল। এরূপ কিছুক্ষণ সিঞ্চনে ও ব্যজনে মুরলা চক্ষু মেলিয়াছিল। সেবাকারী এবার যেন আর কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিল না। আবেগরুদ্ধ-কণ্ঠে পাগলের ন্যায় ডাকিল,—"মুরলা—মুরলা!"

বিধির নির্ব্বন্ধে আজ মুরলা সরোজকুমারের গৃহে এমন পীড়িতা অতিথি।

মুরলা চক্ষু চাহিল বটে, কিন্তু দৃষ্ট পদার্থের সহিত তাহার মনের সংযোগ তখনই ঘটিল না। তাই সে যেন স্বপ্নের ঘোরে বলিল,—"আমাকে আর আটকে রেখনা গো, রেখ না।"

সরোজকুমার অবশ্য মুরলার এই কথার মর্ম্ম তেমন বুঝিতে পারিল না। উত্তরে কোমল-কণ্ঠে বলিল,—"কে তোমাকে আটকাচ্ছে মুরলা?—আমি?" মুরলা আবার চক্ষু মুদিয়াছিল, সে পূর্ব্বের ন্যায় বলিল,—"কে তুমি?—শেফালিকা না?"

মুরলা অবশ্য শ্যামাকান্তের নামই করিতে যাইতেছিল। কিন্তু নামটা জিহ্বাগ্রে আসিতেই আবার বিদ্যুৎসঞ্চারের মত পূর্ব্বজ্ঞান তার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে এবার চক্ষু চাহিতেই দারুণ বিস্ময় ও সন্দেহে তার দৃষ্টি যেন ভরিয়া গেল। এবার সরোজকে

দেখিবামাত্র সে যতটা পারে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সর্ব্বাঙ্গে কাপড় মুড়িয়া কুণ্ঠিতভাবে বসিল। সরোজও মুরলার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"মুরলা, এখন সমস্ত ব্যাপার তুমি বোধ হয় বুঝ্‌তে পারছ।"

মুরলা মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"পারছি, আমি অন্ধকারে পথ হারিয়ে এদিকে এসে পড়েছিলাম।"

"ভাদুড়ীদের বাড়ী থেকে আস্‌ছিলে বুঝি?"

"হাঁ।"

সরোজ এবার যেন একটু মৃদু ভৎর্সনার সহিত বলিল, "এমন সময় বেরিয়ে ভাল করনি। পথের মধ্যেই যদি অচেতন হয়ে পড়্‌তে?"

এই অনুযোগে মুরলা অবশ্য একটু অপ্রতিভভাবেই চুপ করিয়া রহিল। পরে একটু উৎসুকভাবে বলিল,—"ঘরের চাবি যে আমার কাছে—"

সরোজ সবই জানিত। মুরলার কথা শেষ না হইতেই তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া বলিল,—"তা হোক। সেখান থেকে ত বেরুতেই তাঁর দুদণ্ড রাত্তির হয়ে যাবে, বলে গেছেন। এখন তোমার যাওয়া ছেড়ে বাইরে দাঁড়াবারই যে জো নেই।" 'ঝড়ের জোর কি একটুও কমলো না?"—এই বলিয়া মুরলা জানালা দিয়া বাহিরের অবস্থাটা দেখিবার জন্য উঠিতে গেল, কিন্তু তার শরীর যে কতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবার তাহা বুঝিতে পারিল, তার অবসন্ন হাত-পা যেন নেতাইয়া পড়িল।

মুরলার এই দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া সরোজ কোমল অনুনয়ের স্বরে বলিল,—"মুরলা, তোমার দেহটাকে একটু তাঙ্গা না করলে, তুমি এক পাও নড়্‌তে পারবে না। এ ঝড়ের গতিক আমি জানি। এখন এমন প্রচণ্ড, কিছু পরেই বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌বে। একটু দুধ গরম করে নিয়ে আসি। তুমি একটু স্থিরভাবে এখানে বস।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

সরোজ ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। মুরলা আবার একা। কিছু পূর্ব্বে শ্যামাকান্তের গৃহে মুরলা তার স্বর্ণোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে একবার একাকী দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তার এখন তার সে সুবিন্যস্ত কেশ লণ্ড-ভণ্ড, সর্ব্বাঙ্গে ধূলি-কাদায় পোঁচ, গর্ব্বোন্নত দেহযষ্টি অবসাদে নুইয়া। রূপকথার রাজকন্যা একেবারে পথের ঘুঁটে-কুড়ুনী। আর কোথায় বা সে ঐশ্বর্য্য বৈচিত্র্যে ভাস্বর হর্ম্ম্য আর কোথায় এই কালিঝুলমাখা এঁদো কুঠুরী। নিঃসঙ্গ ও একাকী হইবা মাত্র এই পার্থক্যের ভাবটা একবার চকিতে মুরলার মনের কোণে উঁকি মারিল। তবে এখন সে এই চিন্তাটাকে বড় আমল দিল না। অন্যমনস্ক হইবার আশায় যে দুই-একখানা পুস্তক তাহার কাছে মাদুরের উপর পড়িয়াছিল, তাহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে

লাগিল। যে-সব কাব্যের টানে শেষে তাহার হৃদয়ে টান পড়িয়াছিল, হঠাৎ তাহারই একখানা হইতে একটা লেখা কাগজ তার সম্মুখে পড়িল। কৌতূহল জিনিষটা এমন অবস্থায়ও বুঝি মানুষের মনে একেবারে মরিয়া থাকে না। অন্ততঃ মুরলার মনে এখন একটু জাগরূকই হইল।

খুব আগ্রহে না-হোক, মুরলা একটু কৌতূহলী হইয়া সরোজের লেখা পড়িতে লাগিল। কিন্তু কয়েক ছত্র পড়িতে না পড়িতেই মুরলার মলিন ও অবসন্ন চোখ দুইটা হঠাৎ বড় ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তার প্রশান্ত ভ্রূরেখা ক্রমে একটু কুঁচ্‌কাইয়া আসিল। যে লেখাটার উপর সে কেবলমাত্র একটু মৃদু কৌতূহলে চোখ বুলাইতেছিল, তাহা সহসা তার সমস্ত মনটাকে যেন গ্রাস করিয়া বসিল।

মুরলার এই ভাব-বিপর্য্যয়ের অবশ্য বিশেষ নিগূঢ় কারণ ছিল। লেখাটায় প্রবন্ধের একটু গন্ধ থাকুক, আসলে সেটা একখানা চিঠি। যাহাকে এ-চিঠি লেখা হইয়াছে, তাহার নামের কোন উল্লেখ না থাকিলেও সেটুকু বুঝিতে মুরলার কিছুই বাকি রহিল না। অন্য কাহারও হাতে পড়িলে সে কিছুই হয়ত বুঝিতে ছুঁইতে পারিত না, কিন্তু মুরলার কাছে তার মর্ম্ম ত অব্যক্ত থাকিবার নয়, কারণ ঐ অক্ষরগুলা যে হৃদয়ের অভিব্যক্তি তার সঙ্গে মুরলার হৃদয় যে একদিন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিয়াছে।

কাহার উদ্দেশে লেখক এমন করুণ প্রেমের উচ্ছ্বাস তুলিয়াছে, সমাজ ও শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া কাহাকে পত্নীত্বের পবিত্র বেদীতে সে নিঃসঙ্কোচে বসাইতে প্রস্তুত, কাহার জন্য সে তার মান সম্ভ্রম সব খোয়াইয়া সমস্ত গ্লানি ও অপমানকে আনন্দে বরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, এ-সমস্ত কথা অপরের কাছে হেঁয়ালী হইলেও মুরলার অবশ্য তাহা জলের মতই সোজা ঠেকিল।

আজ এই ঝড়-মেঘলা সন্ধ্যায় ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই মুরলার হৃদয়-গৃহের দুই দ্বারে দুই ভিখারী আসিয়া অতি সুস্পষ্টভাবেই তার চোখে পড়িল। সে কাহাকেও অবশ্য আহ্বান করিল না, কিন্তু একেবারে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবার দৃঢ়তাও যে তার বড় নাই। যাই হোক, দুই ভিখারীর প্রার্থনার সুরও বেশ স্পষ্ট তার মনে গেল। সুর দুটার পার্থক্য মুরলা যে একেবারেই বুঝিল না তাহা নয়, কিন্তু সেটা বিশেষভাবে সে অনুভব করিল কি না, সন্দেহ। শ্যামাকান্তের সুরে পশু-বৃত্তির মোটা আওয়াজ ছাড়া আর বড় কিছু নাই। সরোজের সুর প্রায় নিভাঁজ কারুণ্যের সূক্ষ্ম তারেই বাঁধা। একটা যেন বাজারের মাঝখানে নীলামের ভাঙা ঢোল, অপরটা গভীর নিশীথে বীণার-আলাপের মত। আজকার তাহার সায়ু আবেষ্টনের বিপর্য্যয়ের মত ঐ সুর দুটার বৈপরীত্য সম্বন্ধেও মুরলা অবশ্য এখন কোন সচেষ্ট সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল না। এরূপ কোন সমালোচনার বিশেষ দরকারও সে এখনও কিছু অনুভব করে নাই। প্রার্থীদের ভিক্ষার সুর সে আজ স্পষ্ট শুনিয়াছে বলিয়া তাদের কোন রকম নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে এখনও অবশ্য মুরলার চিত্ত সক্রিয় নয়। তবু তার চিন্তাটা কিন্তু আজকার এই ব্যাপারগুলার গোলক-ধাঁধায় এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তা

বেড়া ডিঙাইয়া সে মুক্ত স্থানে যাইতে যেন নিতান্ত অক্ষম। নহিলে সে চিঠিখানা শেষ করিয়াও অমন তদ্গতভাবে থাকিবে কেন? সরোজ যে ইহার মধ্যে গরম দুধের বাটি কাপড়ে ধরিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মুরলার দৃষ্টিটি ত এতক্ষণে সেইদিকে পড়িবারই কথা। নিজের লেখা মুরলার হাতে দেখিয়া সরোজ যেন কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে, তার অবস্থাটা কতক 'ন যযৌ ন তস্থৌ' গোছের, পা-দুটো যেন অগ্রসর হইতে নিতান্ত নারাজ। কাপড় ফুঁড়িয়া বোধ হয় হাতে তাপ লাগায়, সরোজের কনুইটা একটু নড়িয়া কপাটে লাগিল, মুরলার অমনই চমক ভাঙিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি কাগজটা কেতাবের মধ্যে পুরিয়া একটু সরিয়া বসিল।

সরোজ এবার বাটিটা মুরলার কাছে রাখিয়া বলিল,—"এখনও বড় গরম, একটু জুড়োক।"

জড় পদার্থ বাটি অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে জুড়াইতেই লাগিল। কিন্তু গৃহের সজীব পদার্থ দুটির কাহারও মন এমন ঠাণ্ডা বাতাসেও একটু জুড়াইতে পারিল না। মুরলার বাহিরটা ঠাণ্ডা দেখাইলেও, ভিতরে চিন্তার উত্তাপ বড় কম ছিল না। কিন্তু সরোজের অন্বেষাস্তির প্রখরতা ভিতর ফুঁড়িয়া বাহিরেও কিছু প্রকাশ পাইতেছিল। সরোজ একটু বিচলিতকণ্ঠে বলিল,—"মুরলা, লেখাটা কি সমস্ত পড়েছ?"

মুরলা প্রথমে একটু চুপ করিয়া রহিল। পরে নম্রভাবে বলিল,—"পড়াটা অবশ্য অন্যায় হয়েছে। মার্জ্জনা—"

কিন্তু তার বাক্য শেষ না হইতেই সরোজ কহিল,—"মার্জ্জনা তোমার ত নয়, আমারই চাওয়া উচিত।"

"কেন?"—এই প্রশ্নটা মুরলার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু মুরলার জিহ্বা যেন সহসা জড়াইয়া গেল। শব্দটা ঠিক স্পষ্ট উচ্চারিত হইল না।

সরোজ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"ওটা যে কাকে লেখা, সে বিষয়ে কিছু কি তোমার সন্দেহ আছে?"

মুরলা এবার হাঁ না কিছুই বলিল না, নিরুত্তরেই বসিয়া রহিল।

সরোজ আবেগকম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"মুরলা, অপরাধ মার্জ্জনা কর। কিন্তু ওটাকে একটা ক্ষণিক খেয়াল বা উচ্ছ্বাস বলে মনে করোনা। ওর প্রতি অক্ষর হৃদয়ের গাঢ়তম রক্ত দিয়ে লেখা। ওর প্রতি শব্দ দৃঢ় সঙ্কল্পের সত্য প্রতিধ্বনি। তা হলেও—"

সরোজ এবার থামিয়া একটা যেন দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া রাখিল। পরে বলিল,—"তা হলেও ওটা বাহিরের কাছে পাঠাবার জন্য লিখি নি মুরলা, আমাকে এতটা রূঢ় দুঃসাহসী মনে করোনা। কেবল এইটাই নয়, কতদিন ধরে প্রত্যহ সন্ধ্যায় এরূপ কতখানাই লিখেছি, কিন্তু দণ্ড পরেই সেগুলো প্রদীপের আগুনে ছাই করে উড়িয়ে দিয়েছি। এখানাও—"

সরোজ একটু থামিয়া মুহূর্ত্তখানেক উৎসুকচক্ষে মুরলার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু মুরলার অবনত মুখে প্রতিবাদ বা সমর্থন কোন ভাবই ধরা পড়িল না।

সরোজ তাহা দেখিয়া কহিল,—"আচ্ছা এটাও এখন ছাই হয়ে যাক। অপরের চোখে পাছে পড়ে এ-ভয় আমি নিজের জন্যে কিছুই করি না। কিন্তু তোমার—"

এই বলিয়াই সরোজ আবার কথাটা একটু সারিয়া কহিল,—'কিন্তু কে তার বাহ্যিতাকে কোনরকমে কিছুমাত্র বিপন্ন করতে চায়?"

সরোজ এবার লেখাটা লইয়া পুড়াইয়া ফেলিল। মুরলার মুখে চোখে এখনও কোনরূপ ভাবেরই ব্যঞ্জনা নাই।

সরোজ বলিল,—'লেখা পুড়ুক, কিন্তু ঘটনাচক্রে তার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। এখন এ লেখার দোষগুণের বিচার লেখকের হাতে নেই, পাঠকেই তা করবে।"

মুরলার তবুও কোন ভাবান্তর নাই। সরোজ এবার জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরটা দেখিয়া বলিল,—"মুরলা, দুধটা খেয়ে নাও। ঝড় যেন একটু কম পড়ে আসছে। একটু পরেই বোধ হয় বেরোন যাবে। রায়-বুড়ী এখন তার নিজের ঘরেই আছে, তোমাদের ওখানে ত যেতে পারে নি। চল তার বাড়ী পর্য্যন্ত তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।'

মুরলা অমনই উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল। সরোজ কহিল,—"না, তা হবে না। চলবার আগে তোমার একটু বল সঞ্চয় করা দরকার। ওটা ফেলে রেখ না।"

সম্ভবতঃ লজ্জায় মুরলা তবু যেন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সরোজ এবার একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল,—"কথাটা যদি না রাখ, তবে বুঝব আমার অপরাধ এত বেশী যে, তা তুমি মার্জ্জনাও করতে পার না।"

মুরলা এবার ধীরে ধীরে বাটিটা লইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিতে গেল। কিন্তু সরোজ নিজে তখনই জানালার দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। মুরলার পিপাসাও খুব পাইয়াছিল, সরোজের অনুরোধ সে যথারূপেই পালন করিল। আর বাটিটার এরূপ মর্য্যাদা রাখায় বাটিও মুরলার মর্য্যাদা রাখিতে ভুলিল না। শীঘ্রই সে তার অবসন্ন স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর বেশ একটু জোর অনুভব করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সেদিনকার ঝড়ে অবশ্য ছোট বড় অনেক ভাঙা-চোরার কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু সেই দুর্য্যোগের পর হইতে শ্যামাকান্তের বিলাস-উদ্যানে তার অমন সাধের কেয়ারি-করা ক্ষুদ্র শেফালিকাটি যে সমূলে পতনোন্মুখ, এইটাই বেশী আক্ষেপের বিষয়। শেফালিকার উপর তার মালীটির কাট-ছাঁট যতটা ঘটিত, তার মর্ম্মে রসসিঞ্চনের ব্যবস্থা কিছুই তেমন ছিল না। তাই বুঝি তার দেহটা বাহির থেকে খারাপ না ঠেকুক, কিন্তু তার ভিতরটা ছিল বড়ই অসার ও ভঙ্গুর। সেদিনের মেঘলা হাওয়ায় শেফালিকা হঠাৎ এমন কাবু হইয়া গেল যে, সে ধাক্কা কাটিয়া উঠিবার আর যেন তার শক্তিই রহিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই শেফালিকার

অর একেবারে পূর্ণ বিকারে গিয়া পৌঁছিল। সম্ভবতঃ সেইসব ওলট-পালট ব্যাপারের সংঘর্ষে মুরলার চিত্ত নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাই সে শেফালিকার বড় খোঁজ খবর এখন রাখে নাই। শেফালিকাও মুরলাকে তার আমোদের সঙ্গী বলিয়াই জানিত, তাই বুঝি এই দুঃখের দিনে সে তার বন্ধুটিকে ডাকিতে কোন আগ্রহ দেখায় নাই। যাই হোক, দুদিন পরে মুরলা যখন তার পীড়িতা সখীকে দেখিতে গেল, তখন শেফালিকার জ্ঞান বিকারের বিষে একেবারেই জর্জ্জরিত।

সেই বিলাস-কক্ষে শেফালিকা এখন রোগশয্যায় শায়িতা। তার স্তিমিতচক্ষে জীবনের জ্যোতি যেন নিভিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর ছায়ার নীচে তার মুখের হাসি চাপা পড়িয়াছে তার অঙ্গে যে দুই-একখানা অলঙ্কার এখন আছে, সেগুলা যেন শুকনো পাতায় মোড়া ফুলের তোড়া। ইহা দেখিয়া মুরলা কি পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের অসারতার কথা ভাবিতেছিল?—তাহা ত বড় মনে হয় না। মুরলা সেই দর্পণটার প্রায় সমুখেই বসিয়াছিল। পীড়িতা বয়স্যার দিক হইতে তার দৃষ্টিটা যেন কিসের টানে সেই আয়নার পানে ঘুরিয়া পড়িতেছিল। তাহার যে মোহিনীমূর্ত্তি ঐ দর্পণ এতদিন মুরলার চক্ষে ধরিয়াছে, তার একটুও-কি চিহ্ন উহাতে পড়িয়া নাই!

শেফালিকার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটি ঘটিল না। তেমন-কোন আপনার জন কেহ ছিল না, কিন্তু শ্যামাকান্তের সিন্দুক-ভরা মুদ্রা ছিল। টাকার জোরে রোগিনীর ও-সব অভাব বড় হয় নাই। তবে এই ব্যবস্থার ভিতর রৌপ্যের ঝনঝনানি ছাড়া শ্যামাকান্তের হৃদয়ের তেমন কোন কাতর ধ্বনি ছিল কি না সন্দেহ।

শ্যামাকান্তের চোখ পত্নীর উপর ছিল না, তাহা নয়। কিন্তু শেফালিকার বয়স্যাটি যখন তার খবর লইতে আসিত, তখন শ্যামাকান্তের চোখদুটো মুমূর্ষুকে ছাড়িয়া ঐ নবজীবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে-ভরা বয়স্যাটির দিকেই যেন বেশী করিয়া ঝুঁকিত। রোগিনী এইসব নূতন উপক্রম ও ব্যতিক্রমের ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিয়াছিল কি না কে জানে, তবে তার এতটা আর বড় বেশী বুঝিবার অবসর বা দরকারও ঘটিল না, সপ্তাহ না ফিরিতেই, শেফালিকা ভবের পাততাড়ি গুটাইয়া লোকান্তরে চলিয়া গেল।

শ্যামাকান্ত শোকের অভিনয়টা কয়েকদিন রীতিমতই করিল। তবে পত্নীর লোকান্তর-প্রাপ্তির পর মুরলার সম্বন্ধে শ্যামাকান্তের নূতন ভাবান্তরও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এখন শ্যামাকান্তকে তোলানাথের গৃহে খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামাকান্ত এখন কখনও উপনিষদ্, কখনও গীতা, কখনও ভাগবত হাতে করিয়া তোলানাথের সারস্বত আশ্রমে আসিয়া হাজির হয়। পুস্তকগুলোর বাঁধার চাকচিক্যই বা কত—বর্ণের বৈচিত্র্যে প্রায় ইন্দ্রধনুর তুল্য। কিন্তু তাদের উপরটা এমন লোভনীয় হইলেও, ভিতরে পাতার সঙ্গে পাঠকের অঙ্গুলির যে খুব বেশী সংসর্গ ঘটে তাহা বলিয়া বড় মনে হয় না।

তোলানাথও তার এই নূতন ছাত্রটির মুখের চেয়ে মনের আগ্রহ যে বেশী ধরিতে পারিয়া-

ছিলেন, তাহাও নয়। বেদান্তবাগীশ এটাকে বড়লোকের একটা সাময়িক সখ বলিয়াই মনে করিলেন। বড়লোকের ঘাড়ে এই সখ চাপাতে, ভোলানাথ লাভ অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা বড় দেখিলেন না। শ্যামাকান্তের সহিত শাস্ত্রালাপটা 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্' এর মত ভোলানাথের কতকটা ঠেকিত বটে, কিন্তু তাঁর এই বিড়ম্বনাটুকু প্রকারান্তরে বিশেষ রকমই পোষাইয়া যাইত। গৌণভাবে যে অন্তর রসের ধারা শ্যামাকান্তের নিকট হইতে বেদান্ত-বাগীশের গুরুদক্ষিণার স্থান পূর্ণ করিত, তাহার মূল্য নিতান্ত তুচ্ছ নয়। এই শ্যামাকান্তের কাছে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের অনাবশ্যক ব্যাখ্যাকেও ভোলানাথ খুব আবশ্যক ভাবিয়াই কলাও করিয়া তুলিতেন। বড়লোকের এই সখটাকে যতদিন কথার জোরে জাগাইয়া রাখা যায়, ততদিনই—লাভ।

শ্যামাকান্তের কান ভোলানাথের এই কথামৃত পান করিয়া শীতল হইবার মত দেখাক, কিন্তু তার মনের ভিতর যে অন্যরকম ক্ষুধার আগুন সদাই জ্বলিতেছিল। ভোলানাথের সম্মুখে উহার বাহ্য নিদর্শন কতক চাপা থাকিলেও, ব্যাখ্যাতা কার্য্যান্তরে একটু এধার-ওধার সরিলেই অমনই শ্যামাকান্তের এই মনের ক্ষুধা তার চক্ষু দিয়া যেন শিখার মত বাহির হইয়া অম্বরের দিকে ছুটিত। আরও চিন্তার বিষয়—অনেকসময় মুরলাও যেন তার রূপ-যৌবন দিয়া শ্যামাকান্তের সেই চাক্ষুষ ক্ষুধাটার খাদ্য জোগাইতে বড় বেশী কুণ্ঠিত হইত না। এখন মুরলার অবশ্য তাদুড়ীদের বাড়ী যাওয়া একেবারেই বন্ধ। কারণ সে-গৃহে এখন ত কোন স্ত্রী-পরিজন নাই। তবে শেফালিকার কাছে আনাগোনার সময় ও-বাড়ীর দাসীটির সঙ্গে মুরলার যে এতটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, আগে তার কিছুই নিদর্শন পাওয়া না যাক, এখন কিন্তু যেন সেটা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দাসীটি এখন হরদম মুরলাদের বাড়ী যাওয়া-আসা করে, কোমলপ্রাণা কর্ত্রীটিকে হারাইয়া তাঁর বয়স্যার কাছে কি সে জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলিতে আসে, না তার এরূপ আগমনের উদ্দেশ্য অন্যতর?

মুরলার কাছে আত্মপ্রকাশের পরও সরোজের কাব্য-চর্চ্চা অবশ্য একেবারে বন্ধ করা হয় নাই। তবে এখন চর্চ্চার স্থানে আসিয়া সে ভোলানাথের মুখে কাব্যের দোষগুণের ব্যাখ্যা অপেক্ষা মুরলার কাছে তার সেই লেখাটার বিচারফল জানিতেই বুঝি বেশী উদ্‌গ্রীব। এই বিচারফল মুরলার মুখে বা হাতে কোনদিন কোন বাহ্য মূর্ত্তি লাভ না করুক কিন্তু ঘটনাপুঞ্জের অব্যক্ত ইঙ্গিতে ইহা কি সরোজের কাছে কিছুই ধরা পড়ে নাই? যাই হোক, ভোলানাথের গৃহে শ্যামাকান্তের আবির্ভাব যতই বেশী ঘন হইয়া উঠিতে লাগিল, সরোজের তিরোভাবও যেন ততই প্রস্ফুট হইয়া পড়িল। এইভাবে ক্রমে ভোলানাথের বাড়ী সরোজের আসা-যাওয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। ভোলানাথ ইহাতে বড় ক্ষুব্ধ হইলেন না, কারণ পুরাণ ছাত্রটির ভাবরসগ্রাহিতার স্থানটা, নূতন ছাত্রটির অন্যতর রসদাধিতার দ্বারা একরকম বেশ পুরিয়া উঠিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি কিছু তমসাচ্ছন্ন। কালো সন্ধ্যাটির বয়ঃক্রম প্রহরখানেকের বেশী দাঁড়ায় নাই। এইবার তার রং বদলাইবার পালা প্রায় সমাগত। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের যেন কিছু বিলম্ব ঘটিবারই সম্ভাবনা। পূবের আকাশে চাঁদ উঁকি দিলেও, তাকে এখনও অনেকগুলা ঘন মেঘের পর্দ্দা ঠেলিয়া তবে বাহিরে আসিতে হইবে। তাহা হইলেও এতক্ষণ ঐ নদীটি তার পাশের শ্যামল প্রান্তরের সঙ্গে যেরূপ প্রায় এক হইয়া গিয়াছিল, সেরূপ ভাব আর নাই। তার রূপের প্রভেদটা এখন একটু পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তার শাড়ীর কিনারা দুইটা এখন একটু যেন চোখে পড়ে। আর সেই কিনারার ঠিক ধারেই যে একটি মানবীর মূর্ত্তি নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া আছে, সেটিও যে একেবারে আর কিছুই মালুম হয় না, তাহাও নয়।

মূর্ত্তিটির কয়েক হাত দূরে জলচর পক্ষীর মত একখানি ছোট নৌকা নদীর বুকে ভাসিতেছিল। জলের সঙ্গে নৌকার অস্ফুট কথাবার্ত্তা ছাড়া নরকণ্ঠের পরিস্ফুট ধ্বনিও তার ভিতর থেকে বাহির হইতেছিল। কিন্তু এমন অন্ধকারেও কোনরকম আলোকের নিদর্শন নাই, আঁধার আবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে ঢাকিয়া রাখাই যেন নৌকাবাহীর উদ্দেশ্য। পুরুষের কণ্ঠে নৌকা হইতে শব্দ আসিল, "কর্ণা হয়ে আসছে, আর দেরি কর না।"

শব্দটা তটবর্ত্তিনীর কানে গেলেও তার মনকে যেন তেমন স্পর্শ করিতে পারিল না। তার চক্ষু নৌকার দিকে না থাকিয়া যেখানে জলরাশির বিস্তার অপর পারের ঘনীভূত কুহেলিকার মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে, সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সেই কুহেলিকার অনির্দ্দেশ্য অসীম কায়া সহসা তটবর্ত্তিনীর শঙ্কিত দৃষ্টিতে যেন কি-এক বিভীষিকার রহস্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। তার বিরাট তিমিরপুঞ্জের কোনস্থানেই রমণীটি যেন তার কোন একটি আশ্রয় খুঁজিয়া পাইতেছে না। রমণীর এই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া পুরুষ কহিল, "শীগ্‌গির এস, বিঘ্ন ঘটতে পারে।"

রমণী অন্যমনস্কভাবেই এবার উত্তর দিল,—"কোথায় যাব?"

পুরুষটি এবার যেন একটু শঙ্কিত ও বিস্মিতকণ্ঠে কহিল,—"ভবিষ্যতের ভিতর আমাদের যে সুখের নিলয় স্থির করেছি, তাতে কি এখনও তোমার সন্দেহ?"

এবার রমণীর অন্যমনস্কতা কাটিয়াছিল; সে কাতরকণ্ঠে কহিল,—"আমাকে মুক্তি দাও, আমি যে দারুণ অন্ধকার ছাড়া সমুখে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে!"

পুরুষটি স্নিগ্ধকণ্ঠে আশ্বাস দিয়া কহিল,—"যাকে অন্ধকার বলছ, সেটা যে তোমার নিজের মনেরই ধোঁয়া। ওটাকে সরিয়ে ফেলে দেখ দেখি—কত—আলো—কত সুখ।"

রমণী আবার আকুলস্বরে বলিল,—"তাই যদি হয়, আমি আমার ধোঁয়ার মধ্যেই থাকব—"

পুরুষ অতি মিষ্ট অভিমানের সুরে বাধা দিয়া কহিল,—"কেন, আমার আলোর উপর বিশ্বাস হয় না? তুচ্ছ হলেও এস এইটাই আমাদের মিলনের এখন সাক্ষী হোক।"

এবার পুরুষটি একটি মণিমুক্তাজড়িত স্বর্ণহার দুইহাতে উঠাইয়া ধরিল। অন্ধকারের মধ্য হইতেও তাহার জ্যোতি রমণীর চক্ষে ঠিকরিয়া লাগিল বটে, কিন্তু সেটাত ঐ মেঘরন্ধ্র-বিসর্পী কিরণটির মত নয়, সেটা যে অনেকটা দংশনোদ্যত সর্পের মাথার মণিরই তুল্য।

রমণী কয়েক হাত পিছাইয়া ভীতস্বরে কহিল, "না—না, ওসব আর আমার সমুখে ধরো না।"

পুরুষটি এবার যেন অগ্রসর হইয়া রমণীর কণ্ঠে হারছড়াটি পরাইয়া দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক সেইসময়ে কিছু দূর হইতে ছায়ান্ধকারের মধ্যে কে গম্ভীরকণ্ঠে বলিল,—"মুরলা গৃহে ফেরো।"

মুরলার কানে এটা দেবতার আহ্বানের মত বাজিল। সে উদ্‌ভ্রান্তভাবে সেইদিকে ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাকান্তের নৌকাও সরীসৃপের মত গাছপালার আড়ালে অন্তর্হিত হইল।

কিয়দ্দূরেই মুরলা রুদ্ধশ্বাসে আহ্বানকারীর প্রায় পায়ের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। সে আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না, তাহার মাথাটা যেন মাটির সঙ্গে মিশাইয়া রহিল। তার মুখ দিয়া অবশ্য বোনই স্পষ্ট শব্দ বাহির হইল না। শুধু একটা চাপা ক্রন্দনের তাড়নায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

আহ্বানকারী সরোজকুমার মুরলার এই ক্রন্দনের প্রতি যেন কোন লক্ষ্য না করিয়া শুষ্কস্বরে কহিল,—"রাত্তির যে অনেকটা হয়েছে, এখন ত তোমার বাহিরে থাকা উচিত নয়।"

মুরলা রোদনের বেগ একটু সামলাইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"গৃহে কি আমার আর স্থান আছে?"

অন্ধকারে সরোজের ভ্রূ যে কুঞ্চিত হইয়া আসিল, মুরলা অবশ্য তাহা দেখিতে পাইল না। কিন্তু যে স্বরে সরোজ এবার কথা কহিল, তাহা যে শুধু রুক্ষ নয় বেশ কঠোর, ইহা অবশ্য সে অনুভব করিল। সরোজ বলিল,—"গৃহে যদি না থাকে, তবে সে স্থান কোথায়?"

হতাশার স্বরে মুরলা নদীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"ঐখানে।"

এবার সরোজের কণ্ঠ এত শুকাইয়া আসিল যে, কথা যেন স্পষ্ট বাহির হইতে চাহে না। সে বলিল, "কি, ঐ নৌকায়? তুমি কি গৃহ থেকে একেবারেই এতটা শুকাতে গিয়ে পড়েছ?"

মুরলা সরোজের কথার ইঙ্গিত বুঝিল। এবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"তা না—যাই। তবু যে—"

এইটুকু মাত্র বলিয়াই মুরলা যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত আবার নদীর দিকে ছুটিবার উপক্রম করিল।

সরোজ জোরে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল,—"কথাটা—শেষ—করে তবে যাও।"

মুরলা নদীর পানে অপর হাতটা বাড়াইয়া কথঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"সবই ত শেষ করেছি, এখন ঐ যে আমার শেষ আশ্রয়।"

সরোজের স্বরে এবার যেন একটু বিদ্রূপের রেশও বাজিয়া উঠিল। বলিল, "তোমার আশ্রয়? সে যে কোথায় সরে পড়েছে। এখন আর কি তার সন্ধান পাবে?"

মুরলা হাত ছাড়াইবার জন্য তার শক্তিতে যতটা কুলায় চেষ্টা করিতেছিল। চীৎকার করিয়া বলিল,—"পাব—পাব বৈকি। ঐ যে সে আমায় ডাকছে।"

সরোজ পূর্ব্ববৎ বলিল,—"ওটা তোমার কানের ভুল!"

মুরলা প্রাণপণে চেষ্টা করেও বার-বার বাধা পাইয়া এতক্ষণে ক্রমে অবসন্নভাবে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। এবার একটু ভিমিতকণ্ঠে বলিল,—"ভুল? অমন ঢল-ঢল চেহারা অমন কল-কল শব্দ! ওগো তুই না-হয় একটু এগিয়ে আয় না মা, আমি যে—" মুরলার মুখ দিয়া আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তার মাথাটা ঘাসের উপর ঢলিয়া পড়িল।

• • • •

সরোজ কাঠের মত আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মুরলার সংজ্ঞা একেবারে ঠিক লুপ্ত হয় নাই। তবে তার এই আকস্মিক উদ্‌ভ্রান্ততার আবেশে তাহার দেহ ও মন যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। যাই হোক, খোলা বাতাসে শীঘ্রই তার বিমস্ত ভাব অপসারিত হইল। তাহা দেখিয়া সরোজ এবার কোমলকণ্ঠে বলিল,—"মুরলা, তোমাকে কিছু ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তোমার এই ইচ্ছার মূলেও ভুল বৈ আর কিছু নেই।"

মুরলা এবার ভগ্নস্বরে—কিন্তু সংযতভাবেই উত্তর দিল,—"তবে এখন আমার আর কি করবার আছে?"

"তোমার যা করবার তা ত করা হয়েছে।"

"কি—সে?"

"তোমার দেহের না-হোক,—তোমার ক্ষুব্ধ নারীত্বের বিসর্জ্জন হয়ে গেছে।"

"তাই যদি হয়ে থাকে, তবে আছে ত কেবল কালি-মাখা শূন্যতা, সেটাও কেন ঐ নদীর জলে তলিয়ে যাক না?"

সরোজ এবার গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "না মুরলা, এই শূন্যতাকে আর শূন্য কর না। একে পূর্ণ কর।"

মুরলা এবার যেন একটু সন্দিগ্ধভাবে সরোজের মুখের দিকে চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দিয়ে?"

সরোজ উদার মুক্তকণ্ঠে উত্তর দিল,—"দেবীত্বে।" উত্তরটা যেন মুরলার মনে বড় লাগিল না। বলিল, "সে ত একবার দেখেছি কিন্তু—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল,—"মন্ত্রের দেবীত্বে নয়, প্রথার দেবীত্বে নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার দেবীত্বে। আজ তোমার সেই দেব-প্রতিষ্ঠার আমি উদ্বোধন করে চল্লাম। আশা করি; তুমি তার উদ্‌যাপন করবে।"

মুরলা একটু যেন হতাশকণ্ঠে বলিল,—"আমার ভিতরে কি সে দেবীত্ব আছে?"

সরোজ আগ্রহের সহিত কহিল,—"আছে—আছে। সে মরবার নয়। সে ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে তোল। তুলবে ত?" প্রশ্নকর্ত্তার এমন প্রাণভরা আগ্রহ দেখিয়া মুরলা তার কথায় সায় না দিয়া যেন থাকিতে পারিল না।

সরোজ মুরলার উত্তরে যেন বিশেষ আশ্বস্ত ও তুষ্ট হইল। বলিল, "আচ্ছা, তবে এখন এস।"

সরোজ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গ্রামের দিকে চলিল। মুরলা নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। মাঠের অপর পারেই মুরলাদের বাড়ী। সরোজ তার কাছাকাছি আসিয়া কহিল,—"এখান থেকে তুমি একাই বেশ যেতে পারবে। আমি এখন বিদায় লই।" বিদায়ের কথাটা বলিতে সরোজের স্বর ততটা গাঢ় না হোক, বেশ একটু গম্ভীর হইয়া আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মুরলার মনে কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগিল। সে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, "আপনি কি এখন বাড়ী ফিরবেন?" একটা ম্লান হাসির রেখা সরোজের মুখে হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল। সরোজ সেটাকে চেষ্টা করিয়াও দমন করিতে পারিল না। বলিল, "বাড়ী? বাড়ী আমার আর নাই মুরলা।"

একটু বিস্মিত ও ভীতকণ্ঠে মুরলা বলিয়া উঠিল,—'কেন আপনার পৈতৃক ভিটা—"

মুরলার কথা শেষ না হইতেই সরোজ বলিল,—"সেটা বেচে ফেলেছি। দেশের সঙ্গে সব সম্বন্ধ আমার কেটে গেছে। নদীর ঐ-দিকে যে একটা আলো দেখ্‌তে পাচ্ছ, ঐখানে আমার নৌকা বাঁধা আছে। পথে হঠাৎ এই একটু আটক পড়েছিল, নইলে এতক্ষণ এ গ্রামটা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যেত।"

মুরলা সরোজের কথাগুলো সব যেন বেশ বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি কোন দূর দেশে যাচ্ছেন?"

"হাঁ, অনেক দূরে।"

"কাজের চেষ্টায় বুঝি?"

"চেষ্টা নয়— কাজ একটা পেয়েছি।"

এ বিষয়ে আরও বেশী জানিবার ইচ্ছা মুরলার বড়ই যেন বলবতী হইল। তবু সোজাসুজি কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিল। সে শুধু কহিল,—"আপনার যোগ্য বোধ হয়?"

সরোজ একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—"না মুরলা আমিই সে কাজের যোগ্য কি না এইটাই দেখ্‌বার কথা। ছাত্রজীবনে একজন মহাপুরুষের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি তাঁর ধন-দৌলৎ জীবন-মন সর্ব্বস্ব লোক-সেবায় অর্পণ করেছেন। এখান থেকে অতি দূরদেশে তাঁর একটি আশ্রম আছে। তারই কাজের কিছু ভার নিতে তিনি আমাকে আহ্বান করেছেন। আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন আজীবন তাঁর সেই আহ্বানের মর্য্যাদা রাখতে পারি। সম্ভবতঃ আর কখন এদেশে আসাই হবে না। যা-কিছু দোষত্রুটি ঘটেছে, ক্ষমা কর। তোমার এই নব দেবীত্বের সম্মুখে প্রণত হ'য়ে আমি বিদায় নিলাম।"

সরোজকে মাথা নত করিতে দেখিয়া মুরলা নতশিরে তার পায়ের কাছে ভূমিষ্ট হইতেছিল, কিন্তু সরোজ তভটা অবসরই যেন দিল না। সে দ্রুতপদে নদীর দিকে ফিরিল।

মুরলা কয়েক মুহূর্ত্ত যেন স্তম্ভিতের মত সেই নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে গিয়া পৌঁছিল। সেদিন পাড়ায় একটা বিবাহ ছিল। বেদান্তবাগীশ সেই বিবাহ-বাড়ীতে আটক পড়িয়াছিলেন। তিনি এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। মুরলা ঘর খুলিয়া কি-যেন-কিসের টানে ছাদের উপর উঠিল। এই ছাদের যে-স্থানটা হইতে নদী ও তার পাশের মাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, মুরলা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। সরোজকে সে আর তেমন দেখিতে না পাক, কিন্তু নৌকার আলোটা তার বেশ চোখে পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই আলোটা কাঁপিতে লাগিল। সেটা তীর হইতে অল্পে অল্পে সেই পরপারের কুহেলিকার মধ্যে সরিয়া চলিল। ক্রমে আলোটা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। আলোকের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মুরলার চক্ষু যেন মুদিয়া আসিল। মুরলা সেই আলোকের উদ্দেশে ধীরে ধীরে ছাদের উপর মস্তক স্পর্শ করিল। মহান্ ত্যাগের কাছে যেন তুচ্ছ ভোগের উৎসর্গ সংঘটিত হইল। মুরলা চক্ষু মেলিয়া আকাশের দিকে চাহিতেই দেখিল, আগে যে একটু পাতলা মেঘ চাঁদটাকে ঢাকিয়াছিল, সেটা উড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে ফুটন্ত জ্যোৎস্নার ঘটা। মুরলার অন্ধকার হৃদয়েরও সমস্ত জোয়ার-ভাঁটা আজ যেন এক অসীম অনন্ত জ্যোতির সাগরে মিলাইয়া গেল।

সমাপ্ত।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

রবীন্দ্র বারমাস্যা

আজি উন্মাদ মধু-নিশি ওগো
চৈত্র-নিশীথ-শশী !
তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে
কি দেখিছ একা বসি'
চৈত্র-নিশীথ-শশী ?

• •

মোরে দেখ চাহি, কেহ কোথা নাহি
শূন্য-ভবন-ছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।
তোমারি মতন একাকী আপনি
চাহিয়া রয়েছি বসি'
চৈত্র-নিশীথ-শশী ॥

•

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথ-তরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাঙার কাননে ফুটেছে বকুল
পাকল রজনীগন্ধা।

বসন্তের হরষ বাতাসে ঘুরে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অলস উল্লাসে থরে থরে ফলিয়াছে ফল ॥

এবার তবে ক্ষান্ত হ'রে, ওরে শ্রান্ত তরী, রাখ্‌রে আনাগোনা
বর্ষশেষের বাঁশি বাজে সন্ধ্যা-গগন ভরি, ঐ যেতেছে শোনা ॥

আস্‌ত তারা কুঞ্জবনে চৈত্র-জ্যোৎস্না রাতে,
অশোক-শাখা উঠ্‌ত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে ॥

শুক্লসন্ধ্যা চৈত্রমাসে হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে তোমার কোলে ফুলের পুঁজি
তোমার আমার এই যে প্রণয় নিতান্তই এ সোজাসুজি ॥

দেখতে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে-নাম ধরে'
সে নামটি এই চৈত্র মাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।

বসন্ত-রজনী শেষে বিদায় নিতে গেলেম হেসে,
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে।

ফাগুন প্রাতের উতলা গো চৈত্র রাতের উদাসী,
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।

বসন্তের এই ললিতরাগে বিদায়-ব্যথা লুকিয়ে জাগে,
ফাগুন দিনে গো কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি ॥

কার যেন এই মনের বেদন
চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়।

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান;
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্ব্বশেষ গান।

শৈলতলে চরায় ধেনু　রাখাল-শিশু বাজায় বেণু,
ছুটায় তারা সোনার মালা পরে।
সোনায় তুমি দিয়ে লিখা　চৈত্র মাসের ধ্বজটিকা
কাঁধায় হিয়া অপূর্ব-ধন ভরে॥

আমাদের এ পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা।
কোথা হ'তে চৈত্র মাসে　হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে
অঘ্রাণেতে আকাশ-পথে যায় যে তারা কোথা
আমরা কিছুই জানিনেক সেই সুদূরের কথা॥

সে যে　উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই　রিক্ত হাতে তাল দিয়ে যায়
তাইরে নাইরে নাইরে না॥

বসন্তে কি শুধু কেবল কোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে!

কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী সনে,
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে কে লয়ে যাবে সে ভবনে॥

হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্র যাওয়ার পাল তুলে দিই,
ঐ যে মেতে ওঠে নদী।

সুরখানি ঐ নিয়ে কানে
পাল তুলে দিই পালের পানে,
চৈত্র রাতের মলিন মালা
রইবে আমার সাথে।

বড় শীঘ্র গেলি মধুমাস,
দুদিনেই ফুরাল নিশ্বাস ;
বসন্ত আবার আসে বটে,
গেল যে সে ফেরে না আবার।

বসন্তের শেষ রাতে এসেছিনু শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা, কি তোমারে করি দান।

চৈত্রের মধ্যাহ্নবেলা কাটিতে না চাহে,
তৃষা তুলা বসুন্ধরা দিবসের দাহে।

চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চাঁপা তরুর ছায়া-মঞ্জরী বাজে।

অন্তর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি' গেল তব
মর্ম্মর নিশ্বাসে।
উত্তপ্ত যৌবন মোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্র সন্ধ্যাকাশে॥

বর্ষশেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা-গগন ভরি',
ঐ যেতেছে শোনা।

চৈত্র মাসের নানা ক্ষেতের
নানা গন্ধ নিয়ে,
আসতেছিল তপ্ত হাওয়া
মুক্ত দুয়ার দিয়ে।

আজকে নবীন চৈত্র মাসে পুরাতনের বারতা আসে,
খুলেছে গ্রন্থের গ্রন্থি।

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের শেষে কোন্ শেষে,
চৈত্র ফসলের দেশে।

দেখ্‌তে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে-নাম ধরে'
সে নামটি এই চৈত্র মাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সঙ্কলিত।

প্রাচীনকালের ক্রীড়াকৌতুক

আজকাল ক্রীড়াকৌতুকের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন কালে যে-সকল ক্রীড়াকৌতুক হইত, তাহা জানিবার জন্য ব্যক্তিমাত্রেরই আগ্রহ হইতে পারে। সেজন্য আমি এই প্রবন্ধে প্রাচীন কালের কতকগুলি ক্রীড়াকৌতুক বর্ণনা করিবার প্রয়াসী হইয়াছি। আমি যে-গুলি বর্ণনা করিব, তদ্ব্যতীত আর ক্রীড়াকৌতুক ছিল না—এ-কথা কেহ মনে করিবেন না।

১। ঘটানিবন্ধন—দেবগণের উদ্দেশে যাত্রা মহোৎসবই ঘটা। সেখানে সকল নাগরিক সমবেত হইয়া গণধর্মানুসারে ব্যবস্থা করিতেন। পক্ষের বা মাসের কোনও-একটি প্রজ্ঞাত দিবসে সরস্বতী-গৃহে-নিযুক্ত নটগণের সমাজ বা মিলন হইত। যেদিনে যে দেবতার পূজা প্রসিদ্ধ তাহাই তাহার প্রজ্ঞাত দিবস; যেমন গণেশের চতুর্থী, সরস্বতীর পঞ্চমী, দুর্গার অষ্টমী। সরস্বতী বিদ্যাকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া তাঁহার মন্দিরে পূজানুষ্ঠানে ক্রীড়ানিযুক্ত নটগণের মিলন হইত। অন্য দিনে ধূপ বিলেপন ঘটা হইত। প্রথম দিনে নটগণ নিজেদের প্রয়োগ সাধারণকে দেখাইত। দ্বিতীয় দিনে টাকা আদি প্রাপ্ত হইত।

২। সমস্যা ক্রীড়া—

(ক) যক্ষরাত্রি বা সুখরাত্রি—কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে প্রায়শঃ দ্যূতক্রীড়া হইত। ঐ দিনে দীপালিও দেওয়া হইত।

(খ) কৌমুদীজাগর—আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার আধিক্য হয় বলিয়া তাহাকে কৌমুদী বলে। সে-সময়ে দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া রাত্রি জাগরণ করা হইত এবং দোলায় আন্দোলন করা হইত।

(গ) সুবসন্তক বা মদনোৎসব। এই সময় নৃত্যগীত-বাদ্যাদি হইত।

৩। সহকারভঞ্জিকা—আম্রফল পাড়িয়া তাহা (দল-বলের সহিত আম্র-বাগানে গমন করিয়া) খাওয়া।

৪। অভ্যবহারিকা—দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষস্থ ফল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা ভোজন করা।

৫। বিস খাদিকা—সরোবরের তীরবাসী লোকগণের দলবদ্ধ হইয়া মৃণাল তুলিয়া ভোজন করা।

৬। নবপত্রিকা—প্রথম বৃষ্টির পর বৃক্ষে নবপল্লবের সঞ্চার হইলে বনস্থলীতে ক্রীড়া।

৭। উদকক্ষেড়িকা—সে ক্রীড়ায় বাঁশের নালী লইয়া তাহাতে জলপূর্ণ করিয়া খেলা পিচকারী খেলা।

৮। পাঞ্চালানুমান—নানাপ্রকার আলাপ ও নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দেখাইয়া সে ক্রীড়া করা যায়। পাঞ্চাল দেশে ভাঁড়ের নাচ তামাসা হইত।

৯। একশাল্মলী—একটি মহান্ পুষ্পপূর্ণ শিমুল গাছকে অবলম্বন করিয়া তাহার পুষ্পের আভরণ দ্বারা ক্রীড়া করা।

১০। কন্দুকযুদ্ধ—কন্দুক কুসুমকে প্রহরণ করিয়া (ফুটবলের ন্যায়) নিজের বলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পরস্পর ক্রীড়া করা।

১১। মেষযুদ্ধ।

১২। কুক্কুট-যুদ্ধ—দশকুমারচরিতে কথিত আছে, নালিকের জাতি প্রাচ্যবাট কুক্কুট বলাকাজাতি তাম্রচূড় অপেক্ষা বলীয়ান্।

১৩। দণ্ডযুদ্ধ।

১৪। দংষ্ট্রী যুদ্ধ।

১৫। প্রেক্ষা বা থিয়েটার।

১৬। যাত্রা ও প্রবহণ ; জন্মাষ্টমীর রথের ন্যায়।

১৭। কন্দুক-ক্রীড়া—ভাঁটা লইয়া খেলা। ভাঁটাতে স্থানে-স্থানে লাল রং দেওয়া থাকিত। তাহাকে ভূমিতে লীলা-শিথিল-হস্তে প্রক্ষেপ করা হইত। পরে আস্তে আস্তে উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া এবং অন্য অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া হস্তদ্বারা আঘাত করিয়া হস্তপৃষ্ঠে উন্নীত করিয়া গ্রহণ করা হইত। পরে ভিন্ন ভিন্ন বেগে অগ্রপশ্চাৎ ধাবন করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বামদক্ষিণ তুণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হইত। এইরূপে নানামণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া ক্রীড়া করা হইত।

১৮। অক্ষক্রীড়া—দশকুমারচরিতে কথিত আছে যে দ্যূতাশ্রয় কলা পঞ্চবিংশতি প্রকার। এই খেলাতে অক্ষভূমি ও হাতের কারসাজিতে অনেক চাতুর্য্যও করা হইত ; তাহা সহজে ধরার উপায় ছিল না। অর্থ বা পণ অঙ্গীকার করিয়া খেলা হইত। লোক-ব্যবহার যুক্তি ও প্রগল্ভতা অবলম্বন করিয়া অনেকে কার্য্য উদ্ধার করিত। দুর্ব্বল দেখিলে তাহাকে ভর্ৎসনা করা হইত ; অনেকপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়াও কার্য্য সাধন হইত এবং সর্ব্ব-লোককে নিজপক্ষে আনয়ন করা হইত। সে-সময়ে অনেক অশ্লীল বাক্যও প্রযুক্ত হইত। যে-স্থানে অক্ষক্রীড়া হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং রাজা একজন দ্যূতাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন। সেই দ্যূতাধ্যক্ষ অক্ষশালার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কেহ লুকাইয়া খেলিলে দণ্ডিত হইত। পণের উপর শতকরা ৫৲ টাকা রাজা পাইতেন। আবার খেলায় জুয়াচুরি ধরা পড়িলে দণ্ডও হইত।

১৯। ক্রীড়োপস্কর—পূর্ব্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত মেষ, ঘোটকাদির ক্রীড়া করা হইত। (শ্রীধর স্বামীর টীকা)

যথা ক্রীড়োপস্কারাণাং সংযোগবিগমাদিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্ ॥

ভাগবত ১।১০।৪৩

২০। দ্যূতক্রীড়া—মহাভারত আদি পর্ব্বে ১২৮ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা আছে।

২১। ঘোড়দৌড়—ইহা অতি প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

২২। ইন্দ্রজাল—ভোজবিদ্যা। প্রবাদ বিদ্যানুরাগী ভোজরাজ এই অপূর্ব্ব বিদ্যার প্রকৃষ্টভাসাধন জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারই আশ্রয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী-কর্ত্তৃক অথর্ব্বাদি বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া ইহা পৃথক বিদ্যায় পর্য্যবসিত হয়। প্রবাদ রাজা ভোজ-প্রবর্ত্তিত এই অদ্ভুত কলাবিদ্যায় তাঁহার কন্যা তানুমতীই বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' নামক পুস্তকে এই ভোজবিদ্যার নিদর্শন আছে।

২৩। তাসখেলা— আবুল ফজল বলেন, প্রাচীন ঋষিদের আমলেও তাস খেলা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ঋষিগণ স্থির করিয়াছিলেন যে প্রতি প্রস্থ তাসে ১২খানি করিয়া তাস থাকিবে, কিন্তু তাঁহারা বারো রঙের ভিন্ন প্রকারের বারোজন রাজা করিতেন না।

এই সকল খেলার মধ্যে পাশাখেলা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে ঋষি বলিয়াছেন —"বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হয়। মুঞ্জবান্ নামক পর্ব্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে তাহার রসপান করিয়া যেমন প্রীতি জন্মে, বিভিতক কাষ্ঠনির্ম্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎসাহিত করে।" ঋষি এই কথা বলিয়া কিন্তু পাশার অনেক দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন—অক্ষক্রীড়ক তাহার রূপবতী পত্নী পরিত্যাগ করে। যে ব্যক্তি পাশা ক্রীড়া করে তাহার শত্রু তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ঘৃণা করে, যদি কাহারও কাছে সে কিছু যাচ্ঞা করে দিবার লোক কেহ নাই। পাশার আকর্ষণ বড়ই কঠিন, যদি কাহারও ধনের প্রতি পাশার লোভ-দৃষ্টি পতিত হয়, তাহাহইলে অন্য উহার পত্নীকে স্পর্শ করে। তাহার পিতা-মাতা, ভ্রাতাগণ তাহাকে চিনিতে পারে না। পাশাগুলি অঙ্কুশমুক্ত বাণের ন্যায় বিদ্ধ করিতে থাকে, ছুরিকার ন্যায় কর্ত্তন করিতে, তপ্ত দ্রব্যের ন্যায় সন্তাপ দিতে থাকে। যে জয়ী হয় তাহার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য মধুময় মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করে। তাহার স্ত্রী হীনহীনা পুত্র নিরুদ্দিষ্ট।

বৈদিকযুগে তিপ্পান্নটি পাশার দল ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। পাশাগুলি স্পর্শ করিতে শীতল কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে। অপ্সরাগণ দ্যূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অথর্ব্ববেদে অপ্সরাগণ দ্যূতকুশলা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৈদিকযুগে নৃত্যগীতাদিরও প্রচলন ছিল। শৈলূষ শব্দের উল্লেখ শুক্ল যজুর্ব্বেদে আছে।

নটশব্দ পাণিনিতে আছে। প্রাচীন সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেক্ষা শব্দের কথা বিশদভাবেই আছে। সকলেই তাহাতে যোগদান করিত এবং সকলেই তাহাতে চাঁদা দিত।

পূর্ব্বে দণ্ডি-প্রণীত দশকুমারচরিতের উল্লেখ করিয়াছি। অধ্যাপক পিটার্সন বলেন, তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় তৎপূর্ব্বেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য ক্রীড়ার বিবরণ বাৎস্যায়নের কামসূত্র এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত আছে। বাৎস্যায়ন ও চাণক্য অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ বলেন; কিন্তু তাঁহারা এ প্রবাদের কি মূল তাহা বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু ডাক্তার জুলিয়স জলি বলেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে এবং কামসূত্র চতুর্থ শতকে বিরচিত হইয়াছিল। ফলতঃ তাহারা যে খৃষ্ট জন্মের বহু পরে বিরচিত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুতরাং আমি যে-সকল ক্রীড়ার কথা বলিয়াছি তাহা খৃষ্ট জন্মের পরবর্ত্তী অষ্টম শতকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কতকগুলি তৎপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

শ্রীমনীষিনাথ বসু।

মেদিনীপুরে মোগল পুরাকীর্ত্তি

যাঁহারা মেদিনীপুরের পুরাতত্ত্বের সহিত পরিচিত তাঁহারা সকলেই জানেন যে অতীত গৌরবের শ্মশানভূমি এই মেদিনীপুর একসময়ে মোগল আফগান ও মহারাষ্ট্র বীরগণের রঙ্গভূমি ছিল। কালের বশে সেইসব বীরের স্মৃতিচিহ্ন একে-একে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও আজিও কিছু কিছু তাহাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিলুপ্তপ্রায় এইরূপ দু'চারিটা কীর্ত্তির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিয়াছি। আমার অন্যতম বন্ধু সুযোগ্য সব-ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী খলিল আহমেদ বি-এ, মহোদয় এই সংগ্রহকার্য্যে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়া অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস'-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসুর ইতিহাস হইতেও এবিষয়ে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি। প্রারম্ভে সেই হেতু ইঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রাখিলাম।

১। চন্দন শহীদের মসজিদ

এই মসজিদটি শহরের মিঞাবাজারে প্রতিষ্ঠিত। জনপ্রবাদ—সম্রাট ঔরংজীবের সময়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান সৈয়দ রাজি। ইনি ভাগলপুরের জনৈক মৌলানা শাহ্‌বাজের খলিফা বা বংশধর ছিলেন। সৈয়দ রাজির অপর নাম চন্দন শহীদ। ইনি ১০৯০ হিজরীতে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার পুত্র মীর সৈয়দ গৌড়ের বাদ্‌শাহ ফেরুকশায়ারের নিকট হইতে মেদিনীপুর থানার অন্তর্গত কাপুয়া মৌজা জায়গীর প্রাপ্ত হন। সনন্দের তারিখ আনুমানিক ১১৩৪ হিজরী (১৭১২ খৃষ্টাব্দ)।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী, সারজন উডবরণ, সার স্যান্‌সিকেট ফেরার মহোদয়গণ এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুর সার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল মহোদয় এই মসজিদটি ও তাহার অভ্যন্তরস্থিত হস্তলিখিত কোরাণখানি দেখিয়া অতীব মুগ্ধ ও প্রীত হইয়াছিলেন।

এই মসজিদের প্রাঙ্গনে একটি চন্দন-বৃক্ষ বর্ত্তমান। সেই বৃক্ষের পত্র মর্দ্দন করিলে বীর শোণিতের ন্যায় লোহিতবর্ণের নির্য্যাস নির্গত হয় বলিয়া এই বীর সাধক চন্দনশহীদ নামে প্রখ্যাত। চন্দন শহীদের মসজিদের মধ্যে কোরাণের একখানি বিরাট হস্তলিখিত পুঁথি ও একটি প্রাচীন শিলালিপি বিদ্যমান। বাঙ্গলার বাহিরের কথা বলিতে পারি না, তবে বাঙ্গলার মধ্যে এরূপ একখানি কোরাণের হস্তলিপি কোথাও নাই। শিলালিপিটি ভূতপূর্ব্ব ডেপুটিও

বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর শ্লাক সাহেব যখন কাঁথিতে অবস্থান করেন, সেই সময় হিজলীর মসনদ-ই-আলির মসজিদ হইতে সংগ্রহ করিয়া কাঁথি মহকুমা আফিসে আনিয়া রাখেন। পরবর্ত্তী কালে স্থানীয় পরলোকগত ডেপুটী মৌলবী আবদুল কাদের মহোদয় যখন কাঁথি মহকুমার হাকিম ছিলেন, সেইসময় তিনি এই প্রস্তরখণ্ডটি মহকুমা-আফিস হইতে এই মসজিদে স্থানান্তরিত করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা হিজলীর কোন মসজিদের ভগ্নাবশেষ মাত্র। শিলালিপির একখানি নকল (ক) ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত হইল। ইহার অনুবাদ এইরূপ—

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে মান্য করিবে; তাঁহার প্রচারককে মান্য করিবে এবং তোমাদের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান তাঁহাদিগকে মান্য করিবে।

এক বই দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। তাঁহার প্রচারক মহম্মদ। ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর মহান্—এক বই দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর মহান এবং জয়মাত্র তাঁহারই।

সেখ ওয়রদিন নো-ও-ভীর পুত্র খাজা-শিবলি-কর্ত্তৃক ১০১৯ হিজরীতে (১৬১০ খৃষ্টাব্দে) খোদিত।

২। চোল শাহের মসজিদ

এই মসজিদটি শহরের সিপাহি বাজার বা খাপ্রেল বাজারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মসজিদের মধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডে ছয়ছত্র কবিতা সুন্দরভাবে খোদিত আছে। শিলালিপির একখানি নকল (খ) ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত হইল। অর্থ এইরূপ—

শাহজাহান শাহ গাজির রাজত্বকালে (তাঁহার রাজত্বের ভিত্তি অটল হউক) খিজিরের চক্ষুর সম্মুখে আদিল মহম্মদের সাহায্যে এই সঞ্জীবনী সুধা দৃশ্যমান হইল। এই সুধার উৎস-পার্শ্বে আলেকজাণ্ডার পানপাত্র-হস্তে সুধালাভের নিমিত্ত আগ্রহভরে দণ্ডায়মান। এই সুধার উদ্ভবে বসুধা জ্যোতিষ্মান হইল। জীবজগৎ অমরতা লাভ করিল। জ্ঞান আসিয়া তৃষাতুর-কণ্ঠে কহিল—'আদিল মহম্মদের সুধার উৎস হইতে আমার তৃষ্ণা দূর কর।'

যতদূর অনুমিত হয় এবং অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে তাহাতে এই শিলালিপিটি এই মসজিদ-সংশ্লিষ্ট ত একেবারেই নয়, বরং স্থানান্তর হইতে আনীত বলিয়া বোধ হয়। তা' ছাড়া ইহা একটি জলাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া মনে হয়। ইহা ১০৪৮ হিজরী (১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে খোদিত।

৩। দেওয়ান কিফাউতুল্লার মসজিদ

এই মসজিদটি শহরের কিল্লাপুকুরের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত এবং দেওয়ান-খানার মসজিদ বলিয়া সুবিদিত। বৃটিশ রাজত্বের প্রাকালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। কারুকার্য্য ছাড়া ইহার অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য ইতিহাস নাই। বর্ত্তমানের দেওয়ান কিফাউতুল্লা ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

৪। গাজি শাহ মোস্তাফা মাদানির মসজিদ

আজিকার উৎসব-মণ্ডপের পশ্চাতে পুরাতন জেলের মধ্যে এই মসজিদ বিদ্যমান। শাহ মোস্তাফার অনেক কিম্বদন্তী প্রাচীনদের মুখে রটিয়া আসিতেছে। এই আস্তানাটি বহু প্রাচীন। মেদিনীপুরে মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কালে ইহা নির্ম্মিত হয়। জনশ্রুতি এই মাদানির আস্তানাকেই মেদিনীমাতার মন্দিরে পরিণত করিয়াছে।

৫। পীর পলওয়ানের আস্তানা

বর্ত্তমান কালেক্টরী কাছারীর পূর্ব্বপ্রান্তে এই পীরের আস্তানাটি প্রতিষ্ঠিত। এই মুসলমান সাধুটি একজন বীর-সাধক বলিয়া পরিচিত। বীরত্বের চিহ্ন-স্বরূপ ইঁহার আস্তানায় বড় বড় মুদ্গর বিদ্যমান। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট ইনি সমভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করেন। এই পীরের ইতিহাস এখনও অনাবিষ্কৃত। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে এই আস্তানাটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি।

৬। বালগ্ শহীদের কবর

শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেদিনীপুর রেল-ষ্টেশনের অনতিদূরে এই ফকিরের সমাধি-স্থান প্রতিষ্ঠিত। বালগ্ ফকিরের দুইটি পুত্রের কবরও এইস্থানে বিদ্যমান। স্থানীয় জন-সাধারণ এই স্থানটিকে "ফকিরের কূয়া" নামে অভিহিত করেন। সমাধি-স্থানে একটি কূপ আছে। কূপটির সহিত একটি ঝরণার যোগ থাকায় উহার জল কখনও শুষ্ক হয় না। কূপটির জল অতীব সুস্বাদু ও লৌহ-সংযুক্ত বলিয়া উৎকৃষ্ট পানীয়রূপে প্রখ্যাত। এই ফকিরের ইতিহাসও আজ অজ্ঞাত।

৭। ইয়াদগার শাহর আস্তানা

শহরের নয়নপুর পল্লীতে এই আস্তানাটি প্রতিষ্ঠিত। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। চন্দন শহীদ ও পীর পলওয়ানের ন্যায় ইয়াদগার শাহও হিন্দু-মুসলমানের পূজা পাইয়া থাকেন। ইয়াদগার শাহ চন্দন শহিদের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া জানা যায়। লোক-পরম্পরায় ইহা বাদশাহ ঔরংজীব-নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু মূলে ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

৮। পীর লোহানির সমাধিস্থান

গড়াপুরের মধ্যে জগন্নাথ রাস্তার পার্শ্বে পীর লোহানি সাহেব নামক এক মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। পীর সাহেবের আদি নাম আমীর খাঁ। ইনি সম্ভবতঃ লোহানী বংশীয় ছিলেন; তাই পীর লোহানি নামে প্রখ্যাত। আস্তানাটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সমচতুষ্কোণ চত্বর। পূর্ব্বে এই চত্বরের পশ্চিমদিকে একটি উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর, অপর তিনদিকে ঢালু-উচ্চ প্রস্তর-দেওয়াল

ছিল। সম্প্রতি ইহাকে মসজিদ আকারে রূপান্তরিত করা হইতেছে। আস্তানাটির মধ্যে পীর সাহেবের, তাঁহার ভগ্নী ফতে খাতুনের ও লাল খাঁ এবং তাজ খাঁ নামক দুই ভাগিনেয়র দেহ সমাহিত আছে। আস্তানার সম্মুখে পীর সাহেবের কয়েকটি শিষ্যের সমাধি বিদ্যমান। শত হস্ত পশ্চিমে পীর সাহেবের গুরুর সমাধিও দৃষ্ট হয়। এই আস্তানাটি অতীব প্রাচীন এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাবী আমল হইতে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি নিষ্কর দেওয়া আছে।

৯। আলি শাহর গড়

ডেবরা থানার মধ্যে আলি শাহর গড় নামে একটি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। আলি শাহ জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান জমিদার ছিলেন। অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই গড়টি নির্ম্মিত হয় এবং জমিদারের নামানুসারে গ্রামের নামও আলিশা গ্রাম হয়। আলি শাহর কীর্ত্তিরাজি এখন মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত। গড়ের চতুর্দ্দিকে যে পরিখা ও মৃত্তিকা-স্তূপের প্রাচীর ছিল, অদ্যাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখা যায়। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে এই গড়ের অভ্যন্তরে পুষ্করিণী খননকালে একটি কূপ বাহির হয় এবং সেই কূপমধ্য হইতে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের ব্যবহার্য্য কয়েকটি মূল্যবান তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছিল।

১০। শাহ জীউর আস্তানা

ডেবরা থানার অন্তর্গত সাহাপুর পরগণায় মাড়ওলা গ্রামে এই আস্তানা বর্ত্তমান। শাহ জীউ আলি শাহর গুরু ছিলেন এবং শাহ জীউর নামানুসারে সাহাপুর পরগণার নামকরণ হইয়াছিল। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বিভাগে সাহাপুর মহাল সরকার-মান্দারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে সুজার বন্দোবস্তের সময় উহা সরকার-গোয়ালপাড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে শাহ জীউ ও আলি শাহ অন্যূন ৪০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। শাহ জীউর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী এই প্রদেশে অদ্যাবধি প্রচলিত।

১১। কুরুমবেড়া মসজিদ

কেশিয়াড়ীর তিন মাইল অন্তরে কুরুমবেড়া দুর্গ নামে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি জীর্ণ দুর্গ আছে। এই দুর্গ-মধ্যে একটি মসজিদ বিদ্যমান। মসজিদটির গাত্রে একটি শিলালিপি-ফলক রহিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে ১১০২ হিজরী (১৬৯১ খৃঃ) সম্রাট ঔরংজীবের রাজত্বকালে মহম্মদ তাহির কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। মসজিদটির প্রস্তরগুলি হইতে অনুমিত হয় যে কোনও হিন্দুমন্দিরের উপকরণ লইয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। একই প্রাঙ্গনে একই প্রাচীরের আবেষ্টনে হিন্দুমন্দির ও মুসলমান মসজিদের এমন প্রতিষ্ঠা জেলার অপর কোথাও দেখা যায় না। মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা এই মসজিদটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণ উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিলে এ প্রদেশ হস্তগত করিয়া এই দুর্গ ও শিবমন্দির স্থাপন করেন।

১২। তল কেশিয়াড়ির মসজিদ

মোগল রাজত্বের সময় কেশিয়াড়িতে একটি প্রাচীন তহশিল কাছারি ছিল। সে-সময় এ প্রদেশে বহুসংখ্যক মোগলের আমদানী হওয়ায় তাহারা যে-স্থানে বাস করিতেন, সে-স্থান আজিও মোগলপাড়া নামে অভিহিত। মোগলপাড়ায় অনেক মসজিদ ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। একটি জীর্ণ মসজিদে আরবী ভাষায় লিখিত একখানি প্রস্তর-ফলক আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে সম্রাট ঔরংজীবের সময় ঐ মসজিদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিটি একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের প্রতিমূর্ত্তি। তল কেশিয়াড়ি গ্রামের মসজিদটি বাদশাহ শাহ আলমের সময় প্রতিষ্ঠিত। মসজিদটির গঠনপ্রণালী সুন্দর ও কারুকার্য্য শোভিত। সংস্কারাভাবে ইহা এখন জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ এই স্থানে এখনও উপাসনাদি করিয়া থাকেন।

১৩। নারায়ণগড় মসজিদ

নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত কশবা গ্রামে একটি মসজিদ আছে। মসজিদটি বিশেষ কারুকার্য্য-খচিত ছিল, তবে সম্প্রতি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মসজিদটির ছাদ ভগ্ন। একখানি প্রস্তরফলকে সাতটি ছত্র পার্শি ভাষায় খোদিত রহিয়াছে। শিলালিপির একখানি নকল (গ) ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত হইল। অনুবাদ এইরূপ ;—

শাহানশাহ, শাহ সুজা বাহাদুরের প্রতিনিধিবর্গের অবস্থান কালে থানাদার মহম্মদ সফি এই মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। মসজিদ ই-দিলপিজির। ইহার নির্ম্মাণের তারিখ ১০৬৫ হিজরী (১৬৫৫ খৃঃ)। পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি হইতে প্রতীত হয় যে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাঙ্গলার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা শাহ সুজা ১০৬৫ হিজরীতে এই মসজিদটি নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই মসজিদটি কশবার উত্তর মহল্লা পল্লীর এক মুসলমান বংশের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে।

১৪। আলি সাহেবের সমাধি

নারায়ণগড় থানার রাস্তার পার্শ্বে এই সমাধি প্রতিষ্ঠিত। এই আলি শাহ একজন মুসলমান ফকির ছিলেন। সমাধি-স্থানে একটি প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা লুপ্তপ্রায় কোন মসজিদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া এই প্রস্তরটি অনুমিত হয়। খোদিত শিলালিপির একখানি নকল (ঘ) ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত হইল। শিলালিপিটির অনুবাদ এইরূপ—

কি সুন্দর মসাজিদ ও অট্টালিকা! কি পরিচ্ছন্ন ও সমুজ্জ্বল! ধনী নির্ধনের ভগবদারাধনা ও পূজাগৃহই বটে। নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিতে ও নামের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিষ্ঠাতা কর্ত্তা যত্ন করিয়া ইহাদের স্থাপন করিয়াছেন! ইহাদের নির্ম্মাণের তারিখ হিসাব করিয়া জানা গেল—শাহ আলমগীরের শুভ রাজত্বকাল ১০৭১ হিজরী (অর্থাৎ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ)।

১৫। মকদুম সাহেবের আস্তানা

পটাশপুর থানার অন্তর্গত অমর্শি গ্রামে পীর মকদুম সাহেবের একটি আস্তানা আছে। আস্তানার সংলগ্ন একটি জীর্ণ মসজিদে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর-ফলকের কিয়দংশ কালবশে নষ্ট হইয়া গেলেও যেটুকু উদ্ধার করা গিয়াছে তাহার একখানি নকল (ঙ) ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত হইল। খোদিত শিলালিপির অর্থ এইরূপ—

এই মসজিদটি পৃথিবীতে সত্য সত্যই খোদাতালার আবাসভূমি। এইস্থানে ভক্তিসহকারে প্রার্থনা কর; কেননা তাহাই মুক্তির পন্থা। ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুরক্ত ভক্ত মকদুম শিহাবুদ্দীন আউলিয়া এই মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। স্বর্গের দূতকে ইহার নির্ম্মাণ তারিখ জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল ১০৭২ হিজরী (অর্থাৎ ১৬৬০-৬১ খৃষ্টাব্দ)।

পীর মকদুম সাহেব জনৈক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইঁহার অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনী এই অঞ্চলে শ্রুত হওয়া যায়। ইনি ১১০২—৩ হিজরীতে পশ্চিম প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন। অমর্শির তদানীন্তন রাজা অমর সিংহ ভয়ানক মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। সকালে গাত্রোত্থান করিয়া মুসলমানের মুখদর্শন করিবার আশঙ্কায় তিনি রাজফটকে একখানি চর্ম্মপাদুকা ঝুলাইয়া রাখিতেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থীকে অগ্রে পাদুকাকে সেলাম করিয়া পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরণের আদেশ প্রদান করেন। মকদুম সাহেব এইপ্রকার অন্যায় আদেশের প্রতীকার মানসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। দ্বাররক্ষীগণ তাঁহাকে অগ্রে পাদুকাবন্দনা করিতে বলিলে তিনি তাহা না করিয়া অবিলম্বে দ্বাররক্ষীগণকে তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী করেন। রাজা ইহা শুনিবামাত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া মকদুম সাহেবের মস্তক ছেদনে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। অবশেষে রাজা নিজেই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে মকদুম সাহেব তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন।

চক হিজলির নবাব মসনদ-আলি-শাহ ইঁহার একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

১৬। হিজলীর মসজিদ

কাঁথি মহকুমায় রসুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার অনতিদূরে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত। ইহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ প্রায় ৫০×২৫ ফিট। উপরে তিনটি গম্বুজ আছে। মসজিদটি খুব উচ্চ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা হিজলীর অন্যতম নবাব তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলি মসজিদটির সম্মুখে ও পার্শ্বে নবাব ও তাঁহার ভ্রাতা সিকান্দারের এবং তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সমাধি আছে। তাজ খাঁ ১৫০২—১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হিজলীর নবাব ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার কোন বংশধর পূর্ব্বোক্ত মসনদ্ আলি শাহ হইবেন।

১৭। মির্জ্জা দিলার আলির সমাধি

বাদশাহ ঔরংজীব তাঁহার রাজত্বকালে তমলুকে এক দ্বাদশ-দ্বার-সংযুক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

সম্প্রতি ইহা শুধু 'বারদুয়ারি' নামেই স্মৃতিতে পর্য্যবসিত। কেননা বহুকাল হইল ইহা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এই অঞ্চলে নবপোতায় বর্ত্তমান একটি মস্‌জিদ ও ইদগা রহিয়াছে।

হিজলীর ফৌজদার মসনদ আলি মহম্মদ খাঁ তমলুকের তদানীন্তন কৈবর্ত্ত রাজার খাজনা প্রদানের শৈথিল্য নিমিত্ত রাজসম্পত্তি জনৈক খোজা মির্জ্জা দিদার আলি বেগের সহিত বন্দোবস্ত করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মির্জ্জার মৃত্যুর পর কৈবর্ত্ত-রাজা নয়নারায়ণ ও কৃপানারায়ণের পত্নীযুগল এই সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। তমলুক রাজতোরণদ্বারের পশ্চিম দিকে মির্জ্জার সমাধি আজিও বিদ্যমান। সমাধিস্থানের বর্ত্তমান মালিক মহিষাদলের রাজাবাহাদুর। খোজা দিদার আলি তমলুক পরগণার পশ্চিম সীমান্তে একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজিও তাহা এই অঞ্চলে 'খোজার বাঁধ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।

মোস্লেম পুরাকীর্ত্তির বিবরণ সংক্ষেপে এইখানেই শেষ করিলাম। মেদিনীপুরের বিজন পল্লী-বুকে অতীতের এইরূপ কত অলিখিত ইতিহাস কত অকথিত কাহিনী অলক্ষিতভাবে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? সাহিত্যের সৌখীন সেবক আমরা ইতিহাসের এ গহন অরণ্যে দিশেহারা হইবার আশঙ্কায় সতত সন্ত্রস্ত; অনুসন্ধানের পথে পা বাড়াইবার সাহস আমাদের নাই। সাহিত্যের দরবারে কুলীর ন্যায় আজ গোটাকতক স্মৃতির কণা বহিয়া আনিয়া মোস্লেম জাতির পূর্ব্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিলাম। আমি ঐতিহাসিক নহি, পাণ্ডিত্যের অভিমানও আমার নাই। এই স্মৃতিকণিকাগুলি ভবিষ্যতে কোন ভাবুক অনুসন্ধিৎসুকে দেশের মোস্লেম ইতিহাস অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করিলেই আমার শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস।

———

বই বিক্রি

"বই দেখবেন নিশ্চয়-ই নিশ্চয়-ই আসুন আসুন।" এই বলিয়া দু'হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে ঈষৎ ঘাড় হেলাইয়া সস্মিতমুখে পুস্তকালয়ের অধিকারী তাঁহার সোনার চশমার ভিতর দিয়া আমার প্রতি এক মর্ম্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন—"এর মধ্যে অনেক জিনিষ আপনার পছন্দ-সই হ'তে পারে, একটু আগিয়ে বাঁদিকে ভিতরে চলুন দেখি। ওখানে বহু পুরাতন পুস্তকের নূতন সংস্করণ দেখতে পাবেন। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সুরু করে গোবরগণেশ পর্য্যন্ত ছোট-বড় সকল লেখকেরই লেখা এইসকল সংস্করণে সংগৃহীত হয়েছে। দামও বেশী নয়—এই সংস্করণের এক-একখানির দাম আড়াই টাকা মাত্র। কিম্বা পরলোকগত গ্রন্থকারদের ভিতর যদি কারো গ্রন্থ চান তবে তাও ঐখানেই পাবেন। দাম মাত্র পাঁচসিকা করে। অনন্তবাবু, এই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে গিয়ে আমাদের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বইগুলি এঁকে দেখান ত।"—এই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দিক দেখাইয়া দিয়া তাঁর উক্ত কর্ম্মচারীর সহিত আমাকে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অর্থাৎ তিনি যে এক আঁচড়ে আমায় চিনে নিয়েছিলেন তা বুঝা গেল। আমার চাঁদনীতে-কেনা আদ্দীর পাঞ্জাবী, মিনে-করা বোতাম এবং চুনট-করা উড়ানী, দশ-আনা-ছ-আনা ছাঁটার স্থলে নাতিদীর্ঘ চুলের টেরী ও সোনার চশমা তাঁর চোখে ধুলো দিতে পারে নি। কেননা এসকল ছদ্মবেশে আসল মানুষটাকে লুকিয়ে রাখা যায় না। সে ধরাই পড়ে—বিশেষ পাকা ব্যবসাদারের কাছে। আমি যে একজন অধ্যাপক, পুস্তকালয়ের স্বত্বাধিকারী বোধ হয় তা জানতেন—অন্ততঃ এটা তাঁর ব্যবসায়ী প্রতিভার বলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটা এঁচে নিতে পেরেছিলেন। কলিকাতার মতন প্রধান সহরে এত বড় একজন পাকা পুস্তক-বিক্রেতাকে চট্ করে ঠকানো খদ্দেরের পক্ষে কিছু শক্ত। খদ্দের হিসাবে আমি যে কিছুই নই এবং অন্যান্য অধ্যাপকের ন্যায় গুড়ের কলসীতে মাছি বসার মত আমি যে ঘণ্টা-দুই অবসর অলসভাবে বই নাড়াচাড়া করে তারপর সস্তায় যা-হোক একখানি লয়ে শেষে সরে পড়ব একথা বুঝতেও তাঁর বাকী ছিল না।

সদ্য-প্রকাশিত সিল্কে বাঁধা প্যাডের মলাট জলজলে সোনার অক্ষরে নাম-লেখা সাড়ে চার টাকা দামের, নীতি-বিগর্হিত যৌনতত্ত্ব-পূর্ণ বেয়াড়া বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাস পড়বার রুচি এবং কেনবার পয়সা যে আমার নেই তাও তিনি বিলক্ষণ জানতেন। এজন্য আমায় বিশেষ প্রীতির চক্ষেও যে তিনি দেখছিলেন না, তা আমিও বুঝেছিলুম। তবে বইয়ের দোকানে এক কোণ

অধিকার করে নিবিড়ভাবে পুস্তকদর্শনে নিরত অধ্যাপক যে একটা সুফলপ্রদ বিজ্ঞাপনের সমান এবং এ-দৃশ্য অন্ত খরিদ্দারের কাছে দোকানের পসার বৃদ্ধি করে—এটাও তাঁর বেশ জানা ছিল এবং এইজন্যই বোধ হয় হরিকিঙ্কর বাবুর মত একজন বই-বিক্রেতা আমার মত লোককে এমনভাবে আমল দিলেন। আমিও এই সুযোগে তাঁর আসল ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট খরিদ্দার চরাবোর পন্থা লক্ষ্য করবার অবসর পাইলাম। এবং এই অবসরে বুঝতেও পারলাম, এই মহানগরীর প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর আসন এত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত কেন? মণি লিখিত সুসমাচার হ'তে রেজেষ্টী দর্পণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর পুস্তকই রয়েছে দেখলুম; অবশ্য নির্দ্দিষ্ট স্থলে দাঁড়িয়ে—গোয়েন্দাগিরি করবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। সত্য বলতে কি—পুস্তকখানি আমার দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। বইখানির ছাপাও ঝর-ঝরে, বাঁধাও দিব্যি অথচ দামও সস্তা—ষেড় টাকা মাত্র। এবং তক্ষুনি সেখানা কিনে ফেলবার জন্তে আমি খুবই ঝুঁকেছিলাম, তবু একবার মনে হল কিনবার আগে একবার ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখি। বইখানার আন্দাজ তিন অধ্যায় শেষ করেছি, এমন সময় দোকানের অপর পার্শ্ব সামনের দিকে যে কথাবার্ত্তা চলছিল, তার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। শুনতে পেলুম এবং শেলফের ফাঁকে দেখিতেও পেলুম—সুবেশিনী এক রমণী হরিকিঙ্কর বাবুকে বলিতেছেন—আপনি ঠিক জানেন, এটা তাঁর সব শেষের লেখা?

পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ বলিলেন—"নিশ্চয়ই—আমি আপনাকে নিঃসংশয়ে বলছি এটা একেবারে তাঁর হালি বই। সবে কালকে মাত্র এখানে এসেছে।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত ও নীলে বাঁধা সমুজ্জ্বল একটি বইয়ের গাদার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন। উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা ছিল—আমি দেখতে পেলুম—"সোনার স্বপন।"

অধ্যক্ষ পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন—"আমি ঠিক বলছি এই গ্রন্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শেষ রচনা এবং রেজায় কাটছে।"

রমণী বলিলেন—"আচ্ছা তাহলে ঠিক-ই হয়েছে। তবে কি জানেন সময় সময় বড় ঠকে যেতে হয়। এই দেখুন না, গেল-সপ্তাহে এখান থেকে দু'খানা বই নিয়ে গেলুম, বেশ বই—কিন্তু তখন ত আর অত খুঁটিয়ে দেখি নি, তারপর বাড়ী গিয়ে দেখি দু'খানাই পুরোনো বই, দু'মাস আগে বেরিয়েছে।

ক্ষমা প্রার্থনার সুরে অধ্যক্ষ বলিলেন—"এঃ! এ ত বড় লজ্জার কথা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে বই দু'খানা ফিরিয়ে নিয়ে তার বদলে না-হয় আর কিছু পাঠিয়ে দিই।"

রমণী বলিলেন—"না থাক্ তার আর দরকার নেই। আর তা-ছাড়া আমিও সে পড়ি নি, আমার কাছে যে মেয়েটি থাকে—আমার সেবা-টেবা করে তাকেই দিয়েছিলুম। সে অত শত বোধ হয় বুঝতেই পারবে না।

ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন—"তা ত বটেই।" তারপর হাল ফ্যাসানের ব্যবসাদারীর ভাষায় দিব্যি সহজ নির্লজ্জভাবেই বলিলেন—"কি জানেন, সময়ে সময়ে এত বড় ব্যাপারে এ-সকল ভুল ভ্রান্তি অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। এই দেখুন না কালকের কাণ্ডটাই—কি দুঃখের কথাই বলুন দেখি। আমাদের চাটগাঁয়ের একজন খুব পুরোনো খদ্দের ষ্টীমারে পড়তে-পড়তে যাবেন বলে তাড়াতাড়ি এসে শুধু বইয়ের নাম মাত্র দেখে—অনেক পাঠকই এমন করে থাকেন—দু'খানা বই পছন্দ করে নিয়ে গেলেন। তারপর আমরা দেখি সে বই দু'খানা গত বছর বেরিয়েছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে তাঁকে খবর দিলুম, কিন্তু তখন আর উপায় নেই—তাঁর ষ্টীমার ছেড়ে দিয়েছে।"

রমণী অলসভাবে তাঁর হাতের বইখানার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বলিলেন,—"যাক্ এখন বলুন দেখি এই বইখানা কি ভালো হবে? এখানা কি-সম্বন্ধে লেখা?"

অধ্যক্ষ বলিলেন—"এটা একটা অসাধারণ বই। একজন দস্তুর-মতন বিদ্বান্ লোকের লেখা। সমালোচকেরা ত সবাই একসঙ্গে বলছেন—এ মরসুমে যত বই বেরিয়েছে তার মধ্যে বোধ হয় এই খানাই একমাত্র বই যার সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। এর এমন একটা—" একটা—অবধি বলিয়া অধ্যক্ষ হাত-মুখ নাড়িয়া এমন-একটা ভঙ্গি করিলেন যাহা দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইবার সময় ঠিক প্রতি-শব্দ যোগাইতে না পারিয়া সময়ে সময়ে আমার নিজের যেরূপ অবস্থা হয় তাহাই মনে পড়িয়া গেল। তবুও তিনি ছাড়িলেন না—বলিয়াই চলিলেন—"বইখানার এমন-একটা শক্তি,—এমন-একটা অনন্যসাধারণ শক্তি, যদি বলা যায় যে এ-মাসে যত বই বেরিয়েছে তার মধ্যে এখানার মত এত শক্তিশালী আর কোন খানই নয়—তবে বোধ হয় সেটা বাহুল্য বলা হবে না।" কিন্তু এ-বক্তৃতাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অবশেষে তিনি ব্যবসায়ের ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করে বললেন—"তার সাক্ষী দেখুননা, বইখানা কি-রকম ভয়ানক বিক্রী হচ্ছে।"

রমণী বলিলেন—"তাই দেখছি—এই ত দেখছি এনেছেনও গাদা-পরিমাণ।"

অধ্যক্ষ বলিলেন—"কি করি বলুন বইখানা পড়তে পাচ্ছে না। বলতে-কি বইখানা বেরিয়ে অবধি সাহিত্য-সমাজে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেছে—দেখতেই ত পাচ্ছেন। এমন-কি কেউ কেউ এমনও বলছে—এ বইখানার প্রচার—" তারপর চারিদিকে চেয়ে চুপি চুপি কি বলিয়া যে তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন তাহা আমার কর্ণগোচর হইল না।

উত্তরে বিস্ময়সূচক সুরে রমণী বলিলেন—"তাই নাকি, তা' হ'লে আমি একখানা নিলুম। যে-লেখা-সম্বন্ধে এত ডামাডোল পড়ে গেছে সে জিনিষটা কি তা নিশ্চয়ই দেখা উচিত।"

রমণী এইবার তাঁহার জোয়ুক্ত অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন, সোনার চশমা, কুমীরের চামড়ার হাত-ব্যাগ গুছাইয়া লইয়া এবং বাঁ হাতে সুগন্ধি রুমালখানি আর একটু টিপিয়া ধরিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তার পর হঠাৎ কি মনে পড়ায় অধ্যক্ষের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"হাঁ দেখুন। আমি ভুলে যাচ্ছিলুম—এই—এই বইটার সঙ্গে আমার স্বামীর পড়বার মত আরো

খান-কয়েক বই পাঠিয়ে দিতে পারেন? তাঁর এই লম্বা ছুটিতে তিনি সিমলায় যাচ্ছেন। আপনি জানেন ত তিনি কি-রকম বই পছন্দ করেন?"

অধ্যক্ষ বলিলেন—"অবিশ্যি—অবিশ্যি! তিনি ত সাধারণত এ—ইয়ের বই—ঐ যে কি বলছিলুম—ইয়ের গ্রন্থ—তাও তিনি প্রায়ই কেনেন।'

রমণী বলিলেন—"হাঁ—হাঁ এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইসব আর কি।"

"ঠিক্" বলিয়া অধ্যক্ষ তাঁহার বামদিক-স্থিত একটি প্রকাণ্ড শেলফ দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ যে ওখানে সেসব বিস্তর রয়েছে। 'সাহারায় সাত সপ্তাহ'—সাড়ে সাত টাকা; 'মালগাড়ীতে ছ'মাস'—পনরো টাকা বারো আনা; 'গন্ধীরথে সন্ধ্যাযাপন' ছ' খণ্ড—তেইশ টাকা তেরো আনা।"

রমণী বলিলেন—"আমার বোধ হয় উনি ও-সব পড়েছেন। অন্ততঃ বাড়ীতে গাদা খানেক ঐ-রকম সব কি আছে দেখতে পাই।"

অধ্যক্ষ—"খুব সম্ভব। তাহলে লঙ্কার রাক্ষসদের মধ্যে সেও বোধ হয় আছে? কিন্তু দেখুন দেখি এখানা—এখানা সবে মাত্র আজ সকালে এসেছে। 'বিষ্ণুপুর ও বৃন্দাবনের বানর-সমাজ'—দামও সস্তা—নেট কুড়ি টাকা।" এই বলিয়া অধ্যক্ষ 'সোনার স্বপনে'র মতন সুদৃশ্য এবং সংখ্যায় সমতুল, এক থাক্ নূতন বইয়ের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেন। এবং খুব মিঠে রকমে পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন—'বানর-সমাজ'।

রমণী বলিলেন—"দাম-টা বেজায় বেশী না?"

অতি উৎসাহের সহিত অধ্যক্ষ বলিলেন—"সেটা ঠিক! তবে ওই বইটাই ত অত্যন্ত দামী। এর ছবিগুলো দেখুন দেখি—এই ফটোগুলো জীবন্ত বানরের ছায়া-চিত্র। ক্যামেরার সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। তারপর কাগজ ছাপা সে ত দেখতেই পাচ্ছেন। এই বইখানার খরচাই পড়েছে উনিশ টাকার উপর। এর উপর আমরা বিশেষ-কিছু লাভ করতে চাই না। তবে এ-সকল বই নাকি বিশেষ মূল্যবান তাই রাখতেও হয়।"

অধ্যক্ষের এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা থেকে আমি দু'টি জিনিষ আবিষ্কার করিলাম। প্রথম—গুছিয়ে বলতে পারলে ব্যবসা-বিশেষের খুঁটিনাটির কথা সকলেই শুনিতে চায়। কেতাব বিক্রির ব্যবসাতেও যে লোকসান খুব এবং সেজন্য বইওয়ালা বিশেষ সহানুভূতির যোগ্য। সুতরাং রমণী অতি সহজেই 'বিষ্ণুপুর ও বৃন্দাবনের বানর-সমাজ'কে গ্রহণ করিলেন। হরি-কিঙ্কর বাবুও তাঁর কেরাণীকে থিয়েটার-রোডের এক ঠিকানা লিখিতে বলিয়া তাঁর সুবেশিনী খরিদ্দারকে অভিবাদন পূর্ব্বক দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিলেন।

আবার ডেস্কে ফিরিয়া আসিয়া কিন্তু অধ্যক্ষ সম্পূর্ণ দোসরা লোক হইয়া দাঁড়াইলেন। আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি আস্তে আস্তে তাঁর সহকারীকে বলিতেছেন—"এই বাঁদরে বই কাটাতে বিশেষ বিপদে পড়তে হবে।" আরো বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর ঘটে উঠল না। আর একটি নারী-খরিদ্দার আসিয়া দেখা দিলেন। পারিপাট্যের মধ্যে

তাঁর শুভ্র বেশের সংযম এবং বিষণ্ণমাখা মুখ দেখিলে তিনি যে বিধবা তা হরিকিঙ্কর বাবুর অভিজ্ঞ দৃষ্টি না থাকলেও অন্য লোকের চোখে তা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

—"কি বললেন নতুন গল্পের বই—হাঁ—হাঁ—এই যে, আছে বই কি! 'সোনার স্বপন' চমৎকার সুন্দর গল্পের বই। সমালোচকরা সবাই বলছেন—'শরৎ বাবুর এ-রকম মিষ্টি বই আর একখানাও নেই।"

অতি মৃদুস্বরে রমণী বলিলেন—"সত্যি কি বইখানা খুব ভা

আমি বুঝিলাম—যথার্থ-ই খরিদ্দাররা বইখানা চায়।

অধ্যক্ষ—"চমৎকার বই। এ-টা একটা প্রেমের কাহিনী। ভাষা সরল অথচ আশ্চর্য্য রকমের চমৎকার। সমালোচনাতেও সেই কথাই প্রকাশ। এখানা এ-মাসের সকল বইয়ের সেরা। কাল রাত্রে আমার স্ত্রী বইখানা পড়ছিলেন শুনছিলুম। শেষটা চোখের জলে তার পড়া পর্য্যন্ত ভেসে গেল।"

—"বইখানা সম্পূর্ণ নিরাপদ ত? ছেলে-পুলেদের হাতে দেওয়া যেতে পারে ত?" বিধবা বলিলেন, "তা'হলে আমার মেয়ের জন্য নি।"

নীতিবিশারদ অভিভাবকের গাম্ভীর্য্যের সহিত হরিকিঙ্কর বলিলেন—"নিশ্চয়-ই—দৃশ্য এতে কিছুই নেই। একেবারে ধাঁচে লেখা—আগেকার সব বইয়ের মত। এই ধরুন—" বলিয়াই অধ্যক্ষ একটু থামিয়া পড়িলেন। কাদের মতন বলিবেন তা ভাবিয়া লইলেন এবং শেষে বলিলেন—"এই ধরুন অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখুজ্যে, চন্দ্রনাথ বোস, এমন-কি কতকটা বিদ্যাসাগরের ধরণের লেখা। মেয়ে-স্কুলের জন্য সবাই ত নিচ্ছে। যারা সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করেন তারাও ত কিনছেন দেখছি।"

বিধবাটি দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া একখণ্ড 'সোনার স্বপন' কিনিলেন এবং তৃণশ্যাম সুচিক্কণ কাগজে পুস্তকখানি বাঁধা হইলে তাহা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তারপরেই চড়া গলায় ছোঁড়া-ছোড়া কথায় এক খরিদ্দার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই—সময় কাটাবার জন্যে হালকি-গোছের কিছু আছে—বই টই?" লোকটার রকম-সকম দেখিয়া বোধ হইল, তার ব্যবসা দালালি এবং সেও সহরের বাহিরে কোথাও অবসর যাপন করতে চলেছে।

হরিকিঙ্কর বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ—খুব আছে! এই দেখুন না—এইখানা—সোনার স্বপন; খুব হালকা অথচ খুব মজার বই। এই কাল আমার স্ত্রী পড়ে শোনাচ্ছিলেন—হাসতে হাসতে একেবারে নাড়ী ছিঁড়ে যায়।"

—দাম কত? টাকা তিনেক?—সাড়ে তিন টাকা?—ওঃ! আচ্ছা বেশ বেঁধে দিন।

পর মুহূর্ত্তেই টেবিলের উপর টাকা ঝন্-ঝনের শব্দ হইল। খরিদ্দারও বই লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমার বুঝিতে বাকী রহিল না কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক যারা সস্তায় প্রত্নতত্ত্ব খুঁজে বেড়ায় বইয়ের বাজারে তাদের হাল কি। তার পরে-ই দেখলুম অধ্যক্ষ

দিব্যি গোলগাল ভুঁড়ি-বিশিষ্ট—কাঁচা-পাকা মিশ্রিত গোঁফ-দাড়ির মিলন-ক্ষেত্রের মত শুম্ফ-বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে সবিশেষ নম্রতার সহিত বলিতেছেন—"সমুদ্র-সংক্রান্ত বই?—হাঁ হুজুর আছে বই কি। আপনাদের যেরূপ মস্তিষ্ক চালনা করতে হয় তাতে এইরূপ গ্রন্থই আপনাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই দেখুন না এই—খুব সম্প্রতি বেরিয়েছে।—'বিষ্ণুপুর ও বৃন্দাবনের বানর-সমাজ'। দাম তিরিশ টাকা—উপস্থিত অর্দ্ধমূল্যে পনেরো টাকায় দেওয়া যাচ্ছে। এর ছাপা-খরচাই পড়েছে আঠারো টাকা। আমরা নাকি ঠিক সাবাড় করছি তাই এত সস্তায় যাচ্ছে। তা হ'লে পাঠিয়ে দেবো কি?"

"হুঁ—"

"যে আজ্ঞে। আসুন নমস্কার—নমস্কার!"

খরিদ্দারটি চলিয়া যাইলে অধ্যক্ষ তাঁর বিস্মিত সহকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"চিনতে পারলে না? আলিপুরের প্রথম সাবজজ।" এর পর লাগাড়েই খরিদ্দারদের যাওয়া-আসা বেচা-কেনা চলিতে লাগিল। আমিও দেখলুম যদিও দোকানে বিভিন্ন রকমের হাজার হাজার পুস্তক রয়েছে কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয় উক্ত দু'খানা বই কাটাবার জন্যই সমধিক ব্যগ্র। স্ত্রীলোক-খরিদ্দার মাত্রেই 'সোনার স্বপন' লইয়া যাইতেছে এবং পুরুষ-খরিদ্দারকে 'বানর-সমাজ' রচনা বেচা হইতেছে। রমণীদের মধ্যে 'সোনার স্বপন' কাউকে অবকাশরঞ্জনের বই বলিয়া, কাউকে বা তাহার বিপরীত বলিয়া, কাউকে বা বর্ষার দিনে পড়িবার, কাউকে বা বসন্তে পড়িবার উপযুক্ত বলিয়া দেওয়া হইতেছে এবং 'বান্দরে পুস্তক' কখনও বা জলের গল্প, কখনও বা স্থলের, কখনও বা জঙ্গলের, কখনও বা পাহাড়ের গল্প বলিয়া কাটানো হইতেছে এবং হরিকিঙ্করের মতে যে খরিদ্দার যে-রকম সহিতে পারিবে তার কাছ হইতে সে-রকম দাম আদায় করা হইতেছে। এইরকম করিয়া ঘণ্টা-দুই কাটিবার পর দোকান দেখলুম খরিদ্দার-শূন্য হইয়া আসিয়াছে এবং অধ্যক্ষ তাঁহার প্রধান সহকারীকে বলিলেন—"দেখ অনন্ত আমি এক-মুঠো খেয়ে আসি। এই বই-দু'খানা কাটাবার প্রাণপণ চেষ্টা করো, আরো সপ্তাহ খানেক এ-রকম করতে হবে। তারপর প্রকাশকদের কাছে গিয়ে দেখি তার ঘাড় ভেঙে আর কি করা যায়।"

আমিও দেখলুম যথেষ্ট হয়েছে আর নয়, সুতরাং একখানা বই হাতে করিয়া হরি-কিঙ্করের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বইখানার নাম 'ভামিনী'। পাতলা চটি বই। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী পূর্ব্বে যখন যুবরাজ ও যুবরাজমহিষী রূপে এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ যে কবিতা উপহার দেওয়া হয় তাহার একস্থানে যুবরাজ-মহিষীকে 'ভামিনী' সম্বোধন করা হয় এবং সেই সময়কার দু'খানি সুবিখ্যাত সাময়িক পত্রে এই কথার ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ লইয়া বাদানুবাদ চলে। ইহাতে তাহাই লিপিবদ্ধ ছিল। আমাকে দেখিয়া অধ্যক্ষ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার ব্যবসাদারী চাল ফিরাইয়া আনিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—"দেখি কি বই পছন্দ করলেন? ও 'ভামিনী'! হুঁ এ নিয়ে যে তখন খুবই লেখা-লেখি হয়েছিল। যে দু'খানি

কাগজে এর আলোচনা হয় সে-দু'খানিই দেশী-লোক-পরিচালিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজী কাগজ। আশ্চর্য্যের বিষয় কোন বাংলা সাময়িক পত্রে এ-প্রসঙ্গ আলোচিত হয় নাই। দাম? এতে ফেলা নেই তা আপনি টাকা-দুই দেবেন। চটি হলেও শব্দতত্ত্বের হিসাবে বইখানাকে দামী বলতে হবে। সে যা'হোক আর কিছু পুরোণো বই-টই দেখবেন না?" বলিয়াই স্যুটা করিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা পুস্তকের তালিকা লইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ফোক্‌লা দিগম্বর, তফসীর হাকানী, ত্রোপুধ ও ভল্লিক, প্রাচীন কলিকাতার আচার-ব্যবহার, বাল্মীকি ও কীর্ত্তিবাস, প্রেমেরার হাটহন্দ, প্রেমের পরীক্ষা, কুবুদ্ধি, 'হাতেম-তাই, মথুরা-মাহাত্ম, কর্ম্মনাশা, বৈষ্ণব পদাবলী, মুক্তা-লতাবলী, কলিকুতূহল,—না আজ আর থাক। আর একদিন না-হয় তখন আসবো, বলিয়া পুস্তকের মূল্য দিয়া উহা গ্রহণান্তে চলিয়া যাইতেছিলাম; কিন্তু 'সোনার স্বপন' সম্বন্ধে আমার যে অনিবার্য্য কৌতূহল হইতেছিল তাহা আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম—"আচ্ছা সত্যিই কি আপনি 'সোনার স্বপন'কে এত আশ্চর্য্য ভাবেন?"

হরিকিঙ্কর বাবু আমার প্রতি একটি নাতিতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তিনি বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন উক্ত পুস্তক আমি কিছুতেই লইব না। এবং বোধ হয় ক্ষণেকের জন্য পাটোয়ারি বুদ্ধি তাঁহাকে পরিত্যাগ করায় তিনি মাথা নাড়িয়া আমাকে বিশুদ্ধভাবে বলিলেন—"বিপদের কথা বলেন কেন? এই দুই প্রকাশক আমাদের ঘাড় দিয়ে তাঁদের দায় উদ্ধার করতে চান্। তাঁরা একা কিছু করে উঠতে পারছেন না, তাই আমাদেরও জড়িয়েছেন—আমাদের সাহায্য চান্। খুব চংদার বিজ্ঞাপন ছাড়ছেন, কাটলেও কাটতে পারে এবং কিছু সম্ভাবনাও আছে। তবে বলা ত যায় না। তার ওপর নীতিবিশারদ রুচিবাগীশ প্রভৃতির হলও ত আছেন কি না। সেই যা একটু ভয়। তা-ছাড়া বই-দু'খানাও আমার মনে হয় ডাহা ফাঁকি।"

—আপনি পড়ে দেখেন নি?

—ক্ষেপেছেন? গোয়ালাকে তার নিজের দুধ খেয়ে দেখতে বললে তার যে ভাব হয় সেই ভাবেই অধ্যক্ষ উক্ত কথাটি আমায় বলিলেন। কি হাত নতুন যে বই বেরুবে তা যদি পড়ে দেখতে হয় তা'হলেই হয়েছে আর কি? না-পড়েই তাদের ধাক্কা সামলানো যায় না।

আমি বলিলাম—"তা হলে যারা বইগুলো কিনে নিয়ে গেল তাদের কি হবে? তারা ত খুবই নিরাশ হবে?"

হরিকিঙ্কর মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না না সে ভয় নেই। ওরা কিনেই নিয়ে যায়—পড়ে না—কস্মিন কালেও না।"

—কিন্তু আপনার স্ত্রী? তিনি ত বইখানার খুবই সুখ্যাতি করেছেন বলছিলেন?

এইবার হরিকিঙ্কর বাবু তাঁর ব্যবসাদারী সংযম হারিয়ে ফেলে খুব একপাল হাসিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে আমি আজও অকৃতদার।"

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।

ব্যর্থ

আবার আমায় চল ওগো নিয়ে,
প্রাণের মুক্ত প্রান্তরে।
রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ সীমায়,
সে যে গো আমার কেবলি ঝিমায়,
একটানা এই ঘরের মাঝায়
কায়-মন মোর শ্রান্ত রে।

হেথায় কেবল সুখের নেশায়
দৃষ্টি চোখের ক্লান্ত রে।
মৃত্যু হেথায় দেখায় ভীতি,
মৌন হেথায় জীবন-গীতি,
দুখের আঁধার ঘরে কালরূপ,
কিবা সে বাহিরে-অন্তরে।

ফিরে দাও মোরে সেই দুর্দ্দম
নব যৌবন চঞ্চল ;
ফিরে দাও প্রাণে সেই ভালবাসা
অন্তরে যার উজ্জ্বল আশা
ইঙ্গিতে যার সঙ্গীত জাগে
উড়ায় মলয়-অঞ্চল।

কতদিন আর রাখিবে আমায়
শৃঙ্খলে বাঁধি' মোহ-পুরে ?
প্রাণ যে আমার পারেনাক আর,
বহিবারে এই তমিস্রার ভার,
উধাও হিয়ায় উড়ে যেতে চায়
অচেনা অজানা বহু দূরে।

অঙ্গে অঙ্গে একি গো কঠিন
এই বন্ধন চির নিশিদিন,
শুধু আসে যায় ফুল ফল নিয়ে
মরণ-আহত আমাকেও দিয়ে ;
মুক্তি কোথায়, মুক্তি কোথায়,
ঐ আঁধারেতে হয় আলোক লীন !

শ্রীকিরীট ঘোষ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ

প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে আমাদের এক শিক্ষক লিখিয়াছিলেন, "পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব ঠাকুর-বাড়ীতে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তার মধ্যে "শান্তিধামের সত্যজ্যোতি দুটি শিখা নিভিল। এ পঞ্চপ্রদীপের সব চেয়ে উজ্জ্বল 'রবি' এবং সব চেয়ে সরল 'দ্বিজ' শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ধ্রুব দীপ্তি দিতেছেন এবং চিরদিন দিন এই প্রার্থনা।" আজ সেই সরল দ্বিজেন্দ্রনাথও মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন আজ গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। সব চেয়ে উজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথও সে অন্ধকার দূর করিতে পারিবেন না।

মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ সর্ব্ববিষয়ে পিতার অনুরূপ ছিলেন একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবে তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করিতে আসিয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই। ছাত্র অবস্থা হইতেই তাঁহাকে বোলপুরে দেখিয়া আসিতেছি। আমাদের আশ্রম হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে নীচু বাংলায় তিনি বাস করিতেন—সঙ্গে ছিলেন তাঁহার পুত্রবধূ —আমাদের বউমা শ্রীহেমলতা দেবী এবং তাঁহার অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য মুনীশ্বর।

কেন দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ জীবন শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার কারণ অনুমান করা বোধ হয় কঠিন নয়। এই শান্তিনিকেতনেরই উন্মুক্ত প্রান্তরে সপ্তপর্ণি-বৃক্ষতলে একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়াছিল। সেই স্থানটি আজও বিদ্যমান আছে এবং সেই বৃক্ষটিও পঞ্চত্ব লাভ করে নাই। সেই—বোলপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরে সাধনার যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ শক্তিতে এবং তাঁহার

বড়দাদার শান্তিময় দৃষ্টির ছায়ায় সেই নীড় আজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া বিশ্ব ভারতী-রূপে প্রকট হইয়াছে। আজও সকাল-সন্ধ্যা সেই আশ্রম শত মধুপের কণ্ঠোচ্চারিত প্রণব-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে—তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ কলিকাতা নগরীর ধনজনপূর্ণ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া ভুবনডাঙ্গার বাঁধের নিকট নিজের ক্ষুদ্র কুটীর রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথকে আমার যেটুকু দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল সেকথা মনে করিতে গেলে আজিকার পনেরো বৎসর আগেকার বোলপুর-জীবনের কথা মনে করিতে হয়। সেই পনেরো বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতির দ্বার উন্মোচন করিতে গিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

কবে কিভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথকে সর্ব্বপ্রথম দেখিলাম তা আজ মনে পড়ে না—কেবল এইটা বড় হইয়া মনে জাগিতেছে যে তাঁহার শুভ্র শীর্ষ এবং শুভ্র পরিচ্ছদ দেখিয়া প্রথম হইতেই মনটা শ্রদ্ধায় নত হইয়া তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

আমাদের আশ্রমের দৈনন্দিন পাঠপরিচয় এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোন কথা ছিল না। তিনি কোনদিন আমাদের পাঠও বলিয়া দেন নাই কিংবা কোন কার্য্যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে, স্বাস্থ্যহানির আশা আছে, তাহা লইয়া মাথা খারাপ করেন নাই। তিনি তাঁহার নিজের সাধন চিন্তন অধ্যয়ন লইয়াই তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার নাগাল পাইতাম না। তাঁহাকে দেখিতে হইত ফাঁকে ফাঁকে—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আড়ালে—দশদিন ইচ্ছার পর একদিন তাঁহাকে দেখিতে পাইবার সুযোগ মিলিত।

দেখিতাম অপরাহ্ণের রৌদ্র যখন ম্লান হইয়া আসিয়াছে তিনি নীচু বাংলার ক্ষুদ্র বাগানটির মধ্যে বেতের আরাম-কেদারায় বসিয়া আছেন—প্রায়ই একলা—বহির্জগত সম্বন্ধে যেন বড় একটা হুঁস নাই। বনের পাখী, শালিক, কাঠবিড়ালী তাঁহার স্কন্ধে ও সমস্ত শরীরে অবাধে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে—আর কেহ উপস্থিত হইলেই তাহারা উড়িয়া পালাইত। হিংসা-বৃত্তি-পরিবর্জ্জিত দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকট তাহাদের কোন ভয় ছিল না। একবার একটা শালিক তাঁহার চোখের কোণে এরূপ দারুণভাবে ঠোকরাইয়া দিয়াছিল যে সেই চোখটা লইয়া কত কষ্ট পাইলেন তবুও সে পাখীটাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এই বিষয়ে তাঁহার নিজেরই লেখা কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিই। অশীতিবর্ষ পার হইয়াও তাঁহার হৃদয়ের সরসতা এবং হাস্যরস (wit) দেখিয়া অবাক হইতে হয়—"

সাধের মশা, সাধের মাছি,
সাধের পিপড়ে, পোকা মাকড়!
বোস্‌রে গায়ে, বোস্‌রে পায়ে
কোরবো না আমি ধর্-পাকোড়॥

আয় আয় কাক, ছাড়ি কা-কা ডাক,
তোরে বড় বেশী ডাকতে হয় না।
তুইরে শালিক বড় বেরসিক
খাবার দেখলে সবুর সয় না।"

প্রাতঃকালে তাঁহার খানিকটা করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইবার অভ্যাস ছিল। এই অভ্যাসটি আমি যতদিন জানি তিনি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। একবার এই অভ্যাসটির জন্য একটু দুর্দৈব ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি এই :—একবার এক ছুটিতে তিনি পুরী যাইতেছিলেন। তাঁহার নিয়মিত প্রাতঃকালীন ভ্রমণের সময় উপস্থিত হইলে তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া বেড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পরবর্তী ষ্টেশনে তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হইল। তিনি খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া তবে সুস্থ হইয়া গাড়ীতে বসিলেন।—তারপর খুর্দ্দারোড্ জংসনে যখন গাড়ী বদল করিবার প্রয়োজন হইল তখন তিনি কিছুতেই ট্রেণ হইতে নামিতে চাহিলেন না—আত্মীয়-স্বজন গার্ডসাহেব কাহারও কথায় কোন ফল হইল না—তারপর সেই সমস্ত গাড়ীখানা কাটিয়া পুরীগামী ট্রেণের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল।

বিপত্নীক দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাস করিয়াই প্রাণের আরাম পাইতেন। তাই পারত-পক্ষে তিনি শান্তিনিকেতন ছাড়িতে চাহিতেন না। কলিকাতায় তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া যাইতে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। ঠাকুর-বাড়ীর বড়ছেলে—ভোগ-বিলাসের সমস্ত উপকরণ বিধাতা তাঁহাকে দুইহাতে উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে-সমস্ত তিনি গ্রহণ করেন নাই। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, লোভের দ্বারা নয়—এই মহাবাক্যের সত্যতা তিনি নিজেই সমস্ত জীবন দিয়া পালন করিয়া গিয়াছেন। জীবনের প্রথমাংশ হইতেই ত্যাগের এই ধারা তাঁহার মধ্যে অনন্তভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। যৌবনে যখন ভোগের পরিপূর্ণ সম্ভার তাঁহার দ্বারে অর্ঘ্য সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল তখন মহর্ষিদেব তাঁহাকে বৈষয়িক কার্য্য পরিদর্শন উপলক্ষ্যে মফঃস্বলে পাঠাইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেখানে দেখিলেন প্রজাদের দারুণ কষ্ট—কাহারও চালে খড় নাই, কাহারও বা পেটে অন্ন নাই, কেহ পুত্র-শোকে কাতর, কেহ দারুণ ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে—তাহারা ঋষিতুল্য মনিবের নিকট কাঁদিয়া নিজেদের দুঃখ-দারিদ্র্য বর্ণনা করিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের চিত্ত সমবেদনায় দ্রবীভূত হইয়া গেল—তাহাদের সকলের এক-বৎসরের খাজনা মাপ করিয়া দিলেন। আরও তাহাদের অন্ন-কষ্ট জল-কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য সদর হইতে টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। এবম্বিধ জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার কিরূপ সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারিবে মহর্ষিদেবের তাহা অগোচর রহিল না। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। ফিরিয়া আসিবার পথে কন্যাদায়গ্রস্ত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে তাঁহার নিকট নিজের দুঃখের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। পকেট হাতড়াইয়া

দিবার মত কিছু অর্থ না পাইয়া ঘোড়াশুদ্ধ গাড়ীখানাই ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিলেন।

তাই আজ কেবল বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া মনের মধ্যে এই কথাটাই উত্তর খুঁজিয়া মরিতেছে যে এই যে দয়া, এই যে মানুষের লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিবার দারুণ শক্তি, এই যে পরের দুঃখে কাতর হইয়া বুকের মধ্যে তীব্র হাহাকার অনুভব করা, ভাল মন্দ উপযুক্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা না করিয়া দান—এ কি শুধুই প্রাণময়তা Sentimentalism? এ যদি Sentimentalism হয় তবে এর ভিত্তি কোথায়? এর ভিত্তি কি পরমেশ্বরেরই বুকের পক্ষপাতায় নয়, যেখানে ভালমন্দ উচিত-অনুচিত এক হইয়া গিয়া মিশিতেছে! প্রাচ্যের ইহাই বোধ হয় মীমাংসা—তাই আজ পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষকে পাশ্চাত্যের ঔচিত্যের দৃষ্টির সাহায্যে বিচার করিতে পারিলাম না।

দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকট ছোট বড় বলিয়া কোন পার্থক্য ছিলনা—তিনি এ-সব আদৌ বুঝিতে পারিতেন না; সে জগতের লোকই তিনি ছিলেন না। একবার কলিকাতায় বাড়ীতে শীতের সময় এক ভৃত্য তাঁহার নিকট শৈত্যের অনুযোগ করিয়াছিল—তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের গায়ের বহুমূল্য শাল তাহাকে দিয়াছিলেন। পরে সেই বেচারা যখন ছুটি লইয়া দেশে যাইতেছিল তখন দারোয়ানেরা তাহার বাক্সে সেই শাল দেখিতে পাইয়া চুরি করিয়াছে মনে করিয়া মারধোর আরম্ভ করিয়াছিল। তেতালার ঘরে দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকট সেই খবর পৌঁছিলে তিনি "ওকে মারিস্ নে, আমি দিয়েছি" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে নীচের তলায় ছুটিয়া আসিলেন। পিতৃবাক্য জানাইয়া আর একবার কোন-এক ভদ্রলোক দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বহুমূল্য শ্বেত-প্রস্তরের লিখিবার গোল টেবিল এবং কেদারা লইয়া গিয়াছিলেন।

পনেরো বৎসর আগে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট দেখিয়াছি। বলিতেন সেই সময় পর্য্যন্ত মাথাধরা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ একদিন গল্প করিতেছিলেন যে কি-একটা কথায় দাদামহাশয় খুসী হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তামর্ষণ করিয়াছিলেন—হাতের আঙুলের হাড়গুলি দিনেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠে যেন বিঁধিতেছিল এবং যুবক দিনেন্দ্রনাথের পক্ষে ঠাকুরদাদার সে আনন্দের বেগ সহ্য করা দুষ্কর হইয়াছিল। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭০ পার হইয়াছে।

তারপর বোলপুর ছাড়িয়া আসিয়া এই দীর্ঘ পনেরো বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁহার অসুখ-বিসুখের খবর পাইতাম। বড় মা সেই কারণে তাঁহার জন্য বড় উদ্বিগ্ন থাকিতেন। জামিতায় জ্যেষ্ঠপুত্র বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যু ও দুইভাই সত্য-জ্যোতির মৃত্যু তাঁহার বুকে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল—তাঁহার শরীরকে ভাঙ্গার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল।

আজিকার বোধহয় পঁচাশি বৎসর পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতা পুস্তক "স্বপ্ন-প্রয়াণ" রচনা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন কালে এই বইখানি বাহির হইলে, সাহিত্য-সমাজে একটা

মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। বইখানি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন ইহাতে কল্পনাশক্তির (flight of imagination) এবং কবিত্বশক্তির কি নিভুল প্রমাণ বিদ্যমান আছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার বীজ যে এইরূপে দ্বিজেন্দ্র-সত্যেন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্রের ভিতর দিয়া সঞ্চারিত হইয়া রবীন্দ্রনাথে স্থিতিলাভ করিয়াছে এ-বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কখনো নাম কিনিবার দিকে ঝোঁক ছিল না। তিনি বরং অখ্যাত ও অজ্ঞাতভাবে নিরুপদ্রবে বাস করিতে চাহিতেন। সার্দ্ধশতাব্দীর উপর তিনি বাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাজার আজ তাঁহার পুস্তকের ভারে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবার কথা, কিন্তু তাঁহার কয়খানিই বা পুস্তক আছে। ইহার কারণ আমরা জানি। দেখিয়াছি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিনিদ্রভাবে তিনি কাগজের পর কাগজ লিখিয়া চলিয়াছেন, অনুগত ভৃত্য মুনীশ্বর মাঝে মাঝে কফি জোগাইতেছে। প্রাতঃকালে উঠিয়া সে সমস্ত "কিছুই হয় নাই" বলিয়া ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে এই বলিয়া দুঃখ করিতেও শুনিয়াছি যে "বড়দাদা যে-সমস্ত লেখা ছিঁড়িয়া ফেলেন সেগুলি থাকিলে বঙ্গসাহিত্যে। উজ্জ্বল রত্ন হইয়া শোভা পাইত।" কিন্তু এই নষ্ট করার হাত হইতে তাঁহার রচনাগুলিকে বাঁচাইবার কোন উপায়ই ছিল না। যদি কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক লেখা সংগ্রহের জন্য তাঁহার নিকট যাইতেন, তিনি সন্ত্রস্ত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন। 'আমি কি জানি' এই ছিল তাঁহার ধারণা। এটি যে আজকালকার মত ভদ্রতার পোষাক-স্বরূপ তাঁহার বাহিরের সৌজন্য ছিল—তাহা নয়। এটি ছিল তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জন্যই তিনি নিজের বহুমূল্য রচনাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। একবার প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ বাবু তাঁহার নিকট হইতে একটি লেখা পাইবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন। "গীতাপাঠের ভূমিকা" এই প্রতিশ্রুতির ফলে নষ্ট হইবার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

কবিতা লিখিবার ঝোঁক তাঁহার চিরকালই ছিল—লিখিয়াছেনও।

কিন্তু আমার মনে হয় ইদানীন্তন কালে তিনি দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেই নিজেকে বেশী করিয়া নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই চমৎকৃত হইয়া গিয়াছেন। হিন্দুদর্শন বেদান্ত উপনিষদ্ পড়িয়া হজম ত করিয়াছিলেনই, পাশ্চাত্য দর্শনও বাদ যায় নাই। একবার মনে আছে দিনেন্দ্রনাথ কোঁতের একখানা অখ্যাতনামা বইএর কোন-একটা জায়গায় তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সে জায়গাটায় কি আছে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বলিয়া দিলেন। দিনেন্দ্রনাথ সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "দাদা, এ বইটা আপনি পড়েছেন?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "পড়েছি? বোধ হয় পঞ্চাশবার পড়েছি।" এমনই ছিল তাঁহার পড়া।

তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধের দুই চারিটির নাম এখানে লিখিয়া দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না;—

(১) উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের মূল্য নিরূপণ, (২) তীর্থযাত্রা, (৩) বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মূল্য নিরূপণ, (৪) কালের মূল্য নিরূপণ, (৫) ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য রত্নের অনুমার্গন, (৬) ব্রহ্মোপাসনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানে সমুত্থান ইত্যাদি।

"গীতাপাঠের ভূমিকা" লেখা হইলে প্রবাসী আপিসে পাঠাইবার পূর্ব্বে পড়িয়া শোনাইতেন। এই লেখা শোনানর প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। সেটা তাঁহার হাসি। যখন হা-হা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিতেন তাঁহার হাত-পা চোখ মুখ সর্ব্বশরীর যেন হাসিতে থাকিত—ঘর হাসির শব্দে যেন কাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিত। তাঁহার স্বভাবে কার্পণ্য বোধ করি কোথায়ও ছিল না—যখন হাসিতেন মন-প্রাণ খুলিয়াই হাসিতেন। জীবনে এইরূপ হাসি আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

গণিতবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। এ-কথাটা বোধ হয় সাধারণের অগোচরেই রহিয়া গেল। শুনিয়াছি য়ুরোপের কোন্ এক বিখ্যাত পণ্ডিত নাকি একবার কয়েকটি গণিতের প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথই সে-সমস্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করিতে পারিয়াছিলেন। বীজগণিতের অঙ্কে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল—(a) এইরূপ করিয়া power বাড়াইতে বাড়াইতে কাগজে আর কুলাইত না—তিনি সেই অঙ্ক সাম্‌নে রাখিয়া বিনিদ্রভাবে রাত্রি কাটাইয়া দিতেন।

ইংরাজিতে short-hand আছে সকলেই জানেন, বাংলাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ short-hand এর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার নাম "রেখাক্ষর বর্ণমালা"। আমি একবার এই রেখাক্ষর বর্ণমালা লিখিবার দুরাশা মনের মধ্যে পোষণ করিয়া কয়েকদিন তাঁহার নিকট যাতায়াত সুরু করিয়াছিলাম। কয়েকদিন যাতায়াতের ফলে যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইল যে সে দুরূহ বিষয় বুঝিতে হইলে যে-মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় বিধাতা আমাকে তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং পরবর্ত্তী জন্ম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই, বুদ্ধিমান ছাত্রের মত ইহাই মানিয়া লইয়াছিলাম।

বাংলা ব্যাকরণ-সম্বন্ধেও তাঁহার অবধান কম নয়, একথা যাঁহারা তাঁহার (১) ভবিষ্যৎ বাংলা-ব্যাকরণের অঙ্গ-পোষণার্থে শাখের সংগ্রহ, (২) ঝিনুকের কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সর্প বাহির ইত্যাদি প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কে দ্বিজেন্দ্রনাথ অতিশয় স্নেহ করিতেন। সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেন দেখিয়াছি।

এইখানে তাঁহার "প্রাণ কাঁদায়নি" বলিয়া ছোট্ট একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিই :—

আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার!
শুন্যরে না গুঞ্জকুল কুঞ্জবনে আর!
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি।
উপুড় হইয়া ভোজ পত্রে আছে পড়ি॥

ফুকারে মনোবেদনা হাম্বারবে ধেনু।
ঘাস্ নাহি রোচে মুখে না শুনিলে বেণু॥
কালিন্দীর কূলে বসি কান্দে গোপনারী।
তরঙ্গিনী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী॥
সারা কুঞ্জবন খুঁজি উন্মাদিনী বালা,
মাধবী লতাকে বলে, "সে আমার কালা।"
আর কি সে মনচোর স্থা দিবে চক্ষে।
সিন্ধু কাঠি খুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে॥"

দ্বিজেন্দ্রনাথ কিরূপ ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন তাহা তাঁহার একখানি চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দিলে বোঝা যাইবে। এই চিঠিখানি শান্তিনিকেতন হইতে ২রা বৈশাখ ১৩১৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে লিখিত—ঠিকানা "শ্রীযুৎ সত্যেন্দ্রজ্যোতিশ্চিরঞ্জীবয়ঃ।"

"ভাই জ্যোতিঃ!

রবি দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন Andrews সাহেবকে। তাহার keynote হচ্ছে world wide co-operation। এবার এ যে দুটি পত্র লিখিয়াছেন রবি—ইহার উপরে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। তা, শুধু নয়—আমি তাহার প্রতি কথায় সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সায় দিতেছি। তাহা দেখলে তুমি খুব খুসী হবে যে রবির কথা আমার গভীর অন্তরাত্মার কথা ...ইত্যাদি।

তোমার স্নেহের বাঁধা বড়দাদা।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্টিতম জন্মতিথিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিচ্ছি;—

"জনম দিবস আজি তোমার, ধর
উপহার বড়দাদার।
* *
সত্যজ্যোতি বিনা হায়
আঁধার পৃথিবী।
আঁধারের আলো রবি,
হোক্ চিরজীবি।

মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের একদিন খেয়াল হইয়াছিল যে ছোট বেলায় মা যে-রকম খিঁচুড়ি রাঁধিয়া খাওয়াইতেন সেইরূপ খিঁচুড়ী খাইতে হইবে। রান্না হইলে রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়িল। দুই ভাই একসঙ্গে বসিয়া খিঁচুড়ী খাইলেন।

এইরূপ ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কিন্তু সমস্তটা ছাপাইয়া মন তাঁহার নিকট নতিস্বীকার করে সেইখানে, যেখানে তিনি

দার্শনিক নন, পণ্ডিত নন, গণিতবিদ নন, শুধু মানুষ—আত্মভোলা নিরাসক্ত ঋষি। তাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্রকে মহর্ষি বিজেন্দ্রনাথ বলিতে আজ আমার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। সকলেই তাঁহাকে 'বড়দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ধন্য হইতেন। মহাত্মা গান্ধীও তাঁহাকে বড়দাদা বলিতেন। কি শীতকাল কি গ্রীষ্মকাল বারোমাস তাঁহার স্নানের জল বাহিরে ছিমে পড়িয়া থাকিত। প্রাতঃকালে মাত্র সরিষার তৈল মাখিয়া তিনি সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতেন। বিলাসিতার সামান্য বাষ্পটুকুও তিনি রাখেন নাই একদিন তাঁহাকে স্নানের ঘরে ঢুকিতে দেখা গেল—কিন্তু অনেক দেরি হওয়ার পরেও তিনি বাহির হইলেন না। সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া দেখা গেল তিনি তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছেন। গায়ের সাবান শুকাইয়া খড় খড় করিতেছে। দরজা খোলার শব্দে তাঁহার স্মরণ হইল। তারপর স্নান সারিয়া বাহিরে আসিলেন।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে এই কথা বলিয়াছিলাম যে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন যোগ ছিল না। কিন্তু এইটিই শেষ কথা নয়। আশ্রমের সমস্ত কার্য্যের সঙ্গে বস্তুমার ভিতর দিয়া তাঁহার সঙ্গে গভীর নাড়ীর যোগ বিলক্ষণ ছিল। এবং মহর্ষিদেবের যে ব্রহ্মজ্ঞান আজ বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়া পুষ্পসম্ভারে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই মহীরুহের অন্তরস্থিত রস যোগাইয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের অভাবে তপঃক্লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ আজ দিশাহারা হইবেন; দ্বিজেন্দ্রনাথের অভাবে যে পুঞ্জীভূত তমিস্রা শান্তিনিকেতনকে অবসন্ন করিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে—শান্তিনিকেতন মন্দির-সৌধের যে দীপ্যমান কিরীটি আজ খসিত হইয়া পড়িয়াছে তাহার স্থান পরিপূরণ করিবার শক্তি নাই।

দেবেন্দ্রনাথ আরতির যে দীপালি সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন সেউটির সে আলো একটি একটি করিয়া নিবিতেছে। কিন্তু এই মৃত্যুকেই কি আমরা বড় করিয়া দেখিব? জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়া মানুষ যে মহাভুল করে আজিকার দিনে আমরাও কি তাহাই করিব? জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার অখণ্ড যোগসূত্র আমরা যেন না হারাই। রাত্রিতে সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে বলিয়া আমরা যেন মনে না ভাবি আলো নির্ব্বাপিত হইল, সৃষ্টি লোপ পাইল। এমন সময়েও যেন অন্তরীক্ষে চাহিয়া আমরা দেখিতে পাই সূর্য্য অপসারিত হইলেও লোকলোকান্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজের এক দরবার ছাড়িয়া আর এক দরবারে আলোর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে—সেই সঙ্গীতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ বাজিয়া উঠিয়াছে। *

শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ রায়।

---

* ৩১শে জানুয়ারি দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ শোক সভায় পঠিত।

"ডাব কি পেকেছে ?"

সে আজ প্রায় ২৮ বৎসরের কথা। বোধ করি ফাল্গুন মাস ; একদিন অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকার সময় আমরা সকলে বাটীর বহিঃ প্রাঙ্গনে গামড়ার (নারিকেল পাতার গোড়ার অংশ) ব্যাট ও একটী ছোট রবারের বল লইয়া ক্রিকেট খেলিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ একখানি প্রকাণ্ড সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আমাদের গেটে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম সেই গাড়ী হইতে একজন উন্নত দেহ শুভ্র বেশ শুভ্র কেশ শুভ্র শুস্ক শ্মশ্রু বর্ষীয়ান পুরুষ নামিয়া আসিলেন। ইনিই পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার পরণে সাদা চিলা পায়জামা, সুলম্ব পাঞ্জাবী তাহার উপর সাদা কাপড়ের চোগা পদদ্বয়ে মোজা ও তাহার উপর একজোড়া কটকী ঢাউস সাদা চটী। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। আমিই সকলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম। উঁহাকে ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার দেখিয়াছিলাম বলিয়া চিনিবামাত্র দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলাম, এবং আমাদের পুরাতন বৈঠকখানার সম্মুখস্থ উন্মুক্ত রোয়াকে একখানি চৌকী দিয়া বসাইলাম। বৃদ্ধ চৌকীতে হেলান দিয়া বসিয়া মুখে লম্বা এক আঃ শব্দ করিয়া যেন তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন তোমাদের বাড়ীটী বেশ সুন্দর, কেমন নির্জ্জন গাছ পালায় ঢাকা আমার বড় ভাল লাগে। তিনি আমাদের পুনরায় খেলা আরম্ভ করিতে বলিলেন এবং বলিলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার বাবা (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়) না আসেন এখানে বসিয়া তোমাদের খেলা দেখি। আমরা কিন্তু তাঁহার দুরে দুরে ঘোঁসিয়া দাঁড়াইয়াই রহিলাম। ইতিমধ্যে আমার খুড়তুতো ভাই সে তখন নিতান্ত শিশু, হামা দিয়া রম্ভাও ঘুরিয়া বেড়ায় সেও আসিয়া হাজির। তাহার তৎকালীন গোদা চেহারা, বিস্তীর্ণ চক্ষু, লাবণ্য মণ্ডিত নবজলধর শ্যাম রং যে দেখিত সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমরা তাহাকে কেলো বলিয়া ডাকি। এই কেলোকে অনুসরণ করিয়া তাহারই জুড়ীদার আমার আর এক খুড়তুতো ভাই ভেলো সেও আসিয়া উপস্থিত। ভেলো দেখিতে আরো সুন্দর ছিল। এই কেলো ও ভেলোকে দেখিয়া ঠাকুর মহাশয়ের আনন্দের উৎস একেবারে খুলিয়া গেল। তিনি মহোৎসাহে তাহাদের সহিত খেলা আরম্ভ করিয়া দিলেন, হাস্য কলরবে দিক সকল মুখরিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে আমার মেজ কাকা মহাশয় (স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) আদালত হইতে বাড়ী ফিরিলেন। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া হঠাৎ এ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন। পরমুহূর্ত্তে প্রণতি, আলিঙ্গন, ও কুশল সংবাদাদির পর যখন ঠাকুর মহাশয় শুনিলেন যে, আমার পিতাঠাকুর মহাশয় তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে আদালত হইতে ঘোড়াসাঁকো গিয়াছেন তখন খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল। কাকাবাবু বাড়ীর মধ্যে যাইয়া তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলেন ও তাঁহার জন্ত কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কাকাবাবুর বালা কালের ডাক নাম নাকি "পেনো" ছিল আমরা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতাম না। তিনি যখন তাঁহাকে "পেনো" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন তাহা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে যাহা হউক কিছু পরেই পাড়া হইতে একটী ছোকরাকে ডাকিয়া আনা হইল। সে আসিবা-মাত্র ঠাকুর মহাশয় যেখানে বসিয়াছিলেন তাহার সম্মুখবর্ত্তী একটী নারিকেল বৃক্ষ মনোনীত করিয়া তাহা হইতে ডাব পাড়িবার উপক্রম করিল। ঠাকুর মহাশয় একান্ত মনোযোগের সহিত তাহার বৃক্ষারোহণ প্রভৃতি যেন অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ডাব পাড়া হইয়া গেলে আমরা কেহ কেহ সে গুলি কুড়াইয়া আনিয়া তিনি যে স্থানে বসিয়াছিলেন তাহারই সম্মুখে জমা করিলাম। এইবার তাঁহার দৃষ্টি সেই ডাব গুলির উপর পড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া অবশেষে পার্শ্বে দণ্ডায়মান কাকাবাবুকে প্রশ্ন করিলেন 'এ ডাব কি পেকেছে', তাঁহার এ অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া আমরা কেহ কেহ পশ্চাতে যাইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাঁসিতে লাগিলাম। কাকাবাবু বলিলেন আজ্ঞে নারিকেলের কচি অবস্থাকে ডাব কহে, অর্দ্ধ পক্ক অর্থাৎ ডাঁসা অবস্থার দুর্ম্মা, এবং পক্ক ও শুষ্ক অবস্থায় ঝুনা কহে। তিনি তাহা শুনিয়াও হো হো হো ঠিক্ ঠিক্ বলিয়া অন্ত কথা কহিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতরে তাঁহার জন্ত জলখাবার প্রস্তুত সম্পন্ন হইল। সামান্ত কিছু ফলমূল লুচি তরকারী মিষ্টান্ন ও এক কাঁচের গেলাসে তাঁহারই সম্মুখে কর্ত্তিত "পাকা ডাবের" জল ও কচি শাঁস আমরা আমাদের বড় বৈঠকখানায় একটি টেবিলের উপর সাজাইয়া দিলাম। তিনি অল্প স্বল্প গ্রহণ করিলেন এবং তাহার কিছু পরেই ঘোড়াসাঁকোয় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কতদিন হইয়া গেল এ ঘটনা আমাদের বাটিতে ঘটিয়াছে কিন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে তাঁহার এই কথা লইয়া আমাদের আনন্দ হয়।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমীরণের আত্মকাহিনী

অমরার নন্দনকাননে একদিন আমার জন্ম ছিল। দেবতার সুরভি নিঃশ্বাস দিয়ে গড়া তনুখানি পারিজাতের গন্ধে ভরপুর করে নিয়ে চপল নৃত্যে কুঞ্জে-কুঞ্জে প্রিয়তমের কত গানই না গেয়ে বেড়িয়েছি। কিন্তু কি পাপে জানিনা সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে ধরণীর তপ্ত বুকখানায় আমার নির্ব্বাসন হয়েছে। এখানেও প্রিয়তমের গান গেয়ে বেড়ানই আমার কাজ—কঠিন ধরার মাটিকে তাঁর বাসের যোগ্য করে তোলাই আমার চেষ্টা—মানুষকেও তাঁর প্রেমে মাতিয়ে তোলাই আমার চরম কামনা—তা' হলে স্বর্গ মর্ত্য দুই এক হয়ে যাবে, আমার আর কোন দুঃখই থাকবে না।

অনেকের ধারণা আমার এ অভিশপ্ত জীবনটা নিয়ে আমি বুঝি সবসময়ে প্রতিহিংসা নেবার জন্যই পৃথিবীর বুকে হা-হা করে বেড়াই। সোনার শস্যকে দলিত করে, কোমল কুসুমকে তরুর বক্ষ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, জলধির অতল তলে তরণী ডুবিয়ে দিয়ে, মানুষকে চলার পথে বিপর্য্যস্ত করে, প্রলয়-লীলার অট্টহাস্য করাই বুঝি আমার একমাত্র কাজ? ওগো, না গো, না। তোমরা আমার ও-রূপ দেখে ভয় পেয়োনা; আমি যে তোমাদেরি বন্ধু! আমি যদি তোমাদের সাগরে, শৈলে, কাননে কান্তারে, পথে-প্রান্তরে, গৃহ-উপবনে ছুটোছুটি করে না বেড়াই, তোমাদের জীবনের সব বৈচিত্র্য, সব গতি-বেগ যে থেমে যাবে! আমিই যে ধরণীর বুকফাটা তৃষ্ণা দেখে আকুল হয়ে জোর করে জলভরা মেঘকে ধরে এনে শীতল বারিধারা তার শুষ্ক কণ্ঠে ঢেলে দিই; তা' না হলে যে তার বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যেত; সরস শ্যামলতার সব রাগটুকু দগ্ধ হয়ে কেবল তপ্ত মরু-বক্ষের মতই ধূ-ধূ করে উঠ্‌ত! তোমাদের সব ফসলের মূলেই যে আমি। আমিই ত তোমাদের সব চেয়ে বড় চাষী। গ্রীষ্মে বীজগুলি লাঙ্গলে আমিই তা'দিগকে উড়িয়ে দিয়ে ধরণীর বুকে ছড়িয়ে দিই; বসন্তে একফুল থেকে আর-এক ফুলে পরাগ বয়ে নিয়ে বেড়াই। তোমাদের জীবনধারণ ও উপভোগ করার জন্য আমিই ধরার পৃষ্ঠে শ্যাম-শস্পের কোমল আসন বিছিয়ে, গাছে গাছে ফলপুষ্প-সম্ভারে পৃথিবীকে শোভা-সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে তুলি। শীতে আমার উগ্রত রূপ দেখে তোমরা ভয় পাও কেন? আমি কি সাধে পাগল হয়ে বেড়াই? শুকনো পাতা, মরা, রুক্ষ, জীর্ণ গাছ-গুলো আমার যে দুঃখের বিষয়; তারা থাকলে যে সব সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে, সব দূষিত হবে

যাবে, তোমাদের জীবনও বিষময় হয়ে উঠবে। তাইত জোর করে শুকনো পাতাগুলো ঝরিয়ে দেই ; পচা গাছগুলো উপড়ে ফেলে বাগান পরিষ্কার করে ফেলি।

আমার কি এক দণ্ড বিশ্রাম আছে, না পোড়া চক্ষে একটু ঘুম আছে ? তোমরা কি প্রিয়তমের জন্য এতখানা ভাব, না তাঁর এত বড় রাজ্যটা পরিষ্কার রাখতে পার তোমরা যত লোকই লাগিয়ে ঘর দোর, বাগান জমি পরিষ্কার কর না-কেন, আমি দিন রাত জেগে না খাটলে কিছুই হবার যো নেই। তোমরা দিনরাত যে দূষিত বাষ্প উদ্গীরণ করছ, আমি সবসময় সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে আমার স্নেহশীতল স্পর্শে তোমাদিগকে ঘিরে না রাখলে তোমরা যে একদিনও বাঁচবে না।

আমি যে তোমাদেরই সুখদুঃখের সাথী। তোমাদের সুখনিদ্রার জন্যই আমিই তোমাদের নিদ্রালস কর্ণে পাপিয়ার সঙ্গীত বয়ে আনি, উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে ধীর পাদসঞ্চারে প্রবেশ করে তোমাদের শ্রান্তি দূর করি। শ্রান্ত, পীড়িত ছলে আমিই তোমাদের তপ্ত ললাটে হাত বুলিয়ে দিই। আমি তোমাদেরই জন্য ফুলের বুক থেকে গন্ধ চুরি করে আনি, প্রভাত-শিশিরের মত স্নেহের শীতল স্পর্শে ঢেকে রাখি, বালক-বালিকার কলহাস্যের মত প্রাণে সরসতা এনে দিই।

তোমরা যে সেই প্রিয়তমেরই সন্তান। তাইত এখানে এসে সবসময়ই তোমাদের কাছে থেকে তোমাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে আমার এত আনন্দ। তোমরা কিসে ধরণীর অধীশ্বর হবে, তোমাদের কিসে মান প্রতিপত্তি বাড়বে, সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির। তাই কোন সুদূর অতীত যুগ থেকে তোমাদের তরণীর পাল উড়িয়ে কত নদ নদী-সাগর পারে অজানা দেশের কূলে কূলে তোমাদিগকে নিয়ে গিয়ে কত অজ্ঞাত রাজ্যের কত অগণিত ধন-রত্নের সন্ধান দিয়েছি। আর মাঝে মাঝে যে রুদ্র মূর্তি ধরতে হয় সেও তোমাদেরি জন্য তোমাদের মধ্যে যারা ভাল, যারা আমার প্রিয়তমকে ভালবাসো তাদের শত্রু সংহার করে তা'দিগকে বাঁচিয়ে রাখবে কে ? আমার মাঝে মাঝে তোমাদের জন্য ভারি দুঃখ হয় ; তাই অনেক সময় সকলে ঘুমুলে বুকফাটা কান্না রোধ করতে পারি না। অমৃতের পুত্র হয়ে তোমরা অনেক সময় এমন অকাজ কুকাজ করে বস, তার জন্য প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। তাই তোমাদের শিয়রে বসে বসে কাঁদি। আর যখন যুগযুগান্তরের বিরহ আকাশ ছেয়ে জমাট আঁধারের মত ঘনিয়ে ওঠে, আমার অন্তরটা তখন গভীর ব্যথায় বিদ্রোহী হয়ে যায়। ইচ্ছে করে সব ধ্বংস করে ফেলে আমরা নূতন করে সোনার সংসার গড়ে তুলি। তাই কখনও উন্মত্তের মত হাসি, আবার কখনও অবিরাম হা-হা শব্দে ছুটে বেড়াই। কিন্তু যাই করি-না-কেন তোমরাই আমার সব, একথা কখনও ভুলি নি। তোমাদের মধ্যেই যে আমি আমার প্রিয়তমকে পেতে চাই ! তাইত যুগে যুগে আমি তোমাদের কাছে তাঁরি নাম গেয়ে তোমাদের সেবা করে তোমাদিগকে দেবতা গড়ে তুলতে চাই। শীতের হিমজর্জর কাতর প্রাণে তাইত বসন্তে। সুখস্পর্শ জাগিয়ে তুলি, কোকিলের কোমলকণ্ঠের অমিয় ঝঙ্কার তোমাদের

কাণে এনে দিই, কুঞ্জে কুঞ্জে বিচিত্র বর্ণের কুসুম ফুটিয়ে তুলি। গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ তৃষিতকণ্ঠে, বর্ষার শীতল স্ফটিক ধারা ঢেলে দিই। তোমাদের জীবন আশা-আনন্দে-ভরে তুলবার জন্যই শরতের নীলাকাশের শুভ্রমেঘখণ্ডগুলোকে চারদিকে বয়ে নিয়ে গিয়ে নূতন করে সাজিয়ে দিয়ে ধরণীর কঠিন বক্ষকে শ্যামতৃণে সোনার শস্য ভরে দিই।

কবে তোমরা আমার সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে আমার সেই প্রিয়তমের গান গেয়ে উঠ্‌বে, আমি তারি প্রতীক্ষায় চিরদিনই গেয়ে চলেছি।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (বি-এল)

বসন্তে

বিশ্বের উৎসবে এই চির আনন্দ উৎসবে
আহ্বান মোর নাহিরে
প্রবাসী অচেনাসম ম্লানমুখে বসি ঘর-কোণে
চেয়ে থাকি শুধু বাহিরে।
নির্জ্জনে দেখে এনু পাহে-চলা পল্লী-পথে-পথে
ফাগুনের মহারাণী চলে গেছে স্বপনের রথে।
আমের মুকুল-মাঝে জেগে আছে তারি মুখখানি
সজিনার ঝরা ফুলে বায়ু সদা করে কানাকানি ;—
আশাভরে দেবদারু মেলি শত রাঙা কচি পাতা
পথে তার আছে চাহিরে।
দেখা বুঝি পেল নাহিরে।

তালিমের কচি শিশু আঁখি-মেলা কুঁড়ি বুকে বুকে
শিমুলের সবুজ শাখায়
ফাগুনের হোরি দিনে গৃহ ছাড়া গোপিনীরা সবে
একমনে আবির মাখায়।
অশোকের ডালে ডালে কাছ আজ ছুড়িছে পিচ্‌কারী
অশথের পাতায় পাতায় রাধিকার উড়িতেছে শাড়ী।
বাউবনে বাজে বেণু বুঝি তাই বাতাস উতলা
কুহুস্বরে কেঁপে ওঠে কি সে-কথা হয়নি যা-বলা।
অ-ফুট যূথীর বনে কার লিপি বয়ে আনে
প্রজাপতি রঙিন পাখায়।
পেয়ারায় হলুদ শাখায়।

বন্দে আলী।

"বড়াম" ও "বিশালাক্ষী"

আমি নিজেকে হিন্দু বলি, কাজেই প্রচলিত বিশ্বাস মতে আমার পূজ্যই দেব-দেবীর সংখ্যা হওয়া উচিত তেত্রিশ কোটী। দুর্ভাগ্য, কখনও তেত্রিশ কোটীর পুরো তালিকা দেখবার সুযোগ হয় নি। সে যাই হউক, যে কয়টি দেবতা আমাদের নিত্যজীবনে সকল থেকে বারো মাসে তের পার্ব্বনের অধিষ্ঠাতা বা অধিষ্ঠাত্রী হয়েছেন তাঁরা সবগুলিই প্রায় ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণের শ্রেণীর প্রদত্ত নৈবেদ্যোপচারে ব্রাহ্মণের দ্বারাই পূজিত হয়ে ইতিহাসের আগে জন্ম হওয়ায় আমাদের নিজস্ব বলে বনেদী হয়ে গেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস এদের মধ্যে এমন অনেকগুলি আছেন যাঁরা হয়ত অন্য কোন সম্প্রদায় থেকে আমাদের ভিতর ক্রমে এসে কৌলিন্য লাভ করেছেন হয়ত বা কেউ বিপদের সময় পরিত্রাতারূপে আবির্ভূত হয়ে এখন বনেদী দেব-দেবীদের সঙ্গে এক পর্য্যায়-ভুক্ত হয়ে গেছেন।

আজ আমি আপনাদের কাছে দু'টি দেবীর আখ্যান বিবৃত করবো, যাঁরা সবে আমাদের পূজা পেতে সুরু করেছেন। এখনো পাঁজিতে দিন দেখে সংস্কৃত শ্লোকে মূর্ত্তিরূপ ছন্দোবদ্ধ করে একমাত্র পুরোহিত ব্রাহ্মণের দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রে পূজা আবদ্ধ রাখেন নি।

"বড়াম" পূজা

বড়াম ঠাকুর একটি বনদেবী। এই বনদেবী ক্রমে বন থেকে সহরের দিকে এগুতে সুরু করেছেন। তবে সহরে এখনও পাকা হয়ে বসেন নি। পৌষ-সংক্রান্তির পরদিন রাত্তের অন্ধকারে পথে মাঠে উৎসব-লোলুপ কিশোরদের কাছে পূজো-নিয়েই সারা বছরের মত সহর থেকে অন্তর্হিতা হন। ওঁর আদিম বাস যেসব বন-প্রদেশে সেখানে উনি সম্পদে-বিপদে উৎসবে-দুঃখে বিপত্তারিণী ও আনন্দদায়িনীরূপে পূজা পান, সহরে এখনও বিপত্তারিণী পদ গ্রহণ করতে পারেন নি।

এই মেদিনীপুর জেলায় ও সিংভূম জেলায় এই দেবীর পূজার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। অধুনা যদিও উনি এতদঞ্চলের জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সব হিন্দুকেই ওঁর পূজায় দীক্ষিত করেছেন, কিন্তু মূলে উনি ছিলেন লোধা, খাড়িয়া ও শাবর জাতিরই একমাত্র পূজ্যা দেবী। বনে উপজাত মধু, লাহা, ধূপ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও মহনা, বুলবুল, বৌ কথা-কও প্রভৃতি পাখীর বাচ্চা সংগ্রহ ও বিক্রয় করে এই জাতিরা জীবিকানির্ব্বাহ করে। বনদেবী বড়াম ঠাকুরের কৃপা হলে এদের সারা বছর কোন কষ্ট হয় না। স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহের দ্রব্যসংগ্রহ হয়।

বিশেষতঃ এই জীবিকানির্ব্বাহের উপকরণ সংগ্রহের জন্য এরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সারাদিন বনে ঘুরে বেড়ায়। বড়াম দেবী প্রসন্না থাকলে বন্য হিংস্র জন্তুর কাছে কোন ভয়ের কারণ থাকে না।

এই জাতিরা সর্ব্বদা অন্য জাতি থেকে স্বতন্ত্রভাবে বাস করবার চেষ্টা করে। যেখানে কোন একঘর থাকে সেখানে গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করে। এই পল্লীর ভিতর যারা লোধা জাতির অন্তর্ভুক্ত তারা দেবীর আস্তানার জন্য একটি শাল গাছের তলা নির্দ্দিষ্ট রাখে। তার তলায় দেবীর কোন মূর্ত্তি বা প্রতিনিধি প্রতীক্ রূপে থাকে না। চিহ্ন যা দেখা যায় ভক্তের মানসিক দেওয়া মাটির তৈরী হাতী ঘোড়া। এই অমূর্ত্ত দেবী ঘটরূপে আবার পূজা পান এই লোধাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুসভ্য পাতর জাতির আয়োজনের কাছে এঁর মূর্ত্তির চরম বিকাশ হয়েছে। সহরে এসে শিক্ষিত পূজকবর্গের কল্পনা প্রভাবে বিশেষ আকার পেয়েছেন। এই মেদিনীপুর সহরেই রাস্তার মাঝে মাঝে ওঁর মূর্ত্তি তৈরী আছে দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে শুধু স্কন্ধ দেশের উপরটুকু তৈরী আছে অর্থাৎ bust আছে, সেখানে মুখখানি লালরঙের, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় এক ফুট কল্পিতা অতি মানবীয় মুখের মত বিরাট, চোখ দুটিও তদনুরূপ, ওষ্ঠদ্বয় ভীষণ পুরু। কোথাও আবার উনি পুরাণোক্ত দেবীদের মত পূর্ণাঙ্গী। আমি এইখানেই একটি মূর্ত্তি দেখেছি, তার দুটি পা, চার হাত, মুখ চোখ ঠোঁট সবই সঠাম। কিন্তু রং হলদে আর একটি বিশেষত্ব এই যে দেবী সভ্য শিক্ষিত সমাজে এসে পুরাণের দেবীদের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য করবার চেষ্টা করলেও পরবার বস্ত্রখানিতে বন-দেবীত্বের ছাপ রয়ে গেছে। মাল-কোঁচা-মারা, বুকের উপর দিয়ে বীরাঙ্গনা-বেশের বস্ত্র-বন্ধনী। এই সহরেই কিন্তু আবার কোন কোন আদিম জাতির পল্লীতে ইনি এখনও অমূর্ত্ত। কেবল নৈবেদ্যোপচারের মাটির হাতী ঘোড়াই দেবীর স্থিতি-স্থাপকতা সেই প্রদেশে জ্ঞাপন করে।

এই দেবীর বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠান পৌষ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সুরু হয়, সংক্রান্তির দিন বা ১লা মাঘ পূজার শেষ।

এই শালগাছের তলায় দেবীর পূজা সাধারণতঃ লোধা জাতির যারা, তারাই করে থাকে। পাতর জাতির লোকেরা এই দেবীকে বনের শালতলা থেকে বাড়ীর আঙ্গিনার তুলসী-তলা পর্য্যন্ত প্রমোশন দিয়েছে—পূর্ব্বে বলেছি অমূর্ত্ত থেকে ঘটে অধিষ্ঠান করিয়েছে। শুধু ঘট নয় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মত তিনটি করে ঘট মণ্ডপ তৈরি করে মাঙ্গলিক চিহ্ন-স্বরূপ কলাগাছের বেষ্টন দিয়া স্থাপন করেছে। খাড়িয়াগণের পূজা লোধাদের পূজার মতই প্রায়—তফাৎ খুব কম।

লোধাদের পূজা আবার বৎসরে দুইবার। ১বার ঐ ১লা মাঘে পৌষ-সংক্রান্তির পর আর একবার ভাদ্র মাসে। পৌষ সংক্রান্তির পর যে পূজা তাতে মুরগি পাঁটা বলি দিয়ে পূজা শেষ হয়, কিন্তু ভাদ্র মাসের পূজায় কোন জীববলি হয় না, কেবল আগে চাউল গুড় ও ঘি-এর একত্রে পিণ্ড প্রস্তুত করে, তুলসীপাতা একটা করে উপরে দিয়ে পূজা শেষ হয়। এই সঙ্গে

বনজাত তসরগুটী ও সাময়িক ফল মূলও অর্ঘ্য দেয়। ওদের নাকি বিশ্বাস, বনজাত দ্রব্য অগ্রে দেবীকে অর্ঘ্য না দিয়ে গ্রহণ করলে বড়াম দেবীর রোষে বনে ত সেবার কিছুই মিলেই না, অধিকন্তু বনা হিংস্র জন্তুদের কবলে পড়ে বংশের কেউ বাঁচে না। লোধারা এই পূজা উপলক্ষ্যে কোন নাচ-গানের আয়োজন করে না। কিন্তু পূজার দিন জঙ্গলে প্রবেশ করা একেবারে ধর্ম্মনীতি-বিগর্হিত বলে মনে করে।

পাতর জাতির যারা তারা কোন শুভ বিশুভে মানত করা পূজা বাদে সাধারণতঃ বছরের ঐ পৌষ-সংক্রান্তির পরেই পূজা করে থাকে। পূর্ব্বে বলেছি পূজা হয় বাড়ীর আঙ্গিনায় তুলসীতলায়. কলাগাছ-ঘেরা মণ্ডপের উপর তিনটী ঘট স্থাপন করে। সমস্ত রাত্রি নৃত্য সঙ্গীতে অতিবাহিত করে প্রাতে পাঠা মুরগী বলি দিয়ে পূজা শেষ করে। নৈবেদ্যোপচারে সাধারণতঃ থাকে পাঠা, মুরগী, পায়রা বাচ্চা আর সাধ্যিক গুড় আতপ চাল।

এই কয়টি জাতির নাক বড়ামই একমাত্র উপাস্য দেবী, আর কোন দেব-দেবীর বা তেত্রিশ কোটীর বালাই নেই। ওরা দেবীর এমন ভক্ত যে কোন বড় শিকার আগে বড়াম দেবীর কাছে অর্ঘ্য দিয়ে তবে অপরকে ছুঁতে দেয়।

এদের ভিতর পূজক থাকে এদেরই জাতির মোড়লদের মধ্যে একজন, তবে সহরে এসে বড়াম্ দেবী এখন পুরোহিত ব্রাহ্মণের পূজার অধিকার লাভ করেছেন।

এই দেবী হিন্দু দেবীদের পর্য্যায়ে খুব শীগ্‌গির-যাবেন বলেই মনে হয়, কেন-না ইতিমধ্যে ইনি এই সহরের অনতিদূরবর্ত্তী গোপ-পাহাড়ে "গোপনন্দিনী" আখ্যা নিয়ে মন্দিরে মূর্ত্তিমতী। নিত্য ব্রাহ্মণ পূজকের দ্বারা চাল, ফল, মূল উপচারে পূজিতা হয়ে থাকেন।

"বিশালাক্ষী" পূজা

আর একটি বনদেবীর কথা বলি। ইনি মেদিনীপুরের না হলেও সাধারণতঃ সুন্দরবন অঞ্চলে মেদিনীপুরবাসীর দ্বারা পূজিতা হন। এঁর নাম বিশালাক্ষী দেবী। সাধারণতঃ এঁর পূজা সুন্দরবন অঞ্চলেই হয়ে থাকে। ইনি সুন্দরবন অঞ্চলের বনদেবী, বাঘ-কুমীর নাকি এঁর অনুগত প্রজা।

এই দেবী অধুনা কোথাও কোথাও একেবারে ইমারত মন্দিরে স্থান পেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই খানিকটে ফাঁকা অনুর্ব্বর পতিত জায়গাই এঁর বাৎসরিক পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এই পতিত জায়গার কোথাও কোথাও আবার একখানি করে খড়ের ঘর আছে এবং তার ভিতর সেই বাৎসরিক পূজার উৎসব প্রতীক্ষায় পাথর রূপে বারোমাস বিরাজ করেন। যেখানে ইমারত মন্দির—সেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আড়ম্বরের অভাব নাই। সেখানে তিনি শীতলা কালীর মত পুরাদস্তুর দেবী।

এঁর পূজার বিবরণীর আগে বাহ্যবস্তুর কথা বলব। বেশীর ভাগ জায়গাতেই ইনি হস্ত-পদ-বিহীন মুখখানি বাদামী বা ডিম্বকৃতি (oryal) মুখের সব অংশটুকু সিঁদুর দিয়ে রঙান

দুই চোখ খুব বড়, কাজল দিয়ে কালো করা। কোনটিতে নাকের একটি রেখা আছে, কোনটিতে সে বালাই নাই। চোখদুটি মুখের তুলনায় অতি বেশী আয়ত, অতি বেশী উজ্জ্বল, এই অবয়ব পূজা হয়ে থাকে সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত খড়ো ঘরে অথবা অনাবৃত পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট পতিত স্থানে। যেখানে খড়ো ঘরে দেবী পাথররূপে বিরাজমান সেখানে উৎসবে সিন্দুর রঙের কলি ফেরান হয় মাত্র। যেখানে দেবীর বাস কারুকার্য্যময় ইমারত মন্দিরে, সেখানে দেবীর অবয়বও সুঠাম। কেবল চোখদুটী যেন সব মূর্ত্তির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের মত দেহ-সেষ্টবের অনানুরূপ বিশাল ও উজ্জ্বল। দেবীর রঙ এখানে আর সিন্দুর দিয়ে রঙান নয়—একেবারে সিন্দুরের মত লাল।

পূজা—দেবীর পূজার বৈচিত্র্য সার্ব্বজনীন প্রথায়। কি মন্ত্র, কি নৈবেদ্যোপচার, কি পূজক কি পূজার পদ্ধতি, ভক্তের ভক্তি প্রীতিও জাতি-প্রথানুসারে, হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ থেকে সুরু করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণী হাড়ি চণ্ডাল পর্য্যন্ত। এদিকে আদিম জাতিদের মুণ্ডা সাঁওতালরা সকলেই দেবীর পূজা করে। এমনও শুনি মুসলমানেরাও কেউ কেউ এই দেবীর পূজা সুন্দরবনে করে থাকেন। যেখানে হিন্দুদের তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীরা পূজার আয়োজন করেন সেখানে পূজক সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, নৈবেদ্যোপচার চাল-কলা-মুন, কেউ কেউ ছাগবলি দিয়ে থাকেন। পূজার মন্ত্র ও পদ্ধতি বসন্ত-কলেরাদি সংক্রামক রোগের সময় গ্রাম্য শীতলা দেবীর পূজার পদ্ধতি ও মন্ত্র। তবে একটি জিনিষ চাই-ই, সেটা হচ্ছে ঢাকের বাদ্য। কোথাও কোথাও এ-প্রথাও প্রচলিত আছে যে পূজার প্রসাদের অগ্রভাগ ঢাকের বাদ্যকরের প্রাপ্য। কোথাও আছে সেই বনের শীকারীর প্রাপ্য—আর কোথাও সে-প্রথা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের ভিতর বা সাঁওতালদের ভিতর পূজক হয় দলের সর্দ্দার এই সব দলের লোকেরা সাধারণতঃ সুন্দরবনঅঞ্চলে লাটদারদের জঙ্গল কাটাই করতে কিংবা চাষ আবাদ করতে গিয়ে থাকে। কাজেই ওদের পূজা বাৎসরিক নয়। এ জঙ্গল কাটাইএর ঠিক আগে একবার, আর যদি জঙ্গল কাটতে বছরের বেশী লাগে তবে বছরে একবার যতদিন না জঙ্গল কাটার কাজ শেষ হয়। এদের নৈবেদ্যোপচারেই বেশীর ভাগ জীববলি থাকে—সাঁওতালদের "পচাই" ও পাওয়া যায়। মন্ত্র, দলের সর্দ্দার বিশেষভাবে গুহ্য রাখেন, প্রকাশ করলে তাঁর সর্দ্দারপদের সম্মানটুকু যায়। মুসলমানেরাও নাকি কোথাও কোথাও সিন্নি দিয়ে থাকেন—এই বাঘ-কুমীরের দেবীটিকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলি, আমার জনৈক আত্মীয় সুন্দরবন অঞ্চলের একটি লাটের লাটদার, তিনি তাঁদের লাটের জঙ্গল কাটাইবার সময় যথা-প্রচলিত পূজা না করে কুলি দিয়ে কাজ সুরু করলেন। কয়েকদিন কাজ চলার পর হঠাৎ একটি বাঘ একটি কুলির প্রাণনাশ করে। পরদিন সব কুলিই ধর্ম্মঘট করলে যে বিশালাক্ষী পূজা না করলে তারা আর এ জঙ্গল কাটবে না। তখন সেই লাটদারকে বাধ্য হ'য়ে পূজা করতে হ'ল। এ ঘটনা আমার তাঁরই

কাছে শোনা। এই শুনে মনে হয় প্রাণের ভয়ে সেই বাঘ-কুমীরের দেশে বান্ধবহীন মুসলমান বন্ধুদের পক্ষে এই বিপৎহারিণী দেবীর পূজা অসম্ভব নয়। যে সম্প্রদায়ই যেমন ভাবে থাকে পূজক করেই পূজা করুন না কেন, ঢাকের বাদ্য অবশ্যবর্জনীয় উপকরণ।

এই পূজা সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে কোন নূতন জঙ্গল কাটাবার প্রারম্ভে—কোথাও বাৎসরিক পূজা, কোথাও নিত্যপূজাও দৃষ্টিগোচর হয়। নিত্যপূজা আমি ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার কাকদ্বীপের একটি মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দেখেছি। বাৎসরিক পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট খড়োঘর ও পাথররূপে দেবী আমি J. plotএর রাইগোবিন্দপুরে দেখেছি। আর জঙ্গল কাটাবার প্রারম্ভে পূজা করা এ যে-কোন লাটে গেলে বিস্তৃত বিবরণ শোনা যাবে।

এই পূজার আরম্ভের ইতিবৃত্ত যেভাবে কোথাও কোথাও কিম্বদন্তীরূপে প্রচলিত, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

সুন্দরবন অঞ্চলের "বুড়াবুড়ীর তট" বা "ধোবলাট" উর্ব্বরতার জন্য খুব প্রসিদ্ধ। অনেক পূর্ব্বে আবাদের চেষ্টা হয়েছিল। এই অঞ্চলে বাঘ কুমীরের দৌরাত্ম্য নাকি ছিল খুব বেশী, যারা প্রথম জঙ্গল কাটাবার চেষ্টা করে তাদের লোক নষ্ট হয় এত বেশি যে জঙ্গল কাটানর কাজ চালান অসম্ভব হ'য়ে উঠে, লাটদার অর্থাৎ জমির মালিক যখন এমনই ভাবে বিপন্ন তখন একদিন গভীর রাতে হঠাৎ বনের মাঝ থেকে এক দূরাগত মনোমুগ্ধকর বংশী ধ্বনি শুনতে পান। প্রতিদিন এমনি শুনা যায় অথচ এটা নিশ্চিত সেই বনে কোন জন-মানবের অস্তিত্ব নেই। একদিন সহসা রাত্রে ঐ মালিক স্বপ্ন দেখেন যে ঐ বনের বনদেবী তাঁকে পূজা প্রচলন করবার আদেশ দিলেন।' আর তাঁর নাম "বিশালাক্ষী" দেবী বলে' গেলেন। সেই থেকে নাকি এই পূজার প্রচলন চলে আসছে।

এই দেবী এখনও মাস পত্রিকায় পূজার একটি দিন দাগতে পারেন নি, এখনও সর্ব্বত্র বিশাল দুটি আঁখি ওঁর "বাঘের দেবী বিশালাক্ষী," নাম ও পদের সার্থক করেছে। এখনও মন্ত্রের কোন গ্রন্থ এঁর জন্যে তৈরি হয়নি।

অন্যান্য জেলার চেয়ে মেদিনীপুরের একটি বিশেষত্ব যে বালেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে উৎকলবাসীরা এসে তাঁদের ধর্ম্ম, আচার, নীতি ও সিংভূম আদি অঞ্চল থেকে আদিম জাতিরা এসে তাদের পূজা উৎসব আর একদিক থেকে বাঙ্গালীরা তাঁদের পাল-পার্ব্বণ সব এই মেদিনীপুরের বাসিন্দারূপে একত্রে সম্পন্ন করেছেন। তার ফল হচ্ছে বাঙালীরা ওঁদের আচার পূজা উৎসব আদি নিয়ে নিজেদের পাল-পার্ব্বণের পর্য্যায়ভুক্ত করছেন ও নিজেদের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে সংস্কৃত করছেন। পক্ষান্তরে উৎকলবাসীরা আদিম অধিবাসীরা বাঙালীর সংসর্গে এসে তাদের পূজাচারকে রূপান্তরিত করছে। এই যে আচার-রীতির ত্রিধারা এ একদিন ইতিহাসের ও ধর্ম্মাদির বিবর্ত্তনবাদের এক অধ্যায় হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তাই যত্ন করে আমাদের জেলার এই দুইটি দেবী পূজা অধুনা প্রচলিত দেখে সংগ্রহ করেছিলাম আপনাদের কাছে পাঠ করলাম এই আশায় যে আপনারা সুধী

আপনাদের কোন বৃহৎ চেষ্টায় আমার এই দীন প্রচেষ্টা যদি ক্ষুদ্র প্রয়োজনেও লাগে আর তা যদি না হয় তবুও আশা করি—আপনারা আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন এই মনে করে, যে আপনাদের এই দিবসব্যাপী সাহিত্যের গভীর গবেষণার পর আমার এই লেখা দিয়ে আমার দেশের দুটি বনদেবীর ইতিবৃত্ত গল্প করলাম।

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়। —(এম-এস্-সি, বি-এল্)।

———

অজ্ঞাত ইচ্ছা

(মনো-ব্যাকরণ বিদ্যা বা সাইকো-এনালিসিস)

মনোব্যাকরণবিদের কাজ,—মনের অজ্ঞাত ইচ্ছার অনুসন্ধান করা। যে ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের বাহিরের মন কিছুই জানে না। মনোব্যাকরণের ফলে দেখা যায় অজ্ঞাত ইচ্ছার বশে চালিত হইয়া, আমরা অনেক সময় নানা প্রকার কাজ করিয়া থাকি। এই সকল অজ্ঞাত ইচ্ছার অস্তিত্ব ধরা সহজ নহে। সোজাসুজি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে ইহাদের সন্ধান মেলে না। কি কি লক্ষণের দ্বারা অজ্ঞাত ইচ্ছার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব এখানে তাহারই আলোচনা করিব। আমাদের মনের অন্তস্তলে নানা অবৈধ ইচ্ছা সততই বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখনই এই অবৈধ ইচ্ছা মনের উপর আধিপত্য লাভ করে, তখন আমরা নানারূপ অন্যায় আচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু সমাজ—শাসন, নৈতিক ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রহরীর কাজ করে বলিয়া, অনেকের মনেই অসামাজিক ইচ্ছা গুলি ফুটিবার সুবিধা পায় না; তখন এই সকল ইচ্ছা মনের গভীর স্তরে রুদ্ধ থাকিয়া যায়। রুদ্ধ থাকিলেও তাহারা কিন্তু সুযোগ পাইলেই মনের প্রহরী বিবেক ও ধর্ম্মজ্ঞানাদি অতিক্রম করিয়া আমাদের তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। এরূপ ক্ষেত্রে কৃতকর্ম্মের আসল কারণটি অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। এই কারণে কর্ম্মকর্ত্তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়া কার্য্যের কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব।

ডিটেক্‌টিভ গল্পে চুরি বা খুন, করিয়া আসামী আত্মগোপন করে। কিন্তু তাহাকে কেহ খুন করিতে না দেখিলেও, ঘটনার বিশ্লেষণ দ্বারা ((circumstantial evidence) সুদক্ষ গোয়েন্দা যেমন অপরাধীর সন্ধান করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন; মনোব্যাকরণবিদ্‌ও ঠিক সেইরূপ অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া অজ্ঞাত অসামাজিক রুদ্ধ ইচ্ছাগুলির অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন। কর্ম্মকর্ত্তা যখন বুঝিতে পারেন যে তিনি এইরূপ ইচ্ছার বশে কার্য্য করিয়াছেন, তখন আর সে ইচ্ছাকে অজ্ঞাত ইচ্ছা বলা চলে না। অজ্ঞাত ইচ্ছার আলোচনাই মনোব্যাকরণের বিষয়। যে ইচ্ছা মনে পরিস্ফুট আকারে থাকে, তাহার আর মনোব্যাকরণের প্রয়োজন থাকে না। চোর ধরা পড়িলে ডিটেক্‌টিভের সাহায্য অনাবশ্যক; তখন সাধারণ পুলিশই তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

চোর যেমন তাহার কৃত কর্ম্মের সূত্র পশ্চাতে ফেলিয়া যায়, অজ্ঞাত ইচ্ছাগুলি ও সেইরূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনায় আপনাদের ছাপ রাখিয়া যায়। কেহ মনে একভাব পোষণ করিয়া বাহিরে অন্যরূপ আচরণ করিলে, তাঁহার সেই আচরণের মধ্যেই যেমন সময় সময় প্রকৃত

মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞাত ইচ্ছার আভাষ অনেক সময় আচরিত কর্ম্মে ধরা পড়ে। ভিতরের মনে চুরি করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আমি যে ইচ্ছার অস্তিত্ব জানিতে পারিব না। এরূপ ক্ষেত্রে চুরির ইচ্ছা সর্ব্বদাই মনে ফুটিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু আমার বিবেক ও ধর্ম্মজ্ঞান তাহার প্রবল অন্তরায় হইল। ফলে মনের মধ্যে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। চুরি—ইচ্ছা যাহাতে কোনরূপে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারে, তাহার জন্য আমার মন সদাই সতর্ক থাকিবে। চোরের ভয় হইলে বাটীতে যেমন প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, সেইরূপ আমার মনের মধ্যেও তখন প্রহরীর শক্তি বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে,—আমি সকল বিষয়েই অতিমাত্রায় সাধুতা অবলম্বন করিব। বাহিরের মনে এই সাধুতার বর্ম্ম থাকায়, ভিতরের চোর কখনই তাহা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারিবে না। চোরের ভয়ে, রাস্তার ধারের দোকান গুলিতে সকল দোকানদারই রাত্রে তালা লাগাইয়া থাকে। যে দোকানের দরজায় যত বেশী তালা বুঝিতে হইবে সেই দোকানের অধিকারীর চুরির ভয় তত বেশী। বাঙ্গালার প্রবাদ আছে,—'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ,' মনে কোন একটি ভাব অতিমাত্রায় বর্ত্তমান থাকিলে তাহার বিরুদ্ধভাব যে অজ্ঞাতমনে থাকিতে পারে,—এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। অজ্ঞাত ইচ্ছা চাপিবার জন্যই প্রবল প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন। কিন্তু কেবলমাত্র একটি প্রমাণের বলে অজ্ঞাত ইচ্ছার অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করিতে না যাওয়াই ভাল। মনে চুরির ইচ্ছা অজ্ঞাত থাকিলে, অন্যান্য লক্ষণ ও প্রকাশ পাইবে।

মনে সাধুতা ও চুরি-ইচ্ছার দ্বন্দ্ব থাকায় আমার অবস্থাটা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণের মতই হইবে। আমি কার্য্যে সাধু হইবার চেষ্টা করিলেই আমার অজ্ঞাত চুরি ইচ্ছা বাধা দিবে। আবার চুরি ইচ্ছা মনে ফুটিবার চেষ্টা করিলে সাধুতা আসিয়া বিরোধ বাধাইবে। সুতরাং আমার অতিরিক্ত সাধুতার আগ্রহ কেবল মৌখিক ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইবে,—কার্য্যতঃ আমি সাধু হইতে পারিব না। অতএব যাহার সাধুতার বাহ্যাড়ম্বরই সার,—কাজে সাধুতার কোন পরিচয় নাই তাহার মনে চুরি ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে অনুমান করা যাইতে পারে। পাছে ভিতরের চোরটা বাহিরে আসিয়া গোল বাধায়, এই ভয়েই আমি সদা সশঙ্কিত থাকিব, ঘুণাক্ষরে কেহ আমার সাধুতায় সন্দিহান হইলে, দারুণ মানসিক অশান্তি ভোগ করিব। অমন চোরকে কেহ সন্দেহ করিলে সে বাহিরে সাধুতা দেখাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয় ও রাগের ভাণ করে। প্রকৃত সাধুই চুরির অপবাদ অগ্রাহ্য করিতে পারেন। যে নিজেকে চোর বলিয়া জানে, চোর অপবাদের জন্য বাহিরে সে রাগ দেখাইলেও আসলে কিন্তু তাহার মনোকষ্ট হয় না। চুরি ইচ্ছা মনে অজ্ঞাত থাকিলেই, চোর অপবাদে মানসিক অশান্তি হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইরূপ অজ্ঞাত চুরি ইচ্ছা আমাকে সদাই সন্ত্রস্ত রাখিবে। এই কারণে, "অসাধু" বদনামের ভয়ে আমি সতত অতি মাত্রায় সতর্ক থাকিব। কোন বন্ধুর নিকট কোন কারণে এক পয়সা ধার লইলেও যতক্ষণ না তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিব ততক্ষণ মন ছট্‌ফট্ করিবে।

নিজের টাকা কড়ির হিসাব পত্রেও এক পয়সার গরমিল হইলে, মনে দারুণ উদ্বেগ হইবে। আমার এক উকিল বন্ধু আছেন; তিনি বাজার করিয়া আসিয়া যদি হিসাবে এক পয়সা গরমিল দেখেন তবে যতক্ষণ না হিসাব মেলে ততক্ষণ তাঁহার আহার নিদ্রা ত্যাগ। এক পয়সার হিসাব মিলাইতে গিয়া তিনি দুই চার ঘণ্টা মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া থাকেন।

ভিতরের চোরটা পাছে বাহিরে ধরা দেয়,—এজন্য চুরি ব্যাপারটাই আমার কাছে অতি ঘৃণ্য বোধ হইবে। চোরের উপর আমার বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিবে, সেই সঙ্গে পাছে কেহ চুরি করে এই চিন্তাই সর্ব্বদাই মনকে পীড়ন করিবে।

উপরের বিবরণ হইতে মোটামুটি বুঝা গেল যে, ভিতরে চুরির ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিলে, বাহিরে অতিরিক্ত সাধুতা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু সে সাধুতা মৌখিক মাত্র,—কার্য্যে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে না। "অসাধু" অপবাদের ভয়ে মন সদাই সশঙ্কিত থাকিবে, এবং কেহ এরূপ বদনাম দিলে মনে দারুণ অশান্তি আসিবে, চুরি জিনিসটার উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিবে, এবং চোরকে ক্ষমা করিবার উদারতার অভাব হইবে। এই লক্ষণগুলি চুরি ইচ্ছা চাপিবার ফলে প্রকাশ পাইয়াছে। অজ্ঞাত চুরি-ইচ্ছা যে সকল সময়ে এইরূপ রুদ্ধ রাখা যায়, তাহা নহে। সময়ে সময়ে নানাপ্রকার কার্য্যের মধ্য দিয়া এই রুদ্ধ ইচ্ছা আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চুরি—ইচ্ছা সোজাসুজি ভাবে ছুটিতে গেলে তাহার পথে অনেক বাধা; অগত্যা তাহাকে প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া ছদ্মবেশে বাহির হইতে হয়। বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়া, এইরূপ রুদ্ধ চুরি-ইচ্ছার বশে আমি অন্যমনস্ক ভাবে তাঁহার ছুরি কাঁচি বা পেন্‌সীলটা পকেটে করিয়া লইয়া আসিব। ট্রামে চড়িয়া টিকিটের পয়সা ফাঁকি দিব, আর মনকে বুঝাইব যে, ট্রাম কোম্পানী লোকের সঙ্গে বড় দুর্ব্ব্যবহার করে, সুতরাং তাহাকে ঠকানই উচিত। আফিস হইতে কাগজ পেন্‌সিল নিজের ব্যবহারের জন্য বাড়ীতে আনিব, এবং লোককে বলিব,—এ সকল জিনিষে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কেন না গবর্ণমেণ্টে আমাদের পয়সাতেই চলিতেছে। চোরের গল্প শুনিতে বা পড়িতে ভাল লাগিবে; বায়স্কোপে চুরি ডাকাতির চিত্র দেখিলে চোর ডাকাতের দিকেই সহানুভূতি যাইবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, আমার রুদ্ধ-চুরি-ইচ্ছা আমাকে অজ্ঞাতভাবে নিজ পথে চালিত করিয়াছে। কেহ যদি বুঝাইতে যান যে ভিতরের চুরি-ইচ্ছাই আমাকে আফিসের ছুরি ঘরে আনাইতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, তাহা হইলে তখনই আমি তর্ক দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে সচেষ্ট হইব। অজ্ঞাত ইচ্ছার বিশেষত্ব এই, সহজে আমরা তাহার অস্তিত্ব মানিতে চাই না, এবং বহু যুক্তি তর্কের সাহায্যে মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে অন্য কোন কারণ বশে কোম্পানীর জিনিষ ঘরে আনিয়াছি। মনোব্যাকরণশাস্ত্রে এইরূপ যুক্তির একটা বিশেষ আখ্যা আছে। ইহাকে আমরা Rationalization বা 'যুক্ত্যাভাস' বলিয়া থাকি। মনোব্যাকরণের সময় এই যুক্ত্যাভাস কখন কখন বিষম অন্তরায়রূপে উপস্থিত হয়। তর্কের দ্বারা এরূপ যুক্ত্যাভাস খণ্ডন করিতে পারিলেও, বিশ্বাস বা মত পরিবর্ত্তন করা যায় না। যে

ব্যক্তি রুদ্ধ-ইচ্ছা কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে, তাহাকে রুদ্ধ-ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝান সহজ নহে। রুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝাইতে হইলে এক এক সময় বাল্যঘটনার আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। শৈশবে অনেক অন্যায় ইচ্ছাই সোজাসুজি প্রকাশ পায়; সেই সকল ঘটনা মনে আসিলে রুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্ব মানিতে আর তত্তটা বাধা থাকে না। ইহা এক বিচিত্র ব্যাপার সন্দেহ নাই। তর্কের দ্বারা হয়তো কাহাকেও বুঝান গেল না যে সে ব্যক্তি চুরির উদ্দেশ্যেই আফিসের ছুরি ঘরে আনিয়াছে, কিন্তু যদি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায় যে, সে ছেলেবেলায় কাহারও দ্রব্য চুরি করিয়াছিল, তাহা হইলে অনেক সময় চুরি-ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আর বাধা থাকে না। এই কারণে মনোব্যাকরণ-বিদের নিকট বাল্যজীবনের ঘটনাগুলির আলোচনা এত মূল্যবান্। হাজার তর্ক করিয়া বা বুঝাইয়া যেখানে ফল না হইবে, সেখানে ছেলেবেলার একটী বিশেষ ঘটনা স্মৃতিপথে আসিলে কাজ সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে।

রুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্বের ইঙ্গিত কত প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়াছি, এই সকল লক্ষণের কেবলমাত্র দু'একটী প্রকাশ পাইলে রুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্ব মানা হয়ত কষ্টকল্পনা বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু যখন কাহারও মধ্যে সমস্ত বা অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায়, তখন সে ব্যক্তি যে রুদ্ধ ইচ্ছাবশে চালিত হইতেছে, এরূপ অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে। আসামীকে খুন করিতে না দেখিলেও পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্যে যেমন তাহাকে সাজা দেওয়া চলে, সেইরূপ রুদ্ধ ইচ্ছা মনে না ফুটিলেও এবং কেহ তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও, উপযুক্ত প্রমাণের বলে রুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস সি, এম-বি।

কান্না :—

কান্না আর কান্না
সম্পদেরই সেরা আমার
হীরে মতি পান্না।

পারে পেশা মনের আগুন
আঁখির পেয়ালায়
দুখের সাকী বুকের মরু
তৃষারে পিলায়।

ছাতি ফাটা আকুল ব্যথা
মাতাল হয়ে লোটে
অবশ করা বিবশ প্রাণের
ক্ষুব্ধ যৌবন লোটে।

•

কান্না আর কান্না
সম্পদেরই সেরা আমার
হীরে মতি পান্না।

শ্রীঅমূল্যকুমার ভাদুড়ী।

হলধর।

(গল্প)

১

বাপ মা নাম রাখবার সময় ছেলের সম্মতির জন্য অপেক্ষা রাখেন না। তাই রামহরি কেলারাম প্রভৃতি নামের ছেলেও দেখতে পাওয়া যায়। আর ঠিক সেই কারণেই ঘোষপাড়ার হরিহর চাটুর্য্যের ছেলের নাম হইয়াছিল 'হলধর।'

হলধর কোনোকালেই সুবোধ বালক ছিল না। ছেলে বেলায় একবার ও পাড়ার ন্যায়রত্ন মহাশয় হরিহরদের বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি হলধরের পিতার সহিত কথোপকথনে রত ছিলেন। এদিকে বালক হলধর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মস্তকের শিখায় অপূর্ব্ব ক্রীড়ার বস্তু পাইয়া মাঝে মাঝে টান দিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় কি করেন? বলিলেন—"বালক বড়ই চতুর; পরে বড়লোক হইবে হে, বড়লোক হইবে।" পিতা সগর্ব্ব নয়নে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সে তোমাদের আশীর্ব্বাদ দাদা।" বালক কিন্তু চাটুবাণীতে ভুলিল না। পরে যখন যন্ত্রণা অসহ্য হইল তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন—"বলি ভায়া, আর ত পারা যায় না; একবার ছেলেটার দিকে দেখ না।" এতক্ষণ পরে পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহারের প্রতি পিতার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এবং হলধরও নিষ্কৃতি পাইল।

শুনিয়াছি, বাড়ী যাইবার সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় না কি বলিয়াছিলেন যে হলধরের নিকট তাহার চৈতন্য-লোপের আশঙ্কা ছিল।

২

বয়সের সঙ্গে হলধরের দুষ্টামি কমিবার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না; বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। তাহার জ্বালায় দিনের বেলা গাছে কাঁচা আম, পেয়ারা প্রভৃতি থাকিতে পাইত না; আর রাত্রে ব্রহ্মদৈত্যরূপী হলধর গাছের মাথায় বসিয়া পথের লোকের উপর ঢিল পাটকেল রূপ কৃপাবর্ষণ করিত।

পাঠশালেও হলধর এইরূপ কীর্ত্তি করিতে লাগিল। সব দেখিয়া শুনিয়া পিতা বলিলেন—"আর কতকাল দুষ্টামিতে কাটাবি? পড়া-শুনায় তো তোর মন নেই, না হয়, আমার যে জমিজমাগুলি আছে তাই দেখতে থাক্; তাতেও মানুষ হবি।"

হাসিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ন্যায়রত্ন বলিলেন—"আর নিজের নামও সার্থক কর্‌বি।" হলধর মুখে কিছুই বলিল না।

দিন চারেক পরে ন্যায়রত্ন মহাশয় সকালবেলায় বাড়ীর বাহির হইয়াছেন; কিছু পরে হলধরের এক বন্ধু আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"পণ্ডিতমশায়, পণ্ডিতমশায়।" ন্যায়রত্ন গৃহিণী কবাটের অন্তরাল হইতে বলিলেন—"তিনি বাড়ী নেই।"

বালক বলিল—"তাইত—ওগাঁয়ের রমেশ ভট্‌চায্যির মেয়ের কাল বিয়ে হবে। যে পুরোতকে ঠিক করা হয়েছিল তাঁর অসুখ হয়েছে, তাই ভট্‌চায্যিমশাই বড়ই বিব্রত হয়েছেন। যদি ন্যায়রত্ন মশাই অনুগ্রহ করে পৌরহিত্য করেন, ত—"

সাগ্রহে ন্যায়রত্ন গৃহিণী বলিলেন—"তার আর কি, তার আর কি; তিনি নিশ্চয়ই কাল যাবেন।"

"তবে আমি ভট্‌চায্যমশাইকে খবরটা দিই গে" বলিয়া বালক প্রস্থান করিল।

৪

পরদিন সকালবেলা ন্যায়রত্নমহাশয় পুঁথি বগলে করিয়া দুর্গানাম জপ করিতে করিতে বাহির হইলেন। অদূরে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে হলধরও যেন কি কার্য্যবশতঃ ধীরে ধীরে সেই অভিমুখে যাইতেছে। তিনি ভাবিলেন—"ছোক্‌রা কী পাজি—কিন্তু ভারি চালাক্। রমেশ ভট্‌চায্যি ত নাম ও শুনিনি, বাড়ীও চিনি না। তা হলধরকে সঙ্গে নি, অনেক কাজে লাগ্‌বে" পরে বলিলেন—"বাবা হলধর, আমার সঙ্গে যাবি? ও গাঁয়ের রমেশের মেয়ের বিয়ে হবে; তাই চলেচি।"

হলধর শুধু সংক্ষেপে বলিল—"ওঃ"।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—"রমেশ লোক ভাল, বেশ সদাচারী ব্রাহ্মণ। তবে কি না অনেক-দিন আগে এসেছিলুম, তাই তার বাড়ীটা ঠাহর হচ্ছে না। তা, বাবা, তুই যদি বাড়ীটা খুঁজে দিস্।"

হলধর বলিল—"যে আজ্ঞা।"

গ্রামে পৌঁছিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—"বাবা হলধর, এইবার একটু খুঁজে বাড়ীটা বের ক'রে দে। আমি তোর প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতে থাক্‌ব।" হলধর দূরে দুইটি লোক দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া কি বলাকহা করিয়া আসিয়া বলিল—"চলুন, ডানহাতি যেতে হবে।"

৫

এ গ্রামের প্রত্যেকের নাড়ীনক্ষত্র হলধরের জানা ছিল। সেই গ্রামের গদাধর পণ্ডিতের একটী বিবাহ যোগ্যা কন্যা ছিল; কিন্তু গরীব ও কুলীন বলিয়া উপযুক্ত পাত্র জুটিতেছিল না। অনেক সন্ধানের পর এক অশীতিবর্ষ বয়স্ক বুড়ো পাওয়া যায়, কিন্তু গদাধরের পত্নী

তাহাকেই দেখিয়া ছেলে বেগুলে জ্বলিয়া উঠেন এবং তাহার সম্মুখেই বলিয়া ফেলেন—"গরীব ব'লে কি এই ঘাটের মড়াটার সঙ্গে আমার রমুর বে' দেব? তার চেয়ে গলায় দড়ী-কলসী বেঁধে জলে ফেলে দেওয়াও ভাল।" বেয়াতিক দেখিয়া বর চম্পট দেয়।

কাল পঞ্চানন (হলধরের সেই বন্ধু) আসিয়া বলিয়া গিয়াছে যে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যুবা বর পাওয়া গিয়াছে। সে আজ আসিবে এবং আশীর্ব্বাদও হইয়া যাইবে। গৃহিণী হৃষ্টমনে এই বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

এদিকে হলধর ন্যায়রত্নমহাশয়কে লইয়া এই বাড়ীর নিকট আসিলে। বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া ন্যায়রত্ন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। বাড়ীতে যে বিবাহ উৎসব আছে তাহার চিহ্নও নাই। যাক্, তিনি ভাবিলেন, ভগবানের কৃপায় পাওনাটা ভাল হইলেই হয়। চাদরের প্রান্তে ক কি ধরিতে পারে তিনি মনে মনে তাহার একটা তালিকা করিতে লাগিলেন।

হলধর গম্ভীরভাবে বলিল—"আপনি পুরুত; আপনি আগে ঢুকুন।"

"ঠিক ঠিক" বলিয়া ন্যায়রত্ন বৈঠকখানায় ঢুকিলেন।

হলধর তখন অদৃশ্য হইয়া গেল।

ন্যায়রত্ন কুব্জদেহ ও আজানুলম্বিত দোদুল্যমান কুমড়ার মত ভুঁড়ি লইয়া খাটের উপর উপবেশন করিলেন। তাঁহার অপরূপ শ্রী এবং ভুল-আঁটা টিকিটির পানে লক্ষ্য করিয়া গৃহের লোকগুলি পরস্পরের মুখপানে চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

হঠাৎ দরজার ফাঁক হইতে স্ত্রীকণ্ঠের এক বিষম চীৎকার উঠিল—"আ-মল, এই যাহাত্তুরে মিনসেকে কে কাঁধে করে এখানে আনলে? পঙ্কা বুঝি?"

বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় অপ্রত্যাশিত এই সমালোচনা শুনিয়া ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"আমি এইটি—তোমাদের মেয়ের বিয়ে—" কথার মাঝখানেই উক্ত স্ত্রী-কণ্ঠের বেয়াড়া ধ্বনি উঠিল—"হ্যাঁ বিয়েই বটে, বর নয়ত নটবর! দাঁড়া, মুখে নুড়ো জেলে দিচ্ছি—খ্যাংরা দিয়ে আশীর্ব্বাদ—" কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই ব্রাহ্মণ দাওয়ার উপর হইতে দিলেন এক লাফ্; একদম মাটির উপর গিয়া পড়িলেন। মাটিতে পড়িয়াই দিলেন ছুট্। উঃ! কী সে ছুট্! ব্রাহ্মণ নিজেই আশ্চর্য্য হইলেন। ছুট্ ছুট্ ছুট্। কাঁটাবনে চাদর আটকাইয়া গেল, পা ছড়িয়া গেল। "প্রাণ থাকলে ঢের চাদর হবে" এই ভাবিয়া তিনি রক্তাক্ত পায়েই ছুটিতে লাগিলেন। খানা, ডোবা, বাঁশবন জয় করিয়া হঠাৎ একটা কাদার মাঝে ব্রাহ্মণ 'পপাত ধরনীতলে।' "ঐ কে পাকড়াও বলে' না?" ব্রাহ্মণের মনে হইল তিনি যেন এক মহাদোষে দোষী এবং রমেশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর লোকেরা যেন তাঁহাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ আর উঠিবার চেষ্টা করিলেন না; উঠেই দিলেন আর একলাফ্।—পড়লেন গিয়ে একটা ডোবায়।

ব্রাহ্মণ এইবার হাল ছাড়িলেন ; তখন তিনি জীবন-মরণেরও অতীত। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"কত লাঠি ঝাটা নিয়ে আস্‌বি আয়। আমি নির্ভীক্ হয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

ব্রাহ্মণ কি অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়াছিলেন এবং হলধরের সহিত কোন কথা হইয়াছিল কি না জানি না, তবে তাহার পর হইতে হলধর গ্রামে সুবোধ বালক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

শ্রীধর্ম্ম মাণিক্য।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরাধিপতি মহা মাণিক্যের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ তনয় মহাত্মা শ্রীধর্ম্ম দেববর্ম্মা ত্রিপুরাতে রাজত্ব করেন। এই স্বনামধন্য পুরুষ কেবল যে নামে শ্রীধর্ম্ম ছিলেন তাহা নহে ; তিনি প্রকৃত ধর্ম্মভীরুও ছিলেন। তদীয় জীবন-বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে লক্ষিত হয় যে, এবংবিধ ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। ইহা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে উদিত হইত ;—আমাদিগের পিতৃবিয়োগের পর বয়োজ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন আমাকেই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তৎকালে অজ্ঞানতা কিংবা ভ্রম প্রমাদ বশতঃ সদ্বিচারে কোনরূপ পদস্খলন হওয়া বিচিত্র নহে। যে ধর্ম্মকে আমি জগতে অমূল্য মহারত্ন ভাবিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, তাহাতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পাপ পঙ্কে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা সংসার ত্যাগ করাই আমার শ্রেয়ঃ ; এই বিবেচনা করিয়া তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই পরিজন, রাজ্য ও ধনরত্নাদি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বেশ ধারণ পূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটনার্থে গোপনে গৃহ ত্যাগ করেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তীর্থ ভ্রমণ কালে তিনি বিশ্বেশ্বর দর্শন মানসে বারানসীতে উপস্থিত হইয়া পথশ্রম বসে এক বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হন। তৎকালে এক ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তদীয় শিরদেশ প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে থাকে। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটনাক্রমে জনৈক পণ্ডিতের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তিনি ভাবিলেন এই ব্যক্তি কখনই সামান্য পুরুষ নহেন, নিশ্চয়ই ইনি কোন এককালে রাজ্য বিশেষের অধীশ্বর হইবেন। উক্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এইরূপ অনুধাবন করিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন, এবং এতৎ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন যে, আপনি যে সময়ে দেশে

গমন করিবেন, সেই সময় আমাকেও অবশ্য লইয়া যাইবেন এবং আপনি রাজা হইলে আমাকে রাজপণ্ডিত করিবেন। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণে শ্রীধর্ম্ম কোন উত্তর প্রদান না করিয়া কেবল ঈষৎ হাস্য করিলেন।

এদিকে ত্রিপুরাধিপতি মহামাণিক্য পরলোক গমন করিলে রাজান্বিত তদীয় পুত্র চতুষ্টয় রাজ্য লাভার্থ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ কুমার ব্যতীত সকলেই রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন। এইরূপে রাষ্ট্রবিপ্লব পর্য্যবেক্ষন করিয়া কনিষ্ঠ রাজপুত্র ভাবিতে লাগিলেন—যে রাজ্য লোভে আমরা ভ্রাতৃ বিরোধ উপস্থিত করিয়া আমি ব্যতীত অন্য ভ্রাতৃগণ কাল কবলে পতিত হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে এই ত্রিপুর রাজ্যের ন্যায় সঙ্গত অধিকারী আমাদিগের অগ্রজ শ্রীধর্ম্ম; কিন্তু তিনি জীবিত আছেন কিনা ইহা জ্ঞাত নহি। যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে আমার সিংহাসন আরোহণ করিয়া পাপগ্রস্ত হওয়া সঙ্গত নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি শ্রীধর্ম্মের অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন।

যখন শ্রীধর্ম্ম বিশ্বেশ্বরদর্শনার্থ গমন করিতেছিলেন, দৈব বশতঃ সেই সময় পথিমধ্যে ত্রিপুররাজ দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি দূতকে চিনিতে পারিয়া ত্রিপুর রাজ্যের বিষয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে দূতের মনে সন্দেহ উদিত হওয়াতে শপথ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীধর্ম্মের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। শ্রীধর্ম্ম অকুণ্ঠীত ভাবে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে দূত কহিল—"কুমার, আপনার পিতা পরলোকে গমন করিয়াছেন। আপনার ভ্রাতৃগণও পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া কাল কবলে পতিত হইয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিংহাসনারোহন পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ না করিলে নিশ্চয় জানিবেন অদ্যাবধি মহামাণিক্যের বংশ লোপ হইল।" এইরূপ শোচনীয় সংবাদ শ্রবণে শ্রীধর্ম্ম প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে স্বীয়রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

৮১৭ ত্রিপুরাব্দে শ্রীধর্ম্ম ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক কহিলেন—আমি কোন দিনও রাজকার্য্য শিক্ষা করিনাই কিংবা দেখিনাই; রাজকার্য্য শিক্ষার বয়সেই গৃহত্যাগ করিয়াছি। কেবল স্বদেশ রক্ষার্থ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ দণ্ড ধারন করিতে বাধ্য হইয়াছি। এইক্ষণে বাসনা যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহত্মা দিগের কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবন করিয়া রাজনীতি শিক্ষা করি; নতুবা অজ্ঞানতাবশতঃ অবিচার করিয়া আমাকে অধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। যে ধর্ম্মের জন্য এই মায়াময় সংসার ত্যাগ করিয়াছিলাম, আমার সেই ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে।

শ্রীধর্ম্ম মাণিক্যের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে "চতুর্দ্দশ দেবতা" নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুররাজ কুলদেবতার প্রধান পূজক "ছুল্লতৈন্দ্রে চন্তাই" রাজসমীকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপুরেশগণের ইতিবৃত্ত বিবৃত করেন। রাজাজ্ঞানুসারে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক রাজসভাস্থ পণ্ডিতদ্বয় কর্ত্তৃক উক্ত রাজবংশ বৃত্তান্ত সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। এই গ্রন্থ ত্রিপুর রাজবংশের গৌরব স্বরূপ অদ্যাপি রাজনিকেতনে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। তৎকাল অবধিই ত্রিপুরাধিপতিগণের জীবন

চরিত ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। শুনিলাম—শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক পণ্ডিতদ্বয়ের বংশ বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিপুরেশগণের প্রদত্ত অনংপ্রবৃত্তি, এ যাবৎ উক্ত পণ্ডিত দ্বয়ের বংশধরগণের নিকট আছে।

ন্যায় পরায়ণ শ্রীধর্ম্ম মাণিক্য ন্যায়াসনে আসীন হইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক ও পুঙ্খ নুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কথিত আছে যে, তদীয় বিমল ধর্ম্ম প্রভাব রাজ্য মধ্যে কোনরূপ দৈব বা লৌকিক উৎপত্তি ও বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। প্রজাবর্গ সঙ্গতিপন্ন এবং রাজকোষ সর্ব্বদা ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার সুশাসনগুণে রাজ্য মধ্যে দস্যু তস্করের উপদ্রব ছিল না; কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে সক্ষম হইত না, সর্ব্বত্র সুখ শান্তি বিরাজ করিত।

শ্রীধর্ম্ম মাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ত্রিপুরাধিপতিই ম্লেচ্ছ কিংবা বিদেশীয় ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করেন নাই। তিনিই এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া যবন জাতীয় কালে খাঁ এবং আরাকান নিবাসী গগন খাঁ হানথর্থাকে মন্ত্রিপদে নিয়োগ পূর্ব্বক গৌরবান্বিত করিয়া ছিলেন।

কুমিল্লা সহরস্থ "ধর্ম্মসাগর" নামক সুপ্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন। উক্ত দীর্ঘিকা খননান্তে তিনি তাম্রফলকে দানলিপি উৎকীর্ণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকের ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন সেইরূপই রাজ্য পরিচালনেও দক্ষতা এবং যুদ্ধ বিগ্রহকালে সময় প্রাঙ্গনে রণকৌশলও শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিতেন। শ্রীধর্ম্ম মাণিক্য নানাবিধ সৎকার্য্য এবং সুচারুরূপে রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণ করিয়া বসন্তরোগে মানব লীলা সংবরণ করেন।

শ্রীসমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা।

সম্পাদকের দরবার।

মাননীয়া

শ্রীযুক্তা ভারতী সম্পাদিকা মহাশয়া

বরাবরেষু—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তরের আশায় আপনার দরবারে পেশ করিলাম।

(ক) হিন্দুদের সত্যনারায়ণ পূজা মুসলমানদের সত্যপীর পূজার নামান্তর বলিয়া কেহ কেহ বলেন। ইহার প্রমাণ কি?

(খ) বিভিন্ন অঞ্চলে ভাদ্রমাসের 'ভাদুর' পূজা হয়? এই এই পূজার ইতিহাস কি?

(গ) আদর্শ রাজার লক্ষণ কি? রামচন্দ্র আদর্শ রাজা কি?

শ্রীকিরীট ঘোষ।